৮ম বর্ষ;

অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ হইতে
আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৯

(1921—'22)



াপুরে (বাজাসন বিহারের ভগ্নাবশেষ সংলগ্ন) মৃত্তিকা খননে প্রাপ্ত
বৌদ্ধযুগের "বাসুদেব মূর্ত্তি।"
ইদানিং রোয়াইল গ্রামে গাছতলায় স্থাপিত আছেন।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা] [অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল।

ভারতের আহ্বান

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

ভারতের যে বাণী—সে বাণী সমস্ত পৃথিবীর। ভারতে যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, তারা সে বাণী পৃথিবীর মধ্যে প্রচার করবে—তার জন্য ভারতের ইতিহাস অপেক্ষা করছে, তার জন্য যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে। তারি জন্য বুঝি স্পষ্ট করে দেখতে পাবে কি না পাবে সকলে আজ ছুটে আসছে। আমাকে ভারতের ইতিহাস ডেকেছে। যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে—সে শঙ্খধ্বনি তোমার প্রাণকে স্পর্শ করেছে, তাই তুমি ছুটে এসেছ। আমি কেহ নই। আমি কে? আজ আমি সামান্য কর্ম্মীমাত্র—তোমাদের সেবক,—তার বেশী অহঙ্কার আমার নাই। তোমাদের সেবায়—আমার স্বদেশবাসীর সেবায়—আমি আজ কর্ম্মে নিযুক্ত। কাল হয়ত ভগবৎ কৃপায় -এমন অবস্থা হবে——আমি আর সে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে পারবো না। আমাকে এখনই হয়ত তিনি অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে নেবেন; নয়ত আমাকে মরণের দেশে যেতে হবে।

এই যুগধ্বনি তোমাদের প্রাণে বেজেছে! একবার ধ্যান কর—একবার চোখ বুজে মনের মধ্যে চক্ষুকে তাড়িত কর—দৃষ্টিকে পাতিত কর, তখন দেখতে পাবে কি? দেখতে পাবে শুনতে পাবে কি? যা দেখবে তাই শুনতেও পাবে। মনের মধ্যে যে স্বাধীনতার আলোক ধীরে ধীরে জলে উঠছে—সেটা দেখবার জিনিষ—সেটা শুনবার জিনিষ—সেটা বুঝবার জিনিষ।

ইন্দ্রিয়ের ভোগ সেখানে নাই। সেখানে তোমাদের দেখা, শোনা, আস্বাদ-করা, পান করা সব এক কথা। সেখানে এই পঞ্চেন্দ্রিয় এক,—একই আধার সে কি? মুক্তি। সে কি? ধ্যান। সে সব—যে সন্ধ্যার মন্ত্র, জীবনের সব। সেটা দেখতে হবে, দেখতেই হবে, কেউ কারো ছেড়ে নয়। আজ যে ঘৃণা করে, মানুষকে বঞ্চিত করে বলে সব বাতুল—কাল তাকেও আসতে হবে। যুগ শঙ্খ বেজেছে। এযুগে ভারতে এমন নরনারী থাকতে পারে না যে বিধাতার যুগশঙ্খ ধ্বনি প্রত্যাখ্যান করবে। তাকে শুনতে হবে—আজ না হয় কাল। লীলাময়ের সময়ের ত অন্ত নাই। আজ না হয় দু'দিন পরে শুনতে হবে—দেখতে হবে ওরূপ দেখতে হবে! মনকে বাঁধতে হবে, মনের সেতার ঐ সুরে বাঁধতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এই যে প্রেমের বন্যা—এতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কে ছুটবে বল। যদি আমি প্রাণ দিতে পারি-কে ছুটবে বল। বিশ্ব আর তাকে কি আবদ্ধ করতে পারবে। বিধাতা যদি সে প্রেম আমার হৃদয়ে দেন, আমি যদি সে প্রেম ঢেলে দিতে পারি, যতই যুক্তি কর, তর্ককর—থাকতে পারবেনা। পথে বেরুতে হবে। দেখতে পারছনা ভগবানের দুই বাহু সমস্ত দেশকে ঘিরে রেখেছে। দেখতে পারছনা?—চোখ খোল—অন্ধের মত থেকনা! ধ্যানে শুনতে পাওনা? দৃষ্টিহীন, সাধনাবিহীন চোখ বুঝে ভগবানের কৃপাভিক্ষা কর। দিনের পর দিন যুক্তি তর্কের মধ্যে বদ্ধ-জীবের মত আবদ্ধ থেকনা। মনটিকে খুলে দাও—আকাশ বাতাসের স্পর্শ নেও। সাধনাতে স্পর্শ কর। দেখবে সব বন্ধন টুটে যাবে। একথা আমি অহঙ্কার করে বলছিনা। আমার কিছুই নাই। ভগবৎ প্রসাদে একথা বলবার অধিকার ভগবানই আমাকে দিয়েছেন। আমার আর বাহ্যিক কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নাই।

যে স্বাধীনতার বাণী ভগবৎ কৃপায় আমি শুনেছি—তাতে নিজকে স্বাধীন করেছি—আমার স্বরাজ আমি পেয়েছি। ভাইরে; মনে করোনা আমি অহঙ্কার করে বলছি। যদি অহঙ্কার করে বলি—তবে আমার মাথা তোমার পায়ে ছোঁয়াই। আমি অবনত মস্তকে তোমার পায়ের স্পর্শ নেব।

আজ আমার মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে সেইটাই আমি বলছি। ইচ্ছা করে আমার সমস্ত ভাইদের দুই হাত আমার বুকের উপর রেখে সেই অনুভূতি তাদের দিই। সত্য মিথ্যার কথা বলছি না। আমি স্বরাজ পেয়েছি—আমার ভাবনা নাই—ভয় নাই। আমি যতদিন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে এই স্বরাজের

আকাজ্ক্ষা বাংলার সমস্ত নর-নারীর হৃদয়ে জাগাতে না পারি ততদিন—আমার বিশ্রাম নাই—আমার বিরাম নাই। এ কাজ করতে হবে। যদি আমি অক্ষম হই—বিধাতার ইচ্ছায় যদি আমার চেয়ে আর কেহ বেশী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, আমি সরে যাব। আমি মাটিতে শুয়ে থেকে ধুলায় লুণ্ঠিত হব। কিন্তু ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে চরণ স্পর্শ করে যতদিন পর্য্যন্ত না এই স্বরাজের স্বাধীনতার বার্ত্তা দেশে আমার ভাই বোনদের মনে না জাগাতে পারব ততদিন আমার বিরাম নাই।

শিক্ষার বিরোধ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্ব্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে চলে আসছিল। সেটা ভাল কি মন্দ এ বিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ ছিলনা। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা' আমিও পড়্ব। এর থেকে তিনিও যখন দু'পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বস্তে পেয়েছেন, হাণ্ড-শেক করতে পেয়েছেন, তখন আমিই না কোন পারব? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি! হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল! কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষা-বিধানটাই বনিয়াদ সমেত এম্নি টলমল করতে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লও না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জ্জরিত করে দিলেন। তার হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মনের মধ্যেই রয়েই গেল দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনদিন জোর ধরে ত এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না।

এম্নি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পুজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এতো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহু পূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু না হোক, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষায় এদের যখন বুক ফাট্‌তে থাকে তখনি ভয় হয়, ভেতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ করে বাঙ্গালী পরিচালিত একখানা Anglo Indian কাগজ। এর মুখের ত আর কামাই নেই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কবির কথাগুলো বিকৃত বিধ্বস্ত করে অবিশ্রাম বলচে—আমরা বলে বলে গলা ভেঙে ফেলেচি, ফল হয়নি,—এখন রবিবাবু এসে রক্ষে করে দিলেন। যথা—And if there were any among educated Bengalees who were wavering and vacillating, knowing not what to do—to exclude the West or to stick to the East—Rabindranath's recent Calcutta lectures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on the-fence posture. They have jumped off on the Western side. অর্থাৎ আমরা দেশের শিক্ষিত সমাজ বেড়ার ডগায় বসেছিলাম, পশ্চিমপ্রত্যাগত কবির ইঙ্গিতে 'জয়রাম'! বলে পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম! বাঁচা গেল! শিক্ষিত সমাজের এতদিনে একটা কিনারা হ'ল! কিন্তু শিক্ষিতের দল যা' নিয়ে এত বড় রই-রাই করেন, যাদের অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না,—তাঁদের যুক্তি তর্কে এর কি মূল্য দাঁড়ায় একবার সেটাও ওজন করা ভাল! কিন্তু মোটের উপর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েচে সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞেসা করছে 'ভারতের বাণী কই'?' অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া আবশ্যক। এও ভাল কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগ পন্থীর কেউ এ বিষয়ে কোন আপত্তি করে না।

তৃতীয় দফায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং, অতএব মাগৃধঃ। চমৎকার কথা,—কারও কোন স্বত্ব নেই। এযে একটা তত্ত্ব নয়, সমস্ত দুনিয়ায় এও কেউ লোক সমাজে স্বীকার করে না। অথচ, মানুষের এমনি পোড়া স্বভাব যে সে সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে বলে মিটিয়ে নেবে না। আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজন মত, তার মধ্যে অসংখ্য sub clause, অগণিত qualificationএর আমদানি করে তাকে এমনি ভারাক্রান্ত করে তুলবে যে তত্ত্বকথা আপনি হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াবে। তখন অসঙ্কোচে তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াই কঠিন। শুধু এই জন্যই উপস্থিত fact গুলোই সংসারে সত্যের মুখোস পরে মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার ধারার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে দেয়।

কবি প্রথমেই বলেচেন, "এ কথা মান্‌তেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। ....অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোর।"

আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীর ভাণ্ডেই যে মুখ জুবড়ে আছে,—তার পেট ভরে দুই কস বয়ে দুধের ধারা নেমেছে,—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই না বলবার পথ নেই,—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলেই কি এ কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চই একটা সত্যের জোরে! এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে! লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এক একটা fact, কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে জলের উপর এবং উর্দ্ধে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে সে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিম্বা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকারে বলতে পারব না কিসে এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্যে

তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তা ছাড়া গাঁট-কাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙালেও শিখিয়ে দেবে না কি কোরে তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মান্‌তেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেচে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাইই এ কথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল রোমও তাই করেছিল। আফগানেরাও বড় কম করে নি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকে নি। দুর্য্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্য্যোধনের পাত্রও ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়ে নি কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশা খেলা শিখেই কাটাতে হোতো। সুতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই? আফগান যখন হিন্দুস্থান জয় করেছিল, সে কি তার নিজের গুণে? হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতা আফ্‌গানের কাছে শেখ্‌বার কিছুই ছিল না। আবার এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম্ম, কি সভ্যতা, কি ভদ্রতা সমস্তই শিক্ষা করে আর একদিন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে বলেচে সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেচে তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমে বিদ্যে। শেখ্‌বার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেচে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভাণ করার ওপর। শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর। এতকাল এই তামাসায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে

বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জন কয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেচে—এই ত দোষ আসলে মত ভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশেষ করে দেখ্‌বার চেষ্টা করা যাক্‌। পশ্চিমের পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময় এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে ততই আনন্দে দম্ভে এদের বুক ভ'রে উঠেচে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বা'র করেচে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছু দিন অগ্রসর হ'লে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটীমাত্র মাপকাঠি কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটেই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখ্‌তে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শিখাতে পারে কিম্বা শেখাবার সুযোগ দিতে পারে অতি বড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয় নি? হয়েছে বই কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-productএর মত। বলা যেতে পারে, হ'ক by-product কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ত ক'রেও ত আমরা মানুষ হতে পারি? হয়ত পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী। আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে এগুলো দেখতে শুনতে মানুষের মত হ'লেও ঠিক মানুষ নয়। অন্ততঃ সাবালক মানুষ নয়, ছেলে মানুষ। বেল্‌জিয়ম্‌ যখন রবারের জন্য নিগ্রোদের দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত তখনও এই অজুহাতই তারা দিয়েছিল যে এরা আমাদের হুকুম মান্‌তে চায় না। এরা অসভ্য! অতএব আমরা গায়ে প'ড়ে এদের সুসভ্য কর্‌বার মানুষ কর্‌বার ভার যখন নিয়েছি তখন মানুষ এদের কর্‌তেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্যে এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। অবশ্য ভণ্ডামি বলা ছাড়া ওর যে আর কি জবাব আছে আমি জানি না। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠ্‌লেও ইংরাজ ঠিক এই

জবাবটাই দিয়ে আসচে যে এরা অর্দ্ধ সভ্য—ছেলে মানুষ। এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত বেশী খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার টাকা কড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে তাই সে সমস্তও দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এমনি সব ভাল করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করচেন—কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তেরনদী পার হ'য়ে এদের মানুষ করতে এসেছি;—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে কিন্তু আঃ—গেলাম! by law established হ'য়ে এই ইণ্ডিয়ান গুলোকে মানুষ করতে করতেই হয়রান হয়ে গেলাম।

ভগবান জানেন্ কবে আমরা মানুষ হয়ে এদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পারব! দেড়শ বছর ধরে তালিম দেওয়া চল্‌ছে কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে যে হ'তে পারব সেও ওঁরাই জানেন আর জগদীশ্বর জানেন! কিন্তু ঐ দেড়শ বছরেও যদি ওই মোহ আমাদের ঘুচে না থাকে যে এদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সত্যিই একদিন মানুষ হয়ে উঠ্‌ব, সত্যি সত্যিই আমাদের মানুষ করে, নিজেদের মৃত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলিয়া দিতে এরা ব্যাকুল, তা, হলে আমি বলি আমাদের কোন কালে মানুষ না হওয়াই উচিত! ভগবান যেন কোন দিন এই দুর্ভাগাদের পরে প্রসন্ন না হন।

বস্তুতঃ, একথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয় তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্ব্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকীল মোক্তার মুনসেফ; হুকুম মতে জেলে দিতে ডেপুটি সবডেপুটি; ধ'রে আনতে থানার ছোট বড় পিয়াদা; ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মাষ্টার; কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্ব্বরতার লেক্‌চার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, আফিসের খাতা লিখিতে জীর্ণ শীর্ণ কেরাণী,—তার শিক্ষা বিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে সে যে পারে না

কি আমি তাই শুধু ভাবি। অথচ কবি বলেছেন বাঁচবার বিদ্যা, কিম্বা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল, শুক্রাচার্য্যের হাতে আজ তাঁর বাড়ী পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হ'তে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়তেই হবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অমৃত-লোকের লোক হ'য়েও কচকে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়েছিল। হয়েছিল সত্য কিন্তু বিদ্যা ত কচ সহজে আদায় করতে পারেনি, গুরুদেবের ভোজ্য পদার্থ পর্য্যন্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে,—আমাদের দুরদৃষ্টে যদি গুরুদেবের ভোজনপর্ব্ব পর্য্যন্ত হয়েই নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তামাসার বাকী আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানব জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস্ আছে যা' তার অদৃষ্ট। যে বস্তু তার দৃষ্টির বাইরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেম্‌নি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা' তার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে এ কথা উড়িয়ে দেবেন না দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট-বস্তুও অনেকটা দায়ী। যার ওপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই—

মনে কর এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মটর হাকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে তার কৌতুহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে? অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন দিকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালক ছেলেটি মোটরের কল কারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্দ্ধস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ী চালাবার সখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে বাপ আছেন কি নেই সে হুঁস তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়ীটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং

যে রথের রথী ছেলেও যে সেই রথের রথী এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলেটি দেখলে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ড ভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ী চালিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে রাখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং—তখনও সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বললে আমার আর কিছুতে দরকার নেই।

এই গল্পের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারিনি। ছেলে দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে যে বাপ প্রসন্ন, তিনি যে কিরূপ বাপ তা' বোঝা যায় না। তবে একথা বেশ বোঝা যায় এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে, তা' তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন্ তার মরণং ধ্রুবং।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন বৃত্তান্তও দিয়েছেন। মটর-হাঁকানো ছেলেটি ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের ক্লাশে প্রোমোশন পেলে, কিন্তু যে ছেলেটির মরণং ধ্রুবং সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র মন্ত্র নিয়েই পড়ে রইল। এই তন্ত্র মন্ত্রের পরে কঠোর কটাক্ষে কবি পূর্ব্বেও করেছেন। তাঁর অচলায়তনে এ নিয়ে হাসি-তামাসা অনেক হয়ে গেছে, যারা ওয়াকিফ-হাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ব বস্তুর পিছনে যে কোন একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে, মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তত্ত্ব। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও কুল কিনারা তার তেম্‌নি অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে আসচে,—আজও তার উপায় বার হয়নি, অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে যে প্রার্থনা একদিন ম্যাজিক অর্থাৎ মন্ত্র তন্ত্রে, এবং ম্যাজিক আর একদিন প্রার্থনার চেহারা বদলে দাঁড়ায় এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই অংশটা বি[illegible]নের পরিণতির প্রশ্নে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

সে যাই হোক, এই মটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের-দিকে-তাকানো ভালো ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যথা—"পূর্ব্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকচি দৈন্য হলে গ্রহ শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে

দৌড়াচ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভলটেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'শুনেচি নাকি মন্ত্র গুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য ?' ভালটেয়ার জবাব দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায় কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।" য়ুরোপের কোন কোণে কানাচে যাদু মন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।"

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয় তা'হলে বলার আর কিছু নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি, সেকো বিষ খেতেও কারো আপত্তি করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য? ভলটেয়ার বেশি দিনের লোক নন, তাঁর মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন সেদেশেও বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্ব্বরতায় কি এ দেশটা এতখানিই নীচের ধাপে নেবে গিয়েছিল যে ঠিক এম্‌নি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিলনা? কেউ ছিলনা যে বলে, ভূতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ী যাও? মারতে চাওত অন্য পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে নিরালায় মারণ মন্ত্র জপ করলেই কার্য্য সিদ্ধ হবেনা? য়ুরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিম্বা যে হাতী দাঁকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ উচ্চাটন মন্ত্রতন্ত্রের ইঙ্গিতেও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারিনে।' গোরা' বলে বাঙলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে'

কবি বলেছেন, যাদুমন্ত্রের পরিণতিই হচ্ছে বিজ্ঞান। কোনও একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হয়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে য়ুরোপ তার যাদু বিদ্যার নালা এক লাফে ডিঙিয়ে গেল, আর আমরা দেশ সুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড়-ভেঙে সেই পাঁকেই চিরকাল পুতে রইলাম। বাইরের দিকে বস্তুবিশ্ব যে একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড, অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে

যাদু বিদ্যায় ভাঙেনা, সংসারে যা-কিছু ঘটে—তারই একটা হেতু আছে এবং সেই হেতু কঠোর আইন কানুনে বাঁধা, অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্ব জগতে কার্য্যকারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগ্য পূর্ব্বদেশে কারও ছিলনা? এবং এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হ'তে আমদানী না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ-উচাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশী আর কিছুই মিলতে পারে না? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ সংস্থান, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে ত মনে হয় লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভাল। বস্তুতঃ, এই ত নাস্তিকতা। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, যে শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে—অন্ততঃ তাদের মানুষের ধারণা যা, তা তারা আমাদের দেয় নি দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গেরও যে আমরা কি হয়ে আছি মাত্র সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবলই এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ব্ব বিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের গভীর। সেটা জান্‌বার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাহিরের সাজ-সজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা অন্য দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে। তাই একদিন আমাদের দেশের একদল লোক নির্ব্বিচারে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মত না হ'তে পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই। ওদের জাতিভেদ নেই অতএব সেটা ঘোচানো চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হ'লেই নয়, তাদের খাওয়া দাওয়া বাচ-বিচার নেই সুতরাং ওটা না তুললেই আর রক্ষে নেই, তাদের মন্দির নেই, অতএব আমাদেরও গির্জ্জার ব্যবস্থা চাই, তারা ভাড়া ক'রে ধর্ম্মপ্রচারক রাখে সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এমনি কত কি! কেবল গায়ের চামড়াটা বদলাবার ফন্দি তাঁরা খুঁজে পান নি, নইলে আজ তাঁদের চেনাও যেত না। অথচ, আমি এর দোষ গুণের বিচার করচি নে, আমি সরল চিত্তে বলছি, কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র অভিরুচি নেই, আমি কেবল এর Mentalityটাই আপনাদের

গোচর করবার প্রয়াস করচি। এই যে বিদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিদারুণ বিরাগ এ শুধু সম্ভবপর হয়েছিল তাদের আনন্দের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে। তাই এদের সংসর্গে যারা এসেছিলেন তাদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে বসেছিল যে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাঁদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটেনি যে বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে কেবল সেই টুকুর হুবহু নকল করলেই তাঁরাও অমনি মানুষ হ'য়ে ওদের অন্দরে পংক্তিভোজনে সরাসর বসে খেতে পাবেন। সংসারে যা কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না—একথা তাঁদের স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে নি যে মানুষ হবার সত্যকার সজীব মন্ত্রটী কেবল ওদের ওই নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটীতেই চাপা দেওয়া আছে, কোনমতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার দ্বিতীয় পন্থা নেই! এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ চলেছে—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ্য, অত বড় বড় বাড়ী কি হবে? কি হ'বে টানা পাখায়? কাজ কি আমার টেবিল চেয়ারে,—দূর করে দাও মোটা মাইনের বিলিতি প্রফেসার—তার খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হ'য়ে গেল! এমনি আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্ব্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন খানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? একি কেবল গোটাকতক সাজ গোজ বদলালেই হ'বে? টেবিল চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেকট্রীক ফ্যানের পরিবর্ত্তে তালপাখা এনে, কিম্বা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দিশি অধ্যাপক আমদানী ক'রে কিম্বা বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়মের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেকচারের আইন করলে দুঃখ দূর হ'বে? (দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না যতক্ষণ সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হ'তে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হ'লেও সে শুধু একটা গোঁজা মিল হ'বে,—তাতে কল্যাণ

নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনদিন মনুষ্যত্ব দেবেনা।

অভয় মন্ত্র

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

লহ লহ লহ
অভয়ের মন্ত্রদীক্ষা লহ,
দিবসের কর্ম্মে তোর সারাদিনমান
যতেক সংসার ভয় ছায়ার সমান
অনুক্ষণ চলে পিছে পিছে,
যাক্ আজি যাক্ তাহা ঘুচে ;
লহ লহ লহ,
অভয়ের মন্ত্রদীক্ষা লহ।
ঘৃণা, লাজ, ভয়
নিমিষে হইবে সব ক্ষয়।
এ মন্ত্র জপিতে হবে সর্ব্বক্ষণ ধরি,,
এ মন্ত্রে জীবন তরে নিতে হবে বরি,
এ মন্ত্র আশ্রয়
জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মে ছুটে যাবি নাহি কোন ভয়।
ঘৃণা, লাজ, ভয়!
কার ঘৃণা ? কিসে লাজ ? কারে তোর ভয় ?
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছতম ভয় করি তারে
অপমান করিস্না তাঁরে,
অন্তরে তোমার যিনি সর্ব্বক্ষণ ধরি
জাগিছেন অভয় বিতরি।

তাঁরি বলে বলীয়ান্ স । পথে ছুটে যেতে হবে,
মহাবীর কে তোরে রোধিবে ?
রোধিবে ঝঞ্ঝার বেগ ক্ষুদ্র পঙ্গপাল,
শুষ্ক তৃণরাশির জঞ্জাল ?
বিদ্যুতে করিবে রোধ চাতকের পাখা ?
শুষ্ক পর্ণ ঢাকা দিবে যজ্ঞানলশিখা ?
দীক্ষিত অভয় মন্ত্রে চলেছ নির্ভীক্,
মহাসত্যে স্থিরমতি, সত্য পথে হে বীর পথিক,
তদেক শরণ—
শঙ্কা নাহি আসিলে মরণ।
তিনি ছাড়া আর
বিরাট এ বিশ্বে তোর ভয় করিবার
নাহি নাহি নাহি অধিকার।
হে অভয় মন্ত্র আজ জাগো,
ভারতের প্রাণে প্র ণে জাগো!
ভারতের গৃহে গৃহে, বুকে বুকে লভ যজ্ঞবেদী—
তা'রপরে রহ সমুজ্জ্বল
নিত্যকাল হে অভয় মন্ত্রের অনল।
তব উচ্চারণ
সর্ব্বক্ষণ তোমায় স্মরণ
মুহূর্ত্তে করুক দূর যত মিথ্যাভয়
অলীক সংশয়।
র্দ্বলের কাণে কাণে কহ অবিরাম
"এ সংসারে ভয় করিবার
তিনি ছাড়া আর,
নাহি নাহি তোর অধিকার।"

ভাঙ্গন ও গড়ন

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস]

সৃষ্টির সুন্দর প্রকটন হয় ধ্বংসে! নতুন যুগের আরম্ভ হয় প্রলয়ের পশ্চাতে। পুরাতনের আগাগোড়া ভাঙ্গনের উপরেই নতুনের লীলাভবন গড়ে উঠে। কারণ বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্বলীলার এও একটা বিশেষ অঙ্গ যে যেখানে পুরাতনের কাঁটা বনে ঝোপে ঝাপে জঙ্গলে প্রাণসঞ্জীবনী আলোক বাতাস বন্ধ হয়ে যায় সেখানেই সে কাঁটার বাঁধন সে বনের আড়াল ভাঙ্গবার প্রয়োজন সবার আগে। এ শুধু যে বাহিরের সৃষ্টির বিষয়ে সত্যি তা নয়, এ অন্তরের সৃষ্টির পক্ষে আরও বেশী করেই প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন পুরাণো ইমারত ভেঙ্গে তবে নতুন প্রাসাদ গড়তে হয়, তেমনি পুরাণো ভাবধারার জীর্ণ সরঞ্জামগুলি একবারে অপসারিত করে তার উপর গড়ে তুলতে হয় নতুনের সাধনভূমি। কারণ সবটাতেই মুক্তক্ষেত্র চাই, তবে নতুন সৃষ্টির পত্তন করা সম্ভব। বিশ্বজোড়াই এ ভাঙ্গন গড়নের খেলা চলছে, যেহেতু এ খেলায় স্বভাবের অনুমোদন আছে এবং সে অনুমোদন আছে বলেই এ লীলা তরঙ্গের উপর ভর দিয়ে প্রকৃতিরাণী তাঁর নতুন নতুন বিহারভূমি গড়ে তুলছেন। সব খানেই এ রকম ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লীলাময়ের লীলা প্রকটনের পারম্পর্য্য রক্ষা পাচ্ছে। তাই ইউরোপের প্রচণ্ড ধ্বংস লীলার পরে নতুন সৃষ্টির জন্য একটা উদ্দাম চপলতা জেগে উঠেছে। সেখানে সব সংস্কার সব বাঁধন সব পদ্ধতি ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং সে ভাঙ্গনের পশ্চাতে মানুষ সবদিক দিয়ে মুক্ত বাঁধনহারা হবার চেষ্টা পাচ্ছে, কারণ তারা চাইছে নতুন সৃষ্টি নতুন গাঁথনীতে গড়ে তুলতে! বাঁধা সংস্কারে পুরাণো ভাবমোহে অন্ধ মন নতুন পথে এগোতে চাইলেও যে এগুতে পারে না, এটা খুব খাঁটি সত্যি কথা। স্বীকার করি পুরাণোর একটা প্রাণভোলান প্রচণ্ড মায়া আছে; যার জাল ছিঁড়ে নতুনের পথে এগোনো শুধু কঠিন নয় অনেক সময়ে অসাধ্য ও বটে, পুরাণোর ভয়ে পিছু টানে মানুষ কেবল যাই যাই করে আর চমকি চমকি পিছনে চায়। তাই সৃষ্টির চেয়ে ভাঙ্গন বড় কঠিন, কারণ ভাঙ্গন সুন্দর

হলে গড়ন ও সুন্দর হবে। এটা এখন সকলেরই মনে খুব দৃঢ় রকমেই ভিৎগেঁথে বসেছে যে নতুনের সৃষ্টির সময় এসেছে। এখন সকলেই নিশ্চয় বুঝছেন—

"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি, তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'।
ঝড়ের মাতন! বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশ খানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে,
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতার আহ্বানে সকল দেশেই শিকল দেবীর পূজাবেদী ভাঙ্গবার জন্য ঝড়ের মাতন আসেই। তখনই দেখা যায় অট্টহাস্যে দেশের আকাশখানা প্রতিধ্বনিত করে ভোলানাথের পার্শ্বচরেরা বিজয় কেতন নিয়ে ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বেড়িয়ে পড়ে। তাতেই সমাজ ভাঙ্গে, সঙ্ঘ ভাঙ্গে, বাঁধা-ধরা একটানা ভাবধারা কোথায় লোপ পায় কে জানে, তখন আসে এক ভৈরব হুঙ্কারে প্রমত্ত নর্ত্তনে দেশের তরুণ কাঁচার দল। সব দেশেই এ কথার সত্যতার প্রমাণ হয়ে গেছে, সব সমাজেই ভাঙ্গার শক্তির পরীক্ষা হচ্ছে ও হবে, সকল সঙ্ঘেই পাগলামি এমনি করে বাঁধনের দুয়ার ভেঙ্গে ছুটে বেরোচ্ছে। কারণ মানুষ জানে সেই পথেই মানুষের শক্তির অখণ্ড ঘর।

যে বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, যে জীর্ণ আবেষ্টনী টেনে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, তার জন্য সময়ের অপেক্ষা করে পাঁজি পুঁথি হাতে নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে কেন। সেখানে অনেক মায়া কাটাতে হবে, অনেক লোভ দমন করতে হবে, সেখানে প্রাণ খুলে বলতে হবে—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।"

উদ্দাম বাসনাই সেখানে পথ প্রদর্শক। হয়ত অনেক সময়ে কত দিনের স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে ফেলে চলে যেতে হবে, কত লোকগঞ্জনার ভিতর সরল মনকে আঘাত পেতে হবে; কিন্তু যখন সমাজের উন্নতির জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, ধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রাণের মাঝে ভগবৎ প্রেরণা আসে, তখন সে

বিবেকের আহ্বানে কর্ত্তব্যের ডাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়, অনেক বিরহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তপঃশুদ্ধ হতে হয়, অনেক প্রীতির বন্ধন যা জীবনের বিমল রসে সিক্ত হয়ে প্রাণের মাঝে দৃঢ় হয়ে ভিৎ গেঁথেছে, সে সবগুলিও সমূলে টেনে ফেলতে হয়। ব্যাথা লাগে সত্যি কথা, কিন্তু যখন বুঝতে পারা যায় অন্তরের অন্তর থেকে কে আমায় কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড়বার জন্য আকুলকণ্ঠে ডাকছে, যখন বুঝতে পারা যায় যে "মহাকাশ হতে ঐ বারে বার আমারে ডাকিছে সবে," তখন অনেক ব্যথা সহ্য করেও ছুটে আসাই পুরুষকার। তখন সে স্নেহপ্রেম ভালবাসার কাছে বিদায় নিয়ে বলতেই হবে—

"অরুণ তোমার তরুণ অধর করুণ তোমার আঁখি
অমিয় রচন সোহাগ বচন অনেক রয়েচে বাকী।"

কিন্তু উপায় নেই—

"আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্ম্মম আমি আজি
আর নাই দেরী ভৈরব-ভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি।"

এখানেই সাধারণ মানুষ আর অতি প্রাকৃত লোকের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পায়। সাধারণ মানুষ চায় নিজের পরিবারের মধ্যে আত্মস্থ থেকে শান্তির কোলে বসবাস করতে, সেই তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তার পরিবারের বাহিরে দেশের বা দেশের কি অবস্থা হলো, তাদের উন্নতি করবার তার যদি শক্তি থাকে, সে শক্তি সে ব্যয় করবে কি না সে কথা সে ভাবে না কিংবা ভাববার চেষ্টাও করে না। কারণ জাতির বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের দিকে ত তার লক্ষ্য নেই, তার লক্ষ্য আছে আত্মপরিবারকে কেন্দ্র করে যে ছোট একটি জগৎ সে গড়ে তুলেছে সেই স্বার্থের সীমার দ্বারা নিবদ্ধ একটা ছোট স্বার্থপর জগতের পানে। এমনি করে একটানা জীবন প্রবাহের সঙ্গে চলেই ত সাধারণ লোকে জন্মগ্রহণ করে, আহার নিদ্রা বিলাস নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে তারপর একদিন অন্তিম নিশ্বাস ফেলে অনন্ত জীবসাগরের মধ্যে জলবুদ্বুদের মত কোথায় বিলীন হয়ে যায় কে জানে! কিন্তু অতি প্রাকৃত লোকদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা নিজেদের পরিবার নিয়ে ক্ষুদ্রগণ্ডী বেঁধে সুখশান্তিতে থাকতে চান না, তাঁরা চান বিরাট দেশের সুখশান্তি নিয়ে গড়ে উঠতে। হয়ত তাতে তাঁদের নিজেদের পরিবারে মর্ম্মান্তিক বেদনা পান, হয়ত সে বেদনার আঘাতে তাঁদেরও জীবনবীণার দু একটি তার বেসুরা হয়ে যায় এমন কি ছিঁড়ে পর্য্যন্ত যায়; কিন্তু তাঁদের লক্ষ্যস্থল অনেকটা বড়

কর্ম্মভূমিকে কেন্দ্র করে, তাঁদের জীবনের বাসনা নিজেদের ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পরিবারের সুখশান্তি পাওয়ার চেয়ে অনেক মহৎ। সেই জন্যই দেখি শ্রীচৈতন্য যখন মাকে কাঁদিয়ে স্ত্রীকে দুঃখ দিয়ে সব মায়া মোহের বন্ধন ছিঁড়ে এসেছিলেন দেশবাসীকে সুখ শান্তি দেবার জন্য, তখন তাঁর মনে নিশ্চয়ই এই ভাব প্রবল হয়ে ছিল—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে, কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।"

তাই এই মায়ারবন্ধনের ভাঙনের উপর গড়ে উঠেছিল, আচণ্ডালকে কোল দেওয়া একটা অপূর্ব্ব প্রেমের মন্দির। কোনও নতুন জিনিষ গড়তে হলেই আগে ভাঙনের প্রয়োজন।

বিশ্বের যে কোনখানে যা কিছু পবিত্র জিনিষ, কি ধর্ম্ম কি সাধনা, তা সব গড়ে উঠেছে ভাঙনকে ভিত্তি করে। কিন্তু যারা এই ভাঙন দিয়ে গড়নকে বরণ করে আনতে যান তাঁদের সব দেশে সব যুগেই অসহ্য লাঞ্ছনা প্রাণঘাতী গঞ্জনার মধ্যে কাজ করে যেতে হয়েছে। তাই যিশু খৃষ্ট যখন পুরাণের সংস্কারগুলি ভাঙতে ভাঙতে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করছিলেন, ঠিক সেই ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছিল এক অতি পবিত্র যুগধর্ম্ম। এ ভারতেও যখন শাক্যসিংহ সকল মায়ার বেষ্টনী ভেঙ্গে আত্মপরিবার সকলকে কাঁদিয়ে বের হয়ে ছিলেন, তখন কি বুঝতে পারেন নি আমার পরিবারের সুখ শান্তি যে এতে একেবারে ভেঙ্গে যাবে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পাগলের মত বুকফাটা ক্রন্দন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কেন ? কারণ এই ভাঙার দ্বারা একটা মহত্তর কিছু গড়ে তুলতে। তাঁকে যে উদ্দাম ভাবে পাগল করে ঘর ছাড়া করে নিয়ে এসেছিল, তা তাঁকে ভাবিয়ে দিয়েছিল—

"কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম গান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে"।

তাই অসহ্য নির্য্যাতনের পরে অসংখ্য ভাঙনের মাঝে গড়ে উঠেছিল এক প্রশান্ত বিশ্বধর্ম্ম, যার প্রচ্ছায় শীতল আশ্রয়ে এখনও পৃথিবীর কত লোক সুখ-শান্তি উপভোগ করছে। সবটাতেই দেখা যায় নতুন কিছু মহত্তর গড়তে হলে ভাঙনের প্রয়োজন সবার পূর্ব্বে। তখন দ্বিধা-সঙ্কোচ লাজ ভয় সব কিছু অগ্রাহ্য করে প্রীতি ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে কেবল ভাঙনের মুখে ছুটে

যাওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ ; তারপর দেখতে দেখতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শিল্পকলা ধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান প্রজ্ঞান যা কিছু তর্ তর্ করে অসম্ভব প্রয়াসে গড়ে ওঠে। সত্যি এই হচ্চে বিশ্বের ইতিহাসের ধারা।

তাই এ ভারতের যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে তোলবার মূলে রয়েছে প্রকাণ্ড এক ভাঙ্গনের খেলা। কারণ যে বন্ধনটা বড় আঁকড়ে আছে, তাকে ছিন্ন করতেই হবে, যে শিকলটা গলায় বড় বাজছে তাকে ভাঙ্গতেই হবে। তারপর সেই মুক্তশক্তির উপর ভর দিয়ে স্বাধীনতার লীলা ভবন গড়ে উঠ্‌বে। আমাদের জাতীয় জীবন গড়বার পক্ষে বাইরের দিক থেকে সর্ব্বপ্রথম বাধা হচ্ছে সমাজের অটুট বন্ধনগুলি। আমাদের এই সমাজবন্ধনের মত এমন একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার আর কোনও সভ্যদেশে আছে কিনা সন্দেহ। এ শাস্ত্রের বিচার মানে না, গুণের আদর জানে না, একটা প্রবল ঝঞ্ঝার মত এসে দুমড়ে দিয়ে পিষে ফেলে একটা নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেয় কারণ এ অন্তরে বাহিরে পরাধীনতার দেশে শাস্ত্র টাস্ত্র বড় কিছু নয় আচারই নাকি আসল ধর্ম্ম ; আচার বন্ধনই আষ্টে পৃষ্টে মানুষকে বেঁধে রেখেছে। কপটতা ও সঙ্কীর্ণতায় সমাজ যে একেবারে অন্তর সার শূন্য হয়ে কেবলি ফেঁপে উঠেছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে জড়দেহ বেশীক্ষণ আপনাকে খাড়া রাখতে পারবে না নিশ্চয়ই। অথচ এই হিন্দুসমাজই একদিন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়ে ছিল, ধীবর দৌহিত্র দ্বৈপায়নকে বেদবিভাগের অধিকার দিয়েছিল এবং তারই ফলে কত পুরাণ কত সংহিতা হিন্দুশাস্ত্রকে জ্ঞানগৌরবে মণ্ডিত করে দিয়েছে। আর এখনকার হিন্দুসমাজ শুধু ত্যাগনীতি অবলম্বন করে গ্রহণের সামর্থ্যকেই একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রথমেই জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হলে এ সব সমাজ বন্ধনকে আগে ভাঙ্গবার প্রয়োজন হবে। এ সব বেষ্টনী ভেঙ্গে গেলেই সকলে এক অখণ্ড ধর্ম্মকে গড়ে তোলবার শক্তি পাবে। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, আচার কেবল বাহিরের ঠিকাদারি প্রহরীমাত্র। ভাঙ্গনের যে প্রয়োজন এসেছে, সে কথা না বুঝলে আর চলে না।

তাই দেশ এখন এসে পৌচেছে এমন অবস্থায় যেখানে—

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্র বেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হ'তে। লজ্জা সরম তেয়াগি

জাতি প্রেম নাম ধরি ; প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মের ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

জাতীয় জীবন গড়বার পক্ষে সমাজের বন্ধন যেমন বাহিরের প্রচণ্ড বাধা, তেমনি কুশিক্ষার বন্ধন তার অন্তরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কারণ বর্ত্তমান যে শিক্ষা আমাদের দেশে খাড়া করা হয়েছে, তা পাশ্চাত্যের ব্যর্থ অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে প্রাণের অভাব বড় বেশী করেই অনুভব করা যাচ্ছে। এই শিক্ষা দীক্ষার ফলে আমরা আহারে ব্যবহারে আচারে বিচারে ভাষায় ভাবে ধর্ম্মে কর্ম্মে সমস্ত জীবন ক্ষেত্রে প্রতিপদে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে আসছি। মন্দিরের বদলে সভা করেছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল খুলেছি, থিয়েটার করে আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারি করে অনাথ আশ্রমের চাদা তুলি ; দেশে যত রকমের স্বাস্থ্য রক্ষা করবার সহজ উপায় ছিল, তার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করেছি, অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের জীবন যাপনের উপায় মাত্র তা ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের নকলে অর্থোপার্জ্জনের জন্যই জীবন যাপন করবার চেষ্টা করছি। এমনি করে আমরা দেশের সাথে প্রাণের যোগ হারিয়ে ফেলেছি। আসল কথা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষার আদর্শও আগা গোড়া না ভাঙ্গলে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠ্‌বে কি করে। ইহাকে আমাদের দেশের স্বভাব ধর্ম্ম সভ্যতা ও সাধনার সাথে যোগ করে দিতে না পারলে এবং এই শিক্ষা সাধারণের সহজ প্রাপ্য করে তুলতে না পারলে আমাদের বোঁর বিপদের কথা। আমাদের হাব-ভাব আচার ব্যবহার সবই এত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের কোনও যোগই বুঝি নেই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করে তার প্রাণের কাছে গিয়ে তাকে ছুঁতে পারিনি। আমরা মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি একটু চালাক হয়েছি মাত্র। তাই আজ তথাকথিত শিক্ষিতের দল যারা "নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক জনমের গ্লানি", তাদের অবস্থা দেখে বড় দুঃখে বলতে হয়—

"সমস্ত ধরণী আজি অবহেলা ভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

• • • • •

আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সঙ্কীর্ণ, রুধি দ্বার বাতায়ন

তারা আজ কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।"

আর দেশের যারা সত্যি প্রাণ, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পায়নি বলে আমাদের কাছে অবজ্ঞা পেয়ে আসছে, তাদের দয়ামায়া আছে, ধর্ম্ম আছে, তারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথি সেবা করে দেবতাকে ভক্তি করে। তারা ঘোর দারিদ্র্যের মাঝে মরতে মরতেও বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রেখেছে, যারা সব রকম সেবায় নিরত থেকে আজও বাঙ্গলার ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, যারা আজও শুদ্ধচিত্তে সরলপ্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে বাঙ্গলার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়; মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে, যাদের জন্য বাঙ্গালী আজও বাঙ্গালী, যারা বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হয়ে বাঙ্গালীজাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালিয়ে জাগিয়ে রেখেছে, তাদের ভিতর দিয়েই বাঙ্গলার সনাতন শিক্ষার ধারা বয়ে আসছে। তারা সবল স্বাধীন সরলপ্রাণ, কোনওখানে আত্মার নিষেধ না মেনে এক মহান বিপুল সত্যপথে চলেছে, তাদের আদর্শ ই যে বাঙ্গলার আদর্শ। বর্ত্তমান শিক্ষাকে আমূল না ভাঙ্গলে জাতীয় শিক্ষার মন্দির গড়ে উঠবে না। এখন এমন শিক্ষা চাই যাতে দেশের আপামর দুনিয়ার জীবনযুদ্ধে যোগ দিতে পারবে, সকল জাতির সঙ্গে সমক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারবে। কারণ শিক্ষার মূলের কথাই হচ্ছে জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সকল দিক দিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্ব গড়ে তোলা। এ শিক্ষার কণামাত্রও দেশবাসী এখনও পায়নি, তাই দেশে আজ মানুষের এত অভাব। সেই জন্যই দুঃখ করে আমাদের বলতে হয়—

"আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধির পুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর-ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরমস্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ?

কে রাখিবে ভরি নিজ অনন্ত আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার ?

আজ তাই কেবল ভাঙ্গনের পালা এসেছে, ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দেশ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। তারপর সেই শ্মশানে শক্তির সাধনা চলবে এবং বোধ হয় তখনি সেই ভাঙ্গনের শ্মশানের উপর গড়ে উঠবে নতুন মনুষ্যত্বের নতুন সাধনার দেবমন্দির। এ ভাঙ্গনের মাঝে প্রবল হৃদয় শক্তির প্রয়োজন হবে, ভগবানের কাছে ব্যাকুলকণ্ঠে প্রার্থনা করতে হবে—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য জ্বলে উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে ; যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।"

তারপর জগতের সব চেয়ে বড় সমস্যা জীবন সমস্যা। ধর্ম্মের পথে থেকে বিবেকের বাণী অনুসরণ করে জীবিকা অর্জ্জন করা এখন একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপার্জ্জনের পথ এত সঙ্কীর্ণ যে মিথ্যার আশ্রয় না নিলে সেখানে প্রবেশ করা কঠিন। এই জন্য জাতীয় আদর্শ হারা হয়ে উঠছি, অন্তরের কোমলতা হারিয়ে ফেলছি। এখানেও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে। তাই এ সব উপার্জ্জনের পথ ছেড়ে দিয়ে ভারতের যে আদর্শ সেই পবিত্র সরল জীবন তারই পথ ধরবার চেষ্টা করতে হবে। সেই জন্যই দৈনিক আহার বস্ত্র সংগ্রহ করবার পক্ষে এই পরিবর্ত্তনের মোহনায় মিল ফ্যাক্টরী ছেড়ে দিয়ে চরকা তাঁত প্রভৃতি সহজে জীবিকা লাভের ব্যবসায় গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। শুদ্ধচিত্তে পুণ্যমনে সংযম ত্যাগ ও বিলাসবিহীনতার পথ ধরে লুপ্ত মনুষ্যত্ব অনুসন্ধান করে আনতে হবে। তাই এ ভাঙ্গনের পথ এখন সব চেয়ে বড় পথ, কারণ বর্ত্তমান যুগপ্রেরণাও ঐদিকেই ইঙ্গিত করছে। ভেবে ভেবে পথ চেয়ে বসে থাকলে আর চলবে না, কারণ ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়নের পত্তন হতে থাকবে। শুধু সমাহিতমনে তপঃশুদ্ধপ্রাণে সেই ভাঙ্গন-গড়নের একমাত্র নিয়ন্তার কাছে নত হয়ে নিবেদন করতে হবে—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,

এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্যমর্য্যাদাগর্ব্ব চির পরিহার।
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোকমাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।"

কোকিল ছানা

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

সত্যঘটনা

নিরাশ্রয়া অন্ধ দুঃখিনী কুলীরমণী সে। আড়কাঠির প্রলোভনে পড়িয়া আসামের চা বাগানে গিয়াছিল।

আজিকালকার দুর্দ্দিনে, ও দৈন্যও অভাবের নিদারুণ নিষ্পেষণে যখন তাহারা মরিয়া হইল, তখন একদিন দলে দলে আসাম কুলীরা "মহাত্মা গান্ধী জী কি জয়" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কোনো প্ররোচনা, কোনো ভয়-দেখানোর পরোয়া আর তাহারা রাখিল না,—প্রতিজ্ঞা এবার দেশে ফিরিবেই। এ মাত্র সেদিনের কথা,—সবে দীনহীনের আত্মশক্তির উদ্বোধন হইতে সরু হইয়াছে।

আসাম হইতে দলে দলে কুলীরা আসিয়া চাঁদপুর জুটিল। সরু সরু হাত পা, পাঁজরের হাড়গুলি গোণা যায়, সারা দেহের গাঁটগুলি অস্বাভাবিক রকম স্ফীত, টোলপরা গালের উপরে চোয়ালের হাড় পাহাড়ের শৃঙ্গের মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—সারা গায়ের মধ্যে হাড়ের ফ্রেমে আঁটা পাম্পকরা ফুটবলের

মতো পেটটাই দর্শন যোগ্য হইয়া বাড়িয়াছে। তাহাতে নীল নীল শিরাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সেগুলি দূরবীনে-দেখা মঙ্গলগ্রহের খাল!

'পরিধানে চীরবাস'—অত্যন্ত ময়লা, যেন কাদা জলে ডুবাইয়া রৌদ্রে শুকান হইয়াছে। তা'ও পুরুষদের কৌপীনের মতো পরা মেয়েদের বক্ষ হইতে আজানু কোন প্রকারে ঢাকা। মাথার চুল স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই অতি অল্প, তৈলাভাবে রুক্ষ ও জটিল। সকলের সঙ্গেই এক একটী পুঁটুলী আছে, তাতে সম্বল—একটা ঘটি, খান কয়েক ছেঁড়া ন্যাকড়া, চার ছ' আনার পয়সা —আর একটী করিয়া তামার চাকৃতি। ঐ তামার চাকৃতিই নাকি তাদের বাগানে অমূল্য সম্পদ, উহা চা-কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত-করা দোকানে দেখাইলে তিনটী আনা মূল্যের খাদ্যসামগ্রী তাহাদের দেওয়ার কথা! ইহার উপর দোকানদারের "ফাউ" লাভ ত আছেই। বেচারা পাইতে পাইতে পায় গিয়া হয় তো আট পয়সার জিনিষ। মাইনা বাবদ নগদ পয়সা কুলিদের হাতে দেওয়া হয় না, পাছে পয়সা জমাইয়া তাহাদের খর্পর হইতে উহারা পালায়। প্রায়েরই উপর মা ষষ্ঠির যথেষ্ট কৃপা আছে বলিয়া বোধ হইল— প্রত্যেকের সঙ্গেই তুইটী তিনটী করিয়া অপগণ্ড আছে,—প্রায়ই উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ। সবারই চেহারা এক রকম,—হাড়ের কাঠামের উপর যেন আঠা দিয়া চামড়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এরা সব যেন মূর্ত্ত নিঃস্বতা!

হ্যাঁ সেই কুলিরমণীর কথা বলছিলাম। যখন দলে দলে কুলী আসিয়া চাঁদপুরে জড় হইল, তখন সেও আসিয়াছিল। নদীর পাড়ে মারক্যান্‌টাইল ব্যাঙ্ক এর পাট গুদামে হইয়াছিল তাহাদের আস্তানা। এক একটা গুদামে থাকিত সত্তর, আশী নব্বই জন করিয়া! বিসূচিকা দেখিল বড় সুযোগ যায়,— সে স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিল না। যাঁহারা কাগজ পত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন কিভাবে তখন কুলীর দল নিঃশেষিত হইতেছিল। রোজ পনর,—বিশ—পঁচিশটা করিয়া লোক মারা যাইত। ব্যামোটা হইত ভারি অদ্ভুত রকমের—আগে ধরিত পেটের অসুক বা' আমাশায় রোগে। তুই একদিন পরে বিসূচিকা লক্ষণ দেখা দিত।

সে দিন আস্তানায় তদন্ত করিতে গিয়া আমি অন্ধ রমণীটীকে কুড়াইয়া আনি। রোগের আক্রমনে শিথিল হস্তে সে তখন তাহার শিশুটীকে আঁকড়াইয়া ছিল। শিশুটী একটু অস্বাভাবিক, সাধারণ কুলী বালকদিগের মতন অত কালো নয়,—কালো নয় কেন বেশ ফর্সাই। হৃষ্টপুষ্ট না হইলেও

গাল দুটী নিটোল। পেটটা অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও প্লীহা এখনও খুব বেশী বাড়ে নাই। লম্বা লম্বা চুলগুলি ঈষৎ পীতাভ চোখ দুটীর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে বালিকা টুলটুল করিয়া তাকাইতেছিল। দেহের উপর দিয়া তাহার বোধ হয় বার দুই বসন্তের হাওয়া বইয়া গিয়াছে।

ষ্ট্রেচার"—এ মা-মেয়েকে লইয়া অসিয়া যখন রুগ্নাকে বিছানায় শোয়াইবার জন্য বালিকাকে তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইলাম, তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন মেয়েটীর দুর্ব্বল হস্তের বাঁধুনি খুলিয়া আসিতেছে আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে বলিয়া উঠিল" মেরী—মেরী লড়্কী - মেরী লড়কীকো কাঁহা লেতেহো বাবুজী" ?

আমি শিশুকে বাঁহাতে বুকে তুলিয়া লইতে লইতে তাহার উদ্যত হাতদুখানি আস্তে আস্তে বুকের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম "কুছ ডর নেহি মাই, হামরা পাস তেরী লড়কী বহুত আচ্ছা হালমে রহেগী,—বুখার মে তুম্ কেইসে আপনী লড়কীকে তদ্‌বির করোগি।"

প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মেয়েটী বলিল "নেহি নেহি বাবুজী, লড়কীকো দেও—মেরা লড়কী" আমার সঙ্গী কালিকেশববাবু রোগিণীকে ষ্ট্রেচার হইতে শয্যায় তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন,—তিনি বলিলেন "মাই—কোন চিন্তা নেই তোমার। তোমার মেয়ে ভালোই থাকবে। রোজ দেখো—তোমায় দেখিয়ে নে যাবো,—তুমি শীগগির ভালো হয়ে ওঠো—"

"—নেহি—নেহি"—বলিতে বলিতে মেয়েটী অত্যন্ত অস্থিরভাবে একহাত আমার ক্রোড়স্থ শিশুর পানে বিস্তৃত করিয়া দিয়া অন্যহাতে মাটী ভর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ দুই তিন সেকেণ্ড পরে তাহার মাথাটা টুপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি কালীবাবু নীচু হইয়া রোগিণীর মাথা বামহস্তের উপর তুলিয়া ধরিলেন বটে, কিন্তু সে এই উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কালীবাবুর হাতের উপর তাহার মাথাটা গড়াইতে লাগিল,—সে বলিতেছিল "নেহি বাবুজী, মেরী লেড়কী, মেরী—মেরী দুলারী,—মেরী লেড়কী"—কালীবাবু তখন সন্তর্পণে রোগিণীকে বিছানায় তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন। আমি আর কোনো কথা না বলিয়া মেয়েটীকে বুকে লইয়া বাহির হইয়া গেলাম রেজিষ্ট্রী অফিসে,—রোগিণীর নাম ভর্ত্তি করিবার জন্য। রাস্তায় আশুবাবু, বিনয় ও রামকৃষ্ণমঠের সন্ন্যাসী স্বামী ভূমানন্দের সহিত দেখা হইল। তিন জনেই বলিলেন "বাঃ দিব্য—

ছেলেটাতো দেখছি,—কোথায় পেলে ?" আমি শুধু জবাবে "না মেয়ে"—বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেলাম।

শেষ রাতের দিকটায় আবার আমার ডিউটী ছিল। ডিসেণ্টী ওয়ার্ড এ ডিউটী করা এক ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রোগীদের বিছানা বদলাইতে হয়,—একটুও পা জিরাইবার জো নাই। একদফা সবগুলি বিছানা পরিষ্কৃত করিয়া একটা টুল টানিয়া একটু বসিয়াছি, চোখ দুইটা যেন আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিতেছিল ;—এমন সময় সেই অন্ধ রমণীর পাশের রোগীটা ডাকিয়া উঠিল 'বাবুজী—পানি"। আমি তড়বড় করিয়া বলিয়া উঠিলাম "লাতা হুঁ",—মনে হইতেছিল দুই তিন বার ডাকিয়া হয়তো বা রোগীটা সাড়া পায় নাই। মেজার গ্লাসে করিয়া তাহার মুখে একটু জল ঢালিয়া দিলাম ;—দিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় সেই অন্ধ মেয়েটী বলিল "বাবুসাব মেরী লড়কীকো কাহা ভেজা" ? আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম, সেই সকালবেলা গোটা দুই কথা মাত্র ইহার সঙ্গে কহিয়াছি, ইহার ভিতর সে আমার গলার আওয়াজ চিনিয়া ফেলিয়াছে।

গলার স্বর তাহার উদ্বেগ কম্পিত।

রোজ রোজ পোনের বিশটা করিয়া লোক মরিতে দেখিয়া উহাদের একটা আতঙ্ক হইয়া গিয়াছিল যে হাসপাতালে আসিলেই রোগী বুঝি আর বাচেনা। এই ভয়ে অনেকে রোগ গোপন করিয়া থাকিত। ব্যারাকের পরিদর্শক ডাক্তারকে কোন কথা বলিত না—ও ইহার ফলে প্রায়ই সকালবেলা ব্যারাক পরীক্ষা করিলে দুই তিনটা মৃতদেহ পাওয়া যাইত। মেয়েটীর হয়তো মনে হইতেছিল তাহাকে যখন হাসপাতালে আনা হইয়াছে,- তখন সে তো বাচিবেই না,—মরিবার আগে বুঝি সে তাহার নয়নমণি কন্যাটীকেও দেখিতে পায়না ! আমি কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সরিয়া আসিতেছিলাম,—পায়ের শব্দ অনুসরণ করিয়া সে এবার জোরে ডাকিল 'বাবুজী—"

এবার আর জবাব না দিয়া পারিলাম না, বলিলাম "কেও মাই, তুমারী ছোকরী তো আবহি নিন্দ মে হ্যায়। ফজির হোনে দেও তব উসীকে তুঝে দেখলাউঙ্গা"।

ব্যগ্রকণ্ঠে রমণী বলিল "ফজির তো হো গিয়া বাবুজী—"আমি একটু বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে কহিলাম "নেহি নেহি ফজির নেহি হুয়া নিন্দ যাও আভি"—স্বরে বিরক্তির রেশটা বোধ হয় সে ধরিতে পারিয়াছিল, গলা নামাইয়া ভীত ধীর

কণ্ঠে সে বিড় বিড় করিয়া বলিল "নিন্দ বাবুজী,—মেরী দুলারী—ইয়ে দো বরষ, মেরী দুলারী—কলিজা মেরী কলিজা"—লণ্ঠনের মিটমিটে আলো তাহার গালের একপাশে পড়িয়াছিল, দেখিলাম সূক্ষ্ম একটী অশ্রুরেখা তাহার উপর চিক্ চিক্ করিতেছে। একটু কষ্ট হইল। একবার ভাবিলাম দুইটা মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দি। কিন্তু এত রাত্রে কিছু বলিলাম না। দুঃসহ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও সমস্ত ব্যথা ছাপাইয়া কোন্ শক্তির বলে যে তাহার মেয়ের ভাবনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা রাত্রি জাগরণে শ্রান্ত আমার ভাবিবার অবসর ছিল না। তাহার পরে একদিন সে আমাকে বলিয়াছিল, যে দুলারী তাহার কী,—সে যে তাহার কলিজার কলিজা। বর্ষ দুইটী বক্ষোনীড়ে জড়াইয়া ধরিয়া সে তাহার দুলারীর মাথাটী বুকের মাঝে খুঁসিয়া রাখিয়াছে,—রো-জ রাতে। একান্ত নির্ভরতায় লতাইয়া পড়া দেহখানি,—সে ঘুমের ভাঙ্গনের মধ্যে মধ্যে কতবার চুম্বনে ভরিয়া দিয়াছে। চুম্বনের দৌরাত্ম্যে আধঘুমভাঙ্গা শিশু কী রকম ছোট্ট ছোট্ট আঙ্গুলগুলি দিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া ওষ্ঠাধর বিচ্যুত মাতৃস্তন্যটীকে মুখে পুরিয়া আবার চুক্‌চুক্ সুরু করিয়া দিত! তার এক সাজি কুন্দফুলের মতো দেহখানি নড়িয়া চড়িয়া উঠিলে কি তাহার কোমলস্পর্শ,—অন্যে তাহা কি বুঝিবে? তাহার মাথার ঘ্রাণ মায়ের মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়া কি রকম জানি মোহতন্দ্রার সৃষ্টি করিত,—মা আবার ঘুমাইয়া পড়িত। আজ চব্বিশ মাস এমনি গিয়াছে। সে বুক তাহার খালি! তার ছোঁয়ার অনুভূতিটুকু নাই, মৃদু নিশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায় না, মাথার ঘুম-পাড়ানি ঘ্রাণটুকু হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে না, তাহার ক্ষুধিত বাহুর আলিঙ্গনে কুন্দকুসুমের ডালি তুক্ তুকে নরম দেহখানি সে আজ হাতড়াইয়া মরিতেছে, সে ঘুমায় কি করিয়া,—আর বাবুজী তাহাকে বলিয়াছেন নিন্দ্ যাইতে!

ঘণ্টা খানেক পরে মেয়েটী ভীত কুণ্ঠিত স্বরে আবার প্রশ্ন করিল "বাবুজী—ফজির—" কি করুণ তাহার স্বর! বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, রাতের আঁধার আর প্রভাতের আলোতে স্বাগত সম্ভাষণের কোলাকুলি সুরু হইয়াছে। আকাশে দু' একটা তারা তখনও উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। আমি এবার একটু কোমল কণ্ঠেই বলিলাম "হাঁ মাই আব্ হি উসীকো লাউঙ্গা,—এক ঘণ্টা ঔর সবুর করনা।"

"ঔ—র এক ঘণ্টা" টানিয়া টানিয়া এইটুকু বলিয়া সে তখনকার মত চুপ করিল।

(২)

সে দিন মিসেস্ স্মিথ্ রোগিদের দেখিতে একবার আসিয়াছিলেন। মিসেস্ স্মিথ্ ওখানকার পাদ্রী-সাহেবের পত্নী। তাঁহার কাছে কয়েকটী পিতৃমাতৃহীন কুলী বালকবালিকা রাখা হইয়াছিল। আমরা ঠিক করিলাম এই অন্ধরমণীর বালিকাকেও তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিব। তিনি সানন্দে রাজী হইলেন। পাদ্রীসাহেবের মতলব ছিল উহাদিগকে সব খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। কিন্তু তাহা আমরা দেই নাই। পাদ্রীসাহেব উহাদের অবশেষে ছাড়িয়া দিতে একটু গররাজী ভাব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ডাক্তার বাবু ভারী স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তিনি পাদ্রী সাহেবকে বলিয়াছিলেন "যদি তোমরা এদের একটাকেও খৃষ্টান কর, we shall make christianity inpossible in India" ক্ষুণ্ণ হইয়া ইহার উত্তরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কেন ডাক্তার বাবু খৃষ্ট ধর্ম্মটা কি খারাপ মনে করেন আপনি" ডাক্তার বাবু জবাব দিয়াছিলেন "ধর্ম্ম কোনোটাই খারাপ নয়। কিন্তু খৃষ্টান করে তোমরা মানুষ তৈরী কর না কতগুলি দাস তৈরী কর। যে ধর্ম্মে জাতীয়তা বোধ ভুলিয়ে দেয় তা' অবার ধর্ম্ম? খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে তোমরা প্রভু যিশুখৃষ্টের সেবক তৈরী কর না ইংরেজ বানিয়ে তোলো। তারা কেন যেন আর ভারতবাসী থাকে না,—হাজারে হাজারে এ প্রমাণ তোমায় আমি দিতে পারি।"

এ অপ্রিয় সত্যের জবাব কিছু ছিল না কাজেই পাদ্রী সাহেবও দেন নাই, শুধু "হ্যাঁ হ্যাঁ তা কি—সেটা কি—" ইত্যাদি বলিয়াই ক্ষান্ত পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইংরেজ মিশনারীরা রাজনৈতিক কার্য্যের পরোক্ষভাবে যে কত সাহায্য করিতেছে বলা যায় না।

বেলা প্রায় আটটা বাজে। মেয়েটীকে কোলে করিয়া আমি গিয়া রোগিণীর শয্যার পাশে দাঁড়াইলাম; ইচ্ছা ছিল মাকে একবার বলিয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিব। ডাকিলাম "ধনরাজিয়া—"

অন্ধ রমণীর নাম ধনরাজিয়া।

"—বাবুজী"

"তোমার লড়কীকে তো মেম সাহেব নিয়ে যাচ্ছে, তুমি ভালো হলে আবার নিয়ে আসবেন।"

"মেম সাব,—নেহি বাবু মেরী লড়কীকো মেরী পাস্ রহনে দিজিয়ে।"

"তোমার অসুখ যে,—ব্যামোর কাছে থাকলে এরও ব্যামো হবে যে।"

সে দিনই সকালে তার কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।

আতঙ্কের স্বরে ধনরাজিয়া কহিল" উসী কো ভি বুখার হোগা—উসী কো—"

"হাঁ মাই উসীকো ভি বুখার হোগা," তার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

আশু দাদা মিষ্টি সুরে কহিলেন, "রোতী হো কেঁও মাই ?—লড়কীকা ভালা করনেকে লিয়ে তো এইসা কাম করতে হেঁ,"—আশু দাদা সাধু পুরুষ। এমন অদ্ভুত লোক আর দেখি নাই। মলমূত্র তিনি চন্দন জ্ঞানে দুইহাতে ঠেলিতেন। তাঁহাকে কুলীরা সবাই 'বাবা' বলিয়া ডাকিত।

অন্ধ রমনী আশু দাদার পানে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে কম্পিত কণ্ঠে কহিল "তুম্ ভি কহতে হো বাবা—আচ্ছা তব যানে দেও—লেকিন মেরী পাস্ এক দফে উসীকো লাও বাবুজী।" ডাক্তার বাবু চোখ ঠারিয়া ঈষারায় রোগীর কাছে শিশুকে লইতে: মানা করিলেন। পরে কহিলেন "মাই বুখার ওয়ালী জনানা কা পাস্ লড়কীকো নেই লেনা চাহিয়ে।"

আমি রোগিণীর বিছানার পাশ কাটাইয়া মেম সাহেবের কোলে শিশুকে দিতে অগ্রসর হইতেছিলাম, হঠাৎ ধনরাজিয়া কাৎ হইয়া খপ করিয়া আমার পাঞ্জাবীর নীচের পকেটটা ধরিয়া ফেলিল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া ঠিক মত বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। আর্ত্তকণ্ঠে রমণী একবার চেঁচাইয়া উঠিল "দুলারী ও—বা—বু—জী—" তারপর আপাদ মস্তক কম্বলটা টানিয়া দিল। মেমসাহেবের কোলে যাইতেই শিশু হাত পা ছুড়িয়া বিষম কান্না জুড়িয়া দিল। মেমসাহেব রোরুদ্যমান শিশুকে সাম্‌লাইতে সামলাইতে প্রস্থান করিলেন। কাপড় ঢাকা মেয়েটীর পানে চাহিয়া দেখিলাম। ফুলিয়া ফুলিয়া তাহার সে কি কান্না!

* * * * * *

পরে একদিন কন্‌ভেন্ট-এ গিয়াছিলাম। শুনিলাম দিন পোনেরো ষোলো দুলারী নাকি মার জন্য অনেক কান্নাকাটি করিয়া ছিল। তারপর সেখানকার লোকদের, বিশেষতঃ মিসেস্ স্মিথ্‌ এর চেষ্টায় বনের পাখী বেশ পোষ মানিয়াছে, দিব্য এখন সে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া বেড়ায়। এখন কান্নাকাটি গিয়াছে। সে হাসেও খেলেও,—তার দুষ্টমীতে সবাই অস্থির। তার নতুন নাম হইয়াছে 'লিলি'।

* * * *

পাঁচ সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। রমণী প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপরে রোগ জনিত পাণ্ডুর আভা এখনও মিলায় নাই। তথাপি দ্বাবিংশ বৎসরের পরিপুষ্ট যৌবনশ্রী তাহার দেহখানির উপরে যে সহজ লাবণ্যের ছোপটুকু ধরাইয়া দিয়াছে তাহা এত অত্যাচারেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই।

আজ খুকীকে লইয়া আসিবার দিন। আমি দাওয়ার টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া রোগীদের জন্য মণ্টেড মিক্স তৈরী করিতেছিলাম। এই মাত্র সে আমার কাছে বসিয়া তাহার প্রিয়তমা লড়্কীর ইতিহাস শেষ করিয়াছিল। বাগানের মেয়েদের মধ্যে সেই নাকি খুবসুরৎ ছিল,—তাইতে সে ছোট সাহেবের নেকনজরে পড়ে। সাহেব তাহার চোখদুটীর নাকি খুব তারিফ করিতেন। সেই চোখ দুটীই যখন তাহার টাইফয়েড জ্বরে সে জন্মের মত হারাইল, তখন সাহেব ছিন্ন মালার মতো তাহাকে পথের পার্শ্বে ছুড়িয়া ফেলেন। তখন দুলারী পেটে। ফের সে চায়ের পাতা তুলিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু তাহার বরাদ্দ হইল দৈনিক তিন আনার জায়গায় ছয় আনা। কিন্তু সেটা ছোট সাহেবের অন্ধ রমণীর প্রতি করুণার পরিচয় কিম্বা প্রণয়ের প্রতিদান তাহা ঠিক বলা যায় না। তারপর দুলারী হইল। সেই একমাত্র তাহার খালি বুকটাকে ভরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার নাম সে সাধ করিয়া রাখিয়াছিল দুলারী। কি করিয়া সে যে তাহাকে মানুষ করিয়াছে! রোজ ছ' আনা সংগ্রহের মধ্যে দুলারীকে খাওয়াইয়াছে তিন আনা, তার বিবাহের জন্য জমা করিয়াছে দুই আনা, আর তাহার নিজের জন্য ব্যয় হইয়াছে চার পয়সা। এই গেল তাহার দুই বৎসরের ইতিহাস। এই নির্লজ্জ নির্মমতার কাহিনী সে বেশ নিঃসংকোচে বলিয়া গেল। বোধ হইল—যেন এ অতি সাধারণ কথা, নিত্যকার ব্যাপার। আমি ভাবিতেছিলাম,—কিন্তু সন্তানের জন্য এই যে অগাধ স্নেহ—ইহা এই বন্য অসভ্য স্ত্রীলোকটা কোথায় পাইল?

তখন সূর্য্য ডোবে ডোবে। কাহিনী শেষ করিয়া মিনিট দুই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই তাহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। অষুধপত্র রাখিবার টেবিলটার হাত চারেক দূরে একটা মাদুরের উপর সে বসিয়াছিল আর গায়ের কম্বল খানার প্রান্তভাগটা মাঝে মাঝে অকারণ নির্দ্দয় ভাবে মোচড়াইতেছিল। মাঝে মাঝে মাদুরটাকে দুইহাতে ঝাড়িতেছিল,—কখন শুইতেছিল আবার একটু পরেই উঠিয়া বসিতেছিল। তাহার কাহিনী শেষ হইবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে

সে আমাকে অন্তত সাত আটবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে মেম সাহেব আসিবে কি না,—কখন আর আসিবে সন্ধ্যা যে হইতে চলিল, তাঁহার অসুখ হইয়াছে নাকি,—ছুলারী ভালো আছে তো,—মেম সাহেবের কুঠি খুব দূরে নাকি—আরো সব কত কি! আমি রোগীদের ফরমায়েস যোগাইতে যোগাইতে দুই একটা হাঁ না বলিয়া তাহার জবাব সারিতেছিলাম। ক্রমে সে বড়ই উতলা হইয়া পড়িল। মাঝে মাঝে তাহার চোখের কোনে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিতেছিল—এবং ক্ষণে ক্ষণে আমার আশ্বাস পাইয়া নিজের অহেতুকী আশঙ্কাতেই একটু একটু হাসিতেছিল বোধ হয়। আশুদাদা ইতোমধ্যে একবার উহাকে বলিয়া গেলেন ঘরে যাইতে, যে সন্ধ্যা হইয়াছে হিম লাগিবে। নরেনও বার দুই বলিল, কিন্তু কোনো কথাই তাহার কাণে যাইতে ছিল না।

গোটা সাতেকের সময় ছুলারী ওরফে লিলিকে কোলে করিয়া মিসেস স্মিথ্ দেখা দিলেন। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম ধনরাজিয়া তুহারী লেড়কী আগয়ীরে আমারও ভারী আনন্দ হইতেছিল। আমারি হাতের রোগী এতদিনে সারিয়া উঠিয়া মা মেয়ে আবার দেশে যাইবার স্বপ্ন দেখিতে থাকিবে! চাহিয়া দেখিলাম,—আমার কথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে তাহার বুক দ্রুত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, যেন তাহার শ্বাসরোধ হইতে চলিয়াছে। আজ ছত্রিশ দিন সে তাহার খুকীকে বুকে করে নাই; এতকাল পর মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া সে কি তাহাকে সত্যই পাইবে?

রুদ্ধকণ্ঠে সে চেঁচাইয়া উঠিল "ছুলারী"—কী সে ডাক, যেন মমতার উৎস ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

ছুলারী তখনও মেমসাহেবের কোলে। পরণে তার ধবধবে সাদা একটা ফ্রক, পায়ে কাটার বোনা উলের মোজার উপরে বোতাম লাগানো ভেলভেটের জুতা, মাথায় লালরংএর একটা টুপী। মেম সাহেব তাহাকে কোল হইতে নামাইতে নামাইতে কহিলেন "যাও লিলি, তুম্‌হার মাইকা পাশ যাও"। লিলি তখন মিসেস্ স্মিথ এর বুকে সরু চেইনে ঝুলান সোনার ক্রুশটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

ব্যাগ্র বাহু মেলিয়া ধনরাজিয়া ডাকিল "মেরী মাই,—মেরী ছুলারী—"

কিন্তু খুকী তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া মেমসাহেবকে দুই হাতে জড়াইয়া পরণের মধ্যে মুখ লুকাইল। মুহূর্ত্তেক পরে একবার আড়চোখে মলিনবসনা রমণীর পানে চাহিয়া শিশু নিজের মাকে বলিল "তুম দাই বহ মেরী মাই নেহি।"

———

উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত

[শ্রীউর্ম্মিলা দেবী]

ভারতের নারীশক্তি একবার ওঠ! জাগ! তোমার আপন আসন একবার গ্রহণ কর! তোমার সহধর্ম্মিনী নাম সার্থক কর। যার আশীর্ব্বাদে জীবন সার্থক করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়। দেশ মাতৃকার আহ্বানে সমস্ত দেশবাসী সাড়া দিয়াছেন, তোমরা কি সাড়া দিবে না? তবে কি করিয়া এই মহাযজ্ঞ সাধিত হইবে? "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" এই জননীর কি তুমিও সন্তান নও? পুত্রই কি মাতার সন্তান, কন্যা কি সন্তান নয়! একবার ভাবিয়া দেখ এই মা তোমার কত স্নেহশীলা! গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষাও কত ধৈর্য্যশালিনী! এত অত্যাচার মার উপর করি,—গর্ভধারিণী জননীও এত সহ্য করিতে পারেন না। তিনিও সময় বিশেষে ধৈর্য্যহারা হইয়া সন্তানকে তিরস্কার করেন, প্রহার করেন। কিন্তু দেশমা আমার চির স্নেহশীলা, চির ধৈর্য্য-শীলা! সন্তানের সুখের জন্য যে বুক পাতিয়াই দিয়া আছেন!! কত অত্যাচারই না আমরা তাঁর প্রতি করি! তাঁর বক্ষে নিয়ত পদাঘাত করি, তাঁর দেহে আঘাত করিয়া শস্যের সংস্থান করি, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তৃষ্ণার বারি সংগ্রহ করি, তাঁর রক্তে পুষ্ট বৃক্ষ লতাদি হইতে ফল মূল আহরণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করি! কিন্তু কৈ! এত অত্যাচারে তো মা আমার অধীর হন না! একবারও তো বলেন না, "ওরে! আর তো পারি না!" এমন মা কি আর হয়! কিন্তু আমরা কি করিয়াছি? এমন মাকে আমরা পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। আমাদের অপরাধে আজ তিনি পরহস্তে বন্দিনী! দীনা, হীনা, উপবাস খিন্না শৃঙ্খলিতা মা আজ করজোড়ে সন্তানের নিকট মুক্তি চাহিতেছেন, এসময়ে মায়ের অর্দ্ধেক সন্তান যদি নীরব নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘরে বসিয়া থাকেন তবে কিসের তাঁরা সন্তান, আর কিসের তাদের মাতৃগৌরব! একবার ভাবিয়া দেখ কোন দেশের নারী তোমরা! যে দেশে সীতা সাবিত্রীর মত নারী সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশে গান্ধারীর মত জননী ধর্ম্মের মহত্ব প্রচার করিয়াছেন, যে দেশে দ্রৌপদীর মত নারী সেবার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে দেশে সুমিত্রা উর্ম্মিলার মত নারী ত্যাগের

মহিমা প্রচার করিয়াছেন সেই দেশের নারী তোমরা! যে দেশে রাজপুত রমণীগণ স্বামী পুত্রকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করিয়া সমরে পাঠাইতেন, আপন কেশ কর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিয়া দিতেন, স্বামী পুত্রের পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিলে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিতেন, আবার হাসিতে হাসিতে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হইতেন! সেই দেশেরই নারী তোমরা! যে দেশের নারীজাতি ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেন, ধর্ম্মের নিকট স্বামী পুত্র পিতা ভ্রাতাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। দুর্য্যোধন গর্ভের সন্তান হইলেও যেদেশে জননীর মুখ দিয়া আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়' বাক্য বাহির হইয়াছিল, সেই দেশেরই মেয়ে তোমরা! পূর্ব্ব গৌরব কি বিস্মৃত হইয়াছ! মনে কি পড়ে না সে সব কীর্ত্তি কাহিনী—গৌরবে কি বুক ভরিয়া উঠে না! ধমনীতে ধমনীতে কি শক্তির সঞ্চার হয় না! কত শক্তি যে তোমাদের অন্তরে নিহিত আছে তার সংবাদ তো তোমরা জাননা! তোমাদের দেশ তো ভোগ বিলাসের দেশ নহে, তোমাদের দেশ যে ভক্তি প্রেম ও পুণ্যের দেশ! শিশুকাল হইতে ব্রত নিয়মাদির সংযম ও ত্যাগের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়া যে শক্তির সঞ্চয় হইয়াছে তাহার বিকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই দেশের প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত, প্রত্যেক কর্ম্মে নারী শক্তির প্রয়োজন। এদেশে কোন ধর্ম্ম কার্য্যই নারী শক্তির সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। মাতার আশীর্ব্বাদ, পত্নীর সাহচর্য্য, ভগিনীর সহায়তা ব্যতীত পুরুষের শক্তি সম্পূর্ণ হয় না। এই জাতীয় যজ্ঞই বা কিরূপে তোমাদের সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে?

আজ দেশে যে তরঙ্গ দুকুল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে, সে স্রোতে জাতির জীবনতরী বাহিতে ভারত নারীর সমগ্র শক্তির সহায়তার প্রয়োজন। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া বিপদ বাধা অগ্রাহ্য করিয়া, নিন্দা অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া আজ ভারত নারীকে অগ্রসর হইতে হইবে।

তবে এস ভারতের মাতৃজাতি! ফলাফল শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে এস! তোমার আর ভয় কি? পতি পুত্র যে পথে গিয়াছেন, সে পথ তো তোমার চিরপরিচিত পথ, তোমার ঈপ্সিত পথ! এস শক্তিরূপিনীগণ! পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে এস, শব সাধনার শক্তি সঞ্চার করিবে এস! যাহারা এখনও

নিদ্রিত তাহাদের জাগরিত করিয়া, কর্ণে সাধনার মন্ত্র দান করিবে এস! ঘরে ঘরে চরকা কাটিয়া দেশের বস্ত্র সমস্যা মিটাইবে এস! জাতীয় আদর্শের পুনরুদ্ধার করিবে এস! ঘরে ঘরে ত্যাগ ও সংযম ও পবিত্রতার শিক্ষা দিবে এস! বিদেশী শিক্ষার মোহ আবরণ দূর করিয়া ভারতবর্ষের সুপ্ত শক্তি জাগরিত করিবে এস! ভারতবর্ষের ভবিষ্যদ্‌বংশকে ধীর স্থির, অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ধীর করিয়া গড়িয়া তুলিবে এস!

তাই ডাকিতেছি, এসো মা! এস পত্নী! এস কন্যা! এস ভগিনি! যে মহান কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে উপস্থিত তাহা মাথায় তুলিয়া লও। জীবন সার্থক করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। নিজের বিবেকের প্রতি, নিজের স্বামী পুত্রের প্রতি, নিজের জননী জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধন্য হও—ধন্য কর!

বাংলা ভাষার ইতিহাস

ভূমিকা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

বাংলাভাষার ইতহাস আজও লেখা হয় নাই। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাংলাভাষার প্রকৃত ইতিহাস কিছু আছে কি না—সে বিষয়ে আমার মত স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরও ঘোরতর সন্দেহ আছে। অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলাভাষার ছোট্ট একটু "কুলজী" লিখিয়াছেন, কিন্তু বাংলাভাষার "কোষ্ঠী" লেখা এখনও পর্য্যন্ত বাকী আছে। কোন্ আচার্য্য সে কর্ত্তব্য সমাপন করিবেন, আজও তার ঠিকানা পাই না। কেবল মাত্র পণ্ডিতপ্রবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের History of the Bengali Language—"বাংলাভাষার ইতিহাস"—এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে কতকটা অর্থের সন্ধান দেয় মাত্র।

বাংলা ভাষার ইতিহাস জিনিসটা বুঝিতে গেলে—"বাংলা" জিনিসটা কি, "ভাষা" জিনিসটা কি, এবং "ইতিহাস" জিনিসটাই বা কি—তাহা বোধ হয়

আগেই বোঝা দরকার। "বাংলা" এবং "ভাষা"র কথা পরে। "ইতিহাস" কথাটির বেশ একটু মজার ইতিহাস আছে। সংস্কৃত—"ইতি হ আস"—"এই-ই-ছিল"—"ইহাই ছিল"—এই তিন শব্দ লইয়া "ইতিহাস" কথাটি রচিত। সুতরাং ইতিহাস লিখিতে গেলে, যেটুকু ছিল কেবল তাহাই যথাযথ বলিতে হইবে—অজ্ঞতা প্রযুক্ত কল্পনার রঙে রঙিয়ে ছবিখানি আঁকিলে চলিবে না।

বাংলাভাষার বর্ত্তমান পরিণতির ইতিহাস বুঝিতে গেলে গোড়া হইতে সব কথা আলোচনা করিতে হইবে। বাংলার সহিত ভারতীয় অন্যান্য ভাষার কি সম্বন্ধ তাহাও বুঝিতে হইবে। আবার ভারতীয় ভাষাগুলি জগতের ভাষা সমূহের সঙ্গে কি ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে আসিয়া পড়িবে। তারপর আসলে "ভাষা" জিনিসটাই বা কি—তাহার স্বরূপ, পরিণতি ইত্যাদি কথা না জানিলে, বাংলার ভাষার ইতিহাস বুঝার সুবিধা হইবে না। তাই আমার আলোচ্য বিষয়কে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করিয়া লইব।

(১) অবতরণিকা—"ভাষা" ও "ভাষাবিজ্ঞান" সম্বন্ধীয় কথা

(২) জগতের ভাষা সমূহ—

(৩) ভারতীয় ভাষা সমূহ—

(৪) বাংলা ভাষা—

আবার বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার জন্য এই চারিটি বিভাগকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করিয়া লইব :—

১। অবতরণিকা

১—নাম—ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান

২—ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস

৩—ভাষার স্বরূপ

২। জগতের ভাষা সমূহ

৪—জগতের ভাষা সমূহের শ্রেণী বিভাগ

৫—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহ

৬—ইন্দো-ইরাণীয় ভাষা সমূহ—আর্য্য ভাষা

৩। ভারতীয় ভাষা সমূহ

৭—আর্য্য ও অনার্য্য ভাষা

৮—দ্রাবিড়ী ভাষা সমূহ

৯—ইন্দো-আর্য্য ভাষা সমূহ

১০—বৈদিক, পালি, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষা

১১—"বাইরী" ভাষা সমূহ ও "ভিতরী" ভাষা সমূহ

(Outer group and Inner group of indo Aryan Vernaculars)

১২—আসামী, বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলি, হিন্দী (উর্দ্দু)

৪। বাংলা ভাষা

১৩—বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি

১৪—বাংলা ভাষা

১৫—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা

১৬—বাংলার অপভাষা ('ভাষা'—dialects)

১৭—বাংলাভাষায় বিদেশী উপাদান

১৮—বাংলা বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি (syntax)

১৯—বাংলা বিভক্তি প্রত্যয়াদির ইতিহাস (morphology)

২০—বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (phonetics)

২১—বাংলা অক্ষরের ইতিহাস (Palaeography)

২২—বাংলা উচ্চারণ এবং ছন্দ (Accent and metre)

২৩—বাংলা শব্দার্থ তত্ত্ব (semantics)

উল্লিখিত ভাবে এক সঙ্গে সুবিধামত এক বা ততোধিক বিষয় লইয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। উপাদান সংগৃহীত আছে—কেবল গুছাইয়া লিখিতে হইবে। আশা করি সমস্তগুলি প্রকাশিত হইলে বাংলা ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের অনেক সুবিধা হইবে এবং আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ও অবসরযুক্ত কেহ এ বিষয়ের আলোচনার ভার গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার একটি প্রধান অভাব মোচন করিবেন।

বঁধু-বিরহে।

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল]

ওগো মোর দুখের নাহিক ওর !
মরমে পশিয়া সিঁদ-কাটি দিয়া চিত্ত হরিল চোর।
বিম্বাধরের বিভ্রম ভাবি অন্তরে বাড়ে তৃষা,
স্মরি বেণু-তান বিগলিল প্রাণ, হয়ষে না পাই দিশা।
নিমেষে যখন ছুটে সে স্বপন নয়নে উথলে লোর,
দুখের দহনে দহি নিশিদিন জানি না কি হবে মোর !

* *

এ মম মানসে চপলার মত চমকি পলাও আকুলি প্রাণ,
কত দিনে তব মধু-মূরতিতে দিবে দিবা নিশি দরশ দান ?
কত দিনে আর আঁখি রসায়ণ
বিনোদ কিশোর ওরূপ মোহন
লুব্ধ মুগ্ধ এ দুটি লোচন
অধীর পিয়াসে নিমেষে নিমেষে চকোরের মত করিবে পান ?

* *

ওহে নাথ তাপহারি !
অতি অসহন অতি অকহন
জলন্ত তব বিরহ-দহন
পশিয়া ধসিয়া নিখিল মরম চেতনা না নিতে কাড়ি
চন্দ্র-বদন-বিতানে তোমার
কর আবরিত চিত্ত আমার
সন্তাপ-হরা স্মিত-সুধা-ধারা পরতে পরতে ঢারি।

* *

ঘিরিছে আমারে একিরে বিকার !
গভীর তিমির ইন্দ্রিয়-দ্বার
করিছে বুঝিবা বন্ধ !

এ কি নিদারুণ দশা অভিনব
চিত্তে আমার আনে অভিভব,
নয়ন হ'ল কি অন্ধ ?
না হ'তে বধির শ্রবণ-বিবর
নাচুক্ তোমার মুরলীর স্বর
তুলিয়া মধুর ছন্দ ;
না নিভিতে মোর নয়নের আলো
লীলাময় ! তব লাবণ্য ঢালো
উত্তোলি মুখ-চন্দ্র !
কলঙ্ক তব ঘোষিবে ভুবন
ঘটে যদি নাথ ! দাসীর মরণ
না হেরি নয়নানন্দ !

* *

তবে কি বন্ধু আসিল ?
করুণা সিন্ধু টলিল ?
মনে কে তুলিল লহরী ?
বনে কি বাজিল বাঁশরী ?
মুরলীর রসে রসিয়া
মণি-মঞ্জীর রণিয়া
তালে তালে তুলি অগ্র চরণ
নয়নের ক্ষুধা করিতে হরণ
সমুখে কি সখা ! দাঁড়ালে ?
জনমের জ্বালা জুড়ালে !
জীবনে সুখের বাকি কি ?
বঁধু হে, খুলিব আঁখি কি ?

*

একি ! কোথা তুমি লুকালে !
কূলে আনি তরী ডুবালে ?

* *

হে মোর দেবতা! হে মোর দয়িত! ত্রিভুবনে এক বন্ধু হে!
হে রস-আধার! তৃষিত জনার করুণার সুধা-সিন্ধু হে!
হে নাথ রমণ! নয়ন-রঞ্জন! হে মোর চপল রসিক হে!
কত দিনে আর হ'বে গো আমার লোচনের পথে পথিক হে!

* *

দস্যুর মত বিরহ তাহার
দেহের সকল শকতি আমার
নিয়েছে কাড়ি,
ধরণী-শয়ন ছাড়িয়া চরণ
তুলিতে নারি!
দৈবে যদি বা এমন সময়
ভাগ্যের ধন আসে রসময়
সমুখে মোর,
বুঝিবা তাহারে না পারিবে আর
বাঁধিতে বক্ষে বিবশ আমার
বাহুর ডোর!
বঁধুয়ার মম তরুণ তরল
দেখিতে দিবে না বদন-কমল
নয়ন-লোর!

* *

বুঝি এ জীবনে এ পোড়া নয়নে ঘটিল না দরশন!
পরজনমের কঠোর সাধনে
পাব কি দেখিতে কমল-বদনে
ভরি মোর দুনয়ন!
মুখ-পঙ্কজ কি বা সুন্দর
অরুণ অরুণ ওষ্ঠ অধর
হাসিটি লাগিয়া তায়,
সে অধর সুধা বহে বেণু-গান
শ্রবণে গগন ভুবন পরাণ
হরষে গলিয়া যায়!

আধ-বিকশিত বিলোল লোচন
বিভ্রমভরে ভুলায় ভুবন
পরাণ বিকাতে চায়!
এমন মাধুরী যুগে যুগে ঘুরি কভু কি দেখিব হায়?
লীলায় চপল রসেতে শীতল কমললোচন কি বা!
নীল তারা তায়, প্রান্তে লুটায় উষার অরুণ বিভা।
ঘুরায়ে ঘুরায়ে সে ছুটি নয়ন
করুণ কিশোর হেরিবে বদন—
উদিবে কবে সে দিবা?
বকুল চাঁচর চিকুর মাথে
বাঁকা শিখি পাখা চূড়াটি তাতে,
চপল চপল লোচন কি বা
বিম্ব জিনিয়া অধর-বিভা
মৃদুল মৃদুল তরল হাস
বঁধুর মধুর বেশ বিলাস
মন্দার সম মথিয়া মন
ধৈরজ- ধন করে হরণ!
হা হা বঁধু! মধু-মাধুরী তোর
ঢুঁড়িছে পাগল নয়ন মোর!

* *

সে যে রে চতুর চোর!
নীরদ-কান্তি, মরাল-গমন,
খঞ্জন-মীন-হারণ-লোচন
চন্দ্র বদন-মাধুরী মোহন
হরিল বঁধুয়া মোর!
মধুর মধুর তাহার বদন—
মাধুরীতে যবে মগন নয়ন
সেই অবসরে চুরি করি মন
লুকাল কিশোর রাজ;

কত দূরে আর করিবে গমন ?
দয়িতার আঁখি করিতে স্মরণ
অলস চরণ জড়ের মতন
দাঁড়াবে কানন মাঝ !
যদি দূরে যায়, ময়ুর-মুকুটে
পড়িবে সে ধরা নয়নের পুটে,
কেমনে গোপন রবে,
আঁধিয়ার বনে অঙ্গ কিরণে
বঁধুরে চিনিব সবে !

সুখের ঘরগড়া

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

মাণিক বাহিরে আসিয়া বরাবর জীবন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। জীবন তখন ইশেন হালদারের সঙ্গে কি কথায় ব্যাপৃত ছিল। মাণিক গিয়া সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত জীবনের কাছে জানাইল। জীবন বেশ একটু মুরুব্বীয়ানা ধরণে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিতে যাইবে এমন সময় তর্ক সিদ্ধান্ত বাড়িতে আসিয়া হাজির। মাণিককে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে মাণিক ও বাড়ী পুজা সেরে এলে ?

মা। আজ্ঞে না ! গিয়ে দেখি আপনার ভাগ্নে কাজ সেরেছেন—

ত। কেন ? তুমি যাওনি ?

মা। আজ্ঞে যেতে দু চার মিনিট দেরী হয়েছিল বৈতো নয় ; তবে কিনা আমাদের মত পুরুতের কাজে কি ওঁদের মন উঠ্‌বে—' আপনাদের মত পণ্ডিত পুরুৎ যদি ওরা পায় তা হলে আর— ।"

তর্ক সিদ্ধান্ত মাণিকের এই অপ্রত্যাশিত বাকপটুতায় অবাক হইলেন। মাণিক তর্কসিদ্ধান্তের ছেলের বয়সী। তাহারি টোলে সে কয়েক দিন মুগ্ধবোধ মুখস্থ ও স্মৃতির বুকনি সংগ্রহ করিয়াছিল ; কিন্তু সরস্বতীর অকৃপা বশতঃ

ব্যাকরণ বাগ মানিল না, এবং স্মৃতি বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়িল, কাজেই এ বালাই ছাড়িয়া দিয়া সে খুড়ার কাছে নিত্য পূজাপদ্ধতির কয়েকটা কাজ চালান মন্ত্র তন্ত্র শিখিয়া নিয়া কৌলিক পৌরহিত্যের পেশা ধরিল; বাকী সময়টা ঘুনী ও জাল বোনা শিখিয়া মৎস্য বধ কার্য্যে ব্যয় করিত। মাণিকরাম তর্কসিদ্ধান্তকে যেমন সবাই ভয় ভক্তি করিত, তার অধিক ভয় করিত, ভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। কারণ ছাত্রাবস্থায় সে সিদ্ধান্ত হাতে প্রাণান্ত ভৎ'সনা লাভ করিত। এই মাণিকরামের মুখে ঈদৃশ বিদ্রূপ রসাত্মক বাক্য শুনিয়া সিদ্ধান্ত মহাশয় সত্যই স্তম্ভিত হইলেন।

তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না কোন খেলোয়াড়ের যাদু মন্ত্রে হেলে শাপ ফনা তুলিতেছে। এক অসহায়া বিধবাকে তাঁহার দেবী দুর্লভ গুণের জন্যই যে কুচক্রী পাঁচ জনের হাতে অকারণে এমন বিপন্ন হইতে হইতেছে ইহা ভাবিয়া তাঁহার ব্রহ্মণ্য রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঘৃণায় তাঁহার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইল। তার পর একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন "ভেলারে মাণিকরাম, কে বলে মাণিক কথা কইতে জানে না।" তারপর তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। তিনজনেই কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ষোড়শ অধ্যায়—

ভোলানাথ গত দিন অপরাহ্নে একটা ভাসা ভাসা রকমের গুজব শুনিয়াছিল যে চৌধুরী মহাশয় নাকি ব্রাহ্মণদের ডাকিয়া বলিয়াছেন যে ভোলানাথের মেয়ের ভাতে সকলেরই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিৎ। তাহার একটু আশ্বাস হইয়াছিল, কেননা সে কোন এক সময়ে লুকাইয়া গিয়া জমিদার রতনরায়ের শরনাপন্ন হইয়া তোষামোদ ও অনুনয় বিনয় করিয়া ধরিয়াছিল এ সংকটে তাহাকে বিপন্না না করা হয়। রতনরায় স্তবে তুষ্ট হইয়া ভোলাকে অভয় বর দেন। ফলে চৌধুরীও তস্য মণিবের গোপন পরামর্শে স্থির হইয়াছিল যেভোলানাথ রূপ নিরীহ মেষ অবধ্য, রায়সিংহের ক্রোধ যোগ্যই নহে। যত দোষ ওই কুটিল-মতি দুর্ব্বাসারূপী তর্কসিদ্ধান্তের। উহাকে যেন তেন প্রকারেণ জব্দ করিতেই হইবে। আর ভোলানাথের ভ্রাতৃদ্বয়ের অহিন্দু আচরণের জন্য তাহাকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তার যথাযোগ্য মর্য্যাদার মূল্য স্বরূপ অগ্রিম ধরিয়া দিতে হইবে। তবে তর্কসিদ্ধান্তের সম্বন্ধে এই যে মৎলব তাহার সফলতা সাধনে ভোলাকে সাহায্য করিতে হইবে এই সর্ত্ত—ভোলানাথকে উপস্থিত সংকট

হইতে উদ্ধার করা যাইবে, এ কথা তাহাকে বঝান হইল। ভোলানাথ স্বভাবে কাপুরুষ ও প্রবলের আশ্রয় পরায়ণ, গ্রামে তার মত ক্ষীণপতঙ্গকে যে প্রবল প্রতাপ আশ্রয়দাতার রোষবহ্নিতে পড়িলে মুহূর্ত্তে ভগ্ন হইতে হইবে এ ভয় তাহাকে সর্ব্বদা আড়ষ্ট করিয়া রাখিত, অথচ এই ভয় ও কাপুরুষতা সে মেয়ে মহলে জানাইতে পারিত না ; বিশেষ যখন তাহারই আত্মীয় একজন অনাথা অবলা বিধবা তাঁহার মনের দার্ঢ্যে ও তেজ এমন ভাবে দেখাইতেছেন তখন তাঁহার কাছে নিজ দৈন্য প্রকাশ হইতেই পারে না। ভোলা সম্মত হইল, তবে সাক্ষাৎ ভাবে কায়বাক্যে সে তর্কসিদ্ধান্তের শত্রুতা করিবে না ; তবে বন্ধুত্ব করিবেন না ইহা সে প্রতিজ্ঞা করিল ; তাহার মৌন সম্মতি ও নীরব ব্যবহার যতটা পারে ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করুক তাহাতে তাহার আপত্তি নাই।

ভোলার প্রতি রতনরায়ের এই ক্ষমাপ্রদর্শন মহেশের মনোগত ইচ্ছানুকূল ছিলনা ; তাহার কারণ সে ভোলানাথকে জব্দ করিতে চায়। উদ্দেশ্য গভীর। তারামণির প্রতি মহেশের যে জঘন্য অভিসন্ধির আভাষ আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি তাহাই ইহার মূল। মহেশের মনে মনে বিশ্বাস ভোলানাথ তারামণির প্রতি গোপনে গোপনে আসক্ত ; এই আসক্তিকে আলোচালের নৈবেদ্যের উপর ভেড়ার লোভদৃষ্টি রূপে সে একবার ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করে। মহেশ একবার কথায় কথায় ঈর্ষ্যাপ্রাবল্যফলে ভোলাকে ঠারে ঠোরে ঐ বিষয় লইয়া তামাসা করে ; ভোলা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করে। তদবধি মহেশের মন কতকটা সুস্থ হইলেও সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক হয় নাই। মহেশ এরূপ একটা ধারণাও ভোলার মনে জন্মাইয়া দেয় যে তারামণি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠেরই কাম্য বস্তু, তাহাতে সামান্য ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা লোভীর পক্ষে প্রমাদকর। ভোলানাথ না বুঝিয়াও বুঝিবার ভাণ করে।

সম্প্রতি পূর্ব্বদিনের রাত্রিতে এমন এক ঘটনা ঘটে যাহাতে মহেশের পূর্ব্ব ঈর্ষ্যা প্রবলতর মাত্রায় জ্বলিয়া উঠে। ঘটনাটা সামান্য। কিন্তু ঈর্ষ্যার মন তুচ্ছকে ফাঁপাইয়া তিলকে তালে পরিণত করে। যজ্ঞবাড়ীর তরকারী কুটিবার জন্য তারামণি মনিব বাড়ী হইতে রাত্রি ৮টার সময় ছুটী করিয়া কোলের ছেলেটী লইয়া ভোলানাথের বাড়ী আসে। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কুটনা কুটিয়া আর বাড়ী না ফিরিয়া সে যজ্ঞেশ্বরীর কাছেই নিদ্রা যায়। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সে ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসে।

...দৈবের ঘটনা রোধ করে কে ? মহেশ চৌধুরী সেই পথ দিয়া নিকটবর্ত্তী

তালিবপুর গ্রামের কাছারী পরিদর্শন করিতে যাইতেছিল। দুজনের চোখোচোখি হইল। মহেশ একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল "একি হে মাষ্টার! কোথায় চলেছ?" হাসির অর্থ ভোলানাথ যে বুঝিলনা তাহা নহে, অপরাধ না করিয়াও তাহাকে যে অপরাধীর মত জবাব দিহি করিতে হইবে ইহাতে সে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল "তারামণি কাল আমাদের বাড়ীতেই ছিল, কুটনো বাটনা করতে রাত হয়ে যায় কাজেই বাড়ী ফিরতে পারেনি আজ তাই পৌঁছে দিতে চলেছি।" "তাইনাকি? তা মন্দ না ভাল ভাল"— বলিয়া মহেশ চলিয়া গেল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা ভোলানাথকে ভালরকমই বিঁধিল। সে একটা অনির্দ্দেশ্য ভয়ে মুখ ফিরাইয়া পিছনে তাকাইল; দেখিল মহেশও তাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছেন।

মহেশের পাপের মন; সন্দেহটা এই দৈবদৃশ্যে আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল; বাড়ী ফিরিয়াই সে জীবন ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া সকালের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। আগুন উঠিলে বাতাস তাহার সহযোগী হয় এবং রাজ্যের খড়কুটো উড়াইয়া আনিয়া তাহাতে ইন্ধন যোগায়। সহচরটী মহেশের সন্দেহটীকে পাকাইয়া তুলিল। "বলেছিতো পিসেবাবু মাষ্টার ডুবে ডুবে জল খাবার একজন! সাহস বটে বাবা"। বন্ধুর উৎসাহে ভোলানাথের প্রতি মহেশের পূর্ব্বে জিঘাংসা দ্বিগুণ বলে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে যে ইহার সমুচিৎ ফল দেওয়া উচিৎ তাহা দুই জনেই স্থির করিল। তারপর সেদিন জীবন ও ঈশান যখন অপমানিত মাণিকলালকে লইয়া মহেশভবনে উপস্থিত হইল এবং মাণিকের ইতিবৃত্ত মহেশকে শুনাইল তখনই মহেশের মাথায় ভোলানাথ এবং তর্কসিদ্ধান্তরূপ দুই পক্ষীকেই এক ঢিলে মারিবার ফন্দী জুটিয়া গেল। জমীদারী চালানো মাথার উর্ব্বরতা মহেশের যথেষ্ট ছিল। মাণিকের এই অপমান প্রতিশোধচ্ছলে যে তাহা সহজে সিদ্ধ হইতে পারে মহেশ পার্শ্বচর দুটীকে জলের মত সরল করিয়া বুঝাইয়া দিল।

ঘটনা শুনিয়াই চৌধুরীর মুড়া অর্দ্ধপক্ক গোঁপের আড়ালে একটা হাসির বাকা রেখা খেলিয়া মিলাইয়া গেল। কয়েক মিনিট কি একটা ফিস্ ফাস্ করিয়া চৌধুরী বলিলেন—"চলহে ভট্চাজ ফলার খেতে যাই। ভোলা আমাকে এস্‌পেশাল নেমন্তন্ন করেছে—"। পিসেবাবুর আশ্রিত বাৎসল্য দেখিয়া ঈশান ও জীবন মুগ্ধ হইয়া গেল।

যথাকালে দু এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোলানাথের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত

হইল। প্রত্যেকেরই সঙ্গে ছেলে মেয়ে আধডজন করিয়া। এমন কি দুতিন বছরের দুগ্ধ পোষ্যও বাপ ভাই মামা মেসোর কাঁধে ও কোলে চাপিয়া আসিতে ছাড়িল না।

নবীন চক্রবর্ত্তী ও হৃদয় গাঙ্গুলী সর্ব্বাগ্রে আসিয়া আসর জমকাইয়া তামাকের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। মাণিকের অপমান কাহিনী দাবাগ্নির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নবীন ও বিজয়ও তা অবগত হইয়াছিল। জয়রাম চাটুয্যে আসিয়া সেই কথা উত্তাপন করিল। জয়রাম মাণিকের পৃথগান্নভোজী খুড়তুতো বড় ভাই; ইনিও ভোলানাথের পুরোহিত। বৎসরে ছয়মাস ইহারা করেন যজমানী, বাকী ছয়মাস করে মাণিকরাম। মাণিকের যজমানী হাত ছাড়া হইলে উহারই সে কাজ লাভ হইবে এই তার গোপন আশা—কিন্তু তর্কসিদ্ধান্ত যদি সেই পাকা ফলে লোভ বসান তাহা হইলে সমূহ আশঙ্কা; এই জন্যই সে ব্যাপারটার অধিক খবর জানিতে নবীন ও বিজয়ের শরণাপন্ন হইল। জ্ঞাতিশোকসুলভ আনন্দ চাপিয়া মৌখিক দুঃখ ও আক্রোশ জানাইয়া বলিল—"তোমরাই বিবেচনা করে দেখ ভায়া, উনি হলেন একজন দিগ্‌গজ। পণ্ডিত, উনি যদি আমাদের মত গরীব গুর্ব্বার অন্ন মারতে বসেন বিবেচনা কর তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা"—নবীন ডাবা হুকায় ভস্মমন নিয়োজিত করতঃ ধুম্রলোক রচনা করিতে করিতে নালিশ শুনিতেছিল জয়রামের কথা শেষ হইলে একটা প্রচণ্ড বেদম সুখ টান টানিয়া বাহাতে হুকার মুখ মুছিয়া ডাইন হাতে উহা জয়রামের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—"অবিশ্যি, তা আর ভুল কি! ওটা কি ওর জুগ্‌গি কার্য্য হল শাস্ত্রেই বলেছে যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞং মিত্র উক্তং ন করোস্তি য স এব নিধনং যাতি যত্র মন্থর কৌলিক।" তখন বলেছিলাম মাণিক বাবাজী একটু ল্যাখাপড়া শিখে পিতৃমুখ উজ্জ্বল করো বাবা চাপে কাটার চেয়ে ধারে কাটা ভাল—তা বিদ্যালাভ না করে পুরুহিত্য কার্য্য বড় কঠিন—তা আমিতো বলি এর একটা বিহিত হওয়া উচিৎ ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ এর অপমান হওয়াটা ভাল কি?

হৃদয় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"নিশ্চয়ই মা—স্বজাতি হল মাণিক, পরাণ বিশ্বেলংকারের বেটা তাকে ফেলে এ বাড়ীতে পাতা পাতা কি আমাদের উচিৎ সে বোধ হয় আসছেনা খেতে— জয়রাম ধুম ছাড়িয়া বলিল কি করে আসে বল, বিবেচনা কর আত্মসম্মান তো ভাসিয়ে দিতে পারে না? আমরা না হয়—নবীন বলিল "এসেছি যে সে শুধু রাজাদিষ্ট অমান্যকর করতে

পারিনি বলেইতো নচেৎ কিনা ফলারের লোভে—অবিশ্বি কিনা রিদয় ভায়া ?"

এইরূপ আলোচনা চলিতেছে এমন সময় তথায় মহেশ চৌধুরী ঈশান ও জীবন আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরো জন ২০।২৫ ব্রাহ্মণ পুঙ্গব আসিয়া পড়িলেন। চৌধুরী মহাশয়কে দেখিয়া নবীন ও জয়রাম পরম উৎসাহে সমস্ত ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিল। সভাস্থ সকলেই শুনিল ও জানিল ব্যাপার খানা কি। মহেশ কিয়ৎক্ষন গম্ভীর থাকিয়া বলিল "মানিকরাম আসেনি ?" সকলেই সমস্বরে বলিল "না না"। এ ক্ষেত্রে কি তার আশা কর্ত্তব্য বলেন বিবেচনা করুন অসম্মানটা কতদূর আবার মুখুজ্যে গিন্নি না কি বলেছেন যে চালকলা বাঁধার ব্যবসাদার বাউন তুমি তোমার কথা আলাদা—"। মহেশ ভোলানাথের খোঁজ করিল। ভোলানাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত ভাবে অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল। মহেশের কথায় সভায় উপস্থিত হইল।—মহেশ বলিল কি হে মাষ্টার! আবার কি কেলেঙ্কারী করে বসেছ ?" আমি করি না কপালে করে চৌধুরী মশাই যা বলুন! এখন আমিই দোষী।"খুবই একটা তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটী হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ভোলানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! মাত্র আধ ঘণ্টা আগে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদলের আগমন দেখিয়া ভোলানাথ ও যজ্ঞেশ্বরীর খুব সাহস ও আশ্বাস বাড়িয়াছিল এবং উভয়ে পরম উৎসাহে কাজ করিতেছিল, কিন্তু এই আকস্মিক উৎপাতে ভোলানাথ বিলক্ষণ দমিয়া গেল। তাহার মনে হল আসন্ন ঝটিকার সূচনা স্বরূপ দিগন্তে একটা কালো-মেঘ মাথা উঠাইয়া উঠিতেছে। একটা যে গুরুতর কিছু না ঘটিয়া দ্বিবাবসান হইবে না এই ভয় দেবর ভাজকে পাইয়া বসিল। যজ্ঞেশ্বরী……বাহিরের কোলাহল শুনিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিলেন; সঙ্গে দক্ষ ঠাকুরাণী ছিল। উভয়ে বাড়ীর ভিতর গেলে দক্ষ ঠাকরুণ বলিলেন "কিছু না বৌমা! ও ওই বিট্‌লে বাউনের একটা চাল্। মান্‌কের সাহস কি বৌমা কি যজমান চটায় ? শিবের মাথায় চাপ্‌লে ঢোঁড়াও ফণা ধরে।" দক্ষ দেবী খুব চতুরা এবং ক্ষেত্র বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে খুব মজবুৎ। তিনি খিড়কী দিয়া ছুটিয়া গিয়া তর্কসিদ্ধান্তকে খপর দিলেন; সিদ্ধান্ত সেই মাত্র পুজা সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন দক্ষ প্রমুখাৎ ব্যাপার শুনিয়া সেই বেশেই অকুস্থানে হাজির হইলেন; পঞ্চুও মামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত।

আর একজন আসিতে ইচ্ছুক হইয়াও আসিতে পারিলেন না; ভবানী প্রসাদ! ভবানী ঘণ্টা খানেক আগে আসিয়া বিজয়ের সহিত বাটীর ভিতরেই তার শয়ন গৃহে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। বাহিরের ঘরে তেমন বসাইবার ভাল স্থান না থাকাতেও বটে আর তিন বন্ধুতে মিলিয়া নির্জ্জনে আলাপ পরিচয় করার ইচ্ছাতেও বটে বিজয় তাহার শয়ন ঘরে শয্যায় ভবাণীকে বসাইয়া আলাপ সম্ভাষণ করিতেছিল। যে সময়ে গোলমালটা ঘটে তখন ভবানী জলযোগ করিতেছিল; বিজয় বিজয়ের মা নাছোড়বন্দা হইয়া তাহাকে ও পঞ্চুকে জল খাওয়াইতে রাজী করেন; পঞ্চুর তখনো স্নান না হওয়াতে সে বাড়ী যায়; বিলম্ব হইবে বুঝিয়া ভবানীকে অগ্রিম কার্য্য সম্পাদন করিতে বলিয়া যায়। ভবানী তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিতে লাগিল। সে দলাদলি ব্যাপারটা পূর্ব্বেই কিছু কিছু নয়নতারার কাছে শুনিয়াছিল।

হাফিজের কাব্যরহস্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এ ম্ এ]

বি নায়েম্ নিশানে জে জামেলে দস্ত্ লেকিন্
দো জাহান্ বাহুম্ বার্ আয়াদ্ শের্-ই-শোর্-ও শার্ নাদারম্॥

আমি আমার প্রিয়তমের সৌন্দর্য্যের কণা মাত্র দেখাইতাম কিন্তু ভয় হয়—পাছে দ্যুলোক ভূলোক আত্মহারা হইয়া পড়ে! (আমি তোমাকে একটা আভাস—একটা ছবি দেখাইতে পারি, কিন্তু তার সৌন্দর্য্যালোক সহ্য করিতে পারিবে কি?)

১

আদর্শ কবিতার লক্ষণ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে প্রকাশ করা। সমস্ত ললিত কলারই ঐ এক আদর্শ। স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত কবিতা মনের গোপন ভাবটীকে আকার দিয়া চির স্থির করিয়া রাখিতে চায়। মানব জীবনের যেমন তিন অবস্থা, আদর্শ কবিতাও তেমনি তিনটী সোপানের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করে,—শৈশব, যৌবন ও পরিণতবয়স

প্রথম অবস্থায় বা শৈশবে কবিতা সরল ও নীতিমূলক হইয়া থাকে। এই জাতীয় কবিতায় যুগধর্ম্মের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের সাধনা বেদের সরল মন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার প্রথম যুগে এই জাতীয় কবিতা শৌর্য্য, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, মহত্ব প্রভৃতি মানবীয় সদ্‌গুণগুলির পূজাতেই অনুপ্রাণিত! ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্ববর্ত্তী স্যামুয়েল ও পরবর্ত্তী রোদাকি, আন্‌সারি এবং কির্দ্দুশী প্রভৃতি পারসী কবি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কির্দ্দুশী একটী সরল কবিতায় বলিতেছেন—

খুদাওয়ান্দে বালা ওয়া পস্তি তু-ই।
নাদাণাম্ চে-ই, হার্চে হস্তি তু-ই॥

(হে দেবতা, তুমি উচ্চে আকাশের রাজা, নিম্নে ধরণীর রাজা। জানি না, তুমি প্রকৃত কে, কিন্তু তুমি যে-ই হও, আমি শুধু এই মাত্র জানি যে তুমি আছ)। সারল্যে সুন্দর, অভিব্যক্তিতে স্বচ্ছ এই ক্ষুদ্র কবিতাটী নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে জীবন গঠনেরও একটা ক্ষীণ আভাস দিয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগে বা যৌবনে এই কবিতা সভাবতঃই জটিল ও সৌন্দর্য্য-রস-সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন ইহা আপনার মাঝে আপনি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ভাষাসম্পদে ও বর্ণনা-লালিত্যে তখন ইহা স্ফুটনোম্মুখী কিশোরীর ন্যায় অলঙ্কার বাহুল্যে পীড়িতা রূপকে ও কল্পনায় তখন ইহা মাধবী পূর্ণিমার ন্যায় আবেশময়ী। প্রথম যুগের কবিতা যেমন আমাদের প্রাথমিক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক জীবনের প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হয়, দ্বিতীয় যুগের কবিতা প্রধানতঃ আমাদের অন্তর-দ্বারে করাঘাত করিয়া সুপ্ত বাসনারাজি জাগাইয়া দেয়, জীবনের যামুন-প্রবাহে উজান বহাইয়া দেয়। মরণের মধুর স্বপ্ন চক্ষের পল্লবে শিশির-কণার মত মাখাইয়া দেয়। জয়দেবের ভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা 'মৃগমদ-সৌরভ-রভসে' মহিমময়ী। প্রথম যুগের কবিতা অপেক্ষাও এই যুগের কবিতা আদর্শে গরীয়সী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার আদর্শ মুক্তার মত শুক্তি-গর্ভে আচ্ছন্ন ও প্রসুপ্ত বটে, কিন্তু সে শুক্তির কঠ-আবরণ শঙ্খ-ধবল ও মসৃণ। এই আদর্শেই দান্তের সুবর্ণ-স্বর্গ ও অন্ধকারময় নরক গঠিত হইয়াছে, আবার ইহারই আদর্শে সাদি, আনওয়ারি, সুল্‌মান্ সোরাজি প্রভৃতি সৌন্দর্য্য—রসিক পারস্য কবিগণের ললাম কল্পনা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর তৃতীয় যুগ—বা কবিতার উচ্চ পরিণতির কথা।

কবিতা তখন গুণ ও অধ্যাত্মমূলক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা তখন যথার্থ আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়া মাটীর বাঁধন নির্ম্মোকের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে। আপন সত্তা ও পৃথিবীর চতুঃসীমা ছাড়াইয়া তখন ইহার প্রভাব বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। স্বর্গের অমর মহিমার পানে ইহা ভ্রূক্ষেপ করে না, পূজা পদ্ধতির প্রাণহীন ধর্ম্মে ইহা আপনাকে ধরা দেয় না ঈর্ষ্যা-নিন্দার কুটিল কটাক্ষে ইহা সংকুচিত ও অবনত হইয়া পড়ে না। সুতরাং এই শ্রেণীর কবিতার ও কবির সংখ্যা অনেক পরিমাণে কম। কিন্তু সেই অল্প সংখ্যক কবির প্রত্যেকেই সত্যদর্শী, ঋষি-কল্প ও যথার্থ কবি। কবিতা তাঁহাদের হৃদয়ের ছায়াচিত্র, মস্তিষ্ক প্রসূত শুষ্ক সিদ্ধান্ত মাত্র নহে। কবিতা তাঁহাদের ভাষাভাবের, ধ্যান ধারণার প্রকৃষ্ট পরিচয়। সেই জন্যই এ শ্রেণীর কবিতার পাঠক সংখ্যাও খুব অল্প। এই শ্রেণীর কবির মধ্যে জগতের শিক্ষক মহম্মদের জামাতা আলি, সাম্‌স্তাব্‌রেক, মৌলানা জালালুদ্দীন্ রুমি, হাকিম সানাই, জামি, ফারিরুদ্দীন্ আট্টার্, ও এই প্রবন্ধের আলোচ্য কবি শেখ আব্‌দুল্ কাদির্ জিলানি হাফিজ, বা খাওয়াজা সাম্‌সুদ্দীন্ মহম্মদ-ই হাফিজ-বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের কাব্য-ভাণ্ডার অফুরন্ত,—ইহাদের দর্শন-বাদ মরণের ভবিষ্য আঁধারে কুহেলি-সমাচ্ছন্ন নহে। যদি প্রথম যুগের কবিতা দুগ্ধ বা মধু-ধারার সহিত এবং দ্বিতীয় যুগের কবিতা মদিরার সহিত উপমেয় হয়, তাহা হইলে বলিব—তৃতীয় যুগের কবিতা সঞ্জিবনী সুধার সহিত উপমেয় প্রথম যুগের কবিতা আমাদিগকে আনন্দ ও নীতিশিক্ষা দেয়, দ্বিতীয় যুগের কবিতা আমাদের মনে প্রেম ও প্রীতির উন্মেষ করে আর তৃতীয় যুগের কবিতা আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। ঘরের বাঁধন তখন আর আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না; জীবন রহস্যের সমাধান তখন সহজেই হইয়া যায়; সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের শান্তিচ্ছায়া তখন 'ঘন শ্রাবণ মেঘের মত' রৌদ্রদগ্ধ জীবনের উপর 'রসের ভারে নম্র নত' হইয়া পড়ে। হাফিজের দুইটী গজলের দ্বারা আমরা তৃতীয়োক্ত শ্রেণীর কবিতার প্রকৃতি বিশদ করিয়া দিব;

খুর্‌রম্ আন্ রোজ্ কাজিল্ মঞ্জিল্, উইরন্ বিরাওয়াম্।
রহ্‌তে জান্ তালাবাম্ ওয়াজ্ পৈ জানাম্ বিরাওয়াম্॥
বা হাওয়া দারি-ই-উ জারবা শিফ্‌ৎ রাকৃস্ কুনান্।
তালাবে চাশ্‌মি মুর্শিদ্ দারাক্ষান্ বিরাওয়াম্॥

(যে দিন আমি এই নির্জ্জন পান্থ-নিবাস ত্যাগ করিব, কতদূরে সেই দিন

—কতদূর সেই দিন, যখন আমি পরম সুখে আমার প্রিয়তমের পানে ছুটিয়া যাইব—যখন তাঁহার ভালবাসার আলোকে মুগ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণে ধূলিকণার মত ভাসিতে ভাসিতে আমি সেই উজ্জ্বল সূর্য্যের নিকট পৌঁছিব!) বিরহ প্রতীক্ষায় উদ্বেগাকুল কবি ভগবানের পদে আত্ম নিবেদন করিতেছেন; এইখানে বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতির সেই অমর শ্লোকটী মনে পড়ে—

"এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়নু
দিবস দিবস করি মাসা,
মাস মাস করি বরিখ গোঁয়ায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা!
বরিখ বরিখ করি সময় গোঁয়ায়নু
খোয়নু এ তনু আশে—"।

আমাদের মনে হয়, প্রেমের সখীও দাস্যভাব ইহা অপেক্ষা সহজ সুন্দর হইতে পারে না। অন্য একটী শ্লোকে হাফিজ্ নিরর্থক পূজাপদ্ধতি ও সমাজ শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—

কাশ্‌মি গোইম্ ও আজ্ শুক্‌তি খুদ্ দিল্‌শাদাম্।
বন্দী ইশ্‌কোয়াম ও আজ্ হার্দো জাহান্ আজাদাম্॥
নিস্ত্ বার্ লোহি দিলম্ জুজ্ আলিফ্ কোয়ামাৎ-ই-ইয়ার।
চেকুনম্ ইর্‌ফ-ই-দিগর ইয়াদ্ নাদাদ্ উস্তাদাম্॥

(মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আনন্দের সহিত বলিতেছি—আমি ভালবাসার বন্দী এবং উভয় লোক-স্বর্গ ও মর্ত্ত-হইতে মুক্ত।—আমার প্রিয়তমের মূর্ত্তির আলিফ্ (প্রথমাক্ষর) ছাড়া আমার হৃদয় পটে আর কোন অক্ষর লেখা নাই। ওগো, আমি কি করিব—আমার শিক্ষক যে আমায় আর কোন অক্ষর শেখান নাই!)

কবিতার স্তর পরম্পরায় হাফিজের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এইবার আমি তাঁহার কাব্যালোচনা করিব।

২

সিরাজ্ দেশের কোকিল হাফিজের সঙ্গীতরাজি চিরন্তন আনন্দের উৎস; তাঁহার কবিতা কেবলমাত্র পারস্য সাহিত্যের বা পারস্যভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজস্ব নহে, পরন্তু তাহা কবিতামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই উপসেব্য। সমস্ত যুগের ও সমস্ত দেশের কবিত্বশক্তি হাফিজের মায়াদণ্ডে যেন উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

এক কথায় তিনি জগতের কবি। তাঁহার গানের মধ্যে যে ভাব ও রস প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, তাহা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করিলেও অক্ষুণ্ণ ও সুন্দর থাকিবে বটে, কিন্তু অনুবাদ কাব্য সৌন্দর্য্য, ভাষা ও ঝঙ্কারের সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট হইয়া যাইবে। অনুবাদ কেবল মূলের মোট ভাবটী বহন করিতে পারে, মূলের মূর্চ্ছনা কেমন করিয়া দেখাইব? কেমন করিয়া হাফিজের গজলের প্রেম-কম্পিত বিরহ-ব্যাকুল সুর ফুটাইয়া তুলিব? ইরান্‌দেশের আঙ্গুর বাগান, আপেল ও ন্যাসপাতি-কুঞ্জ, বুলবুলের হৃদয়দাহী গুঞ্জন, সাইপ্রেশ্‌—লতার সুকুমার সৌন্দর্য্য, খর্জ্জুর বৃক্ষের চারিদিকে সেই সন্তপ্ত পবন, ভারবাহী উষ্ট্রের সেই জীবন-ভার নামাইবার ক্লান্ত ভাবটী—কেমন করিয়া অনুবাদে জাগাইয়া তুলিব? 'বাহারে'র বা বসন্তের প্রাণোন্মাদী সৌন্দর্য্য, যৌবন-দৃপ্তা সাকীর হস্তে সিরাজির পূর্ণ পেয়ালা, বিরহিনী নারীর প্রেম-মহিমা কেমন করিয়া অনুবাদের বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশিত হইবে? তবে যে আরবী বয়েদ্‌টী আমি এই প্রবন্ধের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিব, "আমি তোমাকে একটা আভাস—একটা ছবি দেখাইতে পারি, কিন্তু তার সৌন্দর্য্যালোক সহ্য করিতে পারিবে কি?" হাফিজ কেবল ভাবসম্পদেই ধনী নহেন, বর্ণনা-লালিত্যেও তিনি অনিন্দনীয়; তাই বলিতেছিলাম, যে অনুবাদে তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্য অনেকাংশে ব্যাহত হইয়া যাইবে।

কলাবিৎরূপে হাফিজকে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার গুণাবলী নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কবির সম্বন্ধে ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান—তিনি কেমন জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চিন্তার ধারা, তাঁহার কবিতার প্রধান মূল্য ও সৌন্দর্য্য কোথায়, তাহাই বক্ষ্যমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার গীতি কবিতার মধ্যে চিন্তা ও ভাবের যে তরঙ্গগুলি বহিয়া গিয়াছে, সেইগুলি নির্দ্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। এইগুলিই কবির চিন্তার গভীর অর্থ ও ধারা নির্দ্ধারণে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করে। আবশ্যক মত আমরা কবির দীবান্‌ বা গজল-সমষ্টির বঙ্গানুবাদ দিয়া আমাদের কথা বলিতে চেষ্টা করিব। কেবল মাত্র যথেচ্ছ কতকগুলি শ্লোকোদ্ধার করিয়া আমরা প্রবন্ধটী ভারক্লিষ্ট করিয়া তুলিব না; কারণ প্রত্যেক গজল ও দ্বিপদী কবিতা যেন জ্যোৎস্নার কণা—ভাবের মমতাজ—সৌন্দর্য্যের মণি-মন্দির বলিয়া প্রত্যেক কবিতাই উদ্ধার করিতে ইচ্ছা হয়।

জীবনেতিহাসের প্রত্যেক খুটীনাটীর কথা ধরিলে আমরা দেখিতে পাই যে অন্যান্য কয়েকজন জগৎপূজ্য কবির ন্যায় হাফিজের জীবন-কাহিনীও আঁধারে বিলুপ্ত। পূর্ব্বতন তাজ্‌কারা বা কবিজীবনের ইতিহাসের মধ্যে আমরা যে ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার জীবন চরিতের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং সে সমস্তও কিংবদন্তী ও প্রবাদ বচনের উপর নির্ভর করিয়া রচিত। সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে হাফিজকে বুঝিবার উপায় নাই; সুতরাং আমরা তাঁহার কবিতা হইতে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব!

হাফিজ যে নির্দ্দোষ ও অকলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কবিতার মর্ম্মগ্রাহিগণ কিছুতেই অস্বীকার করিবে না। তাঁহার জীবন সুন্দর, সংযত, শান্ত, নির্ম্মল—ধর্ম্মের নামে তিনি যথেচ্ছাচারিতা আনেন নাই প্রেমের নামে কলুষতা বা পঙ্কিলতা আনিয়া কাব্য—সুন্দরীর অঙ্গে 'গাঢ় কলঙ্কের দাগ্‌ আঁকিয়া দেন নাই। দীবানে কতকগুলি কবিতা আছে তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, হাফিজ প্রাতে উঠিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন ও কোরাণ পড়িতেন। একটী গজলে তিনি বলিতেছেন, "হে হাফিজ, যতদিন তুমি তোমার কুটীরের নির্জ্জনতায় ও রজনীর অন্ধকারে তোমার মন্ত্র ও কোরাণ পাঠ করিবে, ততদিন তোমার কোনই ভয় নাই।" এমন নির্ভরতা জগতে বড়ই দুর্লভ।

৩

যুক্তি ও বিচারসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করিবেন না যে হাফিজ সিরাজিপূর্ণ পেয়ালার অন্ধভক্ত ছিলেন। সমান ভাবুকতা ও রসের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না বলিয়াই তিনি যে মদিরা ও সাকীর আচরণে রূপক-চ্ছলে অনেক উচ্চভাবদ্যোতক কথা বলিয়াছেন, তাহা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সমালোচকের নিকট সহজেই ধরা পড়ে। বস্তুতঃ এরূপ বর্ণনা-ভঙ্গী পারস্য কবিগণের মামুলী-প্রথা এবং এবং এই প্রথানুকরণে কেবলমাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে যে কামনার রক্তবহ্নিমুখে কবি পতঙ্গের মত ছুটিয়া যান নাই—পরন্তু তিনি যে শব্দসমষ্টি লইয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে আর একটা মহনীয় ও চরণীয় জগৎ আছে। হাফিজ এবং পারস্যদেশীয় অন্যান্য সুফী বা অস্পষ্টবাদী (Mystic) কবিদের ইহাই বিশেষত্ব। ভাবুক ও রসজ্ঞ পাঠক

মাত্রই দেখিবেন যে তাঁহাদের কবিতা অধ্যাত্ম ও ভক্তিমূলক; কিন্তু তাহাদের ভাব রাজি এমন পরিচ্ছদে সজ্জিত যে তাহা কেমল ইন্দ্রিয়ভোগেরই পরিচায়ক। হাফিজের ভিতর এমন একজন মানবের পরিচয় পাই, যিনি প্রেমে গরীয়ান্ ও পবিত্রতায় মহান্। ধর্ম্মের যথার্থভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি চরিত্রনীতিজ্ঞ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল রকম ভানের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে ব্যবধান তাঁহার অসহ্য ছিল; ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে পীড়িত করিত; প্রেমের মধ্যে 'খাদ্' মিশানো তিনি দেখিতে পারিতেন না।

আমরা এই কথা বলিতেছি না যে হাফিজ সন্ন্যাসী ছিলেন, বা তাঁহার "কীণাঙ্ক-কঠিন" জীবনে হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও সহজ প্রবৃত্তিগুলি কখনও জাগে নাই। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি যদি যথার্থই সংসারত্যাগী বৈরাগী হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রেমের এই মনোমোহন সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম না। কিন্তু তিনি কখনও 'জাগতিক' :প্রেমে মজিয়াছিলেন কিনা—তাহা আমাদের অজ্ঞাত; তবে কয়েকজন সুধী সমালোচক তাঁহার কবিতার মধ্যে কবির "মানসীর" সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। আমরা জানি দান্তের বিয়াট্রিচে ছিল, পেত্রার্কের ল্যরা দে নাভিস্ (Laura de Novrs) নাম্নী একজন কুহকিনী ছিল, তাসোর (Tasso) লিওনারা (Leonara) ছিল, সেক্‌স্‌পীয়রের "W. H" নামে একজন প্রচ্ছন্ন নামা দেবতা ছিল, চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী ছিল, বিদ্যাপতির লছমী দেবী ছিল, জয়দেব "পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" ছিলেন, বিখ্যাত পর্ত্তুগিজ সনেট্-লেখক কামোয়েনস্ (Comoens) এর কাথারিন্ ডা'টেড্ (Catherine d'Ataid) নামে একজন মোহিনী ছিল, স্কট্‌ল্যাণ্ডের কবি প্রথম জেম্‌স্'র লেডি জেন ব্যফোর্ট (Lady Jane Beaufort) ছিল ইত্যাদি। প্রণয়িণীর উচ্ছ্বাসে সূর্য্যোদয়ে রজতগিরি হিমালয়ের উপর বহুরশ্মিরেখার ন্যায় তাঁহাদের কাব্য মহিমা ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এমন কি কাহারও বা প্রণয়িণীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যস্ফূর্ত্তি সমাধি লাভ করিত। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেই প্রবাদ আছে যে লছমী দেবী সভাপার্শ্বস্থ মর্ম্মর বাতায়ন হইতে তিরোহিত হইলেই কবির কাব্য—প্রতিভা স্তিমিত হইয়া যাইত। হাফিজ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—"আমার কথায় যে মধুরতা ফুটিয়া উঠে, তাহা সহিষ্ণুতার ফল, আমি ইহার দ্বারাই সাকী নাবাৎকে লাভ করিতে পারিয়াছি।" আর একটি কবিতার প্রারম্ভে তিনি বলিতেছেন :—

ফর্‌রুখের বদন-বিভায়
প্রাণ মোর জলে কামনায়—
ফর্‌রুখের স্রস্ত কেশপ্রায়
প্রাণ মোর পড়েছে ধাঁধায় !

কেহ কেহ অনুমান করেন এই ফর্‌রুখই তাঁহার স্বপ্নসুন্দরী মানসী ; আবার অনেকে বলেন সুফী কবির দ্ব্যর্থব্যঞ্জক 'ফর্‌রুখ' শব্দটি মহম্মদকেই উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে !

হাফিজ মানবীয় প্রেমে মজিয়াছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার হৃদয় প্রেমের মোহনবর্ণে গভীরভাবে রঞ্জিত ; এখানে প্রেম অর্থে আমরা পারমার্থিক প্রেমের কথা বলিতেছি—যাহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বদেশিক, যাহা অন্তঃকরণের মধ্যে মিলনের নেশা জাগাইয়া দেয়। তাঁহার কবিতা ধারাধৌত যুথীর ন্যায় নির্ম্মল, পবিত্র ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার কবিতা আমাদিগকে রোমাঞ্চ ও মুগ্ধ করিয়া দেয় বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে, তাহা কখনও হৃদয়হীনের প্রলাপ নহে। আমরা কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে কবির কল্পনা-বিহঙ্গী কত উচ্চে কোন্ আনন্দলোকে আপনার মানস-নীড় রচনা করিয়াছিল :—

'মহাকালের প্রারম্ভে তোমার সৌন্দর্য্য-কণা ফুটিয়াছিল—তখনই ভালবাসা আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিল।'

'……তোমার ভালবাসা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনঃপ্রাণ বিকশিত করিয়াছে—এই ভালবাসা কেবল জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত অবসানলাভ করিবে।

এইখানে আমাদের একটু মন্তব্য আছে। বাঞ্ছিতের জন্য কবির যে আকুলতা ও অতৃপ্তি—তাহা কি এক জীবনেই শেষ হয় ? কবি ইসলাম ধর্ম্মী, হিন্দুত্বের আদর্শে ও প্রতিবেশ প্রভাবে তাঁহার চরিত্র গঠিত না হইলেও পরপারের পাথেয়-স্বল্পতা তাঁহাকে কখনও বিচলিত করে নাই। তিনি ইহলোকেই তাঁহার ভালবাসার পর্য্যবসান করিয়াছেন। তাই ভক্তিরসাশ্রিত কবিতা ব্যতীত তাঁহাকে কখন কখন জড় বাসনারও উপাসনা করিতে দেখিতে পাই :—

'ওগো সাকি, এমন মদিরা দাও যাহার প্রভাব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কারণ স্বর্গে ত রুক্‌নাবাদের নদীকূল নাই, মুশাল্লার বনভূমিও নাই ! ('মুশাল্লা' অর্থে মন্দির-স্থান, বা বন্ধুজনের বসন্তকালীন মিলন-ক্ষেত্র ; রুক্‌নাবাদ—স্থানীয়

নদী)। নদী, কানন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কবি কত আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা এই কবিতায় সুন্দরভাবে পরিকীর্ত্তিত; পার্থিব বস্তু যে অশাশ্বত—তাহার জন্যও একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস পূর্ব্বোক্ত কবিতাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে লীন হইয়া আছে। আমাদের মনে হয়, যেন দুই এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত কবি একটী নদীকূলে বসিয়া পাদচুম্বী তরঙ্গলীলা দেখিতেছেন, সেই চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে পুষ্পিত বনভূমি, আর উপরে অনন্তশূন্যে অস্তমান্ সূর্য্যের শোণিমরাগ সঙ্গে সঙ্গে টেনিসনের সেই মধুর ভণিতাটী মনে পড়ে।

"For men may come, and men may go,
But I go on for ever"—
কত লোক আসে, কত লোক যায়,—
আমি কিন্তু বহি চিরতরে।

হাফিজ যে সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার অভাব অভিযোগ খুব অল্প ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তথাপি কাব্যের নীরব সাধনা করিবার জন্য যে টুকু শান্তি ও সাংসারিক সুখ থাকা প্রয়োজন, তাহা নিশ্চয়ই তিনি ধনী পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। কারণ, তৎকালে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ ভারতীয় পুরোহিতগণকে সাহায্যদানে উৎসাহিত করিতেন। সে কালে পারস্যে কাশিদা (eulogia) বা প্রশস্তি-কবিতা লিখিবার রীতি ছিল। হাফিজও পারস্যরাজ মনসুরকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;—"তোমার অধীনে কার্য্য করিয়া আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, এবং (তোমার নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া) আমি অমরত্বলাভ করিয়াছি।" অন্য কয়েকটী গজলে হাজি কাওয়াম্, দ্বিতীয় আশ্‌—আফ্, খাওয়াজা খিবামুদ্দীন প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। তিনি কেবল মাত্র তাঁহার নিজদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্য পান নাই। সুদূর ভারতবর্ষে তাঁহার যশোরশ্মি বিকীরিত হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলমান রাজার দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও তথায় আগমন করেন নাই। উত্তর স্বরূপ তিনি একটী গজল লিখিয়া পাঠাইলেন ; তাহা এই; —'জীবনের ভীতিপূর্ণ রাজ-মুকুট লোভজনক শিরোভূষণ বটে, কিন্তু শিরঃপীড়া ঘটায় বলিয়া আমি ইহা চাহিনা।'

তাঁহার কবিতার সমসাময়িক সমালোচনার প্রতি ও তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। আমরা কখনো বা তাঁহাকে আত্মপ্রশংসাবাদে আনন্দিত হইতে দেখি।

আত্ম গুণ কীর্ত্তন পারস্ত কবিগণের চিরন্তন প্রথা। কিন্তু হাফিজ গতানুগতিকের ন্যায় সে প্রথার অনুসরণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার কবিতা মুক্তার মালার মত।—পাঠকগণ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিলে গগন মণ্ডল তাঁহার কবিতার উপর তারকা-কুসুম বর্ষণ করিবে। কার্য্যগৌরব ইহা অপেক্ষা উন্নত হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেবল ভবভূতির সেই গৈরিক-নির্ঝর-পূর্ণ শ্লোকটী মনে পড়ে—"উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্ম্মা" ইত্যাদি। সঙ্কীর্ণচিত্ত সমালোচকদের প্রতিও তিনি একটু তীব্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হাফিজের কবিতার যে দোষানুসন্ধান করে, বলিব-তাহার মোটেই রসবৈচিত্র্য অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই।'

[ক্রমশঃ]

প্রেমের পাল্লা

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ভারি চোট্‌পাট্—খুব কড়াকড়া বুলি
—না হয় আজকে দিয়েছ দু'গাছা রুলী ?
চুল ওঠে তাই দিয়েছ যে তেল কিনে
তা'তেত তোমারো গরজ কম দেখিনে !
কপালের টিপ ?—দু'খানা আলতা পাতা ?
ছাতা দিয়ে তাই কিনে ফেলেছেন মাথা !
হলুদ রঙের সুতো এক ফেটি কই ?
এদিকে বলেন,—"তুমি ছাড়া কারো নই !"
নাকছাবী টাত ডবডবে বেমানান
ভালবাস কত তাই বুঝি এ জানান ?
ফুল দিতে ভুল একমাস যার হয়
সে কেন দেখায় 'বেবাগী' হ'বার ভয় ?
মিছে কথা গুনো কেমনে যে মুখে ফোটে
এখনও যে পূবে চন্দ্র সূর্য্য ওঠে
আমার জন্ম খেটে খেটে তুমি সারা ?

আগে ভেবে দেখ কথাটা কেমন ধারা!
নাক ডেকে ঘুম? কখন শুন্‌লে বল?
দিনে ঘুম?—আমি? মার কাছে বসে বসে
রামায়ণ পড়ি খরচ দিই যে কসে'—
তোপ ভোরে উঠি, তখনি রাঁধার তাড়া
বাবুর—ঘুমত ভাঙ্গে না চায়ের পেয়ালা ছাড়া!
ঘর ঝাট দেওয়া একগাদা পান সাজা
ওঠা নামা করে পড়ে গেল মোর মাজা,
এর মাঝে কর টেবিল বাজিয়ে গান
সত্যি বল্‌ছি,—আন্‌চান্‌ করে প্রাণ!

সাবানের কথা? বলোনাক' মুখ নেড়ে
আতরের শিশি? কালত নিয়েছ কেড়ে!
সাবান মাখিলে তাতে দেবে রোজ গালি
বাক্স এদিকে তোমার হাতেই খালি।
গন্ধ মাখিনে সন্ধ করেছ মনে
কত কথা তুমি বলেছ দিদির সনে।
"হেনা"র শিশিটা উপহার দিলে সই
"লক্ষ্মীটি মেখো" বলে দিলে পই পই
বেছে বেছে কেনা অমন সাধের "জুঁই"
তোমারে লুকায়ে বল দেখি কোথা থুই?
ভাল যে বেসেছ সেটাকি এমন বেশী

কথা না কহিলে কেঁদেছ সত্যি বটে
কার দোষ? বলি—বুদ্ধি নেই কি ঘটে?
উপরে 'কলে' জল ওঠেনিক কাল
সংসার করা জাননাত নাজেহাল!
ঘুম পেয়েছিল কইতে পারনি কথা
অমনি বাজিল পরাণে দারুণ ব্যথা?

রেগে গুলে ভুঁয়ে বিছানাটা ছেড়ে দিয়ে
অতএব-ফোঁস—কেন করেছিলে বিয়ে ?
কাছ ছাড়া হলে সয়না সেটাত জানি ?
তা বলে কেমনে পাল্লায় বড় মানি ?

'চিঠি চিঠি' বলে গর্ব্ব করো না আর
সে গুমোর ওগো হয়ে গেছে সব বা'র
তিন খানি চিঠি দিই ছিলে রেখে ঢেকে
দাসী-দিয়েছিল—পাঁ—চ খানা একে একে !
যা দিয়েছ তার দিগুণ নিয়েছ ফিরে
মিথ্যা বলোনা রইল মাথার কিরে।

পতিতার সিদ্ধি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ]

(২৬)

স্ত্রীর দৃঢ়তার কাছে হার মানিয়া চারুর 'বাবু' ব্রজেন্দ্রনাথ যে সময়ে অবসাদে শয্যায় শুইয়া পড়িল, তখন রাত্রি এগারোটা। সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সেই নূতন প্রবিষ্ট চারুর বাড়ীতে তাহাকে একা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত মনুষ্য-হীনতার কার্য্য হয় মনে করিয়া সন্ধ্যার পর হইতেই ব্রজেন্দ্র সেখানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী নির্ম্মলা কিছুতেই তাহাকে আজ বাড়ীর বাহির হইতে দেয় নাই। সে জন্য নির্ম্মলাকে আজ একটু বিশেষ উগ্র মূর্ত্তিই ধরিতে হইয়াছিল। নয় বছরের বালক নালু যদিও ক্রুদ্ধা মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে বিপন্ন পিতাকে, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসরের পুঁটি চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই !

ব্রজেন্দ্র যাইবার জন্য মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়াছিল বলিয়াছিল না গেলে চারু একা থাকিবে খুব সম্ভব বিপদে পড়িবে।

নির্ম্মলা বলিয়াছিল সেটা স্বামীর গাড়োলত্ব, সে বেশ্যাকে একা থাকিতে হইবে না, গাড়োলের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যাহারা খায়, তাদের মধ্যে একজন সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে সারারাত্রি আগুলিয়া থাকিবে।

রাত্রি প্রায়—এগারোটার সময় চাকর হেমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া এবং তাহাকে সারারাত্রি সেখানে থাকিবার আদেশ দিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বাস্তবিক অবসন্নেরই মত শয়ন করিল!

ঝোঁকের সময়টা উত্তীর্ণ হইতেই সে বুঝিয়াছিল, নির্ম্মলা তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইতে না দিয়া যথার্থ স্ত্রীর যোগ্যই কাজ করিয়াছে। সে বিষম ঝড়ে অন্ধকারে বাহির হইলে বিপদের যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল।

নির্ম্মলা সবই ভাল করিয়াছে, কেবল একটি কথা কহিয়া সে চারুর প্রতি বিশেষ নিষ্ঠুরের ভাবই প্রকাশ করিয়াছে। সে বলিয়াছে, চারু ব্রজেন্দ্রের বিরহে সারারাত্রি তার বিছানায় পড়িয়া কণ্ঠায় কণ্ঠায় ঝড় খাইয়া ছটফট করিবে না, আর একটি খেঁকশিয়ালী জাতীয় ধূর্ত্ত এই ঝড়ের সুযো গ গাড়োল ব্রজেন্দ্রের স্থান অধিকার করিবে। বরং আফিস হইতে ঘরে না আসিয়া প্রারম্ভেই যদি সে চারুর কাছে যাইত, তাহা হইলে যতক্ষণ নির্ম্মলা স্বামীর সংবাদ না পাইত, ততক্ষণ সে উঠিয়া বসিয়া চলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইত না।

শয্যায় পড়িয়া যে সময় ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কঠোর বাক্যের প্রতিবাদ স্বরূপ চারুর নির্ম্মলত্ব-ধ্যানে একটু তন্ময় হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নির্ম্মলা ঘরে ঢুকিয়া বুঝি তাহাকে একবার ডাকিয়াছিল ব্রজেন্দ্র সেটা শুনিতে পায় নাই।

স্বামী ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া সে একবার শয্যার পার্শ্বে আসিল। কাছে গিয়াই তার বুঝি একটু জোরের নিশ্বাস সে শুনিতে পাইল। শুনিয়াই বলিল —"দীর্ঘ নিঃশ্বাস—কেন গো? এখনও ত যাবার সময় উত্তীর্ণ হয় নি।"

"না নির্ম্মলা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম। এখন বুঝেছি, তুমি আমাকে ধরে রেখে ভালই করেছো। তবে তাকে এতটা হীন মনে করা তোমার অন্যায় হয়েছে।"

"বেশ ত গো মহৎ সে। তার মাহাত্ম্য না জেনে একটা কথা কয়েছি, তাতে অতবড় দীর্ঘশ্বাস কেন? হেমাকে ত আগ্‌লাবার ভার দিয়েছ—"

"তাতে বেশী অন্যায় হয়ে গেছে নির্ম্মলা। বরঞ্চ তাকে না পাঠানোই ছিল ভাল। আমি যে যেতে পারলুম না তাতে তত দোষ হয় নি। সে

নিশ্চয়ই বুঝতো আমি চেষ্টা করেও বাড়ী থেকে বেরুতে পারি নি ; কিন্তু হেমাকে পাঠাতে সে মনে করতে পারে যে আমি তাকে বিশ্বাস করি না।"

"তবে তাকে পাঠালে কেন? হেমাকে পাঠাতে আমি ত বলিনি।"

এ কথায় ব্রজেন্দ্রের উত্তর দিবার কিছুই ছিল না। নির্ম্মলা ত তাহাকে যাইতে বলে নাই। শুধু তাই কেন, তার চিঠিখানা ত সে নির্ম্মলাকে একেবারেই গোপন করিয়া পাঠাইয়াছে। তবু সে বলিল—"তুমি যে রকম করতে লাগলে!"

"আমি কি করলুম? ও বুঝেছি—তা আমার কথা শুনেই সে সতীরাণীর মহত্বে তোমার সন্দেহ হয়ে গেল?"

"সন্দেহ হবে কেন!"

"দেখ, লেখাপড়া শিখেও যে মানুষের এত অধঃপতন হ'তে পারে তা জানতুম না। আমার মনে যা এলো, মুখেও তাই বলেছি, কিন্তু তুমি এমনি পুরুষ, মনের কথা মুখে আনতে ত সাহস করলে না, কাজে দেখালে। আবার এখন তার জন্য আমাকে দোষী করছ। আমার কথায় হেমাকে পাঠাওনি ঠাকুর, সতীরাণীকে এতটুকু বিশ্বাস কর না বলেই পাঠিয়েছ!"

"আমাকে বিশ্রাম করতে দাও।"

"বেশ, আমার কথাতেই যদি হেমাকে পাঠিয়ে থাক, তা হ'লে বল, আমি একখানা ক্ষমাপত্র লিখে সে মাগীর কাছে পাঠিয়ে দিই।"

"কি আপদ, তুমি যে বাহিরের ঝড় ঘরে ঢোকালে দেখছি।"

"তবে আর কি, দুর্গা বলে বাইরের ঝড়ে ঝাঁপ খেয়ে পড়।" বলিয়া নির্ম্মলা চারুকে উপলক্ষ করিয়া আরও গোটাকতক তীব্র রহস্য স্বামীকে শুনাইয়া দিল। সেই সঙ্গে সে চারু যে ব্রজেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে অনাথিনী থাকিবে না, একথা দ্বিতীয়বার শুনাইতে কুণ্ঠিত হইল না।

কলহশেষে তার কথার সত্যতার নির্দ্ধারণে হেমার ফিরিবার প্রতীক্ষায় যখন নির্ম্মলা তার রোরুদ্যমানা কন্যাকে শান্ত করিতে নিজের শয্যায় চলিয়া গেল, তখন ব্রজেন্দ্র কতকগুলা ভাবনার আক্রমণের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে একান্ত অশক্ত হইয়া নিরুপায়ে—ঘুমাইয়া পড়িল।

(২৩)

স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্য আজ যেমন সে প্রয়োগ করিয়াছে, এরূপটি নির্ম্মলা এর পূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। করিবার যত প্রকার কারণ

থাকিবার থাকিলেও সে করে নাই। স্বামীর প্রতি কঠোর হইবার জন্য দুচার জন সমবেদনাময়ী মহিলা এমন কি তার সৎশ্বাশুড়ী কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও সে বরাবর মিষ্ট ব্যবহারেই স্বামীর কার্য্য উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। স্বামীর এই বেশ্যাসক্তির জন্য অন্তর তার সর্ব্বদা অসুখী থাকিত বলিয়া মুখে যে সে স্বামীর কাছে ভিখারিণীর মত করুণার আবেদন শুনাইবে, সে মেয়ে নির্ম্মলা আপনাকে কোনও কালে মনে করিতে পারে নাই।

তাহার উপর স্বামীর এই বিষম দোষেও সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, দোষটা যেন তার দেখিয়াও দেখিত না।

এরূপ করিবার তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাহার স্বামী এমন একটা বড় রকমের কুলীন যে, তার একটিমাত্র বিবাহ তখনকার অনেকটা পরি-বর্ত্তিত যুগেও তাহার সমাজে অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কেন না ব্রজেন্দ্র অন্যদার পরিগ্রহ করিতে নিরস্ত হওয়ায় তাহার পাল্‌টি ঘরের মধ্যে দুই চারিটা কন্যার আজীবন কুমারী থাকিবার অবস্থা হইয়াছিল।

তাহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল বিক্রমপুর। ব্রজেন্দ্রের পিতা নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি বিবাহসূত্রে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। শ্বশুর কর্তৃক প্রতিপালিত, শিক্ষিত শেষে তার সাহায্যে হাকিম হইয়াও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একাধিক বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁর শ্বশুর এরূপ কার্য্যে তাঁহাকে নিষেধ করিতে সাহস করেন নাই।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র আর বিবাহ করে নাই। নির্ম্মলার একাধিকার সুখ ভাঙ্গিয়া দিতে মাঝে মাঝে তাহার উপর সমাজের দিক হইতে এক একটা বেশ প্রবল রকমের আক্রমণ আসিত। তাহার শ্বশুর পর্য্যন্ত দুই একটা আক্রমণে এমন নির্দ্দয় ভাবে যোগ দিয়াছিলেন যে স্বামীর একমাত্র দৃঢ়তা ভিন্ন কিছুতেই সে সপত্নী-দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইত না।

সুতরাং আগেকার নির্ম্মল-চরিত্র কিন্তু তাহার ভাগ্যদোষে পদস্খলিত স্বামীর এ দোষটাকে নির্ম্মলা ততটা দোষের মধ্যে গণ্য করিত না। তার স্বামী ও কৃতবিদ্য। শুধু তাই নয়, হাইকোর্টের এটর্ণিগিরি করিয়া এত সে অর্থ উপার্জ্জন করে যে, তাহা হইতে বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াও যে টাকা সে নির্ম্মলার হাতে আনিয়া দেয়, তাই যদি সে রাখিতে পারে, তাহা হইলে পুত্র নালুবাবু মূর্খ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও পায়ের উপর পা দিয়া আজীবন বসিয়া খাইতে পারিবে। স্বামী যদি আর দুই একটা বিবাহ করিত এবং তাহাদের প্রত্যেকের পেটে দুই

একটি করিয়া ছেলে মেয়ে হইত, তা হইলে নালুবাবুর যা ক্ষতি হইত, নির্ম্মলা বেশ বুঝিয়াছে স্বামী চারুর মত দু চারিটা রক্ষিতা রাখিলে তার এক আনা ও ক্ষতি হইবে না।

স্বামীকে তীব্র তিরস্কার করিয়া নির্ম্মলার চিত্তটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তবে তার দুঃখের মধ্যেও একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। তার উপেক্ষার নীরবতা স্বামীকে অনুতপ্ত করিতে এতটা যে শাসন করিয়াছে, তাহা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। আজ আত্মহারা ব্রজেন্দ্রকে ঝড়ে ঘর হইতে কিছুতেই বাহির হইতে দিবে না বলিয়া কোমর বাঁধিতে সেটা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, স্বামী তার চরিত্রহীনতার জন্য অনুতপ্ত। তার আর চারুর গৃহে যাইবার ইচ্ছা নাই।

তবে বিনাপরাধে কেমন করিয়া স্বামী চারুকে পরিত্যাগ করিবে। চারুর রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্র নিজেইত উপযাচক হইয়া তাহাকে ধরা দিয়াছে। তাহাকে আয়ত্ত করিতে চারুর কত অবজ্ঞাত প্রেমিকের হা হুতাশ ও অভিশাপের কণ্টকময় বেড়া যে ব্রজেন্দ্রকে ভেদ করিতে হইয়াছে। সে কথা মনে করিলে, চারুর কাছে নির্ম্মলাকেইত মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে স্বামীকে অনুরোধ করাত পরের কথা। বিনাপরাধে এখন চারুকে পরিত্যাগ করিলেই বা তাহার স্বামীর মনুষ্যত্ব থাকে কই? স্বামীর সহিত কলহ করিতে গিয়া নির্ম্মলা বুঝিল, সে চারুকে পরিত্যাগ করিতে এখন কেবল তার বিশ্বাসঘাতকতার অপেক্ষা করিতেছে। হেমাকে পাঠাইয়াছে ব্রজেন্দ্র চারুকে আগলাইবার জন্য নহে, আর কেহ লুকাইয়া তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে কি না সেটা ও জানিবার জন্য। স্বামী ঘুমাইয়াছে, কিন্তু নির্ম্মলার ঘুম হইতেছে না। শয্যায় পড়িয়া হেমার মুখ হইতে একটা সুসংবাদের প্রত্যাশায় সে কেবল দেবতাকে মানত করিতেছে। হেমা ফিরিয়া যেই স্বামীকে বলিবে চারুর ঘরে মানুষ প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, অমনি সে হেমাকে ভাল রকম বক্‌সিস্ দিবেই, দেবতার জন্য ও ষোড়শোপচারের পূজার খরচ তখনি মাথায় ঠেকাইয়া সে বাহিরের ঝড়ের অবসানে ভিতরকার চিরাবরুদ্ধ ঝড়টাকেও গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দেবতার চোখের ও অন্তরাল করিবে।

(১৭)

দুপুর বাজিবার পর সে শুইয়াছে। একটা, দুইটা ঘড়ী তাহার ঘণ্টা দিয়া নির্ম্মলার অনিদ্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়া গেল। দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে

এক সময় জাগিয়া থাকিবার বিশেষ চেষ্টাতেও সে একটু ঘুমাইয়া পড়িল। ঘড়ীতে তিনটা বাজিতে তার শেষ শব্দটা পূর্ব্বের শব্দ ছুটার মত যেমনি নির্ম্মলার কাণের পাশ দিয়া নিঃশব্দে পলাইবার চেষ্টা করিল অমনি সে এক চমকেই বিছানার ওপর বসিয়া দেখিল, ঘরের আলোটা নিভিয়া গিয়াছে।

তার চারিদিকে দৃঢ় আবদ্ধ ঘরের জানালাসার্শির ফাঁকদিয়া ঢুকিয়া বাহিরের ক্ষীণ আর্ত্তনাদকারী ঝঞ্ঝাতরঙ্গ সেফ্‌টিল্যাম্পের আলোক শিখাটাকে যে খাইয়া ফেলিতে পারে এটা নির্ম্মলার মনে হইল না। সে বিছানা হইতে উঠিল, সংশয়ত্রস্ত-পদে স্বামীর পালঙ্কের কাছে উপস্থিত হইল, প্রথমে পাশে দাঁড়াইয়া নিদ্রিতের স্বভাবগভীর শ্বাসশব্দ শুনিতে একটুক্ষণ কান পাতিয়া রহিল, কোনও শব্দ শুনিতে না পাওয়া ঝড়ের দুষ্টামির জন্যও হইতে পারে মনে করিয়া হাত দিয়া বিছানাটা পরীক্ষা করিতে বুঝিল সেখানে স্বামী নাই।

তখন দুই হাত দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া দোরের কাছে উপস্থিত হইতেই সে জানিতে পারিল, বাহির হইতে দ্বারবদ্ধ করিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। তার যাওয়াটা বেশীক্ষণ না হইলেও নির্ম্মল এটা বেশ বুঝিল, চারুর বাড়ীতে যাইবার সমস্ত বিঘ্ন সে যেন সিন্দুকে পূরিয়া তালা বন্ধ করিয়াছে। ঘরের দুই দিকেই দোর, দুই দিকই প্রশস্ত বারান্দা ছিল। নির্ম্মলার স্বামীর নির্ম্মমতার সুনিশ্চিত একটা পরিমাণ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। এইবারে আবার নিজের শয্যার কাছে আসিল। বিছানার তলা হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া জ্বালিয়া দেখিল, কই স্বামী ত লণ্ঠনটা লইয়া যায় নাই। তখন সেটা জ্বালিয়া সে অন্তদিকের দোর খুলিল। খুলিতেই ঝড়ের তখনও পর্য্যন্ত প্রবলের অনুভূতির সঙ্গে স্বামীর মোহজবিচেষ্টা কল্পনার সমস্ত তীব্রতা দিয়া সত্যের মতন করিয়া সে গাঁথিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বামী তাকে শেষকালে কেবল কতকগুলা স্তোকবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছে।

এখন সে কি করিবে? অবজ্ঞাতার নৈরাশ্যের ভিতর নিশ্চিহ্ন নিমজ্জিত, পূর্ব্ব হইতেই তার অবসন্ন চিত্ত লইয়া কিই বা এখন সে করিতে পারে? স্বামী অনেকক্ষণ ঘর ত্যাগ না করিলেও, বাড়ী ছাড়িয়া পথে পড়িবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। আলোটা নিবিয়া যাইবার কারণ ও সে কল্পনার সাহয্যে নির্ণয় করিল। আলো থাকিলে পাছে তার চমকা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া স্বামীর যাইবার মুখে আবার সে তাকে ধরিয়া বসে, তাই তার তন্দ্রার উপরে ঘুমের প্রগাঢ়তা

ঢালিবার জন্য, অথবা ঘুম ভাঙ্গিলেও তাহার অনুসরণ পথটা দীর্ঘ করিবার জন্য স্বামী আলো নিবাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে আবার দোর আঁটিয়া শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু শয়ন করিতে গিয়া আবার উঠিয়া বসিল। অভিমান ঈর্ষ্যার মধ্য দিয়া পত্নীর যে পতি অনুরক্তি অতি গোপনে মনকে লুকাইয়া হৃদয় পথ দিয়া চলাচল করে, তার একটা অঙ্গুলি পীড়ন নির্ম্মলার শয়ন চেষ্টাকে কাতর করিয়া দিল।

"বৌদি!"

তার সৎশ্বাশুড়ীর ঘর দিয়া স্বামীর তত্ত্ব লইবার সঙ্কল্পে যেমন সে আবার দোর খুলিবার জন্য খিলটিতে হাত দিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা বাহির হইতে দোরের আঘাতের সঙ্গে শুভার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। শুভা তার সৎশ্বাশুড়ীর একমাত্র কন্যা।

নির্ম্মলা দোর খুলিল।

"তুমি কি দোর ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে বৌদি?"

"ডাকছিস্ কেন?"

"শিগ্‌গির এসো।"

"কোথায়?"

"দাদাকে ধরতে।"

যেটা সে আপনি আপনি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সে কাজে নির্ম্মলার প্রবৃত্তি আবার আপনি দমিত হইয়া গেল।

"কেন?"

"কেন, পরে বলব বৌদি, আগে তুমি তাঁকে ফিরিয়ে আনো।

"দরকার কি? আর তোর এ কি রকম আক্কেল শুভা, আইবুড়ো ধেড়ে মেয়ে ভাইকে আগলাতে এতরাত্রি পর্য্যন্ত জেগে রয়েছিস্!"

"তোমার জন্য বৌদি!"

"আমার জন্য তোর অত মমতার বাড়াবাড়ি করতে হবে না, তোর দাদা কোথায়?"

"এখনও বাড়ী আছেন—কোচোয়ানকে গাড়ী জুততে বলেছেন।"

"তুই কি সদর দোর পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিলি নাকি!" শুভার উত্তর পাওয়ার মুহূর্ত্তের বিলম্ব ও অসহনীয় বোধে নির্ম্মলা আবার বলিল, "ছি শুভা, কেউ যদি বাইরের লোক কোথা থেকে অন্ধকারে তোকে একা ঘুরতে দেখতো—"

"মা আমার সঙ্গে আছে।"

"বৌমা!" বলিয়াই শুভার মা নির্ম্মলার কাছে আসিয়া, শুভারই মত, তার স্বামীকে ধরিয়া আনিতে অনুরোধ করিল।

"ধরে লাভ কি মা?"

"লাভালাভ বোঝবার সময় নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্র রিভালবার নিয়ে যাচ্ছে।" এই এক কথাতেই সমস্ত বুঝিয়া নির্ম্মলা আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বামীকে নিরস্ত করিতে ছুটিয়া গেল।

শুভা ও সঙ্গে সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, মায়ের নিষেধে যাইতে পারিল না। এই সময় পুঁটিটা কাঁদিয়া উঠিতে তাহার যাইবারও উপায় রহিল না।

(২৮)

চাকর বিশু জাতিতে কাহার, বহুদিন হইতে চারুর গৃহে চাকরী করিতেছে। তাহাতে মাহিনা ছাড়া আরও পাঁচরকম উপরি রোজগারে কয়েক বৎসর হইতে এমন লুব্ধ হইয়াছে যে, এখন যদি কেহ জুতা মারিয়াও তাহাকে চারুর ঘর হইতে বাহির করিতে যায়, তাহা হইলেও সে তার মনিবনীর চৌকাট ধরিয়া উপুড় হইয়া সেগুলা নিঃশব্দে পৃষ্ঠস্থ করিবে, তবু চৌকাট হইতে হাত ছাড়িবে না। সে চারুর বাবুকে কেবল চারুর জন্যই বুঝে, সুতরাং এই নিমকভোজীর আখ্যাধারী নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধির চাকর যখন তার মনিবনীর কাছে শুনিল যে বাবু আসিলেও তাহাকে না জানাইয়া যেন সে দোর খুলিয়া না দেয়, তখন বাবুর চাকর হেমা যে আসিবা মাত্রই বিশুর কাছে দরজা খোলা পাইবে, এটা আমাদের বুঝিতে যাওয়া মস্ত ভুল।

হেমা যখন ঘরের উৎপাতে অস্থির হইয়া বারংবার দোরে ঘা দিয়া শীঘ্র তাহা খুলিয়া দিতে বিশুকে হুকুমের উপর হুকুম করিল, বিশু তখন তাহাকে বাহিরেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া তার 'মায়ী'কে খবর দিতে উপরে চলিয়া গেল। সুতরাং বাহিরে দাঁড়াইয়া হেমা যে শুধু 'বিশে'র উপর মর্ম্মান্তিক চটিল এমন নয়, বাবুর বিবির ঘরে যে দোসরা মানুষ প্রবেশ করিয়াছে এ বিষয়েও তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকায় তাহারও উপরে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতে লাগিল সারারাত জলে ভিজিয়া, শীতে জমিয়া যদি সেইখানে আজ তাহাকে মরিতে হয় তবু সেই উপচোরটাকে না ধরিয়া কিছুতেই সে দোর ছাড়িয়া যাইবে না।

ঝড় যেমন তাকে মাঝে মাঝে এক একটা সরস রহস্যের ধাক্কা দিতে লাগিল, তার সঙ্কল্পটাও সেই অনুপাতে দমে ভারী হইতে লাগিল।

কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের অধিকার পাইয়া চারুকে মনিবের পত্র দেখাইতে যখন সে তৎকর্ত্তৃক নীত হইয়া সে রাত্রির সেই নবাগত রক্ষকটিকে দেখিল, তখন সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। এযে তার মনিবেরই বাড়ীতে পূজারির কার্য্য করে। ঈর্ষায় ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু চারু সুষুপ্ত রাখুকে এত সন্তর্পণে একটিবারের মত দেখাইয়া, আবার তাহাকে এমন যত্নে অন্ধকারে ঢাকিয়া হেমার চোখের অন্তরাল করিয়া দিল যে, একান্ত নীরব হওয়া ভিন্ন একটা দীর্ঘশ্বাসেও তখন তার ক্রোধ প্রকাশের উপায় রহিল না।

দেখাইয়া চারু সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া হেমাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল, সেখানে তার দত্ত চিঠিখানা পড়িয়া প্রত্যুত্তরে একখানা চিঠি লিখিয়া হাতে দিয়া বাবুকে দিবার জন্য তাহাকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ করিল। হেমা সেখানে রাত্রিকালে থাকিবার কথায় বাবুর আদেশ জানাইলে বলিল থাকিবার তার কোনও প্রয়োজন নাই, যে হেতু তাকে রক্ষা করিতে ভগবান্ রক্ষক পাঠাইয়াছেন।

রাখুর সেখানে উপস্থিতির কৈফিয়ৎ চারু পরিস্কাররূপে দিলেও চাকরটা তাকে বিশ্বাস করিতে পারিত না, সুতরাং তাহার এ অর্থশূন্য ভগবানের দয়ার কথা সে একেবারেই বিশ্বাস করিল না। এটাতে বিশেষতঃ চারুর মমতাশূন্য ব্যবহারে তার দুরভিসন্ধিটাই সে নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইল।

রাখুর নিদ্রা ও কপট বলিয়া তার বোধ হইল। সেই দুর্য্যোগে বাড়ীতে ফিরা নিতান্ত সহজ না হইলেও, সে মনিবকে এই নিমকহারামীর কথা শুনাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছে যে, আকাশ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সেই মুহূর্ত্তেই চারুর ঘর তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ সেই ট্যানাপরা ঠাকুর—পূজা-করা ভিৎভিতে বামুনটার অদ্ভুত সাহস তার ভিতরে ঈর্ষ্যার আগুনটা এমন জাগাইয়া তুলিল যে, বায়ুর সজল ফুৎকারও তাহা নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, কেবল তার হাত পা মুখ চোখ—এমন কি সকল অঙ্গে কতকগুলা ক্রোধের সঞ্চালন যোগ করিল মাত্র।

তবে—নীচে আসিয়া দেখিল বিষেটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে এ সুযোগটা ছাড়া কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। বিশের ঘুমটার সঙ্গে তার দুই

একবার পরিচয় হইয়াছিল। বিশু নিজে নিমকহারাম না হইলেও, তার ঘুমটা মাঝে মাঝে নিমকহারামি করিত। যে রাত্রিতে তার কিছু উপরি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, সে দিন ঘুমটা তার বহিঃসংজ্ঞাকে এত জোরে চাপিয়া ধরিত যে ঢাকের বাদ্য তার কাণের কাছে তাণ্ডবনৃত্য করিলেও সে বিশুর কাণকে তার অস্তিত্ব জানিতে দিত না।

হেমচন্দ্র এ সুযোগটা ছাড়িতে পারিল না। সে মনে করিল, মনিবকে যদি এই নিমকহারামির কথা শুনাইতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়াই তাহাকে শুনাইয়া দিইনা কেন! সে তখন সদরে যাইবার পথের পার্শ্বে, যেখানে পূর্ব্বে চারু রাখুকে বসাইয়াছিল, সেই ধাপের উপর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

রাখু সিঁড়ির মাথায় চলিষ্ণু অন্ধকাররূপে এই হেমাকেই দেখিতে পাইয়াছিল। হেমচন্দ্র লুকাইয়া লুকাইয়া চারু ও রাখুর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছে। দেখিয়া উত্তরোত্তর বুকের ভিতর এত ঈর্ষার উত্তাপ সে সঞ্চয় করিয়াছে যে, যখন রাখুকে ঘরের মধ্যে পূরিয়া চারু সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করিল, তখন সে দৃশ্য একান্ত অসহ্য জ্বালায় উন্মত্তের মত করিয়া চারুর বাড়ী হইতে সেই বিষম দুর্যোগের ঘনতমসাচ্ছন্ন রাজ পথে তাহাকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিল।

যাহা দেখিয়াছে তাহার সঙ্গে যাহা না দেখিয়াছে কল্পনায় যোগ দিয়া হেমা তাঁহার মনিবকে চারু ও রাখুর রাত্রিবিলাসকাহিনী এমন করিয়া শুনাইল যে, ব্রজেন্দ্রের শিক্ষাসংযতচিত্ত ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। চারু রাখু উভয়কেই একসঙ্গে হত্যা করিবার জন্য ঈর্ষা-মত্ত ব্রজেন্দ্র যখন নিজের পরিণাম ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া রিভলবার খুঁজিয়া দিতে হেমাকে জেদের উপর জেদ, শেষে তীব্র ভাষায় গালি দিতেছিল, আর চতুর হেমা সেটাকে আগেই লুকাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অছিলায় বৈঠকখানা ঘরের সব আসবাব পত্র ওলটপালট করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই শুভা দাদার অনুসরণে সেখানে উপস্থিত হইয়া অন্তরাল হইতে সমস্ত কথা গুলা শুনিতে পাইল। শুনিয়াই ভীতি বিহ্বলা সে মাকে গিয়া সে কথা শুনাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

প্রেম-মুগ্ধা

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

১

দ্বারকার রাজভোগে তৃপ্তিহীন নারায়ণ,
পড়ে মনে ক্ষণে ক্ষণে মধুমাখা বৃন্দাবন!
কোথা সখা সখীদল, নিথর তমালতল,
যমুনার 'কল' গীতি,
বাঁশীর আকুল তান,
সকলি স্বপন হেন হ'ল যেন:অবসান।

২

মহিষীগণেরে তাই কন হরি অনুক্ষণ
"গোপী-প্রেম-মাধুরীতে পূর্ণ মোর প্রাণ-মন!"
সবিস্ময়ে ভাবে সবে, 'এত সুখৈশ্বর্য্য ভবে,
রাখালরাজার তবু
কেন চিত্ত উচাটন,
কিযে আছে গোপীপ্রেমে যার এত আকর্ষণ!"

৩

কে জানিবে সে সন্ধান—শ্যামের ব্যাকুল প্রাণ—
•কোথা ক্ষুদ্র কমলিনী কোথা রবি জ্যোতিষ্মান!
দিনে দিনে ক্ষীণ কায়, সারা হৃদি কারে চায়,
উৎকণ্ঠিতা সত্যভামা,
রুক্মিনী উন্মত্তা প্রায়।
সন্ধ্যার আঁধার নামে দ্বারকা ও মথুরায়!

৪

শ্রীকৃষ্ণেরে নিরখিতে একদা নারদ ঋষি
আসিলেন দ্বারকায় মাতাইয়া দশদিশি!

হেরি তাঁর ম্লান মুখ শুধাইলা কিবা দুখ,

কহিলেন লীলাময়—

"গুরু ব্যাধি—প্রতিকার—

একটুকু পদধূলি!—কেবা দিবে উপহার?"

৫

গোপী-কথা বিনে তাঁর অন্য কথা নাহি আর,

শুনি দেবর্ষির মনে লাগে বড় চমৎকার!

রোগ গ্রস্ত নারায়ণ, সম্ভব কি কদাচন?

"পদধূলি প্রতিকার"

এযে আরো সমস্যার!

তারপর "গোপী-প্রেম"—সেত নহে বুঝিবার!

৬

কি জানে প্রেমের কথা অবোধ আভীরবালা,

যার লাগি নিশিদিন এমন অধীর কালা

রাণীদের এত সেবা, কখন পেয়েছে কেবা,

তবু তৃপ্তি—শান্তি হীন,

তবু নিত্য এত জ্বালা!

মণিহারে কে করিল অতর্কিতে ফণি-মালা!

৭

সংশয়-দোদুল-চিত্তে দেবর্ষি চলিলা ফিরি'

নীরব মুখর বীণা, উড়ে জটা ধীরি ধীরি।

শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা লয়ে, উত্তরিলা দেবালয়ে,

ভেটিলেন একে একে

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে,

মাগিলেন "পদধূলি" শ্যামের আরোগ্য তরে!

৮

সসম্ভ্রমে কন তাঁরা "ক্ষিপ্ত তুমি হে নারদ!

ত্রিলোক অর্চ্চনা করে যাঁর পদ-কোকনদ,

তারে দিব পদ ধূলি ! দেবর্ষি ! গিয়েছ ভুলি'
আপনি পুরুষোত্তম
শ্রীকৃষ্ণের অবতার,
ব্যাধি তাঁর ? কি আশ্চর্য্য ! একি লীলা আরবার !"

৯

দেবর্ষি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরি করিলেন অন্বেষণ
কেবা দিবে পদধূলি শ্যাম-ব্যাধি-বিমোচন !
এস্ত সবে দ্বিধা ভরে, কেমনে সাহস করে,
ক্ষুদ্র নদী করিবারে
সিন্ধু-তৃষ্ণা নিবারণ !
পাবকে শুদ্ধতা দান শুনেছে কি কোন জন ?

১০

দেবর্ষি নিরাশ হয়ে ফিরিলেন দ্বারকায়,
শ্রীকৃষ্ণে কহিলা বিশ্বে পদধূলি মিলা দায় !
লীলাময় মৃদু হাসি সুধাইলা "ব্রজবাসী
একটুকু পদধূলি
দিল না আমারে হায় !
এমন নিষ্ঠুর তারা ছিল না যে ধারণায় !"

১১

উত্তরিলা মহামুনি "আমিত যাইনি তথা,
গোঁপ-গোপী-পদধূলি ভিক্ষা করা বাতুলতা !"
কহিলেন ভগবান, "অভিমানে যায় প্রাণ !
একবার হে দেবর্ষি !
দয়া করে সেথা যাও !
একটুকু পদরজঃ মোর তরে যদি পাও !"

১২

দেবর্ষি ত্যজিয়া কুণ্ঠা পশিলেন বৃন্দাবনে,
হেরিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে শত বর্ষ অদর্শনে

প্রেমভূমি মৃত প্রায়, প্রেতভূমি যেন হায়,
বিরহ-কাতর হৃদি
ব্রজবাসী উদাসীন,
কৃষ্ণ নাম জপি' শুধু যাপে দগ্ধ নিশিদিন !

১৩

নীরব তমাল কুঞ্জ, বাঁশরী বাজে না আর,
বহে না উজান আজি কালো বারি যমুনার '
ধবলী শ্যামলী নাই, কোথায় সুবল ভাই,
কায়াহীন ছায়া সম
আজি শ্যাম-বিনোদিনী,
মরমের ক্ষত-চিহ্নে খুঁজে শান্তি অভাগিনী !

১৪

অকস্মাৎ দেবর্ষির বীণা বাজে কৃষ্ণ নামে,
ক্ষণে যেন নব প্রাণ সঞ্চারিত ব্রজধামে !
ছুটে এসে প্রতিজন কহে "কোথা প্রাণ ধন"
দেবর্ষি জানায়ে পীড়া
চাহিলেন পদধূলি,
বজ্রাহত সবে যেন মর্ম্ম-গ্রন্থি গেল খুলি' !

১৫

প্রাণ-বঁধু রোগাকুল—পদধূলি প্রয়োজন—
কেমনে রহিবে স্থির কৃষ্ণ-প্রাণ গোপীগণ !
কহে সবে ব্যগ্র ভরে, "হে দেবর্ষি ! কৃপা করে
লও লও পদধূলি
যতটুকু চাই তাঁর !
বল বল আমরা কি যাব সাথে একবার !"

১৬

দেবর্ষি বিস্ময়ে কন "তোমরা পাগল হলে ?
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সব দিলে রসাতলে ?

শ্রীকৃষ্ণ গোলকপতি, বিশ্বের পরম গতি
তাঁরে দিতে পদধূলি
চাহ সবে অকাতরে !"
অনন্ত নরক-ভীতি ভুলিলে কেমন করে !'

১৭

করযোড়ে সবে কয় "হে প্রভু ! হে দয়াময় !
জানি না নরক স্বর্গ পাপপুণ্য কারে কয় !
মোদের সর্ব্বস্ব সার, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমাধার,
মোরাও যে সব তাঁর,
ধর্ম্মকর্ম্ম সব তিনি।
কোথায় গোলক আর কেবা পতি নাহি চিনি !"

১৮

"লও লও পদধূলি"—কহে সবে আরবার—
"ভেট ত্বরা প্রিয়তমে ঘুচাও যাতনা তাঁর !"
গোপীগণ কথা শুনি, স্তম্ভিত নারদ মুনি,
কি গভীর কৃষ্ণ-প্রীতি,
কিবা আত্ম-সমর্পণ !
বুঝিলেন "গোপীপ্রেম" মুগ্ধ কিসে নারায়ণ !

রাজনীতি ও ধর্ম্ম।

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ]

ধর্ম্ম যখন কোন একটা বিশেষ জিনিষ বা প্রণালীর উপর নির্ভর করে তখনি সেটা সমস্ত লোকের ধর্ম্ম না হয়ে শ্রেণী বিশেষের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি আমি বলি, হেটমুণ্ড হয়ে গিরিগুহায় গিয়ে ভগবানের চিন্তায় রত থাকাই একমাত্র ধর্ম্ম, তা হলে দু চার জন মানলেও মানতে পারে কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ তা কখনই মানতে রাজী হবে না। ভারতবর্ষ জোর করেই বলবে—"স্বভাবো অধ্যাত্ম।" যে প্রেরণার বশবর্ত্তী

হয়ে বুদ্ধ রাজ্যধন পরিত্যাগ করে—"ইহাসনে শোষ্যতু মে শরীরম"—(এই আসনেই আমার শরীর শুকিয়ে যাক্) এই পণ করে দীর্ঘ ছয় বৎসর কঠোর সাধনায় রত হয়েছিলেন, যে প্রেরণার বশবর্ত্তী হয়ে রাণা প্রতাপ সমস্ত পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় গিরিগুহায় দিনাতিপাত করেছিলেন, সেই স্বভাব, সেই সহজ প্রবৃত্তি, যার জোরে মানুষ সাধারণের চোখে যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করে তোলে তাই মানুষের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ কেমন করে ভুলবে ভগবানের বাণী—"সহজং কুরু কর্ম্ম কৌন্তেয়!" যে কর্ম্মের মধ্যে মানুষ সমস্ত মন প্রাণ অতি সহজে ঢেলে দিয়ে আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে উঠে, তা যত কঠিনই হক তার পক্ষে তা আহার বিহারের মত সহজ ও সরল। ৭২ দিন অনাহারে থেকে জীবন পাত করা আইরীস বীর ম্যাকসুইনির পক্ষে চব্য চোষ্য লেহ্য-পেয় খেয়ে জীবন ধারণ করার মত সহজ হয়েছিল।

তাই যেমন ভারতবর্ষ—একদিকে নির্জ্জনে ধ্যান নিরত যতিদিগকেও শ্রেষ্ঠাসন দিয়েছে অপর দিকে "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" এই আদর্শকেও তেমনি স্থানই দিয়েছে।

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"

ইহাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুত্বের মধ্যে একত্ব এই আদর্শই বরাবর ভারতবর্ষে স্থান পেয়েছে। সৃজন পালন ও সংহার এই ত্রিমূর্ত্তিতেই ভারতের ভগবান ভারতের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। মা অন্নপূর্ণাও ভারতের মা, কঙ্কালবদনী কালীও ভারতের মা, ইহাই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষকে বিচার করতে হলে এসব ভুললে চলবে না।

কিন্তু মানুষের এমনি স্বভাব যে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির গণ্ডী দিয়ে একটা অচলায়তনের বেড়া দাঁড় করিয়ে তোলে। আর দেশের যখন অবনতি হয়, যখন স্বাধীন চিন্তার অভাব হয় তখন সব দিকে তা দেখতে পাওয়া যায়। তাই অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে মঠে শুনতে পাই আমরা সাধু সন্ন্যাসী, রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই রাজনীতিকে যেন একটু তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয়, তাঁরা যেন মনে করেন রাজনীতি শঠতারই অপভ্রংশ মাত্র। তবে একথা সত্য পাশ্চাত্যের রাজনীতি দেখে বিচার করতে গেলে অনেকটা সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয়। কিন্তু স্বামী রামতীর্থের

কথায় বদ্ধজলে যেমন শেওলা গজায় তেমন ভারতবর্ষে ৫৬ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী গজিয়ে উঠেছে, অবশ্য মাঝে মাঝে সুন্দর মনোনয়নাভিরামকর পদ্মফুলও ফুটে রয়েছে, তাই বলে কি সাধু সন্ন্যাসীরা সাধু হওয়ার বিরুদ্ধ মত প্রচার করে। যদি কোন এক যায়গার অধিকাংশ লোক ভগবানের পূজা করে ডাকাতি করতে বার হয় তবে কি বলতে হবে ভগবানের পূজা করাই অন্যায়? আজ রাজনীতি শঠের হাতে পড়ে শঠতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে বলে কি রাজনীতিকে পরিত্যাগ করাই ধর্ম্ম হবে? আজ যদি আমার চোখ কুৎসিৎ দৃশ্য দেখে তবে কি তাকে উৎপাটিত করে দেওয়াই ঠিক হবে, না তাকে সংযত করে ক্রমশঃ সবার মাঝারে যে ভগবানের বিরাট রূপ তা দেখতে পারে তাই করতে হবে। অবশ্য অস্বীকার করবার জো নাই যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ রাজনীতিবিদ্ পাশ্চাত্য রাজনীতিকেই রাজনীতি বলে মনে করেন—তাই বলে কি ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তাকে খণ্ডরূপে দেখতে হবে, তাই বলে কি রাজনীতিকে তার প্রাপ্য আসন থেকে সরিয়ে দিতে হবে!

বহুদিনের সংস্কারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মন্দিরে যদি শুধু এই ভাবটা নিবদ্ধ থাকতো তা হলে বিশেষ কিছু বলবার থাকতো না। কিন্তু এ ভাব যেন ভারতের জাতীয় জীবনের ধমনীতে মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় প্রবেশ করেছে। এই সঙ্কীর্ণতার হাত হতে পরিত্রাণ পেতে হলে বর্ত্তমান আন্দোলনকে একটু ভাল করে বুঝতে হবে। ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর ভীরুতার উপরই বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত। তাই এই আন্দোলন কি "সর্ব্ব প্রদানেষু অভয় প্রদানম্" তার সাকার রূপ নহে! আজ সমস্ত ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে অসমর্থ; যদি এই আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে পারে তাহা কি ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হবে না! এই শাসনের ফলে বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা বিদেশে যায় তার ফলে ভারতবর্ষ আজ অনাহার ও অনশন প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষ তার নিত্য-সহচর। ভারতের সব থাকতেও সে আজ ভিখারীবেশে দণ্ডায়মান। আমাদের দেশে খাদ্যের দুর্ভিক্ষ হয় না, অর্থের দুর্ভিক্ষ হয়। মনে পড়ে ১৯১৫ সালে যখন ত্রিপুরা জেলায় দুর্ভিক্ষ ও বন্যা-প্রপীড়িত স্থানে কর্ম্ম করিতে যাই তখন চাউলের মণ ৫৲ টাকা ছিল এবং লোকজন তাহাই কিনিতে অসমর্থ। সুজলা সুফলা বাংলাদেশে আজ ত্রিপুরা, কাল বাঁকুড়া, পরশু খুলনা এইতো আমরা দেখে আসছি। এই অনশনক্লিষ্ট

লোকদের মুখে একমুঠা অন্ন দেওয়া তো সকলেই ধর্ম্ম মনে করে, দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা সকলেই ভাল মনে করে, তবে কেন যাতে দরিদ্র নারায়ণ দেশে না জন্মায় তার চেষ্টা করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হবে না! চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে রোগ হলে তার প্রতীকারের চেষ্টার চেয়ে রোগ যাতে না হতে পারে সে বিধান করাই প্রকৃষ্ট।

ইহাই তো রাজনৈতিক আন্দোলন। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিধানের জন্যই রাজনীতি, তা যদি ধর্ম্ম না হয় তবে তো ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শুধু একদল নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে মানুষ ভুল পথ ধরতে পারে, তা ত জগতের সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই রাজনীতিকে ধর্ম্মহতে পৃথক করে দেখা আমাদের সঙ্কীর্ণতা। যে দিন ভারত উন্নতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় ছিল সে দিন সে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়ায় নাই। প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র হিন্দুর কাছে ভগবানের অবতার, তিনিই তো রাবণের নিকট হতে রাজনীতি শিক্ষা করেছিলেন। তাতে তাঁর ভগবানত্বের হানি হয় নাই। আমরা অক্ষম দুর্ব্বল তাই এই রাজনীতি বিভীষিকা, আবার অপর দিকেও যে ধর্ম্ম বিভীষিকা আছে এই উভয়ই দূর করতে হবে। ধরতে হবে, মানতে হবে সেই ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তাকে যেখানে ধর্ম্ম রাজনীতিকে বাদ দিয়ে নয়, যেখানে রাজনীতি ধর্ম্ম, শঠতা নয়। তবেই আবার ভারতের ধর্ম্ম জীবন্ত হয়ে উঠবে, জাগ্রত হয়ে উঠবে, তবেই তার রাজনীতি পাশ্চাত্য রাজনীতির কলঙ্ক কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে শারদ চন্দ্রমার ন্যায় স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে জগৎকে আনন্দ দেবে। আমরা জানি এই সামঞ্জস্যই ভারতের মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

কালের মহিমা অনন্ত। কাল অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া দেয়, অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি আনে। কালের মহিমায় অপ্রিয়ের স্মৃতিও প্রিয় হইয়া ওঠে।

মোটের উপর অতীতের স্মৃতি বড় মিঠে, যেন বীণার তারের সুপ্ত ঝঙ্কারের মত আঘাত করিলেই মধুর ভাবে ঝঙ্কারিয়া ওঠে।

অনেক সময় অতীতের স্মৃতি বড় পীড়াদায়ক। কিন্তু সে পীড়া বোধের মধ্যেও যেন সুখ থাকে। তখন যে চিত্তের মর্ম্ম স্থানটি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া যায়। সে সময় যে নিজের সহিত বড় নির্জ্জনে বড় গোপনে আলাপ হইতে থাকে।

সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা যেন জীবনভোর আমাদের সহিত রঙ্গ করে, কিন্তু একান্তভাবে কোনটাই বহুদিন স্থায়ী হয় না সবি যায় কেবল স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট থাকে।

স্মৃতিপটে অনেক ছোট জিনিষ বড় হয় ও বড় জিনিষ ছোট হইয়া যায়, আবার অনেক জিনিষ মনের কোণে এমনি ডুব মারে যে খুঁজিয়া পাওয়া দায় হয়।

বারানসী ষড়যন্ত্র মামলায় আমার সাজা হয়। ১৯১৫ সালের ২৬শে জুন ধরা পড়ি ও ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ই তারিখে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডপাই ও সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কিছু দিন কাশীর জেলে থাকিয়া আগষ্ট মাসে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হই। ১৮ আগষ্ট আন্দামানের জেলে আসিয়া প্রবেশ করি। পুনরায় ইচ্ছাময়ের অভিপ্রেতানুসারে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্রাটের ঘোষণা পত্রানুসারে মুক্তি লাভ করি।

এই কয়েক বৎসর লইয়াই আমার বন্দীজীবন। এই বন্দীজীবন অবলম্বন করিয়া যে সংস্পর্শে বন্দী হইয়াছিলাম তাহারও কতকটা পরিচয় দিব ইহাই আমার অভিপ্রায়। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ যাহাতে ঠিক মত লিখিত হইতে পারে এই সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়াই আজ লিখিতে বসিয়াছি।

ভারতের অদৃষ্ট এক সুমহান সন্ধিক্ষণের ভিতর দিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে সে ভীষণ বিপ্লব কাহিনী। নিয়তির গোপন ডাকে আপনার সুনির্দ্দিষ্ট পথে অথচ যেন মনে হয় নিজের খেয়াল মত ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া ফিরিতেছে আমিও সেই নিয়তির বশেই ঐরূপ একটি ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম।

আমার মত আরও কত যুবক স্বীয় মর্ম্মকোণের অব্যক্ত বেদনায় চঞ্চল হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিধাতার অভীষ্ট সাধনের জন্যই দলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; সেই দলের অভ্যন্তরীণ পরিচয় যাহা কর্ম্মের বাহাড়ম্বর মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবার বাসনা

হৃদয়ে বহুদিন যাবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আজ তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস করিতেছি।

ঘটনাকেই অনেক সময় আমরা বড় করিয়া দেখি, কিন্তু ঘটনার অন্তরালে যে মহাশক্তির খেলা থাকে, তা সে যত ক্ষুদ্র ঘটনাই হউকনা কেন, তাহা যে ঘটনার চাইতেও বহু মূল্যবান্ ইহা আমরা ভাল করিয়া বুঝি না। সফলতার মোহ প্রতি পদে আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। সে মোহ বিচার দ্বারা ছিন্ন হইলেও প্রাণ সে মোহাবেশ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বড় বড় ঘটনার চাইতেও জীবন-যাপনের ছোট খাট খুটিনাটিও ছোট নহে। ঘটনাটার সূত্রপাত চিন্তাজগতেই হইয়া থাকে।

এই উপলক্ষে ব্যক্তির চরিত্র আলোচিত হইলেও উহা ব্যক্তিগত ভাবে করা হইবে না। ব্যক্তির পরিচয় ব্যতিরেকে সমষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই জন্য ব্যক্তির চরিত্রের আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

এই পরিচয় দিতে গিয়া নিজের ও নিজের দলের বহু ছিদ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাই বলিয়া কি যে সকল দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা অন্তরে অন্তরে আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে গোপন রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিব? ব্যর্থ ত হইবেই, কারণ একদিন না একদিন সত্য ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আর গোপন করিতে গেলে কেবল যে সত্যের অপলাপ করা হইবে তাহা নহে তাহাতে আমাদের পঙ্গুত্ব আরও বাড়িয়া যাইবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" কথাটির সার্থকতা বুঝিতে পারি নাই।

পূর্ব্ব-পরিচয়।

(১)

কলিকাতা রাজাবাজারে একটি ছোট্ট দুইতলা খোলার ছাতের বাড়ী ছিল। দেখিলে মনে হয় যেন গরীবদিগের আবাস স্থান। ইহা ট্রাম conductor বা ঐরূপ জাতীয় লোকদিগের মেস ছিল। ইহারই উপর তলায় একটি ঘরে শ্রীশশাঙ্কমোহন হাজরা নামে একটী যুবক থাকিতেন। তিনি যখন ধরা পড়েন তখন বোমার খোলের সহিত যোগ ও সাধন বিষয় কয়একটি প্রবন্ধও তাঁহার ঘর হইতে পাওয়া যায়। বিচার কালে কোনও বাবু ঐ প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বলেন যে ওগুলি কেবল ছলনা মাত্র, লোকদিগকে বিপথগামী করিবার

একটি উপায়। আমরা কিন্তু জানি তাহা মোটেই নহে। আমরা সত্য সত্যই ঐ সাধন জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভগবানই যে সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা ইহা আমরা কেবল মুখেই বলিতাম না, সত্য সত্যই গভীর শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিতাম। স্বীয় কর্ম্মোদ্ধারের জন্যই কেবল ভগবানকে টানিয়া আনিতাম না, ভগবানের অধিনায়কত্বের বিষয় লইয়া আলোচনায় ও ভাবনায় কতদিন এমন কি কত রাত্রিও অতিবাহিত হইয়াছে।

এই যে মহা আন্দোলন ভারতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে আমরা বিশ্বাস করি, ইহাও সেই তাঁহারই ইঙ্গিতে সাধিত হইতেছে। যে ভাবের অব্যর্থ প্রেরণায়-ভারতের শত শত যুবক মরণ বরণ করিয়া বিষম বিপদের মুখেও কৌতুকে অগ্রসর হইয়াছেন, সে প্রেরণার বলে তাঁহারা অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ধীর সংযমীর ন্যায় সহ্য করিয়াছেন, এই ভাবের বন্যা কি কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা দেশে আনীত হইয়াছে? না ইহার স্থায়িত্ব কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মত অথবা মরণ বাঁচনের উপর নির্ভর করে?

যখন নিতান্ত বালক ছিলাম তখন হইতেই স্বদেশ উদ্ধারের সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। ইহা ত আমি কাহারও নিকট হইতে পাই নাই। ইহা আমার প্রাণে প্রাণে অত অল্প বয়সে কে বলিয়া দিল? বাল্যকাল হইতেই যে এই বিষয় লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তখনও ত স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত পর্য্যন্ত হয় নাই। আর কেবল যে আমার মনেই এইরূপ ছিল তাহা নহে। পরিণত বয়সে অনেকের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মত দেশে আরও অনেকেই আছেন। যেন মনে হয় আপনার অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য ভগবান পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিয়া আসিতেছেন।

(২)

১৯১৫ সাল ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ সালে বিপ্লবের যে বিরাট আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়, এত বড় আয়োজন, ৫৭ সালের মহা বিপ্লবের পর এক পাঞ্জাবের কুকা বিদ্রোহ ছাড়া আর হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই চক্রান্ত ধরা পড়িবার পরই "ভারত রক্ষা" আইনের পত্তন হয়। তদানীন্তন হোম মেম্বর ক্র্যাডক সাহেব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত আইনের প্রস্তাব উত্থাপন কালে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বলেন—

"We had had anarchism for a long time in Bengal, but the situation in the Punjab was serious, in Bengal it was less so" যথার্থই ভারতের অবস্থা সে সময় নিতান্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে বাঙ্গলার বিষয়ে ক্র্যাডক সাহেবের অভিজ্ঞতা সে সময় অল্পই ছিল। কিছুদিন পরে ক্র্যাডক সাহেব স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের বিপ্লব-পন্থীদিগের সহিত বাঙ্গলার যোগাযোগ সম্বন্ধে প্রথমে তাঁহাদিগের যে ধারণা ছিল পরে সে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়।

উত্তর ভারতের বহু ষড়যন্ত্র মামলাতেই অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অনেকের ধারণা ঐ সকল কথার অধিকাংশই মিথ্যা। অনেকে আমায় বলিয়াছিলেন যে পুলিশ সব মিথ্যা সাজাইয়া কেবল মকর্দ্দমা খাড়া করিয়াছে। সত্য সত্যই দেশে ওরূপ কিছু হয় নাই। ইঁহাদের এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে অন্তর-জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকিতাম। মনে করিতাম দেশবাসীর আত্মশক্তিবোধ এতই লোপ পাইয়াছে যে তাঁহাদের স্বজাতীয়েরা ঐরূপ কিছু করিতে পারেন ইহা তাঁহাদের ধারণাতেই আসে না। কিন্তু অন্তরের অসহিষ্ণুতায় মনের কথা ত খুলিয়া বলিতে পারিতাম না, সেই জন্য জ্বালা আরও বেশী বোধ হইত। কোমাগাটা মারুর শিখ যাত্রিদিগকে কানাডায় অবতরণ করিতে না দেওয়ায় তাঁহাদিগের মনে যে আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহারই অগ্নিকণা যখন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল ভারতের একপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া তাহাই আমরা আশায় বেদনায় চঞ্চল হইয়া অসহিষ্ণুর মতই নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। পাঞ্জাবে যাঁহারা আমাদিগের লোক ছিলেন তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে কোমাগাটা মারুর যাত্রীরা দেশে পদার্পণ করিলেই যেন তাহাদিগকে দলে টানিয়া লওয়া হয়।

কোমাগাটা মারুর যাত্রীরা দেশে পদার্পণ করিতে করিতেই এক মহা কাণ্ড হইয়া গেল। আমাদের আশা আরও বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কানাডা ও ক্যালিফর্ণিয়া হইতে দলে দলে আরও কত শিখ আসিতে লাগিল। এই সকল দল ভারতে আসিবার পথে স্থানে স্থানে নামিয়া শিখ পুলিস ও শিখ রেজিমেণ্টে যাইয়া বিপ্লবাগ্নি ছড়াইতে ছিলেন। ইহার বহুদিন যাবৎ ভারতের বাহিরে থাকায় গোপনে কিরূপে ষড়যন্ত্র করিতে হয় তা মোটেই জানিতেন না। তাই প্রকাশ্য ভাবে জাহাজে জাহাজে, বন্দরে বন্দরে, ইঁহারা বিপ্লব-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে আসিতেছিলেন। ইহারই ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট

সতর্ক হইয়া যান। যেমন যেমন শিখদল স্বদেশে আসিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন তেমন তেমন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতেও তাঁহাদের রীতিমত অভ্যর্থনা হইতে লাগিল। এইরূপ একটি দলের প্রায় তিন শত ব্যক্তিকে সোজা মুলতান জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাঁদের অনেককেই সরকার বাহাদুর নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করেন। ইহাদের অনেকের নিকট বহু অর্থও ছিল। ইহারা আমেরিকায় কএকবৎসর ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা প্রায় সবই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এসব টাকা সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন। ইহাদের একজনের নিকট প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ছিল।

অনেকে আবার স্বীয় উপার্জ্জিত সকল অর্থ ই California যুগান্তর আশ্রমে দিয়া আসিয়াছিলেন। যে সকল দল সরকারের নজর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন তাঁহারা আসিয়া পাঞ্জাবে দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন। শিখদিগের ধর্ম্ম মন্দিরগুলির নাম গুরুদ্বারা। এই সকল জায়গায় শিখদিগের পুরোহিতগণ বাস করেন। ইঁহাদিগকে শিখগণ গ্রান্থীজি বলেন। এক একটি গুরুদ্বারা এক একজন গ্রান্থী আছেন। এই সব গুরুদ্বারা গুলিই বিপ্লবপন্থী শিখদিগের সম্মিলন কেন্দ্র হয়। এইরূপ একটি গুরুদ্বারায় বসিয়াছিলাম। একটি শিখ আসিয়া খবর দিলেন আজ অমুক অমুককে অমুক গুরুদ্বারায় ঢুকিতে দেখিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছি। অল্পক্ষণ পরেই দেখি সেই দলের মুখ্য ব্যক্তিগণ আমাদের গুরুদ্বারায় আসিয়া উপস্থিত। অর্থের কথা উঠিতেই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা গোল গোল বড় বড় সোণার চাকতিগুলি আমাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। আমেরিকার স্বর্ণমুদ্রাগুলি গুণিয়া দেখা গেল প্রায় সহস্র মুদ্রা। প্রত্যেক দলই এইরূপ করিয়াছিলেন। বিপ্লব কার্য্যে অকাতরে স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ দান করিতে ইঁহাদিগকে যেমন দেখিয়াছি বাঙ্গালা দেশে সেরূপ দেখি নাই। অবশ্য আমেরিকা ফেরত শিখদিগের মধ্যেই এরূপ উৎসাহ ও আন্তরিকতা দেখিতে পাই। তা ছাড়া পাঞ্জাবের অন্য অধিবাসিরা প্রায় কেহই ইঁহাদের সহিত সহানুভূতি দেখান নাই। কেবল পাঠান ও শিখ সৈনিকের সহিত ইঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তবে শিখ জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনাপ্রসূত একতা ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা ঢের বেশি।

যাহারা আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই তথায়

কুলি মজুরের কাজ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয় তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় চাযের কাজ করিয়া বেশ ধনী হন।

ইঁহাদের বহু আত্মীয় স্বজনেরা ভারতের সৈনিক দলভুক্ত ছিলেন। ভারতে আসিয়াই ইঁহারা সৈনিকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময় বাঙ্গালার সহিত পাঞ্জাবের সংযোগ সাধিত হয়। অনেক গুণ থাকিলেও ইঁহাদের organising power বাঙ্গালাদেশের মত ছিল না। বাঙ্গালার সহিত সংযোগের পর হইতে বেশ সুসম্বদ্ধরূপেই কার্য্য আরম্ভ হয়। উত্তর ভারতের প্রায় সকল সৈনিকাবাসেই আমাদের লোকের যাতায়াত আরম্ভ হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বান্নু হইতে আরম্ভ করিয়া দানাপুর পর্য্যন্ত কোনও সৈনিকাবাস বাদ দেওয়া হয় নাই। প্রায় সকল রেজিমেণ্টই কথা দেন যে প্রথমে তাঁহারা কিছুই আরম্ভ করিবেন না তবে বিপ্লব আরম্ভ হইলে বিপ্লবকারিদিগের সহিতই যোগ দিবেন ইহা নিশ্চয়। কেবল লাহোর ও ফিরোজপুরের রেজিমেণ্ট সর্ব্বপ্রথমেই কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রতিশ্রুত হন। সরকার বাহাদুর কিন্তু প্রথম এতটা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই যে ষড়যন্ত্রকারীরা এত গভীর ভাবে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছে। তা না হইলে এত দূর অগ্রসরই হইতে পারা যাইত না। বাঙ্গালার পুলিশ বিভাগের একজন deputy superintendent তাঁহার একটি গুপ্ত চরকে এই দলে ঢুকাইয়া দেন এই ত্রিপাল সিংহই শেষে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। ক্রমশঃ

তাই এত ভালবাসি

[শ্রীচারুবালা দত্ত গুপ্তা]

(১)

শশী জিনি' তব আঁখি মনোরম
　　ঢল ঢল রূপরাশি
হাসিটী তোমার জোছনা মধুর
　　নিখিল আঁধার নাশি',
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
　　তাই এত ভালবাসি।

(২)

(তুমি) অমল সরসে কুমুদ কমল
বিকচ আনন শশী,
অলক্ত রঞ্জিত নধর অধর
তরুণ অরুণ হাসি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৩)

উছলে যুমনা দিগ দিগন্তর
মধুর সুতানে বাঁশী,
গগনে পবনে অসীমে সসীমে
চপলা ঝলকে হাসি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৪)

জলদবিহীন সুনীল অম্বর
শরত প্রভাত হাসি,
শ্যামল শোভন নধর বরণ
ঝুমুকা কুসুম রাশি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৫)

পূরব গগনে উষার মাধুরী
অধরে অরুণ হাসি,
সু-পীত বরণ বসন শোভন
ফুটন্ত অতসী রাশি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

চন্দ্রাবাই

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।]

(১)

সেদিন বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘগুলি সন্ধ্যার আকাশে একটা গভীর বিষাদের ছায়া আঁকিয়া দিতেছিল; বিরহবিধুরা সন্ধ্যারাণীর বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে একটা অবসাদের যবনিকা পড়িয়াছিল, দূরে কোন্ গ্রাম্য পথ হইতে বিরহের করুণ-রাগিণী ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। এমনতর চিত্তচাঞ্চল্যের সময়ে বিরহ মথিত হৃদয়ে—"এ ভরা বাদরে, এ মাহ ভাদরে শূন্য মন্দিরে মোর" বসিয়া থাকিতে বড় বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল; তাই মনটা একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য বন্ধুবর অধ্যাপক বসন্তকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমাদের আশৈশব বাল্যবন্ধু সুশীলচন্দ্রকে দেখিয়া খুব আনন্দিত ও চমৎকৃত হইলাম। অনেকদিন হইতে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সম্প্রতি তাঁহার বাসস্থানের কোনও সন্ধান না জানায় সে ইচ্ছা পুর্ণ হয় নাই। আজ না চাহিতে জল পাইয়া চাতকের মত বিশেষ পুলকিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া বড় ব্যথিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সুশীলকেত আমরা বাল্যকাল হইতেই ভালরকম চিনিতাম, তাঁহার ন্যায় হাস্যরসিক বন্ধু জীবনে আর কখনও পাই নাই। তাঁর সদাপ্রফুল্ল হাসিভরা মুখ দেখিয়া কত দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা পাইয়াছি, কত বুক ভাঙ্গা ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছি। কই এমনত তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাই তাঁহার এই অচিন্তিত ভাব—পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাদের বিস্ময়ের কারণটাও কম ছিল না। যাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও অন্যমনস্ক দেখি নাই, কলেজের প্রফেসার আসিতে বিলম্ব হইলে সমস্ত ক্লাসটি যাহার গল্পগুজবে সরগরম হইয়া থাকিত, আজ সহসা তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্যের রেখা দেখিলে স্বতঃই একটা উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথমে কোন উত্তর পাইলাম না, কিন্তু আমাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অথবা তাঁহার আবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"কে বলে স্ত্রী পুরুষে নিষ্কাম বন্ধুত্ব সম্ভবে না? জীবনে মাঝে মাঝে মানুষ প্রেমের এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছে, যেখানে স্বার্থের কলুষ নিশ্বাস

বহিয়া প্রণয়ের পেলব কুসুমটিকে ম্লান করিয়া দিতে পারে না, যেখানে কামনার দুষ্টগন্ধ উঠিয়া প্রণয়ের স্বভাবসুন্দর আবহাওয়া নষ্ট করিয়া দেয় না। এমন এক প্রীতির গ্রামে যখন মানুষ উঠিতে পারে, তখন সে সেই অচ্ছেদ্যপ্রীতি-বন্ধনের ভিতর দিয়াই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, প্রভাতের আলো, আকাশের নীলিমা এবং তাহার মাঝে ইন্দুর হাসি উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই তাহার নিষ্কাম সখ্যভাব সম্ভবপর। আমারি জীবনে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। অহঙ্কার করিতেছি না, আপনাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বড় বলিতেছি না, কিন্তু সত্যি সত্যি মঙ্গলময় ঈশ্বরের এক অখণ্ডবিধানে আমার হৃদয়ে সে নবভাবের ধারা বহিয়াছিল। এখনও আমার সেই অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় সুখশান্তি লইয়া বর্ত্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

"সেবার এম্ এ পরীক্ষা দিয়া কয়েকটা মাস পশ্চিমে বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম। তারপর আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই। হয়ত তোমাদের মনে আছে আমি প্রয়াগে যাইবার জন্য বড় উৎসুক ছিলাম। এলাহাবাদে আমার এক আত্মীয় থাকিতেন, তাঁর কাছে কিছুদিন থাকিয়া এলাহাবাদ সহরটা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিব ভাবিলাম,তারপর যা হক কপালে থাকিলে আগ্রা দিল্লীটাও বেড়ান হইতে পারে। কিন্তু আসলে আমরা যেমনটি ভাবি তা সেই লীলাময় ঠাকুরটির ইচ্ছায় ঠিক তেমনটি হয়ে উঠে না। আমরা মনে করি আমরা যা স্থির করিব তা যেন কবিতার মিলের মত, ছন্দের গতির মত একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসরণ করিবে; কিন্তু তাহা না হইয়া মাঝে মাঝে কোথা হইতে একটা যতিভঙ্গ একটা বেসুরা ধ্বনি আসিয়া পড়ে। আমার ভাগ্যেও ঠিক এমনিতর হইয়াছিল। তখন কিছুদিন পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড ঝড়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইবার রেলওয়ে লাইনটা স্থানে স্থানে খসিয়া গিয়াছিল। কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতায় উহা কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতে পারে নাই। ঠিক মধ্যরাত্রে দুইটি ট্রেণ দুধার দিয়া আসা যাওয়া করিতেছিল, হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম, চারিদিকে ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্যে এইটুকু বুঝিলাম যে দুইটি ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়াছে। আমি একলা মানুষ, সঙ্গে জিনিষপত্র তেমন কিছুই ছিল না, চেষ্টা চরিত্র করিয়া নামিয়া পড়িলাম। রাত্রি অধিক হইয়াছে, কিন্তু তখন জ্যোৎস্নাপক্ষ; জ্যোৎস্নাপ্লাবনে উচ্চাবনত বনভূমি হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম জনমানবের চিহ্নপর্য্যন্তও নাই কেবল অদূরে বনপক্ষীর কলধ্বনিমাত্র শোনা যাইতেছে।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, একস্থানে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ঈষৎ চলিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল। অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম যেন সেই কৌমুদীপ্লাবিতা কাননকুন্তলা বনভূমির উপর বনদেবী অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা যেন সেই উজ্জ্বল নিশীথে নক্ষত্রলোকবিচারিণী কোন জ্যোৎস্নাবালা ধরার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে আসিয়াছেন। পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলাম বালিকা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসিনী, বয়স সতর আঠারোর কাছাকাছি। মুখে চোখে তার লাবণ্যের এমন একটা দীপ্তি যে তাহাকে স্বতঃ পুণ্যহৃদয়া ও সরলান্তঃকরণা বলিয়া মনে হয়। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম বালিকার পিতা এলাহাবাদের এক প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী, পিতার সহিত কলিকাতা হইতে ফিরিবার মুখে এই দৈব দুর্ঘটনায় এখানে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তায় আদৌ সঙ্কোচের ভাব ছিলনা। উন্মুক্তবাতাসে অধিকক্ষণ থাকিলে অসুস্থতাবোধ হইতে পারে এইজন্য আপনা হইতে আমাকে তাহার সহিত সম্মুখস্থ ভগ্নকুটীরে আসিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। হঠাৎ সেই স্তিমিতালোকের আবছায়ায় দেখিতে পাইলাম বালিকার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সাপ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। বালিকাটি দেখিতে পাইয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমি দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া একটা পাথর কুড়াইয়া নিয়া সবলে উহার দিকে নিক্ষেপ করিলাম। ঈশ্বরের করুণা বশেই হউক অথবা বালিকার পরমায়ুর জোরেই হউক উহা সাপের মাথায় আঘাত করিল, সাপটিও হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া পলাইয়া গেল। বালিকাটি তাহার আধ আধ হিন্দিবাক্যে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে চারিদিকে উষার অরুণ ছটা দেখা দিল, সেই নবোদিত উষার আলোকে বালিকার রূপজ্যোতি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এইরূপ অনুপম লাবণ্য এমন অনিন্দ্য স্বাস্থ্য বাঙ্গালা দেশে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। চোখ দুটি যেন কোন্ পুণ্যালোকে বিভাসিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, টানা টানা ভ্রুযুগের উপর ললাটদেশ শরতের আকাশখণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, দক্ষিণ ভ্রূর উপরে একটি ছোট তিল শরতের আকাশে একটি মেঘের টুকরার মত বৈচিত্র্যে সেই শোভা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে, বামগণ্ডের এক পাশে একটি আঁচিল ক্ষুদ্র তারার মত চিক চিক করিতেছে।

প্রভাত হইয়া আসিল। আমরা তাহার পিতার অন্বেষণে বাহির হইলাম। একা এই পূর্ণবয়স্কা বালিকার সঙ্গে যাইতে আমার বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ

হইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে চোখে সঙ্কোচের কোনও চিহ্নই দেখিলাম না। কিছু দূর যাইয়া আমরা সেখানকার রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনটা শোন নদীর তীরে নাম ডিরি অন্ সোন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি বালিকার পিতার নাম শ্রীওঙ্কার লাল চতুর্ব্বেদী, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীব। তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে ষ্টেসনে কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। বালিকার নিকট রাত্রিসংক্রান্ত সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি আমাকে বহুবিধ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন সোনের তীরটি তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে, তিনি কয়েক দিন ঐ স্থানে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; কোনও কাজের ঠেকা না থাকিলে আমাকেও দুই চার দিন সেখানে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কন্যাও পিতার সহিত সেই অনুরোধে যোগ দিল এবং আমি যখন তাঁহাদের অনুরোধে সম্মতি জানাইলাম, তখন তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন। আমিও কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইব না ভাবিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। তারপর সোন নদীর তীরে কত মধুর সন্ধ্যা তাহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছি, সেই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মৌন সাধনার মাঝে কত আমোদ গল্পে কত সাহিত্য চর্চ্চায় কত পুলকময় সন্ধ্যার আলোকে দুইটি হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল।

(২)

"আজ ও মনে পড়ে সেই বিচ্ছেদ কাতর আঁখি দুটি যাহা আমার এলাহাবাদে বিদায়কালে গৃহদ্বারে পথ চাহিয়া সন্ধ্যাতারার মত ফুটিয়াছিল। যদিও অল্পদিনের জন্য আমাদের এ বিচ্ছেদ কারণ তাঁহাদের ও শীঘ্রই এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবার কথা তথাপি চন্দ্রার কাতর মুখখানি আমার মনে এমনি আঁকিয়া গিয়াছিল যে প্রকৃতই পথে আমার কান্না আসিতেছিল। বলিতে ভুলিয়াছি মেয়েটির নাম চন্দ্রাবাই।

কিন্তু ভগবান যার কপালে দুঃখ লিখিয়াছেন তার সুখের আশা মিটিবে কেন? এলাহাবাদে আসিয়া শুনিলাম আমার আত্মীয়টী সেখান হইতে কোথায় বদলি হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক যখন আসিয়া পড়িয়াছি তখন না দেখিয়া আর ফিরিব না স্থির করিলাম। একেবারে কৃষ্ণা হোটেলে গিয়া উঠিলাম।

কৃষ্ণা হোটেলটি মোটের উপর মন্দ নয়, আহার শয়নের ব্যবস্থা ভালই। এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ তুল্য নূতন প্রস্তর নির্ম্মিত সেনেট গৃহের অতি নিকটেই ইহা অবস্থিত। এলাহাবাদে পৌছিবার পরের দিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলি দেখিয়া আসিলাম। বেড়াইয়া আসিয়া শরীরটা বড় খারাপ লাগিতে লাগিল, মাথায় একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। না খাইয়া শুইয়া পড়িলাম, মধ্যরাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বুঝিলাম খুব জ্বর হইয়াছে, তারপর জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া রহিলাম। এইরূপ কদিন অচেতন অবস্থায় ছিলাম জানিনা। যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম আমার শয্যার সম্মুখস্থ টেবিলের বইগুলি বেশ গুছান রহিয়াছে, এই লক্ষীছাড়ার ঘরে যেন একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম চন্দ্রা একহাতে পথ্য ও আরেক হাতে এক গ্লাস জল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। চন্দ্রাকে এখানে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার অচেতন অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া চন্দ্রা বড় আহ্লাদিত হইল, তাহার মুখের প্রফুল্লভাব দেখিয়া আমি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। তারপর সে আপনা হইতেই আমার শিয়রে বসিয়া একে একে সব কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমার এত অধিক জ্বরে আমাকে এরূপ অচেতন অবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণাহোটেলের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার কোনও আত্মীয়ের ঠিকানা পাইবার জন্য আমার পকেট অনুসন্ধান করিয়া ওঙ্কারলাল চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের ঠিকানা পাইয়া তাঁহাকেই তার করিয়াছিল এবং তিনি কন্যাকে লইয়া অচিরে কৃষ্ণা হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চন্দ্রা পিতাকে কোনও নার্স রাখিতে না দিয়া নিজেই সমস্ত শুশ্রূষার ভার লইয়াছে। এমন সময় চন্দ্রার পিতা আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনিও আমাকে জ্ঞানাবস্থা ফিরিয়া পাইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম চন্দ্রার দিবারাত্র শুশ্রূষার গুণেই আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। আমার তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না, তাই চন্দ্রাও তাহার পিতার দিকে করুণ নেত্রে তাকাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। আমার চোখ হইতে দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ক্রমে ক্রমে আমি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলাম। বেশ একটু সারিয়া আসিলে চন্দ্রা আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী লুকারগঞ্জে এলাহাবাদ ষ্টেসনের নিকটে। লুকারগঞ্জ রোডটি বেশ প্রশস্ত,

দুই ধারে বড় বড় বৃক্ষের শ্রেণী বহু শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া একটা স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

একদিন আমি চন্দ্রা ও তাহার ছোট এক মামাত ভাই আমরা কয়জনে মিলিয়া খস্রুবাগে বেড়াইতে গেলাম। খস্রুবাগ লুকারগঞ্জের খুব নিকটে। এখানে খস্রু ও তাঁহার বেগমের এবং আরও কয়টি সমাধি রহিয়াছে। সমাধির চারিধারে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান। সেই উদ্যানের মধ্যে এখন সমস্ত সহরে—জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রকাণ্ড কল রহিয়াছে। আমরা ঐ জলের কল দেখিয়া সমাধিস্থানগুলি দেখিতে লাগিলাম। কোন্ এক যুদ্ধে জাহাঙ্গীর তনয় খস্রু বিদ্রোহী হইয়া এখানে অন্তিম শয়নে শুইয়া আছে। আজ মনে পড়িয়া গেল মোগল বাদশাহদের সেই লোকাতীত ঐশ্বর্য্য, তাহা এখন কোন্ মায়া-পুরীর খেলার মত অতীতের দর্পণ তলে, এখন শুধু ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল এই রকম কয়েকটি স্মৃতি তাহা কালের সর্ব্ববিধ্বংসী ক্ষমতাকে উপহাস করিয়া এখনও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাহাজাদা খস্রু ও তাঁহার বেগমের কবরের পাশে আর একটি কবর দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহা খস্রুর এক প্রিয়পাত্রী পানওয়ালীর কবর, একমাত্র ভালবাসার দাবীতে পানওয়ালী ঐখানে স্থান পাইয়াছে। শুনিয়া ঐ কবরের উপর গিয়া বসিতে ইচ্ছা করিল, সঙ্গে সঙ্গে খস্রুর উপর একটু শ্রদ্ধার ভাবই আসিল। এমনি আপনকরা ভালবাসা যাঁ সামান্য পানওয়ালীকে একেবারে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছে তাহার চরণে মাথা নোয়াইতেই হয়। এমন আপনাভোলা প্রাণ-নিঙড়ান ভালবাসা কয়টা-লোকের ভাগ্যে ঘটে কে জানে, তাই ইহার সম্মানের জন্য আমরা ঐ কবরের পাশে আসিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল; স্থানটি নির্জ্জন। এই নির্জ্জন পবিত্রস্থানে আমার বড় গান শুনিতে ইচ্ছা করিল। চন্দ্রাকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সে কয়েকবার আপত্তি করিয়া পরে স্বীকৃতা হইল। চন্দ্রার স্বর বড় মধুর, সে সেই মধুর স্বরে করুণকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল—

"সাচী-প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি
তুম্ সঙ্গ যোড়ি আওর সঙ্গ তোড়ি।
যো তুম্ বাদল তো হাম মৌ'রা,
যো তুম্ চন্দ্র হাম ভায়জী চকোরা।

যো তুম্ দেওরা তো হাম্ বাতি,
যো তুম্ তীরথ তো হাম্ যাত্রী।
যাঁহা যাঁই তাঁহা তেরি হি সেবা,
তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা।"

এই গানটি ভগবানের চরণে ভক্তের আত্মনিবেদন। ভক্ত বলিতেছে, ওগো তুমি আমার ইন্দু, আমি তোমার জ্যোৎস্নাভিখারী চকোর। এই প্রেমের পুণ্যতীর্থে এই নির্জ্জন উদ্যানের মাঝে প্রকৃতির মৌন সহানুভূতির মধ্যে সেই গানের রাগিণী আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের মণিকোঠায় থাকিয়া থাকিয়া বাজিতেছিল—"তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা।"

(৩)

"সেদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে চন্দ্রার কয়েকটি ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে লইয়া চন্দ্রা আর আমি প্রয়াগে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এলাহাবাদ ফোর্টের নিকট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা গিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ধীর সমীরণে শান্ত নদীর বুকের উপর দিয়া তর্‌তর্ বেগে নৌকাখানি চলিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার অস্তমান রবির কিরণ যমুনার কালো জলে পড়িয়া একটা কোমল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ক্রমে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে যমুনার স্বচ্ছ নির্ম্মল কালো জল গঙ্গার শুভ্র অঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। শরতের নির্ম্মেঘ আকাশের তরল জ্যোৎস্না গঙ্গার বুকে চিক চিক করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটি গৌরবর্ণা তন্বী গুছাইয়া একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পড়িয়াছে। এই যমুনার সাথে কত গাঁথা কত গীতিকাব্য কত বাঁশরীর রাগিণী মিশাইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার সেই পরাণ পাগল-করা উদাস ভাবের মাঝে মনে হইতেছিল যেন কোন্ অদূর কুঞ্জভূমি হইতে শ্যামসুন্দরের গোপীমন-ভুলান বাঁশরীর ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। চন্দ্রা সাথে করিয়া একটি সেতার লইয়া আসিয়াছিল। ভাবমুগ্ধ হইয়া সে কখন উহার কাণ মোচড়াইয়া পর্দ্দায় অঙ্গুলি সংযোগ করিয়া একটা মধুর ঝঙ্কার দিল। সুর প্রথমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইলেও ক্রমে তাহা নব বধূর ঘোমটা ঢাকা মুখের মত সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। সুরের শান্ত কোমল উচ্ছ্বাস

তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছিল। আমি ভাবের আবেগে সেই সুরের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে লাগিলাম—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনি!
নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী জনক-জননী-জননী।
প্রথম প্রভাত তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া চন্দ্রা গানটি শুনিতে ছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আমি আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে গাহিয়া চলিলাম—

"নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণ তল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী।"

গান থামিয়া গেল। অনেকক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিল, তারপর চন্দ্রা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল—"কি সুন্দর কথাগুলি"! আমি বলিলাম এই সঙ্গীতটী আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা। পদলালিত্যে ও ভাবমাধুর্য্যে এই গানটী বাঙ্গলা ভাষার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এই যে আমাদের দেশ জননীর পবিত্রশ্রীর পরিচয় যার স্মৃতি মাত্রেই আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব গর্ব্বের ভাব জাগিয়া উঠে, আমরা কি তাহা ধারণ করিবার উপযুক্ত হইব না। কোন্ অপূর্ব্ব উষায় এই ভারতের তপোবনে সামঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল; কত জ্ঞানের বার্ত্তা ধর্ম্মের কথা এই আর্য্য ঋষিগণের আবাসভূমি হইতে প্রচারিত হইয়াছিল; নূতন সভ্যতার দীপ্তিতে প্রভাসিত কত কাব্য দর্শন পৌরাণিক কাহিনী এই তুষারমৌলিহিমাচলরক্ষিত শতপুণ্যনদনদীবিধৌত আর্য্যভূমি হইতে বিঘোষিত হইয়াছিল। আমরা সেই ভারতে জন্মিয়া সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী পরের কথায় বিমুগ্ধ, নিজের নিজস্ব বুঝিবার চেষ্টা করি না, আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমাদের যত্ন নাই। এইরূপ দেশের অনেক কথা চন্দ্রার সাথে আমার সেদিন হইয়াছিল। রাত্রি হইয়া আসিল আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

(৪)

"পরদিন দেশ হইতে সংবাদ আসিল আমার মায়ের বড় অসুখ, শীঘ্রই আমার যাওয়া প্রয়োজন। সে দিনই চন্দ্রাদিগের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। আজও মনে পড়ে চন্দ্রার সেই বিচ্ছেদকাতর মুখখানি যাহা আমার অন্তরের মাঝে মূর্ত্তি লইয়া এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। দেশে আসিয়া দেখিলাম মায়ের আমার বড়ই অসুখ। প্রাণপণ যত্ন করিয়া যথাসাধ্য অর্থব্যয়ে মায়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চালাইতে লাগিলাম। প্রায় দশমাস ভুগিয়া আমার মায়া কাটাইয়া মা আমার স্বর্গে গমন করিলেন। মৃত্যু শয্যায় আমার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"বাবা, জীবনে চিরসুখী হও।" ভগবান্ অন্তরালে থাকিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন –"হু"।

প্রায় একবৎসর উদাস ভাবে তীর্থে তীর্থে কাটাইয়া মনটা একটু শান্ত হইলে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিন মনের অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় চন্দ্রার কথা বড় মনে আসে নাই, কিন্তু আজ বাড়ী আসিয়া শুধু চন্দ্রার কথাই মনে হইতে লাগিল। কয়েকদিন এইরূপভাবে মনমরা থাকিয়া এলাহাবাদে যাইব ভাবিতেছি এমন সময় আমার নামে একখানি পত্র আসিল। ডাক ঘরের ছাপ দেখিয়া বুঝিলাম চিঠিখানি এলাহাবাদ হইতে আসিতেছে। বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিলাম। সংবাদ পড়িয়া মাথা ঘুড়িয়া গেল, হাত হইতে চিঠিটা পড়িয়া গেল। এলাহাবাদ হইতে চন্দ্রার মামাত বোন লিখিয়াছে "সুশীল বাবু, আমাদের প্রিয় ভগিনী চন্দ্রা আজ চারিদিন হইল আমাদের সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় ছয়মাস কাল তিনি ক্ষয় রোগে ভুগিতে ছিলেন, মৃত্যুর একসপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আপনার নামে একখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন মৃত্যুর পরে ইহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতে। সেই কথা অনুসারে পত্রখানি আপনার কাছে পাঠাইলাম।" স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে চন্দ্রার পত্রখানি তুলিয়া লইলাম। চন্দ্রা লিখিয়াছে—

"ওগো বন্ধু আমার,

মনে হয় আজ কত যুগ বুঝি কেটে গেছে আমাদের সেই—চিরমধুর মিলনের পরে। না, তর্ক করোনা, জানি তোমার তর্ক করবার একটা রোগ

আছে। তুমি বোধ হয় বুঝবে না সত্যি সত্যি একটা যেন যুগ কেটে গেছে। যাকে সামনে পেলে নিমেষে হারাই এমনতর ভয় সব সময়ে জেগে থাকৃত তাকে এতদিন না দেখে কেমন করে বেঁচে আছি আমিই বুঝতে পারিনি। মনে পড়ে কি তোমার কাছেই একদিন বিদ্যাপতির একটা পদ শুনেছিলাম, সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

আজ বুঝতে পারছি এ মস্ত একটা সত্যি কথা। হেসোনা, মনে ভাব্‌ছ চন্দ্রা কেমন করে এতবড় দার্শনিক হয়ে পড়ল। দার্শনিক কি লোকে কেবল বই পড়েই হবে, মনের মাঝখানে কতভাব কত নূতন রূপ নিয়ে ফুটে উঠ্‌ছে। সেই সব রূপকে চিন্‌তে গেলেই ত মানুষ দার্শনিক হয়ে পড়ে। এত-দিনের জমাট বাঁধা ব্যথা আজ আমায় এমন মুখরা করে দিয়েছে। তুমি ভাব্‌ছ এতদিন তবে কেমন করে তোমায় ভুলে ছিলাম। বন্ধু, ভুলতে তোমায় কখন পারিনি, পার্‌তেও চাইনি। কতদিন তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি কিন্তু দুই ছত্র লিখেই লজ্জায় আর লিখ্‌তে পারি নি। দুছত্র লেখা চিঠিখানা অমনি ছিঁড়ে ফেলেছি। আজ আমার কিন্তু লজ্জার সকল বাঁধন টুটে গিয়েছে। জানি আমি আমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আর তুমি যখন আমার এচিঠি পাবে তখন আমি অন্য লোকে। লজ্জায় আর আমার মৌন রাখতে পারবে না কারণ আজ আমি তোমার কাছে আমার প্রাণের কথা উজাড় করে দিয়ে যাব।

মনে পড়ে তোমার সেই ডিরি অনসনে থাকার কথা? তোমার সুন্দর সরল তেজস্বী কথাগুলি শুন্‌তে শুন্‌তে আমি তোমার মুখের পানে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকৃতাম। কি দীপ্ত সে মুখ কি স্বর্গীয় লাবণ্য সে মুখে খেলা করৃত। তুমি স্বভাবতঃ বড় বেশী কথা বল্‌তে না কিন্তু তোমার কথাগুলি শুন্‌তে আমার এমন ইচ্ছা হ'ত যে কোন বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধ মত বলে তোমার অনর্গল তর্কের ঝরণায় ডুবে থাকৃতাম। তুমি বুঝি ভাব্‌তে আমি তোমার কথাগুলি সব গিলে নিচ্ছি তোমার ভক্ত শিষ্য হব বলে। তোমার কথাগুলি গিলতাম নিশ্চয় কিন্তু সে যেমন দেবতারা সাগর মন্থনের পর অসুরের ভয়ে সুধা গিলেছিল। ভয় হত পাছে একটা কথাও হারিয়ে ফেলি। তারপর

যেদিন তুমি ডিরি অনসোল থেকে এলাহাবাদে চলে গেলে তখন আমার বুক ভেঙ্গে যেন কান্না বেরচ্ছিল। জান্‌তাম আমরা ও শীঘ্রই এলাহাবাদে যাচ্ছি, তবু বিচ্ছেদটা আমার প্রাণে এমনি ভাবে বেজেছিল।

তারপর কৃষ্ণা হোটেলের ম্যানেজার যেদিন বাবার কাছে তার করলে আর আমরা তোমার ওখানে গিয়ে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখলাম, সে দিন আমার মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগল আমি তোমায় সারিয়ে তুলবই। বন্ধু আজ আমার কোন ও সঙ্কোচ নেই, তাই তোমায় সব কথাই বলতে পারছি। তোমার অসুখের মধ্যে তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখে চিকিৎসকের আশা পেয়ে বা নিরাশ ভাব দেখে কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তাম কখনও বা অবসাদে হৃদয় ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু ভগবানের নাম নিয়ে দিনরাত্রি বুক বেঁধে শুশ্রূষা করেছিলাম। ওঃ, সে দিন তোমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে আমার কি আনন্দই হয়েছিল।

সেদিন শরতের আকাশে জ্যোৎস্নার বাণ ডেকেছিল। খোলা জানালা দিয়ে তোমার মুখের উপর আলোর ধারা খেলা করছিল। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। তখন মহেন্দ্রযোগ না ঐ রকম একটা শুভলগ্ন; তুমি অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিলে। আমি আমার আঙটিটা তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলাম, তোমার আঙটিটা খুলে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে পরে নিলাম। তারপর তোমার পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা নমস্কার করে ফেললাম। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে বল্‌লাম এই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। তুমি হাসছ। কিন্তু জেনো ভগবান যেখানে পুরোহিত এবং আকাশের তারা যেখানে সাক্ষী তার চেয়ে খাঁটি বিয়ে আর হতে পারে না। প্রকৃত বিয়ে ত অন্তরে অন্তরে মিলন, জাত সম্বন্ধ বিচার করলে তার গৌরবটাকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। মন্ত্রপড়া ত একটা লৌকিক আচার মাত্র। যখন মনে মনে বিয়ে হয়ে গেল তখন কোন মন্ত্রটা পড়া হল কি না হল তা ভাববারই ত সময় থাকে না। প্রকৃতির মাঝেও ঠিক এমনি প্রেমের লীলা, দেখনি মাধবীলতা যখন সহকারতরুকে ঘিরে ঘিরে পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে গড়ে উঠে, তখন সে ভেবে দেখে না তার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ কোনও লৌকিক নিয়মসিদ্ধ বা মন্ত্রানুমোদিত কি না।

তারপর তুমি তোমার মায়ের অসুখ শুনে চলে গেলে। পাছে তোমার যাত্রায় অশুভ হয় এই জন্য প্রাণপণে তোমার নিকট প্রফুল্লভাব দেখিয়ে এসেছি। কিন্তু যেমন বেশী আঘাত লাগলে একটা নীল কালশিরে দাগ হয়ে থাকে,

রক্তের লেশও পড়েনা, তেমনি এই আমার জমাটবাঁধা বেদনা এমনি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, যে তাতে বোধ হয় অশ্রুর উৎসের মুখে একটা পাথর চাপা পড়েছিল।

তোমার কি মনে পড়ে তোমার একখানি ফটো এলাহাবাদে চুরি গিয়েছিল। সে চোর আমিই। তোমার চলে আসার পর সেই ফটোখানি রোজ গোলাপ ফুলে সাজিয়ে রাখ্‌তুম কারণ জান্‌তাম তুমি গোলাপ ফুলই বেশী ভালবাস্‌তে। এখনো এই যে আমি তোমার কাছে চিঠিখানি লিখ্‌ছি তাতেও আমার সামনে তোমার ফটোখানি যেন একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধু, আর আমি কি বল্‌ব, আমার কথা শেষ হয়ে এসেছে। বন্ধু, চল্‌লাম, বিবাহ ত আমাদের হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষায় রইলাম, জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার অপেক্ষায় থাক্‌ব। সাধনায় সিদ্ধি হবেই, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পাব এই আশা দিয়ে বুক বেঁধে থাক্‌ব। বন্ধু, চল্‌লাম মিলনের পথ চেয়ে বসে থাক্‌ব। বিদায়, বন্ধু, বিদায়। চন্দ্রা।”

এইখানে সুশীলচন্দ্র তাহার জীবনের আখ্যায়িকা শেষ করিয়া বলিলেন— “ওগো, আজ তোমরা আমার জীবনের কথা শুন্‌লে। জীবনে আমার সুখের উৎস—শুখিয়ে গিয়েছে। যার সাথে আমার এমনি পবিত্র মিলন হয়েছে তার সাথে আবার কবে মিল্‌ব তাই বসে বসে ভাবি। সেই মিলনেই হবে আমাদের ফুলশয্যা।” এই বলিয়া সুশীলচন্দ্র নীরব হইলেন। তখন রাত্রি অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। চিন্তান্বিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পথে কে যেন তখন গাহিরা যাইতেছিল—

“মন-বুলবুলে তুলেছে রাগিণী
হৃদয় আমার মথিছে ধীরে ;
গত জীবনের কত ভালবাসা
অবুঝ মানসে বিহরি ফিরে।”

উহাদের উপকরণ। কিন্তু গ্রন্থকার বেহারীর যে সকল অসম্পূর্ণতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সকল প্রদেশীর চরিত্রে বর্ত্তমান আছে। জানিনা ভারতের কোন প্রদেশে "মেহেরবান্‌খাঁ" ও "হরসুখরায়" প্রভৃতির ন্যায় "জো হুজুর" লোকের অভাব আছে।

চিত্রগুলি বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে—হাস্যরসে আবরিত হইয়াছে বলিয়া চিনি মণ্ডিত কুইনাইনের কার্য্য করিয়াছে। এক্ষণে ব্যাধি সারিলেই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথম দুইটি চিত্রে বেহারীচরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখাইতে গিয়া ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, লেখকমহাশয় ভারতশাসনের গুপ্ত রহস্য উৎঘাটন করিয়া ফেলিয়াছেন—যিনি ইমান্ খোয়াইয়া দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন, তিনিই কর্ত্তাদের চক্ষে "ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে প্রকার লোকের আবশ্যক তাহাদের আদর্শ হইবার উপযুক্ত" যাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রতি-মুহূর্ত্তের প্রবঞ্চনার নব নব উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত তিনিই সেলামের জোরে "রায় সাহেব" খেতাবে ভূষিত: আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই বলা হইতেছে, "আপনার দেশ প্রসিদ্ধ সাধুতা, বদান্যতা ও প্রজাপ্রিয়তায় গভর্ণমেণ্ট মুগ্ধ"। উহাদের মধ্যে কতটা সত্য লুকান আছে গ্রন্থকারই জানেন।

কেবল বেহারবাসীর "অন্ধকার অংশ" আঁকা হইয়াছে এই অনুযোগের উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তিনি বন্ধুভাবেই এই রূপ করিয়াছেন কেননা—এই সকল অসম্পূর্ণতা পরিহার করিয়া তাঁহারা কল্যাণলাভ করুন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা—কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু আমাদের এই স্থানে বক্তব্য যে পুস্তকখানি অতি অল্পবেহারীই পড়িবে। সুতরাং কেবল dark side আঁকিয়া চিত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়া লাভ কি ?

লেনিন—শ্রীফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, কলেজষ্ট্রীট্, মার্কেট, ইণ্ডিয়ানবুক্‌ক্লাব হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০। বোলসেভিক্‌নেতা লেনিনের ক্ষুদ্রজীবনী। বইখানি ছোটর উপর বেশ শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]   [পৌষ, ১৩২৮।

স্বরাজ্য-সাধনা

[শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী]

সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।—শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবত।

যুগান্তর পরে আজি   বিজয়-দুন্দুভি বাজি'
রোমাঞ্চ সঞ্চারে এহি বঙ্গের শ্মশানে।
জাগিল রে সুপ্ত জাতি   জলন্ত উৎসাহে মাতি,'
উদ্যমে, আশায় দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ পরাণে।
সর্ব্ব ভেদাভেদ ভুলি'   ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি ;
উচ্চ-নীচ নাহি আর ;—প্রেমে একাকার!
চৈতন্যচন্দ্রের বঙ্গে   প্রমত্ত তরঙ্গ ভঙ্গে
দিব্য চৈতন্যের বন্যা বহিল আবার!
উত্তাল তটিনী ধায়,   দ্বেষ-হিংসা ভেসে যায়,
ধন্য সবে তাহে এবে করি' শুচিস্নান।
কত জন্ম জন্ম পরে   আজিরে বিধির বরে
স্বার্থ পরার্থেরে করে বরমাল্য দান!

*   *   *

একতা-পতাকা মূলে   মিলি' সবে, কণ্ঠ খুলে'
গাহ,—"জয় জগদীশ শঙ্কাভয়হারী!

এযে তব কৃপাবরে জীবন্ত হইল জড়ে !
জয় হে অনন্যগতি, অকূলকাণ্ডারী।"
মুখে কর নাম গান, সবে হও একপ্রাণ,
সমবেত শক্তি দেহ স্বদেশ-সেবায়।
কহ দৃঢ় সমস্বরে স্মরি' শিব-বিশ্বেশ্বরে,—
"এ বিশ্বে আমরা আর র'ব না ঘুমায়ে" !
ঊর্দ্ধে তুলি' দুই হাত কর তাঁরে প্রণিপাত,
তাঁরে সাক্ষী রাখি' কহ,—"অটল এ পণ,—
স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা করি' স্বরাজ্য লইতে বরি'
বধিব আত্মার অরি উপেক্ষি, জীবন।
কে আর নিদ্রিত রবে ? অমৃতের পুত্র সবে ;—
তোমারি চিদংশ-কণা মোরা দীপ্যমান !
তুমি যে র'য়েছ চুপে এই দেহে আত্মারূপে ;
মোদের লাঞ্ছনা, সে যে তব অসম্মান !
ওগো পিতা, হে বিধাতা, পরমাত্মা, পরিত্রাতা,
মোদের সর্ব্বস্ব-ধন, হে অনন্যগতি,
তুচ্ছ করি' ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার এ অপমান
মোচন করিব প্রভু,—দেহ সে শকতি !
সাক্ষী সূর্য্য-শশি-তারা —জাগ্রত অম্বরে যাঁরা !
সাক্ষী অন্তর্য্যামী তুমি দেব-নারায়ণ !
দিলাম রক্ষিতে পণ সর্ব্ব স্বার্থ বিসর্জ্জন।
—মন্ত্রের সাধন কিম্বা দেহের পতন !"

* * *

স্নেহ-মায়া স্বরূপিণী, বেদ বিদ্যা প্রসবিনী,
মোক্ষধাম এ ভারত-জননী মোদের
অনাদি স্মৃতির খনি, পুণ্যময়ী চিন্তামণি,
জুড়াতে আশ্রয়-ঠাঁই ইহজীবনের।
সর্ব্ব বাধা-বিঘ্ন অরি আত্মবলে জয় করি,
সে জন্মভূমির প্রেমে ভুলি' আত্ম-পর,

দিব্য মন্ত্রে দীক্ষা লভি'   বাঞ্ছিতো মায়ের ছবি
স্মরি মনে মহাশৌর্য্যে হও অগ্রসর।
হাসি-খেলা নহে ইহা   বিলাস-বাসনা নিয়া!
এ যে পুণ্য প্রেমানলে আত্ম-বিলোপন!
মধু পানে মাতোয়ারা   অমৃত-সন্তান যারা,
এ শুধু তাঁদেরি তরে দীপ্ত আয়োজন!

* * *

কে আছ সঁপিবে প্রাণ?   এস, হও আগুয়ান।
অভয় আহ্বান ওই আসে বারংবার,—
"স্বধর্ম্ম-স্বরাজ্য তরে   যে জীবন দান করে
সে যে নিত্যধামবাসী,—কিবা শঙ্কা তার।"
জাগো তবে! হে বিশ্বাসি,   মোছ' আত্ম-গ্লানি রাশি,
মত্ত হও ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে শিব-শক্তি বলে।
সর্ব্ব দুঃখ দূর করে'   স্থাপ' তাঁরে শিরোপরে,
প্রক্ষাল' সে পাদপদ্ম ভক্তি নেত্রজলে!

শিক্ষার বিরোধ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

আমার এ সব কথার কথা নয়,—উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশী লেকচার নয়,—সত্য সত্যই যা আমি সত্য বলে বুঝেছি তাই কেবল আপনাদের কাছে বলছি। মানুষের এক প্রকার শিক্ষা আছে যা' কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানুষে অর্জ্জন করিতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরিজি ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাকেই চরম উন্নতি জ্ঞান করে এবং এই mentalityরই এক ধাপ নীচের লোকগুলো জাহাজে এবং

রেলগাড়ীতে সাহেবি পোষাক ছাড়া কিছুতেই বেড়াতে চায় না। এবং এই জিনিষটা এত ইতর, এত ক্ষুদ্র, যে এ কেন হয়, এর কি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই ছদ্মবেশের হীনতা, এই আপনার কাছ থেকে আপনাকে লুকোবার পাপ, এবং গভীর লাঞ্ছনা আপনারা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এ কথা কেন যে উত্থাপিত করলাম তাও বুঝতে আপনাদের বাকী থাকবে না।

এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে কেউ কেউ বলতে পারেন, এই যদি সত্য, তবে জাপান আজ এমন হলো কিসের জোরে? তার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের কার ইতিহাসটা একবার ভেবে দেখ! ভেবে আমি দেখছি। পশ্চিমে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্বের জোরেই যদি সে আজ বড় হয়ে থাকে তবে বড়ত্বটাও মেপে দেখেছি আমরা শুক্রচার্য্যেরই মাপ কাঠি দিয়ে। কিন্তু মানবত্ব বিকাশের সেই কি শেষ মান-দণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দু'শো পাঁচশো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস?

আমি জাপানের ইতিহাস জানিনে। তার কি ছিল এবং কি হয়েছে এ বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই তার পার্থিব উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্ম সমর্পণের সূচনাই করে থাকে, ত তারস্বরে আনন্দধ্বনি করবার বোধ হয় বেশী কারণ নেই। এবং এম্‌নি দুর্দ্দিন যদি কখনো ভারতের ভাগ্যে ঘটে,—সে তার বিগত জীবনের সমস্ত tradition বিস্মৃত হয়ে ঠিক অতখানি উন্নত হয়েই ওঠে, এক কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন প্রভেদই না থাকে, ত ভারতের ভাগ্য-বিধাতা অন্তরীক্ষে বসে সে দিন হাসবেন কি নিজের চুল ছিঁড়বেন বলা কঠিন।

কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না। হবার যোই নেই। তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ তা' তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়েই অর্জ্জন করি,—এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী যদি না সে দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে। এর মূল যদি না জাতির অতীতের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে থাকে। এই ফুল-সমেত বৃক্ষ শাখা তা সে বর্ণে ও গন্ধে যত দামীই হোক্ একদিন শুখাবেই শুখাবে, কোন কৌশলই তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না।

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, ঠকিয়ে-

মজিয়েই হোক্ বা কেড়ে-বিকৃড়েই হোক্ নানাদেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। তার অতিরিক্ত যা সে শুধুই ভার, নিছক আবর্জ্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেচে; ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরচে, ঐ যে সহরের আলোর মালার আদি অন্ত নেই,—ঐ যে শত সহস্র বিদেশী সভ্যতার তোড়-জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেচি, ওর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোন দিন ওর আমদানির মূল শুকিয়ে যায় ত ভোজবাজির মত ওদের অস্তিত্ব এ দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হবে না। ওসকল আমরা সৃষ্টি করিনি, করতেও জানিনে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা আজ ও-সকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ, ওর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এই যে দেখা দেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পরি ছাড়তেও না পারি, তা হলে দুষ্ট ক্ষুধার মত ও-কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম-ওদের সৃষ্টি করেচে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও-সকল চাইই-চাই। ওই যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক-গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য-নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানীর সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি কিন্তু বাণিজ্য জাহাজই বল, আর মোটর গাড়ীই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে নিজের দেশে, নিজের জিনিষের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করে ততক্ষণ যেমন করে এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে আনি সে আমার সত্যকারের ঐশ্বর্য্য নয়। তাই ম্যান্‌চেষ্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাসগো লিনেন এবং মসলিন, স্কটল্যাণ্ডের পশমের শীত বস্ত্র,—তা সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক, এবং দেহের সৌন্দর্য্য যতই বৃদ্ধি করুক কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জ্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে গেছি। আমি বলছিলাম যে সে মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদ ও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষে বড় জোর সেই টুকুই তৈরি করতে পারে, কিন্তু তার বেশী নয়—সে সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ, সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা শেখা যায় না,—এমনি কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস,—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হতে দেয় না, অতীতের গৌরব কাহিনী মুছে দিয়ে আত্ম-সম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে; কাণের কাছে কেবলি শোনাতে থাকে আমাদের পিতা পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্য্য কারণের সম্বন্ধ জ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমাদের এদুর্দ্দশা—তা হলে সে শিক্ষার যত মজাই থাক্, তার সঙ্গে অবাধ কোলাকুলি একটু দেখে শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ-মারবার শত কোটী যন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশও তার মুখের গ্রাস অপহরণ করবার ততোধিক কলকারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচে,—কিন্তু ঠিক ওই সকল আর একদেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কিনা আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন এই সকল মহৎ কার্য্য করেছে তারা নিশ্চয়ই কোন একটা সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু ত বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে, সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ।

হতে ও পারে। কিন্তু যে লোক মারণ-উচাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপ্‌তে সুরু করেচে, তার কোনটা সত্য আর কোনটা শয়তানী নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন, "ঐ কথাটাই ত আমরা বারবার বল্‌চি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড় হাঁ করচে তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চল্‌তে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশী অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ একথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে Culture জিনিষটারও জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে ত সে কেবল এই জন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে তারা কেবল অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে, তা হ'লে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে প্রবন্ধের মধ্যে শ্লোক তুলে তুলে হতেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কি ভাবে সমন্বয় হতে পারে আমি জানিনে। যাদের গেলবার মত বড়-হাঁ আছে তারা গিল্‌বেই—মনু বা উপনিষদের দোহাই মান্‌বে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমের ত বড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চল্‌চে, এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ী বেশ তাজা আছে তাতে আশ্চর্য্য হবার আছে কি? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দুপক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে। এবং ফের যদি আবশ্যক হয় তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হবে!

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুল চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে থাকে, ভারতের বাণী কই? তাহলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছে মাত্র! এবং এই জন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে "মা গৃধঃ" মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা আমার নেই। কারণ বাঘের কানে 'বিষ্ণু' মন্ত্র ফুঁকলে বৈষ্ণব হয় কিনা আমি কোনমতেই ভেবে পাচ্চিনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূল মন্ত্র হচ্ছে Standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই, কিন্তু ওদের সমাজ নীতির যেমন interpretationই দেওয়া যাক্, তার আসল কথা হচ্চে ধনী হওয়া। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান,—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয় আছে, এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এই ধনী হওয়ার অর্থও কেবল ধন সংগ্রহ করাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি

ধনহীন কোরে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না। সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় ত অন্যান্য দেশ গুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করে পারেই না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখ্‌লে অনেক দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হয়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর পরে তার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায় আমাদের ঋষি বাক্যে সেকি তার সমস্ত civilizationর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহুযুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্য্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগ্‌তে দেয়নি। আপনাকে এম্‌নি সতর্ক, এম্‌নি শুচি করে রেখেচে যে কোন দিন এর ছায়া টুকু পর্য্যন্ত মাড়ায়নি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের রাজার মাথার কহিনূর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্য্যন্ত যেখানে যা' কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু আজ খামকা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্য বস্তর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পদার্থের enquiry করে থাকেত আনন্দ কোরব কি হুঁসিয়ার হব—চিন্তার কথা।

য়ুরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে। আমাদের ঋষি বাক্য যত ভালই হোক্‌ তারা নেবেনা, কারণ, তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা দেবেনা—কথাটা শুন্‌তে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সে টুকু না নেওয়াই ভাল। বাকি টুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জ্জনা। তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি, তা মারণ-মন্ত্র যত সত্যই হোক্‌ তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ করব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হল না, কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী—এ দুটো আলাদা জিনিষ। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জ্জন করা নয়। এমনও হতে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের

বড় পথ। আপাতঃ দৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশেনা, এ দুটো পদার্থও একবারে উল্টো, তবু, তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য্য থাকা ভাল, অমন উতলা হয়ে নিন্দে করতে নেই।

মৃণ্ময়ী

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

(১)

ডিনারের পর ড্রইং রুমে বসিয়া মিঃ মুখার্জ্জির বাড়ীতে নানারকম গল্পগুজব চলিতেছে। ইউজেনিস্‌ক হইতে আরম্ভ করিয়া হেগেলের dialectic পর্য্যন্ত আলোচনা চলিতেছিল। বিলাত না গেলে যে মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না সমস্ত আলোচনার পর সকলেই একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ শ্বেতেন বাবু। ভদ্রলোক এদেশের ইউনিভার্সিটির এম, এ, হইলেও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তাঁহার ছিল না। আর তিনি যত বড়ই বিদ্বান হোন না কেন—সেদিন সবার সামনে এমন একটা accent ভুল উচ্চারণ করিলেন যে না হাসিয়া কেহই থাকিতে পারে নাই। তারপর শ্বেতেন বাবুর স্থানাস্থান জ্ঞান নাই, একদিন পাখানি একবারে ন্যাংটা ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের partyতে এসে হাজির—আমরা তো লজ্জায় :মরে গেলাম। আমাদের অন্যান্য —young lady friends কি মনে করলেন জানি না—তবে আমাদের সঙ্গে যেন পরিচয়ই নাই এইরূপ ভাব দেখিয়ে কোন রকমে সে দিন মান রক্ষা করি।

(২)

পর দিন সকাল বেলা ৯টার সময় সকলে চায়ের টেবিলে বসিয়াছেন। আজ এত কাজ—মিস্ মুখার্জ্জির Engagement ceremony—তাই সকলেই একটু সকালে উঠিয়াছেন। ছেলেটি বিলাতে পড়িত। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। আর যখন বিলাতের পাশ, তখন বিশেষ দেখিবারই বা কি আছে। মুখার্জ্জি সাহেবের নগদ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা —একমাত্র কন্যা। এই

সংবাদ পাইয়াই বিলেতী নারীর প্রতি প্রেম হঠাৎ স্বদেশ অভিমুখী হইয়া মিঃ বানার্জ্জিকে এখানে আনিয়াছে। আচার্য্য আসিয়া প্রার্থনা করিয়া গেলেন —নবীন প্রেমিকযুগলের মঙ্গলকামনা করা হইল। অঙ্গুরীয় দানও হইয়া গেল!

(৩)

আজ বিজয়াদশমী। মিঃ বানার্জ্জি মিস্ মুখার্জ্জির সহিত রাত দশটার সময় ড্রাইভের পর বাড়ী ফিরিলেন। ঋতেন বসিয়াছিল। মিস্ মুখার্জ্জি ঋতেনকে নমস্কার করিয়া একটা শিকার পাওয়া গিয়াছে, খানিকটা সময় আমোদে কাটানো যাইবে—মনে করিয়া বড় খুসী হইয়া তাহাকে একটী ১৮৲ টাকা ডজনের সিগারেট offer করিলেন। ঋতেন সিগারেট খাইত না। ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক—সে মেয়ে লোকের সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। মিঃ বানার্জ্জি হো হো করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, "ঋতেন বাবু বোধ হয় shocked হ'য়ে গেছেন আমাদের বিলেতে কিন্তু অহরহ এই কাণ্ডটাই ঘটছে—আপনি তো সেখানে গেলে মূর্চ্ছিত হ'য়েই মারা যেতেন।" ঋতেন আর কোন কিছু না বলিয়া লিলি মুখার্জ্জি ও তাহার প্রণয়ীর কাণ্ড দেখিয়া আর আসিব না মনে করিয়া উঠিতে যাইতেছিল। মিস্ মুখার্জ্জি একটু অপ্রস্তুত গোচের হইয়া পড়িলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ঋতেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি একটু রহস্য করছিলাম, আপনি বুঝলেন না। বসুন এক কাপ কফি খেয়ে যান।" গ্রীষ্মকালে রাত দশটার সময় ভাত খাওয়ার পর এক পেয়ালা কফি খাওয়া একটা নতুন জিনিষ মনে করিয়া ঋতেন বসিল। Boy—কে ডাকা হইল। একটি দীর্ঘশ্মশ্রু ৪৫ বৎসর বয়স্ক বৃহদাকার পাঠান আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে কফির হুকুম দেওয়া হইল। সে একটু পরেই কফি আনিয়া লিলি বাবার সামনে ধরিল।

লিলি বলিল—আজ ঋতেন বাবুদের বাংলা কবিতার একটু আলোচনা করা যাক। বিজয়া দশমীর দিন—ঋতেন এক খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়াছিল। তাহা হইতে ব্যর্থ-বোধন বলিয়া একটা কবিতা পড়িল। তাহার শেষ লাইনটি—"চিন্ময়ী থাক চিত্তের তলে মৃণ্ময়ীরূপে এস না আজ।"

কবিতা পড়া শেষ হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঋতেন বাবু সব তো বুঝলাম মৃণ্ময়ীর বাংলটা কি হ'ল? ঋতেন বল্ল আপনিই বলুন না কেন। লিলি ভাবিলেন আমার ডাক নাম লিলি, কিন্তু ভাল নাম মৃণ্ময়ী, অতএব চেঁচাইয়া

বলিলেন, "মৃণ্ময়ী মানে Lotus—" ঋতেন হো হো করিয়া হাসিয়া সেদিনকার মত প্রস্থান করিল।

বিবাহের কয়েকদিন পরেই লিলি সুতিকাজ্বরে আক্রান্ত হয়। তাহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়াছে। সে রূপলাবণ্য কোথায় গিয়াছে। যৌবনের ফুল্লশ্রী আজ বিষাদের কালিমায় লুপ্ত হইয়াছে। সে প্রায় সব সময়েই শয্যাগত থাকে। মিঃ বনার্জ্জি টাকাগুলি হস্তগত হওয়ার পর বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। সেখানেই একটি সঙ্গিনী খুঁজিয়া লইয়া বসবাসের আয়োজন করিয়াছেন। মিঃ মুখার্জ্জির মৃত্যুর পর হইতে ঋতেনই লিলির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে জীবনে বিবাহ করে নাই—লিলিকে যখন চাহিয়াছিল পায় নাই আজ তাহাকে এক প্রকারে পাইয়া কতকটা তাহার মন শান্ত হইয়াছিল। সে অবাক হইয়া ভাবিত মিঃ বানার্জ্জির ব্যবহারের কথা—একদিন লিলির কাছে হাঁসিয়া বলিতেছিল, তোমাদের সমাজের সবই উল্টো যে কারণে অত বড় দাড়ি-ওয়ালা পাঠানটা হ'ল Boy আর তোমার মত সুন্দরী যুবতী হ'ল "বাবা"—সেই কারণেই বোধ হয় আজ তোমার এমন অবস্থা।

হাফিজের-কাব্যরহস্য

৪

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ)

এইবার হাফিজের প্রধান বিশেষত্বের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। অন্যান্য পারস্য গজল বা গীতিকবিতা-রচয়িতাদিগের ন্যায় হাফিজ কেবল মাত্র প্রেম-কবিতা রচনা করিয়াই অমর হন নাই। যদিও গজলের মূলসুরটী প্রেমাত্মক, তথাপি হাফিজ জগতের 'কমলবিলাসী'দের ন্যায় অস্থিমাংস, মেদ-বসা, পিণ্ড শোণিতের পূজা করেন নাই। অন্যান্য পারস্য গীতি কবিতা-রচয়িতৃগণ প্রিয়তমার বিরহে ভাষাসৌন্দর্য্যে ও ভাবসম্পদে নিজ কবিতা মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কবিতা আমাদের উচ্চ মনোবৃত্তির মার্জ্জন পক্ষে কখনই উপযুক্ত নহে। ইরাণী যুবতীর মোহিনীমূর্ত্তির ছাপ্ লইয়া সে

কবিতা যখন মহাকালের দরবারে দাঁড়াইবে, তখন কোথায় তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা আমাদের ও অভাব্য। হাফিজের পক্ষে কিন্তু একথা বলা চলে না। তিনি এরূপ ভাষাও ভাবের অনুগামী নহেন; তাঁহার কবিতা ভাষার তূর্ণ পক্ষে ও ভাবের চারু অঙ্গাভরণে সমৃদ্ধ হইয়া চিরসুন্দর ও চিরমঙ্গলের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তাঁহার সঙ্গীতে এই সমস্ত রসের একটা ব্যাপক ও অনির্দ্দেশ্য বিশেষত্ব আছে। দ্ব্যর্থ প্রকাশক রহস্য-কবিতার ন্যায় তাঁহার প্রেম-কবিতা মানবীয় প্রেম ও স্বর্গীয় প্রেম—উভয়ের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই প্রীতিপূর্ণ স্থিতি-স্থাপকতা ও অস্পষ্টতাই তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য্য অনবদ্য ও অনিন্দ্য করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে সমভাবদ্যোতক কবিতা-প্রকাশের জন্য তাঁহার ভাষার নানারূপ অর্থ করা যায়। প্রেমিকের নিজ হৃদয় রঞ্জিনীর প্রতি সম্ভাষণ পরমেশ্বরের মহান্ সত্ত্বার মধ্যে স্ফুফী কবির আত্মলোপেচ্ছা, অতৃপ্তের বাঞ্ছিত অন্বেষণ এই সকল ভাব তাঁহার সঙ্গীতে গভীর বেদনায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ এবং পবিত্র প্রেমের সরল ব্যঞ্জনায় তাঁহার "দীবান্" ভাবের রত্ন-মঞ্জুষা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

শুধু কি প্রেমের মূর্চ্ছনাই তাঁহার বীণায় বাজিয়াছে?—আরও সুগভীর, আরও গূঢ়তম ভৈরবীর করুণ মন্ত্র তাঁহার দর্শনবাদের মধ্যে বাজিয়াছে। তিনি বলিলেন—আমাদের 'নিজ-হাতে-গড়া' দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ, স্বল্প ও অনিশ্চিত জীবনকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেন সেই দুঃখের মধ্যে ও আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে দারিদ্র্যের মাঝে ও যেন প্রেমের কনকমাধুরী জাগিয়া উঠে। —ইহাই হাফিজের কবিতার দর্শনবাদ। পাপে তাপে পূর্ণ এই সংসার—কেমন করিয়া ইহার মধ্যে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করিব; হাসি-অশ্রু, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন—কেমন করিয়া গ্রহণ করিব; কেমন করিয়া গর্ব্ব-ত্যাগ করিয়া 'সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে' আপন আপন আসন খুঁজিয়া লইব; কেমন করিয়া জীবনের মহাসমুদ্র নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া মরণমরণের অমর বন্দরে পৌছিব, কবি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। জীবন এবং ইহার আনুষঙ্গিক পার্থিব বস্তুর নশ্বরতা; সংসার এবং তদন্তর্গত সমস্ত বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতা,—এই সকল চিন্তার ধারা তিনি বিচিত্র বর্ণ বৈভব সম্পন্ন তুলিকায় কাব্যের পটে আঁকিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—'ধূলি-মুষ্টির মধ্যে তোমার অন্তিম-শয়ন-ভবন রচিত হইবে, বল তবে কেন আকাশ-

স্পর্দ্ধী প্রসাদ নির্ম্মাণে তোমার এত গর্ব্ব ?, (গজল ৭ শ্লোক ৭)। পলে পলে যখন জীবন ফুরাইতেছে, তখন কেন আমরা সুখ দুঃখের দাস ? তিনি বলিতেছেন—সুখ দুঃখকে জীবনের সঙ্গী করিও না। তাহারা দুদিনের ছায়া, মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া যাইবে। তিনি ক্রমাগতই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, গোলাপের পাশেই কণ্টকপল্লব আছে, কণ্টকবিদ্ধ না হইয়া কেহই গোলাপ ছিন্ন করিতে পারে না। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন—'বাহারের' (বসন্তের) পশ্চাতেই 'খিজান' (শরৎ) আসে, সুখ দুঃখ সনাতন ক্রমবিকাশের ফল। সৃষ্টির বনিয়াদ যখন এইরূপ ভূমির উপর নির্ম্মিত, তবে কেন হাহাকার করিয়া মর ? কেন দেখ না যে—'অদূরে রয়েছে চির বসন্ত-প্রভাত ?'

দুঃখের মর্ম্মস্পৃক্ যাতনায় পরিশ্রান্ত কবি মদিরা-চষকের আবাহন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'ভোগ্যের লীলা দিব গো বলিয়া
মদিরাপাত্র দাও গো চুমি—
তাহারি বদন করেছে প্রেমিক
গন্ধে তাহার পাগল আমি!' (গজল ২৭)

মদিরা হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া দেয়, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ—প্রেমের উন্মত্ততা, কিংবা সেই স্বপ্নময় অলসতাপূর্ণ আবেশ, যাহা হৃদয়ের অন্ধকারে উষার অরুণলেখা আনিয়া দেয়। কালো মেঘের কোলে রজতরেখার ন্যায় এই মদিরা সন্তপ্তের চিরতৃপ্তি, দুঃখিতের চিরশান্তি, ব্যথিতের চিরসান্ত্বনা!—ইহা আমাদের নিজের কথা নয়, কবি নিজেই এ রহস্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন;—"তুমি চলিয়া যাও প্রেম-মদিরার ধূমজাল ত তোমার মাথায় নাই; তুমি যে আঙ্গুরের রসে (অর্থাৎ প্রকৃত মদ্যে) উন্মত্ত।" আর একটী গজলে তিনি গাহিয়াছেন—

'মদিরা—মোহিনী—মুরজ না লয়ে
গোলাপের কালে বেঁচে কি ফল ?
সময়েরি মত নশ্বর তারা—
সপ্তাহ শুধু করে গো ছল!'

আমরা আর এ রূপক-রহস্য ভাঙ্গিব না। প্রত্যেক চঞ্চল মুহূর্ত্ত হইতে আনন্দ ও প্রীতি উপভোগ করাই আমাদের কবির ধর্ম্মবাদ। এ আনন্দ এবং প্রীতি ইন্দ্রিয়-সেবার প্রতিশব্দ নহে—কবি ইহা কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন,

আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ওমর খৈয়াম তাঁহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলেন—

"সত্য শুধু বর্ত্তমান—অসত্য সকলি,
শুধু সুধা—শুধু গান—শুধু তুমি সৎ।" (৺অক্ষয় কুমার বড়াল)

বৃথা দুঃখ দূর করিয়া দাও—আনন্দ-সাগরে পরিস্নাত হইয়া কেবল সুখ-সুধা সেবন কর; সংক্ষেপতঃ, ইহাই হাফিজের দর্শনবাদ। ইহাতে নূতন কিছুই নাই বটে, কারণ ইহার কোন কোন অংশ Stoicism ও Epicureanismএর প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের দেশের চার্ব্বাকগণের "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" বচনও হাফিজের সুখবাদকে পরাজিত করিয়াছে বলিতে পারি, কিন্তু হাফিজের সুখবাদের মূলে আধ্যাত্মিকতার যে উপাদান আছে, তাহা আর কোথাও নাই। এই সুখবাদ আনন্দের তপোবন স্বরূপ। ধ্যানী কবি সেই মানস-রচিত তপোবনে অপূর্ব্ব কল্পলোক সৃষ্টি করিয়া লোক-মোহিনী কবিতাসুন্দরীকে রাজরাণী করিয়াছেন। আমরা সেই ভাব-রত্নাকরের দুই একটী মণিকণা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম:—

(ক) বসন্তকাল সমাগত—এইবার সাবধান হও; কারণ ইহার পরে অনেক পুষ্প বিকশিত হইবে, তুমি হয়ত তখন মৃত্তিকার নিম্নে (প্রোথিত) থাকিবে!

(খ) যে কাননে 'বাহারের' (বসন্তের) পর 'খিজান্' (শরৎ) আসে, চতুর বিহঙ্গ সেখানে কখনও গান গাহে না। (পারস্যের শরৎকাল ঝটিকা সঙ্কুল)।

(গ) সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ কর; দুইমুখে যাহার দ্বার (জীবন মরণরূপ দুই দ্বার—অর্থাৎ পৃথিবী) সেই পান্থ-নিবাস হইতে একবার বাহির হইয়া আবার আসিতে পারিব কিনা, কে জানে!

(ঘ) হে হাফিজ, এই পৃথিবীর কানন শরৎ-ঝটিকায় বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া আঁধারে ডুবিও না। সত্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেখ দেখি—কোথায় কণ্টক শূন্য কুসুম আছে!

অন্য একটী কবিতার একাংশে (গজল ৮, শ্লোক ১) সৌন্দর্য্য রসিক কবি মুক্তকণ্ঠ হইয়া বলিতেছেন—'তাহার একটী কৃষ্ণতিলকচিহ্নের জন্য আমি সমরখন্দ ও বোখারা দান করিব।' এই স্থলে বলা আবশ্যক যে সেকালে পারস্য-যুবতীগণ pitch এবং Oxide of antimony নামক এক তীব্র বিষ প্রয়োগে অস্থায়ী তিলক চিহ্ন ও chelidoniun এবং charcoal সহযোগে

স্থায়ী তিলক-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করা সৌষ্ঠব সাধক মনে করিত! তাই হাফিজ বলিতেছেন—

কুন্তল তা'র—বন্ধনজাল,
কৃষ্ণতিলক—শস্যকণা ;
তাহারই আশায় বন্ধুর জালে
পড়িয়াছি আমি অন্যমনা। (গজল ৩০)

হাফিজ জীবন-মরণের কথাও ভাবিয়াছেন, বিশ্ব-নিয়ন্তার কথা, বিশ্ব-রহস্যের কথাও ভাবিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, রহস্যের দ্বার চিররুদ্ধ থাকুক, মানুষ নিজ ক্ষুদ্রবুদ্ধির আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া সে অন্ধকার ভেদ করিতে যাইয়া যেন হাস্যাস্পদ না হয়! ইহাই কি সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে উদারতম মত নহে? সংসারের দুরন্ত বনে এই ধর্ম্মবাদই তাঁহাকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া নববলে বলীয়ান করিয়া দিয়াছে। আত্মশক্তি ও ভাগ্য, পাপ ও দুঃখ—সমস্তই কবি তাঁহার কবিতার বিষয়ীভূত করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মের মূল কথা এই যে—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। হাফিজ যে প্রকারে ইহা বুঝাইয়াছেন, তাহা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত নহে। তিনি মানবিকতা ও আস্তিক্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সমস্ত ইঙ্গিত ও স্ফুটোক্তি করিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিকতায় ও ক্ষুদ্রতায় বিরাট্‌বপুদর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমরা কয়েকটী গজলের অনুবাদ দিলাম :—

(ক) আমাদের জীবন একটা রহস্য বিশেষ—ইহার সমাধান চেষ্টা ব্যর্থ ও কাল্পনিক।

(খ) হে সাকী, পানপাত্র দাও—অদৃষ্ট নিয়ামক আমাদের ভাগ্যে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কি লিখিয়াছেন, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর।

(গ) মদ্য এবং গায়কের কথা কও—বিশ্বরহস্যের কথা কহিও না, কারণ কোনও দর্শন-শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত ইহা নির্ণয় করিতে পারে নাই, পারিবেও না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাফিজ ধর্ম্মের 'ভান্' বা ধর্ম্মজীবনে 'ঝুটা'র আদর দেখিতে পারিতেন না। আমাদের বোধ হয়, হাফিজের সময়ে একদল দুষ্টলোকের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহারা কপট ধার্ম্মিকতা ও সাধনকৃচ্ছ্রতা জয়-ডঙ্কার সহিত সাধারণে প্রচার করিয়া গোপনে কলুষিত জীবন অতিবাহিত করিত। ইহাদের প্রতারণা সমাজের অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সাধারণের অন্ধ বিশ্বাসের ছায়ায় এই আগাছা সমূহ পরিপুষ্ট হইয়া কেবল সাংসারিক সুখকেই আত্মসর্ব্বস্ব

করিয়া লইত। সকল দেশেও সকল কালে এই দল parasite বা পরান্নপুষ্টের ন্যায় সমাজদেহে গূঢ়রূপে বিজড়িত হইয়া আছে। এই দলের বিরুদ্ধেই হাফিজ্ একটু কটূক্তি করিয়াছেন। তিনি যেন নিষ্ঠুরতার সহিত এই বৈড়াল ব্রতিকগণের কীর্ত্তি কথা সাধারণের সমক্ষে দেখাইয়া দিয়াছেন। পারস্যের অন্যান্য কবিগণও এই দুষ্টদলের প্রতি গালিবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু সাধারণ কবিগণের সহিত হাফিজের এ বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে।

(৫)

ছদ্মবেশে সাধারণের ও সমাজের অনিষ্টসাধন করা যাহাদের একমাত্র ব্রত তাহারাই কবির লক্ষ্য। তাহাদের বিরুদ্ধে হাফিজ্ "রিন্দ" নামক একপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। যে উচ্ছৃঙ্খল ও বাধাশূন্য জীবন যাপন করে, তাহাকেই রিন্দ্' বলে। কিন্তু মদিরার ন্যায় হাফিজ্ এই শব্দটীও রূপকার্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যে নির্দ্দোষ ও অকলঙ্ক জীবন যাপন করে, যাহার বাক্যে ও কার্য্যে 'সদর-বাহির' নাই, যিনি ধর্ম্মের নামে সমস্ত সাধনা মন্ত্র-পূত করিয়াছেন—হাফিজ্ তাহারই নাম দিয়াছেন 'রিন্দ্'। নিম্নোক্ত কবিতাগুলি এই ভাবেরই পরিচায়ক—

(১) রঞ্জিত বসনের নিম্নে তাহারা গুপ্তজাল রাখিয়া দেয়—এই সমস্ত মিথ্যাবাদী ভ্রাতৃগণের অন্যায়াচরণ দেখিয়া চলিও।

(২) সন্ন্যাসী তাহার গর্ব্ব ও উপাসনামন্ত্র লইয়া আসুক, আর আমি আমার ত্যাগ ও বৈরাগ্য লইয়া যাই;—দেখি, পরমেশ্বর কাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া লন!

ভক্তের এমন সাহসিকতা দেখিয়াছ কি?

এই সমস্ত উচ্চ কল্পনা নরপ্রেমে অমর মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু কল্পনার শূন্য লোকে ও ভক্তির তপোবলেই হাফিজের সমস্ত জ্ঞান পর্য্যবসিত হয় নাই। জাগতিক জ্ঞানও তাঁহার বড় অল্প ছিল না। জগতের মরুদহনে পিপাসা-ক্লান্ত কবি যে 'ওয়েশিশের' সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা কেবল নিজের জ্বালা জুড়ান নাই—সমস্ত জগতের লোককে তিনি সেই 'আনন্দ-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ' করিয়াছেন। সাধক কবি বিজ্ঞ বিষয়ীর ন্যায়, চতুর গৃহস্থের ন্যায় যে উপদেশামৃত পরিবেষন করিয়াছেন, তাহা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের, কল্প-কল্পান্তের রাক্ষসী ক্ষুধা মিটাইয়া দিবে। তখন নোবেল্ প্রাইজ্ ছিল্ না,

থাকিলে শান্তি-মন্ত্রের গুরু হাফিজ্‌ও বোধ করি একটা পাইতেন। একটী কবিতায় তিনি বলেন—

'উভয় লোকের শান্তি-মন্ত্র
একটী মন্ত্রে পেয়েছে স্থান—
বন্ধুর প্রতি দয়াশীল হও,
মার্জ্জনা কর অচিরে দান।'

হাফিজের কবিতা আন্তরিকতার মুক্ত প্রস্রবণ। গঙ্গা-যমুনার প্রয়াগ সঙ্গমের ন্যায় তাঁহার ভাব ও ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মিলিত হইয়া অসীমের পানে ছুটিয়াছে। বৈষ্ণব সাধক যেমন বিরহিনী নারী সাজিয়া উদ্বেগাকুল হৃদয়ে 'শাঙন নিশায়' আপনার প্রেমাস্পদের জন্য অপেক্ষা করেন, হাফিজ ও তদ্রূপ আপনার সত্ত্বা, আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার অভিজ্ঞান সেই মগরাজরসিকের পদে বিলীন করিয়া বলিতেছেন —

"তোমার অধরে ও আকৃতিতে স্বর্গের সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে।······সমস্ত রজনী আমার নয়ন যেমন তোমার পানে চাহিয়া থাকে, তেমনি আকাশের নদী ঘুমন্তভাবে তোমার পাগল করা চোখের পানে চাহিয়া আছে। প্রত্যেক বৎসরে বসন্তেই তোমার সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় প্রত্যেক পুস্তকে স্বর্গের সঙ্গেই তোমার উপমা দেওয়া হয়। আমার হৃদয় যে জলিয়া গেল, নাথ! আমার মন যে আজিও মনোচোরের দেখা পাইল না! যদি তার কামনা পুরিত, তাহা হইলে কি সে শোণিত-মোচন (অর্থাৎ শোকাশ্রুমোচন) করিত? আমি জানি তোমার গোলাপীগণ্ডে মুক্তা-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে—এই মুক্তা আচার জগৎ প্রকাশক সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। মোচন কর তোমার গুণ্ঠন! ওগো, আর কতদিন তোমার লজ্জা থাকিবে? গুণ্ঠন দিয়া তুমি ত কেবল লজ্জাকেই বাঁচিয়া রাখিয়াছ! গোলাপ তোমার মুখ দেখিয়া (ভালবাসায়) অগ্নি-গর্ভে ঝাঁপ দিয়াছে (তাই সে রক্তবর্ণ) সে তোমার গন্ধে আকুল হইয়া লজ্জায় গোলাপ-জলের মত কোমল ও স্নিগ্ধ হইয়াছে! তোমার মুখ দেখিয়া হাফিজ্‌ আজ পাগল!—দেখ, আজ হাফিজ্‌ দুঃখ-সাগরে পড়িয়া মৃত-কল্প। ওগো, এসো, এসো, একবার এসো—আমায় রক্ষা কর!"

হাফিজের কবিতার কয়েকটী মুখ্য বিশেষত্বের সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম; তাঁহার চিন্তার ধারাও দেখাইলাম। কিন্তু কবির বর্ণরাগ, রেখাবৈচিত্র্য ও সীমান্ত-লীন পরিপ্রেক্ষিত দেখাইতে পারিলাম না। কবিতামোদিগণের নিকট

হাফিজের **দীবান** বিধাতার দান বলিয়া চিরকাল পরিগণিত হইবে। জীবনের ঈশানকোণে যখন দুঃখের জলভরা কালোমেঘ জমিয়া যায়, তখন অনেকে হাফিজের কবিতার আশ্রয় লন; অনেকে আবার কুসংস্কারবশতঃ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে লক্ষ্মীর বড়পুত্র হইবার জন্যও হাফিজের কবিতা বুকে তুলিয়া লন। হাফিজের একটী নাম—"লিশান্-উল-গায়েব্"—গুপ্তের জিহ্বা, যিনি গুপ্তকে প্রকাশ করেন। রুকনী নদীর কূলে ও মুশাল্লা মস্‌জিদের সন্নিকটে "লিশান্-উল-গায়েবের" পাঞ্চভৌতিক দেহ আজ ছয়শত বৎসর হইল ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও তাঁহার স্বর্গীয় জিহ্বা বিশ্বের মাঝে সগৌরবে গাহিতেছে—

অঙ্গে যদি বা লাগে ধূলাবালি
কিবা ক্ষতি, বল, তায়?
বিপুল এ ধরা তাঁহারি পুণ্যে
অমলিন গরিমায়!

অচেনা

[শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ]

আমি চিনেছি তোমারে বহুরূপী
ওগো চির পুরাতন অচেনা,
তুমি খেলিবার ছলে চুপি চুপি
কর কতই বিলাস রচনা।
আজি নিদাঘ গগন বিদারিয়া
তব কঠোর ফুলীশ গরজে,
সারা বিশ্ব-প্রকৃতি মুখরিয়া
যেন ভীষণ দৈত্য তরজে।
ঘন ঝটিকা করিছে হাহাকার
তার চির আশ্রয় হারায়ে,
বাজে কানন-বীণার ছেঁড়া তার
সারা জটাময় মাথা নাড়ায়ে।

তব রুদ্র রাগের আলাপনে
করে মহাপ্রলয়ের সূচনা ;
আমি চিনেছি তোমারে মনে মনে,
ওগো চির পরিচিত অচেনা !

আমি চিনেছি তোমারে হে অতিথি,
ওগো চির পুরাতন অচেনা,
তুমি নব বেশে সাজি নিতি নিতি
কর নব নব ভাব রচনা।
নব অরুণ-কিরণ জাগরণে
হাসে উষার মাধুরী ছড়ায়ে,
হেরি প্রতি পল্লব আবরণে
আছে তোমার সুষমা জড়ায়ে।
সবে প্রভাতের পাখী গাহে গান
তার রঙীন্ পাখাটি নাড়িয়া,
বহে সে স্বর-লহরে তব তান
সারা উদয় গগন বেড়িয়া।
কম কমলিনী মেলি যুগ আঁখি
করে কাহার প্রণয় যাচনা !
আমি নীরবে কেবল চেয়ে থাকি,
ওগো চির-জনমের অচেনা।

আমি চিনেছি তোমারে হে মহান্,
তুমি চির পুরাতন অচেনা,
সারা ধরণী ধরিয়া সম তান,
করে তোমার প্রণয় যাচনা।
যবে মধ্য তপ্ত গগনের
প্রতি রৌদ্র কণিকা বিকাশে,
সে যে তোমার অমৃত লগনের
শুভ চরণ-চিহ্ন প্রকাশে।

যেন সন্ন্যাসী বসি একমনে
করে নীরবে কাহার সাধনা,
কোন্ পিয়াস লাগিয়া সরোদলে
কোন সাগরে জানায় বেদনা।
তব তুষার শুভ্র রূপ হেরি
লাজে লুকায় ব্যাকুল যাচনা;
বাজে গগনে তোমার জয়-ভেরী,
ওগো ও আমার চির অচেনা!

আমি চিনেছি তোমারে হে শ্যামল,
তুমি আপনার জন অচেনা;
বহে করুণা তটিনী ছল ছল
সে তো পর কি আপন বাছেনা।
তুমি শান্ত শীতল শ্যাম সাঁঝে
কর শান্তির অবতারণা,
এই মুখর হাটের পথ মাঝে
কর চুপি চুপি পদচারণা।
যবে অস্ত গগনে ম্লান রবি
পড়ে শ্রান্ত ক্লান্ত ঘুমিয়া,
তব স্নিগ্ধ বিমল রূপ-ছবি
নাচে ধরণীর বুক চুমিয়া।
তুমি সন্ধ্যা-ধূসর ধূমাকাশে
আছে পাতিয়া তারার বিছানা
আমি চিনেছি তোমারে সে আভাসে,
ওগো ও আমার চির অচেনা!

আমি চিনেছি তোমারে হে দেবতা,
তুমি আপন অথচ অচেনা,
তব গভীর সৌম্য নীরবতা
করে রম্য মিলন রচনা

তব নীরব নিশীথ-গীত বাজে
প্রতি তারার তরুণ পরাণে,
তার হিয়ার গোপন গৃহমাঝে
হাস রাকা তুমি রাকা-কিরণে।
তব চন্দ্রধৌত ব্যোম-পথে
আছে হাসির উছল ঝরণা,
সে যে রজত-জড়িত ছায়া-রথে
করে ভূমিতলে অবতরণা।
চারু কৌমুদী-বাঁধা নদীতটে
খেলে তোমারি অমল জ্যোছনা,
হেরি উদার মাধুরী ঘটে-পটে
ওলো সকল যুগের অচেনা!

আমি চিনেছি তোমারে চিনেছি গো,
ওগো সারা হৃদয়ের অচেনা,
তুমি নিবিড় আঁধারে জাগো জাগো,
কর অকুলে দেউল রচনা!
আজি ঝর ঝর ঝর বহে বারি,
নাচে থর থর থর মরুতী,
আমি এ বিশাল ঘন ঘটা ভরি
হেরি তব মঙ্গল আরতি।
আজি উতলা কণ্ঠে ধরারাণী,
করে বজ্র-বারতা ঘোষণা,
শুনি অকম্পিত সেই সামবাণী
ধীরে লুকায় ব্যাকুল বাসনা।
ওগো তোমার রুদ্র রূপ হেরি
প্রাণে মুছে যায় অনুশোচনা;
ওগো মুক্ত ভীষণ ব্যোমচারী!
ওগো চির পুরাতন অচেনা!

আজি তোমার রাতুল শ্রীচরণে,
ওগো ও আমার চির অচেনা,
আমি নীরবে রচিব যতনে
মম চির চরমের বিছানা।
আমি দু' হাতে ছিঁড়িয়া এ পরাণ,
লব রক্ত অর্ঘ্য সাজায়ে;
গাব মরণের শুভ জয় গান
সুখে সকল বাসনা বাজায়ে।
কবে মুছে যাবে মোর সীমা রেখা,
এই যুগ-যুগব্যাপী হীনতা,
কবে জ্বলিবে অসীম দীপ-লেখা
নাশি আঁধারের মৃদু ক্ষীণতা।
ওগো মঙ্গল তুমি সব কাজে,
কর চির মঙ্গল সূচনা,
এস আমার আকুল হিয়া মাঝে
ওগো চির আপনার অচেনা।

বর্ত্তমানভারত ও রবীন্দ্রনাথ

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়]

কবিকুল তিলক, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীরবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা স্থানে "বিশ্বভারতীর বার্ত্তা" প্রচার করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, জগতের লোক তাঁহার মুখে বিশ্বপ্রীতি ও বিশ্বমানবিকতার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে—চারি দিক হইতে প্রতিদিন অজস্রধারে, সম্মান ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। দেশের ভিতরে ও বাহিরে এতাদৃশ সম্মান লাভ করা, বোধ করি কোন যুগে, কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরা বাঙ্গালী—বাঙ্গালী কবির এই সম্মানে গৌরবান্বিত। যিনি এমনই ভাবে আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন,

তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ—ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হউক।

প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে, যে কবি, "ওমা সোণার বাঙ্‌লা তোমায় বড় ভাল বাসি," 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এখন আর সে রবীন্দ্র নাথ নাই। সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও সাধনা, তাঁহার সঙ্গীত ও রচনায় আর তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে না। রবীন্দ্র নাথ এখন আর জাতীয় কবি নহেন, তিনি বিশ্বমানবের কবি, জগতের কবি। তাঁহার কাব্যে ও বক্তৃতায়, সঙ্গীতে ও ছন্দে—এখন সমস্ত বিশ্বমানবের ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমগ্র জগত তাঁহাকে আপনার বলিয়া—বরণ করিয়া লইল। তাঁহার এখনকার বাণী কেবল ভারতের জন্য নহে—সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। যে দিন তাঁহার কবি প্রতিভা বিশ্বমানবিকতার প্রথম সন্ধান পাইয়া, দেশে বিদেশে, সেই বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল, সেই দিন হইতেই, দেশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সংযোগ ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। দেশের সুখ, দুঃখ, আশা নিরাশা আর তেমন ভাবে তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল না। তিনি ভাবুক—ভাবের রাজ্যেই চলাফেরা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া যতই ঊর্দ্ধতর প্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বমানবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ততই ঘনিষ্টতর হইতে লাগিল বটে কিন্তু দেশের প্রাণ বস্তু হইতে তিনি সেই পরিমাণে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দিই নাই—কল্পনা লইয়াই যাঁহাদিগের কারবার—ইহাই তাঁহাদিগের স্বাভাবিক পরিণতি। জগতের অনেক প্রসিদ্ধ কবিই এই-রূপে কল্পনা লইয়া খেলা করিতে করিতে পরিশেষে কল্পনা-বিলাসী হইয়া—mystic নামে অভিহিত হইয়াছেন। আমাদিগের রবীন্দ্র নাথের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ ইঁহা-দিগের কল্পনার অপূর্ব্ব লীলা-চাতুর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে এবং ইঁহাদিগকে এক দুর্ব্বোধ প্রহেলিকাময় উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে। ইঁহাদিগের সহিত দৌড়িবার শক্তি জগতের নাই। সুতরাং জগৎ ইঁহাদিগকে গ্রহণও করে না, প্রত্যাখ্যানও করে না। সংসার-বিভ্রান্ত মানব দুঃখ শোকে অবসন্ন হইয়া এক এক বার ইঁহাদিগের বাণীকে সংসার-পীড়ার পরমৌষধি জ্ঞানে বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হয় বটে কিন্তু, আদর্শের বিশালতায় আচ্ছন্ন হইয়া, আপনাদিগের অক্ষমতায় শেষে আপনারাই

ক্লিষ্ট হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসে। বিগত মহাসমরের পর, জগতের নরনারীর মধ্যে ঠিক এইরূপ একটা অশান্তি ও অস্থিরতার ভাব দেখা গিয়াছিল—তাই রবীন্দ্র নাথের এত সমাদর।

এই ত জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। কিন্তু জগতের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তির মাত্রা কমিল কি? বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে। যদি মুখের কথায়, কলমের খোঁচায় কিংবা শূন্যগর্ভ চোখরাঙ্গানিতে মনুষ্যসমাজের চিরন্তন সংস্কার ও প্রকৃতি বদলাইয়া দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। এরূপ চেষ্টায় ব্যাধির বীজ বিনষ্ট হয় না, কিছু-দিনের জন্য, তাহার অভি-ব্যক্তিতে বাধা পড়ে মাত্র। কিন্তু জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাতে ও লাভ আছে।

আমাদিগের মনে হয় এই জাতিসংঘ যে ভাবেও যতটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্র নাথের "বিশ্বভারতীর" কল্পনা সে ভাবে ও তত টুকুও গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই কল্পনা গড়িয়া তুলিবে কে? রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের পিছনে সে জনশক্তি কোথায়? যে দুর্ব্বার দুর্জ্জয়শক্তি জগতের জাতি সমূহকে আদেশ করিতে পারে—বাধ্য করিতে পারে—অন্ততঃ—তাহাদিগের সহিত সমপর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের সমক্ষে আপনার আহ্বানলিপি—প্রেরণ করিতে পারে ভারতের সে শক্তি কই? যদি বল, "আমরা এ শক্তি চাই না, আমরা আধ্যাত্মিক বলে জগৎ জয় করিব।" কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, আমাদিগের সে আধ্যাত্মিক বলই বা কোথায়? সত্য বটে, আমাদিগের বেদ আছে, বেদান্ত আছে—গীতা আছে, উপনিষদ আছে, পুরাণ আছে—রামায়ণ,মহাভারত আছে —সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র আছে কিন্তু আমাদিগের সে সাধনা কই? সে সংযম কই? সে ত্যাগ কই? সে চরিত্র বল কই? শুধু মুখের কথায় আধ্যাত্মিকতা মিলে না। আমরা বক্তৃতার সঙ্গে দুই চারিটি উপনিষদের বাণী ছিটাইয়া দিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে চমকিত করিয়া দিতে পারি এবং তাহাই আমাদিগের আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ দাবী ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, কিন্তু জগতের লোক কি শুধু মুখের কথায় ভুলিবে? আমরা মোটা কাপড় পরি না, পাছে গায়ে আচড় লাগে, দেশের কথা ভাবি না বা ভাবিতে ও চাহি না, পাছে দেশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। দেশ চুলোয় যাক্, আমি এবং আমার স্বজনগণ সুখে থাকিলেই হইল—ইহাই আমা-দিগের বুদ্ধি—ইহাই আমাদিগের প্রবৃত্তি। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগের

আধ্যাত্মিকতার দাবী সাজিবে কেন? ত্যাগ ও সংযমই অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি স্বরূপ। সেই ত্যাগ ও সংযমকে বাদ দিয়া শুধু ফাঁকা কথার উপরে জগতে প্রেমের রাজ্য গড়িয়া উঠিবে কি?

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, কল্পনা হিসাবে খুবই উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ উহাই ভারতের চরম আদর্শ হওয়া উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রকারান্তরে ঠিক এই ভাবের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, ভারতকে প্রথমতঃ সভ্যজগতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। দাসত্বের টীকা যাহাদিগের ললাটে বিদ্যমান, তাহারা কেমন করিয়া জগতের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে? এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী প্রথমেই ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছেন এবং ত্যাগ, সংযম ও অহিংসাচরণ প্রভৃতির দ্বারা যুগযুগান্তের পাপরাশি ক্ষালিত করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং যে এ কথা বোঝেন না, তাহা নহে। তিনি জানেন, বড়র সহিত বড়র মিলনই প্রকৃত মিলন; বড় এবং ছোটর যে মিল তাহা বস্তুতঃ মিল নহে, গোঁজামিল মাত্র। বহুপূর্ব্বে, তিনিই তাঁহার "হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেনঃ—

"আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। যতদিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা—ততদিনই তাহার ঈর্ষ্যা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে কাহারো সহিত মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোট বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড় হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করাটাই শ্রেয়ঃ।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮)

অতএব প্রাচী ও প্রতীচীর সম্মিলন ঘটাইতে গেলে প্রাচীকে প্রতীচীর সমান হইতে হইবে—নচেৎ, প্রকৃত মিলন অসম্ভব। এই জন্যই আমাদিগের মনে হয়, মহাত্মার কার্য্য যেদিন শেষ হইবে, সেইদিন হইতেই, প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্র-নাথের কার্য্য আরম্ভ হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদি মহাত্মার সহিত বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ একমত না হইয়াও (আমরা কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোনরূপ বিরোধ আছে বলিয়া মনে করি না, বস্তুতঃ রবীন্দ্রের মত মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানের পূর্ণ পরিণতি বা উপসংহার মাত্র) তৎপ্রবর্ত্তিত আন্দোলনের সহায়তা করেন, তাহা হইলে, প্রকারান্তরে আপনার সঙ্কল্পকে

সিদ্ধির দিকেই অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি যদি তাহা না পারেন ত কিছুদিন চুপ করিয়া থাকুন, মহাত্মাকে আপনার কার্য্য করিবার অবসর দিন; নচেৎ, তাঁহার আদর্শের মূলসূত্রটি ধরিতে না পারিয়া, নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে এবং শত্রুপক্ষ এই সুযোগে মহাত্মার সহিত তাঁহার মতের কাল্পনিক বিরোধের দিকটা অন্যায়রূপে চিত্রিত ও প্রচারিত করিয়া আপনাদিগের কাজ হাঁসিল করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে সংশয় মূঢ় বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত বিঘ্নসঙ্কুল শ্রেয়ের পথ ছাড়িয়া সুখাকীর্ণ প্রেয়ের পথকেই বরণ করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

আর একটি কথা, সেদিন রায় বদরী দাস বাহাদুরের বাড়ীতে কলিকাতা সেবা সমিতির অভ্যর্থনা সভায় তাঁহাকে আমরা এই ভাবের কথা বলিতে শুনিয়াছি "তোমরা কি এখন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত তুচ্ছ রোগ শোক, দুর্ভিক্ষ, অন্ন-সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? আমি বিশ্বের সভায় নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি—ঐ তারা আসছে—তারা তোমাদের দিকেই চেয়ে রয়েছে। তোমরা এখন তোমাদের যত কিছু সমস্যা—দুঃখ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী—সব ভুলে, তাহাদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন কর। আমাকে অভ্যর্থনা না করে, তাহাদিগকে তাহাদিগের ঈপ্সিত "অমৃত" পরিবেশন করিবার জন্য উদ্যোগী হও।" কথাগুলি শুনিয়া, অপরের কি মনে হইয়াছিল জানি না, আমরা কিন্তু নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম। যখন গৃহের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত তখন যদি কেহ আসিয়া গৃহস্বামীকে বলে "যাও, অতিথি তোমার দ্বারদেশে—অতিথি সৎকার কর! তুচ্ছ গৃহরক্ষার মোহে অতিথি সৎকাররূপ মহাব্রত হইতে বিরত হইও না।" তাহা হইলে, সেই কথাগুলি তাহার কর্ণে যেরূপ বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি, বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের কর্ণেও ঠিক সেইরূপ বোধ হইয়াছিল। ভারত এক্ষণে ঘোর দুর্দ্দশাপঙ্কে নিমগ্ন। "বিশ্বমৈত্রী" "বিশ্বভারতী"র কথা এক্ষণে তাহার ভাল লাগিবে কি? অগ্রে তাহাকে এই দুর্দ্দশাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার পর বড় বড় কল্পনা বা আদর্শ তাহার সম্মুখে ধারণ করিলে ভাল হইত না কি? আমরা পাশ্চত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বর্জ্জন করিতে চাহি না—মহাত্মারও তাহা উদ্দেশ্য নহে; তবে, তাহার সময় আছে।

এই সকল কারণে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতে, আপাততঃ, স্থায়ী

প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। ভারত চায় ত্যাগ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই ত্যাগের আদর্শ তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুতরাং বাহিরে তাঁহার যতই সমাদর হউক, দেশমধ্যে তিনি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিতে পারেন কিন্তু কখনই বর্ত্তমান জাতীয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিবেন না।

সুখের ঘর গড়া

ষোড়শ অধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

তর্কসিদ্ধান্ত পঞ্চুকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তর্কসিদ্ধান্তের উপস্থিতিতে তর্জ্জন গর্জ্জন যুক্তি বর্ষণ থামিয়া গিয়া ফিস্ ফাস্ কানাকানিতে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণের পট্টবস্ত্র পরিহিত চন্দন চর্চ্চিত দীর্ঘ ঋজ্বায়ত দেহ ও জলদগম্ভীর তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া কাপুরুষের দল একেবারে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহেশও একটু চঞ্চল হইল। "ব্যাপার কি হে ইশেন? হয়েছে কি? এত কানাকাণি কথা কিসের?" ইশেন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তর্কসিদ্ধান্ত শুনিয়া বলিলেন—

তর্ক। আমি মাণিকের হাত থেকে যজমানি কেড়ে নিতে চাই এই কথাটা তোমরা বল্‌তে চাও?

ই। (মাথা চুলকাইয়া) তা…তা—না—তবে কিনা—তা—তা—তা কথাটা—

তর্ক। দেৎ তোর তো—তো—তো—খুলে বল্‌তো কথাটা কি? ইশেন দাপ্‌ড়ী খাইয়া বেকুব হইয়া গেল, তার তোত্‌লামির তাল এক তালা হইতে তেতালায় চড়িল। কাজেই ব্যক্তব্য একপক্ষে অবক্তব্য ও শ্রোতাপক্ষে অবোদ্ধব্য হইয়া উঠিল। জীবন তখন ইশেনের হইয়া কথার উত্তর দিল—"ও কথা ছেড়ে দাও দাদা, ধরিনি, তবে কিনা বিশেষ আজকের দিনে বাউনের ছেলেকে মুখুজ্যে গিন্নি অপমানটা কল্লেন—

তর্ক। কি অপমান শুনিই না ; পঙ্কুকে দিয়ে পূজা করানো তো ?

জী। না না তা নয়—উনি বল্লেন কিনা চালকলা কুড়ানো তোমার মত বাউনের ব্যবসা নয় ও ছোট বাউনের কাজ—

তর্ক। ছোট বাউন বলেছেন শুনেছ ?

জী। আমি কেন শুনবো মাণিক শুনেছে—

তর্ক। ওঃ মাণিক শুনেছে ! কোথা মাণিক ?

মাণিক। (দূর হইতে) আজ্ঞে এই যে—

তর্ক। ছেলে না মেয়ে কোলে হে ?

মা। আজ্ঞে ছেলে—

তর্ক। ছেলে কোলে করে বলছ মুখুয্যে গিন্নি তোমায় ছোট বাউন বলেছে ?

মাণিক মুস্কিলে পড়িয়া আমতা, আমতা করিতে লাগিল।

তর্ক। বোঝা গেছে ! সেই মাণিক তো ! টোল ছেড়ে গিয়ে তাড়ার ভয়ে খুড়োকে বল্লে তর্কসিদ্ধান্ত তাড়িয়ে দিয়েছে ! ওর অভ্যাস আছে বানিয়ে মিথ্যে বলা। তা ছাড়া এক্ষেত্রে মূলে একটু কিছু আছে বইকি, অমনি কি অত জোর ধরে মাণিক ? দক্ষদিদি বলে ঠিক শিবের মাথায় চড়লে ঢোঁড়া গরুড়কে দেখে ফোস্ করে—কথা মিথ্যে নয়—

কথা শুনিয়া মাণিক তো নিভিয়া গেল। জীবন অপ্রস্তুত। ইশেন নীরব। নবীন একা সপ্রতিভ ভাবে বলিল বলিইছিতো মাণিক ভুল শুনেছে না হয় ভুল করেছে ; বড় ঘরের মেয়ে উনি, ওঁর মুখে বেফাঁস কথা বেরুবে কেন ?

তর্কসিদ্ধান্ত বলিলেন 'আমার যদি কিছু ত্রুটী হয়ে থাকে মাণিকের হয়ে পঙ্কুর পুজো করায়, আমায় মাপ করো, কেন ভদ্রলোকের মেয়েকে বিপন্ন করা জীবন ভায়া···বাউনের ঘরে জন্মে:একটু মনুষ্যেত্বের পরিচয় দিও, পরকালটা আর ঝর্ ঝরে করো না—

এই বলিয়া তর্কসিদ্ধান্ত বাড়ীর মধ্যে গেলেন। এবং যজ্ঞেশ্বরীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"কাজ কি মা ; চেপে গেলেই হতো ! মাণিকের আঁচড়ে তর্কসিদ্ধান্তের চামড়ায় ঘা হবে না ; সে তো পরের ছেলে ; নিজের ঘরের লোকের কামড়েই বড় আমল দিচ্ছি না ; তুমি এক কাজ করো বাছা, মাণিককে ডেকে দিচ্ছি তার কাছে ঘাট স্বীকার করে দায় উদ্ধার হও আজকের মত।" যজ্ঞেশ্বরী রাজী হইলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মাণিককে ডাকিয়া

লইয়া যজ্ঞেশ্বরীর কাছে বোঝা পড়া করাইতে লইয়া গেলেন। মাণিক বাহিরে আসিয়া সমবেত ব্রাহ্মণদের কাছে বলিল মুখুয্যে গিন্নি আমার কাছে মাপ চেয়েছেন আর আমার তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই—"। শুনিয়া উপস্থিত আসন্ন ফলাহার-প্রত্যাশী দ্বিজকুলের হর্ষকাকলীতে সভা মুখর হইয়া উঠিল। হইল না, কেবল মহেশ ইশেন ও জীবন। জীবন রাগিল তার কারণ সভামধ্যে অগ্রজ কর্তৃক এই তিরস্কার। ইশেনের চটীবার মুখ্য কারণ তার তোতলামিকে লক্ষ্য করিয়া তর্কসিদ্ধান্তের দাপড়ী দেওয়া। গৌন কারণ কিছু-দিন পূর্ব্বে তর্কসিদ্ধান্ত তাহাকে চামার বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। হেতু এই প্রতিবেশীর এক গর্ভবতী গাভী ইশেনের শাকের ক্ষেতে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক নবজাত পালম শাক গুলি ধ্বংস করে; এবং ইশেন প্রচণ্ড কোপে কুপিত হইয়া অবলা জন্তুকে নৃশংসের মত প্রহার করিতে থাকে; এই ব্যাপার তর্কসিদ্ধান্তের নজরে পড়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "হাঁহে ইশেন তুমি বাউন না চামার?"। মহেশ সন্তুষ্ট নয়, কেন না এত সহজে উভয়কে ছাড়ান দেওয়া হইতেই পারে না, তা ছাড়া তার গভীর উদ্দেশ্য সাধন হয় না। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়…পূজাবেশ বদলাইবার জন্য বাড়ী ফিরিলেন। তিনি ভাবিয়া গেলেন যে মাপ ঘাট স্বীকার করায় সব মিটিয়া যাইবে; কিন্তু মহেশের তাহাতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়; কাজেই মহেশ সমবেত ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করিয়া বলিল—"তোমাদের কি মৎ-তা হলো?" জীবন ও ইশেন মাণিকের সঙ্গে কি একটা কানাকানি পরামর্শ করিল। পরে নবীন বলিল, "কিন্তু একটা কথা—কথাটা তোমার গিয়ে হচ্চে—ভোলানাথ কোথা—সব বিষয়ে স্পষ্টতা ভাল, বিশেষ যথন বল্লশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নিয়ে কথা—" ভোলানাথ আসিল, পিছনে পিছনে বিজয় আসিল, বিজয় গদ্যময় পল্লী জীবনের কদর্য্য গদ্যময় বিশ্রী ব্যাপার দেখিয়া——ঘৃণায় ও রাগে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ভবানী ও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া এক ধারে অলক্ষ্যে বসিল। সে দেখিল তার পিসে বাবু স্বয়ং মধ্যস্থলে, ভাসুর কোণায় সিংহের মত গোঁপ ফুলাইয়া বসিয়া আছেন। অন্তরঙ্গ ঈশেন, জীবন, নবীন প্রভৃতি পার্শ্বদপরিবেষ্টিত হইয়া……সভা অলংকৃত ও কৃতকৃতার্থ করিতেছেন। পঞ্চু অধৈর্য্য হইয়া বলিল "কথাটা কি নবীন খুড়ো বলে ফ্যালো।" নবীন বলিল,—"কথাটা হচ্চে—ভোলানাথকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ করে মর্য্যাদায় মূল্য দিতে হবে নচেৎ কোনো কুলীন সন্তান অনাচারের বাড়ীতে অন্ন ছুঁতে পাবে না"। মহেশ—"হ্যাঁ সেটাতো

করবেই কথাই হয়ে আছে মাষ্টার তা জানে। না কিনা মাষ্টার বল?"

ভোলানাথ বলিল— "বলেন যদি তা করতে হবে, করবো কি বলুন—"

ম। করা করি কিহে সামাজিকতার এ অঙ্গ যে?

প। কোন্ অঙ্গ চৌধুরী মহাশয়? (মৃদু হাস্য)

নবীন। বাবাজী মান্য ব্যক্তির কথা গ্রাহ্যনীয় করো—যাগ তার পর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য অবশ্য এটা যোলো আনার মত আমার স্বনিজস্ব কথা বা মত নয় কথাটা—

প। অবশ্য তাতে আর ভ্রান্তমীয় কিছুই নেই, বলে যান—

ন। তর্ক সিদ্ধান্ত মশাই পংক্তি ভোজনে যোগ দিলে মাণিক পংক্তিতে যোগ দেবে না আর মাণিক না বস্‌লে আমরা বস্‌তে পারিনি—কেমন কিনা চৌধুরী মশাই—

ম। দশের মতেই মত! আমারা তো দশের পালনকর্ত্তা দশে চক্রে ভগবান তো-কি বল ঈশেন?

ঈ। শা-শা শাস্ত্রেই আছে "চক্রং চক্রং মহাচক্রং যত্র ভূত ভগবান"

ম। কি বলো ভোলানাথ তুমিই তো কর্ম্মকর্ত্তা?

ভো। আমার মান অপমান দশের হাতে, যা বলবেন যা কর্ত্তব্য তাই করতে হবে—যোলো আনার যদি তাতেই মত—

ম। মত সেই রকমই তো দেখাচ্ছে—হে না ঈশেন?

বিজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে উঠিয়া উত্তেজিত—কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল,"কাকা বলচেন কি? কি করে—এই অপমানকর প্রস্তাবে আপনি মত দিচ্ছেন? না আসুন আমি মায়ের মত জেনে আসি ছিঃ ছিঃ—"বলিয়া বিজয় দ্রুত পদে বাড়ীর ভিতর গেল। বেশী দূর যাইতে হইল না যজ্ঞেশ্বরী অন্তরালে দ্বারে কাণ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—বিজয়কে বলিতে ও হইল না; তিনি ইচ্ছা করিয়াই সভার সকলকে শুনাইবার মতলবে দৃপ্তা সিংহিনীর মত গুরু গম্ভীর উচ্চ স্বরে বলিলেন—"বাবা বিজু সভায় এই কথা আমার নাম করে বল তো চৌধুরী মশাইকে-শুদ্ধমাত্র এক সিংহের মান রাখবার জন্যেই হাজার শেয়ালকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যায়? চাইনি আমি কাকেও এ বাড়ীতে।"

কথা গুলি সকলেই শুনিল; নারী কণ্ঠ হইতে এই অপ্রত্যাশিত বজ্র-কঠোর সুচি-তীক্ষ্ণ কথা শুনিয়া সমস্ত সভা নীরব নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ।

পঙ্কু বুঝিল ইহার ফলাফল কতদূর গড়াইবে। সে এই মহিমময়ী নারীর

ঔদার্য্যে মহত্ব ও তেজ দেখিয়া সভ্রমে পুলকিততনু হইলেও পরিণাম ফল ভাবিয়া ভীত হইয়া ছুটিয়া মামাকে গিয়া খপর দিতে গেল। মহেশ আকাশ হইতে পড়িয়া যাইবারও বাড়া হইল। সে নতশির হতসর্ব্ব, গুম হইয়া বসিয়া রহিল। ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়া কাণ্ড দেখিতেছিলেন; মহেশের এই যে প্রাণপণ চেষ্টা একজন যথার্থ গুণীমানী সাধু পণ্ডিত ব্যক্তিকে অপদস্থ করা ও এক দেবীতুল্যা অসহায়া বিধবা নারীরত্নকে গ্রামের মধ্যে নির্য্যাতনের পাত্রী করিয়া রাখা ইহার দৃশ্য ও চিন্তা তাহার মহৎ প্রাণকে যার পর নাই ব্যথা দিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তার বেদনা ও লজ্জার কারণ এই যে ওই স্বার্থপর নীচ হীনমনা গুরু স্থানীয় আত্মীয়টী তাহাদের বংশের ও ঘরের নামের উপর দুরপনেয় কলঙ্ক পঙ্ক মাখাইতেছে। তার পর সেই দর্পিত স্পর্দ্ধা যখন ওই দরিদ্র অবলা মহীয়সী নারীর পায়ের ঈষৎ টীপনীতে নত হইয়া মাটীতে মিশাইল তখন তাঁহার হৃদয় ভক্তিআনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বলিলেন "আমার বন্ধু বিজয় বাবুর মাতাঠাকুরাণী যা বল্লেন তা আপনারা শুনলেন তো আজ তিনি তাঁর যে পায়ের কড়ে আঙ্গুলের চাপে আমাদের মত জমিদারের পাশব স্পর্দ্ধার জঘন্য তেজকে ভেঙ্গে দিলেন সেই পায়ে আমার কোটী নমস্কার। কেবল আমার লজ্জা এই যে আমার এই ঘৃণিত আত্মীয়টীর মাথায় ঠেকাতে তাঁর পা অপবিত্র হয়েছে কিন্তু আনন্দ এই যে, যে মর্য্যাদার জন্যে উনি নগদ যৎকিঞ্চিৎ মূল্যের প্রস্তাব করছিলেন এই দেবীর পাদস্পর্শে তাঁদের মর্য্যাদা লক্ষগুণ বেড়ে গেল।"

ভবানী চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সমস্ত সভা একেবারে নির্ব্বাক। প্রথমতঃ ভবানীকে এ বাড়ীতে আজকের দিন এই সভাতে দেখিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ তার মুখে আজ এইরূপ মর্ম্মান্তিক শ্লেষতিক্ত অপমান বাণী শুনিয়া বিশেষ এই শত্রু পুরীতে ভয় সম্ভ্রমে অভ্যস্ত অধীন প্রজাদের সুমুখে ছেলের বয়সী শ্যালক পুত্রের মুখ হইতে শুনিয়া মহেশ মৃতের মত অসাড় ও বিবর্ণ হইল; তবে জমীদারী সেরেস্তার নায়েবী ম্যানেজারী করার চামড়া, বিশেষ বেশীক্ষণ সে ভাব রহিল না, বরঞ্চ সামলাইয়া উঠিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া গুরুজন ভাব ফলাইয়া বলিল "বাবাজী সব যায়গাতেই কি আমাদের কাজে কর্ম্মে কথায় টেক্কা দিতে হবে? যখন জমীদারী পেয়ে গদি দখল করবে তখন তোমার নুন খেয়ে গোলামি করিতো তখন দু কথা বলো, দু ঘা মারো সইব; এখন না—তোমার খুড়োর চাকর আমি তোমার নয় বাবাজী, এখন হতেই মারতে

যেও না বাবাজী, বাঘ কি বেরাল ঠিক হোগ আগে—"। ভবানী কি বলিতে যাইতেছিল। মহেশ বাধা দিয়া বলিল—"থাক্ আর শুনতে চাইনি রায় মশাই। এর কাছে এর উত্তর শুনচো। সেথানেই জবাব দিহি হবে—"। বলিয়া মহেশ উঠিল; অন্তরঙ্গ দু এক জন পার্শ্বদ ও উঠিল। মহেশ স্থান ত্যাগ করিল। ঈশেন, জীবন নবীন ও জয়রাম ও তাহাই করিল। এমন সময় পঞ্চু ও আগে আগে তর্ক সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত। তর্ক সিদ্ধান্ত দেখেন ব্রাহ্মণরা উঠিয়াছে, এ ওঠা ফলার ভোজনের জন্ম গা তোলা যে নয় তা তিনি পঞ্চুর মুখে পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনিয়া আন্দাজ করিলেন। তিনি নিজের মানাপমান ভুলিয়া যজ্ঞেশ্বরীর ম্যান অপমানের চিন্তায় ব্যস্ত হইলেন। অসন্তুষ্ট সমবেত ব্রাহ্মনদের বসিতে বলিয়া দলপতিদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— "চৌধুরী মশাই—শুনুন আমার কথা, আমি না খেলে আর আমার বাড়ীর যারা তারা না খেতে এলে যদি মাণিক এবং আপনারা খেতে বসেন তাতেই আমি রাজী আছি; আমি বলছি আমরা চল্লাম আপনারা খোলসা মনে মর্য্যাদা বাঁচিয়ে ব্রাহ্মণকন্যার মর্য্যাদামান রাখুন! তবে মর্য্যাদার মূল্য স্বরূপ ভোলানাথের কাছে শুনছি বাউন পিছু পাঁচ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। এমন শুরুতর শাস্তি বিধানের মানেটা কি? জন পঞ্চাশ বাউন এসেছেন তাঁদের সবাইকে মর্য্যাদা দিতে গেলে গরীব যে মারা যাবে? আমার মতে নাম মাত্র একটা পরিমাণ ধরে নিন, ধরুন আট আনা কি চার আনা!"

জয়রাম। (বিদ্রূপ স্বরে) কুলিনের ছেলের মর্য্যাদা অত সস্তা নয়—আপনার তাতে সন্তোষ হতে পারে।

ভবানীর অসহ্য হইল, বার বার এই পুজনীয় সর্ব্বজননম্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণের অপমান এই সব লোকের হাতে এ দৃশ্য তাঁর অসহ্য হইল। তিনি রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এক পয়সা মর্য্যাদা নয়, খেতে হয় খেয়ে যাগ সব, ভদ্রতা করে উনি নেমন্তন্ন করেছেন ওঁর মাতৃ পিতৃ দায় নয়, ভদ্রতা বোধ যদি থাকে খেয়ে যা ও বসে সব। ব্যবসাদারীর প্রশ্রয় দেবেন না জ্যাটা মশাই।" তর্ক সিদ্ধান্তের অন্ত চিন্তা গেল, ভবানীর মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'ওই বাড়ীতে ওই সংস্কার আচার ব্যবহারের মধ্যে বাড়িয়া বাঁচিয়া এমন ছেলে কেমন করিয়া হইল! তাঁহার একটা পণ্ডিতীসুলভ ধারণা ছিল ভবানী ও খুড়ার মত না হইয়া যায় না। ভবানী সিদ্ধান্তকে নিরুত্তর দেখিয়া বিজয় ও পঞ্চুর "দিকে তাকাইয়া বলিল,—"আপনারা কি বলেন?" উভয়েই চট করিয়া উত্তর দিল

"ঠিক ওই বলি।" বিজয় আরও বলিল মর্য্যাদাটা কেন বুঝিলাম না! পঞ্চু বলিল "হ্যাঁ, ওরা এঁর বাড়ী পাত পেতে এঁর সাতকুলকে কৃতার্থ করছেন আর ওঁদের এই বাড়ীর লুচি মণ্ডা খেয়ে সুতৃপ্ত ও উদর পুরিত হলেও সনাতন বংশ ধর্ম্ম ও কুল মর্য্যাদা কলুষিত হয়ে উঠ্‌লো কাজেই কিঞ্চিৎ কাঞ্চন দিয়ে ধর্ম্মটাকে ঘসে দিলে ওটা আবার সনাতন জ্যোতিতে ফুটে উঠ্‌বে! পরলোকের পথের কাঁটা উপড়ে যাবে—সোজা কথাটা—"

তর্কসিদ্ধান্ত অভ্যাগত নিমন্ত্রিতরা হাঁ না কিছুই বলে না দেখিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। নবীন ফিরিয়া আসিয়া দু এক জনের কানে কানে কি বলিল। সকলেরই দেখা গেল একটা ভাবান্তর হইল। অনিচ্ছা সত্ত্বে একে একে সকলে উঠিল। যাহারা ছিল তাহারা অনেক লোভেই বসিয়াছিল; মহেশের কোপ-কুটীল ভ্রুকুটীতে ও ফলাহারের মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রথম সঙ্গে যে ছেলে পুলে গুলা ছিল তাহারা অভুক্ত, ক্ষুধায় কাতর বাড়ী গেলেও কিছু খাবার পাইবে না; দ্বিতীয় বাড়ীর মেয়েরা ছাঁদার অপেক্ষায় হাঁ করিয়া বসিয়া আছে, তৃতীয় মর্য্যাদার দরুন পাঁচ পাঁচ টাকা পাইবার আশা ছিল। কাহারো কাহারো পক্ষে মাসের রোজগার! চতুর্থতঃ দক্ষিণা এক আধুলি। পঞ্চমতঃ মধ্যাহ্নের উদরপুত্তির ফলে রাত্রির অন্নব্যয় নিবারণ! কিন্তু নবীন যে খপর আনিয়াছিল তা সাতিশয় ভয়াবহ; আর থাকা চলে না। সকলে মন ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল; ছেলেগুলা ভাবিল ফলাহারের ডাক্! বেচারাম ব্যাচারীর কি সে দুঃখ, ছেলেগুলা বাড়ী যাইতে হইবে শুনিয়া উঠিতে চায় না। দুঃখ দেখিয়া ভবানী ও পঞ্চু ভারি দুঃখিত হইল। ভবানী বলিল আপনারা তা হলে খেতে বসবেন না? বেচারাম বলিল "না হুজুর, চৌধুরী মশাই এর আজ্ঞে লংঘন কি করে করি বলুন হাজার হোগ তাঁর আশ্রয়ে বাসতো!

ভ। তিনি কি বলেছেন?

বে। (এ দিক ও দিক তাকাইয়া) আজ্ঞে বাবু না কি বলে পাঠিয়েছেন যে এ বাড়ী পাত পাতবে তার—

ভ। তার কি বলুন না?

বে। বাবা তুমি ও রাজা তিনি ও রাজা! নাই বা বলি কি করে—আমার যে বাবা—না যাইলে রাজা বধে যাইলে মারীচ—করি কি বাবা।

ভ। বলুন আপনি ভয় নেই

পঞ্চু। বল না বেচা খুড়ো ভয় কি ওনিই তো দু দিন পরে তোমাদের—

বে। হ্যাঁ বাবা রাজা হবেন বাঁচিয়ে রাখুন ভগবান—আমরা কি তদ্দিন—কথাটা কি বাবা তিনি হলেন ম্যানেজার হর্ত্তা কর্ত্তাই বটে, তা যদি এক দিনের খুচির লোভে ভিটে লোপ পায় থাক্ বাবা তোমাদের কল্যেণে অনেক জুটবে—

ভবানী সকলকে ডাক দিয়া বলিলেন—"আপনারা চলুন কোনো ভয় নেই আমি ভরসা দিচ্ছি।" ভরসা পাইবার আগেই জনকতক চলিয়া গিয়াছে। বাকী ছিল জন দশ, ছেলে পুলে লইয়া জন ২৫।২৬। নবীন তাহাদেরও ভাংচি দিতে লাগিল। ভবানীর একটা তীক্ষ্ণ চাহনিতে ভয় পাইয়া সে নিজে সরিয়া পড়িল।

প্রথম সত্বে রাজি তর্কসিদ্ধান্ত ভোলানাথকে সবান্ধব মহেশকে ফিরাইতে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ভয়ে ভাবনায় বিরক্তি ও কান্তিতে তিক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল। (ক্রমশঃ)

তামিল সাহিত্য

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ]

বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক অগস্ত্য ঋষি দক্ষিণ যাত্রা করিয়া সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে যতই মতবাদ হউক না কেন, তিনি যে আর প্রত্যাগমন করেন নাই তাহা আমাদের 'অগস্ত্য যাত্রা' কথাটীতেই সপ্রমাণ। আকাশ মার্গে বিন্ধ্যপর্ব্বতের গতিবিধি নিবারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কিনা সে কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। তবে এটা খাঁটি সত্য যে অভ্রভেদী পর্ব্বত তিনি অতিক্রম করার পর হইতে সেই পথে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণাত্যে মনুষ্যের চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ রূপকের অর্থে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উঁচু মাথা নীচু হইয়াছে। আমাদের পুরাণের কথার বোধ হয় এই অংশ টুকু বিনা বিসংবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে বিন্ধ্যপর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল কিনা এবং অগস্ত্য ঋষি সেই সমুদ্র শোষণ করিয়া সমুদ্রগর্ভকে দেশে পরিণত করিয়াছিলেন কিনা সে আলোচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে পড়িয়াছে। সুতরাং আমাদের সে বিষয়ে নিরস্ত থাকাই শ্রেয়ঃ।

তামিল সাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে অগস্ত্য ঋষি সদল বলে তামিল ভাষা ভাষী অন-আর্য্যগণের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়ী ভাষা সমূহের মধ্যে

তামিল ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং তামিল সাহিত্যই সমধিক সম্পন্ন। এই সাহিত্যে অগস্ত্য ঋষির প্রভাব এত অধিক যে প্রাচীন কালে তামিল গ্রন্থকার মাত্রেই স্ব স্ব রচনা অগস্ত্য ঋষির নামে চালাইয়া দিয়া আত্ম গোপন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন। যে কোন ও গ্রন্থকার যাহা কিছু লিখুন না কেন সেইটাই অগস্ত্য ঋষির রচনা বলিয়া তিনি প্রচার করিতেন এবং অতি সাবধানে নিজের নাম গোপন করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি কালি দাসের স্কন্ধে ও এই প্রকার বহু রচনা ন্যস্ত করা হইয়াছে। তাই অন্ত রস-রসিক কবির নাম জ্যোতিষ নীতি শাস্ত্র, প্রাকৃত সাহিত্য প্রভৃতি অসংখ্য স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তামিল সাহিত্যে অগস্ত্য ঋষি কোন :ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা এক্ষণে জানিবার কোন ও উপায় নাই। কিন্তু তামিলভাষাভাষিগণের অসংখ্য রচনাই তাঁহার নামে পরিচিত। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তিনি তামিল ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তিনিই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রচারক, তিনিই রসায়ন (chemistry or alchymy) শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, তিনিই ইন্দ্রজাল বিদ্যার আবিষ্কারক, ভাস্কর্য্য ও স্থপতি শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই জ্যোতিষ শাস্ত্র ও ব্যবহার শাস্ত্রের রচয়িতা, এবং তিনিই তামিল বর্ণমালার উদ্ভাবন কর্ত্তা। এই সকল অসংখ্য বিষয়ে তিনি নাকি তামিল ভাষাভাষিগণের জন্য অর্দ্ধ শতাধিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বর্ত্তমান কালে এই সকল গ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থের কিছুই অবশিষ্ট নাই। কেবল মাত্র তদ্‌রচিত ব্যাকরণের অংশ বিশেষ এখন ও বর্ত্তমান আছে বলিয়া তামিলভাষিগণ:নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান তামিল ভাষা সে ব্যাকরণের আইন মানে না। কারণ সেটা প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণ।

অগস্ত্য ঋষির এক জন সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন; তাঁহার নাম এক্ষণে অবিদিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "তোল-কাপ্পিয়ম্‌"; এবং গ্রন্থের নাম হইতে তাহা হইয়াছে "তোল-কাপ্পিয়নার্‌" 'তোল্‌' শব্দের অর্থ 'প্রাচীন' এবং কাপ্পিয়ম্‌" কাব্য; সুতরাং গ্রন্থখানির নামের অর্থ প্রাচীন কাব্য। গ্রন্থখানি কিন্তু কাব্য গ্রন্থ নহে.। গ্রন্থ খানি ব্যাকরণ শাস্ত্র; অলঙ্কার শাস্ত্র ও বলা যাইতে পারে, কারণ কাব্যের লক্ষণ ও কাব্য প্রণয়নের রীতি ও পদ্ধতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। কথিত আছে "তোল কাপ্পিয়নার" তাঁহার ব্যাকরণে অগস্ত্য প্রণীত ব্যাকরণের সারাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন, তবে তিনি বিদ্যাসাগরের গোপাল নামক সুবোধ বালকের ন্যায় শিষ্য ছিলেন

না ; তিনি শ্লয়্‌শার্‌ শিষ্য ক্রগ্‌মানের ন্যায় গুরুদ্রোহী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাই তিনি অগস্ত্যের ভাষা বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা করিয়া আত্মমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার গ্রন্থে কাব্যরচনা উদাহরণ স্বরূপ অসংখ্য প্রাচীন কাব্যের উদাহরণ আছে। সংস্কৃত কাব্যাদর্শ সাহিত্যদর্পনে যেমন উদাহরণ স্বরূপ বহু প্রাচীন কবির রচনার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় এই গ্রন্থে ও সেই প্রকার আছে। সুতরাং প্রাচীন তামিল সাহিত্যের কোন ও উদাহরণ দেখিতে হইলে এই গ্রন্থে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। এই হিসাবে এই গ্রন্থ খানি তামিল সাহিত্যের একটী মূল্যবান রত্ন। তামিলগণ বলেন যে এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন। কিন্তু এই গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে যে বহু তামিল সাহিত্যে গ্রন্থ ছিল এবং বহু বৈয়াকরণ যে ইহার পূর্ব্বে তামিল ভাষাও তামিল কাব্যের আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার এই গ্রন্থ হইতেই সুপরিস্ফুট। ইহার গ্রন্থে যে কেবল প্রাচীনকাব্য ও প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শ ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র বুঝাইবার জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নহে। ইনি বহু প্রাচীন ব্যাকরণগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সমালোচনা করিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন মত গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা ভাষায় প্রচলিত দেখিয়াছেন তাহাই ব্যাকরণের বিধি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি কোথাও সংস্কৃত বৈয়াকরণ: পাণিনির ন্যায় ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া মাথা ঘামান নাই। প্রাচীন শাস্ত্রকার ও কবিগণের মত পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ 'এন্‌মনার পুলবর্‌' (= কবি বলেন, বা বৈয়াকরণ বলেন) এই বাক্যটী দৃষ্ট হয়। ইহার গ্রন্থেই যে সকল লুপ্ত তামিল গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলান্বেষণ করিতে যাইলে অনৈতিহাসিক অন্ধকার যুগে আসিয়া পৌঁছিতে হয়। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে যে সাহিত্য ছিল, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা এক্ষণে একপ্রকার অসম্ভব। সেই জন্য 'তোল্‌কাপ্পিয়ম' গ্রন্থকেই তামিল সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা যায়।

দুঃখের বিষয় ইনি কোন্‌ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের ন্যায় তামিল সাহিত্যিকগণও আত্ম-স্মৃতি লোপ করিবার জন্যই সযত্ন ছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের স্রোতের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকে ভাসাইয়া দিয়াই কবিগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। কত কবিই যে স্ব স্ব রচনাকে ঋষি অগস্ত্যের নামে বিলাইয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তামিল জাতিও সাহিত্য হইতে

শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সাহিত্যের সমাদর করিয়াছেন, স্মৃতিমধ্যে প্রাচীন সাহিত্য গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, সৎসাহিত্য ও অসৎসাহিত্যের সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু কে কোন্ গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন, কোন্‌খানি প্রাচীন, কোন্‌খানি অর্ব্বাচীন, কোনও গ্রন্থের রচয়িতা আছে কি না আছে তাহার বিচার লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। ঐতিহাসিক আলোচনা বা সমালোচনা প্রবৃত্তি অতি আধুনিক যুগে ইউরোপীয়গণের নিকট পাইয়াছেন। তৎপূর্ব্বে এ প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না।

"ঞানন্নূ" বা জ্ঞানশতক নামক একখানি আধুনিক নীতিশাস্ত্রমূলক কবিতা গ্রন্থ মহর্ষি অগস্ত্যের নামে প্রচলিত। কিন্তু ইউরোপীয়গণ ইহার মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পান। গ্রন্থখানি তামিল হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমাধিক সমাদৃত। কারণ ইহার উপদেশে কোনও ধর্ম্মবিশেষের প্রতি কোনও আস্থা প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার উপদেশ সর্ব্বধর্ম্মের উপাসকগণের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ বাঞ্ছনীয়। আমাদের আধুনিক কবি শ্রীযুক্ত ক্যলিদাস রায়কে এবিষয়ের জন্য কোমর বাধিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থের একটী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। Caldwell এই কবিতার মধ্যে নামহীন খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেশের উপলব্ধি করিয়াছেন।

Worship thou the Light of the Universe; who is one;
who made the world in a moment, and placed good men in it;
who afterwards himself dawned upou the earth as Guru.
who without wife or family, as a hermit performed austerities,
who, appointing loving sages (Siddhas) to succeed him,
Departed again into heaven—worship him.

খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতক হইতে দ্বাদশশতক পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে জৈনগণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইহাঁদের প্রভাবে পাণ্ড্য বা তামিলদেশে চারিশতাধিক কাল সাহিত্যসেবা চলিয়াছিল। নালন্দার বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ বহুকাল বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিয়াছিল, তিব্বত ও চীন প্রভৃতি দূরদেশ হইতে অসংখ্য বৌদ্ধধর্ম্মী ধর্ম্মপিপাসু যেরূপ ধর্ম্মালোচনার জন্য নালান্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে গতায়াত করিয়াছিলেন, প্রাচীনকালে মদুরা (মধুরা বা মথুরা শব্দ সমার্থক) সহরে সেইপ্রকার একটী জৈন বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নালন্দার ন্যায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরূপ প্রতিষ্ঠা বা সমাদর হয় নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু তামিল কাব্য ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং জৈন সাহিত্যের আলোচনার জন্য তামিল সাহিত্যের এই সকল গ্রন্থের উদ্ধার সাধন ও প্রচার আবশ্যক। জৈনগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-বিরোধী হইলেও তাঁহাদের সভ্যতা ও তাঁহাদের সাহিত্য ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা ও সংস্কৃত্য সাহিত্যের নিকট ঋণী। জৈন তামিল সাহিত্য সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া স্বরূপ হইলেও একটা বিষয়ে তামিল সাহিত্য মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছে। সেটা তামিল নীতি সাহিত্য। নীতি-উপদেশ-মূলক যেসকল তামিল কাব্য প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে অনুকরণ অপেক্ষা মৌলিকতার ভাগ এত অধিক যে অনেক তামিল-সাহিত্যবিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে এই বিষয়ে তামিল সাহিত্যই সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা সম্পন্ন।

তিরুবল্লুবর্ প্রণীত কুড়াল্ একখানি নীতিশাস্ত্র বা পুরুষার্থ বিষয়ক সুপ্রতিষ্ঠিত তামিল কাব্য গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ বিষয়ে ১৩৩০ পঙক্তি কবিতায় রচিত সূত্র আছে। এখানি অতি উপাদেয় এবং প্রাচীন : তামিল কাব্য বলিয়া সমাদৃত। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ তামিল সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। জৈনধর্ম্মের মূলমন্ত্র "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এবং "সর্ব্ব জীবে সম দয়া" এই গ্রন্থেরও মূল মন্ত্র। ইহাতে সাঙ্খ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যে প্রচারিত বেদান্তদর্শনের কোনও প্রভাব নাই। শৈবধর্ম্মের তান্ত্রিকতা বা বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তিবাদ ইহাতে নাই। প্রাচীন ব্যাকরণ ও ছন্দোগ্রন্থাদিতে ইহার বহু কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ বা বেদান্তাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের দেশব্যাপী প্রভাব এই গ্রন্থে লক্ষিত হয়না বলিয়া তামিলভাষাবিৎ ইউরোপীয়পণ্ডিতগণ ইহাকে অতি প্রাচীন তামিল কাব্য বলিয়া মনে করেন। এবং Caldwell বলেন খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার রচনাকাল বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

কুড়াল্ গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা তিরুবল্লুবর্ হীন কুলোদ্ভব, 'পড়েইয়' বংশোদ্ভূত। এই জন্য মদুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভিজাত্যাভিমানী পরিচালকগণের নিকট প্রথমে ইহার সমাদর হয় নাই। কিন্তু তাহার ফলে মদুরা বিশ্ববিদ্যালয় রাজাদেশে বিলুপ্ত হয় দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি নক্কীরর্ এই গ্রন্থখানিকে মদুরা কলেজের অষ্টাদশ

কাব্যগ্রন্থের অন্তিম কাব্যগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এঅপমান সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। ইহার পরেই মদুরা কলেজ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তিরুবল্লুররের প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। 'বল্লুবন্' শব্দের অর্থ 'পড়েইয়' পুরোহিত। তিরুবল্লুবস্ (শ্রীবল্লুবন্) শব্দে ঋষি স্থানীয় পড়েইয় পুরোহিত বুঝায়। তাঁহার জন্ম বিষয়ে দুইটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথমটী অনুসারে তিনি পড়েইয় কুলোদ্ভূত। দ্বিতীয়টী অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে পড়েইয় মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য ভগিনী অউবেইয়ার্ এর নামে বহু প্রাচীন করিতা প্রচলিত আছে। কথিত আছে ইনিও একখানি প্রাচীন কবিতা গ্রন্থের রচনা করিয়া ছিলেন। তাহা এক্ষণে লুপ্ত। তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় তাঁহারও প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। তামিল ভাষায় অউবেই বা অউবেয়ার্ শব্দে 'মাতা' বা 'মাতৃস্থানীয়া পুজনীয়া মহিলা' বুঝায়।

'নালড়িয়ার্' আর একখানি প্রাচীন কবিতা গ্রন্থ। ইহার ছন্দোরূপে চতুষ্পদী বৃত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'নালড়িয়ার' বা চতুষ্পদী। ইহারও গ্রন্থকারের বিষয় কিছুই জানা যায় নাই। এখানিও মদুরাবিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টাদশ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম। ইহার রচনায় বিচার ও অলঙ্কারের বাহুল্য আছে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে কুড়াল্ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহারও প্রতিপাদ্য বিষয় "ত্রিবিধ পুরুষার্থ" বা 'ধর্ম্ম, অর্থ, কাম'।

'চিন্তামণি' একখানি অতি প্রাচীন জৈন সম্প্রদায় রচিত তামিল মহাকাব্য। ইহাতে ১৫০০০ চরণ বা কবিতার পঙ্ক্তি আছে। ইহারও প্রণয়িতার বিবরণ নাই। ইহার রচনার রীতি অতি উৎকৃষ্ট হইলেও তামিলগণের মধ্যে যথোচিত চর্চ্চা হয় নাই। অথচ যাঁহারা ইহা পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহাকে কুড়াল্ অপেক্ষা প্রাচীন বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহারই অনুকরণে ইটালী দেশীয় 'বেশ্‌চি' নামক জনৈক তামিল কবি 'তেম্বাবণি' নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি চিন্তামণির অনামা রচয়িতাকে 'তামিল কবির সম্রাট্' বলিয়াছেন।

জৈনগণ বহু কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন তামিল ভাষার একখানি অভিধান 'দিবাকরম্'। অভিধান খানির রচয়িতা 'শেন্দনার্' নামক মদুরা কলেজের জনৈক সভ্য। 'পিঙ্গলন্দেই' ও 'চূড়ামণি নির্ঘণ্ট' আর দুইখানি জৈনরচিত অভিধান। দ্বিতীয়খানির রচয়িতা 'মণ্ডল পুরুষ' নামক একজন

জৈন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের লোক। ‘পবণন্তি’ নামক আর একজন জৈন ‘নন্নূল্’ নামক বিখ্যাত তামিল ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের এই খানিই প্রামাণিক ব্যাকরণ।*

তামিল রামায়ণ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য। ইহার রচয়িতা ‘কম্বর্’ রাজা রাজেন্দ্র চোলের রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ ও তামিল রামায়ণে যে সম্পর্ক তাহাতে কম্বরের মহাকাব্যকে বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ না বলিয়া বাল্মীকির আদর্শে বা বাল্মীকির উপাখ্যানমাত্র লইয়া রচিত কাদম্বরীর ন্যায় পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ একখানি মহাকাব্য বলা যায়। বাল্মীকির রচনার স্থানবিশেষে অলঙ্কারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আড়ম্বর আছে, স্থানবিশেষে স্বাভাবিক কবিনৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়, স্থানবিশেষে ভাষা শোক দুঃখাদি করুণ ভাবের আবেগে পূর্ণ, স্থানবিশেষে আনন্দের উচ্ছ্বাসে বর্ণনা মুখরোচক, স্থানবিশেয়ে কবি নিতান্তই গদ্যরসাত্মক আবার স্থানবিশেষে অন্যরূপ। কিন্তু কম্বরের রামায়ণের ভাষা মাজা ঘষা, ঝর্‌ঝরে তর্‌তরে, সর্ব্বত্রই পাণ্ডিত্বের পূর্ণ বিকাশ, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, ছন্দোজ্ঞানের চরম নিদর্শন। বাল্মীকির রামায়ণ স্বাভাবিক কাব্য, কম্বরের রামায়ণ সর্ব্বত্রই পাণ্ডিত্বের কৃত্রিমতাপূর্ণ। বাল্মীকির কাব্য যেন স্বাভাবিক বনভূমি, মুনিগণের তপোবন এখানে কোথাও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অকৃত্রিম বিকাশ ও নানাবিধ বন্য কুসুমের স্বাভাবিক সৌরভ বিকিরণ, কোথাও ভূমি সমতল ও তৃণাচ্ছাদিত, কোথাও বন্ধুর ও উচ্চ নিম্ন। কম্বরের রামায়ণ যেন সযত্ন রক্ষিত কৃত্রিম পার্ক্; এখানে সর্ব্বত্রই সমতল ভূমি, কোথাও বন্ধুরতা বা উচ্চ-নিম্নতা নাই; সমস্ত পার্কটাই সমভাবে কর্ত্তিত তৃণাচ্ছাদিত, এ তৃণের সর্ব্বত্রই সমভাবে ঘন. ও সর্ব্বত্র সমান উচ্চতা; যেন একখানি সুবিস্তীর্ণ কৃত্রিম তৃণনির্ম্মিত বহুমূল্য আসন। এক কথায় সংস্কৃত রামায়ণ যেমন স্বাভাবিকতার নিপুণ নিদর্শন, তামিল রামায়ণ সেইরূপ কৃত্রিমতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আদর্শ।

---

* তামিল সাহিত্যের সহিত জৈনধর্ম্মিগণের এসম্পর্ক জানিলে প্রাকৃত ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ণ কারের প্রাদুর্ভাবের অন্য কারণ নির্ণয়ের প্রবৃত্তি, কমিয়া যাইবার কথা। অতি প্রাচীনকালে অগস্ত্য ঋষির যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে প্রভাব তামিল প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার ফলে সে দেশের হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মিগণ সেকালে এদেশের সহিত পরিচিত হয়েন নাই। তাই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে মীমাংসা দর্শনের শবর ভাষ্যের টীকাকার কুমারিল ভট্ট আন্ধ্র দ্রাবিড় ভাষাকে ম্লেচ্ছ ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কম্বরের রামায়ণ রচনার বিষয়ে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাঞ্জোর অঞ্চলে কম্বনাড়ু নামক স্থানে জন্ম বলিয়া তিনি 'কম্বর্' আখ্যায় অভিহিত। কম্বর্ তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। কবি বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হইলে রাজা রাজেন্দ্র চোল তাঁহাকে রাজ সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া বহু সম্মানের সহিত 'কবিরাজ' আখ্যায় ভূষিত করেন। তখন রামায়ণ রচিত হয় নাই। রামায়ণ রচনার জন্য বহু তামিল কবির প্রতিযোগিতা আহূত হয়, এবং রাজেন্দ্র চোলের পুত্র রাজা কুলোতুঙ্গ চোলের সভায় বহু রামায়ণ পঠিত হয়। তন্মধ্যে কম্বরের রামায়ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরস্কৃত হয়। ইহার 'এর্ এড়ুবাই' বা হল প্রশস্তি নামক সপ্ততি শ্লোকাত্মক একখানি কাব্য আছে। আরও অনেক ক্ষুদ্র কাব্য ইহার নামে প্রচলিত।

রাজা রাজেন্দ্র চোল পাণ্ড্য-চোল-কলিঙ্গ রাজ্যের সুপ্রতিষ্টিত অধীশ্বর ছিলেন এবং ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিঙ্গাধিপতি আহব মল্লকে পরাভূত করেন। সুতরাং কম্বরের কাব্য দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বিরচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এইকালে আরও অনেক কবি ছিলেন। তন্মধ্যে তিরুবল্লুবরের ভগিনী অউবেইয়ার্ একখানি বিশাল সংগ্রহ গ্রন্থের প্রচার করেন। এই গ্রন্থের নাম 'মুদুরেই' বা প্রবাদের জ্ঞান। এই গ্রন্থে একটী কবিতায় আছে :—

"বন্য ময়ূরকে নৃত্য করিতে দেখিয়া 'বান্ কোড়ি' পক্ষী যেমন আপনাকে ময়ুর মনে করিয়া তাহার কদর্য্য পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক নাচিতে আরম্ভ করে মূঢ় কবির কাব্য সেই প্রকার।"

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই 'বান্ কোড়ি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন American turkey তাই tobacco potato প্রভৃতি শব্দের ন্যায় এই পক্ষীটিও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। এজন্য তাঁহাদের মতে এই গ্রন্থখানি অতি আধুনিক। *

তামিল শৈব সাহিত্যের দুই ধারা। প্রথম ধারার প্রধান গ্রন্থ 'মাণিক্ক বাশগর্' (মাণিক্য-যাচক) বিরচিত 'তিরু বাশগম্' (শ্রীবাচক)। তামিলগণের মধ্যে এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় শৈব সিদ্ধান্ত বা শৈবদিগের দর্শনও ধর্ম্মতত্ত্ব। সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধগণকে (ইঁহাদের

* তামিল ভাষায় 'বান্‌কোড়ি' শব্দের অর্থ 'বড় পাখী' আমাদের 'পান্‌কোড়ি' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

বিচারে বৌদ্ধগণ বিধর্ম্মী বা heretic) তর্ক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাণিক্ক বাশগরের প্রতিষ্ঠা। 'তিরুবাদূর্ পুরাণম্' নামক এক খানি গ্রন্থে এই তর্ক যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শৈব সাহিত্যের দ্বিতীয় ধারার প্রধান কবি 'ঞান-সম্বন্ধর্'। এই ধারায় ৬৩ জন ভক্তের উল্লেখ আছে। 'মাণিক্ক বাশগর্' সে ৬৩ জনের পরিগণিত নহেন। ঞান সম্বন্ধর্ প্রমুখ শৈবভক্তগণের ধর্ম্মের শত্রু জৈনগণ। ইঁহাদের তর্ক যুদ্ধের বিবরণ ও ভক্তগণের জীবনী 'তিরুত্তোণ্ডর্ পুরাণম্' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। চিদম্বরম্ অঞ্চলে শীগারী গ্রামে ঞান সম্বন্ধর্ জন্ম গ্রহণ করেন চিদম্বরমে একটী পবিত্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইঁহার দুই শিষ্য ও কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম 'সুন্দরর্' ও 'অপ্পরর্'। ইঁহাদের কবিতাসমূহ সাধারণতঃ 'দেবারম্' (দেবাই) নামে পরিচিত (আর্য্যবর্ত্তে যেমন তুলসী, কবীর প্রভৃতি গুরুগণের 'দোহা')। সম্বন্ধর্ প্রণীত দোহা বা দেবারম্ সমূহের সংখ্যা ৩৮৪। সমগ্র গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সুন্দরর্ ও অপ্পরর্ প্রণীত দেবারম্ সমূহ এক এক খণ্ডেই সমাপ্ত হইয়াছে। তামিল শৈবগণের মধ্যে এই তিন জন কবি ও ধর্ম্মপ্রচারক এত সমাদৃত হইয়াছেন যে ইঁহাদের জীবনীর সহিত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। ইহারা ৬৩ জন ভক্তের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; এবং অন্যান্য যাবতীয় ভক্তগণের সহিত ইহাদের জীবন কাহিনী লইয়া 'শেক্কিরার্' নামক কবি যে তিরুত্তোণ্ডর্ পুরাণম্, পেরিয় পুরাণম্ বা মহাপুরাণম্ নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন শৈব তামিলগণের মধ্যে তাহার অত্যন্ত সমাদর! এই প্রসঙ্গে একটী কিম্বদন্তী উল্লেখ্য যোগ্য। মদুরারাজ সুন্দর পাণ্ড্য জৈন ছিলেন। তাঁহার ৮০০০ সভাসদ্ সম্বন্ধরের নিকট তর্কে পরাজিত হওয়ায় তাহারা প্রত্যেকে রাজাদেশে মৃত্যু দণ্ড ভোগ করে ও জৈন রাজা সম্বন্ধর্ প্রচারিত শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। এই সুন্দর পাণ্ড্য খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে জীবিত ছিলেন।

তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য শৈব তামিল সাহিত্যেরই সম সাময়িক ও কিঞ্চিৎ উত্তর কাল ব্যাপী। রামানুজের স্থিতি কাল দ্বাদশ শতক। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যই প্রধানতঃ তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের রচয়িতা। ইহারা তামিল ভাষায় 'আড়্বার্' বা বৈষ্ণব ভক্ত নামে পরিচিত। ইহারা সকলে যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের একত্র সমাবেশে 'নালায়ির প্প বন্ধম্' (—চারি সহস্র কবিতা] বা 'পোরব প্প বন্ধম' (—মহা গ্রন্থ) নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইয়াছে।

শৈব সাহিত্য অপেক্ষা বৈষ্ণব সাহিত্য কাব্যের হিসাবে অপকৃষ্ট। তবে শৈব সাহিত্যে তিরুবাসগম্ ও দেবারম্ সমূহ যেমন শৈবদিগের 'বেদ' স্বরূপ, বৈষ্ণবদিগেরও সেইরূপ 'নালায়ির প্রবন্ধম্'। নালায়ির প্রবন্ধমের দুইটী খণ্ড 'পেরিয় তিরু মোড়ি' (শ্রীমহাবাক্য) ও 'তিরু বায়্-মোড়ি' (শ্রীমুখের বাণী) বৈষ্ণবগণের নিকট আমাদের গায়ত্রী-মন্ত্রের ন্যায় পবিত্র।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে তামিল সাহিত্যে কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য উদ্ভূত হয় নাই। এই কালের মধ্যে কোন বিখ্যাত সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নাই। এই কালকে তামিল সাহিত্যের জড় যুগ বা নিষ্ক্রিয় যুগ বলা যায়। ইহার পরে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে তামিল ভাষায় পুনরায় সাহিত্য চর্চা আরম্ভ হয়। এই যুগের বহু গ্রন্থই 'অতি-বীর-রাম-পাণ্ডিয়ন্' নামক একজন পাণ্ড্যদেশের রাজার নামে প্রচারিত। ইঁহার প্রকৃত নাম 'বল্লভ দেব' এবং ইনি খ্রীষ্টীয় ১৫৬৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইটী সাধারণতঃ তামিল সাহিত্যে অনুবাদের যুগ। 'নেইড়েদম্' (নৈষধম্) নামে ১১০০ শ্লোকে সমাপ্ত নলচরিত বিষয়ক একখানি মহাকাব্য 'অতি-বীর-রাম' রচিতবলিয়া পরিচিত। 'কাশী কাণ্ডম্' নামে স্কন্দ পুরাণের কাশীকাণ্ডের অনুবাদ, এবং লিঙ্গ ও কূর্ম পুরাণ অতিবীররামের নামে প্রচলিত। সম্ভবতঃ কোনওটাই তাঁহার রচিত নহে, তাঁহার আদেশে অন্যান্য তামিল পণ্ডিতগণের রচনা তাঁহার নামের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে। বল্লভদেব বা অতিবীর রাম পাণ্ডিয়ন্ যে আমাদের বল্লালসেন বা ভোজরাজ বা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! তাঁহারই যুগে অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে; মহাভারতের অনুবাদ হইয়াছে; বেদান্ত দর্শন ও শৈবদর্শনের অনুবাদ হইয়াছে; এবং অনেক আয়ুর্বেদ গ্রন্থের ও অনুবাদ হইয়াছে। আদিরসাত্মক খণ্ড কাব্যও অসংখ্য রচিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে শৈব ধর্ম্মের তান্ত্রিকতার পরিণামে বহু সিদ্ধ (তামিল 'শিত্তর্') তামিল দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কালে আরব দেশ হইতে রসায়ন ও ইন্দ্রজাল বিদ্যা তামিল দেশে আনীত ও আলোচিত হয়। ইহার পূর্ব্বে রসায়নের আলোচনা হয় নাই। এই কালে সিদ্ধগণ 'ঋষি' নামে বিদিত হইতেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম বিদ্বেষী মত প্রচার করিতেন। ইহাদের জাতি বিচার ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষেই এক কালে এই শৈব তান্ত্রিকতা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই সিদ্ধগণের 'বুজ্ রুগি' অনেক প্রকার

ছিল। ইহারা আপনাদিগের অতি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম রাখিতেন। কেহ 'অগস্ত্য,' কেহ 'কপিল' কেহ 'শঙ্করাচার্য্য,' কেহ 'গৌতম' কেহ 'তিরুবল্লুবর্' বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেন। কেহ কেহ আগস্ত্য শিষ্য, গৌতম শিষ্য বা কপিল শিষ্য সাজিতেন। এইরূপে নানা নামকরণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ইহারা হিন্দু ধর্ম্ম ধ্বংস করিবার উপদেশ দিতেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী তামিলগণের প্রসাদে খ্রীষ্ট ও ইঁহাদের নিকট সদ্‌গুরু বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে আধুনিক তামিল সাহিত্যের কাল। বলা বাহুল্য উনবিংশ শতকের পূর্ব্বে গদ্য সাহিত্য ছিল না, এবং ইউরোপীয় প্রভাবেই (ভারতের আন্যান্য স্থানের ন্যায়) এখানেও গদ্য সাহিত্য গঠিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের প্রথম দিকে কয়েক খানি কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বীর শৈবদিগের অনুবাদ গ্রন্থ 'প্রভু লিঙ্গ লীলা' ও নীতি-বিষয়ক 'নীতি-নেরি-বিলক্কম্' (পট্টনত্তু পিল্লেই কৃত) প্রধান। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইজন প্রধান কবি 'তায়ুমান বর' ও 'বেশ্‌চি'। তন্মধ্যে 'বেশ্‌চি' একজন ইটালী দেশীয় ইউরোপীয়। এদেশে থাকিয়া তিনি তামিল শিখিয়া কুড়ালের অনুরূপ উৎকৃষ্ট মহাকাব্য 'তেম্বাবনি' লিখিয়াছিন। ইনি যে প্রকার তামিল ভায়া ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদির জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসার্হ। ইনি গদ্য সাহিত্যও অনেক লিখিয়াছেন। নাটকাদি নানাবিধ সাহিত্য সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীতে হইয়াছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিক 'তাণ্ডব-রায়-মুদলিয়ার্'। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ইনি গদ্য অনুবাদ করিয়াছেন। একালে অসংখ্য তামিল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বটে, তবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কিছুই নাই। মুদ্রক (Mudroch) লিখিত তামিল মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা (১৮৬৫ পর্য্যন্ত) হইতে বঙ্গসাহিত্যের সহিত তুলনা মূলক মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা ফুটনোট প্রদত্ত হইল।*

*		Bengali	Tamil
1.	Protestant Books and Tracts	263	587
2.	Roman Catholic Publications	2	47
3.	Mahammadan Books	41	36
4.	Saiva Books	37	237
5.	Vaishnava Books	80	103
6.	Vedantic Books	40	101
7.	Brahma Samaj Books	51	3

বঁধু-মিলনে

[শ্রীভুজঙ্গধর রায়-চৌধুরী এম্ বিএল]

নব তপন মণি কিরণ নিকর মৃদু পরশে
সরসতর শোহন কর বিকশে সর-পদ্ম,
নবাঙ্কুরতি-চপলগতি তরল তনু-সরসে
ঈষত ফুটি রয়েছে দুটি নয়ন লীলা-সদ্ম,
রস-যুবতী-কলহ-রতি-বিজয়-কেলি-হরষে
গরব ভরে বিরাজ করে মধুর মুখচন্দ,
মানস-লোভা সে মুখ-শোভা অমিয় ধারা বরষে,
তাহাতে ডুবি চিত্ত লুভী পিইবে মকরন্দ !

* * *

কমল-কর-দলেতে ধরি ললিততর বংশী
রচিবে বঁধু গলিতামৃতে সুরের সরোবর,
বিকচরাগ-কমল-বনে পশিয়া মন-হংসী
লুকাবে কবে গভীর তার মরমে মনোহর !
সহজ রসে সতত ভরা হাসির ঘন বীথিতে
অধরমণি মাধুরীধারা ঢালিবে অবিরল,
সুধার সেই নিঝর জলে গাহন করি নিতি সে
কবে গো হিয়া দাহন-জ্বালা করিবে সুশীতল ?

* * *

করুণা বিতরণে কৃপণ হবে তুমি কেমনে ?
নিষ্ঠা করি যারা চরণে পড়ি রয়
দীক্ষা ধরিয়াছ দানিতে বরাভয়,
কে আছে তব সম বিঘ্ন-বিনাশন ভুবনে ?

8.	Jurisprudence	49	19
9,	Ethics	59	48
10.	Medicine	24	43
11.	Poetry & Drama	53	103
12.	Tales	53	42

এই যে পথে পথে তোমার পরিচয়
শ্যামল রূপরাশি তমালে পড়িরয়
তনুর সৌরভ হতেছে অনুভব প্রসূনে !

*   *   *

এই যে দাঁড়ায়ে সম্মুখে তুমি !
মাধুরীর স্রোতে মরমের ভূমি
উজল পরিপূর্ণ !
দক্ষিণে বামে পশ্চাতে মম
যে দিকে তাকাই ওগো মনোরম !
উছলি পড়িছে ঝরিছে ঝরিছে রূপের কিরণ চূর্ণ !
তুমি যে এসেছ হে রস-পাথার !
এ দুটি নয়ন সাক্ষী তাহার
সংশয় নাহি বিন্দু ।
বাহু পশারিয়া ধরিবারে যাই—
এ কি বিস্ময় ! নাই ! নাই ! নাই !
ভাগ্যে শুকাল সিন্ধু !
ও গো ! একি হল ! মজিল হৃদয় !
এই কাছে আসে ! ওই দূরে রয় !
নেহারি কেবল ত্রিভুবন ময়
কিশোর বদন ইন্দু !

*   *   *

কত দিনে আর এ কর আমার
স্নিগ্ধ নিবিড় চিকুরে তাহার
বাঁধিবে মোহন চূড়া !
অলি পাঁতি সম কুন্তল দল
চিকণিয়া দিবে ললাটে তরল
হরি-চন্দন-গুঁড়া ?
শুনিবে শ্রবণ মৃদুল বচন
নেত্র হেরিবে বিপুল নয়ন
মধুর অধর মধুর বদন
আনন দিবে মোর ?

বঁধুয়ার মম চরিত চপল
চিত্তে আমার হইবে অচল,
রূপেতে রহিব ভোর ?

*   *   *

এ জগত মাঝে আর্ত্ত জনার দয়াল বন্ধু তুমি
কেমনে ভুলিবে আর্ত্তের নাদ
দরশন দানে না পুরাবে সাধ
রহিলে চরণ চুমি ?
মধুর মধুর মুরলী তোমার
তুলে নিক্কন, তাহারি মাঝার
এমন আকুল ক্রন্দন ভার
পশিবে না কি গো শ্রবণে তোমার বিগলি চিত্ত-ভূমি !

*   *   *

হেন কি সুদিন হবে
বক্ষ আমার বিপুল বক্ষে
চক্ষু আমার কমল চক্ষে
ওষ্ঠ মধুর বিম্ব অধরে
শ্রবণ মোহন মুরলীস্বরে
পরাণ মৃদুল হাসির সরসে
মরম মধুর আলাপের রসে
চিত্ত আমার চুপে চুপে চুপে
বিলাস-সিন্ধু বঁধুয়ার রূপে
ছলিবে মজিবে চুমিবে রসিবে
ভাসিবে ডুবিয়া রবে ?
কবে সে সুদিন হবে ?

———

নারীর ভাগ্য

[শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী]

পিতা তারাকান্ত বাবু পুত্র নিশিকান্তের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আরত দেরী করা চলে না নিশি, তোমার মার প্যানপেনি দিন দিনই বাড়চে"—

নিশি "রোমান্‌ল" এক খানি টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "কিসের দেরী বাবা!"

শীতকাল। তারাকান্ত বাবু গায়ের কাপড় খানা টানিয়া গায় দিয়া খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, "আর কিসের দেরী বাবা! মাধুরী যে মস্ত বড় হ'য়ে পড়েছে দেখচো না! এই মাঘ মাসে ১৪ পূর্ণ হ'য়ে পনেরতে পড়বে। বিদেশে আছি তাই রক্ষে, নইলে যে বাড়ন্ত মেয়ে, দেশ হ'লে এদ্দিনে একঘরে করত। দাদা ত ফিরেও তাকান না।"

নিশি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যতবড় ভাব্‌চেন বাবা, মাধু ততবড় হয়নি কিন্তু! ওটাতে আমাদের সংস্কারও আছে খানিকটা বার বছরে যদি বিয়ে না দেওয়া গেল, আমরা নিজেরাই মনে করি মেয়েটা যেন হাতী হ'য়ে উঠেছে, পাড়াপড়শী বল্‌বে তাতে আর কথা কি? বেশ পড়ছিল, ইস্কুলও ছাড়িয়ে দিলেন!"

অন্য সময় হইলে পিতা বর্ম্মা সিগার ধরাইয়া এই বিষয় লইয়াই মস্ততর্ক জুড়িয়া দিতেন, এবং যতক্ষণ সেই তর্কের আদিম বস্তু মাধুরী আসিয়া খুল্লতাতকে একরূপ টানিয়া অন্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ না করাইত, ততক্ষণ তর্ক কিছুতেই থামিত না। কিন্তু আজ আর তিনি তর্কের দিকে না গিয়া বলিলেন, "না, ও বেশ হ'য়েছে! Fourth class এই ইস্কুল ছাড়ান উচিত ছিল। যাক্‌গে, যা হ'য়েছে বেশ হয়েছে। অগ্রাণের শেষেই এবার কন্‌কনে শীত পড়েছে। আমারও সর্দ্দি কাশিটা যাচ্ছে না। তানা হ'লে, বুঝতে পেরেছ নিশি, আমি নিজে গিয়ে সম্বন্ধটা ঠিক করে ফেল্‌তুম।" নিশি বলিল, "অকুলীন যে! জ্যেঠা-মহাশয়ের কি পছন্দ হবে?" তারাকান্ত বাবু শুইয়া সিগারেট টানিতেছিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "তাঁর কথা ছেড়ে দাও। গরজ ত তাঁর নয় গরজ আমাদের। আমি বলি একদিন পরে বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হবে। তুমি গিয়ে দেখে শুনে ঠিক করে এস। মাধুরীর সেদিনকার তোলা ফ'টো

নিয়ে চলে যাও।" নিশি সোৎসাহে বলিল, "বেশত, আমারও এই Occasionএ ঢাকা বেড়িয়ে আসা হবে। আচ্ছা আমি মার সঙ্গে পরামর্শ করে আসিগে।"

নিশিকান্ত বাড়ীর ভিতর গেল তাঁহার জননী ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া বধু সুমতির সাহায্য ভাঁড়ারের হাঁড়িকুড়িগুলি রৌদ্র হইতে ঘরে আনিয়া ঝাড়িয়া পুঁছিয়া রাখিতেছিলেন। উপরে বসিয়া মাধুরী তাহার পিতা তারাকান্ত বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্নদা বাবুকে "মেঘনাদ বধ" কাব্য পড়াইয়া শুনাইতেছিল। বালিকার কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত "মধুসূদনের" মধুর কবিতাবলী নিশিকান্তের কাণে যেন মধু বর্ষণ করিতেছিল। নিশিকান্ত ভাঁড়ারে ঢুকিয়া বলিল, "মা জননী।" মাতা বলিলেন, "কেন বাবা, এখন খেতে দেব? আসন দেওতো বৌমা।"

সুমতি একটু ঘোমটা টানিয়া আসন পাতিয়া দিল। আসনে বসিয়া নিশি বলিল, "না মা জননী, এখন খেতে আসিনি। মাধুরীর বিয়ের পরামর্শ ক'ত্তে এসেছি। এমন মেয়ে জ্যেঠামহাশয় পাড়াগেয়ে দোজবরে দিতে চাচ্ছেন।" মা জননী একমুখ হাঁসিয়া কতগুলি বড়ি কৌটায় তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "এরচেয়ে ভাল কোথায় পাচ্ছ নিশি? কুলীনের ঘরের ভাল বরের যে বড্ড দাম। ২৫ বছরের ছেলে তার আর দোজবর কি?" নিশি বলিল, "ঢাকার ছেলেটি মন্দ কি?" মাতা বলিলেন, "মন্দ হবে কেন, সবই তো ভাল। কিন্তু তোমার জ্যেঠামশায়ের যে অকুলীনের বেজায় আপত্তি। শেষ সন্তান, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আর বিয়ে দিতে পার্‌বে না। মিছি মিছি ঢাকায় গিয়ে কি হবে।" নিশি বলিল, "তাতে, ভাবিয়ে দিলে যে।"

২।

নিশি যখন দেড় বছরের শিশু তখন গর্ভধারিণীকে হারাইয়াছিল। দুই বছর বয়সে বিমাতা ওরফে মা জননীকে পাইয়া মায়ের অভাব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। বিমাতা বলিয়াই হয়ত নিশিকে চিরদিন পুত্রবৎস্নেহ করিতেন। মাতাপুত্রে সংসারের পরামর্শ হইতে College এর strike পর্য্যন্ত সমস্ত কাজের ও অকাজের কথাবার্ত্তা হইত। নিশিকান্তের জ্যেঠাই মা যখন বহু সন্তানের মধ্যে মাধুরীকে তিন মাসের শিশু রাখিয়া ইহ লোক হইতে বিদায় নিয়াছিলেন, তখন নিশির মা জননী তাহাকে বুকে তুলিয়া নিয়া তাঁহার যে সন্তান হয় নাই সে জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

হায় রে, যে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিতে হয়, তাঁ'র ত তাই নাই তবু মাধুরীকে নানা কৃত্রিম উপায়ে বুকের দুধের অভাব বুঝিতে দেন নাই। অনেক বড় হইয়া মাধুরী বুঝিয়াছে, যে সে কেন "মা"কে বলে "মা" আর "বাবা"কে বলে "কাকা"!

অন্নদা বাবুকে লোকে বলিত, একটু বাতিকের ছিট আছে। বস্তুতঃ সেটা অনেকটা সত্য, তাঁহার উপার্জ্জন যে কত ছিল, তাহা কেহই জানিত না জীবন ভোর পোষ্টাফিসে চাকুরী করিয়া তিনি নিজের ব্যতীত পরিবারের অন্ন সংস্থান করিতে পারেন নাই অথচ কোন বদ খেয়ালও ছিল না। পরিবার পালন করা কাজটা ছিল ছোট ভাইটার। এই পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব পরিণতবয়স্ক ভ্রাতৃ-যুগলের মধ্যে মনের অথবা মতের কোনই ঐক্য ছিল না। দুইটা মেঘের ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাত সচরাচর নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের দুজনের দেখা হইলেই বাক্যালাপ ব্যাপারটা কলহে পর্য্যবসিত না হইয়া যাইতই না। ইদানীং অন্নদা-বাবু ভ্রাতার উপর রাগ করিয়া বারাসত গিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকে বলিত সেটা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, কেন না নিকটে থাকিলেই মাধুর বিয়ের পণের টাকা ভাইটা তাঁহার কাছ থেকে আদায় করিতে কতক্ষণ!

নিশিকান্ত মেদিনীপুরে গিয়া জ্যেঠামহাশয়ের পছন্দসই সেই কুলীন পুত্র সুখময় রায়কে দেখিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল, "এটা ত একরকম ঠিক করে এসেছি, ছেলেটা "সেটেলমেণ্ট" এ ঢুকেছে শীগগিরই "কানুন গো" হবার আশা আছে। কিন্তু দেশে সেই মোটা ভাত কাপড়। ঢাকার ছেলেটা ও শুনলুম অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে কিন্তু জ্যেঠামশায়—"

কথা শেষ হইতে না হইতে জ্যেঠামহাশয় মাধুরীকে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঢাকার ছেলেটার কথা শুনিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। "তোকে পই পই করে বারণ কর্‌চি তারা, তুই মাধুর বিয়েতে সর্দ্দারি কর্‌তে আসিস্ না!"

"কে তবে কর্‌বে দাদা, তুমি ত ফিরেও চাওনা মেয়েত এখন ছোট নয়, সর্দ্দারি কাজেই যে কর্‌তে হয়।"

"আহা হা, "মার পোড়ে না পোড়ে মাসী, ঝালখেয়ে মরে পাড়াপড়শী," এও হ'য়েছে তাই। বড় মেয়েটাকে অকুলীনে বিয়ে দিয়েছিলি, বেশ হ'য়েছে মেয়ে মরে আমার লজ্জা ঘুচিয়েছে।"

তারাকান্ত বাবু শান্তস্বরে বলিলেন, "তাইত দাদা, রাজার ঘরে তাকে

দিয়েছিলেম, ভাগ্যে সইল না! মাধুকে কুলীনে, হাভাত ঘরে দেবে এই তোমার মত? মেয়েটা না খেয়ে মরুক্!"

"না খেয়ে মর্‌বে কেন, যত অলক্ষুণে কথা।"

"না খেয়ে মরবে না ত কি! কুলধুয়ে জল খাবে! এত পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন বেনাবনে এই মুক্তো ছড়াই, যেমন মেয়ের ভাগ্যি তেমনি ত বাপের মতি হ'বে।"

"তুই চুপকর্ হাঘাগ, হতভাগা, আমার মেয়ে, আমি যা খুসী করব। আমার সঙ্গে কেউ লাগতে এস না।"

উত্যক্ত হইয়া তারাকান্ত বাবু রুক্ষস্বরেই বলিলেন, "বটে, তা বেশ, আমার বাসায় বসে নয়, বারাসতে গিয়ে যা খুসী করগে, নয়ত দেশের বাড়ী পড়ে আছে।"

অন্নদা বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, "এখনি চল্লুম, দে, আমার মেয়ে দে—"

"মেয়ে যায়ত এখুনি নিয়ে যাও না—"

"মাধু ও মাধু—"

নিশিকান্ত ঠোঁটের হাসি ঠোঁটে চাপিয়া কষ্টে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের অভিমুখে চলিল "মাধু খেতে বসেছে জ্যেঠামশাই! আপনিও খপ্ করে 'চান্' করে নিন্ তারপরে সম্বন্ধের কথা বল্‌ব সব।"

"না এখুনি যাব, তোর বাবা আমাকে গরীব বলেইত অপমান ক'রেছে। বউমাকে বল্‌গে আমি মাধুকে নিয়ে যাব। তোদের বাড়ীর দাসীবৃত্তি করতে আর এখেনে রেখে যাব না।"

বলিতে বলিতে, জুতা জামা পরিতে পরিতে ভিতরে দিয়া দেখিলেন, মেয়ে সত্যসত্যই খাইতেছে। নিশির মাতা তা'র পাতে "চিতলের কোল" ভাজা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন; "আস্তে আস্তে খাস্‌রে মাধু, কোর্‌মা নাব্‌ল ব'লে।"

রবিবার; একটু "ভালমন্দ" আহারের ব্যবস্থা হইত। ক্রুদ্ধ জ্যেঠামশায়ের সাড়া পাইয়া বধূ সুমতি তৈল গামছা হাতে লইয়া সম্মুখে আসিল। জুতাজামা একপ্রকার জোর করিয়াই কাড়িয়া লইল, তিনি একবার মুখে বলিলেন, "না মা না, আমি মাধুকে নিয়ে এখনি চলে যাব"

সুমতি তৈল মাখাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "তা বই কি, যাবেন বই কি, মা বল্লেন, আপনি এলেন বলে তিনি নিজে কোর্‌মা আর গল্‌দাচিংড়ি দিয়ে কফি দিয়ে রাঁধ্‌লেন তাড়াতাড়ি 'চান্' করে নিন্, ভাতকটা জুড়িয়ে যাবে নইলে।"

বলা বাহুল্য বৃদ্ধ নির্ব্বিকার ভাবে স্নান আহার শেষ করিয়া উপরের ঘরে

বিশ্রাম করিতে গেলেন। তথন ভ্রাতুস্পুত্র তাঁহাকে বুঝাইল "কুলীনের ঘরেই বিয়ে হবে, আপনি মাত্র ১৫০০৲ টাকা পণের দরুণ যোগাড় করুন, আর সব আমরা চালাব।"

ছুইটী বৃদ্ধ যে কলহটাকে বর্ষার মেঘের মত নিবিড় করিয়া তুলিাছিলেন, ভ্রাতৃবধূ তাঁহার পাক পাত্রের মায়ামন্ত্রের প্রভাবে তাহাকে শারদাকাশের সুশুভ্র অভ্র খণ্ডের মতই লঘু করিয়া গগনপ্রান্তে ভাসাইয়া দিলেন। অন্নদা বাবু বলিয়া গেলেন, "আমি ২।১ দিনের মধ্যেই টাকাটা নিয়ে আসব। ১৪ই মাঘ ত দিন? ঢের দেরী আছে।"

(৩)

অন্নদা বাবু সেইযে পলাইলেন, আর ১৪ই মাঘ বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপেক্ষায় কোন কাজই বাকি ছিল না, কাজেই তিনি সোর গোল করিয়া এঘর ওঘর করিয়া নিমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতাদের জানাইতে লাগিলেন, "মাধুর বিয়ের পণের টাকা আমি এনেছি।" কিন্তু নির্জ্জনে ভ্রাতার হাতে ৮০৲ টী টাকা দিয়া বলিলেন, "এর বেশী ধার পেলুম না।"

তারাকান্ত বাবু যদিও এই আত্মসর্ব্বস্ব ভ্রাতাটীকে ভাল করিয়াই চিনিতেন, তথাপি আশা করিয়াছিলেন, এই শেষ সন্তান ও একমাত্র বাৎসল্যের আধার ইহার বিবাহে অন্ততঃ ৩০০৲ টাকা দিবেনই। এখন ৮০৲ টী টাকা গুণিয়া দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল, একবার মনে হইল, টাকাটা দাদার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলেন, "বেরোও আমার বাড়ীথেকে, আমি একাই মাধুর বিয়ে দেব।" কিন্তু আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভরা, বিশেষ এখনও বিবাহ হয় নাই। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া টাকা কয়টী পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও নিশি তোমার জ্যেঠামশাই মাধুর বিয়েতে ভিক্ষে দিয়েছেন, আজ রাখ, কাল ফিরিয়ে দেব।"

অন্নদা বাবু টাকা ভিন্ন আর একটি উপকার ভ্রাতার করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশ হইতে ছুইটী বিধবা, জাতি সম্পর্কে খুল্লতাতপত্নীকে মেয়ের বিবাহ দেখাইতে অনেক মাথার দিব্য দিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়াই তারাকান্ত বাবুর প্রদত্ত দানসামগ্রী ও কন্যার অলঙ্কার দেখিয়া নাকসিঁটকাইতে লাগিলেন। "পাগল হউক যাহাই হউক এতগুলো টাকা অন্নদা তারার হাতে দিয়েছে। তারা ত কই দানসামগ্রী তেমনে দয়নি। ৮০০৲ টাকার গয়না দিলেও ত কেমন হ'ত। আহা, মেয়েটার মা নেই, কে কি করে গা? ছোট বউত ছেলে মানুষ, কি মানুষই ছিল বড় বউ!"

বিবাহের গোলে বিশেষ এই আচার নিষ্ঠাপরায়ণা নবাগতাদের আহারের আয়োজনে সুমতি ও গৃহিণী নিতান্তই ব্যস্ত ছিলেন। তাই ইত্যাকার টীকা টিপ্পনি শ্রবণ করিয়া তাঁদের কর্ণকুহর তৃপ্ত হইতে পারিল না। কিন্তু তারাকান্ত বাবু আভ্যুদয়িক কর্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিতৈষিণীগণের সুধামাখা বাক্য শুনিতে লাগিলেন। শুনিয়া একবার সমীপবর্ত্তী ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র

তারাকান্ত বাবু বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতায় একটি স্কুলে মাষ্টারি করিতেন। তাহাতে মাহিয়ানা ১০০৲ টাকা আর টিউসনি করিয়া ২৫৲ টাকা পাইতেন। ছেলে পড়াইয়া নিজের সংসার চালাইয়া হাতে বড় বেশী কিছু থাকিত না। নিজের মেয়ে নাই তথাপি ভ্রাতুষ্পুত্রীরদিকে চাহিয়া তিনি প্রতি মাসের প্রথমেই ১০৲ টাকা Post officeএ রাখিয়া আসিতেন। মাধুরী-কেও তিনি Bethune schoolএর 2nd class পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। এখন সেই ৫০০৲ টাকা উঠাইয়া এবং কিছু ধার করিয়া মাধুরীর বিবাহের ক্রটি হইতে দিলেন না। যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেল।

(৪)

বাসি বিবাহের দিন রাত্রে মাধুরী শ্বশুরবাড়ী হরিপুরে আসিয়াছিল। বধু দেখিয়া শাশুরী ও কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণ যত তুষ্ট হইয়াছিলেন, শ্বশুরালয় দেখিয়া বেথুন স্কুলের পুরস্কারপ্রাপ্তা ছাত্রী মাধুরীলতা তত সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ঘোমটার ভিতরে মনে মনে ভাবিতেছিল, "মাগো মা, কাকামণি যেন আমায় বনবাস দিয়ে'ছে। বইতে পড়্তেম, "পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা" রবি বাবুর পল্লীবাটটী ভাল লাগে। চোখে দেখে, বিশেষ বড় হয়ে থেকে কি ওসব ভাল লাগ্‌তে পারে? বিকেল বেলা বেড়াতে বেরুলে, বাঁশ বাব্‌লা খেজুর গাছের পাতের আড়ালে অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত আভা দেখতে মন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু সন্ধ্যে হতে নাহতে' ওরে বাস্‌রে' কি ভীষণ ঝিঁঝিঁর ডাক। ছুত্তোর কবির ঝিল্লিমুখরিত সন্ধ্যা এরচেয়ে কলিকাতার মটরের প্যাঁ পোঁ ট্রামের ঘড়্ ঘড়্ অনেক ভাল।" সে যাত্রায় অল্প কয়েক দিন থাকিয়া বেচারার ফাঁড়া কাটিয়া গেল। নিশি আসিয়া জামাই সুখময় ও মাধুরীকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সুখময় সেখান হইতে কার্য্যস্থানে চলিয়াগেলেন। কিন্তু মাস দেড়েক পরেই মাধুর শ্বশুরের অসুখের সংবাদ পাইয়া নিশিকান্ত আবার সাশ্রুনয়না মাধুরীকে মায়ের স্নেহের কোল হইতে নিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আসিল। আসিবার সময় সুখময়ের মাকে বলিল, "আপনি এখন মাধুর মা।" অল্প

বয়সে মা মরে যাওয়াতে আমরা ওকে ঘরের কাজকর্ম্ম কিছুই শেখাইনি। আপনি ওকে শিখিয়ে নিবেন। এতদিন লেখাপড়া নিয়ে ছিল কিনা, তাই আমরা, বুঝ্‌তে পেরেছেন।" ইত্যাদি।

তিনিও "তা হ'ক শিখিয়ে নেব বইকি বাবা" ইত্যাদি বলিয়া নিশিকে বিদায় দিলেন।

নিশির কথাটি যে শুদ্ধ বিনয় উক্তিনয়, তাহা তিনি দুএক দিনের মধ্যেই বুঝিয়া লইলেন। সংসারের দুএকটি কাজ ধীরে ধীরে নববধূর হাতে দিতে লাগিলেন। ঘরে ঝিচাকর ছিল না, তাহার মধ্যমবধূ স্বরমা সংসারের সমস্ত কাজই করিত। তাহার কার্য্যনিপুণতা দেখিয়া মাধুরী মনে মনে অবাক হইয়া যাইত। সে দিন সকালবেলা মাধুরীর কনিষ্ঠ দেবর জ্যোতির্ম্ময় মাছের চুবড়িটি মাটিতে রাখিয়া হাঁক ছাড়িল, "মেঝবৌদি, জল্‌দি কর বড্ড খিদে পেয়েছে। দেরী হলে আজ আর ভাত খাব না। স্বরমা রাঁধিতেছিল। সে মাধুরিকে বলিল, "ছোড়্‌দি ভাই, তারাতাড়ি আমাকে দুটো মাছ কুটে দাও না, নইলে ছোট টাকুরপো এসে আজ হাঁড়িকুড়ি চুরমার কর্‌বে।" মাধুরী সে কথা অবিশ্বাস করিল না। সে দেখিতেছিল, দুরন্তপনায় তাহার ননদ দেবরের জুরি মেলা ভার। সে তাড়াতাড়ি মাছ ও বঁটি নিয়া মাছ কুটিতে বসিল। কিন্তু দশ মিনিট ধরিয়া চিন্তা করিয়াও জীবন্ত কইমৎস্য ছেদনের প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিল না। অবশেষে বঁটীর উপর বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে ১০ বছরের বয়সেই "ডাকাত" আখ্যাধারী জ্যোতির্ম্ময় ওরফে "জ্যোতি," ছোট বোন ননীকে লইয়া স্নানের ঘাটের পথে যাইতে যাইতে আর একবার পাকের তাড়া দিতে আসিয়া "নতুনবৌদির" ভাব খানা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল। এক মিনিটেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ও মেজবৌদি, মজা দেখবে এস, এসনা এদিকে! নুতনবৌদি মাছ কাট্‌তে জানে না! লজ্জায় বসে কাঁদ্‌চে, হ'য়েছে মশাই হ'য়েছে, এতো আর class promotion নয়, যে রাত্তির জেগে পড়া মুখস্ত করলেই হ'ল! এতে বিদ্যে লাগে! সত্যি বৌদি, তোমার মহাকালী পাঠশালায় পড়াতে পারেনি। সেখানে নাকি রান্না বান্নাও শেখায়।"

মাধুরী লজ্জায় ঘৃণায় যেন মরিয়াগেল, ছোটমার উপরে যত রাগ হইতে লাগিল। কেন তা'কে আদর করিয়া ঘরের কাজ কর্ম্ম শেখায় নাই।

এমন করিয়া দিনের পর দিন খোঁচা খাইয়া মিষ্ট অনুযোগ শুনিয়া মাধুরী

একে একে সকল কাজই শিখিয়া লইল। দরিদ্র গৃহস্থের গৃহস্থালীতে সারা দিনই কাজ, সন্ধ্যার পর আহারান্তে অবসর। সেই সন্ধ্যাটি তাহার কাছে আগে যতই বিভীষিকাময় ছিল এখন অনেক সরস হইয়াছে, কেন না এই "উল্টো রাজার" দেশে সন্ধ্যাবেলায় ডাক আসে। দাদা, বৌদি, ছোটমা, কাকামণি, প্রায় প্রতিদিনই তাহার কাছে পত্র লিখিয়া থাকেন। দিনের কর্ম্মশ্রান্ত দেহমন সন্ধ্যাবেলার সেই অমৃত প্রলেপে যেন জুড়াইয়া দিত। কিন্তু সম্পর্কে ছোট অথচ পূর্ব্বে বিবাহিতা এই 'জা' টির সহিত মাধুরী ভাল করিয়া মিশিতে পারিল না। দেবর সুধাময় পত্নীর কাছে প্রতিদিনই প্রায় সুদীর্ঘ পত্র লিখিত। সে কলিকাতায় থাকিয়া B. A classএ পড়িতেছিল। কিন্তু মাধুরীর কাছে সুখময় পত্রলেখা আবশ্যক বিবেচনা করিত না। একদিন সুরমা ৫।৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র পাইয়া রান্নাঘরে বসিয়া পড়িতেছিল, মাধুরী মৃদুহাসিয়া ক্ষুদ্র পরিহাস করিয়া বলিল "বাপরে, ছোরদি, চিঠিত নয় এটাযে প্রবন্ধ।"

সুরমা অর্থপূর্ণ বক্রহাসি হাসিয়া বলিল, "হু, প্রবন্ধই বটে। তুমি তার কি বুঝবে ভাই।"

মাধুরীর বুকের ভিতরটা যেন ছাঁত করিয়া উঠিল! বুঝিবেনা! মাধুরী বুঝিবে না! কেন, সেওত মূর্খ নয়।

সুরমা যেন তাহার গূঢ় অভিমানের ভাবটি বুঝিতে পারিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "লেখাপড়া জানলে কি হয় দিদি, সোয়ামীর সোহাগ পেতে বরাত চাই। নইলে রূপওত আছে, বিদ্যেও ত শুনি সরস্বতী, তবু বট্‌ঠাকুরের মনে ধরেনি কেন!"

তদবধি, মাধুরী নিজেকে জোর করিয়া সুরমার নির্জ্জনসহবাস হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত। অবসরের সময় বরং দেবর ননদের লেখাপড়ার সাহায্যে যাইত, ঠাট্টা শুনিত ঠাট্টা করিত তবু স্বামী সোহাগিনীর সমালোচনার মধ্যে যাইতে চাহিত না। শাশুড়ী যে যখন তখন পাড়া পড়শীর কাছে বড়বধূর "বিদ্যের ব্যাখ্যা" করিতেন, শ্বশুর ও যে বড় বউমার সেবার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন:সেটা পল্লীদুহিতা অশিক্ষিতা সুরমার বড় হিংসার কারণ হইয়াছিল।

(৫)

জৈষ্ঠ মাসে আমকাঁঠালের তত্ত্ব লইয়া অন্নদা বাবু মেয়েকে নিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সুখময়ের আসার কথা ছিল বলিয়া বৃদ্ধ রসিক বাবু বৈবাহিককে একাই ফিরাইয়া দিলেন। অন্নদা বাবু একে রসিক বাবুর বাড়ীতে মেয়েকে দিনরাত কাজ

করিতে দেখিয়া চটিয়াছিলেন, তার পরে মেয়ে না পাইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ফিরিয়া গেলেন। সুখময় ছুটিপাইল না, সুধাময় ভ্রাতাকে দেখিয়া বাড়ীতে আসিল।

মাধুরী তাহাদের প্রেমের অভিব্যক্তি দেখিয়া মাঝে মাঝে বুঝিত, তাহার জীবনে আর সব পাইয়াছে, কিন্তু যে জিনিসটী যে পরশ কাঠিটী পাইলে জীবনের সকল অভাব পূর্ণ হয়, সব লোহা সোণা হইয়া যায়, সে তাই পায় নাই, তাই সব পাইয়াও সে বঞ্চিতা, সে দুঃখিনী।

দুপুরে সুধাময় শুইয়া "ভূদেবগ্রন্থাবলী"র পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইবার চেষ্টায় ছিল। সুরমা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর মুখে দুইটী পান গুঁজিয়া দিয়া পাখা হাতে লইয়া বিছানায় বসিল। "ওঃ! তুমিও ওই ঘোড়ার ডিম পড়চ না আছে গল্প, না আছে কিছু!"

সুধাময় হাসিয়া বলিল, "তুমিও মানে কি! আর কেউ পড়ে নাকি? "পড়ে না আবার? আমাদের মাষ্টারনি পড়েন যে; তাঁরইত বই!" "মাষ্টারনি কি রকম?"

"হাঃ হাঃ, তাও জাননা, এদ্দিন এসেছ! ছোটদি দুপুরে ঠাকুরপো আর ননীকে পড়ায় কি না, তাই তারা ওকে মাষ্টার বলে।"

"তা তুমি একটু লেখা পড়া শিখলেই পার সুরমা,"

"আমার বয়ে গেছে ছোটদির কাছে শিখতে"

"ছি সুরমা, তুমি জাননা, উনি ভাল লেখাপড়া শিখেচেন! তুমি বোধ হয় ওঁর সঙ্গে ভাল করে মিশে কথা কও না, তাই বৌদি যেন সর্ব্বদা একটু বিষণ্ণ"।

"না গো না, বটঠাকুর মোটেই চিঠি পত্তর লেখেননি কি না, ওত বিদুষী বিদ্বেভুষিতে, অথচ ৫।৬ পৃষ্ঠা চিঠি আসে মুরুখ্যু আমার কাছে, মানিনীর মানে ঘা লেগেছে বোধ হয়।"

"তা হ'বে, লেখাপড়া শিখেচেন একটু Sentimental হতে পারেন। আচ্ছা বৌদি তোমার কাছে সে কথা নিয়া দুঃখ্যু করেছেন নাকি।"

সুরমা এবার রাগিল, "খালি 'বৌদি' আর 'বৌদি' অত পছন্দ হ'য়েছিল ত নিজে বিয়ে করলেই হ'ত!"

সুধাময় হাসিয়া বলিল, "তুমি ত আর মরনি, বৌমরলযে দাদার, আর বিয়ে করব আমি! একা রামে রক্ষা নেই, আবার বিয়ে! তবেই হয়েছে! কিন্তু সুরমা, মেয়েরা বড্ড হিংসুক! কোথায় দাদা ও বেচারার খোঁজ খবর নেননা বলে দুঃখ করবে, না আমি দুটো জিজ্ঞাসা করতে মুখখানা হেসেলের

হাড়ির মত কালো আর ভারি করলে! লেখাপড়া না শেখার অশেষ দোষ।"
এবার সুরমা রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল, সুধাময় হাসি মুখে তাস খেলিতে বাহির হইল! কিন্তু তাহার মনে ভ্রাতার ব্যবহারে একটা সন্দেহ জন্মিতেছিল। কয়েকদিন পরে সুধাময় পিতাকে বলিল, "বাবা, দাদার একা একা বড় কষ্ট হয় দেখে এসেছি নিজে রেঁধে খান, আমি বলি বৌদিদি ননীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে থাকুন। রসিক বাবু নিতান্তই ভাল মানুষ, তিনি বলিলেন, "তা বটেইত, কষ্ট হচ্ছে বই কি, তা' এক কাজ কর সুধা, তুমি বৌমাকে বাপের বাড়ী রেখে এস, দেব বলেছি ভদ্রলোককে কিনা! মাসখানেক পরে ননীকে নিয়ে সুখের কাছে ওদের রেখে এস!" মাতাও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রাজি হইলেন। আহা বাছা আমার একা থাকে! কি খায় না খায় কে জানে!" হায়রে মায়ের প্রাণ।

মাধুরী শুনিল তাহাকে মেদিনীপুরে যাইতে হইবে! শুনিয়া যেন অভি-মানিনীর সমস্ত দেহ মন বাঁকাইয়া বিদ্রোহী হইয়া বসিল, ছি! ছি! ছি! তিনিত ডাকেন নাই। হয়ত তাহাকে তাঁহার মনেই ধ'রে নাই, তাই অমন নির্ব্বিকার উদাসীন ভাব! তবু সে যাচিয়া তাঁহার কাছে যাইবে?

সুরমা মুখের হাসিতে মনের হিংসার বিষ লুকাইয়া বলিল, "লোকে বলে মেঘ না চাইতেই জল, ছোড়দির হ'য়েছে তাই! যাই বল ভাই, ডবোল প্রমোশন পেয়েছ!"

মাধুরী কলিকাতায় গেল। ৫ মাস পরে যেন বন্দী আলোকের মুখ দেখিল! কাকা বলিলেন, "রোগা হ'য়ে গিয়েছ মাধু!" মাধু বলিল, "না কাকা, রোগা হইনি, মনটাই বড় কেমন করত। তারাবাবু হাসিয়া বলিলেন "দু বছর পরে আমায় এই মা'টীর মত হ'বে মা, বুড়ো বাপ নিতে এলে আসতে চাইবে না।" মাধু সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কখ্‌খনো না, বৌদিদিটা খাঁটি পাথর! মায়া মমতা নেই! ও শুধু তোমাকে আর ছোট মাকেই ভাল বাসে।" পরস্পর বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া মা ও কাকা দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।"

ইতিমধ্যে অন্নদাবাবুর রঙ্গস্থলে প্রবেশ! ভ্রাতৃবধূ ভিতরে পলাইলেন। তিনি মাধুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"মাধু এলি? বেশ! তোর কাকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে! এর চেয়ে হাত পা বেধে জলে ফেলে দিলেই হ'তো!"

তারাকান্তবাবু অবাক হইয়া চাহিলেন—"কি রকম দাদা!" আরও গরম

হইয়া দাদা বলিলেন, "রকম আবার কি! জ্ঞাতি শত্তুর! এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছিস্ যে একবেলা ভাত জোটে ত একবেলা উপোস!"

এবার তারাকান্ত বাবুর ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিল। বাংকের মত চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'চুপকর, কুটুমের ছেলে বাইরে বসে আছে, ওঁর জ্বালায় লোক লৌকিকতাও যাবে দেখচি!"

-'ওঃ! ভারিত পাড়া গেঁয়ে কুটুম, তার আর লোক আবার লৌকিকতা! কালাছেলের নাম পদ্মলোচন!"

"বৌমা, ভদ্রলোক যতক্ষণ এখানে আছেন, দাদাকে রান্নাঘরে পিঠে পায়েয়েসের তদন্তে রাখগেত!"

সুধাময় বারান্দায় দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে দুই ভ্রাতার বাক্যালাপ শুনিতেছিল। সহসা একটু হাসিয়া, একটু কাশিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তালুই মশায়, আমরা পাঁড়াগেঁয়ে অসভ্য বটে, কিন্তু অতিথির অসম্মান করিনা।"

তারাকান্তবাবু ব্যাকুলভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি চা খাবে ওঘরে চল বাবা, ওর কথা শুনো না।"

স্থিরভাবে স্নিগ্ধস্বরে সুধাময় কহিল, "আমাকে মাপ করবেন, একটু সবুর করুন, একটা কথা বলে যা'ব, তালুই মশায় আপনি দাদার কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, তা আমি দেখেছি, ছেলের শ্বশুর দূর হোক্ মেয়ের শ্বশুর অমন চিঠি লিখলে আমরা তাকে 'ছি' 'ছি' বল্‌তুম। তা পাড়াগাঁয়েও এখন এই সব দেখে লোকে শিখবে। ছোট তালুই মশাই একবার পত্র খানা দেখুন তার পর ছিড়ে ফেলি। ওকি বৌদি হা করে শুন্‌চ কি? তুমি ওঘরে যাও।" ঘরের কোণে বজ্রাহতের মত স্তব্ধভাবে মাধুরী বসিয়াছিল, দেবরের কথা শুনিতেছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া কপাটের আড়ালে গেল।

তারাকান্ত বাবু পত্র পড়িলেন পত্রখানি এইরূপ—

কল্যাণবরেষু।

এবার তোমাদেরদেশে মাধুরীকে আমি আনিতে গিয়াছিলাম। তাহার প্রতি তোমার পিতামাতা যেরূপ ইতরজনোচিত ব্যবহার করিতেছেন, তাহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। যতদিন তুমি পরিবার পালন না করিতে পার, আমি কলিকাতায় মাধুকে রাখিতে স্বীকৃত আছি। যখন সুবিধা হয়, তাহাকে তোমার

কাছে নিয়া রাখিও। আমার শিক্ষিতা মেয়ের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে এখন তোমাকে অনুরোধ যত শীঘ্র পার, তাহাকে তোমার কাছে নিও।"

তারাকান্ত বাবু বলিলেন, "উনি ত পাগল, কিন্তু তুমি তাত জান্‌তে না! এ চিঠি বেয়াইকে দেখিয়েছ কি বাবা।"

"না তালুই মশায়, কেউ দেখেনি।"

"বাবা, তুমি আমার মাথা রেখেচ কি আর বলব আমি, তুমি আজই মাধুকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

"না, না, আপনি চা খাবেন চলুন। ১মাস পরে আমি বাবার কথামত ওঁকে মেদিনীপুরে নিয়ে যাব। আপনি অত ব্যস্ত হ'বেন না, দিন্, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলি।"

(৬)

১টা মাস যেন মাধুরীর কাছে ১দিনের মত কাটিয়া গেল অবশেষে মেদিনীপুর যাইবার দিন আসিল। সুধাময় আবার এই ফাঁকে বাড়ীতে গিয়া দুই দিন থাকিয়া ননীবালাকে লইয়া আসিলেন। মাধুরী মাকে প্রণাম করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাকার হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। গাড়ী ষ্টেশনে চলিল। তারাকান্ত বাবু মাধুকে বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি বড় হ'য়েছ, তোমাকে বুঝান কষ্ট হ'বেনা একটা কথা সব সময়ে তুমি মনে রেখ, ওই যে কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলে লিখে গেছেন "পতিকুলে তব দাস্যমপি শ্রেয়ম্," মেয়ে মানুষের পক্ষে অমন কথা আর নেই মা! নিজের ঘরকন্না করতে কি অপমান আছে! লেখাপড়া শিখেচ, শুধু টেবিলে বসে শেলি বায়রণ মুখস্থ করতে নয়, সংসার যাত্রা ভালকরে চালাতে, আদর্শ স্ত্রী হ'তে, আদর্শ মা হ'তে! সরস্বতীকে প্রণাম করতে হ'লেই যে রান্নাবান্না ছেড়েছুড়ে দিতে হ'বে, তারত মানে নেই! আর তোমরা অন্নপূর্ণার জাত, তোমরা যদি পদ্মহস্তের পরমান্নের থালা ছুঁড়ে ফেলে, দিনরাত বীণাপাণির বীণা বাজাও, লোকের কাণ জুড়োবে বটে, কিন্তু পেট ভরবে না যে মা! সবই চাই, ভরা পেটে সব ভাল লাগে। তোমরা ঠিক না হ'লে আমরা যে মা মিথ্যে!"

* * *

রাত্রি ১ টার সময় সুধাময় ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সুখময়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনো সুখময় নাকি বাড়ী ফেরেন নাই। একদণ্ডে

সুধাময়ের কাছে যেন সমস্ত তিক্ত হইয়া গেল। চাকরটাকে কাঁচাঘুম ভাঙ্গাইয়া ডাকিয়া তুলিল, "হতভাগা বেটা, বাবু তোকে বলে নি যে আমরা আস্‌ব?"

সে হাঁউমাউ করিয়া বলিল, "হাঁ বলেছে বটেত, বাবু ত রোজ দুপুর রাতে এসেন আমি কি করব।"

সুধাময় তাহাকে ধমক দিয়া তাহার সাহায্যে দাদার ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা হারমোণিয়ম্‌, এক পাশে আলনায় কতকগুলি কোচান কাপড় ও জামা ঝুলিতেছে, তিন চার জোড়া ডসনের "সু" তে আলো ঠিকরাইতে ছিল। এক পাশে খাটপাতা মেজের কোণে ভাত ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। পাতা বিছানার উপর তাহার পত্রখানি পড়িয়া আছে। মেজেতে চাকরের সাহায্যে ১খানি বিছানা করিয়া সুধাময় বৌদিও ননীকে শোওয়াইল; এবং নিজে পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিজেও টের পায় নাই; সহসা শেষ রাত্রির দিকে বমির শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ভ্রাতার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে গেল। দেখিল দাদা বমি করিয়া ভাসাইয়াছেন বৌদিদি মাথায় জল দিয়া বাতাস দিতেছেন। মদের দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে।

সুধাময় কতক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত বলা যায় না, সে ভাবিতেছিল, "এই কি আমার সেই দাদা! যে পানটী খাইতে জানিত না! অমন অধঃপতন হইয়াছে, তাই বৌদিদির কাছে পত্র লিখিতে ভরসা হয় নাই! কিন্তু এই যে সেবাপরায়না অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নারী এই যে মুখের দিকে চাহিয়া আছে, উদ্বেগের সীমা নাই, চিন্তা নাই, হায়রে পুরুষ দেবতা তুমি, না দেবী ওই নারীটী! তোমার এই পতনে কি ওর ঘৃণা হয় নাই, তবুতে মনি প্রেমে তেমনি স্নেহে তোমাকে আগুলিয়া বসিয়া থাকিবে যুগ যুগ, জন্ম জন্ম।"

মাধুরী বলিল, "ঠাকুরপো, আপনি ঘুমোন্‌গে"। সুধাময় বলিল, "বৌদি, আমি এই নরকে ফেলে দিতে কি তোমায় এনেছি? ভোরের গাড়ীতে তোমাকে কল্‌কাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই চল, উনি টেরও পাবেন না।"

দাদাকে দাদা বলিতে সুধাময়ের ঘৃণা হইতে ছিল। মাধুরীর বিবর্ণ মুখে একটুখানি হাসি ফুটিল। হাসি ত নয় যেন ঠোঁটের কোনে জমান অশ্রুর নীরব ভঙ্গী ফুটিল! মরি মরি, বেদনা না দিলে কি নারীর নারীত্ব ফোটে! না ঘষিলে কি চন্দনের সুগন্ধ ভোগ করা যায়।

মাধুরী বলিল, "আপনি নরক ভাব্‌চেন, তাই মুখে অমন কথাটা বেরিয়ে

বন্দী-জীবন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

[শচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

কেমন করিয়া কৃপাল সিং এই দলে প্রবেশ লাভ করে এবং কবে কিরূপে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয় সে সকল বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করিব। তৎপূর্ব্বে এই শিখ দলের কতকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

এই শিখ দলের লোক সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। উত্তর আমেরিকা ও কানাডা হইতে বিভিন্ন দলে প্রায় ৬।৭ হাজার শিখ দেশে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু ১৯১৪ সালের Ingress Ordinance act অনুযায়ী বহুলোক জেলে আবদ্ধ হইয়া যান, এবং আরও বহুলোক নজরবন্দী হইয়া নিজ নিজ গ্রামে থাকিতেই বাধ্য হন। যাঁহারা নজরবন্দী হন তাঁহারাও বিপ্লব কার্য্যে সাহায্য করিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই। কারণ সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে ইঁহারা কেহ বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না। পুলিস যে কোন সময় যাইয়া ইঁহাদের খোঁজ খবর লইত। সূর্য্যোদয়ের পরও ইঁহারা কেহই স্বীয় গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না অথবা ভিন্ন গ্রামের কোনও ব্যক্তি ইঁহাদের সহিত প্রকাশ্যে মিশিতে পাইতেন না। পরে যখন কার্য্য বেশ সুসম্বদ্ধরূপে আরম্ভ হয় তখন ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের দেশের কাজ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল তাহারা পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া গা ঢাকা দিলেন। অর্থাৎ পুলিশ অথবা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরা আর কেহ তাঁহাদের খোঁজ খবর পাইতেন না।

যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই সকল দল ভারতে আসিয়াছিলেন স্বদেশে পদার্পণ করিবার পর হইতে তাঁহাদের অনেকের মধ্যই সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এই ৬।৭ হাজার আমেরিকাপ্রত্যাগত লোকদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক নিজ নিজ গৃহস্থালিতেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অবশিষ্ট শিখেরা পূর্ণ উদ্যমেই বিপ্লব কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন।

এই সব আমেরিকাপ্রত্যাগত লোকদিগের অধিকাংশই ছিলেন শিখ। অ-শিখের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। বোধ হয় ২৫।৩০ জনের বেশী হইবে না।

তাঁহারা প্রায় সকলেই পূর্ণ বয়স্ক গৃহী ছিলেন। অনেকেরই স্ত্রী পরিবার, পুত্র কন্যা সবই ছিল। তাঁহাদের অনেকের বয়স ৪০ সেরও উর্দ্ধে দেখিয়াছি। অন কএক ত বৃদ্ধই ছিলেন। ভাই নিধান সিং, ভাই সোহন সিং, ভাই কাপা সিং, ভাই কেরসিং ইঁহাদের কাহারও বয়স ৫০ সের নিয়ে ছিল না।

দিল্লির ষড়্‌যন্ত্র মামলাতেও যাঁহারা ধরা পড়েন তাঁহাদেরও অনেকেই পরিণত বয়সের লোক ছিলেন। আমির চাঁদের বয়স ৫০ সেরও উপর ছিল। আবধ বিহারিও পরিণত বয়স্ক ছিলেন।

কেবল বাঙ্গলাদেশেই প্রধাণতঃ ছাত্র শ্রেণীর বালক ও যুবক দিগকে লইয়াই বিপ্লব দল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের অনেকেরই সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল না বলিলেই হয়। অধিকাংশেরই :বয়স ১৬ হইতে ২০।২২ সের অধিক হইবে না। বাংলাদেশে ইহাই প্রায় দেখা যায় যে যাঁহাদের বয়স ৩০ সের কোটা পার হইয়াছে তাঁহাদের সকল উৎসাহ সকল উত্তম প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসে, তখন তাঁহাদের দ্বারা কোনও রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ভিন্ন আর কিছু কাজই হইয়া উঠে না। বাঙ্গলাদেশের যাহা কিছু আশা ভরসা মনে হয় তাহা কেবল স্কুল কলেজের যুবকদিগের তরুণ মনের মধ্যেই আবদ্ধ আছে। কিন্তু বাঙ্গালার কর্ম্মীদিগের সাংসারিক অভিজ্ঞতা অল্প থাকিলেও, তাঁহাদের অধিকাংশই তরুণবয়স্ক হইলেও তাহাদের মধ্যে এমন একটী একাগ্র সাধনা দেখিয়াছি যাহা বাঙ্গালার বাহিরে আর কোথাও দেখি নাই।

বাঙ্গালী যখন যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহা যেন একান্ত প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। তাই দেখি বৌদ্ধ যুগে বাঙ্গালী যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অন্তরে অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছিল এমন আর অন্য কোন প্রদেশের লোকই পারে নাই এবং শেষে যখন অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল তখন তাহারা বাঙ্গালীকে একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করে কারণ বাঙ্গলা দেশ তখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে তেমনি পূর্ব্বের মতনই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। আবার ইংরেজি আমলেও বাঙ্গালী যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও গ্রহণ করিয়াছিল এমন আর অন্য কোন দেশই করে নাই। ইহা বাঙ্গলার গুণই হউক আর দোষই হউক বাঙ্গালী যখন যাহা ধরে তাহা সর্ব্বস্ব দিয়াও বরণ করিয়া লয়। তাই বর্ত্তমান যুগেও বাঙ্গালী যখন দেশহিতকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তখন আর দোমনা হইয়া করিতে পারে নাই, তাহার আর সংসার করা হইল

না, অর্থোপার্জ্জন করা পোষাইল না, একেবারে ঘর সংসার ছাড়িয়া তাহাকে বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

এই সকল যুবকদিগের অনেকের মধ্যে কেমন এক অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রেরণার আভাস পাইয়াছি। ইঁহারা কেবলমাত্র হুজুগ লইয়াই মত্ত থাকেন নাই। দেশসেবা ইঁহারা একরূপ সাধনার অঙ্গ স্বরূপই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিসে মানুষ হইব, কিসে চরিত্রবান হইব এই ভাবনা ও ধারণা ইঁহাদের মধ্যে দৃঢ়রূপেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।

কিন্তু এই ভাবটি দুই তিন জন শিখ ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাই নাই। এবং যুক্ত প্রদেশের যে সকল বিপ্লবপন্থীদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের মধ্যেও বাঙ্গালার আদর্শের কথার অবতারণা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারাও ইহা প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের ওষ্ঠপ্রান্তে অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসির রেখাই ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়াছি।

শিখদিগের প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল, দুর্জ্জয় সাহস ছিল, এবং তাঁহারা নিরতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণুও ছিলেন। তাঁহাদের বিশাল সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ ও সুসম্বদ্ধ মজ্জাদেশ সকলকারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহাদিগের গুম্ফ, শ্মশ্রু মণ্ডিত দৃঢ়তাব্যঞ্জক বদনমণ্ডল দেখিয়া অনেক উৎপীড়কই ভয়ে পশ্চাৎপদ হইত। তাঁহাদের চলন ভঙ্গিমায় এক বিশিষ্টভাব ফুটিয়া উঠিত, বেশ বুঝিতে পারা যাইত যেন তাঁহারা দুই পায়ের উপর সমান ভর দিয়া চলেন; কিন্তু অজাত-শ্মশ্রু কোমলাঙ্গ নিরীহ নম্রপ্রকৃতি বাঙ্গালী যুবকদিগের মত ইঁহাদের চরিত্র অমন উচ্চ আদর্শে গঠিত ছিল না। অবশ্য ইহা আমি সাধারণ ভাবে বলিতেছি, কারণ ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন শিখের উপর আমার খুবই উচ্চ ধারণা আছে। আমার আণ্ডামানের কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

সাধারণত শিক্ষিত বলিলে আমাদের মনে যে ধারণা হয় এই সব আমারিকা প্রত্যাগত দলের মধ্যে সেরূপ শিক্ষিত কেহ ছিল না বলিলেই হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর মত কেবল ঘর মুখো না থাকায় ইহারা অনেকেই শুধু অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই পাঞ্জাবের বাহিরে গিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্গ, শ্যাম, মলয়াউপদ্বীপ সমূহ ও চীন দেশের নানাস্থানেই ইহাদের গতিবিধি আরম্ভ হয়। ওদিকে কানাডা ও উত্তর আমেরিকারও বহু স্থানে ইহারা একই উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্গ ও হংকং এ

প্রধানত ইহারা ইংরাজের সৈনিক ও মিলিটারি পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তবে সায়াম, মলয় উপদ্বীপ ও চীন দেশের নানা স্থানে অনেকে কুলি মজুরেরও কাজ করিতেন, অনেকে আবার কন্ট্রাকটারি ও অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসায়ও নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কানাডায় ও আমেরিকায় ইঁহারা প্রধানতঃ কুলি মজুর রূপেই জীবন যাপন করিতেন। আমেরিকার কোন কোনও কারখানায় আমেরিকা বাসীদিগের অপেক্ষা ইহারাই অধিক সমাদৃত হইতেন। ইহারা আমেরিকাবাসীদিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন সুতরাং উপার্জ্জনও যথেষ্ট করিতেন। এই জন্য অনেক সময় ইঁহাদের সহিত আমেরিকাবাসীদিগের ঘোর বিবাদ চলিত। ইঁহাদের মুখে শুনিয়াছি একবার একটি সহরে মনোমালিন্য এতদূর গড়াইয়াছিল যে এক প্রচণ্ড বিবাদের সূত্রপাত হয় তাহাতে সহরের যত শিখ সব একদিকে আর যত আমেরিকাবাসী মজুর সব আর একদিকে ও লাঠি সোটা লইয়া রীতিমত মারামারি আরম্ভ করিয়া দেয় কিন্তু ইহাতেও সরকার পক্ষ হইতে শিখদের তেমন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। ভারতে এইরূপ হইলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াইত কে জানে! ঐ সব আমেরিকাপ্রত্যাগত শিখেরা সেরূপ শিক্ষিত না হইলেও নিজেদের মাতৃ-ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি প্রায় সকলেই পাঠ করিতে পারিতেন এবং নিজের গ্রামের শিখজাতির শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। ঐরূপ শিক্ষা কল্পে সেই সব আমেরিকাবাসী শিখেরাই আমেরিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া কয়একবার ১০ হাজার ১৫ হাজার করিয়া টাকা দেশে পাঠাইয়া-ছিলেন! আমেরিকার স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে বাস করায় এবং যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম হওয়ায় ইহাদের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ইঁহাদের অনেকেই আমেরিকায় যাইয়া ও স্বীয় বেশ ভূষা পরিত্যাগ করেন নাই এবং অনেকেই স্বহস্তে পাক করিয়া দেশী ধরণেই আহার বিহার সমাধা করিতেন। দেশ হইতে যখন প্রথম আমেরিকায় যান তখন হয়ত ইংরাজি একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমেরিকা গিয়া কেমন একরূপ আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি বলিতে শিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মুখে সেইরূপ আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি বুলি শুনিতে বড় আমোদ অনুভব হইত। এইরূপ ইংরাজি বলিয়াই ইঁহারা আমেরিকায় আপনাদের সকল কাজ বেশ সুন্দর রূপেই চালাইয়াছিলেন এবং উপার্জ্জনও করিয়াছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু আমেরিকায় প্রবাসের ফলে তাঁহারা স্বদেশের সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই।

এমন কি তাহারা আমেরিকায় কুলি মজুরের কাজ করিলেও দেশে কি হইতেছে না হইতেছে এ সকল সংবাদ লইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকিতেন। বাঙ্গালা-দেশের সে দিনের সে নব জাগরণের তরঙ্গ যেমন ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও একটা ভাবের হিল্লোল তুলিয়াছিল তেমনি আমেরিকার সুদূর তটপ্রান্ত ও প্রহৃত করিয়াছিল। যখন ভারতের বিপ্লবস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল তখন আমেরিকাতেও কয়একজনের অন্তরে অন্তরে সে অগ্নিকণা জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় ভাই কারতার্ সিং নামক একটি তরুণ যুবক ইঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হয়েন। ইনি উড়িশ্যার র‍্যাভেনস কলেজের প্রথমশ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ সমাধা করিয়া বিশেষ কারণে আমেরিকায় চলিয়া আসেন। ইনি শিখদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠদিগের মধ্যে একজন হইলেও ইঁহার অধিনায়কত্বে অনেক বয়স্থ শিখকেও কাজ করিতে দেখিয়াছি। ইনি তাঁহার মতাবলম্বী আরও দুই এক জনের সঙ্গে মিলিয়া একটি সংবাদ পত্র বাহির করিতে সংকল্প করিলেন এই সময় পাঞ্জাবের স্বনামখ্যাত কর্ম্মী লালা হরদয়াল ভারতে বিপ্লবের সকল আশা ত্যাগ করিয়া আমেরিকান সোসিয়ালিষ্টদিগের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। কারতার্ সিং ও তাঁহার বন্ধুরা এই সময় হরদয়ালের নিকট ঐরূপ কাগজ বাহির করিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হন। স্বদেশপ্রেমিক হরদয়াল এইরূপ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন, সুতরাং সানন্দচিত্তে উহাতে যোগদান করেন। এইরূপে "গদর" নামের বিখ্যাত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে ইহাই "গদর" দল গঠন করিয়া তুলে। ক্যালিফর্ণীয়া যুগান্তর আশ্রমই ছিল ইহার কেন্দ্রস্থল।

বিংশ শতাব্দীর মহাসমরের প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবপন্থীর দল বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরাজের সহিত জার্ম্মণির বিরোধ এত শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইবে। ইঁদের বিপ্লবায়োজনও এরূপ ভাবেই হইতে ছিল। যেন আরও ১০।১৫ বৎসর পরে প্রকৃত বিপ্লব আরম্ভ হইবে। এই জন্যই ইঁহারা এই মহাসমরের সময় বিপ্লবের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতের বিপ্লব দলের সহিত ভারতের বাহিরে কোনও বিপ্লবপন্থীর তেমন কোনই যোগাযোগ ছিল না। এই জন্যই আমেরিকার বিপ্লবপন্থিগণ যখন দলে দলে ভারতে আসিতে লাগিলেন ভারতবাসী বিপ্লববাদীরা তখন তাঁহাদের সহিত তেমন ভাবে সময় মত মিলিয়া উঠিতে পারেন নাই, পারিলে হয়ত ভারতের ভাগ্য আজ অন্যবিধও হইতে পারিত।

আমেরিকা প্রবাসী বিপ্লবপন্থিগণও বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরাজের সহিত জর্ম্মণির এত শীঘ্র যুদ্ধ বাধিবে, সেই জন্য তাঁহাদেরও আয়োজন এক ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিতেছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ভারতের বাহিরের কোনও রাজ শক্তির সহায়তা লইয়া সমরায়োজনের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবারও বহু আয়োজন হইতেছিল, ঠিক এমন সময় ইউরোপে মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইয়া গেল। সকল সংকল্প একেবারে চূর্ণ হইল। তখন ইঁহারা দলে দলে ভারতে আসিয়া ভারতীয় সৈনিকদিগকে হাত করাই বিপ্লবের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। হাজারে হাজারে শিখ বিদেশে নিজেদের সকল আস্তানা গুটাইয়া লইয়া স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

ভারত গর্ভর্ণমেণ্ট কিন্তু ইঁহাদের অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন, কারণ ইঁহারা আমেরিকায় প্রকাশ্য সভায় ভারতের বিপ্লববিষয়ে বক্তৃতাদি করিতেন। "গদর" কাগজ প্রকাশ্য ভাবেই মুদ্রিত হইত। ৫৭ সালের মহা-বিপ্লবের ১০ই মে তারিখ এক উৎসবে পরিণত করা হইত। লালা হরদয়ালের উপরেও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিশেষ খরদৃষ্টি ছিল, কয়একবার তাঁহার 'দিন-লিপি'ও অদ্ভুত উপায়ে অপহৃত হয়। শেষে যখন তাঁহাকে ধরিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তখন জনৈক আমেরিকান তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন। সুতরাং হরদয়াল ও অন্যান্য ভারতীয়গণ আমেরিকা ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিলেন।

বিভিন্ন স্থানের জর্ম্মণ কন্সলেরা তখন ভারতের বিপ্লব প্রয়াসীদের নানারূপে সাহায্য করিতেছিলেন। আমেরিকা-প্রত্যাগত দলেরা তাহাদের সহিত দেখা করিবার সুযোগ পাইলে কখনই পরিত্যাগ করেন নাই।

এইরূপে কয়েকজন ইউরোপের দিকে যাত্রা করিলেন এবং অবশিষ্টাংশ সকলে ভারতের দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে ইঁহারা যেখানে সেখানে নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে থাকেন। এইরূপ একটি দল জাপানের বন্দরে উপস্থিত হইলেন। পরমানন্দ নামে ছিপছিপে ধরণের এক তরুণ যুবক ইঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ইঁহার বাড়ী ঝাঁসিতে। আণ্ডামানে আমরা ইহাকে ছোট পরমানন্দ বলিতাম, কারণ বড় পরমানন্দ ছিলেন লাহোরের ডি, এ, ভি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ। ইনিও লাহোরের ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি পাইয়াছিলেন। পাঞ্জাবে শিখ অভ্যুদয়ের সময় স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের জন্য যখন নির্ভীক দেশ

ভক্তেরা মুসলমান অত্যাচারের সম্মুখে অকাতরে প্রাণ বলি দিতেছিলেন, এই ভাই পরমানন্দের এক পূর্ব্বপুরুষ তখন আত্মবলিদানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে নাকি মুসলমানেরা করাত দিয়া বিদীর্ণ করিয়া মারিয়াছিল। তখন হইতেই শিখেরা এই বংশের সকলকে "ভাই" আখ্যা প্রদান করেন। শিখদিগের মধ্যে এই "ভাই" আখ্যা অতিশয় সম্মান সূচক। সেই জন্যই আমরা সকল শিখকেই তাঁহাদের নামের সহিত "ভাই" শব্দ যোগদিয়া ডাকিতাম।

ভাই ভগবান সিং নামে শিখদিগের এক অতি উৎসাহী নেতা ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কত শিখ নিজের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বিপ্লব কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল ক্ষণিক উত্তেজনাবলেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই বিপ্লব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা নহে ; তাঁহাদের মধ্যে সত্যসত্যই দেশসেবার একটা প্রেরণা জাগিয়াছিল। এইরূপে দেশপ্রত্যাগত অনেক শিখের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যাঁহারা প্রকৃতই প্রাণের পরতে পরতে পরাধীনতার জ্বালা বুঝিয়া বিপ্লব কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহ পেনাঙ্গে মিলিটারি পুলিসের কাজ করিতেছিলেন, কেহ হংকং এ পাহারাওয়ালা ছিলেন অবার কেহ বা ব্যবসা পরিচালনা করিতেন। এই সময় হংকংএ এক শিখ রেজিমেণ্ট ছিল। এই রেজিমেণ্টেও ইঁহারা আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

ভারতপ্রত্যাগত দলের অনেকে ইংরাজ রেজিমেণ্টের সৈনিকদলভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা কেহ ৮ বৎসর, কেহ ১০ বৎসর আবার কেহ বা ১১ বৎসর ধরিয়া রেজিমেণ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই সকল পূর্ব্বতন সৈনিকদিগের মধ্যে কাহারও তিন বৎসরের কম অভিজ্ঞতা ছিল না, কারণ প্রত্যেক সৈনিকের অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য কর্ম্ম করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে মেশিন গান্ চালক ছিলেন, অনেকে তোপ খানারও কাজ করিয়াছিলেন।

ভারতে আসিবার পথে পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ইঁহাদিগকে ভারতে প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ইঁহারা কেহ বলেন বিবাহ করিতে যাইতেছি, কেহ বলেন বহুদিন যাবত গৃহছাড়া আছি তাই বাটী ফিরিতেছি ইত্যাদি। পরে আদালতে বিচার কালেও বিচারক যখন ইঁহাদিগকে ভারতে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখনও ইঁহাদের প্রায় সকলেই পূর্ব্বোক্তি

উত্তরই দিয়াছিলেন, কেবল একজনের উত্তর একটু ভিন্ন প্রকারের হইয়াছিল। বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করেন "তুমি দেশে ফিরিলে কেন?" তখন উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ইহা আমার স্বদেশ বলিয়া। এই পাঞ্জাবি ব্রাহ্মণটির নাম জগৎরাম, ইনি "গদর" পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি "গদর" মানে মিউটিনি, অর্থাৎ "সিপাহিবিদ্রোহ"।

ভারতপ্রত্যাগত শিখদিগের মধ্যে অদম্য উৎসাহ থাকিলেও কার্য্য করিবার রীতি নীতিতে তাঁহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ দিলেন। ইঁহাদের কোনও কেন্দ্র ছিল না, কোনও শাখা ছিল না। একজনের অধীন হয় ত ২০।৫০ জন করিয়া লোক থাকিত। তাঁহাকে ঐ ২০।৫০ জনের সর্দ্দার বলা হইত। এই সর্দ্দারেরা কখনও একত্র হইতেছেন, কখনও বা পরস্পরের সহিত কিছুদিন ধরিয়া দেখাই হইত না। মোট কথা সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার তাহাদের একটা শৃঙ্খলা ছিল না। কারণ কেন্দ্র ত কোথাও ছিল না। এইরূপে কত লোক নিতান্ত অব্যবস্থিতের মত দেশময় হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল তাহার সংবাদ কে রাখে? যাঁহারা মুলতান জেলে আবদ্ধ ছিলেন তাঁহারাও কেবলই বলিতেন যে শীঘ্রই বিপ্লব আরম্ভ হইবে এবং তাঁহাদিগকে অতি সত্বর জেলমুক্ত করা হইবে। ফলে কিন্তু অবিলম্বে ইঁহাদিগকে বিভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সমানধর্ম্মী একভাবে ভাবুক বহুলোক একস্থানে থাকিলে যে আনন্দ পাওয়া যায় সে আনন্দ হইতেও এইরূপে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন।

এই সব দল ভারতে আসিয়াই বাঙ্গালার বিপ্লবপন্থীদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াদিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় না থাকায় পাত্রে অপাত্রে পাঞ্জাবের বিদ্রোহের কথা বলিতে লাগিলেন। এই সময় কলিকাতার সাধারণ পথেও আমি শুনিয়াছি যে পাঞ্জাবে বিপ্লবের আয়োজন চলিতেছে। "ভারত রক্ষা" আইনের পত্তনকালে হার্ডিং সাহেব এই কথারই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

কারতার সিং এই সময় বাঙ্গালার কোনও সুপরিচিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নেতার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন "তোমরা নিজেদের সুবিধা ও সংকল্পমত কার্য্য করিয়া যাও, বাঙ্গালা ঠিক সময়ে তোমাদের সাহায্য করিবেই" অথবা এইরূপই একটা কিছু বলিয়াছিলেন, এখন আমার তাহা ঠিক স্মরণ নাই।

এই সময় ইঁহাদের অস্ত্র স্বল্প অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। যদিও এই

বিপ্লবের প্রধান অবলম্বন ছিলেন পাঞ্জাবী সৈনিকের দল তথাপি আত্মরক্ষার্থে ও যতদূর সম্ভব প্রত্যেক কর্ম্মীকেই সশস্ত্র করিবার অভিপ্রায়ে কিছু রিভলভার ইত্যাদির আবশ্যকতা হইল। এই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত জগৎরামকে কিছু টাকা দিয়া কাবুলের দিকে প্রেরণ করা হয়। জগৎরাম বেচারা পেশাওয়ারেই ধৃত হইলেন এবং এখন হইতেই তাঁহার কারাযন্ত্রণা ভোগের আরম্ভ হয়। পরে ইঁহার সহিত আমার আবার আন্দামানে সাক্ষাৎ হয়।

(৪)

ঝাঁসির পরমানন্দকেও ইঁহারা বাঙ্গলাদেশে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলেন। ইনিও বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এই বিপ্লবায়োজনের সময় কাশীতে বাহিরের লোকের সহিত দেখাশুনা করিবার জন্য কয়েকটি বিশেষ বাটী নির্দ্ধারিত ছিল। পাঞ্জাব হইতে কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহারা ইহারই একটি বিশেষ বাটিতেই প্রথমে উপস্থিত হইতেন। সেখান হইতে সংবাদ পাইলেও দুর হইতে অলক্ষ্যে আগন্তুককে চিনিয়া লইলে তবে তাহার সহিত দেখাশুনা করা হইত। সেদিন কাশীতেই ছিলাম। পাঞ্জাব হইতে দলের একটি লোক পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজনের সংবাদ লইয়া আমাদের নিকট উপনীত হইয়াছেন। বিপ্লবের জন্য দুই তিন হাজার শিখ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার মুখে এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া আমাদের অন্তরতম পুরুষটি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। পাঞ্জাবের সহকর্ম্মিগণ ইঁহার মুখে বলিয়া পাঠাইয়াছিলন যে তাঁহাদের রাসবিহারীকে নিতান্তই প্রয়োজন। দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারি আসামী প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর রাসবিহারীর নাম সে সময় আমেরিকাতেও প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমেরিকায় থাকিতেই তাঁহারা রাসবিহারীর নাম শুনিয়াছিলেন।

রাসবিহারী নানাকারণে তখন যাইতে পারিলেন না সুতরাং প্রথমে আমারই পাঞ্জাব যাওয়া স্থির হইল। কথা বার্ত্তায় ঠিক হইল যে পাঞ্জাবের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া সকলের গোচর করিলে, পরবর্ত্তি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইল যে জালান্দার সহরে গিয়া শিখদিগের নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তখন নবেম্বর মাস প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। পশ্চিমে তখন রীতিমত শীত পড়িয়াছে। সেই শীতকালের সকালে লুধিয়ানায় আসিয়া

পহুঁছিতেই দেখি আমার বন্ধুটির পরিচিত একটি তরুণ শিখ ষ্টেসানে আমাদের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। বন্ধুটি ইহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইঁহারই নাম কারতার সিং। কারতার সিং গাড়িতে উঠিয়া আমাদের সহিত জলন্দরাভিমুখে চলিলেন। পথে যৎসামান্যই আলাপ হইল। শুনিলাম লুধিয়ানায় সে সময় ২।৩শ লোক একত্র হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্নদিকে প্রেরণ করা হইবে। তাঁহারা সকলে গুরুদ্বারায় অধ্যয়ন করিবার উপলক্ষ করিয়া মিলিত হইতেন। ক্রমশঃ

পতিতার সিদ্ধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(২৯)

অন্ধকারে রিভলবারের নিষ্ফল অনুসন্ধানে ব্রজেন্দ্রের সাময়িক উত্তেজনা চলিয়া গেল। আবার যখন কোচয়ান আসিয়া জানাইল আস্তাবলের সুমুখের রাস্তা জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, গাড়ী লইয়া আসা অসম্ভব, তখন তাহার উত্তেজনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও আর রহিল না।

উত্তেজনান্তে অবসাদে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া কিছুক্ষণের চিন্তায় যখন ব্রজেন্দ্র আপনাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল, তখন ঘড়ীতে চারটে বাজিয়াছে।

"রিভলবার লুকিয়ে রেখে তুই বন্ধুরই কাজ করেছিস হেমা।" "সেকি বাবু, একটা কুটাকে মেরে আপনাকে খুনের দায়ে পড়তে দেব?"

"না যাওয়াটাই ভাল হয়েছে, চোখের উপর দু'টোকে দেখলে হয়ত রাগ সামলাতে না পে'রে কিছু একটা ক'রে বসতুম।" "গেলে বাবু, ঠিক দেখতে পেতেন।"

"হেঁটেই একবার যাব নাকি?"

"এখন গেলে আর কি দেখা পাবেন বাবু! সে ধূর্ত্ত বামুন এতক্ষণে ঠিক স'রে পড়েছে।"

"আলোটা জ্বালাবার ব্যবস্থা কর্ দেখি, চিঠি খানাতে কি লিখেছে দেখি।"

"চিঠিখানা ঘরে নিয়ে এস, সেই খানেই দেখবে।"

হেমা এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই চোরের মত প্রভুর পশ্চাতে ইজিচেয়ারের অন্তরালে মাথা ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল, আর ব্রজেন্দ্র দোরের ফাঁকের ভিতর দিয়া বিরাট শূন্তের সঙ্গে দেখা করিতে চোখ দু'টাকে কপালের দিকে উঠাইয়া দিল—নির্ম্মলা ত তা হ'লে দোরের আড়াল হইতে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে।

ঘরের বিপুল নিস্তব্ধতায় নির্ম্মলাও বুঝিল, তাহার অতর্কিত আগমনে, স্বামী ও হেমা দু'জনেরই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। "উঠে এস।"

বাঙ্‌ নিষ্পত্তি না করিয়া ব্রজেন্দ্র বাহিরে আসিল। হেমাও তার পিছন পিছন বাহিরে আসিল, এবং পুরস্কারের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, তার প্রভুপত্নীকে শুনাইয়া বলিল—"কিন্তু বাবু, সে বামুন বেটাকে আপনাকে কিছু শিখিয়ে দিতেই হইবে।"

"সে কি আর এ বাড়ীতে আসবে ?"

"ঠিক আসবে—আমাকে সে দেখতে পায়নি বাবু।"

"ছুঁচো মেরে আর হাতে গন্ধ ক'রে কি হবে হেমা !"

"কে বামুন ?" নির্ম্মলার এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ব্রজেন্দ্র হেমাকেই বলিতে লাগিল—"তবে তাকে আর ঠাকুর ছুঁতে দেবো না।"

নির্ম্মলা কে বামুন বুঝিতে পারিয়া বলিল—"ঠিক্ হয়েছে—বাবুর যেমন নারায়ণে ভক্তি, তার পূজারি ত সেইরকম হওয়া চাই। বামুনের দোষ কি, সে ঠিক কাজই করেছে।"

ব্রজেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু হেমা বলিতে নিরস্ত হইল না। উল্লাসে প্রভুপত্নীকে শুনাইবার ইচ্ছাতেই বলিল—"সে যা বল, আমি শুনবো না মা। সে বাড়ীতে এলে আমি ত কান ধরে তাকে ছুচারপাক ঘুরুবোই, তাতে যা থাকে অদৃষ্টে। বাবু! আপনিত দেখেন নি—বেটা বামুন একবার দেখিনা একখানা গরদ প'রে,—আবার খানিক পরে দেখি, কি বল্‌ব মা, বাবু সেই বেটিকেসে দিন যে সেই দেড়শোটাকা খরচ ক'রে চেলি কিনে দিয়েছিলেন—সেই খানা প'রে বরুটির মতন না সেজে—উঃ! এখনও পর্য্যন্ত রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যাচ্ছে—"

নির্ম্মলা তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"তা বলে বামুনকে মারতে হবে ?"

"যে সুটির বাড়ীতে ফলার মারে সে আবার বামুন কি ?"

"তা হ'লে তোর বাবু কি?" আরও কিছু এই বেশ্যাগৃহে আহারের ব্যাপার লইয়া স্বামীর সম্বন্ধে নির্ম্মলা বলিতে যাইতেছিল, কথা সংযত করিয়া সে কেবল রাখুর উপর কোনও অসদ্ব্যবহার করিতে হেমাকেই নিষেধ করিল।

বলিল—"খবরদার, ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এলে যেন তাকে একটীও অকথা শুনিয়ো না, একটি তামাসার কথা পর্য্যন্ত কয়ো না—যা কিছু তাকে বলবার আমি বলব।" বলিয়া, ক্ষুব্ধ নির্ব্বাক স্বামীকে হাত ধরিয়া সে ভিতরে লইয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া নির্ম্মলা দেখিল শুভা ঘুমাইয়াছে। তাহাকে তুলিয়া তার মায়ের ঘরে পাঠাইবার আর প্রয়োজন হইল না দেখিয়া সে মেঝের একটা সতরঞ্চ পাতিতে পাতিতে স্বামীকে বলিল—"শুভাই আজ আমাকে রক্ষা করেছে। আমি সেই জন্য ওকে আশীর্ব্বাদ করেছি,—তোর সোয়ামী যেন মুখ্খু হয়। মুখ্খু সোয়ামী যদি তোমার মত ব্যবহার করে, তা হ'লে মুখ্খু ব'লে তার আচরণ হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় আছে। তোমাদের বেলায় যে মনকে প্রবোধ দেবার কিছু নেই। নাও, তোমার প্রাণপ্রিয়া চিঠিতে কি লিখেছে পড় আমি ব'সে ব'সে শুনি।"

"ও কি লিখেছে না পড়েই আমি জেনেছি। পড়তে হয় তুমিই পড়। আমি শুয়ে পড়ি" বলিয়াই চিঠিখানি নির্ম্মলার একরূপ পায়ের উপরেই ফেলিয়া ব্রজেন্দ্র বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

(৩০)

নির্ম্মলা চিঠি পড়িল। একবার—পড়িতে পড়িতে শিহরিল। দুইবার—পড়িতে পড়িতে ধ্যানস্থার মত মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু মুদিত হইল। তিন-বার—পড়িবার উদ্যমে বার বার চোখে জল সঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে পড়া শেষ করিতে দিল না।

"ঘুমলে নাকি গো?"

"না।"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, রাত থাকতে থাকতে যে কোনও রকমে সেখানে একবার যাওয়াটা আমার উচিত ছিল। হাতেনাতে হারামজাদীকে ধরতে পারলেই সুবিধে হ'ত। এর পরে সে কতরকমের ভান করবে, কত দিব্যি গালবে—"

"হাতেনাতে কেমন ক'রে ধরতে?"

"সে বামুনকে ঘরে ঢুকিয়েছে।"

"হেমা দেখেছে ?"

"দেখেইত সে পাগলের মত ছুটে এসে আমাকে খবর দিয়েছে।'

"হেমাকে দেখিয়ে সে বামুনকে সে ঘরে ঢুকিয়েছে নাকি ?"

"রাম রাম! তার বাবারও কি সে সাহস হয়! সে ওই চিঠি লিখে হেমার হাতদে আমাকে পাঠিয়েছিল।"

"বুদ্ধিমান হেমা চলে না এসে আড়ি পেতে পেতে দেখেছে-কেমন ?"

প্রশ্নটার অর্থ না বুঝিয়া ব্রজেন্দ্র উত্তর দিল না।

"তুমি মনে করেছ, চিঠি পেয়েই হেমা চলে এসেছে সে বিশ্বাস করেছে ?"

"কি রকম ? চিঠিতে সেই রকম কিছু সে লিখেছে নাকি ?"

"তুমিত না পড়েই চিঠির ভিতর কি লেখা আছে বুঝে নিয়েছ।"

ব্রজেন্দ্র শয্যাত্যাগ করিয়া নির্ম্মলার কাছে আসিল, না বসিয়াই বলিল—"কই চিঠিখানা দেখি।"

নির্ম্মলা চিঠিখানা মুঠার ভিতর পুরিয়া বলিল—"আগে বিদ্যের পরীক্ষা দাও।" ব্রজেন্দ্র তাহার হাত হইতে সেটা লইবার চেষ্টা করিতে সে আরো জোরে চিঠি চাপিয়া বলিল—"উঁহু, আগে বল—টেনোনা, ছিঁড়ে যাবে—তোমার বোন জেগে উঠবে—মা জানবে—সকাল হয়ে এলো—করকি—ছি!—"

"বেশ, ভিক্ষে দাও।"

"যা পার, আগে একটু বল—নইলে দেবো না।"

"তুমি কি মনে করছ, চিঠি প'ড়েই আমি তাকে খুন করতে ছুটবো ?"

"আমি কি মনে করছি তোমাকে বলব কেন! তুমি না প'ড়ে কেমন পণ্ডিত হয়েছ, আমি কেবল সেইটি জানতে চাই।"

কাজেই ব্রজেন্দ্রকে পত্নীর কাছে তার অনুমানের পরীক্ষা দিতে হইল।

"কি আর ছাই লিখবে! তোমার জন্য আশাপথ ছেয়েছিলুম, দেরি দেখে ঘর বা'র করছিলুম, হেমার কাছে হঠাৎ তোমার জরের কথা শুনে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়েগেছি। আমার প্রাণের ভিতরে কিযে যাতনা হচ্ছে তা আর লিখে তোমাকে কি জানাবো—তোমার বিরহে সারারাত আমি ছটফট করতে রইলুম সকাল বেলা হেমাকে দিয়ে কেমন থাক, যদি লিখে না পাঠাও, তা হলে কিছুতেই আমার শান্তি হবে না জেনে রেখো—ইত্যাদি।"

"জর হয়েছে লিখে পাঠিয়েছিলে বুঝি ?"

"কি করি, অবস্থা বুঝে এক আধটা ওই রকম করতে হয়—ওকে আইনে মিথ্যা বলে না। সামান্য একটু উত্তেজনাতে শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী হয়, ডাক্তারী আইনে তাকেও জর বলে।"

"তা হলে শুভার মুখ্খু স্বামী হ'ক এ আশীর্ব্বাদ করে আমি অন্যায় করিনি? তা যা হো'ক, ও সব ত ফাঁকা কথা কইলে, বামুন সম্বন্ধে সে কি লিখেছে অনুমান কর দেখি।"

"পথে আসতে আসতে ঝড়ে পড়ে বামুন আশ্রয় চেয়েছে। কি করি—একে ঝড় তাতে বামুন—থাকতে না দিলে পাপ হয়"—নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে যোগ দিল—"তবে কিনা সে যে সেটা -তুমিত বুঝতেই পারছ—অন্ধকারে চিৎপুর রোড মনে করে—বোকা বামুন সেটা যে তোমার চারুমতির ঘর তা বুঝতে পারেনি"—"এইবারে চিঠিখানা দাও।"

নির্ম্মলা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্কের মত হইয়া গেল। ব্রজেন্দ্র সেটা বুঝিতে পারিল। সে দেখিল নির্ম্মলার চোখ দু'টা তার চোখের উপর পড়িতে আসিয়া হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া কোন্ শূন্যদেশের প্রান্তে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে আপনার দিক দিয়া স্ত্রীর এই আকস্মিক শূন্য দৃষ্টির হিসাব করিতে গিয়া বলিল—"তোমার কি আমার কথার বিশ্বাস হল না নির্ম্মলা?" বলিয়া এখন শুধু তার মুক্ত করপত্রের উপর অযত্নে পতিতবৎ পত্রখানাকে তুলিয়া লইল।

"ভয় নেই আমাকে বিশ্বাস কর।"

"তোমাকে বিশ্বাস না করতে পারলেও, ভয় আমার ঘুচে গেছে।"

"শুধু তোমার জন্য নয় নির্ম্মলা তোমার সেই অসম্ভব রাগ দেখে পুঁটি কেঁদে উঠলো, কিন্তু নালু চুপ ক'রে কাতর নেত্রে যখন আমার মুখের পানে চাইলে, লজ্জায় ম'রে যাওয়া ব'লে সত্য সত্যই যদি একটা ব্যাপার থাকে, সেই সময় ঠিক যেন আমার তাই হয়েছিল। ছেলে বড় হয়ে উঠলো, বিশ্বাস কর, আর আমার এ রকম লজ্জার ব্যবহার চলবে না। যখন বেরুতে সুবিধা পেয়েছি তখন তার ফাঁদে আর পা দিচ্ছিনি।"

"তা হলে আর ও চিঠি পড়ে কাজ নেই।" বলিয়া নির্ম্মলা চিঠিখানা আবার ধরিল।

"একবার চোখ বুলিয়ে যাব মাত্র।" বলিয়া চিঠিখানা খুলিয়া ব্রজেন্দ্র যেমন আলোর কাছে ধরিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা তাহার হাত ধরিয়া পড়িতে আবার নিষেধ করিল।

"এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"এখন থাক ছেলে মেয়ে উঠবার সময় হইল।"

"বেশ তুমি উঠে যাও না।"

"চিঠি তোমার নয়।"

"তবে কার?" বলিয়া চিঠি উল্টাইতেই ব্রজেন্দ্র দেখিতে পাইল, শিরোনামায় লেখা শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী, সাবিত্রী চরিতাসু।

এমন চমকিত বুঝি ব্রজেন্দ্র জীবনে হয় নাই। পত্রহাতে ধরিয়া সে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

"হেমা কি এই চিঠি হাতে ক'রে এনেছে?"

"তা আমি কি করে জানবো? সে তুমি জান।"

"তবে পড়বো না নাকি?"

"সত্যি সত্যিই মেয়েটা উস্‌খুস্ করছে—পড়তে চাও হাত মুখ ধুয়ে এর পর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে প'ড়। চিঠি তোমারই—শিরোনামাটা কেবল আমার।" পুঁটি বার দুই পাশমোড়া দিয়া ক্রন্দনের সুর ধরিবার উদ্যোগ করিল।

"আর বসে রইলে কেন—উঠে যাও না গো!"

ইহারই মধ্যে চিঠির উপর একবার মাত্র চোখ ফেলিয়াই ব্রজেন্দ্র দুই তিন ছত্র পড়িয়া লইয়াছে।

"আমার নমস্কার জানিবে। পত্র তোমার স্বামীকে লিখিতে গিয়া তোমায় লিখিলাম, অন্ধের চোখের উপর আলো ধরিয়া ফল কি?"

"অন্ধকে তবে আলো দেখাচ্ছ কেন নির্ম্মলা?"

"পড়েছ, তবে পড়—মাগী যেন নভেল লিখেছে।"

পত্র হাতে করিয়া ব্রজেন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

আহ্বান

[শ্রীলীলা দেবী]

বাজিছে ডঙ্কা গিয়াছে শঙ্কা
চল্‌রে চল্‌রে মরণ মাঝ !
নাচিছে পরাণ দুলিছে কৃপাণ
সেজেনে সেজেনে প্রলয় সাজ !
ঐ বাজে ভেরী আর নাহি দেরী
আয় রে ছুটিয়া বাহিরে আয়—
ছেড়ে দে' লজ্জা ভয়ের সজ্জা
সময় বৃথা যে বহিয়া যায় !
দ্যাখ্‌রে নয়নে মত্ত পবনে
উড়িছে মুক্তি-পতাকা দল,
বজ্র তাড়নে ছেদিয়া বাঁধনে
মুক্ত হবি তো চল্‌ রে চল্‌ !
ঐ দ্যাখ কিবা গৌরব বিভা
অম্বরভালে উদিত আজ,
বাজিছে ডঙ্কা গিয়াছে শঙ্কা
সেজেনে' সেজেনে' প্রলয় সাজ !

সঙ্গীত

[শ্রীমহেশচন্দ্র সেন]

সেতার ও এস্রাজের স্বর-তরঙ্গ, নিশীথে বংশীধ্বনি, অথবা কোকিলের-কল-কূজন বা ভ্রমর-গুঞ্জনে অর্থযুক্ত বাক্য নাই, তথাপি তাহা হৃদয়োন্মাদক। বালকের অস্ফুট বাক্য কামিনী কণ্ঠ-স্বরলহরী স্বতই মনোমোহকর। যে কথা সামান্যতঃ বলিলে কোনরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস হয় না, কণ্ঠ-ভঙ্গীর গুণে তাহাতে প্রেম বিরহ, ভক্তি, বাৎসল্য ও শোক প্রভৃতি ভাব শতগুণে বিকশিত হইয়া

পড়ে। হৃদয়ের যে গভীরতম শোক, অপরিমেয় ভালবাসা, মর্ম্মান্তিক বেদনা ও অতলস্পর্শী প্রেম,—যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না,—সঙ্গীতের স্বর-মাধুর্য্যে কণ্ঠভঙ্গীর গুণে সেই ভাব পরিব্যক্ত হয়। দুঃখ যত গভীর তত বাক্যের অতীত। বাক্য সীমাবদ্ধ অথবা অসম্পূর্ণ। উদ্বেলিত হৃদয়-সমুদ্রের তরঙ্গ অপূর্ণ ভাষায় ধারণা করিতে পারে না;—তাহা ব্যক্ত হয় স্বর-ভঙ্গীতে। বস্তুতঃ স্বর যেন তাপিত অন্তরের একমাত্র ভাষা। পুত্র-শোকাতুরা জননীর বিলাপ ও পতি-শোক-বিবশা-বিধবার কান্না, হৃদয়-বিদারক! সে করুণ বিলাপে বাক্যসংযোগ না থাকিলেও মর্ম্মভেদিস্বরে অঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃদয়কে আলোড়ন করে, শোক, ভয় ও বিস্ময়ের ভাব নয়নাশ্রুরূপে ধীরে ধীরে বহিতে থাকে। ফলতঃ হৃদয়ের গূঢ়-তল-চারী ভাব প্রকাশের ভাষা আবেগপূর্ণ স্বরভঙ্গী।

এই স্বর-বৈচিত্রের চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। যে সঙ্গীতের বিমোহিনী শক্তিতে জগৎ মন্ত্রমুগ্ধ, যাহার উন্মাদকর বিহ্বলতা মদিরা অপেক্ষাও মত্ততাজনক; সেই সঙ্গীতের মূল উপাদান দুইটী;—শব্দ-চাতুর্য্য ও স্বর-চাতুর্য্য। অর্থযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যই শব্দ চাতুর্য্যের মূল; সুরের নাদ লয় এবং শ্রুতি ও মূর্চ্ছনাদিই স্বরচাতুর্য্যের প্রাণ।

নাদ বা ধ্বনি দ্বিবিধ, বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। মনুষ্যাদির কণ্ঠ হইতে যে নাদ নির্গত হয়, তাহা বর্ণাত্মক এবং বস্তুর পরস্পর আঘাতে যে নাদ জন্মে, তাহা ধ্বন্যাত্মক বলিয়া কথিত। ধ্বনির অপর নাম কাকলী। মধুর ও অস্ফুট ধ্বনি কল, গম্ভীর ধ্বনি মন্দ্র এবং উচ্চধ্বনি নাম তার। মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনিকে স্বর বলে। ঐ স্বর সা, রি, গা, মা, ইত্যাদি স্বর গ্রামে পরিণত হইলে সুর বুঝায়। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় স্বর বিভাগের নাম গ্রাম। উদারা গ্রাম, মুদারা গ্রাম ও তারা গ্রাম। এবং সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সপ্তস্বর।* সুতরাং সপ্তস্বর ও তিন গ্রাম স্বরগ্রামের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক গ্রামে ৭টী সুর এক এক সপ্তক বলিয়া কথিত। মানব কণ্ঠে উদারা, মুদারা, তারা, এই তিন গ্রামের অধিক সুর উচ্চারিত হয় না। স্বর একটু উচ্চগ্রামে উঠিলেই কড়ি, এক পরদা নামিলেই কোমল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় মধ্যম বলে। সঙ্গীতের ভাষায় ইহার নাম তারা, উদারা, মুদারা। এবং বেদান্ত মতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিতনামে অভিহিত। সা, রি, গা, মা, অর্থাৎ নিম্ন সুর হইতে উচ্চ সুরে উত্থানের নাম আরোহণ এবং নি, ধা, পা অর্থাৎ উচ্চ সুর হইতে :নিম্নসুরে

* ইংরাজী ও ইয়োরোপীয় ভাষায়, ডো, রি, মা, ফা, সো, লা, সি সপ্তস্বর বলিয়া কথিত।

নামিবার নাম অবরোহণ। বিশুদ্ধ ভাষায় ইহাকে অনুলোম ও বিলোম বলে। এক সুরকে দ্রুত গতিতে বার বার কম্পিত করার নাম কম্পন। কোন সুর হইতে এক বা ততোধিক সুরে অবিচ্ছেদ গতির নাম মূর্চ্ছনা। এক সুরকে ভিত্তি করিয়া তাহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী সুরের সহিত দ্রুত গতিতে বার বার ধ্বনিত করার নাম গমক। সঙ্গীতের ভাষায় কোন একটী অক্ষরকে দুই বা ততোধিক সুর উচ্চারণের নাম আঁশ। কতকগুলি সুর দ্রুত গতিতে আঁশ সহকারে আরোহণ করিলে অথবা ঐ দুইটী ক্রমকে মিশাইলে গিটকারী হয়। সা, রি, গা, মা, ইত্যাদি সুরের সাহায্যে অনুলোম ও বিলোম গতি দ্বারা গমক ও মূর্চ্ছনা সহকারে রাগ রাগিণী বিস্তার করার নাম তান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তানকে উপজ বলে। সুরের পরিমাণের নাম ওজন। কোনরূপ শব্দ অবলম্বনে ও কুষ্টরূপে রাগরাগিণী প্রদর্শন করাকে আলাপ বলে। আলাপে গমক, মূর্চ্ছনা, গিটকারী প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাগিণী আলাপে প্রথম শ্লথ অর্থাৎ ঢিমা, পরে উহা দ্বিগুণ অর্থাৎ দুন, তৎপর চতুর্গুণ অর্থাৎ পর দুন এইরূপ গতি হইয়া থাকে। কতকগুলি সুর গমক মূর্চ্ছনা ও গিটকারী সংযোগে আরোহী ও অবরোহী ক্রমে স্বরভঙ্গী দ্বারা বিন্যস্ত হইয়া এক একটী রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাতে কমনীয়তার ভাগ অল্প তাহা রাগ; যাহাতে উহার আধিক্য, তাহাকে রাগিণী বলে। সংগীত শাস্ত্রে ছয় রাগ * ও ছত্রিশ রাগিণী নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ সমস্ত যোগে ষোড়শ সহস্র উপরাগ ও উপরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

স্বর-গ্রাম রাগ রাগিণীর মূল ভিত্তি। উহার মৌলিকতা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ স্থির করিয়াছেন যে, "ষড়্জ ময়ুরের কে-কা বা ভ্রমর গুঞ্জন হইতে উৎপন্ন। ঋষভ অর্থাৎ বৃষের ধ্বনি হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া কথিত। ছাগলের স্বর হইতে গান্ধার এবং শৃগালের রব হইতে মধ্যম উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চম কোকিলের স্বর হইতে সৃষ্ট। ধৈবত অশ্বরব হইতে এবং মতান্তরে ভেকের স্বর হইতে গৃহীত। নিষাদ বা নিখাদ গর্দ্দভের ধ্বনি হইতে কাহারও মতে হস্তিস্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' † এইরূপে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ধৈবত, নিখাদ প্রভৃতি সপ্তস্বরের সৃষ্টি। মূল উনপঞ্চাশটী

---

* ভৈরব, মেঘ, পঞ্চম, শ্রী, নটনারায়ণ ও বসন্ত। এই ছয় রাগ যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয়, ঋতুতে গীত হইয়া থাকে।

† ধ্বনি ও স্বর-প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত। বিশ্ব-সঙ্গীত।

বর্ণমালার সংযোগে যেরূপ ভাষার উৎপত্তি, শুদ্ধ শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সেইরূপ পশুপক্ষীর স্বরের অনুকরণে যে কিরূপে রাগরাগিণীর কল্পনা সূচিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

রাগরাগিণী শব্দময় সুরের সমষ্টি মাত্র। উহার সূক্ষ্মতম বিভাগগুলি এরূপ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহা পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের সম্পূর্ণ অতীত। সঙ্গীতে ভক্তি প্রেম বা শোকব্যঞ্জক পৃথক পৃথক রাগিণী নির্দ্দিষ্ট আছে। বেহাগ রাগিণীতে হৃদয়ের ঔদাস্য ভাব আনিয়া দেয়। বিরহের অনুরূপ ললিত, এবং জয়জয়ন্তীতে শোকের তরঙ্গ উচ্ছ্বাসিত হয়। কাব্য নবরসাত্মক, কিন্তু সঙ্গীত অনন্ত রসের প্রস্রবণস্বরূপ। রাগ রাগিণীর ব্যাকরণ আছে। দিবসে, নিশীথে সন্ধ্যায়, কোন সময়ে কোন রাগিণীর আলাপচারি করিতে হয়, তাহাও প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে! দিনে বেহাগ গাইতে হয় না; রাত্রে ভৈরবী গাওয়া নিষিদ্ধ; অন্যান্য রাগরাগিণীর সম্বন্ধে এইরূপ। পূর্ব্বকালে রাগ রাগিণী মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতেন। মেঘমল্লার বারিবর্ষণ ও দীপক রাগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। ইহা অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইলেও প্রকৃষ্টতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। সুতরাং সেকালে রাগরাগিণীর চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে।

এক একটী রাগিণী এক একটী মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি বিশেষ। রাগ রাগিণী ধ্যান আছে; যে রাগিণীতে যেরূপ মানসিক ভাবের উচ্ছ্বাস জন্মে, সেই রাগিণীর প্রতিমাকল্পনাও তদুপযোগী, সন্দেহ নাই। ইহা অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। নব রসের মধ্যে আদি, করুণ ও শান্তি রস সঙ্গীতের পক্ষে অধিক উপযোগী; সুতরাং অধিকাংশ রাগ রাগিণীই ঐ সমস্ত ভাবের উদ্দীপক।

রাগ রাগিণীর ন্যায় তালও সঙ্গীতের একটী প্রধান অঙ্গ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রা সমষ্টির নাম তাল। সঙ্গীতের কালকে করতালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতে সমভাগে বিভক্ত করা হয়; উল্লিখিত বিভাগ গুলিই মাত্রা। মাত্রা ভেদ অনুসারে তালের গুরুত্ব লঘুত্ব পরিমিত হয়। মাত্রা চারিপ্রকার;—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও অণু। হ্রস্ব—এক মাত্রা; দীর্ঘ—দুই তিন বা ততোধিক মাত্রা; প্লুত–অর্দ্ধ এবং অণু—$\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ বা তাহা অপেক্ষাও অল্প মাত্রা। তাল চারি অংশে বিভক্ত; বিষম, সম, অতীত, ও অনাঘাত। যে স্থান হইতে তালের প্রথম উৎপত্তি, তাহা সম, তালের ঠিক মধ্যস্থলে বিষম, সম ও বিষমের মধ্যস্থলকে অতীত এবং বিষম ও

সমের মধ্যস্থলকে অনাঘাত বলে। প্রথম পদ বিষম, দ্বিতীয়ের নাম সম, তৃতীয় অতীত এবং চতুর্থ পদের নাম অনাঘাত বা ফাঁক্। এই চারি পদের সমষ্টির নাম তাল। তন্মধ্যে সম এবং ফাঁক্, এই দুইটাই তালের প্রধান অংশ। গীতের আদ্যোপান্ত কাল পরিমাণ তুল্য হওয়ার নাম লয়। তালের সাহায্যে লয় রক্ষা হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক সম এবং অনাঘাত প্রভৃতি ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পড়িয়া থাকে। লয়ের গতি ত্রিবিধ। প্রথম বিলম্বিত, শ্লথ, ঠা বা ঢিমা। দ্বিতীয় মধ্য এবং তৃতীয় দ্রুত অর্থাৎ জল্দ বা দুন। প্রথম মাত্রার ও তালের যেরূপ গতি, পরবর্ত্তী মাত্রা ও তালের সেইরূপ গতি হওয়া উচিত। সমগতির ব্যতিক্রমের নাম বেলয় বা তালকাটা। গায়ক ও বাদক উভয়ের সুবিধা অনুসারেই লয় স্থির করা উচিত। তাল-নিরূপক মেট্রোনোম (Metronome) যন্ত্রের সাহায্যে মাত্রা ও তাল সাধন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা। তাল বহুবিধ। ৬৪ তাল, অসংখ্য উপতাল, এবং রং পরং প্রভৃতি যে কত আছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। ব্যাকরণ যে রূপ ভাষার অধিরোহিণী, তাল ও সঙ্গীতের পক্ষে তদ্রূপ। বেতালা গান কদাপি শ্রুতি-সুখকর অথবা শ্রোতব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না।

গীত সমূহ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা। যে সমস্ত গীত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ, তাহাই ধ্রুপদ। ইহা অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত। ধ্রুব পদ এই নাম হইতে ধ্রুপদ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। খেয়াল শব্দের অর্থ স্বাধীনতা অর্থাৎ ইচ্ছামতে যাহার নিয়মচ্যুতি ঘটে, তাহাই খেয়াল। খেয়ালের তান্ উপজ প্রভৃতি দ্বারা ইচ্ছামত রাগিণী বিস্তার করা যাইতে পারে। স্ত্রী-কণ্ঠের উপযোগী অর্থাৎ প্রেম, বিরহ, মিলন ও পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি কোমল ও মধুর ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের নাম টপ্পা। ধ্রুপদ গুরুপাক ও কষ্টসাধ্য। খেয়ালে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য ও টপ্পার মাধুর্য্য উভয়ই বিদ্যমান। টপ্পা কোমলতা ও মাধুর্য্যের আধার; সুতরাং উহাতে সহজেই লোকের মন আকৃষ্ট হয়। গীত সমূহ প্রধানতঃ চারি চরণে বিভক্ত হইয়া থাকে; আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। যে গানের ভিন্ন ভিন্ন চরণে বিভিন্ন তাল ব্যবহৃত হয়, তাহাকে তাল ফেরতা বলে। গীত এবং বাদ্য উভয়ের মধ্যে বাদ্য গীতের অনুগামী; সেই জন্য হিন্দুস্থানী গায়কেরা গীতকে সওয়ার এবং বাদ্যকে তাহার বাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

স্বর-চাতুর্য্য যেরূপ সঙ্গীতের প্রাণ, শব্দ-চাতুর্য্যও সেইরূপ সঙ্গীতের প্রধান

উপাদান। অর্থযুক্ত বাক্যভিন্ন মানসিক ভাবের পরিস্ফুটতা জন্মে না এবং ছন্দোবন্ধে গ্রথিত না হইলে তাহা চিত্তাকর্ষক হয়না; সুতরাং শব্দ-চাতুর্য্য জন্য অর্থযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যের প্রয়োজন। ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়াই কাব্যের সৃষ্টি। সঙ্গীত স্বর-চাতুর্য্য ও শব্দ-চাতুর্য্যময়। সুতরাং কবিত্ব সম্বন্ধে কাব্য ও সঙ্গীত অভিন্ন ভাবাপন্ন। তান-লয়-নিবদ্ধ কবিতাই সঙ্গীত-পদবাচ্য। কবিত্ব-বিরহিত অর্থাৎ ভাব-বিহীন সঙ্গীত রসলেশ শূন্য; উহা হৃদয়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়না। সুতরাং যে সঙ্গীতে নব রসের কোন রস বিদ্যমান নাই, উহা কদাপি সঙ্গীত পদবাচ্য নহে। আধুনিক যাত্রা ও স্বদেশী সঙ্গীতের অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কাব্যের উদ্দেশ্য যেমন মানসিক সুখ, সঙ্গীতের উদ্দেশ্যও তাহাই; তথাপি বিস্তর মাত্রাগত প্রভেদ আছে। তান-লয়-নিবদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে মানবহৃদয় যে ভাবের তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়, উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠে কবি ও ভাবুক ভিন্ন অন্যের হৃদয়ে তাহার শতাংশের একাংশ ভাবও উদ্রিক্ত হয়না। অপিচ সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই কাব্য পাঠে ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া থাকেন; —শোক, ভয়, বিস্ময় ও হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি ভাবে আত্মহারা হইয়া একবারে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ শিক্ষা প্রভাবে হৃদয় উন্নত না হইলে রসগ্রাহিতা শক্তি উন্মেষ হয় না; এজন্যই কাব্যাদি সুকুমার বিদ্যার আলোচনায় জনসাধারণের সহসা প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু সঙ্গীতানুরাগ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বালক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, ইতর ও সুরসিক, অরসিক, আপামর সাধারণ সকলেই সঙ্গীতের মনোমোহিনী শক্তিতে বিমোহিত। সুললিত-সঙ্গীত-শ্রবণে হৃদয় আনন্দে বিস্ফারিত হয়, আহ্লাদে নৃত্য করে, শোকে দ্রবীভূত হয় ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সঙ্গীতে অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়ন করে,—হৃদয়কে একবারে উন্মাদিত করিয়া তোলে। এই সর্ব্বজন-বিমোহিনী শক্তি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতার প্রধান উপাদান। সুতরাং কাব্য যদি মধু হয়, সঙ্গীত তবে মদিরা। ফল কথা, মাদকতা সম্বন্ধে তুলনা করিতে গেলে কাব্য অপেক্ষা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। মানবজাতির কথা দূরে থাকুক, অজ্ঞান পশুপক্ষীদিগকেও সঙ্গীতের সুমধুর তানে আত্ম-বিহ্বল হইতে দেখা যায়। বংশী-নিনাদ-মুগ্ধ বন-কুরঙ্গ নির্দ্দয় ব্যাধের শরে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, ইহা প্রবাদ বাক্য নহে। এই মুগ্ধকারিতাগুণেই ঈশ্বর-সাধনা পক্ষেও সঙ্গীত প্রধানতম অবলম্বন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠকল্প সাধকগণের মধ্যে অনেকেই

তাল-লয় নিবদ্ধ সুমধুর সঙ্গীতে সাধনমার্গ অনুসরণ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন। অপিচ পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতেও সঙ্গীতের মহিমাকীর্ত্তনচ্ছলে ভাগীরথীর জন্ম প্রভৃতি বহুবিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাও সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অমোঘ নিদর্শন। বস্তুতঃ সঙ্গীতের ন্যায় এরূপ মোহমন্ত্র আর দ্বিতীয় সম্ভবে না।

উচ্চতর মনোবৃত্তিসমূহের বিকাশের জন্যও সঙ্গীত একমাত্র প্রধান সাধন। সঙ্গীতে নীচাশয়তা দূর করে, হৃদয় প্রশস্ত ও পরিমার্জ্জিত হয়, হিংসা, দ্বেষ, খলতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশ নিস্তেজ হইতে থাকে। সঙ্গীতামোদে মদিরার প্রমত্ততা আছে, অথচ কলুষপঙ্কিলতা নাই। কাব্য ও সঙ্গীত আলোচনার ফল একই—হৃদয়ের উৎকর্ষসাধন।

রচনা—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

আমার আমার বলে' ডাকি, আমার এ ও আমার তা ;
তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিওনাক আমার যা।
আমার বাড়ী আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে ;
আমায় নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা আমার মা,
আমার পতি আমার পত্নী ;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না।
আমায় যত্নের দেহ ভবে তাও রেখে যেতে হবে ;
আমার বলে' কারে ডাকি ?—চোখ বুজলে কেউ কারো না॥

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

তোড়ী-ভৈরবী—কার্ফা।

আস্থায়ী।

	২´	৩	০	১	
II {	র্সা	র্সা। -া	র্সা। র্সা	-া। র্ঋা	র্সা I
	আ	মা র্	আ মা	র্ ব	লে'
	২´	৩	০		
I	দা	-ঋা। র্সা	-া। -া	-া। -া	-া I
	ডা	• কি	• •	• •	•

২´	৩	০	১	
I জ্ঞা	-া। জ্ঞা	-া। ঋা	-া। জ্ঞা	-ঋা I
আ	০ মা	র্ এ	০ ও	০
২´	৩	০	১	
I জ্ঞা	-া। ঋা	-া। সা	-া। -া	-া }
আ	০ মা	র্ জা	০ ০	০
২´	৩	০	১	
I { পা	পা। -া	পা। পা	-া। দা	পা I
তো	মা র্	নি য়ে	০ তু	মি
২´	৩	০	১	
I জ্ঞা	-মা। পা	-া। -া	-া। -া	-া I
থা	০ ক	০ ০	০ ০	০
২´	৩	০	১	
I জ্ঞা	-া। জ্ঞা	-া। ঋা	-দা। জ্ঞা	-ঋা I
নি	০ ও	০ না	০ ক	০
২´	৩	০	১	
I জ্ঞা	-া। ঋা	-া। সা	-া। -া	-া } II
আ	০ মা	র্ মা	০ ০	০

অন্তরা।

২´	৩	০	১	
II { দা	-া। দা	-া। দা	-া। দা	-পা I
(১) আ	০ মা	র্ বা	০ ড়ী	০
(৩) আ	০ মা	র্ ছে	০ লে	০
২´	৩	০	১	
I র্সা	-া। র্সা	-া। র্সা	-া। র্সা	-া I
(১ক) আ	০ মা	র্ ভি	০ টে	০
(৩ক) আ	০ মা	র্ মে	০ য়ে	০
২	৩	০	১	
I র্ঋা	-া। র্ঋা	-া। র্ঋা	-া। র্ঋা	-র্সা I
(১খ) আ	০ মা	র্ ঘা	০ টা	০
(৩খ) আ	০ মা	র্ বা	০ বা	০

	২´	৩	০	১	
I	পা	পা। জ্ঞা	র্ঋা। র্সা	-া। -া	-া } I
(১গ)	ব	ড় ই	মি ঠে	০ ০	০
	পা	-া। পর্জ্ঞা	-র্ঋা।		
(৩গ)	আ	০ মা০	র্ মা	০ ০	০

	২´	৩	০	১	
I {	র্সা	-া। র্সা	-া। র্ঋা	-া। র্সা	-া I
(২)	আ	০ মা	র্ নি	০ য়ে	০
(৪)	আ	০ মা	র্ প	০ তি	০

	২´	৩	০	১	
I	পা	পা। -া	দা। পা	-া। -া	-া I
(২ক)	কা	ড়া ০	কা ড়ি	০ ০	০
	পা	-া। পা	-া। দা	-া। পা	-া I
(৪ক)	আ	০ মা	র্ প	ত্ নী	০

	২´	৩	০	১	
I	জ্ঞা	-া। জ্ঞা	-া। মা	-দা। মা	-মা I
(২খ)	আ	০ মা	র্ নি	০ য়ে	০
(৪খ)	স	ঙ্ গে	ত কে	০ উ	০

	২´	৩	০	১	
I	জ্ঞা	-া। ঋা	-া। সা	-া। -া	-া } I
(২গ)	ভা	০ ব	০ না	০ ০	০
(৪গ)	যা	০ বে	০ না	০ ০	০

	২´	৩	০	১	
I {	দা	-া। দা	-া। দা	-া। দা	পা I
	আ	০ মা	র্ য	ত নে	র

	২´	৩	০	১	
I	র্সা	-া। র্সা	-া। -া	-া। র্সা	সা I
	দে	০ হ	০ ০	০ ভ	বে

	২´	৩	০	১	
I	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা। -া	র্জ্ঞা। র্ঋা	-া। র্ঋা	সা I
	তা	ও ০	রে খে	০ যে	তে

	২´	৩	০	১	
I	র্ণা	-র্সা । র্ঋা	-া । -া	-া । -া	-া } I
	হ	০ বে	০ ০	০ ০	০
	২´	৩	০	১	
I {	র্সা	-া । র্সা	-া । র্সা	র্ঋা । র্সা	-া I
	আ	০ মা	র্ ব	০ লে’	০
	২´	৩	০	১	
I	ণা	ণা । -া	দা । পা	-া । -া	-া I
	কা	রে ০	ডা কি	০ ০	০
	২´	৩	০	১	
I	জ্ঞা	-া । জ্ঞা	-া । মা	-দা । ঋা	মা I
	চো	খ্ বু	জ্ লে	০ কে	উ
	২´	৩	০	১	
I	জ্ঞা	-া । ঋা	-া । সা	-া । -া	-া } II II
	কা	০ রো	০ না	০ ০	০

মন্তব্য।

"গান" পুস্তকে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় এ গানটির শিরোনামায় লিখেছেন—"ভৈরবী—কাওয়ালী"। অর্থাৎ ঐ পুস্তকানুযায়িক গানটি শুধু ভৈরবী সুরে গেয়। খুব সম্ভব দিলীপ বাবু তাঁর পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতা-ঠাকুর মহাশয়ের খাস সুরের নামটি-ই লিপি করে রেখেছেন। গান খানির বহুল প্রচলিত সুর কিন্তু "তোড়ী-ভৈরবী"। লোক-প্রবাদ যে গান খানি অভিনয় বিশেষে (কোন পালার নিমিত্ত জানি না) গীত হওয়ার জন্য রচিত হয়েছিল। আর প্রায়ই দেখা যায় যে, যে গান বারকতক অভিনয় কালে যে সুরে গাওয়া হয়, সাধারণতঃ সে সুর এতই বেশী প্রচার হয়ে পড়ে, যে রচয়িতার যদি খাসের পৃথক সুর থাকে, সে খাস সুর অনেক সময়ে চাপা পড়ে যায়! এস্থলে হয় ত তাই ঘটেছে। যা'ই হ'ক, শুধু "ভৈরবী"র পরিবর্ত্তে "তোড়ী-ভৈরবী" হ'লে তত কিছু এসে যায় না; কারণ "ভৈরবী" এবং "তোড়ী"—দুটি-ই "ভৈরব" রাগের আদি রাগিণী বলে সমধিক পরিচিতা; যদিচ পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদও দেখা যায়। যথা, ব্রহ্মার মতে "তোড়ী"

বসন্তের, ভারতের মতে মালকৌষের এবং হনুমন্ত মতে মালবের ভার্য্যা বলে কল্পিতা হয়েছে। "ভৈরবী"র কপালটা বোধ হয় মন্দ নয়, কারণ তার ভৈরব রাগের পত্নীত্ব সম্বন্ধে সকলের মত এক-ই। মতের ঐক্য দৃষ্ট না হলেও এ কথা নির্ব্বিঘ্নে বলা চলে যে, ও দুটি বিভিন্ন রাগিণীর সম্মিলনে করুণ ও আদ্যরসের মিশ্রণ কে যত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, শুধু ভৈরবীতে সেটি সম্ভব হ'ত না।

তাল সম্বন্ধেও ঐ অভিনয় বিষয়ক যুক্তি কতকটা খাটে। অভিনয়-মঞ্চাদিতে কার্ফা, কাহারবা, দাদরা, খেম্‌টা, ছেপকা, ভরতঙ্গা ইত্যাদি ইত্যাদি তালেরই প্রভাব স্বভাবতঃ বেশী। তাই হয়ত কাওয়ালীর পরিবর্ত্তে কার্ফা তালেই গানখানি গীত হ'তে শোনা যায়। আমার কিন্তু মনে নেয় যে কার্ফা অপেক্ষা ঢিমে-কাওয়ালী তালে গাইলে, গানখানির গাম্ভীর্য্য কতক পরিমাণে হয় ত বজায় থাকৃতে পারত; কিম্বা ত্রিতালীর মধ্যগতিতে গাইলে আরও মজ্‌তে পারত!

যাই হ'ক, শাস্ত্রের একটি বোল্ ভেঙ্গে, সেটিকে "সাধারণো যেন গতঃ স পন্থাঃ" তে পরিণত করে, আর সেটিকে মহাবাক্য বলে অবলম্বন ক'রে, গানখানির যে সুর ও তাল অংশতঃ বেশী প্রচলিত, সেই সুরে ও তালে স্বরলিপি করলাম। বাঙ্গলা গান কিন্তু কার্ফা তালে বেশী গীত হ'তে শোনা যায় না। "কার্ফা"র যায়গায় "কাহারবা" তালই বাঙ্গলা গানে ব্যবহার করা হয়, যখন "কার্ফা'র আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ এই যে কার্ফা ও কাহারবার ঘর একই, কেবল তালাঘাতের নিয়ম কিকিৎ বিভিন্ন, যথা :—

"কাহারবা"র বোল—

	২´		৩		•		১
I	ধাগ্	তেটে। নাক্	ধিন্। তাগ্		তেটে। নাক্	ধিন্ I	

এবং কার্ফা'র বোল—

	২´	৩	•	১	
I	খে	নে। না	তে। নে	তে। না	-ক্ I

যেমন এক পরিবারস্থ জলদ্-তেতালা, কাওয়ালী আর ঠুংরীর মধ্যে, কিম্বা একই ঘরের দাদরার মধ্যেও ভরতঙ্গার ঠেকার, তফাৎ দেখা যায়। লেখিকা।

নারায়ণের নিকষমণি—

মেবার ১ম খণ্ড।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি, এ প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান—ইউনিয়ন বুরো, ১০নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য। আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি শিশু-ইতিহাস সাহিত্য গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। স্বাধীনতার চির উপাসক রাজপুত জাতির ইতিহাসের সহিত আমাদের বালকগণকে পরিচিত করা প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক এই পুস্তকখানিতে দুইটি অধ্যায়ে রাজপুতানার অতি প্রাচীনকাল হইতে আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংস পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভাষা সরল ও শিশুদিগের উপযুক্ত হইয়াছে।

ভারত ললনা—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২৬ নং বেচারামের দেউড়ী, ঢাকা। মূল্য ॥৶০ আনা মাত্র।

ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের নাম বঙ্গীয় পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। "ভারত ললনা" গ্রন্থে সাতটি বিভাগে সপ্তবিংশতি ভারত ললনার জীবন কথা সঙ্কলিত হইয়াছে। "পঞ্চথেরী" বিভাগে বৌদ্ধযুগের পাঁচটি নারী চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। "ত্রয়ী" নামক বিভাগটি রুক্মাবতী, খনা ও লীলাবতী, জয়ন্তী এই কয়েকটি চিত্রের সমষ্টি। দ্বাদশ নারী অধ্যায়ে দ্বাদশ রাজপুত রাণীর চরিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কর্ম্মদেবী, রাণীভবানী, অহল্যাবাই ও লক্ষ্মীবাই এই চারিটি চরিত্রের আলোচনা বিশদভাবে করা হইয়াছে, অন্যান্য চরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই, কারণ ইতিহাসকে সুখপাঠ্য করিয়া তুলিতে রামপ্রাণ বাবুর অসাধারণ ক্ষমতা।

রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম, কনখল, হরিদ্বার।—আমরা এই আশ্রমের বিংশবাৎসরিক বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। নর-নারায়ণের সেবা এই আশ্রমের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থেই আশ্রমের সেবকগণ এই মহৎব্রত উদ্‌যাপনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তিনটি অভাবে সেবকগণ বিশেষ বিব্রত। (১) একটি আউট্ ডোর ডিস্পেন্সারির প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে এবং তদুদ্দেশ্যে অর্থও সংগৃহীত হইতেছে কিন্তু আনুমানিক ব্যয় ১৭০০০৲ টাকার মধ্যে এ পর্য্যন্ত ১০০০০৲ টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এক একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ১৫০০৲

লাগিবে, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি কোনও আত্মীয়জনের স্মৃতি রক্ষার্থ এক কিম্বা ততোধিক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহেন তাহা হইলে একটি মহদুদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সহায়তা করা হয়। (২) একটি স্থায়ী ফণ্ড্ না করাতে আশ্রমের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আশ্রমে ৬৬টি জন রোগী থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে, মাসে প্রতিরোগীর জন্য ১৫৲ আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে সেবাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্তরূপ আয়ের কোন ব্যবস্থা করিয়া নর-নারায়ণের সেবায় ধন্য হইতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এ অতিউত্তম সুযোগ। (৩) প্রতিবৎসর রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঔষধাদির দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ সেবকগণ অর্থের বিশেষ অভাব বোধ করিতেছেন। আশ্রমের সেবার জন্য তাঁহারা সহৃদয় মহোদয়গণের কৃপাভিক্ষা করেন।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—মূল্য এক টাকা, প্রাপ্তিস্থান—৫২।২।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। এই পুস্তকখানিতে অতি সরল ও সুন্দর কবিতায় ভগবান রামকৃষ্ণের—জ্ঞানভক্তি ও কর্ম্মযোগের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। পরমহংসদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী ভক্ত অন্নদাঠাকুর লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্নদাঠাকুর একজন উচ্চকোটির সাধক ও ভক্ত। এই পুস্তকপাঠে পরমহংসদেব প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ জন্মে।

ভাগ্যলেখা লাল৷ গোলকচাঁদ- ভিখারী নীরানন্দ প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। সম্পত্তির লোভে মানুষ কিরূপ অন্ধ হয় এই পুস্তকে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা মন্দ নহে কিন্তু ঘটনা বিশেষকে উপলক্ষ করিয়া উপদেশ দিবার ভাষাটি স্থানে স্থানে বড়ই বিসদৃশ লাগিল।

স্বরাজ সঙ্গীত, প্রথম খণ্ড—প্রকাশক এন, কে, দাস, ২১ নং ভবানীদত্তের লেন, কলিকাতা, মূল্য ৴০ মাত্র। পুস্তিকাখানি ১৯টি গানের সমষ্টি, কয়েকটি গান আমাদের বেশ ভাল লাগিল।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব—শ্রীযুত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত হিন্দু-সমাজ পত্র "ত্রিশূল" হইতে উদ্ধৃত। পুস্তকখানি নিষ্ঠাবান হিন্দুগণের আদরের সামগ্রী হইবে।

দেশের ডাক - শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, সরস্বতী লাইব্রেরী—৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, মূল্য ৵১০ মাত্র। এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের পাবনা ও সিরাজগঞ্জের কয়েকটি বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত সারাংশ অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার নিজের প্রাণে দেশের ডাকের যে সাড়া পাইয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিয়া দেশের কার্য্যে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। আশা করি "দেশের ডাক" দেশবাসীমাত্রেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিবে।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] [মাঘ, ১৩২৮।

বন্দী-বন্দনা

[হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

মল্লার—তেওরা।

আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে!
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে!
টুটেছে ভয় বাধা
স্বাধীন হিয়াতলে!

ঐ ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরুশিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য জ্যোতিশিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি ত্রিংশকোটি আজি মানব কল্লোলে।

ওরা দু'পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কা রে—
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে।
আজি বন্দী-শালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছেরে উতল কলরোলে।

আজি কারার সারাদেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হা হা স্বরে ছিড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যেথা বন্দী-কারাগৃহ
সেথা কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীর-দলে ?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা মুক্ত নভতলে !

আজি ধ্বনিছে দিগ্‌বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কা'রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ঐ ভারত হোমশিখা জ্বলিল জয়টিকা
পরাতে ও কপালে।
সে কারা মুক্তি-কারা যেখানে ভৈরব-রুদ্র-শিখা জ্বলে।

কোরাস্ :—জয়হে বন্ধন-মৃত্যু শঙ্কাজয়ী !
মুক্তি-কামী জয় !
স্বাধীন চিত জয় ! জয় হে !!

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের বিশেষত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

আর্য্য-হিন্দু দর্শন আসলে মোক্ষশাস্ত্র। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যতত্ত্বকে বিবেক-শাস্ত্র নামে আখ্যাত করিয়াছেন। আমরা ইংরাজীশিক্ষিত যাহাকে philosophy বা দর্শনশাস্ত্র বলি তাহাতেও এই মোক্ষ শাস্ত্রে কিছু প্রভেদ আছে। বিষয় ও উদ্দেশ্যভেদে এই নামান্তর। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান; জীবাত্মা জগৎ ও ঈশ্বর ইহাদের প্রকার প্রকরণ ও সম্বন্ধনির্ণয় হইল philosophyর বিচার্য্য বিষয়; ইহার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র জ্ঞান লাভ; এই জ্ঞানের জোর চরমফল বুদ্ধিবৃত্তির চরিতার্থতা বা জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তিসাধন। পক্ষান্তরে হিন্দু মোক্ষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাপেক্ষা গভীরতর জীবাত্মা মাত্রেই ত্রিবিধ দুঃখে দুঃখী; এই দুঃখ নিবারণ করাই হিন্দুতত্ত্ববিদদের প্রধান কর্ত্তব্য; এ দুঃখ শীতাতপ বা ক্ষুধা তৃষ্ণা বা অন্নবস্ত্রাভাবের দুঃখের মত তুচ্ছ দুঃখ নহে। ইহা

আত্মার শান্তিহারক পরম দুঃখ। এই দুঃখের হাত হইতেই মুক্তি পাইবার জন্য মানবাত্মা ধর্ম্মের আশ্রয় লয়। এবং ধর্ম্মবিহিত নানা কর্ম্মক্রিয়া কৃচ্ছ্র-সাধনের অনুষ্ঠান করে। ইহার ফল আধ্যাত্মিক শান্তি, peace, happiness, bliss.

হিন্দুদর্শনের উৎপত্তি এই মুক্তি বা শান্তি অন্বেষণ চেষ্টার ফল। আদি বিধান কপিল, মহর্ষি বাদরায়ন, পতঞ্জলি কনাদ, গৌতম, শাক্যসিংহ বুদ্ধ প্রভৃতি মহা মহা তত্ত্ববিৎরা যে সব মোক্ষশাস্ত্রের প্রচলন করিয়া যান তাহার মূল উদ্দেশ্যই ছিল দুঃখ হইতে জীবকে মুক্তি দিবার ইচ্ছা। প্রধানতঃ দুঃখ-বাদই হিন্দুদর্শনের গোড়ার কথা, মধ্যের কথা ও শেষের কথা। এইটাই পাশ্চত্য-দর্শন হইতে হিন্দুদর্শনের প্রধান ভেদলক্ষণ। কাজেই আমার মনে হইয়াছে এবং হইবার অনেক যোগ্য কারণ আছে যে ইংরাজী বিচার অনুসারে হিন্দুর দর্শন বুঝিবার চেষ্টা করিলে অনেক গোলমাল থাকিয়া যায়। হিন্দুদর্শনে যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত, প্রমাণিত ও যুক্তিসিদ্ধ তাহাই ইংরাজী দর্শনে প্রতিপাদ্য। হিন্দুদর্শনের মূল আলোচ্য যে দুঃখবাদ ও দুঃখমুক্তি তাহা পাশ্চাত্যদর্শনে অজ্ঞাত ও অগৃহীত। সুতরাং পাশ্চত্যদর্শনের পূর্ণসাদৃশ্য হিন্দুদর্শনে খুঁজিতে যাওয়া বা প্রায় সদৃশ-মতকে সেই ভাবে বুঝিতে যাওয়ায় অনেক স্থানে হিন্দুদর্শন তত্ত্ব অবোধ্য থাকিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরাই হিন্দুদর্শনকে ভারতীয় ইংরাজী শিক্ষিতদের নিকট সুলভ করিয়াছেন ; কাজেই তাঁহাদের ব্যাখ্যাপ্রণালী অনুসারে বুঝিতে গিয়া আমরা ইংরাজী-শিক্ষিতরা অনেকস্থলে ঠিক বুঝিতে পারি নাই ; এমন সব দুর্বোধ্য গোলমাল থাকিয়া গিয়াছে যে ইংরাজী-দর্শন সংস্কার না ছাড়িলে হিন্দুদর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারিব না।

সাংখ্যদর্শন শাস্ত্র আলোচনাকালে আমার এইরূপ কয়েকটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। পশ্চিমে যে সব দ্বৈতবাদাত্মক দর্শনশাস্ত্র আছে তাহাদের অনুযায়ী করিয়া সাংখ্যের দ্বৈতবাদকে বুঝিতে গিয়া এমন সব গোলমাল লাগিয়া গিয়াছে যে কোন মতে কোথাও তাহার সন্তোষকর ব্যাখ্যা পাইতেছি না।

কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমুলরের হিন্দু-দর্শন ইতিহাসের সাংখ্য পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া কয়েকটা ইঙ্গিৎ পাইয়াছি যাহাতে আমার পূর্ব্বসংশয় অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে এবং নিজে যে একটা মীমাংসা মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহার সমর্থক উক্তি দেখিয়া মনে আশ্বাস ও ভরসা পাইয়াছি।

প্রথমে আমার ধারণাটি বলি :—আমার নানা যুক্তিযুক্ত কারণে মনে

হইয়াছে যে হিন্দুদর্শন শাস্ত্র বিশেষে সাংখ্য, বেদান্ত ও যোগ পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র হইতে aim, scope ও treatment এই তিন বিষয়েই ভিন্ন। যে যে বিষয়ে মিল আছে তাহা জগৎ-তত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে মিল হইবার কথা। ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র is a science of the ultimate principles of Being জীবাত্মা পরমাত্মা ও জগৎ ইহাদের অস্তিত্ব ও সম্বন্ধ বিচার পাশ্চত্যদর্শনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম হইতে ইহার ভেদ বিস্তর। পশ্চিমে ধর্ম্ম revealed তত্ত্ব, উহাতে বিশ্বাস জীবের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য। উহা বিচার বিতর্কের মধ্যে নহে। ভারতবর্ষে দর্শনতত্ত্বে ও ধর্ম্মতত্ত্বে মূলতঃ ভেদ নাই। পরন্তু দর্শনের মীমাংসিত তত্ত্বের উপরই প্রচলিত ধর্ম্ম মতের ভিত্তি। পূজনীয় বটব্যাল মহাশয় বলেন দর্শনের সীমানায় বেদের (ধর্ম্মের) প্রবেশ অনধিকার দর্শন তাহার মতে শুদ্ধ Logic ও Dialecticএর জিনিস। বেদ অধ্যাত্মদৃষ্টিলব্ধ তত্ত্ব (revealed)। সুতরাং দর্শনের উচিৎনয় ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা ও বেদের উচিৎনয় দর্শনের প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করা। আমার মনে হয় এই ভেদ চেষ্টা ভুল। হিন্দুর দরর্শনশাস্ত্র যে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ভিন্ন নহে তাহার প্রধান প্রমান উহার নাম "মোক্ষশাস্ত্র"। ব্রহ্মপ্রাপ্তি কৈবল্যলাভ নির্ব্বাণলাভ এই সব কথায় বুঝা যায় দর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে পরমপদ লাভ করান; যে পদ লাভ করিলে মানুষের সংসার গতাগতি শেষ হয়। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রেরও কি উদ্দেশ্য নয়? পরন্তু দর্শনশাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্র না হইবে তবে দার্শনিকেরা শ্রুতিকে কেন এত মান্য করিয়াছেন? শ্রুতি সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের মহা আশ্রয়স্থল। সেই শ্রুতির অনুমোদন ও সম্মতিলাভের জন্য দার্শনিকদের এত চেষ্টা কেন?

মোট কথা হিন্দুর দর্শন আসলে মোক্ষশাস্ত্র। উহার শিক্ষনীয় বিষয় পরাবিদ্যা। পরাজ্ঞান পরমার্থজ্ঞান অপরাবিদ্যা ও অপরাজ্ঞান ইহা হইতে অনেক হীন। কেন না অপরাজ্ঞানে মোক্ষ পাওয়া যায় না; পরাজ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও দর্শন-লব্ধ জ্ঞান আমাদের চোখে অপরাজ্ঞান। তবে গ্রীকদর্শনের দেয় জ্ঞান পরাজ্ঞানই বটে। বিশেষ Plato ও Neo-platonistদের দর্শনশাস্ত্র লব্ধ জ্ঞান বটে।

সর্ব্বশাস্ত্রের আদি যে উপনিষদ, তাহাতে দেখা যায় ঋষিরা সেই জ্ঞানের প্রয়াসী যাহা লাভ করিলে সমস্ত জানা যায়; যাহাতে সংসারবন্ধ মোচন হইয়া মুক্তি পাওয়া যায়; দর্শন যুগের পূর্ব্বে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও দেখা যায় মানুষ ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তির জন্যই দেবদেবতার উপাসনায় ব্যস্ত।

যাগযজ্ঞের ফলে যে স্বর্গ লাভ হইবে সমস্তকাল সুখসম্ভোগ ঘটিবে ইহারই আশায় আশান্বিত হইয়া মানুষ কত না কি চেষ্টা করিতেছে।

দর্শনের যুগে দেখি সেই একই চেষ্টা অর্থাৎ কিসে জীব দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে? কি পথে গেলে আত্মা পরম শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিন্তু প্রশ্ন পুরাতন হইলেও সমস্যা মীমাংসা নূতন ধরণের—তত্ত্ববিৎ সূক্ষ্মদর্শীরা অনেক অনুধাবন করিয়া জানিবেন, সব দুঃখের মূল হইতেছে **সংসার বন্ধন** এই যে সংসার মায়া ইহারই দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ইহারই মোহ মদিরায় উন্মত্ত হইয়া জীব আত্মানন্দ ভুলিয়া সুখ শান্তির জন্য ছুটাছুটী করিতেছে। জীব জানেনা যে যাহা সে খুঁজিতেছে তাহা বাহিরে নাই তাহা মৃগনাভির মত মৃগের শরীরেই আছে—এই সুখ শান্তি আত্মার স্বরূপ; ইহা আত্মাই আত্মাকে দিতে পারে; কোন দেব-দেবতা তাহা দিতে পারেন না। একমাত্র আছেন পুরুষ বা আত্মা; আর আছে জড় জগৎ; বা উভয়ে আছে ব্রহ্ম। তার মধ্যে জগৎ বা প্রকৃতি অনিত্য আত্মা নিত্য। (জীব) আত্মা নিজ স্বরূপ ভুল করিয়া শাশ্বত রত্ন এই শান্তিকে অনিত্য জগতে খুঁজিতেছে। এই যে বাহিরে খোঁজা এটা অবিদ্যা ভ্রম বা মায়া বা অবিবেকের কাজ। এই অবিদ্যা বা অবিবেক মাঝখানে থাকিয়া জগৎকে বা (বা ব্রহ্মকে) সংসারে পরিণত করিয়াছে। জগৎ স্ব স্বরূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা মূলা প্রকৃতি; আত্মা (জীব) অবিদ্যা বা ভ্রমের একটা আবরণ দিয়া জগৎটাকে তার স্ব স্বরূপ হইতে বিকৃত করিয়া সংসার তৈয়ারী করিয়া তাহা হইতে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মিথ্যা কথার মোহে ভুলিয়া ...অনন্ত সুখৈশ্বর্য্য লোভে স্বর্গ কামনায় নানা নিষ্ঠুরাচরণ করত যাগ যজ্ঞ করিয়া প্রতারক পুরোহিতদের স্বার্থ বাড়াইতেছে আর নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

তবেই দেখা যাইতেছে এই সংসারই সকল দুঃখের মূল। এবং এই দৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ "জীবজন্তু—বৃক্ষলতা-নদনদী—জীবজন্তু, ঘরদ্বার" প্রভৃতির সমষ্টীভূত এই যে জগৎ ইহাই জীবের ভাব-ভাবনা কামনা কল্পনায় রঙ্গীন হইয়া তাহার কাছে সংসারে পরিণত হইয়াছে। স্বরূপে জগৎ (যা ব্রহ্মের পরিণতাবস্থা সুতরাং সত্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাংশ বলিয়া) জীবের সুখদুঃখের হেতু হইতে পারেনা; কিরূপে অর্থাৎ বিকৃত হইয়া অর্থাৎ সংসাররূপ ধরিয়াই সে জীবের সকল দুঃখের হেতু হইয়াছে। কেন এমন হইল? কে জগৎকে এমন করিয়া বিকৃত করিয়া সংসার করিল? জীবের অবিবেকী অবিদ্যাগ্রস্ত আত্মা করিল। কেন? এই জীবধর্ম্ম এই যে সংসার-ঘটনা ইহা অনাদি জীবমায়ার

কাজ ; যেখান হইতে জীব সেখান হইতেই এই সংসারঘটনী মায়া। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই এই পুরানী সংসার প্রবৃত্তি নিসৃত। কেন তিনি এই মায়া ঘটাইলেন? তাহার লীলা বা খেলা যাই বল। অথবা পুরুষ প্রকৃতির সহিত যুক্ত হওয়াতে ইহা হইয়াছে। কেন যুক্ত হইলেন? জানিনা, ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে দেখিতেছি। এ কোনর উত্তর নাই। দার্শনিক জ্ঞানেরও একটা সীমা আছে। তবে ইহা সত্য যে এই শক্তি এই মায়া, এই সংযোগ ক্ষণিক। ইহার শেষ আছে। ইহা অনাদি হইলেও সান্ত বটে। এখন জীব এই যে জগৎকে একটা ভ্রমাবরণে আবৃত করিয়া সংসার পরিণত করিয়া দুঃখ পাইতেছে ইহার নিরাস জীবের পক্ষে সম্ভব। কেননা দেখা যায় অনেক মুক্ত জীব এই মায়া কাটাইয়া নিজের ও জগতের সত্য-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন ও পারিয়াছেন বুদ্ধ, চৈতন্য শুকদেব, যিশু, মহম্মদ প্রভৃতি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের এই সংসার সৃজনকারিনী মায়ার শেষ হইয়াছে। আমরা জগৎকে যে রঙ্গে রঙ্গীন দেখি তাঁহারা তাহা দেখেন না —

এখন দর্শনকারিরা বলেন যে দুঃখের মূল এই সংসারের উচ্ছেদ করা যায়। এবং তৎফলে মুক্তিলাভ হয়। সকলেই বলিতেছেন জীব ও জগতের মধ্যস্থিত এই যে মায়াবরণ, যা অবিদ্যাজনিত বা অবিবেক ঘটিত তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ছিন্ন করা যায়। কিরূপে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে তাহার পন্থা তাঁহারা নিজ নিজ প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রমত দ্বারা স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সকলেরই মূল কথা তাই, তবে পন্থা নির্দ্দেশ আলাদা। আসলে জীবের সহিত জগতের ও ঈশ্বরের ঠিক সম্বন্ধটা জানিতে হইবে। জগৎ আছে, জীবও আছে। বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়েই তাহা স্বীকার করেন, তবে স্বীকারের ধরণটা আলাদা। এই ধরণ লইয়া যত লাঠালাঠী! বেদান্ত বলেন ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ। জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই দুই বিধা ; তাহারা দেশকাল কারণ বদ্ধ বলিয়া নিত্য সত্য নহে, ক্ষণিক সত্য। ব্রহ্মের তুলনায় মিথ্যা। বন্ধ্যার পুত্রের মত মিথ্যা নহে! এই যা। এই আছে এই নাই, এখন একরূপ পরে অন্যরূপ। যেন মায়ার খেলা, থাকিয়াও নাই, না থাকিয়াও আছে। বেদান্ত মতে জগৎ বা ব্রহ্ম সত্য তাহাদের বা তাহার বিকৃতরূপ এই সংসারটাই মিথ্যা।

যত গোল হইয়াছে এই জগৎ কথাটা লইয়া। আমার মনে হয় এবং প্রমাণও আছে মোক্ষপ্রচারক বেদান্তকার প্রপঞ্চ জৎগকে সংসার হইতে অন্যভাবে দেখেন নাই। কেননা জীবের চোখে জন্ম হইতেই জগৎটা বিকৃত

রূপেই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই তাঁহারা পারমার্থিক ও ব্যবহারিক কথার ব্যবহার দ্বারা জগৎ as it is ও জগৎ as it appears to ভ্রমদৃষ্টি এই দুই জগৎকে তফাৎ রাখিতে যত্ন করেন। বেদান্ত প্রতিবাদীরা এই কথাটা না মানিয়া তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। বেদান্তবাদী যে দৃশ্যমান এই বহুরূপী-জড়াজড়-জগৎটাকে উড়াইয়া দেন নাই তাহার সমর্থক লক্ষ উক্তি আছে। তাঁহারা সংসার বা ভ্রমজ বিকৃত জগৎটাকেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। সাংখ্যকারও কি এই **সংসারকে** মিথ্যা বলেন না? যদি না সংসার মিথ্যা হইবে তবে পুরুষ মুক্ত হন কিরূপে? তাহার মতে অবিবেক ঘুচিলে পুরুষ প্রকৃতি প্রভাব হইতে ভিন্ন হইয়া স্বরূপে থাকিয়া যান। প্রকৃতিও **প্রপঞ্চ-জগৎ** নষ্ট হয় না। বেদান্তও বলেন অবিদ্যা ঘুচিলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিবর্ত্তিত জগৎ থাকে; মোহ বা **কামকামনা বিকৃত জগৎ বা সংসারটাই** ঘুচিয়া যায়। কথাই তাই।

যত গোল এই **জগৎ** কথাটির ব্যবহার লইয়া বেদান্ত যেখানে জগৎ মিথ্যা বলিয়াছেন, বা স্বপ্ন বা মায়া বিজৃম্ভিত অলীক কল্পনা বলিয়াছেন সেখানে জগৎ মানেই **সংসার**। জীবের মমতা-ঘটিত হেয়-প্রেম সম্বন্ধ বিশিষ্ট জগৎটাই সংসার। ইহারই মিথ্যাত্ব বেদান্তের প্রতিপাদ্য। শংকরাচার্য্য তাহাই বলিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাহা মানেন না। মনে হয় আচার্য্য শংকর গোড়ায় এই **সংসার** ও **জগতের** ভিন্নার্থটা খোলসা করিয়া বলিলে এবং যথাস্থানে ঠিক কথা ব্যবহার করিলে এত গোল হইত না। অথচ গোল না হইবারই কথা। তিনি বৌদ্ধ কথিত অলীক বা শূন্যবাদ, জগতের চরম-মিথ্যাত্ব (absolute nihilism) নিরাস করিতে কতই না যুদ্ধ করিয়াছেন। স্থূলজগতের সৃষ্টি বুঝাইতে কতই পরিশ্রম না করিয়াছেন। মুক্ত পুরুষের আচার ব্যবহার ব্যাখ্যা কালে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে কোথাও মনে হয় না যে দিব্যজ্ঞানযুক্ত মুক্তাত্মার চোখে নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত জীবজন্তু ঘটপট সব উবিয়া ফাঁকা হইয়া যায়! এমন কি তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে এই যে অজ্ঞানরচিত **সংসারটা** ইহাও একেবারে মিথ্যা নয়; ইহারও সত্বা না মানিয়া চলা যায় না; মুক্ত হইলেও জীবের জীব-ধর্ম্ম আছে তো? **সমাজে বাস** করিতে হইলে তাহাকে সংসার সম্বন্ধ মানিয়া চলিতে হইবে। জীব-সমাজ থাকিলে সংসার থাকিবেই; মুক্ত পুরুষকে সেই সমাজে থাকিতে হইলে সংসারের বাছবিচার ভেদাভেদ মানিতে হইবেই; এইটাই সংসারের বা জগতের

ব্যবহারিক সত্যতা (worldly reality)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব তো মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা কি খাদ্যাখাদ্য , শত্রু মিত্র, ন্যায় অন্যায় ; সদসৎ ঘটপট পথঘাট ভেদাভেদ করিতেন না? তবে তাঁরা জানিতেন যে এসব বিচার ব্যবহারিক, পারমার্থিক নয়। সমাজে পাঁচজন জ্ঞানী লোকের মধ্যে থাকিতে হইলে এ ভেদ অনিবার্য্য ; তবে তাঁহাদের সংসার-বাস আর সাধারণ অজ্ঞানীদের সংসার বাস উভয়ে ভেদ এই:যে,— তাঁহাদের চোখে সংসার মিথ্যা তবে ক্ষণিক সত্য এবং চরমকার্য্য নয়। সাধারণ অজ্ঞানীর চোখে সংসারই একমাত্র সত্য, নিত্য সত্য ও চরমকার্য্য। সাধারণ অজ্ঞানী দেহাত্মবাদী জ্ঞানী কিন্তু দেহ ও আত্মার সত্যভেদ, স্বতন্ত্র সত্তা, স্বীকার করেন। যেমন কাগজের নোটখানা অজ্ঞানীর চোখে দশটা টাকাই বটে, জ্ঞানীর চোখে সেখানা দশ টাকার symbol মাত্র ; উহার আসল মূল্য আজ আছে ; কাল নাই। সংসার সম্বন্ধটা তেমনি জ্ঞানীর চোখে একটা ক্ষণিক প্রয়োজনের symbol মাত্র ; অবস্থা বিশেষে উহার কোনোই সত্য নাই, মূল্য নাই ; অজ্ঞানীর চোখে সংসারই সার ও সর্ব্বস্ব, জগতই সংসার, সংসারই জগৎ ; উহাই কাম্য ও পরম সম্পত্তি ; উহাতেই সুখ ও শান্তি। উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অস্তিত্ব থাকিতে পারে না—ইত্যাদি।

এখন কথা—হইতেছে আর্য্য হিন্দু দর্শন যে মোক্ষ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন তাহার বিচার প্রণালী কিরূপ ? প্রণালীটা এই :—দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা জীবের পরমপুরুষার্থ—দুঃখ কোথা হইতে ? সংসার হইতে।—সংসার কি ?—জীবাত্মার সহিত বাহ্য জগতের হেয় প্রেয় সম্বন্ধ সৃজন। কে এ সৃজন করে ? জীবই ইহার সৃষ্টি কর্ত্তা ? কি করিয়া সৃষ্টি করিল ? অনাদি অজ্ঞেয় ভ্রম; অবিদ্যা অবিবেক বশতঃ।—কিসের ভ্রম ?—পুরুষ বা আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত ; দেহ, প্রকৃতি বা জগৎ তা হইতে স্বতন্ত্র, একের প্রভাব অপরকে বিকৃত করিতে পারে না, অথচ তাহাই করিয়াছে—প্রকৃতিও পুরুষের, জীব ও জগতের মধ্যে এই যে সত্য নিত্য সম্বন্ধ ইহা না জানাই এই অবিদ্যার স্বভাব। উপায় ?—বিবেক দ্বারা বা আত্মস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা এই ভ্রমকে উচ্ছেদ করা। করিলে কি হইবে ?—মুক্তি, মোক্ষ, কৈবল্য, নির্ব্বাণ স্বস্বরূপে অবস্থান করা পরমা শান্তি বা আনন্দ আস্বাদ।

মুক্তের পক্ষে জগতের বা প্রকৃতির গতি কি হইবে ?—মুক্তের চক্ষে জগৎ অবিকৃতভাবে সংসার বিকৃতি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্ব স্বরূপে থাকিবে প্রকৃতি

যেমন লীলা করিতেছে করিবে—পুরুষ উদাসীন দ্রষ্টা হইয়া কেবল বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করিবেন।

আসল কথা বিবেকনেত্র খুলিলে জীবাত্মা তাহার lower nature হইতে ছাড়ান্ পাইয়া Higher natureএ অবস্থান করিবে।—স্বাদুফলভোগী চঞ্চল অস্থিরমতি রসপিপাসী পক্ষী অভোজনকারী, স্থির সংযত অকাম উর্দ্ধবিহারী পক্ষীর মত স্বারূপ্য লাভ করিবে। মুক্তের চিত্ত Higher lifeএ মগ্ন থাকিবে, lower natureএর কাজগুলি আপনাহাতে mechanically চলিয়া যাইবে।

এখন আমার কথা হইতেছে সাংখ্য শাস্ত্রে বিশদ আলোচনা দ্বারা মহর্ষি কপিল দেখাইতেছেন কেমন করিয়া প্রকৃতি পুরুষের অদৃষ্ট মিলনে সংসার সৃষ্টি হয়, এবং কি পন্থায় ভ্রমান্ধ কর্ম্মফলভোগী প্রকৃতিমুগ্ধ পুরুষ বিবেক লাভ করিয়া মুক্ত হয়। সর্ব্ব দুঃখের মুল সংসার যে কি অদ্ভুত উপায়ে সৃষ্ট হয় আবার নষ্ট হইতে পারে তাহাই কি বেদান্ত, কি উপনিষদ কি সাংখ্য, কি বৌদ্ধ দর্শন কি যোগ দর্শন সকলেই নির্ণয় করিতেছেন। বৌদ্ধের প্রতীত্য সমুৎপাদ এই সংসার সৃষ্টিরই ব্যাখ্যা।

অনেকেই হিন্দু মোক্ষ শাস্ত্রকে পাশ্চাত্যদর্শনের পদ্ধতিতে বুঝিতে ও বুঝাইতে গিয়া বহু ভ্রমে পড়িয়াছেন। আধুনিক যত দেশী বিদেশী সাংখ্য ব্যাখ্যা পুস্তক সকলেতেই এই ভ্রম দেখা যায়। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষকে পাশ্চত্য matter ও force এর সঙ্গে একার্থবোধক করিয়া স্থূলজড় জগৎ সৃষ্টির অবতারণা করিয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে দুইটী বিভিন্ন চিন্তাধারা বিপরীত-মুখী চিন্তাধারা এক গ্রন্থে এক শাস্ত্রে মিশিয়া খিচুড়ী হইয়াছে। বিশেষ দেখি সাংখ্যের। যে কেহ "তত্ত্বসমাস্" নামক সাংখ্য-সূত্র মন দিয়া আলোচনা করিবেন তিনিই দেখিবেন, আসলে কপিল দর্শন পাশ্চাত্য জড়াজড় দ্বৈত দর্শন হইতে অনেক পরিমাণে ভিন্ন। এমনকি ঈশ্বরকৃষ্ণরচিত সাংখ্যকারিকা যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিচিত তাহাতেও দেখা যায়, এ শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য ত্রিবিধ দুঃখের হেতু জীব কর্ত্তৃক সংসার সৃষ্টি এবং মুক্তির পন্থাস্বরূপ সংসার বন্ধন ছেদন। এবং জীবাত্মার সহিত প্রকৃতির ভেদ বা বিবেক জ্ঞান এই বন্ধনচ্ছেদনের উপায়। matter ও force যোগে জড়জগতের ও অধ্যাত্ম জগতের যে সৃষ্টি তাহা পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বটে, কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অন্য অর্থাৎ অবিবেক যোগে প্রকৃতিপুরুষের সত্যসম্বন্ধ না জানার ফলে সর্ব্বদুঃখকর সংসারের

সৃষ্টি ; তবে জগৎটাই সংসাররূপে পরিণত হয় বলিয়া প্রয়োজনভাবে স্থূল-জড়জগতের কথা আসিয়া পড়ে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী আরম্ভ করিয়াছেন "অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্তঃ। তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্ দর্শনমাহ—"এ অধ্যায় সাংখ্যযোগ ব্যাখা সবাই জানেন। তৎরচিত হিন্দুদর্শন শাস্ত্র ইতিহাসে পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর কৃত যে তত্ত্ব সমাসের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার পাঠে এই মতটী দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। অপি চ ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার সূত্রের বেশীভাগই সংসার সৃষ্টি ও সংসার মোচনের প্রকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন সাংখ্যোক্ত সৃষ্টি যে cosmic world এর স্থূলজগতের নয় তাহা সকলেই মানেন। কিন্তু মানিয়াও কেহ কেহ প্রকৃতি-পুরুষ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে matter force এবং attraction repulsion inertia সংজ্ঞা দিয়া Cosmogenetic সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে সত্ত্ব রজঃতম দ্রব্য নয় উহারা স্বভাব গুণ। তত্ত্বসমাসে একথাস্পষ্ট উল্লিখিত। সাংখ্যকারিকার বর্ণনাভাবেও তাই মনে হয়। আর একটা গোলমাল প্রকৃতি বা মূল প্রকৃতি সত্যই Primordial matter কি না।

সত্ত্ব রজঃ তম এই তিনগুণের গুণত্ব (দ্রব্যত্ব নয়) গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত। গীতাকার ত্রিগুণকে moral qualities বলেন। তত্ত্ব সমাস যাহা আসল কপিলশাস্ত্র বলিয়া প্রখ্যাত তাহাও ঐ কথা বলেন। প্রকৃতি বালতে জড় বিশ্বের মূল উপাদান কিনা বুঝা যায় না, তবে জীব প্রকৃতি প্রাক্তন সংস্কার ঘটিত heriditary human nature বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতির আসল মানেই তাই জীবের **স্বভাব** আদিতে অব্যক্ত থাকে, পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে Soul এর প্রভাবে ভাল মন্দ ; পুণ্যাপুণ্য, উত্তমাধম গুণ যোগে বিকৃত হইয়া ব্যক্ত হয় এবং সেই গুণানুসারে পারিপার্শ্বিক যাবতীয় বস্তুকে ইষ্টানিষ্ট বোধে কখনো হেয় কখনো প্রেয় কভু কাম্য কভু বা অকাম্য করিয়া **সংসার রচনা** করে। কোনো একটা **বস্তুতে** যে **ভাল মন্দ** গুণ লাগিয়া আছে তাহা নয় ; অবস্থা বিশেষে একই বস্তু জীবের কাছে কখনো ভাল কখনো মন্দ যখন ভাল তখন কাম্য desirable যখন মন্দ তখন হেয় undersirable অন্যথায় indifferent neutral আবার এখন যাহা কাম্য, পরেই তাহা অকাম্য। বস্তুর এই স্বরূপ বিকৃতি কেন হয়? পুরুষ বা আত্মার

সান্নিধ্যবশতঃ। জীবধর্ম্মী আত্মা ; বহির্জগতের সম্বন্ধেই তার জীবত্ব ; সে এটা ওটা চাহিবে। যখন তার অস্তিত্বের পক্ষে যেটা প্রয়োজন তখন সেইটাই কাম্য। জগতের বস্তু মাত্রেই কামনাময় জীবের সম্মুখীন :হইলেই হয় **প্রেয়** না হয় **হেয়** না হয় **উদাসীন**। গীতায় প্রকৃতিকে **ক্ষেত্র** বলা হইয়াছে ; পুরুষ বা আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র কথাটার অর্থ প্রকৃতির আসল অর্থদ্যোতক। তমস্ আর একটা নাম। প্রকৃতি **তমস** বা 'অন্ধকার' কেন? আসল-কথা হইতেছে জীবের শুদ্ধাত্মা জীবের inherent nature স্বভাব বা প্রকৃতি এই উভয়ের সম্মিলনই সংসার এবং তৎফলজাত সুখদুঃখাদির বন্ধন। এই স্বভাব inherent মানব প্রকৃতি বা nature, Soul বা আত্মার প্রভাবেই কাজ করে ; তা না হইলে পারে না ; অন্ধ জড়বৎ পড়িয়া থাকে। আত্মার আলো বা প্রভাব পড়াতেই এই জীবপ্রকৃতি বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদিতে ফুটিয়া ওঠে। মুলে, আদৌ এই প্রকৃতি তমোধর্ম্মী অর্থাৎ neutral unaffected ; আমার প্রভাবে বুদ্ধি অহংকার প্রভৃতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে উহার এই neutral ভাব কাটিয়া যায়, উহা হয় **ভাল** (সত্ত্ব) না হয় **মন্দ** (রজ) ভাবে দেখা যায়। ইহাই সাম্যের ব্যতিক্রমাবস্থা অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম-ফলে কাহারও প্রকৃতি সাত্ত্বিক কাহারো বা রাজসিক ; কাহারো বা তামসিক ; এই যে জীব প্রকৃতির ত্রিধা ভাব ইহা অনাদি প্রবাহ। জীবের শৈশবে ইহা অব্যক্ত ভাবে থাকে। পরে তাহার বুদ্ধি ও অহংকার খুলিলে ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হইলে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলি নিজ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিলে তখন তাহার অব্যক্ত মূল প্রকৃতি, স্বভাবভেদে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক রূপে প্রকট হয় ; সে সংসারী হইতে থাকে। প্রকৃতি তাহাকে নিজ প্রভাবে কর্ম্ম করায় এবং পুরুষ রূপী সেই জীব সেই কর্ম্মফল ভোগ করে। এই ভোগ ততক্ষণ যতক্ষণ সে নিজাত্মস্বরূপ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন না দেখে। সংসারে জীবের এই দুঃখ কেন? তার কারণ আত্মা (পুরুষ) দেহধর্ম্মী হইতে চায়, আর, দেহ আত্ম-ধর্ম্মী হইতে চায় বলিয়া। উভয়ে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, ভিন্নধর্ম্মী ; এই কথাটা জানিলে যে যার স্বভাবকর্ম্ম করে, স্বরূপে থাকে ; একে অপরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না ; জগৎ নিজ নিয়মে সরল ভাবে চলে ; কিন্তু সংসারী জীবে তাতো হয় না ; পুরুষ প্রকৃতিধর্ম্মী হয় অর্থাৎ পরিণামশীল হইতে চাহে, নৃত্য করে, ছুটা-ছুটী করে জলোকার মত এটাতে ওটাতে নড়ানড়ি করে ; আর প্রকৃতি অচেতন হইয়া চেতন পুরুষের মত ভোগ করিতে চায় ; এই যে উভয়ের সান্নিধ্য বশতঃ

ভ্রমবশে পরস্পরের ধর্ম্ম-অবলম্বন করা **ইহাই সংসার সৃষ্টি,** ইহাই দুঃখের মূল।

তত্ত্ব সমাসের পঞ্চবিংশ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ভাল করিয়া পাঠ করিলে আগাগোড়া দেখা যায় এই ভাবে সংসার সৃষ্টির ব্যাখ্যাই আসল বক্তব্য। cosmic জগতের সৃষ্টি ব্যাখ্যা সাংখ্যের উদ্দেশ্যই নয়। এই সংসার তত্ত্বের কথাটার পাশ্চাত্য দর্শনে একেবারে স্থান নাই। কেন না পাশ্চাত্যদর্শন মোক্ষ বা বিবেক শাস্ত্র নহে। জীবের **দুঃখ নিবারণের পন্থা-উদ্ভাবন** পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্যই নয়। কাজেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এবং এতদ্দেশীয় উক্ত দর্শনে দীক্ষিত যাঁহারা তাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত হিন্দু মোক্ষ শাস্ত্রকে গোল করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। হিন্দু মোক্ষশাস্ত্রকে তাহারই ভাবে স্বাধীন ভাবে বুঝিলে এই সিদ্ধান্তই দাঁড়ায়। এই সন্দেহ করিয়াই মোক্ষমূলর—বলিয়াছেন "we have in fact to read the Samkhya philosophy in two texts ; one as it were in the old uncial writing that shows forth here and there giving the cosmic process, the other in the minuscle letters of a much later age, interpreted in a psychological or Epistemological sense." page 249 History of Ind. part I. (uncial = large round letters, minuscle = small letters). মোক্ষমূলর cosmic সৃষ্টির ব্যাখ্যাই আদিম কপিল মত বলেন। আমার কিন্তু মনে হয় ঠিক বিপরীত। psychological সংসার সৃষ্টিই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ জীব কর্ত্তৃক জগৎকে সংসার ভাবে সৃষ্ট করা। সুপণ্ডিত বটব্যাল মহাশয় এ মতের পক্ষপাতী। ইহাই ঠিক।

পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর তত্ত্বসমাসকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কাপিল সাংখ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত সমর্থন করেন। যদি এ কথা সত্যই হয়—সন্দেহের কোন প্রমাণ নাই—এবং **সাংখ্যশাস্ত্র যদি মোক্ষশাস্ত্রই হয়** তবে ব্যাখ্যাকারদের উচিৎ—উহার অনুমোদিত সহজ সরল মতটাই গ্রহণ করা—কিন্তু ব্যাপার ঘটিয়াছে অন্যরূপ ;—সাংখ্যদর্শন ভৌতিক সৃষ্টিবাদ আগে হইতে এই ধারণা করিয়া বসিয়া উহার ব্যাখ্যাত সংসার সৃষ্টিবাদ অপ্রামাণিক বলিয়া সন্দেহ করা কি উচিৎ? গীতায় ১৩ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকোক্ত 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ' পদের টীকাকালে শ্রীধরস্বামী লিখিতেছেন "অবিবেককৃতাৎ আত্মাধ্যাসাৎ ভবতীতি—" বিদ্বিস্বাবর জঙ্গমং।

২৭ শ্লোকও দেখুন। সংসার সৃষ্টিই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য ভৌতিক সৃষ্টিবাদ (cosmic creation) উহার প্রতিপাদ্য ধরিয়া উহার Technology ব্যাখ্যা করিতে গেলে বহুস্থানে অবোধ্য হইয়া বসে ; তখন গোঁজা মিল দিয়া মিলাইতে গিয়া মুস্কিলে পড়িতে হয়। যেমন মোক্ষমূলর করিয়াছেন, তিনি বলেন যে আদিতে cosmic creation ব্যাখ্যাই কপিলের মনোগত মত ছিল, পরে তৎশিষ্যগণ হস্তে Psychological creationএ দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধিতত্ত্ব তত্ত্বসমাসমতে অধ্যবসায় ascertainment একবস্তু হইতে অপরের লক্ষণ ভেদ ; ইহা গরু, গাধা নহে, ইত্যাদি differentiation বোধ। মোক্ষমূলর স্বীকার করেন যে দেশীয় ভাষ্যকরেরা বুদ্ধিতত্ত্ব ঐ ভাবে বুঝেন ; এ কথা বলিয়া ও তিনি নিজে জোর করিয়া বলিতেছেন যে Sense is more important than commentary অতএব Budhi or Mahat must here be a phase in the cosmic growth of the universe—and however violent our proceeding (interpretation) may be we can hardly help taking this Mahat in a cosmic sense. (page 246) কিন্তু সাংখ্যোক্ত সৃষ্টি জড় বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি বুঝিলে তত্ত্বসমাসের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমস্ত ব্যাখ্যাতেই এই গোলমাল লাগিবে। ত্রিগুণ তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই ; গুণ 'দ্রব্য' না ভাবিয়া প্রকৃতি ধর্ম্ম (moral qualities of human nature) যথা, ধর্ম্ম—অধর্ম্ম, ন্যায়—অন্যায় ইত্যাদি, বুঝিতে হইবে ; তত্ত্বসমাস তাই বুঝেন ; তা না ভাবিয়া 'দ্রব্য' ভাবিলে আবার সব গোলমাল। গীতাকার নিশ্চয়ই খাঁটী আদিম কাপিল সাংখ্যের মর্ম্ম বুঝিতেন, তিনি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে নিম্ন লিখিত ব্যাখ্যা দেন—"

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবা—
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ং
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি, জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং ॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

পরে নবম, দশম একাদশ শ্লোকে গুণত্রয়ের সামর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গীতাবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায় সত্ত্ব রজঃতম মানবপ্রকৃতির গুণমাত্র ; যে প্রকৃতিতে যে গুণাধিক্য তাহার ক্রিয়া তদ্বৎ। তত্ত্বসমাস বুদ্ধি বা মহৎ

তত্ত্বের আটপ্রকার রূপ বলিতেছেন—ধর্ম্ম-অধর্ম্ম ; জ্ঞান-অজ্ঞান ; বৈরাগ্য আসক্তি ; ঐশ্বর্য্য-দৌর্ব্বল্য। যাহারা মহৎকে আদি-cosmic intelligence বলিতে চাহেন তাঁহারা কিরূপে বুদ্ধির ব্যাখ্যা বুঝাইবেন ? জীব সৃষ্টির কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে cosmic primordial matter heterogeneous হইয়া পরিণাম-মুখী হয়। তখন সেই বুদ্ধির ধর্ম্মাধর্ম্ম আসক্তি বৈরাগ্য এ সব লক্ষণ কোথা হইতে হইবে বা তাহার অর্থ সার্থকতা কি ? বুদ্ধির সামর্থক বাক্য যথা :—মন, মতি, মহৎ ব্রহ্মা ; খ্যাতি ; প্রজ্ঞা ; শ্রুতি ; ধৃতি ; প্রজ্ঞান সন্ততি ; স্মৃতি ; ধী। এ সবের কি অর্থ হইবে যদি cosmic primal intelligence ইহার মানে হয় ? আবার দেখা যায় পঞ্চমহাভূতের সমার্থ বাক্য যথা বিগ্রহ, শান্ত, ঘোর, মূঢ় ! এ সবের অর্থই বা কি ? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূতকে, প্রকৃতির বিকার বলা হয়। পুনশ্চ :—পুরুষের কর্ত্তৃত্ব বিচারে তত্ত্বসমাসকার বলেন, ক্রিয়া ত্রিবিধ :—যথা (১) ধর্ম্ম দয়া সংযম, চিন্তা ঐশ্বর্য্যবোধ ইত্যাদি) (২) কাম, ক্রোধ, লোভ, নিষ্ঠুরতা, অশান্তি, বর্ব্বরতা ইত্যাদি (৩) উন্মত্ততা, মাদকতা, আলস্য, নাস্তিক্য, কাম, নিদ্রা, অপবিত্রতা,—অধর্ম্ম। ইহারা পুরুষের ধর্ম্ম বা গুণ নহে ; প্রকৃতির গুণ, সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণের বিবিধ বিচার মাত্র ! এ সত্ত্বেও মোক্ষমূলর বলিতেছেন "We see here the same narrowirg of cosmical ideas" ! অথচ আচার্য্য নিজেই বলিতেছেন "we must never forget that these qualities belong to nature never to Purusha apart from Prakriti."

যদি তাই হয় এই সব গুণ প্রকৃতির গুণ তবে আমার জিজ্ঞাস্য Primordial matterএর এই সব moral qualities বলিলে কিছু কি পরিষ্কার বোঝা যায় ব্যাপারটা কি ? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে গুণত্রয়কে গুণই বলা হইয়াছে, গুণ ইন্দ্রিয়েরই শক্তি। দ্রব্যভাবে কুত্রাপি নহে। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং। সং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং শ্বেত। ৩। ১৭। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৪ শ শ্লোকে সেই কথা।

অথচ স্থানে স্থানে গুণকে দ্রব্য বলিয়াও ব্যাখ্যা করা হয়। এ ভাবে বুঝিতে গেলে প্রকৃতিকে এই জড়ময়ী জগৎশক্তি ধরিতে হইবে, এবং প্রত্যেক বস্তু পুরুষ সম্বন্ধে গুণযুক্ত। হয় ভাল, না হয় মন্দ, না হয় indifferent। গুণী ও গুণ যদি অভেদাত্মক ধরা হয় তা হইলে গুণকে দ্রব্য

বলা যায়। সত্ত্বগুন মানে যে সব দ্রব্য চৈতন্তের পক্ষে প্রকাশকসুখকর রজগুণ মানে—যে সব দ্রব্য চৈতন্তের পক্ষে চেষ্টাকর কষ্টকর; এবং তমগুণ অর্থে যে সব দ্রব্য মোহজনক উন্মাদক বা দুঃখজনক।

সে যাহা হউক, আমার মূল বক্তব্য এই যে হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র মুখ্যতঃ মোক্ষ শাস্ত্র; পশ্চিমের দর্শনশাস্ত্রের মত শুষ্ক তর্কশাস্ত্র নহে, এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে আদৌ ভিন্ন নহে। ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচীন আর্য্যহিন্দুর চক্ষে, বেদ উপনিষদ স্মৃতি দর্শন সকলেরই এক মহান উদ্দেশ্য। ত্রিবিধ তাপতপ্ত সংসারী জীবকে উহা মুক্তির পন্থা দেখাইয়াছে।

এই মহান উদ্দেশ্য যে শাস্ত্রের নহে তাহা হিন্দুর চক্ষে অপরাশাস্ত্র তাহার মূল্য অতি কম, তাহার কার্য্যকরিতা সামান্তই। তবে বেদ উপনিষদে ও দর্শনে তফাৎ এই বেদ উপনিষদ শ্রুতি, উহার দর্শিত পন্থা যেন দিব্যদৃষ্টিতে লব্ধ, আর দর্শনের দর্শিত পন্থা বুঝি বিতর্কিত যুক্তির দ্বারা লব্ধ। বেদের সহিত দর্শনের বিশেষ সাংখ্যের তফাৎ এই যে বেদ ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞাদির ভিতর দিয়া মুক্তি নির্দ্দেশ করেন; সাংখ্যকার কপিল দেবদেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে মিথ্যা উপায় বা অপূর্ণ উপায় বলিয়া যুক্তির দ্বারা আত্মা-নাত্ম বিবেক দর্শন করান। উভয়েরই উদ্দেশ্য ভবরোগের চিকিৎসা; ঔষধ নির্ণয় কেবল ভিন্ন।

দর্শনের এই উদ্দেশ্য যে উপনিষদ হইতে ভিন্ন নহে তাহা সমস্ত উপনিষদ গ্রন্থেই বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। আর বদ্ধজীবের সমস্ত দুঃখের মূল যে সংসার মায়া ইহাও স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত; এই সংসার সৃষ্টির ফলাফল মৈত্রায়ণী উপনিষদের ৩।২। অধ্যায়ে অতি সুন্দরভাবে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে; উহার ইংরাজী অনুবাদ আচার্য্য মোক্ষমূলরের গ্রন্থ হইতে তুলিয়া দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব—উহাতে কথিত হয় যথা—There is indeed that other different one called the Elemental Self (ভূতাত্মা) who over come by the bright and dark fruits of action, enters on a good or evil birth, so that his course is upward or downward and that overpowered by the pairs of the opposites (সত্ত্ব, তমঃ, বা রজ, তম?) he roams about. And this is the explanation. The five Tanmatras are called Bhuta and the five Mahabhuts are called Bhuta. Then the agregate of all this is called sarira,

body, and he who dwells in that body is called Bhutatman. True his Immortal Atman remains untainted, like a drop of water on a lotus leaf, but he the Bhuttatman is in the power of the Gunas of Prakriti (গুণ শক্তি) Then thus over powered he becomes bewildered, and because thus bewildered, he sees not the creator i e the Holy Lord abiding within him, carried along by the Gunas, darkened, unstable fickle, crippled, full of devices, vacillating he enters into Abhimana (অহংকার) (conceit of subject, object) believing "I am he" 'this is mine' etc. He binds himself by himself, as a bird is bound by a net, and overcome afterwards by the fruits what he has done, he enters on a good or evil birth, downward or upward in his course and overcome by the pairs he roams about."

উপরের ছত্রে গুণ সম্বন্ধে উপনিষদ কারের মত প্রনিধানের বিষয়। আর এক কথা; উক্ত উপনিষদিক উক্তিতে আমরা সাংখ্যও বেদান্তের মিশ্রন দেখিতে পাই। এই উভয় মত যে বহু প্রাচীন কালেও দুই সমান্তরাল প্রবাহি নদীধারার মত প্রবাহিত ছিল তাহা বুঝা যায় আর বুঝা যায় যে সেই প্রাচীনতর কালে উভয় মতে পরবর্ত্তীকালীন মারাত্মক ভেদ হয় নাই। আর একটা সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য—মোক্ষ শাস্ত্র হিসাবে উভয় দর্শনেরই একমত :—জীব দুঃখাঘাত হইতে কষ্ট পায়; এই দুঃখ সংসার হইতে উৎপন্ন। জীব অবিদ্যা বা অবিবেক বলে, দৃশ্যমান জগৎ ও জগতের বস্তুগুলিকে প্রয়োজন বোধে হেয় প্রেয় ভাবিয়া নিজ নিজ মনোমত একটা সংসার রচনা করিয়া এই বিশুদ্ধ সদামুক্ত আত্মাকে এই হেয়-প্রেয় নশ্বর বস্তুর সঙ্গে সমান জ্ঞান করিয়া (identify করিয়া) তাহাদের প্রাপ্তিতে হৃষ্ট ও অপ্রাপ্তিতে বিমর্ষ হইয়া উন্মত্তের মত ছুটাছুটী করে; ভ্রমবশতঃ বুঝিতে পারে না যে এই রং দেওয়া মমতার পোছ দেওয়া জগৎটা অর্থাৎ সংসারটা মিথ্যা; স্বরূপে নির্ব্বিকার আত্মা বা পুরুষই সত্য ও নিত্য তাঁহার প্রাপ্য অপ্রাপ্য কিছু নাই, তাঁহার নাশ বা ক্ষয় ভয় নাই। এইটী বিচার বলে বুঝিলে অর্থাৎ পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা বা জগৎ-ব্রহ্ম 'জগৎ-সংসার' হইতে ভিন্ন অর্থাৎ world Brahman is different from world-Samsara তাহা হইলেই

মুক্তি বা কৈবল্য লাভ। মুক্তির পর প্রকৃতি নাচিতে থাকেন বটে তবে পুরুষ আর ভোলেন না, অন্যপক্ষে জীব নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বুঝে আর জগৎব্রহ্ম হইতে সংসার রং এর পোছ মুছিয়া যায় বা আবরণটা উঠিয়া যায়। যে অজ্ঞান রঙ্গীন কাচ টা মাঝে থাকিয়া জগৎরূপী ব্রহ্মকে সংসাররূপ দিয়াছিল তাহা সরিয়া যায়। জগৎ যেমন তেমনিই থাকে, উহাতে হেয়ত্ব প্রেয়ত্ব মমত্ব রংটা থাকে না। জগৎটা উঠিয়া গিয়া, নদনদী ঘটপট, পাহাড় পর্ব্বত, জন্তু মানুষ সব একাকার nebula হইয়া যায় না। এই কথা কেবল কাণ্ডজ্ঞানহীন পাগলে বলে।

আসলে মূল কথায় সাংখ্য বেদান্ত আদিমকালে একই কথা বলিয়াছিল! পরে ভ্রান্ত তার্কিকেরা দলাদলি করিয়া বিশুদ্ধ মোক্ষশাস্ত্রকে শুষ্ক অর্থহীন তর্কশাস্ত্রে দাড় করায়। আমি এই বুঝিয়াছি। বারান্তরে তত্ত্ব সমাস ও সাংখ্য কারিকার বিশদ analysis দ্বারা আমার কথা প্রমাণ করিব।

আমার ধারণা সমর্থনের জন্ত যে তত্ত্বসমাসের ভাষ্য হইতে উক্তি ও যুক্তি সংগ্রহের কথা বলিলাম তাহার হেতু আছে। অনেকে হয়তো বলিবেন, তত্ত্বসমাস অপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ কারিকা ও প্রবচনসূত্র। এই শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বিবৃত সাংখ্যমতই সর্ব্বজন আদৃত ও মান্য। উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে তত্ত্বসমাসই বিশেষজ্ঞ সাংখ্য পণ্ডিতদের দ্বারা সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত। এই জন্যই মোক্ষমুলর বলেন তত্ত্বসমাস হইতেই আমরা সঠিক জানিতে পারি "what really was in its original form!" তাঁহার মতে কারিকা ও প্রবচনসূত্রের মধ্যে সাংখ্য তত্ত্ব বিশেষ বিশদভাবে ও সুষ্ঠুপ্রকারে the Sankhaya ব্যাখ্যাত হইলেও "all that is essential can be found in the Samasa" পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই জন্যই তত্ত্বসমাসের একটা মোটা রকমের বিবরণ দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব—সাংখ্যশাস্ত্র পাশ্চাত্য দর্শনের সমজাতীয় দর্শন নাম অপেক্ষা মোক্ষশাস্ত্র নামেরই যোগ্য। জীব কর্ত্তৃক বাহ্য জগৎ অবলম্বনে কিরূপে সংসার চক্র প্রবর্ত্তিত :হয়, এবং কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ইহাই হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য।

মুক্তি

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

সে দিন ১১ই ডিসেম্বর রবিবার। সারা ভারতের নব জাগরণের হিল্লোল পদ্মার বিপুল তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে বুড়ীগঙ্গার শান্ত বুকের উপর দিয়া ঢাকানগরীর তটপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানবের স্বাধীন চিন্তার উপর হস্তক্ষেপ, তাহার শান্তিপূর্ণ দেশহৈতিষণার প্রতি সন্দেহ, দেশবাসী নিবিরোধ-প্রতিবাদ ও আইনলঙ্ঘনের দ্বারা প্রতিকার করিতে উদ্যত হইল। ফলে, দেশ-প্রেমিক কর্ম্মবীরগণ কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন ১০ই ডিসেম্বর তারিখে অবরোধ-বিধি তাহার সীমায় আসিয়া পৌঁছিল এবং ভারত-পূজ্য ত্যাগিশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারারুদ্ধ হইলেন, তখন দেশবাসীর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। আজ ১১ই তারিখে তাই বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঢাকা-নগরীতেও দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পথে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"ঝন্—ঝন্—ঝন্
খুলিয়াছে ওই তোরণের দ্বার,
আয় সন্তানগণ!
আয় শত শত হাজার হাজার,
রেখেদে চিন্তা, রেখেদে বিচার,
অদূরে মায়ের মরকত মোড়া
হৈম সিংহাসন।
বহুদিন—ওরে বহুদিন ভাই,
কি যেন নেশার লোভে,
কাটিয়াছে তোর দীর্ঘ দিবস
ব্যর্থ আশার ক্ষোভে।
আজ খুলিয়াছে মুক্তির দ্বার,
ডেকেছে জননী সন্তানে তার
লজ্জা সরম রাখিতে এবার
কর-রে-জীবন-পণ।"

ক্রমে প্রথম দল ঢাকা স্কুলপ্রাঙ্গণ পার হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের নিকট উপস্থিত হইল। দুইজন সার্জ্জেণ্ট আসিয়া প্রথম দলের নেতা সুশীল বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। দলের অন্যান্য সকলে যখন আত্মসমর্পণ করিয়াও অবরুদ্ধ হইল না, তখন গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া চলিল—

"ওরে রে মরণ-যাত্রি।
অদূরে হাসিছে উষার সুষমা,
আর নাই কালো রাত্রি।
সকল বিষাদ প্রেমে কর জয়,
সকলের প্রেমে মাতাও হৃদয়
জগত ভরিয়া দাও পরিচয়—
মা তোর জগদ্ধাত্রী।"

* * * *

আজ ১২ই ডিসেম্বার সোমবার। সবেমাত্র আদালত খুলিয়াছে, তখনও ১২টা বাজিতে বিলম্ব আছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই আদালত-গৃহ দর্শক ও স্বেচ্ছাসেবকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ সুশীলকুমারের বিচারের দিন। সুশীলকুমার ঢাকানগরীতে বিশেষরূপেই পরিচিত। ছাত্রজীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রহিসাবে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর কত প্রশংসা সে পাইয়াছে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া যখন সে গবেষণা-বৃত্তি পাইল, তখন তাহাকে সকলে সোনার টুকরা বলিয়া আদর করিয়াছে। অল্পদিন হয় ঢাকা-কলেজের অধ্যাপকপদে মনোনীত হইয়াও দেশজননীর আহ্বানে সে সহযোগিতাবর্জ্জন আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজন অনেক ধমকাইয়া শেষে মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া জবাব দিলেন। ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট মাতুল মহাশয়—যিনি পূর্ব্বে সুশীলকুমারের বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রশংসায় শত-মুখ হইতেন, তিনিও মূর্খ বাতুল বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিয়া সম্পর্ক ত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু মানুষের মনে যখন একটা প্রেরণা জাগে, সে তখন কে কি বলিল বা ভাবিল ইহা লক্ষ্য করিবারও ত সময় পায় না। তাই সুশীলকুমার যখন কর্ত্তব্যের ডাকে দেশজননীর আহ্বানে বাহির হইয়া পড়িল, তখন কোনও কথা তাহার কাণে পশিল না। দুঃখকষ্টকে বরণ করিয়া লইয়া দেশের সেবা করাই, সে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য স্থির করিল।

আজ ভগবানের কোন্ ইচ্ছার ইঙ্গিতে সুশীলকুমারের বিচারের ভার পড়িয়াছে তাহার একমাত্র মাতুল ঢাকার প্রথম ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট হিমাংশুমোহনের উপর। তাই শুধু সুশীলকুমারের গুণমুগ্ধ হইয়াই দেশবাসী আজ আদালতে ঝুকিয়া পড়ে নাই, তাহা ছাড়া এই অপূর্ব্ব বিচাররহস্য দেখিবার জন্য অনেকের অত্যধিক কৌতূহলের লক্ষণ দেখা গেল।

* * * *

হিমাংশুবাবু খুব গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এজলাসে আসিয়া বসিলেন। না, তিনি কিছুতেই বিচলিত হইবেন না। কঠোর বিচারক বলিয়া সরকারের নিকট তাঁহার সুযশ ছিল। তিনি আজও সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। হতভাগাটা যেমন তাঁহাদের সৎপরামর্শ না শুনিয়া রাজবিদ্রোহীর দলে মিশিয়াছে তেমন ফল লাভ করুক। কিন্তু হিমাংশু বাবুর মনের এক কোণে কে যেন মাথা উঁচু করিয়া বলিয়া উঠিল—ছিঃ, দুঃখিনী বিধবা ভগিনীর নয়ন পুত্তলী যে। অমনি তাঁহার সরকারী মনটা শাসাইয়া বলিল, না, ওসব কোন কাজের কথা নয়, সুশীলটাকে শিক্ষা দিতে হইবে গুরুজনের অবাধ্য হওয়ার ফল কি, আর এ ক্ষেত্রে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ঠিক রাখিতে পারিলে প্রমোশনটাও শীঘ্র হইতে পারে। হিমাংশু বাবুর সম্মুখে সুশীলকুমারকে আনা হইল। ডেপুটি বাবু আসামীর মুখের দিকে না তাকাইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"তুমি শিক্ষিত যুবক হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে কারাবাসের জন্য অত ব্যাকুল হয়েছ কেন?" সুশীলকুমার উত্তর দিল—"প্রথমেই আমার পূজনীয় মাতুলহিসাবে আমি আপনাকে প্রণাম করি।" কথাটা শুনিয়াই হিমাংশুবাবু একটু কাঁপিয়া উঠিলেন। সুশীলকুমার বলিতে লাগিল—"এইবার বিচারক হিসাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি কি মনে করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য বড় সরকারী চাকরী লাভ করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করা? আর সেটা না করলেই ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়। এর চেয়ে কি শিক্ষার বড় উদ্দেশ্য নাই? সে উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ ও দশের সেবার যোগ্যতা। পশুরাও ত নিজের আহারের যথেষ্ট সংস্থান করে, মানুষ কি তবে পশুর চেয়ে একতিলও বড় নয়। যদি বড় হয়, সে শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? ত্যাগ ও সংযমে শিক্ষার ফলে যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে, তাহাতেই জীবনের সফলতা। এ ছাড়া যদি আর কোনও ধারণা শিক্ষা সম্বন্ধে কারও থেকে থাকে, তবে সেটা মস্ত ভুল। জানেন রামপ্রসাদে আছে—"লোকে করে সুখের গর্ব্ব আমি করি দুখের বড়াই।" জগৎএতদিন

সুখের গর্ব্ব করেই এসেছে, আজ ভারত দেখাবে দুঃখেরও বড়াই করা চলে বিশ্বের দুয়ারে ভারত যে বাণী পাঠাবে, তার প্রথম কথাই হবে যে দুঃখদহনের মধ্যদিয়ে ভারত মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। সে সাধনাই আমাদের স্বরাজ সাধনা। জানেন আমাদের দেশপূজ্য নেতা চিত্তরঞ্জন কি বলেছেন—"আমাদের দেশ আজ একটা বৃহৎ কারাগার।" কারাগার কার কাছে? যারা সুখের লোভে সংসারে বিচরণ করে, দু'পয়সা পেয়ে আনন্দে অধীর, ইংরেজের স্বেচ্ছাকৃত গোলাম হ'য়ে যারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তাদের কাছে বাঙ্গলা দেশ কারাগার নয়? তবে কারাগার কার কাছে? যাদের হৃদয়ে এই দাসত্বের জ্বালা আগুণের মত জ্বলছে, তাদের কাছেই এ কারাগার। একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাণের পরতে পরতে হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনে বোঝা যে স্বরাজ ছাড়া আমাদের গতি নেই। এমনিধারা স্বরাজের জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগলে আমরা চাইব আমাদের কারাগারের দরজা ভেঙ্গে বেরুতে। এই আকাঙ্ক্ষা যার মনে জাগবে—এই আগুণ যার প্রাণে জ্বলবে, তাকে যে ইংরাজের কারাগারে ঢুকতেই হবে! আমাদের নেতৃবৃন্দ যে এমন অকুণ্ঠিতচিত্তে কারাবাসকে বরণ করে নিচ্ছেন, তার মধ্যে তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাচ্ছে যে তাঁরা ভোগবিলাস ত্যাগ করে কারাবাসের দুঃখ কষ্ট দিয়ে সমগ্র জাতির যুগসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করবেন। কারণ এটা নিশ্চয়ই সত্যি যে জাতির দুঃখদৈন্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দূর হইবেই। কারাগারেই কংসবিনাশন ভগবানের জন্ম হয়েছিল। আজ এই কারাগারে ভগবান্ কি আবার জন্মিবেন না?"

সুশীলকুমার এইখানে তাহার বক্তব্য শেষ করিল। আদালতের সকলে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহা শুনিতেছিল, একটি কথাও কাহারও মুখ হইতে ফুটিল না। কেবল সকলের মধ্যে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া পরস্পরের সহিত এবিষয়ের নিঃশব্দে আলোচনা করিয়া গেল। আদালত নিস্তব্ধ, হিমাংশুবাবু রায় প্রকাশ করিলেন—আসামীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। সকলে স্তম্ভিত, এ কোন্ ন্যায়ের বিচার ভগবান্ জানেন। কিন্তু উপস্থিত সেচ্ছাসেবকগণ আনন্দিত মনে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

আজি ভারত গগনে
কি শুভ লগনে
মুক্তি-উষাহাসি ফুটিছেরে!

ঐ যে কাণে কাণে
বিহগ প্রাণে প্রাণে
তুলিল তানে তানে
আশার বাণী রে ;
অলস ঘুমঘোরে
মোহের বাঁধা ডোরে
ভারত জাগে ওরে
শকতি আনি রে ;
আজি পবনে পবনে
মধুর লগনে
শান্তি—সঙ্গীত ধ্বনিছেরে।

• • • • •

আদালত হইতে গৃহে ফিরিয়া হিমাংশু বাবু সুশীলকুমারের মাতুলানীর নিকট বলিতে লাগিলেন—"দেখ, সুশীলটা যেমন আমাদের কথার অবাধ্য হয়ে—রাজ-দ্রোহীদের দলে মিশেছিল, তেমন তার আমি খুব শাস্তি দিয়ে এসেছি। এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।" শুনিয়া হিমাংশু বাবুর স্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন, একটু স্থির হইয়া বলিলেন—"কি বললে আমাদের সুশীলের বিচারের ভার তোমার উপর পড়েছিল? তুমি তাকে একবৎসরের কারাদণ্ড দিয়ে এসেছ? তুমি আমায় অবাক্ করলে। তার দোষ? সে রাজদ্রোহী? নিজের দেশবাসীর জন্য তার প্রাণ কেঁদেছিল, তাই সে জীবনের সব সুখ-স্বচ্ছন্দের আশা ত্যাগ করে—ভোগ বিলাসকে পায়ে দলে দেশের ভাই বোনদের দুঃখে কাঁদতে গিয়েছিল! তুমি বলবে সে বাতুল! কিন্তু এমনি পাগল সব না থাকলে এই অধঃপতিত দেশ আজ কোন্ শ্মশানে ভস্মীভূত হয়ে যেত কে জানে! সে রাজদ্রোহী? অপরাধ, সে তার দেশের ভাই বোনদের উলঙ্গ অবস্থা দূর করবার জন্য তাদের চরকা ও তাঁত চালিয়ে পরণের কাপড় তৈয়ারী করতে উপদেশ দিচ্ছিল; গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের অস্বাস্থ্যকরতার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। মস্ত অপরাধ? হাঁ গভর্ণমেণ্টের চক্ষে মস্ত অপরাধ বই কি! তারা ত চায় না দেশের শিক্ষিত লোক গ্রামবাসীদের সাথে মিলে মিশে কাজ করে। তাতে যে দেশের দারিদ্র্য কিছু

কমে, আর ওদের অর্থশোষণে যে বাধা পড়ে। অর্থলিপ্সুর জাত, ওরা যা বলবে, তোমরাও কি তাই বুঝবে? তোমরা না শিক্ষিত? ওঃ বুঝতে পারিনি ওদের শ্রীচরণে যে শিক্ষা বলি দিয়েছ, তোমরা যে ওদের কেনা গোলাম। বুদ্ধি আর ঘটে কোথা থেকে থাক্‌বে।" এই বলিয়া সুশীল কুমারের মাতুলানী কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। এই সময়ে হিমাংশু বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যা যে তাহার সুশীল দাদাকে বড় ভাল বাসিত, সে তার জেলের সংবাদ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হিমাংশু বাবুর পত্নীর নয়নযুগল ও জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, "কাঁদিস্‌নি মা, তোর সুশীল দাদা দেশের কাজে করাগারে গেছে, সে ত আমাদের আনন্দের কথা, তার আত্মীয় বলে যে আজ আমাদের গৌরব করবার দিন, কাঁদবার দিন ত নয়। আয়, আমরা মা ও মেয়ে মিলে সুশীলের পরিত্যক্ত কাজের ভার নিই। আজ প্রতিজ্ঞা কর দেশের ভাই বোনদের সেবায় সমস্ত প্রাণ সঁপে দেব। তারপর যখন সুশীল ফিরে আসবে, তখন দেখাব যে তার কাজ আমরা পড়ে থাকতে দিইনি।"

এতক্ষণ হিমাংশু বাবু নীরবে সব দেখিতে ছিলেন এবং এক মনে পত্নীর কথাগুলি শুনিতে ছিলেন। এতক্ষণে এইবার তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক বলিয়াছ, এতদিন মোহের ঘোরে নিদ্রা যাইতে-ছিলাম, শিক্ষার অভিমানে পদগৌরবে মনে করিয়াছিলাম আমি যাহা বুঝি তাহাই বুঝি সব চেয়ে ভাল। কিন্তু আজ সে অভিমান দূর হইয়াছে। সুশীল আমার পুত্র স্থানীয় হইলে ও, আজ সে আমাদের আদর্শ। আমি ও আজ হইতে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলাম এবং যতটুকু সাধ্য দেশের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করিব।"

* * * * *

আজ ২০শে ডিসেম্বর। ঢাকার কমিশনার সাহেব হিমাংশু বাবুকে তাহার খাসকামরায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। হিমাংশু বাবু উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন—"রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষ্যে ২৭শে যে উৎসব হইবে, তাহার সমস্ত ভার আপনার উপর দিলাম। আপনি এখানকার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর যে রকম কার্য্যদক্ষ, তাহাতে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিব। আর এককথা, আপনি সে দিন এখানকার রাজদ্রোহীদের

নেতাকে যে দণ্ড দিয়াছেন, তাহাতে আমরা সকলেই আপনার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার শীঘ্র প্রমোশনের জন্য লিখিয়া পাঠাইতেছি। শুনিলাম সে ছোড়াটা না কি আপনার আত্মীয়, বোধ হয় দূর সম্পর্কের হবে, না? তা যাক্ বিদ্রোহীদের এমনি করে পায়ের তলায় দাবান চাই।" হিমাংশু বাবু ধীর স্থির ভাবে বলিলেন—"সে দিন যাহাকে আমি কারাদণ্ড দিয়াছি, সে আমার নিকট আত্মীয়, আমার বড় আদরের ভাগিনেয়; এখন বুঝিয়াছি দেশদ্রোহী সে নয়, দেশদ্রোহী আমরা। আমার মোহ কাটিয়াছে, অভিমান দূর হইয়াছে। তাহাকে আমি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। আর আপনার উৎসবের আয়োজন আমার দ্বারা কিছুই সাহায্য হইবে না। দেশে এখন অশান্তি, উৎসবের এ সময় নয়।" এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কমিসনার সাহেব চেঁচাইয়া উঠিলেন—"র‍্যাসকেল, এখনি তোমাকে lowest grade এ নামাইয়া দিলাম।" অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া হিমাংশু বাবু বলিলেন"—অত কষ্টের আপনার প্রয়োজন নাই, আমি পদত্যাগের পত্র সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছি, এই তাহা গ্রহণ করুন। আমি চলিলাম। দেশ আমায় ডাকিয়াছে, আমি সেখানেই চলিলাম।"

* * * * *

ঢাকা নগরীতে হিমাংশু বাবুর পদত্যাগের কথা অচিরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক হিমাংশু বাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হিমাংশু বাবু তাঁহার স্ত্রী কন্যার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"ভাইরা আমার, সুশীল আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে। এতদিন যে অন্ধকারে ছিলাম তার থেকে আজ আলোকে সেই আমায় নিয়ে এসেছে। সে তোমাদের নেতৃস্থানীয় ছিল, আমাদের তার মত যোগ্যতা নেই; তবে আমরা তিন জনে তোমাদের সেবা করে তার অভাব যতটা পারি দূর করতে চেষ্টা করব। আজ আমি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে অন্তরে বাহিরে মুক্ত। আজ আমার মুক্তির দিন। বল ভাই বন্দে মাতরম্। গান্ধী মাহাত্মী কি জয়! দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জনের জয়।"

হিমাংশু বাবু, তাঁহার পত্নী ও কন্যাকে সম্মুখে রাখিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ গাহিতে গাহিতে চলিল—

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস—
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।"

শান্তি সংগ্রাম

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

(১)

সবল! তোমার রক্ত আঁখির আর রাখি না ভয়!
রুদ্র বলে হয়ঃকি কখন ক্ষুব্ধ হৃদয় জয়!
সাগর শোষি' কর্‌ছ তুমি বারির কণা দান!
তাতেই তোমার এতই দম্ভ এতই অভিমান!
ভিক্ষা তোমার আজকে তবে শিকায় তোলা থাক্!
দয়ার দায়ে রক্ষাকর—আর করো না জাঁক!
চুকিয়ে দিয়ে লেনা-দেনা ফিরছে ঘরে ঘরের ছেলে,
দল্‌তে তারে চরণতলে চাচ্ছ তুমি অবহেলে!
তুমি প্রবল তুমি সবল কর্‌ছি না ত দ্বেষ,
অস্ত্রে অস্ত্রে নয় এ সমর জানেন পরমেশ!

(২)

বুকের মাঝে যে দেব নিত্য রাজেন সংগোপনে,
দুয়ারে তাঁর ধন্না মোদের আজকে প্রাণে মনে!
অনেক কালের অনেক গ্লানি মুছতে হবে নয়ন জলে,
শান্তি মন্ত্রে দীক্ষা যে তাই নিলাম সবে কুতূহলে!

চণ্ডনীতির দণ্ড ভীতি প্রীতির মধু সুধা-স্রোতে,
আজকে মোরা ভাসিয়ে দেব স্বার্থে অন্ধ জগৎ হতে'!
দীনের আত্মা নয় যে দীন সে যে পরম শক্তিধর,
সুপ্তি যদি টুটে রে তার পায় যে মুক্তি চরাচর!
রিক্ত যারা বিত্ত তাদের চিত্ত ভরা রয়,
খোঁজ যে তার নিতেই হবে—ভরসা কৃপাময়!

(৩)

ভোগের মোহে মত্ত সবাই, ত্যাগের পথ আমরা লব,
প্রেমের যাগে আপনারে উৎসর্গিয়া অমর হব!
মুখাপেক্ষী নাহি গো কারো, ধারিনে আর কারো ধার,
নিজের মাঝে বুঝ্‌তে নিজে চাই যে নিজের অধিকার!
আপন বলে হবই হব আজকে মোরা বলীয়ান,
মাথা পেতে নিতেই হবে বিধির বিধি "স্বরাজ" দান!
সাধন ভজন পূজন মনন তাই যে শুধু মোদের আজ,
কথার মায়া ছেড়ে এবার সার করেছি সত্য কাজ!
আঁধার ঘরে জল্‌ল আলো মরা-গাঙে আস্‌ল বাণ,
ধ্রুব লক্ষ্য স্থির হয়েছে হবেই হবে পরিত্রাণ!

(৪)

অভিশপ্ত সগর বংশ বুঝি রে আজ উদ্ধারিতে
ভগীরথের শঙ্খধ্বনি, যাচ্ছে শোনা চারি ভিতে!
সুরধুনীর সুধা-ধারায় উঠ্‌ছে জেগে পতিত যারা,
ধূলায় লুটে চূর্ণ হয়ে যুগ-যুগান্তের রুদ্ধ-কারা!
অকাশ বাতাস পূর্ণ করে ওই উঠেরে বিজয়-নাদ,
স্পর্শমণির স্পর্শ পেয়ে মিট্‌ল বুঝি সকল সাধ!
হে ঐরাবত! সরে দাঁড়াও! হবে না আর গায়ের জোরে!
মায়ের ছেলে লুটেই নিবে আজকে ঠিক্ মায়ের ক্রোড়ে'
দয়াল হরি! করুণা করি দেখাও সবে অভয়-পাণি,
সফল যেন হয় গো ভবে মহাত্মার দিব্য-বাণী!

বাঙ্গালার জাতীয়-সাহিত্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ,]

জাতীয় সাহিত্য বা national literature বলতে আমরা কি বুঝি? জাতীয় সাহিত্য মানে জাতির সাহিত্য বা রচনা-বিবরণ নয়, জাতীয় সাহিত্য একটা সমগ্র জাতির পিতৃ-পরিচয়। বাঙ্গালার যা জাতীয় সাহিত্য, তা বিদেশীয় সাহিত্যের প্রতিবেশ-প্রভাবে একেবারে চাপা পড়ে গেছে। মহাকবি রবীন্দ্র নাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের উপর একটা স্বর্ণ-সেতু নির্মাণের জন্য বিশ্ব-জয়ে বেরিয়ে আমাদের এই অসহকারিতা-মথিত বাঙ্গালাদেশে এসে যে বক্তৃতা গুলি দিয়েছেন, তাতে তিনি এই ভাবটী জানাতে চেয়েছেন যে, দু'জগতের একটা মিলন-বন্ধন না হলে আমাদের আর গতি-মুক্তি নেই। অসহকারিতা এই মিলন-বন্ধনের হিরণ্যকশিপু।

আমাদের জাতীয় জীবনের মুখ্য সুরটী কি, তা আমাদের ভাল করে জানা নেই। খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাহিত্যই কি আমাদের জাতীয় সাহিত্য? না, পরবর্ত্তী যুগের বিশাল চৈতন্য-সাহিত্যই আমাদের জাতীয় ভাব-দ্যোতক সাহিত্য? কিংবা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-গঠিত সাহিত্য আমাদের জাতীয় ভাবের পরিপোষক সাহিত্য? অথবা এই সমস্ত বিশিষ্ট সাহিত্য আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সাহিত্য? কথাটার বেশ সোজা উত্তর দেওয়া বড়ই শক্ত। কিন্তু আমরা বেশ জানি, যে-সাহিত্য আমাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সঙ্গে গভীরভাবে বিজড়িত, তাহাই 'জাতীয়' বিশেষণ-যোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস-পরিবৃত হাসির গানে আমাদের জাতীয়তার স্ফুরণ বা প্রকাশ হয়নি, কিন্তু তার 'আমার জন্মভূমি' বা 'আমার দেশ' সমগ্র ভারতবর্ষের গভীর প্রাণ-স্পন্দন প্রকাশ করছে। রবীন্দ্রনাথের খৃষ্ট-ধর্ম্ম-পরিচায়ক অনেক-গুলি সুন্দর গান জাতির হৃদয়স্পর্শ করতে পারেনি, কিন্তু তাঁর অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত উপনিষদের বিরাট ভাবে অনুপ্রাণিত বলে সেগুলি জাতির হৃদয়ে অতি উচ্চ আসন পেয়েছে। ফরাসী সাহিত্যে হিউগো, বদেলেয়ার, মিস্ত্রাল, গী-দ্য-মোপাসঁ বিচিত্র যুগের লেখক,—তাঁরা ফরাসী দেশের হৃদয়ের কথাটী নিপুণ ভাষায় জানিয়েছিলেন বলে দেশ-বরণ্য হয়ে আছেন। ফরাসীর সেই অটুট কর্ম্মশক্তি, ধৈর্য্য, বারম্ব ভাবপ্রবণতা, অনলস অধ্যবসায়, আন্তরিকতা

ও নারীপূজা,—ইহাই তাঁরা সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। জাতিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা কোথাও স্বদেশিকতা নষ্ট করেন নি। ইংরাজী সাহিত্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) আছে, যুগে যুগে যা-কিছু এই সমুদ্র-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপটাতে এসেছে, তাই ইহা নিজের রসরক্তে মিশিয়ে নিয়েছে। সব ভাষার এই অদ্ভুত গ্রহণ-শক্তি নেই; ভাষার গ্রহণ-শক্তি থাকলেও বিদেশী জাতির উগ্রগন্ধ মদিরতা সব জাতির ধাতে সয় না। গত শতাব্দীর শেষভাগে মিশনারীগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এই বাঙ্গালা দেশটাকে একটা প্রকাণ্ড খৃষ্ট-ধর্ম্ম-দীক্ষিত উপনিবেশরূপে পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা হয়েছিল; তার কিন্তু ফল হলো উল্টা। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করে' উপনিষদ-গৃহীত মন্ত্রাবলী থেকে বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব হলো। বাঙ্গালীর খৃষ্টান হ'য়ে যাবার ভয় কেটে গেল। আমাদের দেশের ইতিহাসে এই ধর্ম্ম-সংঘর্ষ ব্যাপারটা যুগে যুগেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—এটা গীতার একটা সমাধি-প্রবচন (esoteric) নয়, যখনই বিজাতীয় ধর্ম্মের উত্থান, তখনই জাতীয় নবধর্ম্ম-শক্তির উন্মেষ! তবে বাঙ্গালা ভাষার যে গ্রহণ-শক্তি নেই, তা বর্ত্তমান যুগে আর বলা চলে না। কিন্তু গ্রহণ করা চলে অনেক জিনিষ, কিন্তু শেষে তা বদ্-হজম হয়। গত নবযুগের প্রথমে যখন সমাজে বিরাট পরিবর্ত্তন চলছিল, তখন আমরা:অনেক জিনিষই গ্রহণ করেছিলুম, কিন্তু কিছুই ধরে রাখতে পারিনি। যে-সব জিনিষ বদ্-হজম হয়েছিল, তা যথা-সময়ে আমাদের আত্মশক্তি হরণ করে নিয়ে চলে গেছে। তাই এখন আমরা বিচিত্র আলোকাহত হ'য়ে ভবিষ্যতের বিপুল অন্ধকারের দিকে স্তিমিতনয়নে চেয়ে আছি। সমাজে এমনি একটা বিশৃঙ্খলতা, উচ্ছ্বাস ও প্লাবন এসেছে যে কারো চুপ করে বসে থাকবার যো নেই। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে যেমন সকলের দেহই আবেগ-চঞ্চল হয়ে ঠেলাঠেলির পেশাপেশির মুখে ক্রমশঃ এগিয়ে বা পেছিয়ে চলে, একমুহূর্ত্তেও স্থিতিশীল হয় না, তেমনি যুগধর্ম্মবশতঃ মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভিড় কেটে গেলেই সব চঞ্চলতা দূর হ'য়ে যায়। জগতে যাঁরা আত্মসমাহিত ধ্যানী পুরুষ, তাঁরা নির্ব্বিকার শিবের মত সাময়িক উত্তেজনা-কেন্দ্রের বাইরে থাকেন,—তাঁদের চিন্তার ধারা চরকা-নির্গত সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন সূত্রের মত, তার মাঝে কোনও কিছুর সংযোগ-সম্ভাবনা নেই। এমার্সনের একটী প্রবন্ধে এক সামান্য ঘটনার বিবরণ আছে। রাজপথে বিচিত্রবেশ সেনাদল ব্যাণ্ড্ বাজিয়ে পতাকা উড়িয়ে

শ্রেণীবদ্ধভাবে চলেছে ; পথে ভীষণ জনতা, সকলেই সেই দৃপ্ত সাহসোজ্জ্বল তরুণ সৈন্য দলের দিকে চেয়ে আছে। এমন সময় পাশের বাড়ীতে একটী শিশু লাঠি নিয়ে একটা কেট্‌লি বাজাতে আরম্ভ করে দিলে, তখন সেই বিচিত্র সেনা পরিচালনা না দেখে সকলের দৃষ্টি সেই ভাঙ্গা কেট্‌লির কর্ণপটহবিদারী শব্দের দিকে গেল।—কেট্‌লির খেলা ও শব্দ এমনি চিত্তাকর্ষক বোধ হলো। এই সামান্য ঘটনায় সংঘমনের (mob-mind) বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। যার মনে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি আছে, সে ক্ষণিকের মোহে ভোলেনা, আকাশ যখন প্রলয়ের বজ্র-নিনাদে আলোড়িত হতে থাকে, তখনও সে দূরাগত সঙ্গীতের প্রচ্ছন্ন ও শান্তিময় স্তব্ধতার মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রাখতে পারে। কারণ যেটা শান্ত, তাহাই যে চিরন্তন ; ধূলি যে আমাদের পদতলে চিরকাল পড়ে আছে শান্ত হয়ে, তাই জগতের সব গৌরব দর্প, দম্ভের শেষ পরিণতি এই ধূলিতে। বদ্‌-হজমি জিনিষ খুব পেট ভরে খেয়ে বেশ প্রথমটা আনন্দ হয়, মনে হয় গায়ে খুবই জোর হবে, কিন্তু জিহ্বায় যে জিনিষটা প্রথমে মধুর হয়, তাহাই শেষে উদরে গিয়ে বিষ হয়ে পড়ে,—তখন নানা উপায়ে উদ্‌গার করতে হয়। আমাদেরও কি ঠিক এই দশা হয়নি ? বর্ত্তমান কালের সভ্যতা বলতে যা বুঝায়, তা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হলে ইংরাজী সভ্যতা, শিক্ষা ও রীতিনীতির যা-কিছু-ভালো আছে, সবই গ্রহণ করতে হবে। খুবই ভাল কথা। জগতের সব রাস্তা যখন রোমে গিয়ে মিশেছিল, তখন যে-দেশেই রোম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেই দেশেই সর্ব্বতোভাবে রোম্যান্‌ হয়ে গিয়েছিল, তার আর কোনো স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকেনি। এমনতর সংমিশ্রণ হলে একটা পেছিয়ে-পড়া বিদেশী জাতির পক্ষে খুব সৌভাগ্যের কথা বটে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা কি সম্ভব হবে ? এ বিষয়ে সাহিত্যিক ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। আমাদের শুধু সুদূরের দিকে অপলক-নয়নে চেয়ে থাকতে হবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সময় যখন দেশ তান্ত্রিকতা ও শূন্যবাদের মোহে আচ্ছন্ন, তখন আশু প্রলয়-সম্ভাবনায় দেশ ধর্ম্মকেই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড বলে' মেনে নিছলো। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় অহেতুকী প্রীতি ও সেবাতত্ত্ব যখন মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে যোদ্ধ-ভাবাপন্ন, তখন এই ধর্ম্মই দেশ রক্ষা করেছিল। ধর্ম্মই ভারতের বন্ধন-রজ্জু। এক ধর্ম্মবুদ্ধি থেকেই দেশভক্তির বিকাশ; ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য। কিন্তু যে জাতির ধর্ম্ম নেই, যার বিশিষ্ট

সমাজ-বন্ধন নেই, তার কি জাতীয় সাহিত্য থাকতে পারে না? আমাদের মতে এমন সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকলেও তাকে বর্ব্বর-সাহিত্য ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। যন্ত্র-তন্ত্র, বিজ্ঞানশিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি এই সবের সমবায়ে এই আপাতরম্য ইয়োরোপীয়ান্ সাহিত্য গড়ে উঠলেও এর মাঝখানে দু'হাজার বছরের পুরাণো খৃষ্ট ধর্ম্মের বিপুল সংহত শক্তি এখনও অটুট আছে। তাই এ সাহিত্য 'বর্ব্বর' হয়নি, ইহা ক্রমশঃই বৃদ্ধির পথে চলেছে।

আমাদের দেশে এই ধর্ম্মভাবটা বিশেষ ভাবে জেগে উঠেছিল কথায়, ছড়ায়, গানে ও কবিতায়। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্য একটা লৌকিক প্রেমের উপমা দিয়ে কৃষ্ণরাধার অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী গড়ে তুলেছিল। ঘুমপাড়ানির গানেও সেই ধর্ম্মের উদ্দীপনা মধুর ভণিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ছেলেদের কথা সাহিত্যেও এ ভাবটা বেশ ফুটে উঠেছে। ঘুমন্ত রাজপুরীতে গিয়ে রাজকন্যার উপদেশ মত রাক্ষসদের আসবার পূর্ব্বেই সাহসী রাজপুত্র দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বিল্বপত্রদলের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিলেন। এই ধর্ম্মভাবটা কেউ মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয়নি,—এটা এমনি নিশ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অন্তরধন হয়ে গিয়েছে।

বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ জাতি। পরের সঙ্গে এমন করে মিশে যেতে বোধ হয় আর কোনো জাত পারে না। দুটো মিষ্ট কথা শুনলে অমনি তাহার মন-প্রাণ গলে যায়। গৃহের নিবিড় বন্ধন, স্বদেশের প্রবল আকর্ষণ ও স্বল্পেই পরিতোষ—বাঙ্গালীর মজ্জাগত আদর্শ। সব কাজেই সে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেও এই ভাবপ্রবণতাই তার সর্ব্বনাশ সাধন করেছে। তাই এই রক্ষণ-শীলতার শক্তি আজ বাঙ্গালীর জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ পরের যা-কিছু আছে, যা-কিছু হাতের কাছে পেয়েছি—তা-ই ধার করে, নকল করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মেকী মাল যে জগতে চলে না। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই জন্য একটা বিপুল সাহিত্যিক আন্দোলনও এসে পড়েছে। জাতিত্বের ধারা বজায় রাখতে হলে এ প্রশ্নকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারবো না।

আমাদের বোধ হয়, বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্যের প্রথমোন্মেষ হয় রামমোহন রায়ের যুগ থেকে। তিনি তদানীন্তন যুগের একজন উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন, তাঁর মনের শক্তি দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমুদ্র-পারেও চলে গিয়েছিল, আর স্বদেশ-বিদেশের মধ্যে মিলন স্থাপনের প্রথম প্রয়াসটা তাঁরই

মনে জেগেছিল। তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি ধর্ম্মকে আগলে রাখেন নি বুকের কাছে বিধবার দুঃখ ও কষ্ট-সঞ্চিত ধনের মত,—তিনি দাতাকর্ণের মত এই চিরপোষিত ধন আত্ম ও পরসমাজে বিলাতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর প্রারব্ধ সেই বিরাট বিশ্বজিৎ যজ্ঞের বর্ত্তমান ঋত্বিক কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁরই পথে অনুসরণ করেছেন। এক যুগের চেষ্টা কখনও ফলবতী হয় না। যুগযুগান্ত ধরে সে চেষ্টার অব্যাহত গতি চলে আসছে তার সিদ্ধি এত সহজলভ্য নয়। বাঙ্গালা ধর্ম্মগত ও বিদেশের ঐহিক উন্নতিগত প্রচেষ্টা কালধর্ম্মে এক অখণ্ড যোগসূত্রে ধরা দেবে কি না, তা আমাদের জানা নেই; তবে আমরা এই জানি যে, যে-যুগের দিকে পিছন ফিরে আমরা এগিয়ে চলেছি, আর সেযুগে ফিরে চলবার আশাও নেই উপায়ও নেই; আবার এমনো হতে পারে না যে সবাই মিলে আমরা বিদেশের মন্ত্রতন্ত্রে একদিনেই দীক্ষিত হয়ে পড়বো। এর একটা আপোষ আছেই,—কিন্তু কতদিনে আমরা সে চিরাকাঙ্ক্ষিত আদর্শটা লাভ করবো, তা কে জানে?

দেশের কথা।

[শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার]

ভারতের আকাশে তামসী রজনীশেষে উষার রক্তিমাটুকু ছড়িয়ে পড়ল। আকাশের শুভ্রতারা প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিজালে ডুবে গেল। নয়নের দ্বার আজ সহসা মুক্ত হ'ল, তাইতো বিশ্ব আজ এমন সাজে সাজ্‌ল—আকাশে বাতাসে মুক্তির হাওয়া বয়ে গেল। নবীন উৎসাহে তরুণ সাহসে বুক ভরে গেল। হৃদয়ে হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা সহস্র ধারায় ঝরে পড়ল চোখে মুখে বুকে সুদৃঢ় তেজস্বিতার রেখা সুস্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল। দুনিয়ার সকল স্বাধীন মানুষের মত উচ্চশির হয়ে পথে পথে আজ এ দেশেরও মানুষ বেড়িয়ে পড়ল। ইংরেজের কলিকাতা; ফরাসীর চন্দননগর, পর্ত্তুগীজের গোয়া ইউ-রোপীয় পতাকা স্বচ্ছন্দে বহন করে থাক, হিন্দু মুসলমানও আজ ভারতের নগরে নগরে,পল্লীতে পল্লীতে স্বরাজের পতাকা উন্মোচন করে পৃথিবীর শান্তি অর্জ্জনের

পথে চলেছে; সে পথে ভারত আজ কারো বিরোধী নয়—ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিন, জাপান, পাহাড়িয়া, পাঠান, সবাই ভারতের বন্ধু, সবার সহানুভূতি কল্যাণকামনা না পেলে তো আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। প্রকৃত কথা,যতদিন স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একজন ভারতবাসী ইংরেজের সাহায্য করবে, ভারতে বৃটীশ-শাসন ততদিন অব্যাহত থাকবে—তার গায়ে স্বাধীন ভারত একটী আঁচরও দেবে না। আমাদের আদর্শ জগতে প্রচার করাই আমাদের জাতীয় জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার উদ্দেশ্য—ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে থাপ্‌ছাড়া সঙ্গীন আস্ফালন করে আগাগোড়া সবটাই থাপ্‌ছাড়া, সঙ্গীন ও ব্যর্থ-নিষ্ফল করে তোলা নয়। হিন্দু স্বাধীন মানুষ হ'তে চায়, স্বাধীন পশু হ'তে চায় না। জগতের শান্তি স্থাপন করতে হ'লে আজ দেশে দেশে দেশবাসীর কাণে কাণে প্রচার করতে হবে যে, দেশের উপর অধিকার দেশবাসীর, কোন Voted Interestsএর নয়; গোড়ার এই অধিকার দখল ও স্বীকার না হ'লে পর কোন শান্তি-বৈঠক দ্বারা শান্তি-স্থাপন অসম্ভব—গান্ধী, ডি ভেলেরা, উইল্‌সন কারো সাধ্য নয়!

ভারতের নব জাগরণকে জগতের হিতে কেমন করে সার্থক করে তোলা যায়, এ প্রশ্নের সদুত্তর আজ ভারতবাসী মাত্রেরই চিন্তার বিষয়। প্রথমতঃ আমাদের স্বার্থরক্ষার স্থূল কথা—অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা যা, তা শিক্ষায় দীক্ষায়, ভাষায় ভাবে, ধর্ম্মে-আচারে, ব্যবহারিক ও সামাজিক আদান-প্রদানে শুদ্ধভাব বজায় রাখার কথা। 'শুদ্ধভাব বজায় রাখা' অর্থে অনেকটা 'লুপ্তধন পুনরুদ্ধার করা' কারণ দীর্ঘ শতাব্দীর মিশ্রণের ফলাফলে অনেকখানি হলাহল উঠেছে, তাই পরিহার করা। তার উপায়, গান্ধী-প্রদর্শিত নূতন পথ "সাহচর্য্য ত্যাগ" অথবা 'স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনং' পুরাতন চাণক্য-নীতি। শেষোক্ত পথ অর্থাৎ দুর্জ্জনের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত বর্জ্জন করা সম্পূর্ণ নির্ব্বিরোধী ভাব, সুতরাং আশুফলপ্রদ। মৃণ্ময় পাত্রের কাংস্যময় পাত্রের সান্নিধ্যাই বর্জ্জনীয়। যাদের সংস্রব-বর্জ্জনে আমাদের প্রকৃত হিতসাধন, তাদের সঙ্গত্যাগ করে স্থানান্তরে সরে যাওয়াই বিধেয়। এই "সরে যাওয়াই" পথটা বেশ সম্পষ্ট নয় তাই প্রশ্নটা হচ্চে যে, সরে যাবার শক্তিটা প্রকৃত আছে কি না এবং কোথায় যাব? সংঘবদ্ধ হওয়া ভিন্ন এ শক্তি অর্জ্জনের উপায়ান্তর নাই; কিন্তু "কোথায় যাব" এ তালার চাবি কোথায়, এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়? মুসলমান মুহজ্জিরিনরা এর এক উত্তর দিয়েছেন, "দেশান্তরে

যাওয়া।" আমার নিবেদন এই যে, এটা সদুত্তর নয়—কারণ, এটা হতাশার উত্তর, কিন্তু নিরাশ হ'লেও যে হতাশ হয়নি সে কখনও এ উত্তরের সমর্থন করবে না; এর দ্বিতীয় ভৌগোলিক কারণটা হচ্ছে এই যে, এত বড় দেশ আমাদের, এ দেশ ছেড়ে ভাই-বন্ধুদের ফেলে কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই আমাদের, আর কোটি কোটি নর-নারীরও মুক্তি কয়েকটা মাটীর কেল্লার মধ্যে বন্দী হয়ে নেই—তথাপি এ সত্যকে এড়িয়ে চলা মানেই পুরুষকারকে অবহেলা করা। দেশকে 'বৃটীশ সাম্রাজ্য' বলে ছেড়ে দেশান্তরে পালান সহজ হ'তে পারে, কিন্তু পালাবার সীমানা পালাতে পালাতে অবশেষে সব 'লাল' হয়ে যাবারই সম্ভাবনা এবং এই সম্ভাবনাটাকে এড়াতে হ'লে মনে মনে সঙ্কল্প করা চাই যে, দেশ ছেড়ে কোথাও সরে গেলে চল্‌বে না। ইস্‌লাম ধর্ম্মের দিক্ থেকে যে সৌভ্রাত্রের পতাকা ইস্‌লামীয় বীর ও ফকিরগণ কর্ত্তৃক সুদূর স্পেনে আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের তটপ্রান্ত হ'তে ব্রহ্মসীমান্তে চীন সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত প্রোথিত হয়েছিল, আজ সেই পতাকা বস্ফোরসের পশ্চিম তটে নির্ম্মূলিতপ্রায়, আর ভারতবর্ষ হ'তে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত! ইস্‌লাম ধর্ম্মের সম্প্রসারণের দিনে এই বর্জ্জনের শিক্ষা ছিল কি? দেশত্যাগের ফলে পরিত্যক্ত নিরীহ দেশবাসীর উপর নির্য্যাতন ভার লাঘব না হয়ে দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। এই কারণে আফ্রিকা, আমেরিকা ও মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে প্রবাসী ভারতবাসীর আজ যে দুর্দ্দশা, সেই প্রবাসযাত্রার অন্যতম ফল স্বদেশে ভারতবাসীর দুরবস্থা। স্বরাজ ও স্বাতন্ত্র্যলাভের ব্যর্থ চেষ্টার মূলে ভারতবাসীর ও আইরিশদের দেশত্যাগ একটা মূল কারণ। সাতশ বছরের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে মুসলমান আজ যদি হিন্দুকে ছাড়ে, হিন্দু আজ মুসলমানকে ছাড়বে না। তবে হাঁ, কোথায় যাব? প্রশ্নটা রয়েইছে, সদুত্তর চাই।

বহুকাল পূর্ব্বে রোম সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বিফল মনোরথ হয়ে প্লিবিয়ানরা (প্রজাশক্তি) প্যাট্রিসিয়ানদের (রাজশক্তি) সাহচর্য্য বর্জ্জন করে রোমনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে নূতন নগর নির্ম্মাণ করেছিল, কিন্তু তারা ইটালী পরিত্যাগ করে নি। ফরাসী-বিপ্লবের সময় নির্য্যাতিত ফরাসী জাতি তো ভাবে নি "দেশ ছেড়ে কোথায় যাব?" দেশ ছাড়া দূরে থাক, প্যারিস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে নি এবং রাজার রক্তে রাজত্বের অবসান ঘটায়, প্রজার পূর্ণপ্রভাব রাজধানী প্যারিসেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর নির্ব্বিরোধ সাহচর্য্য বর্জ্জনের প্রবর্ত্তক মহাত্মা

ফ্রান্সিস্ ডিক্ (Francis Deak) ও হাঙ্গেরিয়ান প্রতিনিধিরা কদাচ বুডাপেষ্ট্ পার্লামেণ্ট ভিন্ন ভায়েনা পার্লামেণ্টে সমবেত হন' নেই ; তাঁহাদের এই দৃঢ়ভাবে অষ্ট্রীয়ার পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাতে অস্বীকৃতির মূলে যে শক্তি ছিল তাহারই বলে নিরস্ত্র বীর হাঙ্গেরিয়ানেরা ভাবেনি, 'দেশ ছেড়ে পালিয়ে কোথায় যাব !' বর্ত্তমান সময়ে সোভিয়েট্ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কেন্দ্র সমগ্র 'রাশিয়ার বলসেবী প্রভাব' বিস্তারের পূর্ব্বে পেট্রোগ্রাডের পরিবর্ত্তে মাস্কোতেই ছিল ; রুশজাতি জারের কুশাসনের ফলে এবং যখন শত্রুহস্তে দেশ বিধ্বস্ত তখন পর্য্যন্ত এদিকে নিশ্চয়ই মিথ্যাচারী দেশনায়কের সামরিক বিধিব্যবস্থায় কর্ণপাত করেনি, ও অপরদিকে 'দেশ ছেড়ে কোথায় যাব' না ভেবে দেশেরই মাটির অধিকার দখল করে নিয়েছিল এবং এপর্য্যন্ত এশিয়া ও ইউরোপে বিভিন্ন স্বাধীন দেশে মৈত্রীস্থাপন করা ভিন্ন দিগ্বিজয়েও তারা দেশ দেশান্তরে ছুটে আসে নি, বরং দেশের মাটী অধিকার করতে বিভিন্ন দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে—দেশে দেশে এই নব জাগরণের মূলে তাদের লোকবল, অর্থবল তত নেই, যত আছে তাদের সহানুভূতি আর ইতিহাস। তাদের ইতিহাস বলতে সমগ্র রাশিয়া আজ ইউরোপের মানচিত্রের অন্তর্গত হয়েও চীনও ভারতের মত প্রাচ্য এশিয়ারই অন্তর্গত। ফলতঃ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরও আজ এশিয়ার অন্তর্গত। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা আজ দম্ভভরে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন সভ্যতার বিরুদ্ধে যেন রণতরীর বহর সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ! প্রশান্ত সমুদ্রেও কিন্তু ঝড় উঠেছে, প্লাবনে জল-স্থল-আকাশ আবার ছেয়ে ফেলেছে, তার কলের পুতুলের প্রাণ নিমেষেই অতলজলে বুঝি ডুবে যায় ! প্রলয় যে সৃজনেরই পূর্ব্বাবস্থা ! ঐ রাশিয়ায়, ঐ মিশরে সৃজন আরম্ভ হয়ে গেছে, ভারতেও এই সৃজনের পূর্ব্বাভাষ উষার অরুণরাগের মত ফুটে উঠেছে। আমরা আজ যে পথে দাঁড়িয়ে আছি, এ যে দেশে ফেরার পথ। তাই স্পষ্ট করে আবার বল্‌ছি "দেশে ফেরা চাই।" চাবির তোড়ার এই ছোট্ট চাবিটিতে "কোথায় যাব ?" তালাটী খুলবে না কি ?

"দেশে ফেরা চাই !" এ আর নতুন কথা কি ? সোজাদিকে চাবি ঘুরিয়ে তালা যখন বন্ধ হয়েছে তখন উল্টোদিকে চাবি ফেরান ছাড়া গতি কি ? যাঁরা চাবি ফেরাতে নারাজ, সোজাই চাবিটা ঘুরিয়ে তালা ভাঙ্‌তে চান, তাঁদের চাবিটাই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। যাঁরা 'দেশান্তরে যাওয়া চাই' এই মেকী চাবিটা এনেছেন, বোধহয় তালার চেয়ে চাবিটা বড় বলেই তালা

খোলেনি; অপরপক্ষে আমার এই দেশে ফেরা চাই চাবিটা স্বহস্তে প্রস্তুত ও নেহাৎ ছোট, সম্ভবতঃ সকলের উপেক্ষার বিষয়। আশা এই, মহাত্মা গান্ধীর চর্কা-চাবিটা আজ আর তত উপেক্ষার বিষয় নয়। "দেশ" কথাটার ভেতর আমার চাবির দাঁত রয়েছে—'দেশ' বল্‌তে আমি যা বুঝি তা কলিকাতার মত ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালাই করা বৃহৎ সহরও নয়, আর জরাগ্রস্ত পল্লীসমাজও নয়,—তবে কি? "দেশ" অর্থে অফুরন্ত প্রকৃতির সম্ভার একদিকে, আর একদিকে দেশবাসী এবং এতদুভয়ের একটা নিবিড় যোগাযোগ। প্রকৃতিকে ছেড়ে বেঁচে থাকাই 'মৃত্যু' প্রকৃতির কোলে মৃত্যুই 'জীবন', প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগাযোগ সম্বন্ধ আজ নেই—নগরেও নেই, পল্লীতেও নেই—সে সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, 'কার শ্রম-লব্ধ ধন কে ভোগ করে!' দেশবাসী প্রকৃতির সম্ভার অবহেলা করে ছুটে আসে সর্ব্বনাশের পথে, আর প্রকৃতির ভাণ্ডার উদ্যোগী যারা, তারা লুঠ করে নিয়ে যায়। শুভ লক্ষণ এই যে, হাওয়াটা দেশের এবার বদ্‌লেছে। একটা প্রশ্ন উঠেছে যে, চাঁদপুর হ'তে প্রত্যাগত আসামের চা-বাগানের শ্রমিকরা দেশে ফিরে বাঁচবে কেমন করে? সহজ উত্তর—'মরে বাঁচবে।' মরতে যারা শিখেছে তারাই প্রকৃত বাঁচ্‌তে শিখেছে, তারা যে 'অমর' হয়েছে—তাদের মরবার ভয় দেখাব আমরা, যারা মরে আছি? বাঁচ্‌বার পথ তারাই নির্দ্দিষ্ট করেছে, তারা আর মরবে না,—তাদের দেখে দেশও প্রাণ পাবে ঐ মরণের পথের পথিক হয়ে; যারা মরেছে, তারা ঐ 'দেশে ফেরা চাই' পথের ইঙ্গিত করে গেছে—অমৃতের সন্ধান দিয়ে গেছে! যে পথে এতকাল কাঁটা দিয়ে এসেছি আত্মশক্তিতে সে পথ আবার মুক্ত করে নিতে হবে—ফেরবার সে পথ অপরে মুক্ত করে দেবে কেন? এই আত্মবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, আত্মহিত ও জগতের হিতে আমাদের স্বরাজ অর্জ্জন সার্থক করে তুলতে হবে। যুগযুগান্তর পরে আবার দেশ স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে ভারতীয় সভ্যতার নূতন মর্ম্মরবেদী নির্ম্মাণ করুক; হিমালয় যেরূপ পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ, ভারতীয় সভ্যতা সেইরূপ পৃথিবীর সকল সভ্যতাকে ধারণ করে বিরাজমান হ'ক।

"দেশে ফেরা চাই" অর্থাৎ ভারতীয় ছাঁচে ঢালাই করা নূতন নগর প্রতিষ্ঠা ও অসংখ্য আদর্শ পল্লী গঠন করা চাই। ভারত স্বপ্রতিষ্ঠ হ'বার পর 'স্বরাজ' ভারতের নানাদেশে নানারূপ ধারণ করবে কিন্তু দেশের প্রভূত শক্তি কেন্দ্রীভূত হবে কোথায়? আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা

(National Education) এবং শিল্পোন্নতি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তার কেন্দ্রীভূত না হ'লে পর বিপরীত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ঘাত প্রতিঘাতে (Hostile environments এর মধ্যে) নিষ্ফল হয়ে যাবে। সুতরাং সফলতা পেতে হ'লে কেন্দ্রীভূত হওয়া চাই। মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ এখনও বাংলায় আছে, ইংরেজের কলিকাতা, ফরাসীর চন্দননগর ঐতিহাসিক স্মৃতি বুকে ধরে টিকে আছে ও টিকে থাকবে, কিন্তু নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় নাগরিক সভ্যতা স্বভাবতঃ ম্লান ও শ্রীহীন হয়ে পড়বে। কালস্রোতে দেশে দেশে এমন কত জনপদ ও পল্লী বুদ্‌বুদের মত উঠে মিলিয়ে গেল, কিন্তু কোনটাই খেয়ালমত গড়ে ওঠেনি—প্রত্যেকটীরই ইতিহাস আছে। প্রয়োজন মত দেশ কালান্তর্গত অবস্থার অনুযায়ী কত নগর নগরী গড়ে উঠেছে, সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে আবার কালের নিষ্ঠুর আঘাতে, প্রয়োজন ফুরালে, অশোভন হয়ে পড়লে সমৃদ্ধির শিখর সমেত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাম্রাজ্যের বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়েছে। মোগল ভারতের দিল্লী-আগ্রা, বাংলায় নবাব ও শেঠদের মুর্শিদাবাদ অমনই বিস্মৃতির গর্ভে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে ঐতিহাসিক, পুরাতত্ত্ববিদ ও পর্য্যটকের কৌতূহল ও বিস্ময়োৎপাদন করছে।

বৃহৎ ও বহু জনাকীর্ণ নগরে মানুষ সঙ্কীর্ণভাবে বাস করে ; প্রচুর আহার্য্য বস্ত্রাদির সংস্থান দূরে থাক, বিশুদ্ধ বায়ু পর্য্যন্ত সচরাচর মেলে না। অভাব সৃজন ও অভাব পুরণ করতে করতে অবসর অভাবে জ্ঞানের চর্চ্চা প্রায় দুর্ঘট হয়ে ওঠে। নগরে বাস করার মূলে যে উচ্চ আশা, আকাঙ্ক্ষা জীবনকে রঙিয়ে রামধনুর মত বিচিত্র করবার বাসনা, তা প্রতিদিন দারুণ অতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। মনে হয়, পল্লীর মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন গুজ্‌রান করে প্রচুর দীর্ঘ অবসর সময় বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে ও কোকিলের কুহুতানে নিরালায় বসে কাটান কত সুখকর হ'ত। কোন মোহের দুর্ব্বিপাকে ছুটে এসে অন্তরাত্মা আজ বিষিয়ে উঠল? মানুষের এই অন্তরের ক্ষোভ ও মনস্তাপের প্রতি লক্ষ্য করে নূতন নগর নির্ম্মাণের স্থপতিকে সুকৌশলে প্রত্যেকটী ইট বা পাথর

এই প্রসঙ্গে H. G. Wells এর নবপ্রকাশিত সুবিখ্যাত The Outline of History ইতিহাসের The Moglul Empire of Land Ways and British Empire of Sea Ways প্রসঙ্গটী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গাঁথতে হবে। একথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে, পুরাতনের ছাঁচে নূতনকে যতই আমরা ঢালাই করতে যাব, ততই আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। কলিকাতা নয়, মুর্শিদাবাদ নয়, নবদ্বীপ নয়, বাংলায় একেবারে নূতন আবহাওয়ার মধ্যে প্রকৃতির স্নেহময়ী কোলে ফিরতে এই নব জীবনকে মুক্ত করতে হবে! আমাদের সৃষ্ট নূতন নূতন নগরে বিদেশী বণিককে আমরা বন্ধুভাবে আহ্বান করব, প্রভুভাবে নয়। তবেই বিদেশীর একাধিপত্যের আওতায়, ব্যর্থ শিক্ষার মোহে আকৃষ্ট হয়ে, ভ্রান্ত দরিদ্র নিরাশ্রয় দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের জন্ত লালায়িত হয়ে পথে পথে ধনীর দ্বারস্থ হওয়ার দুঃসহ দাসত্বের লাঞ্ছনার অবসান হবে। ধনীর অহঙ্কার, দরিদ্রের হাহাকার, মধ্যবিত্তের দাসত্বস্বীকার যে দেশে আজ বিধির বিধান বলে স্বীকৃত সে বিধানের আমূল পরিবর্ত্তন করতে হলে কিরূপ বিরাট উদ্যোগপর্ব্ব কিরূপ organisation আবশ্যক, কিরূপে সংঘবদ্ধ হ'লে প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী তার যথাযথ সদুত্তর চাই।

নূতন নগর নির্ম্মাণ করা সম্ভব কিনা, এ প্রশ্নও আমাদের অক্ষমতার ও অবসাদের পরিচয় দেয়। সত্য বটে, যে সমাজ 'দানা বেঁধে উঠেছে' তাকে এক কথায় ছাড়া চলে কি? তবে আর একটা কথা, তার একদিকে ভ্রূক্ষেপ করলে দেখতে পাই যে একটা মস্ত ক্ষয়ের অঙ্কও জমা হয়ে আছে; বর্ষার ধারায় যার অনেকখানি ধুয়ে মুছে গেছে, বৃথা তার মমতা না করে নূতন সংঘ জীবন, নূতন ভিত্তির উপর গঠন করবার মত শক্তি উপার্জ্জনের প্রয়াসই শ্রেয় নয় কি? মানুষ সমস্ত শক্তি দিয়ে যে কাজ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়, সে কাজ কখনই অসাধ্য নয়। যে নাগরিক সভ্যতা আমরা গড়তে চাই সর্ব্বাগ্রে সে সভ্যতার স্বরূপ সুস্পষ্ট জানা চাই। নূতন নগর কোন আদর্শে সৃষ্ট হবে? ধনীর অর্থই কি সেই সভ্যতার তুলাদণ্ডে বাট্‌খারারূপে গৃহীত হবে? সভ্যতার মানদণ্ড নিয়ে যারা পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য অনুযায়ী মানুষকে সভ্য কি অসভ্য সাব্যস্ত করেন, ধনীর টাকার থলি যারা জগতের সকল দরজার চাবি অথবা passport বিবেচনা করেন, যাদের দৃষ্টি স্বচ্ছলতার মধ্যে সভ্যতাকে বরণ করতে সঙ্কুচিত হয়, তাঁরা ইউরোপীয় কুশিক্ষার হলাহল আকণ্ঠ পান করে সভ্যতার উদার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না। স্কটলণ্ডের উত্তরে একটী বরফের দেশ বা দ্বীপ আছে (Iceland); তাঁহার অধিকাংশ ভূভাগ বরফে ও আগ্নেয়গিরির উদ্গীর্ণ লাভা ও প্রস্তরাদিতে সমাকীর্ণ; সেদেশের অধিবাসিগণ ইউরোপীয়

Scandinavian settlers মুদ্রার দ্বারা বিনিময় তাদের প্রয়োজন হয় না ; তাই মুদ্রার প্রচলন সেখানে নেই। সকলেই একই প্রকার সামগ্রী, প্রতি ঘরে গৃহস্থ নরনারী নিজ নিজ শ্রম লব্ধ আহার্য্য বস্ত্রাদি সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রাসাচ্ছাদন করেন, মেষ ও হংস পালন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। সভ্যতার মানদণ্ডে এই ৮৫০০০ নরনারী অদ্যাপি সাওতালের মত অসভ্য বিবেচিত হ'ন কিনা জানিনা ; অর্থ তাঁদের নেই, সম্পত্তির মধ্যে ঘরের সামান্য আস্‌বাব আর ব ই—জ্ঞানার্জ্জনে ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে ইঁহাদের আগ্রহ সমধিক। মানুষের আত্মবলের উপর এইরূপ আস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—যারা বরফ ও আগ্নেয় গিরির দেশে বাস করে ও স্বচ্ছলতার তৃপ্তিতে মগ্ন, তাদের কাছে সুজলা, সুফলা দেশে বাস করে ও অন্নবস্ত্রের কাঙাল ভারতবাসীর অন্ততঃ এইটুকু শিখতে হবে—'সভ্যতা বলে যা ধরেছি তাকি প্রকৃত সভ্যতা? একমাত্র আত্মবলের উপর নির্ভরতা নেই বলেই আমাদের এই হীনাবস্থা। মানুষ বজ্রের মত চরিত্র যেদিন লাভ করবে, সেদিন বুঝবে অর্থ তুচ্ছ—মানুষ মানুষই চায়। এক শক্তিমান মহাপুরুষের ডাকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দেশের কাজে আসে, কিন্তু কোটি কোটি মুদ্রায় দেশের কাজে একজন মহাপুরুষ গড়া যায় না! আজ যদি প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর আদর্শে হিন্দুস্থান ইংলিশস্থানে পরিণত হ'তে হ'তে মর্ম্ম—ত গান্ধীস্থানে পরিণত হয়ে থাকে, হয়ত সেই মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে ভারতবর্ষ 'গান্ধীবর্ষ' বলে একদিন জগদ্বিদিত হবে—কিন্তু কল্পনার পাখা একটু সংযত করে প্রথমে বলতে চাই যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গান্ধীপল্লী ও গান্ধীনগর অথবা (Congress town) কংগ্রেস গঠিত নগর এর প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—যেখানে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হলে পর ভারতের ভাবী সভ্যতা প্রচার সহজসিদ্ধ হবে।

সম্মুখে কঠিন কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনে আমাদের আজ পেছিয়ে দাঁড়ালে চলবে কি? আজ যদি আমরা এ জাতিকে সন্ন্যাস ধর্ম্মেই দীক্ষিত করি, তা হ'লে পাহাড়ের গুহায় গুহায় উপনিবেশ স্থাপন করা ভিন্ন গত্যন্তর কি? তবে একটা দুর্ভাবনা এই যে, সন্ন্যাসধর্ম্ম নিয়েই একটা জাতি হিমালয়ে বসবাস করলেই ধর্ম্মরক্ষার বিশেষ সম্ভাবনা কোথায়? পাহাড়িয়া মাত্রই তো আর সাধু-ফকির নয়, গুর্খা-আফ্‌গান আজও সাধু-ফকির হয় নেই। অপর পক্ষে মানুষকে গৃহী করে আবার যদি বৈদিক যাগ-যজ্ঞেই ব্রতী করতে হয়, আর রেলষ্টীমার সব তুলে দিয়ে 'মোদের মাসী পিসীর হেঁটে কাশী পাড়ি মারবার'

ব্যবস্থাই পুনরায় হয়, তা হ'লে বদরিকাশ্রম হ'তে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত তীর্থস্থান ক'টার একটু আধটু সংস্কার করলেই চলতে পারে। কিন্তু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের আর অপার্থিব জ্ঞানের আদান-প্রদান যদি করতে হয়, তা হ'লে জগৎকে আহ্বান করতে হবে ও জগতের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে—সুতরাং আমাদের হিমালয়ে উপনিবেশ অথবা গুর্থার সুন্দর বনে উপনিবেশের পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখাও চলতে পারে এবং তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের আর চা-বাগানের আড় কাঠিদের এড়িয়ে চলেও সংসার যাত্রা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই নির্ব্বাহ করা চলতে পারে।

'সভ্যতা' কথাটার মানে নিশ্চয়ই ধোয়া নয়, বাতাসে ভর করে আকাশে চলাফেরা করে না। সভ্যতা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়; ভারতে ইউরোপীয়রা দস্তুর মত মাথায় করে তাদের কর্ম্মজীবনের সভ্যতা বয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতায় ভারতবাসীকে শত বর্ষও মুগ্ধ করে রাখা গেল না। ভারতবাসী সহস্র সহস্র বৎসর যে সভ্যতার আদর্শ বুকে করে শান্তির মধ্যে সমাজ বেঁধে বসবাস করছে, তাদের সে সভ্যতা সে ধর্ম্মবন্ধন নানা সভ্যতার সংঘর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপর্য্যয়েও আজও যে টিকে আছে আর যখন বৈদেশিক কোন সভ্যতাই দেশের ধাতসহ হ'ল না, তখন ঐ টিকে থাকার মধ্যে একটা সার্থকতা নিশ্চয় আছে। সত্য বটে, অতিকায় হস্তী লোপ পেয়েছে, 'কিন্তু তেলাপোকা আজও টিকে আছে' এই অজুহাতে "টিকে থাকাই চরম সার্থকতা নয়"—তবে আশা করা যায় যে, চরম না হ'লেও আজও যা লোপ পায় নেই তার মধ্যে সার্থকতার সন্ধান মিলতেও পারে। অবশ্য এ যুগে বৌদ্ধদের গৌরব যুগ অথবা শঙ্করাচার্য্যের হিন্দু সভ্যতা গড়া চলবে না—কিন্তু ভারত সভ্যতার ধারাবাহিক শৃঙ্খলে ভারতের অতীত যুগের গৌরব স্মৃতি, শৃঙ্খলের অংশ বিশেষটুকু ছেঁটে বাদ দেওয়াও চলবে না এবং অপরদিকে বিদেশীর পরিত্যক্ত সভ্যতার উপর :দাগা বুলোনও চলবে না। নূতন সভ্যতা গড়তে আমাদের এ যুগে নূতন ছাঁচ চাই—এবং সেই নূতন ছাঁচ দেশকালভেদে একই রূপ (form) ধারণ না করে বিচিত্ররূপ ধারণ করবে। কিন্তু তাদের সবার মূলে জগতের হিতে আমাদের সভ্যতাকে কাজে লাগাবার একটা বিরাট প্রচেষ্টা থাকবে, যার সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি ও পরিণতি আমাদের জাতীয় জীবনে পরিলক্ষিত হবে।

নূতন সংঘ—জীবনের প্রয়োজনীয়তা এ যুগে কেন, যুগে যুগে হবে। তবে

এ কথাও ঠিক যে, পুরাতনকে ভাঙবার চেয়ে নূতনকে গড়বার দিকটায় ঝোঁক বেশী হওয়া চাই। পুরাতন বলেই ভাঙা অনাবশ্যক হ'তে পারে—পুরাতন বহুদিন টিকে থাকে, তবে তার শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাস যেথানে শেষ হয় সেথান হ'তে শ্রীহীনতার ইতিহাস আরম্ভ হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে ইংরেজ ইউরোপীয় ছাঁচে কলিকাতায় তার নাগরিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করবার পর একদিকে কলিকাতার (অর্থাৎ এ দেশের মাটীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার) শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, অপর দিকে মুর্শিদাবাদ শ্রীহীন হ'তে থাকে। দীর্ঘ শতাব্দীর এই টিকে থাকার সংগ্রাম একটা দিনের পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অপেক্ষা অধিকতর নির্ম্মম, অধিকতর কঠোর।

মধুর অপেক্ষা মঙ্গলকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পথ মানুষকে দেখাতে হবে। আমরা যেদিন আবার সে পথের সন্ধান পাব, উদ্যোগী হয়ে বীরের মত অতুল সাহসে বুকভরে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব, আমাদের সংঘবদ্ধ দেখে সর্ব্ববিধ নির্য্যাতনের অবসান সেই দিন হবে ও 'টিকে থাকতে হ'লে' আমাদেরই সৃষ্ট নগরে আমাদের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন বিদেশীর গতি থাকবে না। আজ যেথানে ব্রাহ্মণ চর্ম্মকার বৃত্তি আশ্রয় করে জীবনধারণ করে, কাল সেখানে সে দুর্ভোগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত গুণধর্ম্মী ব্রাহ্মণের পদতলে বসে বিশ্ববাসী জ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসবে।

সুখের ঘরগড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

ষোড়শ অধ্যায়

ব্রাহ্মণদের ধনুর্ভঙ্গ পণ হইল তর্কসিদ্ধান্তকে পংক্তিচ্যুত করা ও মর্য্যাদার মূল্য স্বরূপ ব্রাহ্মণ পিছু পাঁচ টাকা জরিমানা লওয়া। মহেশ ভোলানাথকে স্পষ্ট অক্ষরে তাই বুঝাইয়া দিল। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ভোলানাথ দেখে উঠানে দাঁড়াইয়া তর্কসিদ্ধান্ত দক্ষঠাকুরুণ যজ্ঞেশ্বরী, পঞ্চু, বিজয়, ঐ কথাই আলোচনা

করিতেছে। ভোলানাথকে দেখিয়া তর্কসিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হলো ভুলু?" ভোলানাথ চুপ করিয়া রহিল। সিদ্ধান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, "বলই না ছাই, চুপ কল্লে কেন? তারা রাজী নয় এই তো?"

ভো। হ্যাঁ, তারা বরং জরিমানা অর্দ্ধেক নিতে রাজী আছে কিন্তু—

তর্ক। আমাকে পংক্তিতে বস্‌তে দেবেনা এই তো?

ভো। শুধু আপনাকে নয় ওবাড়ীর কেহ না—

তর্ক। উত্তম। তাতো আমি রাজী আছি হে—

য। আমি রাজী নই এতে যা হয় তা হোক—

সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ও কিরণ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয়ই না তা গ্রাম ত্যাগ করে ফিরে যেতে হয় সেও ভাল—

তর্ক। শোনো মা—আমি যা বলি, নাই বা যজ্ঞিতে বস্‌লে পঙ্গু আমি তো যজ্ঞির রান্না খাইনি জানো, যদি এটা কল্লে মান রক্ষে তোমার হয়—

য। আপনার অপমানে মাথা হেঁট করে যোগ দিয়ে আমার মান রক্ষে? মাপ করবেন—বলেইছিতো দুগুণ জরিমানা দিতে রাজি আছি আপনার অপমানে আমি রাজী হবো না—আমি যদি তিনগুণ জরিমানা দি তা হলে রাজী হবে মনে হয়?

প। আমরা সেইটিতে রাজী নই খুড়িমা! জরিমানা কেন দেবেন?

দক্ষদেবী এতক্ষণ নীরব ছিল, গর্জ্জন করিয়া হাত নাড়িয়া অগ্রসরপূর্ব্বক বলিল—"চামারদের ঐ ব্যবসা এখানে বৌমা! আমার নোটা নেত্য তাঁতির বুড়োমার মড়া পুড়িয়েছেল:বলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা মুখপোড়ারা আদায় করে তবে জাতে উঠতে দেয়—জানিনি আমি? কোন নচ্ছারের কত মর্য্যাদা তা দক্ষ বাউনীর জান্‌তে বাকী নেই—কুলের কথা আর বলবুনি হাটের মাঝে ঐ ঈশেন হালদারের—"

তর্ক। থাক্ ভাইঝি আর হাড়ি ভেঙ্গে কাজনি—(যজ্ঞেশ্বরীকে) এখন শোনো মা আমার যুক্তি নাও, আমিও সরে দাঁড়াচ্ছি—

য। কিছুতেই আমি রাজী হবোনা—আপনি না খান পংক্তিতে পাত পেতে বসতে হবে খাবার ছুতে হবেনা—ঠাকুরপো তুমি তিনগুণ জরিমানায় রাজী হওগে—

তর্ক। কিছুতে না—এক পয়সা নয়!

বাহিরে আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী এইসব কথা শুনিতেছিলেন, তর্ক-

সিদ্ধান্তের গর্জ্জনে বুঝিলেন জরিমানা দেওয়ার কথা হইতেছে। তিনি বিজয়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "বিজয়কান্ত খপরদার নয় এক পয়সা জরিমানা দেওয়া হবেনা মা কে বলুন।" বিজয় বাহিরে আসিয়া ভবানীর হাত ধরিয়া বলিল—"মা আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে! খেয়াল করিনি, আসুন ভিতরে আপনি যে আমাদের পরম ভরসা।" "থাক্না বাড়ীর ভিতর মেয়েরা আছেন—"বলিয়া ভবানী কুণ্ঠা জানাইলেন। বিজয় বলিল—"তাতে কি আমার মা বোন খুড়ী আপনারও তাই।" সেতো বটেই বলিয়া ভবানী অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত ভবানীর মনোভাব জানিয়া বলিলেন "বাবাজী ঠিক বলেছ! অসহ্য হ'য়ে উঠেছে এই কুৎসিৎ অত্যাচার দেখে ব্রাহ্মণ গৌরবের দোহাই দিয়ে এতবড় কাপুরুষতা যে জগতে কোনো জাত দেখাতে পারে তা মনে হয়না! এই ভদ্রলোকের মেয়ে আজ তৃষ্ণার্ত্ত মানুষকে তেষ্টায় জল দিয়ে হলো পতিত! আর—" দক্ষদেবী কথা কাড়িয়া লইয়া বাকীটুকু পূর্ণ করিল "ঈশেন হালদারের বিধবা বোন—"ভোলানাথ চটিয়া গিয়া বলিল "থামো পিসি, আমার আর ছাদ্দ ভাল করে পাকাতে হবে না!" দক্ষ থামিয়া গেল কিন্তু ঘুরাইয়া ইঙ্গিত করিয়া তবে থামিল—"থাম্‌বে কি? হক্ কথা বলবো ডরাই কাকেও, তোর ছ্যাক্‌রাটারী বাবুকে বশ করেছে ঈশেন হালদার—"

তর্ক। আঃ থামোনা দক্ষ!

দক্ষ মাথার কাপড় মাথায় ফিরাইয়া আনিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

তর্ক। তা হ'লে কি বলো সব! ভুলুর কি মত?

সকলেই একবাক্যে বলিল আপনাকে পংক্তিচ্যুত কল্লার সঙ্গে আমরা রাজী নই। ভোলানাথ হা না কিছু না বলিয়া ঘরে ঢুকিল।

দেবরের মনোভাব দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী তর্কসিদ্ধান্তের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা এনা কল্লে কি করে মান রক্ষে হয়?"

তর্কসিদ্ধান্ত। উঠে বসো তো মা। মান নষ্ট হলো কিসে যে মান রক্ষের ভাবনায় অস্থির হলে? আর হলে জরিমানা দিয়ে মান উদ্ধার করবে?

য। নইলে যে ব্রাহ্মণ সব অভুক্ত অবস্থায় ফিরে গেলো? পঞ্চু দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"ব্রাহ্মণ হলে যেত না—খুড়ী মা—ভেবনা তার জন্যে। ওতে তোমার প্রত্যবায় হবেনা।"

তর্ক। বারোজন বাউন খেলে তো নিয়ম রক্ষে হয়? তা যোগাড় করে দিচ্ছি—হয়ে যাবে—

য। রাম চন্দ্র! বাউন খেলে না আমরা খাবো তাই হয় বাবা? এত আয়োজন সব নষ্ট হবে?

তর্ক। তাই হয় রে বেটী এ দেশে লক্ষীর অন্নের পরিমাণের চেয়ে পেটের কাঙ্গাল অনেক মা! আর এই দেশ লক্ষী ছাড়া কাঙ্গাল কেন জান? লক্ষীর অপমান করে করেই—এই হয়েছে। লক্ষীর অপমান যারা করে তাঁর অন্ন তাদের জন্ত নয়। যারা লক্ষীর দরদ মর্য্যাদা বোঝে তারা আয়োজনের সার্থকতা করে যাবে।

কিরণ এক গ্লাস সরবৎ মায়ের জন্ত আনিল। যজ্ঞেশ্বরী হাত দিয়া ঠেলিয়া দিল। তর্কসিদ্ধান্ত বলিলেন "তা হবে না মা খাও"। "না বাবা আগে ব্রাহ্মণ দু এক জন খাগ্ তবে হবে।" তর্কসিদ্ধান্ত গ্লাসটা লইয়া ডান হাতে চেটোয় এক ঝিনুক ঢালিয়া গণ্ডূষ করিয়া বলিলেন—"এবার হয়েছে তো নাও মা।"

যজ্ঞেশ্বরী হাত হইতে গেলাসটী লইয়া অন্তরালে সরিয়া গেলেন। তর্কসিদ্ধান্ত বাহিরে আসিয়া পঞ্চুকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা যাওতো বাগদী আর দুলে পাড়ায় গিয়ে তাদের সব আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এসো বাবা মুখুজ্যে বাড়ী ফলার খাবি আয়—"। পঞ্চু ও ভবানী দু জনেই এমনি একটা মতলব অাঁটিয়াছিল; সিদ্ধান্ত মহাশয়ের মুখে আদেশ পাইয়া দু জনে খুসী হইল। পঞ্চু চলিয়া গেল। উঠানের এক দিকে ঝঁাতলা পাতিয়া এসমাইল তার ছেলে মেয়ে লইয়া বসিয়া হিঁদুর বাড়ীর সামাজিক সভ্যতার লীলা অবাক হইয়া দেখিতেছিল। তর্কসিদ্ধান্ত তাহাকেও ডাকিয়া বলিলেন—"এসমাইল তুই ও এক কাজ কর আবদুল আর করিমকে ছেলে পুলে নিয়ে আস্তে বলগে যা—"। এসমাইল তার দয়াময়ী মঙ্গলকামিনীর সমাজ শাস্তি দেখিয়া বড়ই ক্ষুন্ন হইয়াছিল; ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি পাইয়া সে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাক্য-ব্যয় না করিয়া ছুটিল। এ দিকে যজ্ঞেশ্বরী তর্কসিদ্ধান্তের প্রসাদী সরবতের গ্লাস হাতে করিয়া সদুর সন্ধানে রান্নাঘরেরর ভিতর গিয়া দেখে, তারামণি একা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সদু কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে তারামণি বলিল—"ভোলাদা ঘরে রাগ করে গিয়ে শুয়ে আছে ছোট বৌদি তাঁরই কাছে বা গেল—"

যজ্ঞেশ্বরী উদ্বিগ্ন হইয়া ভোলানাথের ঘরে ঢুকিয়া দেখে ভোলা মুখ গুজিয়া বিছানায় পড়িয়া। সদু নীরবে কাছে বসিয়া আছে।

যজ্ঞেশ্বরী ডাকিলেন "ঠাকুরপো"; ঠাকুরপো নিরুত্তর। যজ্ঞেশ্বরী গায়ে

ঠেলা দিয়া ডাকিলেন। সে চোখ চাহিল। যজ্ঞেশ্বরী সরবতের গ্লাসটা ধরিয়া বলিলেন "এইটে খাওতো ভাই" মুখ না তুলিয়া ঠাকুরপো বলিল—"চুলোয় গিয়ে তার পর খাবো।"

যজ্ঞেশ্বরী "তবে আগে খেয়ে নিলে অকারণে যাবার জন্তে তাড়া পড়বে না—নাও ওঠো তো, ছেলে মানুষি করনি—পুরুষ হয়ে জন্মানো টাই তোমার ভুল হয়েছিল—বুঝলে?"

ভো। তা আজ বুঝিছি; তোমারও মেয়ে হয়ে জন্মানোটা কম ভুল নয়।

য। বেশ তো পরস্পরে ভুলের দোষটা তা হলে কেটেই যাবে; আমি পুরুষ গিরিই করবো, তুমি মাদী হয়েই ঘরে পড়ে থেকো—জালা বটে! বলি হয়েছে কি বল তো?"

ভো। আমার শ্রাদ্ধ,—যাও সব, বিরক্তি করনা—

য। খেয়ে নাও বিরক্ত করবো না—আমার মাথার দিব্বি—

অগত্যা ভোলানাথ হাত হইতে গ্লাসটা লইয়া একটু চুমুক খাইয়া রাখিয়া দিল। পরে বলিল—"একটা কথা বৌদি—ওই বাহাদুরিটা না কল্লেই হ'তো না—

য। ওটা বাহাদুরী নয় কিছুই! যথার্থ বন্ধু যথার্থ মানীর মান রেখেছি তুমি যা পাল্লেনা পুরুষ বাচ্ছা হয়ে আমাকে কুলের বৌ হয়ে সভায় দাঁড়িয়ে তাই করতে হলো—তোমার ভিটেতে যদি অমন পুণ্যাত্মার অপমান হয়, ওই সব শেয়াল বেরালের হাতে তা হলে—যাগ্ তুমি বুঝলে না এই দুঃখ ঠাকুরপো!" যজ্ঞেশ্বরী অঞ্চলে চোখ্ মুছিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সদু বলিল—"দিদির মনে কষ্ট দিও না—উনি যে কত বড়, কত মহৎ কত উঁচুতে তা রোজ একটু করে করে বুঝিছি—সে দিন পুরুৎ গিন্নি আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লে "মাগী দেওরটার ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে যাবে দেখছি—"শুনে আমার মনে একটু সন্দেহ হয়—ভাবলুম দিদি কি মতলব—করেছে নাকি? তার পর সন্দেহের পাপে মন ঘেন্নায় ভরে গেল!—তোমার মনে ওর নামে কত কি হচ্ছে নিশ্চয়ই—সত্যি বল না?

ভো। হোক্ না হোক্ আমাকে এমন করে বিপন্ন করা কেন?

স। উনি কি ইচ্ছে করে করছেন্ বল্‌তে যাও—ছি! এক করতে আর হয়ে যায় যদি—তা উনি কি করবেন—আর একটা কথা তুমি ও যদি এতো ভেঙ্গে পড়ো তো আমরা মেয়ে মানুষ দাঁড়াব কি করে?

ভো। (উত্তেজিত ভাবে) ভেঙ্গে পড়ি সাধে? তার দাঁড়াবার স্থান

আছে—মাথা গোঁজবার স্থান আছে—আমার তো আর নাই—এইখেনেই এক ঘরে হয়ে মাথা মুখ হেঁট করে দিন কাটাতে হবে। প্রবলের বাদ করে আমার টেঁকা সম্ভব? যাগ্ বেশ হয়েছে—তোমরা ঘর কর আমার ত্ চোখ যেথানে যায় চলে যাব—

যজ্ঞেশ্বরী আড়াল হইতে স্বামী স্ত্রীর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। দেবরের আক্ষেপ উক্তি শুনিয়া ভয় পাইয়া আবার ঘরে ঢুকিলেন। অত্যন্ত গো বেচারী ঠাণ্ডা প্রকৃতির এই স্বামীটার মুখে এরূপ ধরণের ভয়প্রদর্শনের উক্তি শুনিয়া সত্ন স্বভাবতঃই বিচলিত হইয়া পড়িল; কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় যজ্ঞেশ্বরীকে দেখিয়া তাহার মনে হইল—ওর বিবাগী হওয়ার কথা দিদি যদি শুনিয়া থাকে তবে কি না জানি ভাবিবে এই আন্দাজ করিয়া সে স্বামীর প্রতি সমবেদনা জানাইয়া বলিল—"সত্যি দিদি কি করতে গিয়ে কি হলো? কেন এ ভাতের হেঙ্গাম করতে গেলে—সাত পুরুষের বাস ভিটে হলেও এ গ্রামে যে কত ভয়ে ভয়ে বাস করতে হচ্চে তা আমরাই—জানছি—"। যজ্ঞেশ্বরী অন্ন প্রাশনটা এই বিভ্রাটের কারণ নয়, কারণ তাঁহারই কাজে কথার ব্যবহারে যে আত্মস্বাতন্ত্র্য দেখাইয়া আসিতেছেন তাহাই। পঙ্কিল জলস্রোতে মিশিয়া ভাসিয়া যাইতে হইলে নিজের শুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া চলিতে গেলে এমনি বিভ্রাট হয়। দেবরের সংসারে আসিয়া তাঁহাদের গতানুগতিক জীবন স্রোতের সঙ্গে নিজেদের জীবন স্রোত তাহার সঙ্গে পূর্ণ ভাবে মিশাইতে না পারায় এই পরিণাম হইল! এবং এ জন্য এই যে একটা গৃহ শান্তি ভঙ্গের সূচনা হইতেছে ইহার জন্য তিনিই যে—দেবর ও দেবরজায়ার চোখে দায়ী হইলেন এই ভাবিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, কি করিয়া সে সব দিক বাঁচাইয়া পরিত্রাণ পাইবেন এই ভাবনাটায় এখন তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইল; তবে যেমন প্রবল ঝড়ে দৃঢ় মূল স্থিরকাণ্ড বৃক্ষের উপরেরই ডাল বা পাতা গুলাই নড়ে কাঁপে, কাণ্ডের কোনো চাঞ্চল্য হয় না, তেমনি যজ্ঞেশ্বরীর অন্তর প্রকৃতিটী স্বভাবে তেজপূর্ণ ও নিঃশঙ্ক বলিয়া তিনি দেবরদম্পতীর মত ভাঙ্গিয়া পড়িলেন না তা ছাড়া তর্কসিদ্ধান্তের মত ব্রাহ্মণবীরের ও জমিদারের ভ্রাতষ্পুত্র ভবানীর—চরিত্র বলের ভিতর আর এক নূতন প্রকারের সহায় সাহসের সন্ধান পাইয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। সে সব কথা অপ্রকাশ রাখিয়া ভোলানাথের খেদোক্তি স্মরণ করিয়া—সমবেদনার সুরে বলিলেন—

"ঠাকুরপো কেন ও কথা বল্ছ? আমার মাথা গোঁজবার স্থল বা আশ্রয়

স্থল এই শ্বশুরের ভিটা। স্বামী অবর্ত্তমানে দেবর আমার অভিভাবক জেনেই এখানে এসেছি—ভাইএর বাড়ীর কথা বলছ তো তা যদি তেমন হতো তা হলে—আর হলেই বা সেখানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? তোমার মান অপমান আমারই মান অপমান আর আমার মান অপমান তোমারই। যদি আমার বুদ্ধির দোষে একটা বিভ্রাট ঘটেই থাকে তা হলে তুমি আমায় সামলাবে রক্ষে করবে না রাগ করে বাড়ী ছাড়া হতে যাবে? যদি আজ সন্তুর অবিবেচনাতে একটা দুর্ঘটনা ঘট্‌তো তা হলে কি তাকে ফেলে বাড়ীছাড়া হতে ভাই? আমায় মাপ কর—আমার খুব শিক্ষা হয়েছে আর ত্রুটি কখনো হবে না—এখন যাতে সব দিক রক্ষা হয়, তাই করো—রাগ অভিমান করে ঘর ভাঙ্গা ভাঙ্গি ভাল কি?" কথা শুনিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়েই লজ্জিত হইল। এদিকে দেখিতে দেখিতে বাড়ীর প্রাঙ্গণ দুলে বাগদীতে ভরিয়া উঠিল। তর্কসিদ্ধান্ত আসিয়া বলিলেন "ওঠো ভোলানাথ ওঠো মা অন্নপূর্ণা হয়ে এই সব দীন দুঃখী নিরন্নকে পেট ভরে খাইয়ে দেও; তোমাদের আয়োজন সার্থক হোক্—দরিদ্র নারায়ণ এই সব; এরাই অন্নের ভিখারী—দাও এদের আত্মার তৃপ্তি ঘটিয়ে; মহাপুণ্য এতেই হবে—মা—আসল পুণ্যই এই; কলিতে বাউন নেই ব্রাহ্মণ ভোজনও নেই এই সব ভগবানের টুকরো গুলিকে তুষ্ট করে দাও—"

এই বলিয়া তর্কসিদ্ধান্ত নিজের জ্ঞাতি ও শিষ্য কয়জনকে দাওয়ার উপরে খাওয়াইতে বসাইলেন; ভবানীপ্রসাদকেও জোর করিয়া বসান হইল। পঞ্চু ও বিজয় আর দক্ষদেবীর ভাইপো মুটবিহারী নিচে আহুত দুলে বাগদী মুসলমান দিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল।

ভোলানাথ তদ্বৎ অবস্থায় পড়িয়া আছে শুনিয়া তর্কসিদ্ধান্ত তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিলেন; একটু মৃদু ভৎর্সনা করিতেও ছাড়িলেন না। "ভোলানাথ বাবাজী ভাবছো বুঝি গায়ে একঘরে হয়ে থাকতে হবে মেয়ের বিয়ে ছেলের পইতে হবে না! হাঃ হাঃ হাঃ আচ্ছা ছেলেমানুষ বটে! আরে তুমি এক ঘরে, আমি একঘরে, ব্রহ্মঠাকরুণ এক ঘরে মুটবিহারী একঘরে' এতগুলো ব্যক্তি একঘরে হলে তো ভালই হলো হে! ভবানী বাবাজীও বুঝি একঘরে হয় বা!" ভবানী খাইতে খাইতে হাসিল। বলিল "গুন্‌তিতে দেখছি তা হলে আমাদের দশঘরা হয়ে দাঁড়াল তা মন্দ কি?—আমাদেরই একটা সমাজ হয়ে উঠ্‌বে—"।

ভোলানাথ নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ। তার অন্তরপুরুষ সনন্দী ভৃঙ্গী সগণ—

মহেশের কুটীল দৃষ্টি মানস চক্ষে দেখিয়া প্রমাদ কল্পনা করিতেছিল। মাথার উপর দোদুল্যমান তরবারি ও আশে পাশে অঙ্কুশের সুচ্যগ্র মুখ তাহার ভবিষ্যজীবনকে যে অসহ করিয়া তুলিবে এ বিশ্বাস তাহার মনে স্থির হইয়া বসিয়া গেল।

এ দিকে মহেশ ও জীবনের আর একটা গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল। অভিসন্ধিটা —এই ; মর্য্যাদার মূল্য গ্রহণ ও তর্কসিদ্ধান্তকে পংক্তিচ্যুত করণ রূপ দুইটী সত্ব ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মণরা ভোজনে বসিবে, এবং ভোজনকালে—হঠাৎ একটা অছিলা করিয়া গোল বাঁধাইয়া অভুক্ত অবস্থায় সকলে উঠিয়া যাইবে। সেই অছিলাটীও পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ; জীবন ভাবিয়াছিল, এ ফাঁদে তর্কসিদ্ধান্ত পা না দিয়া থাকিতে পারিবে না, কিন্তু মহেশ ও জীবনের সাবধানে বোনা জালটীকে তর্কসিদ্ধান্তের সহজ সরল বুদ্ধি ও তেজশক্তি একেবারে অবলীলাক্রমে মাকড়সার জালের মত ফাঁসাইয়া দিল। তাহাদেরই জন্য আহৃত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যে শেষে অন্ত্যজ কাঙ্গাল গরীবদের উদর পূর্ণ করিবে এ কথা তাহারা ভাবে নাই। নবীন গাঙ্গুলীর আটচালায় বসিয়া সমবেত ব্রাহ্মণরা আর একবার ডাকিলেই যাইব এই মৎলব করিয়া পথ চাহিয়া বসিয়া-ছিল নিশ্চয়ই তর্কসিদ্ধান্ত বা ভোলা তাহাদের পায়ে ধরিতে আসিবে। পঞ্চুকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া জীবন ও ঈশান মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, কিন্তু পঞ্চু কোনো দিকে মুখ না ফিরাইয়া সোজা চলিয়া গেল, এবং সোজা ফিরিয়া আসিল সঙ্গে কতকগুলা দুলে বাগদীর ছেলে বুড়া লইয়া! জীবন চালিয়াৎ লোক, বুঝিয়া লইল ব্যাপারটা কি! সে সকলকে বুঝাইয়া দিল পঞ্চুর এই রহস্যময় গতিবিধির অর্থ কি!

জয়রাম গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল "দেখ্‌লে ভোলা ব্যাটার কাণ্ড হে! ব্রাহ্মণের নামে উৎসৃষ্ট অন্ন কি না দুলে বাগদীর সেবায় লাগালে—"। ঈশেন বলিল—"ভো-ভোলার এটা চাল নয় বুঝলে গাঙ্গুলী ; এতে স-সত্যি বলতে কি ভট্‌চার্জ্জের দা–দা—দাদার হাত আছে—সে—সে -ম্লেচ্ছ পণ্ডিত কি ভায়া সাধ করে নাম দিইছি!" সকলে নির্ব্বাক। যে কয়জন অভুক্ত দ্বিজবর সন্তান—শেষ পর্য্যন্ত আশা রাখিয়া উদরদাহ নীরবে সহ্য করিতেছিল তাহারা চটিল—ঈশেন জীবনের উপর! অনাহারের যুগে অলক্ষীর কৃপায় যাহারা ভাল খাওয়ার মুখ বড় দেখিতেই পাইত না যদি বা ভাগ্যে একদিন জুটীল তা এদেরই কুটীল কুচক্রে সব পণ্ড হইয়া গেল। তাহারা ছেলেগুলার নড়া

ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া মনে মনে—মহেশ জীবন ঈশেন, জয়রাম অ্যাণ্ড কোঃ কে গাল দিতে দিতে বাড়ী চলিয়া গেল। পরে এই সূত্রেই উহাদের মধ্যে একটা সিভিলওয়ার পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

পাগল

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

ভারতময় বিশ্বজয়ী পাগল আজি জেগেছে,
পাগল-মায়া-কাজল ছায়া নয়নে সব লেগেছে।
ভুলেছে সাজ ছেড়েছে লাজ প্রেমের মহা-মিলনে,
প্রেমের হাটে যোগের নাটে ত্যাগের অনুশীলনে!

পিনাক-পাণি পিনাক টানি' প্রলয়-স্বর ধ্বনিছে,
আকাশে ঘিরি' বাতাসে ফিরি' প্রলয়-শ্বাস শুনিছে।
অট্টহাসে ভুবন ত্রাসে নিদ্রা গেছে টুটিয়া,
ছাড়িয়া গেহ ভুলিয়া মোহ এসেছে সবে ছুটিয়া।

টুটিয়া বাধা ছিঁড়িয়া বাঁধা ছুটিছে দিক্ বিদিকে,
আঁধার-পথ উজলি' শত প্রেমের দীপে নিমিখে।
নিরাশাহত শ্রবণে কত শুনা'য়ে আশা-কাহিনী,
মুক্তকারা বাঁধন হারা চলেছে আশা-বাহিনী।

জ্বালা'য়ে প্রাণ করিছে দান আলোক ঘোর আঁধারে
মরণে পূজি' পেয়েছে খুঁজি জীবন মরু পাথারে।
বেদনা দিয়া ভরিয়া হিয়া সুখের হাসি হাসিছে
ভুলিয়া হেলা নিঠুর খেলা সবারে ভাল বাসিছে।

ভুলেছে ভয় করেছে জয় মানব-আঁখি-ভ্রূকুটি,
রাজাধিরাজ দিয়াছে সাজ ললাটের জয়-বিভূতি।
শ্মশান-শিখা দীপ্ত লিখা ভাতিছে সব নয়ানে,
বিশ্বজয়ী মহিমময়ী দীপ্তি হাসি বয়ানে।

মিথ্যা আজ পেয়েছে লাজ সত্য-শিব আলোকে,
দ্যুলোক-আলো সেজেছে ভালো আঁধার-মায়া-ভূলোকে।
অশিবনাশী শিবের হাসি ভুবন আলো করিল,
দীপ্তজ্ঞানে সবার প্রাণে মোহের তমো হরিল।

পাগল-খেলা শ্মশান-মেলা ল'য়েছে মন লুটিয়া,
রাজার ছেলে রাজ্য ফেলে শ্মশানে আসে ছুটিয়া।
জ্বালিয়া ভালে দৃপ্তজালে সৃজন-লয়-আরতি
চলেছে হিয়া উন্মাদিয়া পাগল-মহাসারথি।

রেবা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্. এ]

১

মাত্র আড়াইবৎসরকাল তার সহিত পরিচয়। আমার একরকম বুড়া বয়েসেই বিয়ে হয়,—তখন আমার বয়স ত্রিশ, আর তার বয়স মাত্র এগার। কিশোরীর সঙ্গে আমার আবার নবীন কিশোর সাজিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমাকে নাকি সত্যই কিশোর বয়স্ক দেখাইত,—কারণ রেবা একদিন বলিয়াছিল—'তুমি কি চিরদিনই এই রকম ছোকরা থাকবে ?'

আমাদের বিবাহের পরেই আমি দূরদেশে চাকরী করিতে গিয়াছিলাম। যেখানে কাজ করিতাম, সে যায়গাটা রেল-ষ্টেশনের খুবই কাছে। আর আমার বাংলোটা ছিল মর্ত্ত্যের নন্দন-কানন। সুন্দর নব-নির্ম্মিত একটী ছোট একতলা বাড়ী, সম্মুখে একটী ছোট ফুল-বাগান। আর বাড়ীর পশ্চাতে অনন্তবিস্তৃত মাঠ সেই দামোদরের কূল পর্য্যন্ত গিয়াছে, অনেক দূরে কালো কালো তিনটা ভীষণদর্শন অভ্রংলিহ পাহাড় দেখা যাইত। আমার ঘরের ভিতর দামোদরের প্রাণস্পর্শী বাতাস দিবানিশি বহিত, কর্ম্মের অবসানে শয্যায় শুইয়া আমি সেই সীমাহারা প্রান্তরের দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া থাকিতাম।

শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলাম বলিয়া আমি প্রথম হইতেই নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর শাসন খুবই কড়া ছিল, বিশেষতঃ আমার মাতার ও জ্যেঠামহাশয়ের। যদিও সগৌরবে অনেক-গুলা মেডাল-সহ ডাক্তারী পাশ করিয়া ছিলাম, তথাপি আমার হৃদয়ের কাব্যের উৎস শুকাইয়া যায় নাই। যোলো হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী নায়িকাগণ আমার মানসমোহিনী হইয়াছিল। তারপর রেবার মুখ দেখিয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম।

ফুলশয্যার সেই নিবিড় গন্ধাঢ্য বাসর-শয্যার কথা মনে করিলে এই প্রৌঢ় বয়সেও যেন আবার নবীনতা ফিরিয়া আসে। সমস্তদিন অভ্যাগত-গণের পরিচর্য্যা করিয়া সুগভীর রাত্রে জ্যেঠামহাশয়ের নিকট হইতে ছুটী পাইলাম। দেহমন তখন বিশ্রাম সুখ প্রার্থনা করিতেছিল। আমার কক্ষের নিকট আসিয়া দেখি—বদ্ধবাতায়ন প্রান্তে কয়েকটী চঞ্চল সকৌতুক মুখ লুকাইয়া 'আড়ি' পাতিয়া আছে। তাহার মধ্যে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কুণ্ডলাও আছে। আমি গম্ভীরমুখে ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিলাম। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। শ্লথবাসা বধূ নবীনা সখীদের আদরের আতিশয্যে উৎপীড়িতা হইয়া তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে তখন অফুটন্ত ফুলের কুঁড়িমাত্র, আর আমি যৌবনরাজ্য পার হইয়া প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি সকৌতুকে সাদরে তার গোলাপগণ্ডে চুম্বন করিলাম। সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। তার ব্যবহারে বোধ হইল যেন দুজনেই দুজনের কাছে অনেকদিন ধরিয়া পরিচিত।

'রেবা, আমায় চিঠি লিখবে ত?'

'তুমি আগে লিখবে, নইলে আমার লিখতে লজ্জা করবে।'

সেদিনের আলাপ এইরূপেই সাঙ্গ হইল। পরদিন প্রাতেই জ্যেঠামহাশয় বলিলেন, 'সুরেশ, তুমি আজই বিকালে কর্ম্মস্থানে বেরিয়ে পড়। কি জানি, সাহেব যদি কোনো গোলমাল বাঁধায়!'

জ্যেঠামহাশয়ের কথার উপর কথা কহিবার শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু তখনও আমার দুইদিন ছুটী মজুত ছিল। আমি যদি থাকিবার ইচ্ছা জানাই, তাহা হইলে হয়ত তিনি মনে করিবেন যে, এরই মধ্যে আমি নবীনা বধূর দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহার মনে এ ধারনা জন্মায়, আমার এমন ইচ্ছা একটুও ছিল না। কারণ এই চারিদিনের ব্যাপারেই আমি

একজন ঘোরতর স্ত্রৈণ কাপুরুষ বলিয়া বাড়ীতে সকলের কাছেই নিন্দিত হইয়াছি। আমি কাল বিলম্ব না করিয়া সেই দিন বিকালেই বিদেশ-যাত্রা করিলাম। আসিবার সময় শুনিলাম, রেবা কাঁদিতেছে। কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা দিবারও সুযোগ পাইলাম না।—পাছে আবার কেহ কিছু বলে। মাও দেখা করিবার সম্বন্ধে কোনো কথা বলিলেন না। কেবল কুণ্ডলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'ছোড়দা, বউদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?'

কথার উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভাদ্রের বিপুল বন্যা তখন দুই চক্ষু প্লাবন করিয়া ছুটিয়াছে।

২

কর্ম্মস্থানে আসিবার দুই সপ্তাহ পরে আঁকা বাঁকা ছন্দে ঠিকানা লেখা তার পত্র আসিল। সে তখন তার বাপের বাড়ীতে। প্রায় একদিন অন্তর আমাদের পত্রালাপ চলিত। চিঠি লেখালিখির ফলে দুইজনেই দুইজনকে বুঝিতে শিখিলাম। আমার হৃদয় তখন একটী বিকচ কুসুমের মত তরুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ রেবাসুন্দরীকে কেন্দ্র করিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই মনে মনে তাহার দাস হইয়া গিয়াছিলাম। তাহার উপর রাগ করিতে পারিতাম না। এক বৎসরের মধ্যে যত বারই তার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, কোন বারেই সে রাগ করিবার অবসর দেয় নাই। জোর করিয়া একবার হাতখানি মুঠোর ভিতর হইতে কাড়িয়া লওয়া, একটী ক্রুদ্ধ বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ, নিবিড় পরিরম্ভণ শিথিল করিয়া একবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া—এই সব ছোট ছোট ব্যবহার-গুলিরও বড় বড় কৈফিয়ৎ দিতে হইত, কথা না বলিলেই অমনি গাঢ় কণ্ঠে সজলনেত্রে বালিকার অনুযোগ—'আমায় তা'হলে ত্যাগ করলে? তুমি আমার উপর রাগ করে থাক কিন্তু আমি যে এক মুহূর্ত্তও তোমার উপর মুখ ভার করে থাকতে পারি না।'

এইরূপে আমার হৃদয় তাহারি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছিল। আমাদের ভালবাসার মাত্রা ছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবিতাম—সামান্য বালিকা একজন প্রৌঢ়কে এত ভালবাসিতে পারে।

ঘন ঘন পত্রালাপে হৃদয়টা বড়ই কোমল হইয়া গিয়াছিল। একদিন চিঠি পাইতে দেরী হইলে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতাম। সে-সব দিনগুলির কথা মনে পড়িলে এখনও সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। সেই ডাকের সময়

পিয়নের আগমন-প্রতীক্ষায় নয়নময় হইয়া পথেরদিকে চাহিয়া থাকা, তারপর হয়ত অন্যান্য চিঠির মধ্যে তার প্রতীক্ষিত চিঠিখানি না পাইয়া ভগ্নহৃদয়ের একটা করুণ অন্তর্বেদনা, তারপর মানসিক সন্দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে চিঠি আসিলে সকল সন্দেহের অবসান হইত বটে, কিন্তু ভাবিতাম—বালিকা চতুরা হইয়া উঠিতেছে।—আমাকে কষ্ট দিবার জন্যই এই সব কৌশল। আমিও দেরীতে উত্তর দিয়া তার প্রতিশোধ লইতে ছাড়িতাম না।

রেবা আমাদের বাড়ী আসিতে পত্রালাপ কমিয়া আসিল। কারণ জ্যেঠা-মহাশয় ও মার শাসনশক্তির উদ্যত দণ্ডটার কথা মনে পড়িলে আমার আর চিঠি লিখিতে প্রবৃত্তি হয়না।

দীর্ঘ একবৎসর পরে এইরূপে আমাদের পত্রালাপের ক্ষীণ সম্বন্ধটুকুও একেবারে ঘুচিয়া গেল। প্রথমে বড়ই কষ্ট হইত, কিন্তু কালের অমৃত প্রলেপে কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া বোধ হইত না, সবই সহিয়া গেল।

অনেকদিন পরে একখানা খুব ক্ষুদ্র চিঠি আসিল। তাহা এই—

"প্রিয়তম, শুধু একবার এসো। অনেক কথা আছে। তুমি যদি আমার অন্তর্য্যামী হও তো কেন ডাকিতেছি বুঝিয়া নিও। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও ভালবাসা নিও। ইতি তোমারি রেবা।"

মনে বড় কষ্ট হইল। গৃহে যাইবার সময় একটা সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। সুযোগ জুটিল।

৩

গভীর রাত্রে দুইজনে বিশ্রমালাপ করিতে ছিলাম।

"কেন, তোমার কিসের কষ্ট আমায় বল।"

"আমার কিছু কষ্ট হয়নি গো,—বড় পেটের অসুখ করতো কিনা, তাইতে রোগা ও কালো হয়ে গেছি। কেন, আর কি পছন্দ হচ্ছে না?"

আমার রাগ হইল। নিদ্রার ছল করিয়া শুইয়া পড়িলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থসিয়া রহিল। শেষে একেবারে হুড়মুড় করিয়া আমার বুকের উপর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত পড়িয়া বলিল, "তা হলে আমায় ত্যাগ করলে? আর ও-কথা বলবোনা, এইবারটী আমায় ক্ষমা কর, তোমার পায়ে ধরছি।"

অভিমানের ক্ষুদ্র ঝড়টী কাটিয়া গেলে জানিতে পারিলাম যে আমার অবর্ত্তমানে তাহার উপর নির্য্যাতনের মাত্রাটা খুবই বেশী করিয়া হইয়া গিয়াছে।

সে আর কাহারও উপর রাগিতে জানে না বটে, কিন্তু শৈশবে মাতৃহীনা বলিয়া তীব্র অনুভূতিসম্পন্না; দুঃখের মাত্রা ভাল করিয়াই অনুভব করিতে পারে। বাড়ীতে কোনও কাজ অসম্পন্ন বা অসম্পূর্ণ থাকিলে তার জন্য দায়ী রেবা। আমাকে চিঠি লিখিলে বাড়িতে বুঝিবে যে স্বামীর কাছে সে অভিযোগ করিতেছে। সুতরাং তিরস্কারের প্রখর জ্বালাটা তাহাকেই দগ্ধ করিত। নীরবে সে সব সহ্য করিতে পারিত, কারণ সে যে মাতৃহীনা।

আমি সব শুনিলাম। গৃহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীগুলিও আমার পক্ষে অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলিয়া মনে হইত। হিন্দু-সমাজের বজ্র-বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রাণমন বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইত। সাধারণতঃ হিন্দুর গৃহে বধূর অবস্থাটা বিশেষ প্রীতিকর নয়। আমার ক্ষেত্রেও প্রতিবিধানের কোনই উপায় ছিলনা। তাই তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া আবার চলিয়া আসিলাম। দুঃখের অন্ধকারও তার মুখে সরম হাস্যের তরল জ্যোতিঃ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলাম।

সমস্ত কাজেই আমার উপর তাহার একান্ত একটা নির্ভরশীলতা দেখিতে পাইতাম। আমি যে কাজ অনুমোদন করিতাম না, বা পছন্দ করিতাম না, সে তাহা কখনও করিতে চাহিত না। কোমল-বয়স্কা বলিয়া সে তার কিশোর ধর্ম্ম এখনও ভুলিতে পারি নাই, তাই এত মান-অভিমানের পালা। দ্বিতীয়ার চন্দ্রেরমত তার ছোট কপালতটে চূর্ণকুন্তলের অলস ক্রীড়া, সেই কখনো গম্ভীর, কখনো হাস্যোজ্জ্বল মুখের অপরূপ সৌন্দর্য্য সেই চম্পকবর্ণনিন্দী সুগৌর করযুগের কোমল আকর্ষণ, সেই কিশোরমুখে যুবতীর মত প্রণয়-নিবেদন সমস্তই আমাকে মুহ্যমান করিয়া রাখিত। আমি অবাক হইয়া শুধু চাহিয়া থাকিতাম। বেশ বুঝিতাম—পরস্পরে পরস্পরের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আমার বা তাহার উদ্ধারের একটুও উপায় ছিলনা। একদিন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

"একটা কথা বলবো, ঠিক উত্তর দেবে ?"

"এমন কি কথা আছে যা তোমায় এপর্য্যন্ত বলিনি ?"

"আচ্ছা, আমি মরে গেলে আবার বিয়ে করবে ?"

"যদি বলি—হাঁ, তাহলে বিশ্বাস করবে ত ?"

"না।"

"তবে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে ?"

"কি জানি কেন, হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন কেঁপে উঠলো।"

বাহিরে চৈত্র পূর্ণিমার আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। আমার নিবিড় আদরে তার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিলে মনে হইত—সমস্ত পৃথিবীটা সঙ্গীতের সুকুমার ছন্দে ভরিয়া গিয়াছে। তখন বুঝিতাম—সে এ জগতের নয়। একটা অপার্থিব সুর কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়া এই মানব-লীলা ভূমিতে আসিয়া হঠাৎ যেন মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়াছে।

৪

আর একটী দিনের কথা মনে পড়িতেছে। শুনিলাম সে মরণাপন্ন ব্যাধিতে শয্যাশায়িনী হইয়া আছে। সে আমাকে দেখিতে চাহিয়াছে। আমি ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম। একটি স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় যখন তার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তখন সে একরূপ অচৈতন্য হইয়া আছে। একটী ছিন্ন জীর্ণ শয্যায় সে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া আছে। পার্শ্বে কতকগুলি রজনীগন্ধা ফুল। সমগ্র কক্ষটী যেন একটা প্রশান্ত তৃপ্তির ঘোরে গম্ভীর হইয়া আছে। আমি গিয়া বসিতেই তার মোহের ঘোর কাটিয়া গেল। সে বলিল, "এসেছ? বসো—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ বড় আনন্দ হচ্ছে, এমন আনন্দ কখনো পাইনি। এসো, তোমায় একবার ভাল করিয়া দেখি।"

"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। তোমার ত অসুখ সেরে গেছে।"

অসুখ সারিবার কথা শুনিয়া সে হাসিল। শুধু বলিল, "আমায় নিয়ে তোমরা একদিনের জন্য সুখী হতে পারোনি, এইবার নিজের চোখে দেখে ভাল দেখে বিয়ে করো। বল, আমার এই কথাটা রাখবে?"

"ছিঃ ছিঃ, কি বলছো সব? তুমি একটু ঘুমোও দেখি।"

"ঘুমুবো?—সে একেবারে। আমার শুধু আজ এই দুঃখ হচ্ছে যে আমার জন্য তোমাকে অনেক সইতে হয়েছে। বলো, আমার সব দোষ ক্ষমা করলে? বলো—"

"ও সব কথা বললে আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারবো না। তুমি একটু চোখ বুজে শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

রোগের যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিতে পারা যায় না। শুধু বারবার আমার স্নেহশীতল করতলটী নিজের জ্বর-তপ্ত কপালে দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। নিতান্ত অসহায়ের মত সে একবার আমার ক্রোড়ের মধ্যে তার চুলে-ভরা সুন্দর সমস্ত মাথাটী লুকাইল। যেন সমস্ত জগতের মধ্যে সেইখানেই তার একমাত্র আশ্রয়স্থান। কিন্তু আমাদের

সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রায় পক্ষাহকাল দারুণ রোগযন্ত্রণা সহিয়া সে নীরবে জগতের নিকট হইতে বিদায় লইল। কিন্তু আমার নিকট হইতে তাহার বিদায় লওয়া হয় নাই। জগতে এরূপ ঘটনা ত নিত্যই ঘটিতেছে। কোন্ অজ্ঞাত দেশ হইতে স্বপ্নের মত আসে, আবার কোন্ অজ্ঞেয় রাজ্যে স্বপ্নের মত চলিয়া যায়। তার শেষ স্মৃতি শীঘ্রই আমাদের বাড়ী হইতে মুছিয়া গেল। বিবাহের সহস্র অনুরোধ এড়াইয়া আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

তার জন্য একটুও দুঃখ হইত না আমার। তাহাকে ত একদিনের জন্যও কম ভালবাসি নাই। সুতরাং আক্ষেপ করিবার কিছুই ছিল না। তাই চোখ দিয়া একটুও জল বাহির হইত না। কেবলি সেই মৃত্যু বাসরের পবিত্র শুদ্ধ মুহূর্ত্তটী মনে হইত। সে দিন তাহাকে বলিয়াছিলাম যে তাহার কাছে ফিরিয়া যাইতে আমার একটুও বিলম্ব হইবে না। নন্দন-লোকের সুন্দর রাজ্য হইতে সে স্নিগ্ধ সজল নেত্রে আমার দিকে এখনও নিশ্চয় চাহিয়া আছে, চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে যে তার শূন্য আসন এখনও শূন্য পড়িয়া আছে, তৃপ্তির ও প্রীতির প্রশান্তগর্ব্বে নিশ্চয়ই তার কিশোর হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে, আর সে নিশ্চয়ই এই কথা ভাবিতেছে এখনও তার কাজ সারা হলোনা কেন? আমাকে যে সব দিয়েছিল, সে এখনও কি নিয়ে ধরাধামে বেঁচে আছে?'

কিন্তু ভগবান্ যে মুমূর্ষুকেও বাঁচাইয়া রাখেন!

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিনের কথা আজও বেশ মনে পড়ে। ট্রেনের সেই কামরায় কত লোকই যে আমরা একত্র হইয়াছিলাম, কিন্তু সকলকার মনের ভাব কত বিভিন্ন রকমেরই না ছিল। আমরা তিনজন মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলিতেছিলাম বটে, কিন্তু হৃদয়ে কত ভাবেরই না আলোড়ন হইতেছিল। আমি সারাটা পথ ইহাই ভাবিতেছিলাম এই শিখদলের লোকেরা না জানি কিরূপ ধরণের হইবেন, ইহাঁদের শিক্ষা দীক্ষা কিরূপ; অনেকেরই বয়স শুনিয়াছিলাম

৩০ বা ৩০ এরও ঊর্দ্ধে, ইঁহারা সকলে আমায় কিরূপ চক্ষে দেখিবেন, (কারণ আমার বয়স তখন মাত্র ২২ বৎসর ছিল,) আমি গিয়া ইঁহাদের মধ্যে কোনও আমল পাইব কি না, এত বড় উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে কোন্ উপায়ে আমরা সুসংযত করিয়া আমাদের অভীষ্ট সাধন করিব ইত্যাদি শত শত প্রশ্নের আন্দোলনে সারাটা পথ আমার অন্তরে অন্তরে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আনন্দস্রোতও মর্ম্মের অন্তস্তল দিয়া যেন অজ্ঞাতসারেই বহিয়া যাইতেছিল, মনে হইতেছিল বুঝি এইবার জীবনের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল, যুগ যুগান্তের তিমির বুঝি এইবার অপসারিত হইবে, কিন্তু,—কিন্তু আর একটি কথা ভাবিতেই যেন শঙ্কায় একটু শিহরিয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু বাঙ্গলা আজ কত পশ্চাতে! বাঙ্গলার শত সহস্রবৎসরের কলঙ্ক কালিমা যেন জমাট বাঁধিয়া আমায় প্রতিনিয়তই খোঁচা মারিত। তাই আমার বড় সাধ ছিল বাঙ্গলায় গিয়া কাজ করা, কিন্তু থাক সে কথা।

লুধিয়ানা ছাড়িয়া আর একটি ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম। কায়তারসিং "বুলেটিন" নামের একটি সংবাদপত্র কিনিলেন। কাগজে দেখিলাম কলিকাতায় মুসলমানপাড়া লেনে এক ভীষণ বোমার কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। পড়িলাম গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটিসুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বসন্তচাটুর্য্যের বাড়ীতে দুই তিনটা বোমা ফেলা হইয়াছে, একজন হেডকনষ্টেবলের পা উড়িয়া গিয়াছে, কয়একজন আহত হইয়াছেন, ঘরের খানিকটা দেয়াল ভাঙ্গিয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, ঘরের ভিতরের অনেক সাজ সরঞ্জাম ছিটকাইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে, বাড়ীর সম্মুখের ল্যাম্প-পোষ্ট চুরমার হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু বসন্তবাবু এযাত্রা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। খবর পড়িয়া অনেক কথাই বুঝিতে পারিলাম; পাঞ্জাবের কথা বলা শেষ হইলে বাঙ্গলার তদানীন্তন অবস্থার আলোচনাকালে এ সকল বিষয় যথাযথ ভাবে লিখিব ইচ্ছা আছে।

এই সব বোমা ফাটার ফলে ভারতের চারিদিকে দেশ-ভক্তদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। সকলেই, অন্তত অনেকেই মনে করিত এগুলি এক বিরাট বিপ্লবআয়োজনের বহিঃপ্রকাশ ও ইহার ফলে সকলের মনে ঐরূপ দল গঠনের বাসনা জাগরিত হইত। কায়তারসিং খবরটি পড়িয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কেবল চোখে চোখে চাওয়া চাই-ই হইল, ও পরস্পরের নয়নকোণে আনন্দের এক আভাস পাওয়া গেল। এইরূপে আমরা জলন্ধর ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম। ষ্টেসনে কায়তারসিংএর কয়েকজন ছাত্রবন্ধু অপেক্ষা করিতে

ছিলেন। ইঁহাদের যাহার সহিত যা কথা ছিল হইয়া গেলে আমরা রেলের লাইন পার হইয়া অদূরের এক বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে এই দলের কএকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন ইঁহাদের দেখিয়া মনে একটু ভরসা হইল যে ইঁহাদের মাঝে আমি নেহাত ছেলে মানুষটি হইব না, কারণ ইঁহাদের কাহারও বয়স খুব বেশি বলিয়া মনে হইল না। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কারতার সিং, পৃথ্বী সিং, অমর সিং, রামরাখা ও আরও বোধ হয় কেহ একজন ছিলেন। কারতার সিংএর বয়স তখন ১৯।২০ বৎসরের বেশি হইবে না অমর সিং ও পৃথ্বী সিং দুজনেই রাজপুত তবে বহুদিন যাবৎ পাঞ্জাবেই বসবাস করিতেছিলেন। ইঁহাদেরও বয়স ২৪।২৫এর বেশি বলিয়া মনে হয় নাই। রামরাখা বোধ হয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ইঁহারও বয়স ঐরূপই ছিল। ইঁহারা সকলে রাসবিহারীর সহিত দেখা করিবার আশায়ই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুটি ইঁহাদের সকলের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি অবশ্য প্রথমে কাহারও নামধাম কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই, প্রসঙ্গক্রমে সকলেরই নাম জানিতে পারিয়াছিলাম। আমাদের দলে ঐরূপ অনুসন্ধিৎসাকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম এবং ঐরূপ নামধাম জিজ্ঞাসা করা একবারেই অনাবশ্যক মনে করিতাম। বন্ধুটি এই বলিয়া ইঁহাদের সহিত পরিচয় করাইলেন যে রাসবিহারী বিশেষ কারণে এখন আসিতে না পারায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ যিনি তাঁহাকেই পাঠাইয়াছেন। কারতার সিং বলিলেন আমরা কিন্তু রাসবিহারীকেই চাই। আমি ইঁহাদের বুঝাইয়া দিলাম যে এখানে আসিবার পূর্ব্বে এখানকার অবস্থা তিনি ভালরূপ জানিতে চাহেন আর এ ছাড়া তিনি এখন এরূপ অবস্থায় আছেন যে আরও কিছুদিন এ দিকে আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। পরে আমি ইঁহাদিগকে পাঞ্জাবের সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা কত লোক আছেন, তাঁহারা কিরূপে মেলামেশা দেখাশুনা করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নেতা কে ইত্যাদি। আমি বলিলাম "আপনাদের যিনি প্রকৃত নেতা তাঁহার সহিতই আমরা আলাপ পরিচয় করিতে চাই।" অমর সিং বলিলেন "দেখুন আমাদের মধ্যে প্রকৃত নেতার বিশেষ অভাব সেই জন্যই আমরা রাসবিহারীকে চাই, এখানে আমরা যে কয়জন আছি তাঁহাদের কাহারই অভিজ্ঞতা বড় বেশি নাই, সেই জন্যই আমাদের কার্য্যের কোনই শৃঙ্খলা হইতেছে না। আমরা বাঙ্গলার সাহায্য নিতান্তই প্রয়োজন মনে করি; বাঙ্গলা দেশে আপনারা বহুদিন যাবৎ কার্য্য

:করিয়া আসিতেছেন, এসব কার্য্যে আপনাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হইয়াছে। কারতার সিং ও ইহা স্বীকার করিলেন বটে তবে অমর সিংকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "দেখো ভাই ঐইসে হিম্মত কি‍ঁউ হারতে হো দেখ্‌লে না কামকে ওয়াখত পর তুম হারেই ভিতরসে কিতনে ছিপে হুয়ে রুশতম নিক্‌লেঙ্গে।" অর্থাৎ "কেন ভাই এইরূপ আত্মবিশ্বাস হারাইতেছ, দেখিবে কার্য্যক্ষেত্রে তোমাদের মধ্য হইতেই কত বীর আত্মপ্রকাশ করিবেন।" সেদিনকার সকল কথাবার্ত্তা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বিরাট কার্য্যে তাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার গুরুত্ব ইঁহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন এবং নিজেদের অন্তরে অন্তরে শক্তির কিছু অভাব বোধ করিয়া বাহিরের একটা অবলম্বন খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃত কর্ম্মী যদি কেহ থাকেন তো সে কারতার সিং। ইঁহার মধ্যে যেরূপ আত্মবিশ্বাস দেখিয়াছি সেরূপ আত্মবিশ্বাস না থাকিলে কাহারও দ্বারা কোন বড় কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না। অনেকের মধ্যেই অহঙ্কারের ভাব থাকিলেও এরূপ আত্মবিশ্বাসের ভাব বড় বেশি পাওয়া যায় না। অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস দুইটি পৃথক জিনিষ; অহঙ্কার অন্যকে খোঁচা দেয় কিন্তু যে অহঙ্কার অন্যকে খোঁচা না দিয়া নিজের প্রাণে শক্তির অনুভূতি জাগায় তাহাই আত্মবিশ্বাস।

যাহা হউক ইঁহাদের নিকট পাঞ্জাবের অনেক অবস্থা জানিতে পারিলাম। তাহার অনেক কথাই পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে ইঁহাদের বিপ্লবায়োজনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন হইল পাঞ্জাবের শিখ সৈন্য। কারতার সিংএর নিকট শুনিলাম যে আমেরিকা প্রত্যাগত শিখদের সর্ব্ব প্রথম দলেই তিনি এ দেশে আসিয়াছেন এবং সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই কার্য্যের আয়োজন করিতেছেন ইত্যাদি।

পরে কারতার সিং আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাঙ্গলা দেশে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কতদূর সাহায্য করিতে পারে? বাঙ্গলা দেশে কত হাজার বন্দুক সংগ্রহ হইয়াছে ইত্যাদি।"

আমি বলিলাম "আপনার কি মনে হয়? বাঙ্গলা দেশে কত অস্ত্রশস্ত্র আছে?"

কারতার সিং—"আমরা ত মনে করি বাঙ্গলা দেশ যথেষ্ট অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে কারণ বাঙ্গলা ত বহুদিনযাবৎ এই বিপ্লবায়োজন করিয়া

আসিতেছে এবং আমাদের দলের পরমানন্দের কোন বাঙ্গালী-বন্ধু তাঁহাকে ৫০০ রিভলভার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পরমানন্দ সেই জন্য বাঙ্গলা দেশেই গিয়াছেন।"

আমি—"দেখুন পরমানন্দকে যে কেহ ঐরূপ বলিয়াছেন তিনি কোন বাজে লোক হইবেন। কারণ বাঙ্গলা দেশের কোথাও কেহ ৫০০ রিভলভার বাহির করিতে পারিবেন না। যিনি ঐরূপ বলিয়াছেন তিনি মিথ্যা বলিয়াছেন।"

কারতার সিং—"তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ কিরূপে আমাদের সাহায্য করিবে? বাঙ্গলা দেশেও পঞ্জাবের সাথে সাথেই বিদ্রোহ হইবে কি না? বাঙ্গলা দেশে আপনাদের হাতে কত লোক আছে?" অন্য কোন সময় অন্য কাহাকেও আমরা এ সকল প্রশ্ন করিবার সুযোগ দিতাম না, এবং জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তরে বলিতাম "এ সকল বিষয় তোমার জানিবার কোন প্রয়োজন নাই, ধরিয়া লও কিছুই আয়োজন হয় নাই, তাহা হইলেও এই দলে যোগ দিবে কি না, তোমাকেই সব গোড়া হইতে তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে, এই অবস্থায়ও তোমার এই দলে যোগ দিবার ইচ্ছা হয় কি না? ইত্যাদি।" অবশ্য বাঙ্গলা দেশের কোথাও কোথাও এমনও কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা অনেক মিথ্যা কথা বলিয়া বিপ্লবের বিরাট আয়োজনের মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া দলে লোক সংগ্রহ করিতেন। যাহা হউক কারতার সিং যখন ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন তখন তাঁহাকে উত্তর না দেওয়া সম্ভব হইল না। আমি বলিলাম "দেখুন বাঙ্গলা দেশে যদি আপনাদের মত আমাদেরও সৈনিক বিভাগে ঢুকিবার কোনও সুযোগ থাকিত ত বহুদিন পূর্ব্বেই ভীষণ বিপ্লব হইয়া যাইত। বাঙ্গলা দেশের দল প্রধানতঃ যুবক ও ছাত্রশ্রেণীর লোকদিগকে লইয়া গঠিত, এবং এই দলে আমরা অতি সন্তর্পণে অনেক বাছাই করিয়া এরূপ লোক লই যাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে মরণকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। কাজে কাজেই আমাদের দলে বহুসংখ্যক লোক নাই; বোধ হয় হাজার দুই এর বেশি হইবে না, তবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যেদিন বিপ্লব প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হইবে সেদিন আরও হাজার হাজার লোক আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইবে। যদি পঞ্জাবে বিপ্লব আরম্ভ হয় ত ইহাও স্থির নিশ্চয় জানিবেন যে বাঙ্গলা দেশ সেদিন নিশ্চেষ্ট থাকিবে না এবং ইংরাজকে বাঙ্গলা দেশ লইয়াও এমন বিব্রত থাকিতে হইবে যে রাজসরকারের সকল শক্তি পঞ্জাবে কেন্দ্রীভূত হইতে পাইবে না।" আমি ইহাও বলিলাম "বাঙ্গলা দেশ এখনই ট্রেজারী লুট

অথবা পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ ইত্যাদি অনেক কিছুই করিতে পারে, কিন্তু তারি পর? এই তার পর ভাবিয়াই বাঙ্গলা দেশ ওরূপ কিছু এখনও করে নাই। আমি ইহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইলাম যেন ইহারা আমাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ না করেন। ইহাও বলিলাম "খুব সন্তর্পণে কাজ করিতে হইবে, যেন এত শক্তি ব্যর্থ না হইয়া যায়, শুধু শুধু হই চই করিয়া বাজে কাজে যেন শক্তিক্ষয় না করা হয়।" আমি ইহাদিগকে পরামর্শ দিলাম যেন অধিকাংশ লোককে নিজ নিজ গ্রামে থাকিতে বলা হয়, কেবল নেতৃবর্গও আপাততঃ কাজ চালাইবার জন্য জন কতক লোককে হাতের নিকট রাখা হয়, আর সকলকে যেন কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের উপর এক একজনকে অধিনায়ক করিয়া দেওয়া হয়। তবেই যখন আবশ্যক হইবে তখনই সকলকে পাওয়া যাইবে। এইরূপে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া না পড়েন ত খুব শিঘ্রই সব ধরা পড়িয়া যাইবেন। পরে কারতার সিংকে বলিলাম "আপনাদের মধ্যে কেহ একজন আমার সঙ্গে চলুন আমি তাঁহাকে রাসবিহারী যেখানে আছেন সেখানে লইয়া যাইব। রাসবিহারীর সহিত একসঙ্গে বসিয়া সব ভাল করিয়া পরামর্শ করা যাইবে; ইহাতে ইহারা স্বীকৃত হন এবং ইহাই স্থির হয় যে পৃথ্বি সিংএর সহিত লাহোরে পুনরায় দেখা করিব এবং পরে রাসবিহারীর নিকট যাওয়া ঠিক হইবে।

কারতার সিং আমাদের নিকট কিছু রিভলভার ইত্যাদির সাহায্য চান। আত্মরক্ষা করিবার জন্য ও ছোট খাট ট্রেজারী লুট করিবার জন্য কিছু কিছু অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ইহারা যখন আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিলেন তখন নানা স্থান হইতে কতক কতক রিভলভার ইত্যাদি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, ইংরেজের প্রখর দৃষ্টি সত্বেও সে সব রিভলভার দেশে ঢুকিতে পারিয়াছিল। বালতির তলায় একটি কাঠ অথবা টিনের পাত লাগাইয়া তাহার মাঝখানে রিভলভার ইত্যাদি পুরিয়া আনা হইত কিন্তু অল্পদিন পরে রিভলভার আনিবার এই রাস্তাটি ধরা পড়িয়া যায়; আবার অনেক সময় ভারতের বন্দরে পৌছিবার অব্যবহিত পুর্ব্বেই এগুলি খালাসিদের জিম্মায় রাখিয়া আসিয়া পুনরায় অবকাশ ও সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের নিকট হইতে লইয়া আসা হইত। এইরূপে কিছু কিছু রিভলভার ইহাদের হাতে আইসে। কিন্তু আরও রিভলবারের প্রয়োজন ছিল। আমরা কাশী হইতে কয়েকটি রিভলভার ও গুলি আনিয়া ছিলাম সে সমুদয় কারতার সিংএর হাতে দিয়া দিলাম এবং বলিয়া দিলাম যা হাতের

গোড়ায় ছিল আনিয়াছি পরে আরও কিছু আনা যাইবে তবে ইহাও জানাইয়া দিলাম যে খুব বেশী অস্ত্র শস্ত্র আমাদের হাতেও নাই সুতরাং যেন তাঁহারা বেশী আশা না করেন।

তবে বোমার বিষয় বলিলাম যে বাঙ্গালী ইহাতে সিদ্ধ হস্ত হইয়াছে এবং যতই আবশ্যক হউক না কেন, ততগুলি বোমাই বাঙ্গলা দেশ যোগাইবে। ইহারাও সে সময় এক প্রকারের বোমা তৈয়ারী করিতেন। পাঞ্জাবে শীশার ও পিতলের একরূপ দোয়াত পাওয়া যাইত এই দোয়াত ছিল ইহাদের বোমার খোল। এই সব দোয়াতের মুখে প্যাঁচ ছিল, দোয়াতের ঢাকনা আটিয়া দিলে বেশ ভালরূপেই বন্ধ হইয়া যাইত। আর ইহাদের মসলা ছিল ভুমি পটকার যাহা উপাদান তাহাই, অর্থাৎ পটাশ (ক্লোরেট অব্) ও মোমছাল। আর কাচের একরূপ অতি সূক্ষ্ম শিশি পাওয়া যাইত; ইহাও দেশী তৈয়ারী; ইহারই মধ্যে সালফিউরিক এ্যাসিড্ পুরিয়া ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া খোলের মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হইত; সামান্য আঘাতেই ইহা ভাঙ্গিয়া যাইত অনেক সময় বোধ হয় এই মসলার সহিত চিনিও দেওয়া হইত শিশি ভাঙ্গিয়া যাইলে এ্যাসিড্ পোটাস্ ও চিনির সংযোগে ঐ বোমা ফাটিত ও দোয়াতের টুকরা চারিদিকে ঠিকরাইয়া পড়িত। এই বোমা তেমন মারাত্মক ধরণের ছিল না, অনেক সময় মোটেই ফাটিত না, ফাটিলেও মানুষ বড় একটা ইহাতে মরিত না। আমি ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে বাঙ্গলার বোমা বড় সাংঘাতিক জিনিষ। কারতার সিংকে বলিলাম যে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে আমাদের কতক কতক বোমা রাখা আছে তাঁহারা চান ত দিতে পারি। কারতার সিং সাগ্রহে লইতে প্রস্তুত হওয়ায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার পর তাঁহার সহিত কোথায় দেখা হইবে। উত্তরে তিনি বলিলেন আমি কোথায় থাকিব তাহার কিছুই ঠিক্ নাই। ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনাদের কি কোন কেন্দ্র নাই যেখানে যাইলে সকল খোঁজ পাওয়া যাইবে?" উত্তরে শুনিলাম, না। শুনিলাম ইহারা সকলে বিভিন্ন কাজে চলিয়া যাইবেন, কাজ হইয়া গেলে পুনরায় একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মিলিত হইবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ এইরূপে মিলিত হইতে না পারেন তখন গুরুদ্বারায় খোঁজ করা ভিন্ন অনুসন্ধানের আর অন্য উপায় থাকে না। শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, ভাবিলাম হয়ত আমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করা হইতেছে না। তাই আমাদের অভ্যাস মত আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না আর এর উপর

কোন পরামর্শও দিলাম না। পরে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলে জানিয়াছিলাম যে সত্যই ইঁহাদের এইরূপই অবস্থা এবং তখন তার প্রতিকারও করিয়াছিলাম। এই বাগানে যেখানে কথাবার্ত্তা হইতেছিল সেখানে প্রথমে আসিয়াই আমার মনে হয় যে জলন্ধরে ইঁহাদের বিশেষ কোন আস্তানা নাই, যাঁহারা এখানে উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই জলন্ধরের বাহির হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন, আর এখানে ইঁহাদের এমন কোন আড্ডা ছিল না যেখানে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারি। এইরূপ বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ইঁহারা রাসবিহারীকে আনিতে চাহিয়াছিলেন। যাহাকে ধরিবার জন্য—সে সময় ৭৫০০৲টাকা সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। যাহা হউক এই সব কথা শুনিয়া কারতার সিংকে পরের দিন কোন একটি স্থানে যাইতে বলিলাম, কারতার সিং স্বীকৃত হন। স্থির হইল সেই ষ্টেসনে আসিয়া তাঁহাকে আমি লইয়া যাইব এবং তাঁহার হাতে আমাদের সংরক্ষিত বোমাগুলি দিয়া দিব।

ঘড়ি দেখা গেল, যে যাঁহার কাজে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহাদের ট্রেনের সময় হইয়া আসিয়াছে। আমিও আমার বন্ধুটী একটি হোটেলে গেলাম। দেখিলাম বন্ধুটি মৎস্য মাংস কিছুই স্পর্শ করেন না অগত্যা আমায়ও সে যাত্রা ডাল ভাজিতেই তৃপ্ত হইতে হইল। পাঞ্জাবের তন্দুরের রোটি ও ডাল কিন্তু একটি উপাদেয় জিনিষ (তন্দুর পাঞ্জাবের একপ্রকার উনান)।

আমিও পূর্ব্বে মাছ মাংস কিছুই খাইতাম না, আর কতবার যে এইরূপ খাওয়া ছাড়িয়াছি ও ধরিয়াছি তাহাও বলিতে পারি না। আরও কিছু পূর্ব্বের কথা—একবার হরিদ্বার হইতে লাক্সার জংসনে আসিয়া রাসবিহারীর জন্য (আমরা ইঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম) অপেক্ষা করিতেছি। তিনি বিকালের গাড়ীতে আসিবেন। লাক্সারে একটি ভাল রিফ্রেসমেণ্ট-রুম ছিল আমি হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া রিফ্রেসমেণ্ট রুমে গেলাম। কি চাই বলিতেই "রোটি আর তরকারি লেয়াও" হুকুম করিলাম। পশ্চিমের সুন্দর সুন্দর রুটিও—ওকি,—দেখি মাংস লইয়া আসিয়াছে। তখন জানিতাম না যে তরকারি মানে পাঞ্জাবী ভাষায় মাংস। কি করি বড় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। এখন ফিরাইয়াই বা দি কেমন করিয়া, ইহারাই বা কি মনে করিবে ইত্যাদি ভাবিয়া খাওয়াই স্থির করিলাম। পুনরায় যখন বিকালে রাঙদার সহিত খাইতে বসিলাম, তিনিও রুটি মাংস ফরমাস করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই

আমার দিকে তাকাইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—ও তুমিত মাংস খাবে না বলিয়াই আর একটা হুকুম করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আমি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, থাক্ থাক্ যা আসছে আসুক এবং পরে সকালের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলাম সকালে খাইয়াছি এখন না খাইলে নিতান্ত ভণ্ডামি করা হইবে। রাশুদা কিন্তু বলিলেন "দেখো ভাই, যেন ইহাতে মনে কোন রূপ গ্লানি না হয়।" সেদিন হইতে পুনরায় মাংস খাওয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। মাংস খাই আর নাই খাই এবং বোমা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও আমরা নিতান্ত মাংসাশী জীব ছিলাম না।

যাহা হউক তন্দুরের রুটী ও ডাল খাওয়া হইলে পরিতৃপ্ত ভোজনের পর শারীরিক স্বরাজ লাভ করিয়া আমি কারতার সিংএর বোমা সংগ্রহের জন্য একদিকে চলিয়া গেলাম এবং আমার সঙ্গী বন্ধুটি লাহোরের দিকে রওয়ানা হইলেন। আমি গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া নিজেদের আস্তানায় গেলাম। এইখানে আমাদের যে লোকটি ছিলেন তাহার কাছে অবশ্য আমি পূর্ব্বোক্ত কোন কথাই ভাঙ্গি নাই কেবল এইটুকু বলিলাম যে বোমাগুলি আমার চাই, একটি শিখ্ আসিবেন তিনি সেগুলি লইয়া যাইবেন। শিখের নাম শুনিয়া তিনি একটু বিচলিত হইলেন, বলিলেন দেখিবেন শিখদিগের সহিত একটু সাবধানে মিশিবেন, শিখ্‌দিগের উপর সরকারের আজকাল বড় কড়া নজর ওদের সঙ্গে এখন মেশামেশি না করিলেই ভাল হয়। আমি মনে মনে ভাবিলাম সর্ব্বনাশ একে তো আর বিশ্বাস করা যায় না, থাক এর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। মুখে তাঁহার কথায় শায় দিয়া নির্দ্ধারিত সময় ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যথা সময়ে ট্রেন আসিল, কিন্তু কারতার সিংকে খুঁজিয়া পাইলাম না। সারা ট্রেণ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম কোথাও পাইলাম না, আর একটি ট্রেণের সময়ও দেখিলাম সে ট্রেণেও পাইলাম না। সারা ষ্টেসন খুজিলাম কত লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলাম কিন্তু কাহারও মুখ কারতার সিংহের মুখের সহিত মিলিল না। অগত্যা বাসায় ফিরিলাম পুনরায় যে কারতার সিংএর কোথায় দেখা পাইব তাহা আমিত জানিতামই না ইহাদের দলেরও কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। যেখানকার বোমা সেইখানেই রহিল আমি লাহোর চলিয়া গেলাম। লাহোরে পূর্ব্ব পরিচিতদের সহিত দেখা শুনা করিয়া ইহাদের নিকট হইতেও পাঞ্জাবের খবর লইবার চেষ্টা করিলাম। এইরূপে বিভিন্ন সূত্র হইতে নানারূপে যাহা সংগ্রহ

করিলাম তাহার অনেক কথা আপনাদের বলিয়াছি। সন্ধ্যাবেলা লাহোরে একটি প্রকাশ্যস্থানে পৃথ্বীসিং আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাকে করতার সিং এর কথা বলিলাম। অবশ্য তিনিও তাঁহার কোন খোঁজ দিতে পারিলেন না, কাশী যাওয়ার কথায় তিনি বলিলেন যে আরও দিন তিন চারের মধ্যে যাইতে পারিবেন না। স্থির হয় ৫ই ডিসেম্বর :পাঞ্জাব মেলে কাশী যাইয়া পৌঁছিবেন। পরে তাঁহাকে আমি রাসবিহারী যেখানে ছিলেন সেখানে লইয়া যাইব, রাসবিহারী যে ঠিক কোথায় আছেন তাহা আমি ইহাদের নিকট তখনও কিছু প্রকাশ করি নাই। (ক্রমশঃ)

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩১)

পত্র হাতে বাহিরে আসিয়া ব্রজেন্দ্র হেমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"এ-পত্র সে কাকে দিতে বলেছে রে ?"

"আপনার হাতে দিতে বলেছে।"

"তোর মাকে দিতে বলেনি ?"

"মার কথা সে তোলেই নি। কেন, বেটি মার সম্বন্ধে কিছু চিঠিতে লিখেছে নাকি ?"

"না—আপাততঃ তোর কাজকর্ম্ম যা করবার আছে সেরে নে। হয়ত সেখানে তোকে আর একবার পাঠাবার দরকার হবে।"

মনিবকে তামাক দেওয়া যে প্রথম ও প্রধান কাজ তারই ব্যবস্থা করিতে হেমা চলিয়া যাইতেই ব্রজেন্দ্র ইজি চেয়ারে শুইয়া চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল।

"তোমার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা নাই, তবু তোমাকেই লিখছি। শুনেছিলুম আমাকে দেখতে তোমার ইচ্ছা হ'য়েছিল। তোমার স্বামীর মুখে তোমার গুণের কথা শুনে আমারও তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল।

বিধাতার ইচ্ছায় সেটা ঘটে ওঠেনি। আর এ চিঠিখানা পড়ে বুঝবে সত্য সত্যই বিধাতার ইচ্ছা ছিল না তোমাতে আমাতে দেখাশুনা হয়। আমি, বড় তাড়াতাড়ি যা মনে আসছে লিখছি, কিছু মনে করনা ভাই—কেন তা এখনি বুঝতে পারবে। মনের যে অবস্থায় লিখছি কেমন করে কলম ধরেছি এটা ভাবলে ও তুমি আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারবে না।

বললে তুমি রাগ করনা, তুমি সাধ্বী, তোমার স্বামীর মুখে শুনেই তোমাকে বলছি, আর তোমার মত সাধ্বীকে ত্যাগ করে যে পরদারাসক্ত হতে পারে, আমি নিজে হীন হলেও তাকে বলবার আমার অধিকার আছে ব'লে বলছি। তোমার সেই ঝুঁটা মাণিকটির জন্য আজ সন্ধেবেলা থেকে আমি একরকম ঘর-বার করছিলুম, এমন সময় ঝি এসে খবর দিলে চোরটির মত সে সদর দরজার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঝড় আর অন্ধকার। পা টিপেটিপে তাকে ধরতে গিয়ে—এত বড় আশ্চর্য্য কথা তুমি বোধ হয় আর কখনও শোননি, শুনেও হয়ত তুমি প্রত্যয় যাবে না। তোমার সেই ঝুঁটা মাণিকটির বদলে দেখি আসল মাণিক আমার পায়ে ঠেকেছে। একথা বেশী বলছি না ভাই পায়েই ঠেকেছে। বারো বৎসর পরে তার অপমানের যে টুকু বাকি ছিল সে টুকু কড়ায় গণ্ডায় তাকে চুকিয়ে দিয়েছি। হায়! সে যদি আমাকে চিনতে পারে তার লাথীতে আমার দাঁত কটা ভেঙে আমার লাথীর জবাব দিয়ে চলে যেতো! কিন্তু সে যায়নি, আমি যেতে দিইনি, তার পায়ে ধরে অনেক করে ঘরে এনেছি।

পূর্ব্বের বালক যুবা হয়েছে;—কিছু পরিবর্ত্তন, তবু আমি তাকে দেখামাত্র চিনলুম। কিন্তু সে চিনতে পারলে না। এখনও পারেনি, বুঝি পারবে না। আজ আমার গৃহ প্রবেশের দিন—সে আজ আমার ঘরে কোন্ বিধাতার কি লিখনে বামুন হতে এসেছে—তার সুমুখে সাধ্বী এক ঘটি জল পর্য্যন্ত ধরতে আমার সাহস হচ্চে না—বুঝি তাও সে খাবে না।

তোমার স্বামী আসতে পারেনি সে একরকম ভালই হয়েছে। হেমাকে ভিতরে আসতে দিয়েছি, তাঁকে দিতুম না। এসে সারারাত তাঁকে আমার সদর দোর আগলে থাকতে হ'ত। এ প্রচণ্ড ঝড় নিজে ওকালতী করলেও আমার ঘরে তাঁর স্থান হ'ত না।

হেমা তাঁর চিঠি এনে আমাকে দেখিয়েছে। তিনি যা লিখেছেন তার একটিও আমি বিশ্বাস করিনি। হয় তিনি ঝড়ে আসতে সাহস করেন নি, নয়

তুমি তাঁকে কোনও মতে আস্‌তে দাও নি। না দিয়ে ভালই করেছ ! কিছু মনে ক'রনা ভাই, আলাপ পরিচয় যা কিছু করবার তা এই চিঠি দিয়েই করা গেল। কোথায় বুঝি সে পয়সার জন্যে গিয়েছিল, ঘুরে বুঝি ক্লান্ত হয়েছিল, একটুখানি বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হেমাকে দেখিয়েছি।

সাধ্বী, তোমার শোনা উচিত নয় ব'লে এ পাপিষ্ঠা কুলত্যাগিনীর কাহিনী তোমাকে শোনালুম না। তবে, যখন ছিল, তখন আমার কুল তোমাদেরই মত উজ্জ্বল ছিল। আমার স্বামী তোমাদেরই পাল্‌টি ঘর। তবে সে বড় গরীব, কিন্তু আমি ? কালই যে সুদ আন্‌তে তোমার স্বামীর হাতে পনর হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়েছি। আর তার গায়ে যখন পা ঠেকিয়েছি, তখন আমার গায়ে অন্ততঃ দুহাজার টাকার অলঙ্কার।

ইচ্ছা নয় এ চিঠি তিনি দেখেন, কেননা কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আমার দরকার—বিশেষ দরকার। তবে যদিই তুমি তাঁকে দেখাও, আর এ চিঠি দেখে যদি এখানে আস্‌তে তাঁর সাহস না হয়, তা হ'লেও আমার মাথার দিব্যি দিয়ে শেষবারের মত, আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে ব'ল। তাতেও যদি তিনি আস্‌তে না চান, তা হ'লে ও' কাগজ কখানা আমাকে ফিরিয়ে দিবার তাঁর আর প্রয়োজন নেই। ও সমস্ত টাকা, ভাই আমি নালু বাবুকে দান করলুম। ইতি

শ্রীমতী——

হায় স্বামীর নামেই অভাগিনীর নাম ছিল।

পুঃ যদি কাউকে এ কথা জানাও একমাত্র তোমার স্বামীকে জানাইতে পার। মাথা খাও, যেন তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা জানিতে না পারে। আমি নির্লজ্জ, সুতরাং এ কথা জানিলে আমার আর কি ক্ষতি হবে—শুধু সেই গরীব ব্রাহ্মণটির জন্যই বল্‌ছি।

চিঠিপড়া শেষ করিয়াই ব্রজেন্দ্র চোখ বুজিল, মুক্তদৃষ্টিতে পাছে নিজের মসীরেখাঙ্কিত মুখখানা দৈবযোগে দেখিতে পাইয়া সে শিহরিয়া উঠে। হেমা গড়গড়া লইয়া প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিল। মনে করিল, বাবু ঘুমাইয়াছে। সে ডাকিল—"বাবু!"

চোখ বুজিয়াই ব্রজেন্দ্র বলিলেন—"গড়গড়া রেখে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয়।"

ঠিক এমনি সময়ে ঝি সরি সেখানে আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—

"বাবু! মা জানতে পাঠিয়ে দিলে ভট্টাচাজ্জি মশাই আজও যদি না আসেন, তা হলে নারায়ণ পুজোর কি হবে?"

"আমাকেই করতে হবে।"

হেমা আবার বলিল—"সত্যি সত্যি তাকে আর ঠাকুর ছুঁতে দেবেন না বাবু!"

ব্রজেন্দ্র উত্তর না দিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

চোখের উপর যা দেখছি সব কথা কি আপনাকে বলতে পারি!

এবারেও মনিবের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না দেখিয়া, কথার উপর একটু অভিনয়ের সুর দিয়া যেমন সে বলিল—"সেই সোফার উপর দুজনে—কি আপনাকে বলিব বাবু—"

"থাম্‌না হারামজাদা, চিঠি লিখ্‌তে দে।"

সরি ছুটিয়া পলাইল, হেমাও এবার বুঝিল, বাবুর প্রাণে বড়ই দাগা লাগিয়াছে। সুতরাং আর সে কোনও কথা কওয়া ভাল বোধ করিল না, কেননা বলিলেই বাবুর মেজাজ এইরূপ দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিবে।

ব্রজেন্দ্র লিখিল—"নির্ম্মলা তোমার পত্র আমাকে দেখাইয়াছে। বুঝিলাম, যে কথা গুলা আমার সম্বন্ধে তুমি পত্রে লিখিয়াছ, সেগুলা আমাকে বরাবর বলিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়ায় তুমি পত্রখানা আমার স্ত্রীর নামে পাঠাইয়াছ। পত্রে আমাকে বেশী কিছু বল নাই, বরং আরও একটু জোর করিয়া আমাকে শঠ প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুচারিটি খাঁটি কথা বলিতে পারিলেই ঠিক বলা হইত। পত্র পড়িয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। শুধু তাই নয়, নিজেকে এমনি হীন বোধ হইতেছে যে, তোমার সুমুখে উপস্থিত হওয়া পরের কথা চিঠি লিখিতেও লজ্জা বোধ করিতেছি। তবু তুমি যখন যাইতে লিখিয়াছ, তখন একবার যাইব। যদি আমার দ্বারা তোমার কোনও কিছু সাহায্য হইবার প্রত্যাশা কর, আমি প্রাণপণে তাহা করিব। আদালতে আজ আমার বিশেষ কাজ আছে—যেরূপ দুর্য্যোগ এখনও রহিয়াছে, তাহাতে সকাল সকাল আফিসে যাওয়া বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আফিস হইতে ফিরিবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

পোনেরো হাজার টাকা নালুবাবুকে দিবার প্রয়োজন নাই। বরং তাহা তোমার স্বামীকে দিলে আমি বেশী সুখী হইব।

আগে তোমার কি নাম ছিল পত্র পড়িয়াও ঠিক জানিতে পারিলাম না। বলিয়া শিরোনামা দিলাম না। তোমার স্বামীর নাম ত রাখহরি—তার কি আর কোনও নাম আছে?"

অনুতপ্ত ব্রজেন্দ্র।

চিঠি খামে মুড়িয়া হেমার হাতে দিতে গিয়া, ব্রজেন্দ্র বলিল—"যদি বামুনকে সেখানে দেখতে পাস্, কোনও কথা তাকে বলিস্নি।"

"আমার বলবার দরকার কি বাবু!"

"দরকার থাক্ আর—না থাক্, শোন আমি যা বলছি।"

"আমি তার দিকে চেয়েও দেখবো না।"

"চেয়ে দেখবিনি কেন?"

"কি জানি, দেখলে বাবু, কোন্ দিক থেকে কার আবার রাগ হবে।"

দুষ্ট ভৃত্যটার কথার ভাবে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্রের ক্রোধ হইল, তথাপি সে আপনাকে যথেষ্ট সংযত করিয়া, চিঠির খামখানা পরীক্ষার ছলে মুখ নামাইয়াই বলিল—"আর কারও হোক না হোক আমার হবে। এমন কি পথে যদি দেখা হয়—"

"মুখ ফিরিয়ে চলে যাব।"

"কথা শেষ করতে যদি না দিস্, জুতো মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো।"

ঠিক এমনি সময়ে নির্ম্মলা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল -"কেন গরীব কি অপরাধ করলে যে জুতো মেরে তার মুখ ভেঙ্গে দেবে?"

হেমা বাবুর বাক্যের জুতা ইতিপূর্ব্বে বহুবার খাইয়াছে, সুতরাং সে ইহাতে দুঃখ ক্রোধের কিছুমাত্র নিদর্শন না দেখাইয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কথার কোনও উত্তর না দিয়া হেমার হাতে চিঠি দিয়া বলিল—"যা, এই চিঠিখানা দিয়ে আয়। দিয়েই চলে আস্বি, দেরি করবিনি।"

নির্ম্মলা বলিল—"কাকে?"

হেমা বাবুর মুখের পানে চাহিল। ব্রজেন্দ্রও কিছু অপ্রতিভের মত হইল; সত্যই ত চিঠি যে কাকে দিতে হইবে সে ত এ পর্য্যন্ত হেমাকে বলে নাই।

নির্ম্মলা হেমার হাত হইতে চিঠি লইয়া দেখিল তাতে শিরোনাম নাই। যদিও চিঠি কার এটা নির্ম্মলা কিম্বা হেমা কারও বুঝিতে বাকি ছিল না, তবু নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—

"এ চিঠি কাকে দিতে যাচ্ছিস্‌রে হেমা?"

হেমা বলিল—"বাবু জানে"।

"তোকে এখন চিঠি দিতে হবে না। হালদার বাড়ী গিয়ে ঠাকুর পূজোর একজন বামুন ডেকে আন্‌, যদি ভট্‌চার্জ্জিমশাই না আসে, তাহ'লে পূজো হবে না।"

"কেন, সরি তোমাকে গিয়ে কিছু বলেনি?"

"সরি ত বলেছে। তুমি তোমার মত বলেছ, আমাকে ত আমার মতন করতে হবে। যা হেমা দেরি করিস্‌নি, চিঠি এসে দিলেও চল্‌বে, কিন্তু বামুন না এলে একেবারেই চলবে না, মা ও আমি মুখে জল দিতে পারবো না, বঝেছিস্‌?"

হেমা চলিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র বলিল—"কেন, আমার পূজো কি তোমাদের পছন্দ হবে না?"

"তুমি পণ্ডিত মানুষ, মন্ত্র তন্ত্র সব জানতে পার, কিন্তু বামুনকে যদি ঠাকুর ছুঁতে দিতে তোমার আপত্তি, তুমি নিজে কোন্‌ সাহসে ছুঁতে যাও; ঠাকুর কি তোমার বাড়ীর খানসামা না কি? না পাঁচটা পাশ করে টোরনি হয়েছ ব'লে তোমার কোন কাজ আটকায় না?" বলিয়াই নির্ম্মলা খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। ব্রজেন্দ্রের কোনও কথার অপেক্ষা করিল না।

"দেখো যেন চিঠিখানা শুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলো না।"

নির্ম্মলা চিঠি পড়া শেষ করিয়া বলিল—"তোমার উপর রাগ আর করবো না মনে করেছিলুম, কিন্তু চিঠি পড়ে সত্য সত্যই তোমার উপর আবার রাগ হ'ল। তুমি শঠ প্রবঞ্চক হ'লে কিসে? আর সে মাগী তোমাকে ঝুঁটো বলেছে বলেই তুমি ঝুঁটো হ'য়ে গেলে? তাই এ চিঠি সেই বেশ্যা বেটীকে লিখে পাঠাচ্ছ। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই।" বলিয়াই সে চিঠিখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"তা হ'লে চিঠি তাকে দেবো না?"

"চিঠিত দেবেই না, যাবেও না। হ্যাঁ, তবে একখানা চিঠি তাকে লিখতে পার, আর যাব না বলে। আস্পর্দ্ধার কথা দেখ একবারে ময়লার হাড়ী, বেটী

কিনা বলে তোমায় ঝুটা মাণিক। তোমাকে সে লিখতো, আমি না জানতুম, সে হ'ত এক আলাদা কথা। একটু ধুলো কাদা লেগে উজ্জল রত্ন কিছু মলিন হয়েছে উজ্জ্বল হ'তে কতক্ষণ! তবে টাকা কটার কথা যা লিখেছ, তা ঠিক লিখেছ—রাম রাম! তার দান আমার নালু কেন নিতে যাবে?"

"সেই ভাল, যাবনা বলেই একখানা চিঠি লিখে দেবো। এরকম খবর পেয়ে আর সেখানে যাওয়া আমার উচিত হয় না।" বলিয়াই ব্রজেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

নির্ম্মলা বলিল—"তবে যদি সে নিজে সাহায্য চাইতে তোমার বাড়ীতে আসে তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা।"

"তা কি সে পার্ব্বে নির্ম্মলা?"

"দেখাই যাক্ না। তুমি স্থির থাকতে পারলেই হ'ল।"

"আমি স্থির থাকব, স্থির জেনে রাখ।"

"তবে সকাল সকাল স্নান সের ফেল। রাত্রে ঘুমুতে পারনি, না নাইলে অসুখ করবে!"

অন্যদিন হইলে নির্ম্মলার ছেলে মেয়ে ঘুম হইতে উঠিয়া এতক্ষণ বাড়ীতে কোলাহল তুলিয়া বসিত, আজ এখনও তাহারা উঠে নাই, কিন্তু আর তাদের উঠিতেও বড় বিলম্ব নাই। নির্ম্মলা বাহির বাটীতে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় জানিয়া, ব্রজেন্দ্রকে উঠিতে বলিয়া চিঠির ছিন্নাংশগুলা কুড়াইয়া নীরবে ছেঁড়া কাগজের চুবড়ীর ভিতর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একবার কেবল ব্রজেন্দ্রের গৃহত্যাগের সময় বলিল, তবে চারু তাহার স্বামী সম্বন্ধে যে কথা গোপন রাখিতে বলিয়াছে, তাহা উভয়কেই পালন করিতে হইবে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে যাইবার জন্য ব্রজেন্দ্র সবেমাত্র সিঁড়ির মাথার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় হেমা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল পুরুতঠাকুর আসিতেছে। এরূপ মনিব হইয়াও নিতান্ত অপরাধীর মত ব্রজেন্দ্র তাহার বেতনভোগী দরিদ্র রাখুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইল না। আবার একবার তামাক খাইবার অছিলা করিয়া ত্রস্ত পদে সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। নির্ম্মলা ঘরটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বাহিরে আসিতেছিল। স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"ফিরিলে যে?"

ব্রজেন্দ্রকে আর উত্তর দিতে হইল না, বাহিরে আসিবার জন্য চৌকাটে পা দিতেই নির্ম্মলা দেখিতে পাইল রাখু সিড়িবাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

(ক্রমশঃ)

স্বদেশ-বোধন

(শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত)

আজকে আমার স্বদেশ জুড়ে প্লাবন জেগেছে
প্লাবন ওরে মাতন ওরে পরাণ মেতেছে।
কোন্ নিভৃতে দুঃখ-ঘায়ে জাগ্‌ল ওরে প্রাণ
আজ সে মহা ঝড়ের মত বইছে বেগবান,
বইছে হাওয়া উড়িয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র শাসনে
ঘূর্ণীচাপে চূর্ণ করে শাসক-পীড়নে।
বন্দীবীর-মৌন-বলে বন্দীর অপমান
শক্তি-পশু খর্ব্ব নত ক্ষুব্ধ হতমান।

* * *

আমার দেশে বেদন-বাসে সুখের ভিটাতে
সুধামৃত-সঞ্জীবনী লক্ষ ধারাতে
লক্ষ প্রাণে জাগিয়ে দিল দৃপ্ত সুমহান
নির্য্যাতনে চরণ-তলে দলছে বলীয়ান।
সত্যে তারা সার বুঝেছে ধর্ম্মে রাখে মন
হিংসা দূরে দূর করেছে, মান্‌ছে না পেষণ;
ভয় জিনেছে, ক্লেশ মানে না, দর্প ভাঙে বীর,
অত্যাচারে বক্ষে লহে সৌম্য তেজী ধীর।
অত্যাচারও নির্য্যাতন নদীর যেন জল
তাদের বক্ষ গিরির পরে আছ্‌ড়ে কলকল

চূর্ণ হয়ে ফিরছে পুন, নয় গিরি চঞ্চল ;—
প্রহ্লাদ সে লক্ষ যেন মৌন অবিকল
সত্যে আপন আঁকড়ে লয়ে হাস্যে বরে দুখ
বিজয়ী প্রাণ গুপ্ত জয়ে ফুলিয়ে রাখে বুক।

* * *

আজ্‌কে আমার দেশের পরে শাসক-ফেরুদল
লক্ষ বীরসিংহ পিছে করছে কোলাহল,
সিংহ চলে দম্ভভরে শক্ত চরণে
ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ নাই ক্ষুদ্র কথনে।
সত্য কাছে তুচ্ছ দেহ নির্য্যাতন ও ক্ষীণ,
অত্যাচারে অন্তরে কি করতে পারে হীন ?
দুখের ঘায়ে বেদন-ঘায়ে আলস্ টুটেছে
দেশ-সেবকের আত্মা আজি অজয় হয়েছে।
অত্যাচারী পীড়ন করে পেষণ অবিরাম—
দুখের দাগ কিছু নাহি, ফুল্ল অফুরাণ
লক্ষ বীরে সইছে ধীরে সকল বেদনায়
বাত্যামুখে বজ্রভরা মেঘের গতি প্রায়।
অত্যাচারী অবাক মানে—নীরব নীতি আজ
রক্তলোভী শক্তি তারি খর্ব্বে দিয়ে লাজ।
উদ্যত তার অস্ত্র আজি নুইয়ে পড়িছে
আত্মনীতি ক্ষাত্রনীতি আজকে জিনিছে।

* * *

দেশ জেগেছে প্রাণ জেগেছে শক্তি জাগরূক
বিপদ জিনে আনতে বিজয় আজ সবে উন্মুখ ;
জাগ্‌ল কুলী জাগ্‌ল মেথর জাগ্‌ল যারা দীন
মুছ্‌বে আত্ম-অপমানে, থাকবে কেন হীন ?
বল্‌ উচ্চৈরা—গান্ধীকি জয়, জয় ভারতমাতা
মুক্তি চাহি, মোদের ঘরে আমরা মোদের ধাতা ;

করবে না কাজ নকরি সেবা, অগ্রে চাহে মান,
তাদের স্বাধীন কর্ম্মে কেহ কর্ব্বে না হাত দান।
দেশ-নেতা যায় কারাগারে, ছাত্র তারি পিছে
তার পিছনে বালক ছুটে, বলছে বাঁচা মিছে
দেশ যদি না স্বাধীন হল, বিচার-দিনে বলে
জরিমানা নাহি দিব, পিতায় দিলে পরে
নই সে পিতার তনয় আমি। এম্‌নি ভয় হীন
জাগল যুবা, বৃদ্ধ, শিশু আর কে পরাধীন?
মন ভেগেছে মুক্ত হাওয়ায় মুক্তিপথে রে,
কিসের বাধা?—শাসক বাধা? ভাঙতে হবে যে।

• • •

পুরাঙ্গনা ঘর ছেড়ে আজ সন্তানেরে লয়ে
দেশের তরে সকল দুঃখ মাথার পরে বহে,
মাতা ত্যজেন স্নেহের নীড়ে, ভগ্নী ভ্রাতা ছেড়ে
পত্নী স্বামী সোহাগ ত্যজি আজকে পথে ফেরে,
পরতে বলেন দেশের মোটা সুতোয় বোনা বাস,
দেশকে মনে রাখতে আসে, নিজের পরে আশ।
আলাদিনের অত্যাচারে চিতোর পুরাঙ্গনা
আজকে যেন পুড়তে আসেন দৃপ্তা মহামনা।
আজকে পথে মাকে দেখে ভগ্নীকে আজ দেখে
কে রবে রে অলস ভীরু ঘরেতে মুখ ঢেকে?—
আজকে যেরে ডাক এসেছে দেশমাতারি ডাক
সে ডাক বুকে বুকে গিয়ে বাজায় যেন শাঁখ।
সেবাব্রতে স্বরাজব্রতে পূজায় জাগা প্রাণ,
দীন ভারতের মুছিয়ে আঁখি গৌরব কর দান।
আজো যারা পিছিয়ে আছিস্ আয়রে চলে আয়
কাতর দেশমাতা যে তোর মুখের পানে চায়।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ—

(১) স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু-চারটী কথা।

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

মেয়েদের এই বিবিয়ানীর নেশা কাটাইতে হইবে। এই সর্ব্বনেশে মৌতাত ছাড়াইবার প্রধান উপায় ধর্ম্ম-চর্চ্চা! স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ব্যতীত কি স্ত্রী-পুরুষ কাহারও চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুরণ হইতেই পারে না। জ্ঞানব্যতীত সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় না। আধুনিক মতে যে ইংরাজের সর্ব্বপ্রকার অনুকরণেই চিত্ত-বৃত্তির প্রসারতালাভের উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই ইংরাজের ধর্ম্মনীতি অথবা রাজনীতি এবং সমাজনীতিও যে কতখানি সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সঙ্কীর্ণ রূপেই সংস্থিত, তাহা ইংরাজ চরিত্রাভিজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণের সহিত আলাপে এবং তাঁহাদের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে অনেকেই জানিতে পারেন। আমি এখানে একটী শ্রুত কথার উল্লেখ করিলাম। এক সময়ে মেহেরপুরে চাকরী করার সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুক্ এবং আমার পূজনীয় পিতৃদেব একটা গরমের দিনে কি একটা মোকর্দ্দমার তদারকে গিয়াছিলেন। অনেক ক্রোশ পথ ঘোড়া ছুটাইয়া ফিরিয়া আসিলে একটু বিশ্রামের পর পিতৃদেব ঠাণ্ডা হইবার জন্য মুখে চোখে ও কাণে বারবার ঠাণ্ডাজল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ঐ সাহেবটী আমার পিতার সহিত বিশেষ সুহৃদ্বৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি ওরূপ করিতেছ কেন? ওরূপ করিলে কি শরীরের ক্লান্তি দূর হয়?" পিতৃদেব উত্তর করিলেন "মুখে ও কাণে জল দিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। আপনি করিয়াই দেখুন না।" ইহা শুনিয়া সাহেব অঞ্জলি পাতিয়া জল লইলেন; এবং মুখের কাছে সেই অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়াও গেলেন; কিন্তু তার পরই কি ভাবিয়া সেই জলাঞ্জলি ফেলিয়া দিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "না, আমি এরূপ করিতে পারি না; যেহেতু কোন ইয়োরোপিয়ান করেন না।" স্বদেশীয়ের অসাক্ষাতে এবং এক-জন বিদেশীর সাক্ষাতে অতি সামান্য বিষয়েও নিজ সমাজে অপ্রচলিত এই সামান্য পরানুকরণের দ্বারা নিজের শ্রান্ত শরীরকে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য হইতে এই যে তিনি স্বচ্ছন্দে বঞ্চিত করিলেন, এবং এতবড় সঙ্কীর্ণ মতটাকে প্রকাশ করিতে এতটুকুও দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন না, এর কারণ উহারা জেতার জাতি।

পরের ঠাকুর চাইতে এঁদের নিজের কুকুরটার উপরেও শ্রদ্ধা বেশী। আর সে শ্রদ্ধা প্রকাশকে এঁরা গৌরবের চক্ষে দেখেন; যেহেতু এঁদের মনে আত্মসম্মান বোধ জিনিষটা খুব স্পষ্ট ভাবে জাগ্রত আছে। আর ঐ-টুকুর অভাব আছে বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়ে-পুরুষে নিজের ধর্ম্মকে, নিজের সমাজকে পদে-পদে বিদেশীর কাছেও লাঞ্ছনা-কষাহত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা হইতে অর্দ্ধ প্রবীণ পিতা পর্য্যন্ত সকলেই অর্ব্বাচীন, অজ্ঞ, কুসংস্কারান্ধ। এবং নব্য শিক্ষার মূল-মন্ত্রই এই যে পরানুকরণ করিতেই হইবে। যদি কোন ছেলে একটা ভাল পদ পাইলেন, দুই-চারি শত বাঁধা মাহিনা হইল (আর বিলাতে ফেরৎ হইলে তো আর কথাই নাই।) তৎক্ষণাৎ (অধিকাংশ স্থলে) একটা বাবুর্চ্চি, সাহেব-বাড়ীর-ফেরৎ তক্‌মা লাগান দু'চারিটা খানসামা, একখানা সাহেবি-কায়দায় সাজান বাংলাগোছের বাড়ী (কলিকাতা হইলে সাহেবদের সহিত ভাগ করিয়া চৌরঙ্গী অঞ্চলের সাহেব হোটেল বা ভাড়া-বাড়ীর একটা ফ্ল্যাট) এবং নিজের সাহেবী ও স্ত্রীর শুধু সাড়ীখানা বাদ আর সমস্তই হাল ফ্যাসানের মেমসাহেবের সঙ্গে সমান হিসাবে জুতা, মোজা, ব্লাউস্, পেটিকোটের, চায়না বাসনের গাদা দিয়া নবজীবনের মঙ্গলাচরণ আরম্ভ হইয়া গেল। মেয়েরা যাঁরা তিন পাতা ইংরেজী পড়িয়াছেন, তাঁদের স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ—কোন কিছুরই ঋণ স্বীকার করিতে হয় না; তাঁহারা এবিষয়ে স্থানে স্থানে পুরুষদেরও পরাজিত করিতেছেন। তা মেয়েরা শিক্ষিতা এবং স্বাধীনা হইয়া কি দেশের ও দশের কোন কাজে লাগেন? উহুঃ। সযত্নে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, সে শিক্ষার সাধারণ্যে প্রচার চেষ্টায় দরিদ্রের পর্ণগৃহে এঁদের অভ্যুদয় ইঁহারা কি কখনও কল্পনা করিয়াও দেখিয়াছেন? স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাগ্রহে শিখিয়া প্রতিবেশী দরিদ্রগণকে সে অমূল্য জ্ঞান দানে এঁদের কোনই আগ্রহ আছে? চিকিৎসা-বিদ্যা যথা শক্তি আয়ত্ত করিয়া (বিশেষতঃ হোমিও-প্যাথি ও বাইওকেমিক্ চিকিৎসা) রোগা-তুর দীন-হীন স্বদেশীকে আসন্ন মৃত্যু ও রোগ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষার চেষ্টা ইঁহারা কি জীবনের পুণ্যতম ব্রত রূপে পালন করিতে চাহিতেছেন? লক্ষ-লক্ষ অজ্ঞ স্বদেশীর মুখের অন্নগ্রাস স্বরূপ বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে কি ইঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারিয়াছেন;—স্বদেশীর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকার-কল্পে স্বদেশীয় মহাপ্রাণ নেতার দ্বারা আহূত অনুরুদ্ধ হইয়াও এদেশের সহস্র সহস্র, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী নিজেদের দেহ-বিলাসের এতটুকু ব্যত্যয় ঘটিতে দিয়া, দেশমাতৃকার

সেবাব্রত গ্রহণ করিতে কি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন? না,—কিছু না! কেন? যেহেতু, তাঁদের মধ্যের মনুষ্যত্ব আজ ধর্ম্মশিক্ষার অমৃত-নিষেক অভাবে অচেতন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি মনুষ্যত্ব, তাহা সর্ব্ব-ভূতাধিষ্ঠিত চৈতন্য-শক্তির প্রকাশ। আধার যদি মলিন হয়, অভ্যন্তরের অতি উজ্জ্বল আলোক-রশ্মিও বাহির হইবার পথ পায় না। আমাদের অন্তরের আলোকও আজ তাই আমাদের লোভাতুর চিত্তের ঘন বেষ্টনী মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া, আমাদের অমানুষে পরিণত করিতেছে। আমরা শিক্ষা ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া শুদ্ধমাত্র বৈদেশিক বিলাসিতার সঙ্গে স্বদেশীয় আলস্যময় ভাবে জীবন যাপনকে সংযোগ করিয়া, এক অপূর্ব্ব-সৃষ্ট জীবে পরিণত হইতেছি। ধর্ম্ম আমরা মানি না; ধর্ম্ম আমাদের লোকহিতকর, বা আত্মহিতসাধক নয়, মাত্র আত্ম-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-জ্ঞান। আমাদের না ব্রহ্মতত্ত্ব, না বস্তুতত্ত্ব,—শুধু বিলাসতত্ত্বটাই শিক্ষা হইতেছে ভাল করিয়া। যে দেশে অজীন-শয্যায় বল্কল-বসনে বনবাসিনী ঋষি-পত্নী ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, সে দেশের মেয়েদের আটপৌরে নিত্য সজ্জায় একটা ইজের, গেঞ্জি, একটা সেমিজ, দুইটা পেটিকোট, একটা বডিস্, একটা ব্লাউস্, একখানা (অধিকাংশ স্থলে) শান্তিপুরে, বড়জোড় ফরাসডাঙ্গার ১২ হাতি সাড়ী, একখানা রুমাল, একজোড়া চটিজুতা,—এতো চাইই। আর পোষাকীর হিসাব রাখিতে স্বয়ং একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেলও পারেন কিনা সন্দেহ। নব্য শিক্ষিত পিতামাতার ছেলে-মেয়ের (বেবি ও মিসিবাবার দল) আসনে-বসনে,শয়নে-ভ্রমণে ইংরাজ-বাচ্চার সহিত বর্ণ ব্যতীত আর কিছুতে খুব বেশী প্রভেদ নাই। ঘরের মধ্যে খৃশ্চান বা অর্দ্ধ-খৃশ্চান আয়ার সাহায্যে তাঁরা বাংলা বুলি শিখিবার পূর্ব্বেই ইংরাজি বুলি শিখিতে অভ্যস্ত। বাবা, মামা, দাদা, দিদি—সকলকারই আটপৌরে পোষাকের মত অষ্ট প্রহরের ভাষাও ইংরাজী। নেহাৎ যারা অতটা দূরে উঠিতে অক্ষম, তাঁদের একটা কথার মধ্যে অন্ততঃ আধখানার চাইতে একটুখানি বেশি-বেশি ইংরাজীর বুকনী দিয়া শোধন করা। যাঁদের আয় সহস্রার্দ্ধ বা তাও নয়, তাঁদের চাল দেখিয়া কে না সন্দেহ করিবে যে, পিছনে অন্ততঃ মহারাজ বর্দ্ধমানের সিকি আয়ের সম্পত্তি একটা আছে। গাড়ি-ঘোড়া এ যুগে যার নাই, সে তো ছোটলোকের সামিল। মোটর, এরোপ্লেন, সব্‌মেরিণ—এ তো ইচ্ছা করিলে তুমি-আমিও চড়িয়া বেড়াইতে পারি। আবার দুর্ভাগ্য-ক্রমে যাঁদের বাড়ীতে পশ্চিমে ঝড়ো হওয়া এখনও ততদূর জোর করিয়া উঠিতে

পারে নাই, তাদের মধ্যে অশান্তির জের নেহাৎ কম নয়। বুড়াবুড়ির দলকে (সম্ভবতঃ উত্তরাধিকারিত্বে অর্থ লাভের আশাতেই) স্পষ্ট লঙ্ঘন করিয়া নব্যেরা নিজেদের বিজয়-নিশান উড়াইতেও সঙ্কুচিত ; অথচ মনের মধ্যে এই অধীনাবস্থাটা মরার বাড়া খোঁচ দিতে-দিতে জন্মটাকেই ব্যর্থ বোধ করাইতেছে। এই অবস্থার একটি মেয়ে, ভাসুর সম্পর্কীয়ের নিমন্ত্রণে কতকটা আধুনিক সুখ-সম্পদে পূর্ণ গৃহে আগমন করিয়া, মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন—

"এমন একখানা বাড়ী যার নেই, এমন করে যে স্ত্রীকে রাখতে পারে না, তার গলায় মালা দেওয়ার চাইতে দড়ি দেওয়াই ভাল!"

অতঃপর হিন্দু নারীর কি এই আদর্শ দাঁড়াইবে? বিলাসিতা যদি দেশের এতবড় দুর্দ্দিনেও দেশের মেয়েদের জীবনের এতখানি সারাৎসার হইয়া দাঁড়ায়, যাহাতে দেশের মিলের মোটা সুতার মত সাড়ী পরিয়া মিলওয়ালাদের প্রাণে উৎসাহ জাগাইতে না পারেন, নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবমত বিলাসিতা যথাসাধ্য বর্জ্জন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হইতে না পারেন, তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় যে, বিলাস-অলসিত জীবন যাপনই ভারত-নারীর পুণ্যময় ত্যাগ-মহত্ত্বে মহৎ চরিত্রেরই স্থানাধিকার করিতেছে না?

এ দেশে এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী নব্যনারী মহিমাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখিতেছেন। পতি-পুত্রের অন্যায়কেও যে এ দেশের নারী কতবড় প্রেমের বলে, ক্ষমার বলে সহনীয় করিয়া চলিতেছেন, আজও চলেন, ইহার মহিমা তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না। ইহার মধ্যে শুধু দুর্ব্বলের অনুপায়ই তাঁ দেখিয়া থাকেন। তাঁদের জন্যও কি বলিব ইংরাজী বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্ব্বিবাহ প্রথা চালাইতে চান না, কি? আমার মনে হয় ঐ সকল স্থুল-দৃষ্টিসম্পন্ন নব্য লেখকেরা বিপত্নীক বা নিতান্ত গোবেচারা স্ত্রীর স্বামী। নতুবা ইবসেনের নোরা সাহিত্য-জগতে বা রঙ্গমঞ্চে মস্তবড় হিরোইন, বা বীর-চরিত্রা হইতে পারেন;—নিজের ঘরকন্নার মধ্যে ইঁহার আবির্ভাব, যতবড় সংস্কারকই হোন, কেহই পছন্দ করিবেন না। (ভারতবর্ষ)

(২) নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

মেয়েরা যে গোড়াতেই পুরুষদের কাছে, যাহাকে বলে ভাতে মরিয়া রহিয়াছে। এই গোড়ার বন্ধনটি মুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে নারীর স্বভাব

স্বধর্ম্ম কি চায়, কি ভাবে চলে, পুরুষের সহিত তখন সে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে তাহার মধ্যে আর কিছু না থাকুক দাতার ও গ্রহীতার, মনিবের ও দাসের যে একটা অস্বস্তিকর অস্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ সেটির কোন ছায়া পড়িবে না —উভয়ের মধ্যে ছুটী মুক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠ সত্তার সত্য সম্বন্ধ দাঁড়াইবার সুযোগ হইবে আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহাতে নারীরও মঙ্গল পুরুষেরও মঙ্গল ; সমাজেরও ব্যবস্থা একটা নূতনতর স্বাভাবিকতর সত্যতর রূপকে ফলাইয়া ধরিতে পাইবে। আধিভৌতিক হিসাবেও—বিশেষতঃ বর্ত্তমানের অন্নকষ্টের দিনে সকলের সুবিধা হইবে। আমাদের হিন্দুসমাজের অসহায় বালিকাদেরও আর যেনতেন প্রকারে বলিদান দিতে হইবে না, পুরুষদেরও যে ভার ক্রমে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে তাহার লাঘব হইবে—সমাজের যে অর্দ্ধেকভাগ এখন কেবল খরচই করিয়া আসিতেছে তাহারও জমার দিকে কিছু নজর দিলে গোটা সমাজ সমৃদ্ধতরই হইয়া উঠিবে।

নারীর স্বাধীন উপজীবিকার মধ্যে একটা হেতু দেখান হয়, তাহার মাতৃত্বের ভার। এই হেতু একটা ছুতা মাত্র কারণ, আমরা চোখের সম্মুখে নিত্যই দেখিতেছি নিম্নতর শ্রেণীর অশিক্ষিত ঘরের মেয়েরা এই মাতৃত্বের ভার সত্ত্বেও কত উপায়ে কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। আর আমাদের ভদ্র ঘরের মেয়েরা পরিশ্রম হিসাবে কিছু কম করিতে পারে, সে পরিশ্রমটার মধ্যে একটু কৌশল একটু সাজান গোছান একটু ইচ্ছা ও উদ্যোগ থাকিলেই যে তাহাকে উপজীবিকার উদ্দেশ্যে খাটান যায় না তাহা নয়; আর যাঁহারা বসিয়া বসিয়া গালগল্প করিয়া শুইয়া গড়াইয়া বা বাজে কাজে সময় কাটান, তাঁহাদের ত কোন অজুহাতই নাই। তারপর এই মাতৃত্বের ভার মেয়েদিগকে সারা জীবনের প্রতিদিন কিছু বহন করিতে হয় না—প্রয়োজন মত অবসর ত লওয়াই যাইতে পারে, এই অবসর ছাড়াও আরও যে যথেষ্ট সময় পড়িয়া থাকে, সেটির সদ্ব্যবহার কয়জন করিতে চাহে বা পারে ?

আমাদের দেশে মেয়েদের "ভোট" অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতিক অধিকার লইয়া একটা আন্দোলন সম্প্রতি বেশ উঠিয়াছে—বর্ত্তমান যুগের হাওয়া আমাদের সনাতন সমাজের বুকের উপর দিয়া যে চলিতে সুরু করিয়াছে ইহা তাহারই প্রমাণ। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক অধিকার তখনই সত্যিকার হইয়া উঠে যখন তাহার পিছনে থাকে অর্থনীতিক অধিকার। তাই আমরা মনে করি পলিটিক্যাল স্বাধীনতা অপেক্ষা ইকনমিক স্বাধীনতাই মেয়েদের পক্ষে বেশী জীবন্ত জিনিষ, এই বস্তু-

টিই নারীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের গোড়া ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী তাহার একটা স্বাধীন মতামত ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না, আর কোন স্বাধীন মতামত থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার বা তদনুসারে কার্য্য করাইবার পথ থাকে না—উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ। রাষ্ট্রে অথবা আরও বড়ভাবে সমাজে মেয়েদের যদি স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে হয়, রাষ্ট্রের সমাজের ব্যবস্থার উপর নারীরও হস্ত-চিহ্ন থাকা প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে আগে অর্থ সম্বন্ধে আত্মবশ হইতে হইবে। সমাজের মধ্যে এই আন্দোলন আমরা আগে দেখিতে চাই। তাহা হইলে বুঝিব নারী-রাষ্ট্রনীতিক অধিকারের আন্দোলনটিই কেবল যে খাঁটি হইয়া উঠিতেছে তা নয়, নারীর সমগ্র জীবনের স্বতন্ত্রতাও সত্যিকার ভিত্তি পাইতেছে। পুরুষেরা এই আন্দোলনে কতখানি যোগ দেয় তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিব নারীর যথার্থ মুক্তির অধিকারের জন্য পুরুষের প্রাণের সায় কতখানি আছে।

তাই বলিয়া নারীর অর্থাধিকারকেই যে আমরা সর্ব্বে-সর্ব্বা করিতেছি তাহা কেহ মনে করিবেন না। আরম্ভেই আমরা বলিয়াছি গোড়ার কথা হইতেছে, মনের মুক্তি, অন্তরাত্মার উদ্বোধন—শিক্ষা ও দীক্ষা। এই ভিতরের জিনিষ ব্যতিরেকে বাহিরের সব আসবাবই বিফল। বর্ম্মায় আমাদের দেশে খাসিয়াদের মধ্যে নারীর অর্থাধিকার যথেষ্টই আছে কিন্তু তবুও তাহাদের সমাজ যে খুব সমৃদ্ধ বা উন্নত ধরণের তাহা মনে হয় না; কারণ সেখানে অভাব এই গোড়ার জিনিষটির। তবুও নারীর স্বাতন্ত্র্য সমাজ-শৃঙ্খলার অন্তরায় যাঁহারা বলেন, তাঁদের দৃষ্টি আমরা ঐ ঐ সমাজের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই—পুরুষের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছাড়া নারীর কর্ত্তৃত্ব যে সমাজ গাঁথিয়া তুলিতে পারে, সমাজকে একটা ভিন্ন রকম মূর্ত্তিই দিতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ ঐখানে পাওয়া যাইতে পারে। (উপাসনা)

ডালি

এসিয়ার নারী শক্তির জাগরণ

[শ্রীনীহাররঞ্জন দাশ বি, এ,]

সত্য বটে এশিয়া বহুদুর বিস্তৃত এক মহাদেশ এবং এই মহাদেশে বহু জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের বাস, কিন্তু ইহা দেখিবার বিষয়, কিরূপে সময়ে সময়ে সমগ্র দেশ একই ভাব প্রবাহে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। একই সময়ে কিরূপে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ধর্ম্মের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল; একই কালে কিরূপে সমষ্টির জীবনে একই সৌন্দর্য্য ও দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও এশিয়ার সমগ্র নারী জাতির অন্তরে একই সঙ্গে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে।

এ স্বাধীনতার তরঙ্গ পালেস্টাইন হইতে জাপান পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, এমন কি মুসলমান রমণীর প্রাণেও এই বাণী পৌঁছিয়াছে। কান্টনের রাজপথ মুখরিত করিয়া দক্ষিণ ভারতকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়া এই স্বাধীনতার বাণী ছুটিয়াছে। প্রতি স্থানেই নারী জাতি শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চাহিতেছে; প্রতি ক্ষেত্রেই এই মুক্তির চেষ্টা অন্তরাত্মা হইতে আসিতেছে—পাশ্চাত্য বাসীর আগমনে বাহির হইতে যে এ চেষ্টা চলিতেছে এমত নহে। এশিয়ার নারীর প্রাণে সাড়া পড়িয়াছে, তাই তাহারা রুদ্ধ কারা ভাঙ্গিতে চায়। এ আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন দেশে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে কোথাও নারী আর পর্দ্দা-নশিন থাকিতে চায় না—কোথাও বা তাহারা ছত্র ও পাদুকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে--কোথাও বা তাহারা পদবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায় আর কোথাও বা তাহারা চায় শিক্ষার সুব্যবস্থা ও রাজনীতিক অধিকার, মুসলমান, ইহুদি, ভারতবাসী, ব্রহ্মবাসী, চীনা ও জাপানী লইয়াই এশিয়ার রমণী জাতি। মুসলমান রমণীর মধ্যে সাড়া পড়িয়াছে। পারস্যরমণীর পর্দ্দা ভাঙ্গিবার ইচ্ছা এত বলবতী যে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাহারা প্রতিনিধি পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিল। যুদ্ধের সময় আরমেনিয়ার রমণীগণ রাজ্য পরিচালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; এমন কি জাপানে রমণী প্রতিনিধি নিযুক্তও করিয়াছিল। আর পালেসটাইনের ইহুদী রমণীগণ চায়

না সে আদালতে বিচারিত হইতে, যে আদালতের মতে স্বোপার্জ্জিত ও সন্তানের অভিভাবকত্বে স্ত্রীর অধিকার নাই, আর যে আদালতের বিচারে চিরটা জীবন পিতা, স্বামীও ভ্রাতার অধীন থাকিয়া রমণীকে কাটাইতে হয়।

ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার অতি অল্প হইলেও ভারতীয় আইন্ কানুন্ স্ত্রী-স্বাধানতাকে কখনও খর্ব্ব করে নাই। স্ত্রী-জাতিকে তাহাদের ক্ষমতা-নুযায়ী পদ দিতে ভারত কখনও কুন্ঠিত হয় নাই। ভারতের কোনও রাজ-নীতিক অনুষ্ঠানে নারীকে রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইতে হয় নাই। ভারতের ধর্ম্ম স্ত্রী-পুরুষকে সকল সময়েই একাসনে বসাইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে যে স্বরাজের আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতেও স্ত্রী-জাতির স্থান আছে। যাহারা কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন অধিনেত্রী শ্রীমতী বেসেণ্ট, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপা শ্রীমতী নাইডু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা, জননায়ক তিলক, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সহিত একাসনে উপবিষ্টা ছিলেন ও তুল্য সম্মানে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন—এ দৃশ্য ভুলিবার নয়। স্থানীয় ব্যব-স্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার মাদ্রাজ রমণী পাইয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয় ভারতীয় স্ত্রীকুলই একদিন সমগ্র এশিয়ার নারী জাতির পথ প্রদর্শক হইবে।

ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীজাতি বোধ হয় প্রাচ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন—দেশের ব্যবসা তাহাদেরই হাতে—অনেকেই শিক্ষিতা—বর্ণবিচার ও পর্দ্দা তাহাদের নাই।

চীন দেশের স্ত্রীজাতির প্রাণে যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। সাময়িক পত্রে আমরা দেখিয়াছি—৩০শে মার্চ্চ সহস্র সহস্র নারী সভা করিয়া ভোট দিবার অধিকার চাহিয়াছিল ও সভান্তে মিছিল করিয়া Canton এর রাজপথে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তাহারা ভোট দিবার অধিকার পায় নাই

জাপানে স্ত্রীজাতি সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বুদ্ধ। তাহারা দেশের সকল কাজই করিতেছে। তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০জন শিক্ষিতা। তাহারা আজও কোন রাজনীতিক অধিকার পায় নাই বটে, কিন্তু শিক্ষিতা রমণীগণ এক আন্দোলন তুলিয়াছে।

ইহা দেখিয়াই মনে হয় এশিয়ার নারী জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর

হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে এক অটুট বন্ধন বিরাজ করিতেছে, নচেৎ এই মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুক্তির কামনা এমন করিয়া একত্র জাগিয়া উঠিত কি? (Asian Review)

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত]

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

সঙ্গীত বলিতে গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনই বুঝায়। যথা—

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।"

সঙ্গীত—রত্নাকর।

সঙ্গীতশাস্ত্রে এই তিনটীকে একত্রে তৌর্যত্রিক বলা হয়। ইহার মধ্যে গীত সর্ব্বপ্রধান। বাদ্য গীতের অনুগামী এবং নৃত্য বাদ্যের অনুগামী যথা—

"নৃত্যবাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যগীতানুবৃত্তি চ।
অতোগীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবাভিধীয়তে।"

সঙ্গীত চন্দ্রিকাধৃত বচন।

সম্প্রতি আমরা গীত সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। গীত নাদাত্মক। সঙ্গীত দর্পণে দামোদর মিশ্র লিখিয়াছেন—

"গীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রশস্যতে।
তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতস্ত্রয়ং॥"

সেই নাদ আবার আহত এবং অনাহত ভেদে দ্বিবিধ। গুরুপদিষ্টমার্গে মুনিগণ অনাহত নাদের উপাসনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন বটে কিন্তু উহা মুক্তিদ হইলেও রঞ্জক নহে। আহত নাদই রঞ্জক এবং ভবভঞ্জক। যথা—

"স নাদ স্বাহতো লোকরঞ্জকো ভবভঞ্জকঃ।"

সঙ্গীত দর্পণ।

এই আহতাখ্য নাদোৎপত্তি এই ভাবে হয়—আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চিত্ত দেহস্থ 'বহ্নি" অর্থাৎ তেজ আহরণ করে, পরে ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত প্রাণবায়ু

কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই তেজ ক্রমে উর্দ্ধে বিচরণ করিতে করিতে নাভিতে অতি সূক্ষ্ম, হৃদয়ে ও গলদেশে সূক্ষ্ম, এবং শীর্ষে ও বদনে ক্রমে পুষ্ট ধ্বনিরূপে বহির্গত হয়। যথা—

"আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নি মাহন্তি দেহজং।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥ ৩৪॥
পাবকঃ প্রেরিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথেচরন্।
অতি সূক্ষ্মম্ ধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলেপুনঃ॥ ৩৫॥
পুষ্টং শীর্ষে ত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয়তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্ততে বুধৈঃ॥ ৩৬॥

সঙ্গীত দর্পণ।

নাদ শব্দের 'ন'কারে প্রাণ ও "দ" কারে অনল বলিয়া জানিবে, কারণ প্রাণ নামক বায়ু এবং দেহস্থ তেজ সংযোগেই নাদের উৎপত্তি। যথা—

"নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
যতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥ ৩৭॥

সঙ্গীত-দর্পণ

এই প্রাণ বায়ু নাভির নিম্নদেশে অবস্থান করে এবং নাসাপথে, মুখে, হৃদয়ে এবং নাভিতে বিচরণ করে। প্রাণবায়ুই শব্দোচ্চারণ এবং নিশ্বাসোচ্ছাস কাসাদির কারণ। যথা—

তেষাং (দশ বিধ বায়ু) মুখ্যতমঃ প্রাণো নাভি কন্দাদধঃস্থিতঃ।
চরত্যাস্যে নাসিকয়োর্নাভৌ হৃদয়পঙ্কজে॥ ৪৪।
শব্দোচ্চারণ নিশ্বাসোচ্ছাস কাসাদি কারণম্॥ ৪৫॥

সঙ্গীত রত্নাকর।

যে ধ্বনি আপনা হইতেই শ্রোতার মন প্রফুল্ল করিয়া তোলে তাহাকেই সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বর বলে। যথা—

"স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বরউচ্যতে।"

সঙ্গীত চন্দ্রিকা ধৃত বাক্য।

স্বয়ং যোরাজতে নাদঃস স্বরঃ পরিবকীর্ত্তিতঃ।

সঙ্গীত দর্পণ।

স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকাশ্চাসৌ স্বরইত্যভিধীয়তে॥

সঙ্গীত দর্পণ।

শুদ্ধ স্বর সাতটি আর বিকৃত স্বর পাঁচটি অতএব মোট স্বর সংখ্যা দ্বাদশটি। যথা—

শুদ্ধাঃসপ্তস্বরাস্তেচ মন্দ্রাদি স্থানতস্ত্রিধা।
চ্যুতাচ্যুতাদিভেদেন বিকৃতা দ্বাদশোদ্দিতা॥ ৫৯॥

সঙ্গীত দর্পণ।

এই সপ্তস্বর আবার উৎপত্তির স্থান ভেদে তিন সপ্তকে বিভক্ত। হৃদয় হইতে যে সপ্তস্বর উত্থিত হয় তাহাকে মন্দ্রস্বর, গলদেশ হইতে উঠিলে মধ্যস্বর এবং মূর্দ্ধা হইতে উঠিলে সেগুলিকে তারস্বর বলে। মন্দ্র স্বর হইতে মধ্যস্বর দ্বিগুণ, এবং মধ্যস্বর হইতে তারস্বর দ্বিগুণ প্রবল। দেহ যন্ত্রে নিম্ন হইতে উর্দ্ধে স্বরের প্রবলতা হয়, কিন্তু কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রে ইহার বিপরীত উহাতে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে স্বরের প্রাবল্য হয় অর্থাৎ স্বর চড়িতে থাকে যথা—

ইতি বস্তুস্থিতিস্তাবদ্ গাত্রে ত্রিধাভবেদসৌ।
হৃদি মন্দ্রোগলেমধ্যো মূর্দ্ধ্নি তারইতি ক্রমাৎ॥ ৪৯॥
দ্বিগুণ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাদয়ং স্যাদুত্তরোত্তরঃ।
এবং শারীরবীণায়ং দারব্যাস্ত বিপর্য্যয়ঃ॥ ৫০॥

বৈদিক অনুদাত্ত, স্বরিত ও উদাত্ত স্বরই যথাক্রমে সঙ্গীত শাস্ত্রে মন্দ্র, মধ্য, তার এবং আধুনিক উদারা, মুদারা, তারা হইয়াছে।

এই সপ্ত স্বরের নাম যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। ইহাদেরই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা স, রি, গ, ম, প, ধ, নি। যথা—

"তেষাং সংজ্ঞা স-রি-গ-ম-প-ধ-নীত্যপরামতঃ।"

সঙ্গীত চন্দ্রিকাধৃত বচন।

(ক্রমশঃ)

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান। *

প্রথম গীত।

[রচনা———স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

নর্ত্তকীগণ।

মিশ্র ভূপালী———একতালা।

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু——আমরা তোমায় ভালবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই, তোমার কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি ;
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে, আমরা দেখ্‌বো তোমার মধুর হাসি ;
তুমি কভু দয়া করে,' বাজিও তোমার মোহন বাঁশী ;
শুন্‌তে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু! আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হোয়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী ;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু, আর, আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালবাস নাহি বাস, নইক তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি॥

স্বরলপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

	০			১				২			৩			
II {	1	1	সা।	রা	গা	পা	I	র্সা	র্সর্সা	ধা	। পা	-গা	-া	।
	•	•	তু	মি	যে	হে		প্রা	ণের্	বঁ	ধু	•	০	

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "নারায়ণে"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।
—লেখিকা।

০ ১ ২´ ৩
। রা -গা রা । -া গা ররা I সা ধ্া রা । সা -া -া }।
আ ম্ রা । ০ তো মায় ভা ল বা সি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। {া া সা । ররা গা গা I গা গা গা । গা -সরা -গা ।
০ ০ তো মার্ প্রে মে মা তো য়া রা ০০ ০

০ ১ ২ ৩
। গা -া গা । গগা গা রা I গা গা পা । রা -া -া } II
তা ই তো মার্ কা ছে ছু টে আ সি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II {া া গা । গা পা ধা I র্সা র্সা র্সা । র্সা -া -া ।
০ ০ তু মি শু ধু দি ও হা সি ০ ০

০ ১ ২´ ॰ ॰ ৩
। া া ননা । না ধা ধা I পা ক্ষক্ষা ধা । পা -া -া } ।
০ ০ আম্ রা দি ব অ শ্রু রা শি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। {া া র্সা । র্সা র্সা ধা I না না না । ধা পা পা ।
০ ০ তু মি শু ধু চে য়ে দে খ বঁ ধু

০ ১ ২´ ৩
। গা -পা গা । -া গা ররা I সা ধ্া রা । সা -া -া } II
আ ম্ রা ০ কে মন্ ভা ল বা সি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II {া া সা । সা সা সা I ধ্া সা রা । রা া া ।
০ ০ আঁ খি মা লা শ ত দ লে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। া া গা । মা গা রা I সা রা গা । গা -া -া ।
০ ০ দি ব ত ব প দ ত লে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। া া পা । পা পা পা I ধা ধা পা । গা গগা গা ।
০ ০ তু মি হে সে ধ র গ লে আম্ রা

০ ১ ২´ ৩
। রা -গা রা । -া গা ররা I ধ্‌া সসা রা । গা -া -া } II
দে খ্‌ বো ॰ তো মার্‌ ম ধুর্‌ হা সি ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
II { া া পা । পা ধা নর্সা I র্সা র্সা র্সা । র্সা -া -া ।
॰ ॰ তু মি ক ভু॰ দ য়া ক রে ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। া া ন না । র্সা না ধধা I পা ধধা র্রা । র্রা -া -া ।
॰ ॰ বাজি ও তো মার্‌ মো হন্‌ বাঁ শী ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। া া র্সর্সা । র্সা র্সা ধধা I না ননা ননা । ধা পা পা ।
॰ ॰ শুন্‌ তে তো মার্‌ বাঁ শীর্‌ ধ্বনি বঁ ধু

০ ১ ২´ ৩
। গা -পা গা । -া গা রা I সা ধ্‌া রা । সা -া -া } II
আ ম্‌ রা ॰ ব ড় ভা ল বা সি ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
II { া া সা । রা গা মমা I মা পা পা । পা -া -া ।
॰ ॰ তু মি মো দের্‌ হো য়ো প্র ভু ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। া া পপা । পা পা পপা I পা ধা ধা । ধা -া -া } ।
॰ ॰ আম্‌ রা তো মার্‌ হ ব দা সী ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। া া ধা । ধা ধা ধা I র্সর্সা র্সসা ধা । পা -গা পপা ।
॰ ॰ তু মি যে হে ব্র জের বঁ ধু ॰ আর্‌

০ ১ ২´ ৩
। গা -পা গা । -া গা রা I র্সসা ধ্‌া রা । সা -া -া } II
আ ম্‌ রা ॰ যে গো ব্র জ বা সী ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
II { া া গা । গা পা ধা I র্সা র্সা র্সা । র্সা -া -া ।
॰ ॰ ভা ল বা স না হি যা স ॰ ॰

```
   ০      ..  ১             ২´               ৩
।  1  1  ননা। র্সা  না  ধধা I  পা  ধা  র্রা  ।  র্রা -1  -1 }।
   •  •   নই   ক   গো তায়্    অ   ভি   লা     ষী  •   •

   ০          ১             ২´               ৩
।  1  1  র্সর্সা। র্সা  র্সা  ধা  I না  না   না  ।  পা  -1  -1 ।
   •  •  আম্    রা   শু   ধু   ভা  ল   বা      সি  •   •

   ০          ১             ২´               ৩
।  ধা ধা ধা  । গা   -1   -1  I  রা  গা  রা  । ( সা  -1  -1 ) }।
   ভা ল বা    সি    •    •     ভা  ল   বা     সি   •   •

   ২´
।  র্সা -1 -1  II  II
   সি  •  •
```

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]		[ফাল্গুন, ১৩২৮।

স্বাধীনতার স্বরূপ।

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

স্বাধীনতার অর্থ কি ? এক কথায় ইহার নির্দ্দেশ করা অসম্ভব ; তবে আমরা এইরূপে ইহার বর্ণনা করিতে পারি যে ইহা সেই অবস্থা ও সেই সর্ত্ত যাহা কোন জাতিকে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে এবং স্বীয় ভাগ্য গঠন করিতে সমর্থ করে। কিরূপে বিভিন্নজাতি জাতীয় স্বভাবধর্ম্ম ও জাতিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন ও নির্ম্মল রাখিবার জন্য স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অভিযান করিয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসের প্রতি পত্রে জলন্ত অক্ষরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা ফিন্‌ল্যাণ্ড পোল্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতেও ইহার নিদর্শন পাই। ইহাদের প্রত্যেকেই বৈদেশিক শিক্ষাদীক্ষার বহিরারোপের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। এই সকল জাতির ইতিহাস একই ধারায় বহিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা বৈদেশিক শিক্ষার নিকট স্বীয় সভ্যতার পরাজয় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে বৈদেশিক শক্তি হইতে কোনরূপ বাধা না পাইয়া আত্মভাগ্য বিধানের অধিকার পাইবার জন্য তাহারা স্বাতন্ত্র্য সত্তা স্বীকার করাইবার দাবি করিয়াছে।

আমাদের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা, কেননা জাতীয় ধারার অনুযায়ী করিয়া আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার এবং জাতির ভাগ্য গঠন করিবার অধিকার দাবি করিতেছি। আমরা চাইনা ইহাতে পাশ্চাত্যের আরোপিত অনুষ্ঠানগুলি আমাদের প্রতিবন্ধকতা করে, অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার শিক্ষাদ্বারা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। এইখানে আমি ভারতের কবি

রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিতে পাইতেছি, তাহা আমায় বাধা দিয়া বলিতেছে "পাশ্চাত্যের সভ্যতা আজ আমাদের দ্বারে অতিথি হইয়া আসিয়াছে আমরা কি আতিথেয়তা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বিমুখ করিব; আমরা কি স্বীকার করিব না যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার সম্মেলনেই জগতের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।"

আমি স্বীকার করি ভারতীয় জাতীয়তাকে বাঁচিতে হইলে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিরুদ্ধে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা এই যে আতিথেয়তা প্রদর্শনের পূর্ব্বে আমাদের নিজস্ব একখানি আবাস থাকা প্রয়োজন, আর দ্বিতীয় কথা এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা না আসিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব, যদিও অন্ধ দাসোচিত অনুকরণ হইতে পারে, যেমনটি এতাবৎকাল হইয়া আসিয়াছে। বৈদেশিক শিক্ষা দীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—ইহা রাজনীতিক অধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে। যখন ভারতে জাতীয় জীবনের অন্তর স্পন্দন অনুভূত হইবে, কেবল তখনই উভয় সভ্যতার সম্মেলনের কথা উঠিতে পারে।

[আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ]

কবির প্রতি

(দরবেশ)

জাগো কবি! জাগো কবি।
স্বপন-রচিত নন্দন হতে
হের এ ধূলার ছবি।
দীর্ঘ তমস আধার অন্তে,
উষা হাসিয়াছে পূরব প্রান্তে,
পশ্চাতে তার কিরণ-কান্ত
ওই ধ্বান্তারি রবি।

মন্মথ-মেখলা ছড়ায়ে গিয়েছে
চির আঁধারের ভুমে ;
অন্ধকারের বন্দীরা আজি
জেগেছে আলোর চুমে।
কণক-বিজলী ছেয়েছে গগন,
ঘুমভাঙাদল মেলেছে নয়ন,
এ নব প্রভাতে রাঙাও ভুবন
নব সুর-কুঙ্কুমে।

বিশ্ব-ভারতী-শ্রীকর-দীপ্ত
নিয়ে এস তব বীণা ;
নিঃস্ব রিক্ত ভাইরা তোমার,
জননী তোমার ক্ষীণা।
পেটে নাই ভাত, মুখে নাই কথা,
বুক পোড়া শুধু নিরাশার ব্যথা,
চির লুন্ঠিতা বঞ্চিতা মাতা,
মহারাণী—আজি দীনা।

আনন্দ-পূত নন্দন হতে
আনো গান—আনো গান ;
দীপ্ত রঙীন রক্ত রাগিণী,
শক্তি-সফল প্রাণ।
ভিখারীর দল হয়েছে বাহির,
মুক্তির লাগি পাতিয়াছে শির,
হে চারণ ! হের হাসিছে মিহির,
তোল তোল বীণাখান।

গাও সেই গান, যে গানে আবার
জাগিবে শৌর্য্য বল ;
গাও সেই গান শত ঝঙ্কায়
রবে যাহে অবিকল।

গাও সেই গান, মরমে মরমে
জাগিবে জীবন করমে করমে,
সত্য ন্যায়ের সহজ ধরমে
হইবে সমুজ্জ্বল।

গাও সেই গান, যে গানে ভারত
তিল সহিবেনা আর,
অত্যাচারের রক্ত মুরতি,
অন্যায় ব্যবহার।
যত পাপ এরা করেছে জীবনে,
ভায়ের ঘৃণায়, নারীর বেদনে,
ধুয়ে যাক্ সব বীণা-নিস্বনে
শুষে যাক্ সব ধার।

বিশ্ব-মায়ের অমৃত পুত্র,
ওগো কবি মহাজন!
নিঃস্ব-মায়ের গাঢ় নিশ্বাসে
কাঁদুক তোমার মন।
হে অমর বীণা! জাগাও পরাণ
বাজাও বাজনা, গাহ গাহ গান,
মরণ যাত্রি! হও আগুয়ান,
সমুখে সিংহাসন।

মনের লীলা

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস]

'রাজাদা, আমরা বুঝি মজা দেখতে যাব না! বা-রে!"
"কিসের মজা ভাই?"
"এই যে গড়ের মাঠে কত বাজি হবে, রাস্তায় চারদিকে কত আলো

জলবে! বাঃ, তুমি বুঝি আর জান না। এত লেখাপড়া শিখেছ, এই খবরটা বুঝি আর রাখ না। না, তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করছ।"

"ওঃ, তাই বল, আচ্ছা তুইই বল্ না, কিসের জন্য এ উৎসব হচ্ছে?"

"বাঃ, তা বুঝি আমি জানি না, আমাদের ইস্কুলের মাষ্টার মশায় যে বলে দিয়েছেন আমাদের রাজপুত্তুর কলকাতায় এসেছেন, তাই সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এত ধূমধাম করছে। বাতি জ্বালিয়ে সাহেবপাড়া নাকি ইন্দ্রপুরী করে তুলেছে। না, আমি দেখতে যাবই।"

"দেখ কমল, এ উৎসব কারা করছে জানিস্। এ উৎসব দেশের লোক কেউ করছে না, করছে জন কতক সাহেব সুবো যাদের এ দেশের উপর কোন টানই নেই, যারা এ দেশের দুর্দ্দশা দেখে হাসে, আর উৎসব করছে তারা যাদের সঙ্গে দেশের কোন সম্পর্কই নেই যারা সাহেবদের উচ্ছিষ্টভোজীর দল। ভেবে দেখ কমল, যখন দেশে শতকরা নব্বইজন দুবেলা দুগ্রাস অন্ন জোটাতে পারে না, তখন কি না দেশের এত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। কিসের উৎসব বল দেখি ভাই, এযে আমাদের বুকের রক্ত নিয়ে তাণ্ডব-লীলা। এখন কি উৎসব করবার সময় ভাই? দেশের যাঁরা প্রাণ হিন্দু মুসলমান, তাঁরা মায়ের কাজে কারাবাস বরণ করে নিয়েছেন; আর আমরা মজা করে বাজি দেখতে যাব, আর স্ফূর্ত্তি লুটব। ছিঃ ভাই।"

"না রাঙ্গাদা, আমি তোমার অত সব বড় বড় কথা বুঝি না, সকলে যাবে, আমি বুঝি যাব না। আমি যাবই, বা রে।"

"কমল, তুই যদি একান্তই যেতে চাস্ ত যা, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। আমার বোঝাবার ভার বোঝালাম। জানিস্ ত আমি কারও স্বাধীন-ইচ্ছার উপর হাত দিই না। তবে আমি ত নিয়ে যেতে পারবনা। আর কেউ যদি তোকে নিয়ে যায় ত সঙ্গে যা।"

কমলরঞ্জন পুলকিত মনে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

"আজ আমাদের ছুটি ওভাই
আজ আমাদের ছুটি;
কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।"

* * * * *

উপরের কথাবার্ত্তা সুখরঞ্জন বাবু ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলরঞ্জনের মধ্যে হইতেছিল। সুখরঞ্জন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলেজের অধ্যাপনা করিতেছিলেন, এমন সময় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশভক্তের মুখ দিয়া দেশমাতৃকার আহ্বান আসিল। সুতরাং সুখরঞ্জন বাবু সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক মনে কংগ্রেসের কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রকৃতি খুব নিরীহধরণের ছিল। সে কাহারও স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহিত না, সুতরাং যখন তাহায় কনিষ্ঠ সহোদরেরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাইবার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল, তখন সে তাহাতে কোনওরূপ আপত্তি করিল না। আজ ২৭শে ডিসেম্বার তারিখে সমপাঠিদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও রাজকুমারের আগমন উপলক্ষে উৎসবাদিতে যোগদান করিতে যাইতে দেখিয়া দ্বাদশবর্ষবয়স্ক কমলরঞ্জনের কোমল মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তাহার রাঙ্গাদাদার নিকট আসিয়া আলোক ও বাজি দেখিতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অনেক আবদার করার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি পাইয়া সে পাড়ার কোনও সমপাঠীর অভিভাবকের সঙ্গ ধরিতে চলিয়া গেল।

* * * * *

"রাঙ্গাদা, ও রাঙ্গাদা, বেশ মজা হয়েছে। আমি নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র, অমনি দেখি ও বাড়ীর অনাথ, ওইযে অনাথ আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে,—ছিপছিপে ফরসা ছেলেটি যাকে তুমি একদিন খুব বুদ্ধিমানের মত চেহারা বলেছিলে ;—সে আমাকে ডাকতে এসেছে। তারা সব তাদের বাড়ীর গাড়ী করে ময়দানে মজা দেখতে যাচ্ছে, আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করছে। যাব ? বেশ ত যাই না ? তাহলে আর কাউকে আমার খোঁজ করতে হবে না।"

"আচ্ছা, তোর ইচ্ছে হলে যা। আমিত বলেছি তোর ইচ্ছের উপর আমার আপত্তি নেই। তবে সাবধানে যাস্। ঠাণ্ডা বেশী যেন লাগে না, দিন কাল ভাল না। বুঝলি।"

"আচ্ছা, তা আমায় বলতে হবে না, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। যাই তা হলে, বুঝলে।"

• • • • •

কমল রঞ্জন চলিয়া গেল। সুখরঞ্জন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে আজ তিন চার বছরের আগেকার কথা। সুখরঞ্জনের পিতা মৃতশয্যায় ছোট পুত্র দুটিকে সুখরঞ্জনের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"বুকের রক্ত দিয়ে আমি তোকে মানুষ করেছি, এখন ভাইদের তুই মানুষ করে তুল্‌বি।" সে কথা সুখরঞ্জন ভুলে নাই, নিজের সাধ্যমত ভাইদের শিক্ষা ও স্বচ্ছন্দতার জন্ম সে চেষ্টা করিয়াছে। অর্থে যাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, স্নেহ দিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ ও তার মন্দ জুটে নাই। কিন্তু যখন অত্যাচার ও অবিচারে দেশবাসীর মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, আত্মোন্নতির জন্য সকল প্রকার বৈধ উপায়কে শাসকসম্প্রদায় নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইয়া—দেশবাসীর মনে সদাপ্রচ্ছন্ন ধূমায়মান অসন্তোষ বহ্নিকে পীড়ন ফুৎকারে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল, তখন অনেক ভাবিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও সুখরঞ্জন স্থির থাকিতে পারিল না। কত কথা তার মনে পড়িল। তার ভাইদের শিক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, জীবনে ভোগ সুখের কথা, কত বিনিদ্র রজনী সে কাটাইল। একবার ভাবে,—আর না, সময় বহিয়া যায়, তাহার আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মনে মনে সে—একপদ অগ্রসর হয় আবার এস্তপদে সে ফিরিয়া আসে। এক পা, আর এক পা, অমনি মনে পড়ে ভাইদের খাওয়াইবে কেমন করিয়া। জীবন তাহার অসহ্য বোধ হইল। দিবানিশি ভগবান্‌কে ডাকিয়াও সে ইহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন সময় চাঁদপুরের নিরন্ন, কঙ্কালসার কুলিদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সপাৎ করিয়া কে যেন সুখরঞ্জনকে এক প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করিল। না আর ত নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকা চলে না। যা করেন ভগবান্ বলিয়া সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে নামিয়া পড়িল। সত্যই ত কে কাহার আহার দেওয়ার মালিক। মানুষ ভ্রান্তজীব, আমি আমি করিয়া অহংকে আরও দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই মানুষ জীবনে অশান্তিকে ডাকিয়া আনে। তাহাই হউক ভগবান্, তুমি যাহা স্থির করিবে তাহাই হউক এই ভাবিয়া সুখরঞ্জন চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। কিছুদিন অভাবে অনটনে অথচ মনের শান্তিতে তাহাদের কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু আজ যখন কমলরঞ্জন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অর্থের অভাবে পাড়ার বড়-লোকের সঙ্গে উৎসব দেখিতে বাধ্য হইল, তখন সেই বুকের এক পাশে স্তূপাকার

দুঃখরাশি হঠাৎ বড় ভারি বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, কত বাসনা আকাঙ্ক্ষার রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া জীবনটাকে রামধনুর মত বিচিত্র করিয়া তুলিবার কল্পনা তাহার ছিল। কিন্তু কি করিবে, দেশের আহ্বানে তাহাকে সাড়া দিতে ত হইবেই। নহিলে যে সে দেশদ্রোহী হইবে। ভাবিতে ভাবিতে সুখরঞ্জন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

* * * * *

হঠাৎ সুখরঞ্জনের চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া কমলরঞ্জন বেগে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সুখরঞ্জন বলিয়া উঠিল—"কিরে কমল, গেলিনে যে?" কমলরঞ্জন উত্তর দিল—"না রাঙ্গাদা যাওয়া হল না।"

"কেন রে, কি হল তোর? কেউ কিছু বলেছে নাকি?

"না, রাঙ্গাদা, কেউ ত কিছু বলে নি।"

"তবে?"

"তবে কেন যে আমার যেতে ইচ্ছে হল না, তা আমি নিজেই বলতে পারি না।"

"কি ব্যাপার, শুনিই না।"

"শোন রাঙ্গাদা, জীবনে আমার এমন কোন দিন হয় নি। আমি কাপড় চোপড় পরে অনাথদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম, তাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে গেলুম এমন সময়ে আমার বুকের মধ্যটা কেমন করে উঠ্‌ল। এমন আমার কথনো হয় নি। কে যেন মনের ভিতর থেকে মুখ খানা ম্লান করে বলে উঠল —ছিঃ কমল, কোথায় যাস, বুঝতে পারছিস্ না কারা উৎসব করছে। পেছিয়ে গেলুম, অনাথ এসে হাত ধরে বল্‌লে উঠ না ভাই কমল। আবার উঠতে চেষ্টা করলুম, আবার মনের মধ্যে ঐ কথা বেজে উঠ্‌ল। আমি ফিরলাম, অনেক সাধ্য সাধনাতেও আর গাড়ীতে উঠতে গেলাম না। মনে হচ্ছে একখানা করুণ মুখ আমার ভিতর গুমরে গুমরে কাঁদছে, সে মুখখানা যেন আমাদের ভারতমাতার। রাঙ্গাদা, তোমার ইচ্ছাই শেষকালে আমাকেও বশ করলে।"

"ভাই কমল, আমার ইচ্ছা তোমায় বশ করেনি। এ ভগবানের ইচ্ছা। জেনো, সব সময়েই মনে রেখো মানুষের নিজের মনের উপর ও নিজের হাত নেই। তুমি যে আজ অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে ফিরে এলে, এ সেই লীলাময়ের ইচ্ছায়ই হয়েছে, তোমার আমার এতে হাত নেই। ভগবানের হাতে ক্রীড়া-

পুতুল আমরা তাঁরই ইঙ্গিতে আমরা স্বরাজের পথে চলেছি। তাঁরই ইচ্ছায় তোমার মত সকলের মনেই আজ এমনি লীলা চলছে। আশীর্ব্বাদ করি এই রকম সব সময়ে বিবেকের বাণীর অনুসরণ করো, সেই হচ্ছে মানুষের চিরন্তন মনের লীলা!"

ঠিক সেই সময়ে বাহিরে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল—

সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই গভীর অন্ধকার,
অন্তরে তোর আঁধার কেবল, দুয়ার বন্ধ তার।
কিসের লাগিয়া দীপ জ্বালিস্‌রে,
কিসের লাগিয়া সুখে হাসিস্ রে,
উৎসবে তুই কেন মাতিস্ রে
জননী বহে যে শৃঙ্খল ভার;
মুখ ঢাক ভাই মুখ লুকাও রে
দীপ নিভে যাক্ দীপ নিভাওরে
অন্তরে তোর স্থির জাগাওরে
বিষাদখিন্না মুখখানি মার।
সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই গভীর অন্ধকার,
অন্তরে তোর আঁধার কেবল, দুয়ার বন্ধ তার।

বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ভাষাবিজ্ঞান—ভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ—

ইংরেজী Philology শব্দের অর্থ—ভাষা এবং সাহিত্য—ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—

ভাষা ভাব বিনিময়ে উপায়। শুধু শব্দের দ্বারাই যে ভাব বিনিময় করা যায় তাহা নয়। নানারূপ চিহ্ন সঙ্কেতাদির দ্বারাও ভাব বিনিময় ঘটিয়া থাকে।

আর এই ভাব বিনিময় মানুষের মধ্যে যে কেবল প্রচলিত এমন নয়, পশুপক্ষীর ভিতরও ইহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কুকুর, ঘোড়া, হাতী, বানর প্রভৃতি বুদ্ধিমান জীবের সহিত মানুষের ভাবের আদান প্রদান চলিয়াছে। তবে যে অবস্থায় আসিলে ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করা চলে, একমাত্র মানুষেই সেইরূপ ভাষা বলে।

ভাষার উৎপত্তি, পরিণতি, বিভিন্ন আকার ধারণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং সাধারণ তথ্য নির্দ্ধারণ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ভাষা এবং ভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ কি পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে লিখিত বিবরণ হইতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে।

এই প্রসঙ্গে ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভাষায় চলিত নামগুলির আলোচন সুবিধাজনক হইতে পারে। ইংরেজীতে Science of Language নামটি সুপ্রযোজ্য জার্ম্মাণ ভাষায় এই নাম sprachwissenschaft (sprach=speech=বাক্ wissens chaft=knowledge=বিদ্যা)—ফরাসী নাম Linguistique ইংরেজীতে আরও একটি নাম দেওয়া হয় glottology =the science of Tongues=এইরূপ কত নামই চলিত আছে। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় ভাষা বিজ্ঞান নামটি এই অর্থে ব্যবহার করিব।

ইংরেজীতে যাহাকে comparative Philology অর্থাৎ তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান বলে, তাহাতে ভাষার সমস্ত উপাদান এবং বিভিন্ন বিকাশক্রিয়ার আলোচনা থাকা উচিত। Comparative Grammar অথবা তুলনামূলক ব্যাকরণ ইহা হইতে পৃথক শাস্ত্র। ইহাতে ভাষার গঠন সম্বন্ধীয় নীতি এবং পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা আরও সীমাবদ্ধ ভাবে থাকে (a more limited comparis on of structural principles and methods)। Historical Grammar বা ঐতিহাসিক ব্যাকরণ কোনও একটি ভাষার বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আকার এবং অবস্থাবিশেষের বর্ণনা এবং ক্রমপরিণতির বিষয় সংগ্রহ করে। Descriptive Grammar: বা বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ কোনও একটি ভাষার বর্ত্তমান অবস্থার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় আকার প্রকারের বিষয় বর্ণনা করে।

ইংরেজীতে যাহাকে সাধারণত এখন Philology বলা হয়, তাহার আদি অর্থে বুঝাইত—কোনও একটি জাতির চিন্তা পদ্ধতি সভ্যতার বিকাশ ধারা এবং আর্টের পরিচায়ক রচনা বিষয়ে পাণ্ডিত্য পূর্ণ—সাহিত্যিক এবং ভাষা বিষয়ক আলোচনা। (literary and linguistic study and learning concer-

ned with the writings of a people as representive of its thought, style, culture aud art)। ফরাসী এবং ইউরোপীয় অন্যান্য দু একটি ভাষায় এখনও Philology কথাটি উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

এস্থলে অতি সহজ হইলেও একটা কথা সাধারণ পাঠকের নিকট উল্লেখ করিতে চাই। ভাষা এবং সাহিত্য যে এক জিনিস নয়—অনেকে একথা সব সময়ে মনে রাখেন না। ভাষার ইতিহাস এক জিনিস—সাহিত্যের ইতিহাস আর এক জিনিস। আমরা এখানে শুধু ভাষার ইতিহাসের কাথাই আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিকভাবে এই ইতিহাস আলোচনা করিবার নামই ভাষাবিজ্ঞান। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ—আলোচনার সুবিধার জন্য আমাদের প্রথমেই করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে কোনও বিশিষ্ট ভাবে লক্ষ্য না করিয়া শুধু "ভাষা" এই শব্দটিতে যাহা বুঝায় সাধারণভাবে তাহারই—আলোচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ সকল ভাষার অন্তর্নিহিত যে মুল সূত্র গুলি আছে সেগুলি বুঝিতে হইবে।

(১) ভাষার ইতিহাস (History of Language)

(২) অর্থের ইতিহাস (History of Meanings or Semantics)

(৩) ধ্বনির ইতিহাস (History of sounds or phonetics)

(৪) অক্ষরের ইতিহাস (History of writing or Palaeography)

(৫) বিভক্তি-ধাতু-প্রত্যয়াদির ইতিহাস (History of Parts of speech, prefixes suffixes etc. or morphology)

(৬) বাক্‌বিন্যাস রীতির ইতিহাস(History of Sentence structure or syntax)

(৭) প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস (urgeschichte Germant Ur— original, Geschichte—History of Primitive Culture as revealed through words.

এই বিভাগকয়টির ভিতর একটি সম্বন্ধের ধারা আছে। আত্মার বিশিষ্ট শক্তি স্ফুরণের জন্য ভাষার সৃষ্টি হইল। ভাষার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অর্থ আরোপিত হইল। সেই অর্থের প্রকাশক দেহ স্বরূপ শব্দের বা ধ্বনির সৃষ্টি হইল। সেই ধ্বনিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য লিপির আবশ্যক হইল। কালক্রমে বিভিন্ন অর্থবাচক বিভিন্ন ধ্বনি সমষ্টির আকারগত প্রভেদ এবং পরিণতি

ঘটিল। অনেকগুলি শব্দের সমষ্টি লইয়া বাক্যের বিন্যাসপদ্ধতি ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধানতম বিষয় হইল। শব্দের আকার অথবা অর্থের সাহায্যে মানবের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে—তাই এই আলোচনা ও ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম অঙ্গস্বরূপে বিবেচিত হইল।

নির্ভরতা

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ]

মানুষ যে ভগবানকে পেতে চায় তাও তার নিজের মতন করে। ভগবান যখন বৃন্দাবনের প্রেমময় মূর্ত্তিতে আসেন মানুষের এমনি সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির গণ্ডি যে সে তখন নিজের যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রেমময়ের মাধুর্য্যকে হারিয়ে ফেলে। ভগবান তখন মাতৃরূপে বুকের কাছে টেনে নেন তখন তাঁর উপর নির্ভর না করে নিজের বুদ্ধি দিয়ে সেখানে মোহকেই দেখে থাকে। স্ত্রীরূপে যখন প্রেমালিঙ্গন করেন তখন কামকেই প্রেমের আসনে স্থান দেয়, বন্ধুরূপে যখন অবতীর্ণ হন তখন স্বার্থকেই বড় করে তোলে। মা অন্নপূর্ণা যখন খাওয়ান দাওয়ান তখন যেন দিন দিন আস্তে আস্তে কেমন একটা সামর্থ্যহীন হয়ে পড়ে। এই প্রেমের মধ্যে, মাধুর্য্যের মধ্যে কোমলতার মধ্যে যে একটা ভগবদ্‌শক্তির বিকাশ তা মানুষ দেখ্‌তে পায় না—মনে করে শক্তিহীন হয়ে যাবে। আবার যখন ভগবান্ ভীষণ সংহারিণী মূর্ত্তি ধরে রুদ্রভাবে অবতীর্ণ হন তখন যেন বুক দুর দুর করে কেঁপে উঠে সেখানে যে প্রেমের বিন্দুমাত্র আভাস আছে তাও মানুষ মনে কর্‌তে পারে না। যখন শত্রুরূপে এসে দেখা দেন তখন হিংসা দ্বেষ মান অভিমান এসে হৃদয় অধিকার করে বসে। তাই মানুষ কোন অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হতে পারে না। যখন ভিতরে কোমলতার বন্যা দিয়ে ভাসিয়ে দেন, সরলতার সাগরে ডুবিয়ে দেন তখন মনে হয় বুঝিবা মানুষ হৃদয়ের কোমলতা ও সরলতার উপর টেক্স বসিয়েছে। সর্ব্বভাবে ভগবান যে পরিপূর্ণ রূপে আমাদের নিকট এসে হাজির হচ্ছেন তা না দেখে আমরা কোমল হতে কঠোর আবার কঠোর হতে কোমল করে তোলপাড় করে থাকি—ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। পরিপূর্ণ সত্তাকে খণ্ড করে দেখ্‌তে চাইলে ভগবান তাতে রাজী নন, তিনি যে চান মানুষকে পরিপূর্ণ করে তুল্‌তে।

এই যে অবস্থা তার মুল কারণ আমাদের অহমিকা ও ভগবদ্‌নির্ভরতার অভাব। আমরা মনে করি আমাদের মঙ্গল আমরা যেমন বুঝি আর কেউ তেমন নয়। বিশ্বাস করতে পারি নে যে ভগবান্ যখন সংসারে এনেছেন তখন তাঁর যা উদ্দেশ্য তা তিনি অবশ্যই আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন এবং তাতেই আমার জীবনের সার্থকতা। আমার শক্তি কত ক্ষুদ্র আর তাঁর শক্তি কত বেশী মুখে বল্‌লেও বুঝি না।

তাই যতদিন পর্য্যন্ত আমি কোন বিশেষভাবে সাধনা করে ভগবানকে লাভ করব এ অহমিকা মনে থাক্‌বে ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁকে লাভ করা যাবে না। ভগবান্ সমস্ত গীতায় বিশেষভাবে সাধনার কথা বলে উপসংহারে এই কথাই বলছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

জীবনে অনেকদিন দেখেছি শত চেষ্টা করেও নিজের দুর্ব্বলতাকে দূর করতে পারি নাই, মনে মনে ভগবানের নির্দ্দয়তার কথাও ভেবেছি, কিন্তু তারপর এখন এই দুর্ব্বলতার মধ্যেও ভগবান্ আছে, এর মধ্যেও প্রেমময়ের মধুর ভাব বিশেষভাবে বর্ত্তমান রয়েছে ভাব্‌তে পেরেছি তখনই দুর্ব্বলতা দূরে গিয়েছে। ভগবান্ এমনি করে দিন দিন কত শিক্ষা দিয়ে কত ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে সত্যে নিয়ে যাচ্ছেন। খেলা করতে করতে বাপ ছেলেকে মাথার উপর তুলে ধরে ছেলে ভয়ে ভীত হয়, তারপর মুহূর্ত্তেই আবার বুকের কাছে টেনে নেয়ার আনন্দটা আরো আনন্দময় হয়ে উঠে। সংসারে লীলাময়ের লীলা বৈচিত্র্যকে যদি এমনি করে দেখ্‌তে পারা যায় তখন কবির কথাই ঠিক্‌বলে প্রতীয়মান হবে,—

"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছ গোপন।"

সে প্রেম সে নির্ভরতা জমাট বাঁধলে পরে ভীষণ বিষধর সর্পে দংশন করলেও বল্‌তে পারে "প্রিয়তমের বার্ত্তাবহ" তাঁরই বারতা জানাইতে এসেছে। পাহাড়ী বাবার জীবনী এইরূপ নির্ভরতার জলন্ত দৃষ্টান্ত। চোর যখন সর্ব্বস্ব অপহরণ করতে এল তখনও মনে বৈরীভাব আসে নাই, প্রেমময়কে ধরবার জন্য যেমন করে ছোটে তেমনি করে ছুটাছুটি করেছিল। সমস্ত গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমি তো একখানা নির্ভরতার ইতিহাসই দেখ্‌তে পাই, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি খাটিয়ে অর্জ্জুন যখন ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতা হয়েছিল তখনই বলেছিল,—

"যৎ শ্রেয়ো স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাংত্বাং প্রপন্নম্।"

যাহা শ্রেয় তাহা নিশ্চিত করিয়া আমাকে বলো। বলিতে গেলে ইহাই গীতা শাস্ত্রের আরম্ভ। তখন পর্য্যন্তও অর্জ্জুনের বিচারবুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নাই, ভগবৎসত্তার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিতে পারেন নাই, তখনও সন্দেহ আছে, কেবল মাত্র নির্ভরতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তারপরে আরো নানাপ্রকারে সর্ব্ববিষয়ে বিশদ আলোচনা গীতার ভাষায় যাকে বল্‌তে পারি "বিমৃশ্যৈতদ্ অশেষণঃ" গত সন্দেহ হইল তখনই বলিল "করিষ্যে বচনংতব।" ইহাই হইল গীতার শেষ কথা। তাই আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের ভগবান্‌কে যে চাওয়া তাঁকে যে পাওয়া তা তখনই ঠিক্ হবে যখন আমরা সকল প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়ে অর্জ্জুনের মত বল্‌তে পার্‌ব "করিষ্যে বচনং তব।"

মাতা পুত্র

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

মা। কেন বৎস হেরি তোর বিরস বদন?
কোন্ বিষাদের ছায়া দিয়াছে আঁকিয়া
করুণ ম্লানিমা তোর বদন-সরোজে?
বল মোরে কোন্ ব্যথা বাজে তোর বুকে।

পু। দুর্ভিক্ষের হাহারব উঠিতেছে আজি
দেশের মরম ভেদি', তাই বড় ব্যথা
বাজে বুকে, ভাবি হায় দারুণ বিধাতা
কত দুঃখ লিখেছিল এ দেশের ভালে!
মৃত্যু—মৃত্যু চারিদিকে,—ঘোর অন্ধকার!
মৃত্যুরূপা মাতা যেন পেতেছেন কোল
সকল দেশের তরে, তাই হেথা লোকে
বাঁচিয়া মরিয়া থাকে, মরে' তবে বাঁচে!

মা। তিমির-দেশেতে মোরা পথহারা-জন,
সত্য বটে ; কিন্তু এই মরণ-আঁধারে
দহিয়া সোনার রঙ্গে, নব জীবনের
দীপ্ত অগ্নিশিখা কিগো উঠিবে না জ্বলে ?
সকলের শেষ আছে—মোদের এ দুখ
অশেষ অনন্ত হ'য়ে রবে চিরদিন ?
এই দুঃখ-ব্যধি হ'তে দিতে অব্যাহতি
আছে কোন প্রতীকার—দেখেছ ভাবিয়া ?
পুঃ। অনেক ভেবেছি মাগো, কিন্তু দিশাহারা
মনতরী কূলহীন এ চিন্তা সাগরে !
মা। বিরাট এ ভারতের বিপুল জীবনে
কত রোগ, কত শোক, কত দুঃখ রাশি
বিচিত্র আকারে নিত্য আসি দেখা দেয় ;
কে এমন মন্ত্রদ্রষ্টা আছে ঋষিবর
বুঝিয়া কারণ তা'র করে প্রতীকার ?
আশা-নিরাশার আর আলো-আঁধারের
মায়া-যবনিকা আজি ঢাকিয়াছে দিশি,
অন্তরের দিব্যালোকে তমো-আবরণ
নিমেষে ভেদিয়া তা'র দেখাইবে পথ
যেইজন, তা'রি পথ চেয়ে বসে আছে
নিখিল ভারত, আজি সকল কর্ম্মের
মাঝে, মর্ম্মে নিতি নিতি ধ্বনিছে ক্রন্দন
তা'রি লাগি, শত চেষ্টা, শত অস্থিরতা
যাচিছে তাহার মাঝে লভিতে বিরাম।
পুঃ। হেন জন আসিবেন আমাদের মাঝে ?
কতদিনে মিলিবে মা তাঁহার সাক্ষাৎ
আঁধার ভবিষ্যাকাশে আগমন যাঁর
নব জীবনের উষা করিবে ঘোষণা ?
কিবা তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কিবা তার বাণী ?
কিবা তাঁর ধর্ম্ম মাগো ? পথহারা জনে

কোন্ পথে ল'য়ে যাবে আলোকের দেশে ?
জান যদি, কহ মাগো, হৃদয় ব্যাকুল !
মা। কেমনে বলিব বাছা, জননী কি তোর
শক্তিরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী, জ্ঞানের আধার ?
তোর কাছে মা যে তোর বিশ্ব-বিকাশিনী
বিশ্বের নিকটে সে যে দীন ধূলি কণা !
তা'র মুখে সাজে কিরে এই মহাবাণী ?
দেশভাগ্য-বিধাতার ভবিষ্যৎ কথা
শুনিলে তাহার মুখে, বাতুল বলিয়া
উপহাসি' যাবে সবে, তবে এই জানি,
মাতাপুত্রে বাতুলতা করিয়া রেখেছে
এ ধরণী মোহনীয়া সহজ সরল।
তবে আজ আয় বাছা, মাতাপুত্রে মিলি
অর্থহীন বাতুলতা প্রকাশি ধরায় ;
পাগলে বুঝুক শুধু পাগলের কথা।
কেবা সে, একক, কিংবা বহুজন হ'য়ে
আসিবে মোদের মাঝে জানিনা কিছুই।
শুধু এই মনে হয়—মহাভারতের
অন্তর্গূঢ় দীর্ঘতম সংহত সাধনা
বাহিরের মূর্ত্তি ল'য়ে হইবে প্রকাশ,
এক কিংবা বহু হয়ে আত্ম প্রয়োজনে ;
কাল পূর্ণ হ'বে যবে আসিবে সে জন।
শতদল কাটায়েছে তিমির রজনী,
নবীন উষার তরে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ;
সে নব জীবন রবি যেদিন হাসিবে
সে দিন হাসিবে সেও শত দল মেলি'।
ধর্ম্ম তা'র, বাণী তা'র সহজ উদার
নিত্য স্বচ্ছ আলো আর বাতাসের মত।
'শান্তি' 'সামঞ্জস্য' বহি' বরাভয় করে,
প্রশান্ত অভয় মূর্ত্তি, দেখা দিবতা'রে।

সকল প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিদর্শন দ্রাবিড়গণের নিজস্ব; তাঁহারা স্বীকার করুন আর নাই করুন।

ইউরোপ ও এসিয়ার শকপ্রধান বহুদেশে এই পদ্ধতির অস্তিত্ব হইতে ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে দ্রাবিড়গণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বে যে শক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যাঁহাদের ভাষা তাঁহাদের ভাষা হইয়াছে, সেই শকজাতির সাধারণ সম্পত্তি এই শবদাহ-পদ্ধতি তাহার ভস্মাবশেষ সংরক্ষণ প্রণালী এবং সেই সঙ্গে এই প্রকার মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের শিল্প। এই সকল সভ্যতার উপকরণ এবং তাঁহাদের ভাষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি লইয়া দ্রাবিড়গণ অন্যান্য শকজাতিকে ছাড়িয়া ভারতে আসিয়াছেন। তৎপরে হিন্দুদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক হিন্দু হইয়া আপনাদিগের প্রাচীন সম্পত্তি সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

সপ্তদশ অধ্যায়

এই যজ্ঞভঙ্গের ফলে ভোলানাথের সহিত তাহার ভ্রাতৃজায়ার যে মনোমালিন্যের সূচনা হয় যাহা তখন সেরূপ মাত্রাধিক্যে পরিণত না হইলেও পরে এক বিশ্রী রূপ ধারণ করে। যজ্ঞেশ্বরী নিজের চরিত্রগুণে সব দিক সামলাইয়া চলিতেছিলেন; কিন্তু যে পরিমাণ পুরুষত্ব ও চিত্তবল থাকিলে কাঁটা খোঁটাকে অগ্রাহ্য করা যায় ভোলানাথের তাহা ছিল না; পথে ঘাটে সে বিদ্রূপের বাণ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া উঠিল; শত্রুদলের বাড়ী কোন কাজকর্ম্ম হইলে তাহার নিমন্ত্রণ হইত না; স্কুলের চাকরীও রাখা সঙ্কটাপন্ন হইত যদি না মহেশ ভবানীর স্কুলের উপর জাগ্রত দৃষ্টিকে ভয় করিত। তবে পূর্ব্বের মত সুখে চাকরী করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশের ভয়ে যজ্ঞেশ্বরীকে প্রকাশ্যে সে কিছু বলিতে পারিত না, অথচ বাড়ীতে সে বিরক্ত হইয়া থাকিত। একান্নে থাকাতেই তাহার এই শাস্তি ঘটিল, ঘটিতেছে ও আরো ঘটিবে সে প্রত্যক্ষে না পারুক পরোক্ষে ভাবে ইঙ্গিতে কথায় ও কাজে যেখানে সেখানে জানাইতে ছাড়িত না; যজ্ঞেশ্বরী কখনো চাপিয়া ধরিলে সে মিথ্যার আড়ালে

আত্মগোপন করিত। অবশেষে একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে যাহাতে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে পলাইয়া যাইবার কল্পনাও করিতে হয়। ভোলানাথ লুকাইয়া তেজারতী করিত; দায় দৈবে পাড়ার লোক ভোলানাথের কাছে দু দশ টাকা কর্জ্জ করিত। তারামণির পিশি ব্রহ্ম ঠাকুরুণের অসুখ হওয়াতে চিকিৎসার জন্যে তারা—ভোলানাথের কাছ হইতে পাঁচটি টাকা কর্জ্জ করে। তারামণি কন্যা সন্ধ্যার একযোড়া মল বন্ধক রাখে। শুধিতে পারিব না বুঝিয়া তারামণি ভোলানাথকে উহা বেচিয়া ফেলিতে বলে। ভোলা এই উপলক্ষে তারামণির সহিত প্রায়ই দেখা করিত; একদিন সন্ধ্যার পর তাগাদা করিয়া ফিরিবার পথে ভোলানাথ বিক্রীত মালের দাম ১৭টাকা হইতে নিজ সুদ আসল প্রাপ্য মিটাইয়া লইয়া বাকী ফেরৎ দেয়। ভাগ্যের বিড়ম্বনা; ঐ সময়ে জীবন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী ব্রহ্মঠাকুরাণীকে দেখিতে আসিয়াছিল। সে ভোলানাথকে ঘর হইতে দেখিতে পায়; ভোলানাথ তাহাকে দেখে নাই, ভোলানাথ তারাকে ডাকিতে ইতঃস্তত করিয়া চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী তাহাকে শুনাইয়া প্রতিবেশীনী ঈশানভগ্নীকে ডাকিয়া কহিল "আহা ভোলা ছোঁড়া যেন কি হয়ে গেছে ভাজ্‌টাকে এনে পুষ্‌ছে গা আর মাগী উল্টে ছোঁড়ার হাল করে ছেড়ে দিলে; সে দিন ঘাটে বলছে··· ওর মুখ দেখানো ভার হবে বলে আমি তো কোট্‌ ছাড়তে পারিনি যা ভালো বুঝবো তা করবো দেওরের খাইনি যে তাকে ভয় করবো সে আমার নিন্দে করে দুর্নাম করে করুক, কেয়ার বড় গাঁয়ের জমিদারকে করি তা ত দেওর!" —ঈশানভগ্নী কাদম্বিনী বলিল—"ওমা তাই নাকি গো? তা বলবেই তো মাগী যেন দেমাকে ফেটে রয়েছে—তা নইলে বোন্‌ অতগুনো ব্যাটছেলের সুমুখে বল্লে কি করে কথাটা;—"

কা। তবু পয়সা হাতে নেই থাকলে বোধ হয় সব·চাব্‌কেই না দিতো;— ছি কর মা ছি কর! বড়মান্‌সি দেখে গা জলে যায় মা—

তারার অসহ্য হইল, অথচ ভয়ে সে কোনো কথা বলিতে পারিল না; একটা ছল করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে ভোলানাথ—ভোলানাথ তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিয়া আড়ালে লইয়া গেল। হঠাৎ কাদম্বিনীর চোখ পড়িল সে বাহিরে আসিয়া দেখিল তারা ও ভোলা ধানগোলার পেছনে গেল। কাদু ঘরে ঢুকিয়া জীবনের পরিবারকে ডাকিয়া কাণে কাণে বলিল;—ভট্টাচার্য্য-আহ্লাদে আটখানা হইয়া যেন কিছু জানে না এই ভাব দেখাইয়া সেইখানে গিয়া

উপস্থিত হইল। তারা তাড়াতাড়ি টাকা কটা কাপড়ে লুকাইল। দুজনে ভারি অপ্রস্তুত হইল। ভোলা চলিয়া গেল। খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে, সে কথা হাজার বার সত্য। জীবন-পত্নী গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিলা তারু? কি হচ্ছিল?" তারা ভয় পাইয়া বলিল "কটা টাকা ধার চেয়েছিনু তাই এনেছিল।" "ওমা টাকা! তা ধার কেনা করে গো? তা অত লুকিয়ে চুরিয়ে যে?" তারা বলিল "পিসি পছন্দ করে না, ধার করি।" "তবু ভাল ভাইঝির রাঁধুনীগিরিতো পছন্দ করে?" তারা কি বলিবে? সে নিরুত্তর। জীবন-পত্নী কাদুকে ডাকিয়া বলিল "চলো কাদি বেলা হলো।"

তারামণি ও ভোলানাথের এই নিভৃতকথোপকথন কাহিনী নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া জীবন কর্ত্তৃক মহেশের কানে গিয়া পৌছিল। মহেশ দেখিল ভোলানাথের হাত হইতে তারাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে সে ফাঁকে পড়িবে। জীবনকে ডাকিয়া মহেশ পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় বসিল। ভবানী প্রসাদের সহানুভূতি থাকাতে তাহা সহজে সিদ্ধ হইবার নহে বুঝিয়া সে অপেক্ষাকৃত বাঁকা পথ ধরিল। জীবন বুঝাইয়া দিল তারামণির অর্থাভাব প্রচুর; ভোলানাথ বা তাহার ভ্রাতৃজায়া সে অভাব যত না মিটাইতে পারিবে মহেশ তদপেক্ষা বেশ পারিবে। কাজেই জীবন বলিল "প্রকাশ্যভাবে ভোলানাথকে বিড়ম্বিত না করিয়া তারামণিকে আশাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া এমন কি কৌশলে ঋণবদ্ধ করিয়া বশীভূত করিতে হইবে; সম্ভব হয় ভোলানাথকে গ্রামান্তরে বেশী বেতনের চাকরীর লোভ দেখাইয়া পথ হইতে সরাইয়া ফেলিতে পারিলেও মন্দ হইবে না।" মহেশ এ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজী হইল। কাদু ঠাকরুণকে তারামণির সহিত সম্বন্ধ রাখিবার দূতী পদে নিযুক্ত করা হইল। এদিকে স্কুলের হেডমাষ্টারকে বিরলে ডাকাইয়া ভোলানাথের বিরুদ্ধে ছলছুতা ধরিয়া রিপোর্ট করিবার ভার দেওয়া হইল। ভোলানাথের চরিত্র যে সন্দেহযুক্ত এই কথা ইঙ্গিতে হেডমাষ্টারকে জানানো হইল। হেডমাষ্টার মহাশয় বহুদিন হইতে বেতনবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন; এতদিন সুবিধা করিতে পারে নাই; এখন তাহার মাথায় কার্য্য-সিদ্ধির উপায় যোগাইল। তিনি বুঝিলেন সেক্রেটারী বাবুর মনস্তুষ্টি করিতে পারিলে তাঁহার স্বার্থ সাধন সহজসাধ্য হইবে।

হেডমাষ্টার দিন বিলম্ব না করিয়া ভোলানাথকে নজরে নজরে রাখিতে লাগিলেন; প্রত্যহই একটা ছল ছুতা করিয়া অপদস্থ করিতে ছাড়িলেন না;

মাঝে মাঝে ভয়ও দেখাইতে লাগিলেন "আপনার কাজকর্ম্মে বড় শৈথিল্য ছাখছি যদি অ্যামনে চলেন, তা হলে রিপোর্ট করতি ছাড়মুনা বুঝ্যা চলবেন—।" হঠাৎ একদিন আধঘণ্টা লেট হওয়ার জন্য ভোলানাথ সস্‌পেণ্ড হইল। ভোলানাথের বুঝিতে বাকী রহিলনা, হঠাৎ এমনটী কেন হইতেছে।

সেদিন ভোলানাথ বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া কথা কহিলনা। যজ্ঞেশ্বরী ব্যাপার কি হইয়াছে জানিবার জন্য ভোলানাথের কাছে যাইলেন স্ত্রীর উপর রাগ এই :জন্য যে যজ্ঞেশ্বরীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করার সে আদপে পক্ষপাতিনী নয়। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন যে ঝিকেমেয়ে বৌকে জব্দ করার পলিসিতে এই রাগ। যজ্ঞেশ্বরী ভোলানাথকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। ভোলানাথ বলিতে বসিল।

ফলে তুচ্ছ একটা কথা লইয়া সে দিন দেবর ভাজে খুব একচোট একটা কলহ হইয়া গেল; ভোলানাথ রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল, সমস্ত দিন আর বাড়ী ঢুকিলই না; যজ্ঞেশ্বরী চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। সৌদামিনী মুখ ভার ও মন আঁধার করিয়া দাওয়াতে বসিয়া রহিল। কিরণের দেখিয়া শুনিয়া অসহ্য হইল; সে খুব রাগ করিয়াই মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে বসিল। বলিল—"এতেও তো মা তোমার লজ্জা হচ্চেনা তবু থাকতে হবে এখানে?"

য। বলি যাব কোন চুলোয় বল্‌?

কি। কেন মামার বাড়ী চল?

য। কি দায় দুঃখে ভাই ভাজের ভাত মাগ্‌তে যাব শুনি?

কি। এমনি করে কি এখানে থাকতে হবে? ভাতই বা মাগ্‌তে যাবে কেন? দু দশ দিন নিদেন না হয় মাস খানেক থাকলে? তার পর দাদা গুছিয়ে উঠ্‌লে না হয় বাসা করবো সব?

য। বাসা করে আলাদা থাকা তো? তা এখানেও তো হতে পারে? এ বাড়ীতে কি আমার অংশ নেই? স্বামী শ্বশুরের ভিটে থাকতে পরঘরি কেন হতে যাব শুনি?

কি। তাই না হয় করো? তোমার অসহ্য না হয় কাকারতো হয়েছে? এখনো বুঝতে পার না যে তুমি এখানে থাকাতেই ওঁর এত—

য। তুই থাম্‌। একসঙ্গে থাকলে ঝগড়াঝাটী হয় না? তোদের সঙ্গেই কি

কখনো কথা কাটাকাটি কি মনান্তর হবে না ? একদিন আধদিন একটু ঝগড়া হলে ঘর ছেড়ে পর হতে হবে ?

কি। এক আধ দিনতো নয়, এ যে নিত্যিকাণ্ড হয়ে পড়েছে ? তোমাকে উনি চান্ না তুমি গায়ে পড়ে থাকবে নাকি ?

য। হ্যাঁ থাকি যদি ? অপমান টা কিসে ? আপনার লোকতো ? এতো পরের গায়ে পড়ে থাক্‌চিনি।

কি। আপনার যে এসব জায়গায় পরের বাড়ী হয়ে পড়ছে !

য। তাই বলুক না খুলে যে এক অন্নে থাকা হবে না আমি খুসী হয়ে আলাদা হেঁসেল করছি ; হাঁড়িই না হয় আলাদা হলো তাতে ওরা আমার পর হবে না তা ছাড়া তোর কাকা আমায় না চাইতে পারে সন্তুকে আর গোবুকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও সোয়াস্তি পাব না।

কি। কাকাই যদি অশান্তি ভোগ করেন তা হলে কাকীমা কি তোমার জন্যে তাঁর অশান্তি বাড়াবেন ? মোটকথা তোমার এখানে আর থাকা ভাল হচ্চে না।

য। খুব হচ্চে যা তুই, আমায় আর জ্বালাস্‌নি সব—

কি। আমরা জ্বালাচ্ছি না তুমিই সবাইকে জ্বালাচ্ছ ?

য। কিরণ তোদের কি তাই ই ধারণা ? (যজ্ঞেশ্বরী কাঁদিলেন)

কি। (লজ্জিত অনুতপ্ত হইয়া) না মাপ কর। বড্ড দুঃখে এই কথা বলছি আমাদের নয় তবে কাকার সংসারকে বটে ।

য। এখনি তোরা দু সংসার আলাদা ভাবছিস্ কিরণ আমি যে তা পারিনি, পারবোও না—তোরা না হয় মামার বাড়ী গিয়ে থাক্।

কি। আর তুমি এইখেনে থাক, কেমন ? মা কি আমাদের এমনিই ভাবো ? হ্যাঁ মা।

য। না তা নয়, তা নয় তোরা কেন অশান্তি পাস্ !

সন্তু সব শুনিতেছিল উঠিয়া আসিয়া কিরণকে বলিল—"কিরণ কেন দিদিকে চোখের জল ফেলাস্। যে অশান্তি সংসারে দেখা দিয়েছে তা যে আরো ওই পাপে আগুণ হয়ে উঠবে। দিদি মাপ কর তাকে তুমি না মাপ করলে—"

য। আচ্ছা পাগলতো সন্তু তুই ? আমি কি শাপ শলুই দিচ্ছি যে মাপ চাইছিস্—? বলি তুইতো দেখছিস্ সব কেন এমন হচ্চে বল দেখি ? আমি কতটা দোষী তাই যে বুঝতে পারছি নি ।

সত্থ। এক বিন্দু না দিদি এক বিন্দু না! তোমাকে ঠিক মত চিন্‌তে পেরেছি আর পারছি এইটেই আমার বড় সান্ত্বনা আমি জানিনি কি বল্‌বো, কি করবো! তবে একটা কথা দিদি তুমি কোনো কথায় থেক না; কোনো কথাটীতে নয় হাঁ না ভাল মন্দ কিচ্ছু না—রোগ যে ওর কোথা আমি তাও বুঝতে পারিনি কি বোঝাব? কি পন্থা দেখবো আমার যে মাথান্তর হয়েছে দিদি। মনে হচ্চে ছুমাস পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ী বসে থাকি!

য। তুই কেন ঘর দোর ছেড়ে পালাবি বোন্? আচ্ছা সত্থ একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি, মাথা খাস্ আমায় সত্যি বলবি; ঠাকুরপোর কি সত্যিই আন্তরিক ইচ্ছে আমি এখান হতে চলে যাই—? বা ভেন্ন হয়ে থাকি? আর কেনই বা এ ইচ্ছে?

সত্থ। ভগবান জানেন কেন এ ইচ্ছে তবে কথায় বোধ হয়; আমার দোষ নিওনি দিদি আমি তোমাদের সরিয়ে দিয়ে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে সুখী হবো তা নয়—

য। না লো না তা ভাববনা আমি কি তোকে চিনিনি তুই স্বচ্ছন্দে বল্ কি ওর মনের কথা—

সত্থ কাঁদন্ মাদন্ হইয়া বড় যা এর হাতছটী ধরিয়া বলিল—'ওরা ওঁকে শাসিয়েছে যে তুমি ভাজের সঙ্গে একান্ন থাক্‌লে গাঁয়ে ওঁর তিষ্ঠানো ভার হবে বাউনদের যে সে দিন অমন করে অপমান করতে পারে—তার সঙ্গে যার কোনো সংস্পর্শ থাকবে সেই ওদের শত্রু; দেখলেতো সে দিন স্কুলের হেড-মাষ্টার কিরকমেই না, ওঁর পেছনে লেগেছে—বলছিল কাল, চাকরী বুঝি থাকে না—"

য। চাকরী বিনি দোষে মারলেই হলো?

স। যাদের হাতে চাকরী তারা মারলে রাখেইবা কে দিদি? আর দেখছইতো ওর তেমন সাহস বা জোর আছে যে নড়বে?

যজ্ঞেশ্বরী অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন; ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা সত্থ! আমার অন্তত কিছুদিনের জন্য আলাদা হয়ে থাকা বা স্থানান্তরে যাওয়াই ভাল; সত্যিইতো কেন আমি ওকে আমার বিপদের জালে জড়াই? ওরা আমাকে জব্দ করবার জন্য নানান্ রকমে বিরম্বনা ঘটাবে আমি সে সব হীনতা স্বীকারও করতে পারবো না আর ঠাকুরপোকেও তাতে রাজি করতে পারবো না। কেন তবে মিছি মিছি ওর সুখের ঘর ভাঙ্গি। সুখের ঘর

গড়তে এসে যে এমনি করে ভেঙ্গে বস্‌বো সে ভাল নয়—সেই ভাল আমি এই ভিটে ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে থাকি তবে গ্রাম ছেড়ে যেতে পারবো না যাবও না সদু ; তোকে আর গোবুকে ছেড়ে আমি যমালয়েও গিয়ে সুখী হবো না। আমার দেহ মন যেমনি তোদের আছে তেমনি থাকবে—

সদু। কেন দিদি ভিটে ছাড়বে কেন ? এ ভিটে কি আমার একলার ? শ্বশুরের ভিটেতে তোমারও অধিকার কম কিসে ? বরং বেশী বড়ঠাকুরের টাকাতেই তো এ ভিটে ?

য। সে জানি সদু আমি যদি সত্যিই মনে জ্ঞানে তোদের ওপর শত্রুতা করে ভিন্ন হতাম তা হলে ভিটে ছাড়তাম না তবে কি না ঠাকুরপোর ধারণা আমা হতে দূরে থাক্‌লে সে সংকট থেকে উদ্ধার পাবে তাই এই মতলব, দুদিন তাই থাকি সদু। পালডাঙ্গাতে একটা ঘর তুলে না হয় কিছুদিন থাকিগে ?

স। তাই কি হয় দিদি। আবার খরচ করে আলাদা ঘর তুলতে যাবে কেন ? সে কেমন ধারা হবে ?

য। গোটাছুই কুটুরী ! আছে আমার একটা মতলব—পরে জান্‌বি ; এই ভিটেতেই আমাকে ফিরে আস্‌তেই হবে দেখে নিস্ সদু এ আমার বিশ্বাস আর মন নিচ্ছে যে আবার আমাদের এক সঙ্গে মিশতেই হবে আর বেশী দিন দেরিতেও না যেমন ছিনু তেমনিই থাকবো। এখন ঘর ভাঙ্গচে বটে কিন্তু এ ভাঙ্গা জুড়বেই জুড়বে একদিন ঠাকুরপো তার ভুল বুঝে বৌদিকে ফিরিয়ে আন্‌তেই হবে—যখন চিড় ধরেছে তখন জোর করে তাকে চেপে ধরে জুড়তে যাওয়া ভুল ; তাতে ফল উল্টাই হবে ; এই যে ভুল বোঝা বুঝি আমাদের দেওর ভাজে এর একটা শেষ আছেই সদু ; ভুলটাই সংসারে সবচেয়ে বড় নয় ঘুমের ঘোরে চোখের ঝাপসার মত ক্ষনিক ; কেটে গেলে চোখ পরিষ্কার হবে সত্যি যা তাই বড় হয়ে ফুটে উঠবে—

সদু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমার স্বামীর মত আমিও দুর্ব্বল আর ভীতু, কিন্তু দিদি আমি তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে পরম সাহস ভরসা পেয়েছিলুম ; কিন্তু যার সঙ্গে আমার ভাগ্য বাঁধা সে য'দ সে-সাহস, সে-ভরসা না পায় আমাকে বাধ্য হ'য়ে তার সঙ্গেই চল্‌তে হবে—আমার দোষ নিওনি দিদি।" যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া সদুকে বুকে টানিয়া তার মাথায় চুম্বন করিয়া বলিল—"পাগল হলি সদু আমি তোকে বুঝিনি ? এত

কথা তোকে বল্‌তে হবে কেন? যাতে তোরা নিরাপদ হোস্ আমি তাই-ই কর্‌ছি আমার মনপ্রাণ ভালবাসা তার কি একবিন্দু হতে তোরা বঞ্চিত হবি? কোলের ছেলেটী বেঁচে থাকলে আজ গোবুর মত বড় হতো? গোবু আজ আমার সেই শূন্যস্থান দখল করে বসেছে; তাকে ফেলে যেতে পারি আর আমার একবিন্দু শক্তি নেই সত্ত! ওই আর একটা পরের ছেলেকে কিরণ আপনার করে বসে আছে—ওই বা যাবে কোথা?"

এমন সময় "জ্যাঠাইমা তুমি কি আজ আমাকে খেতে দেবে না" বলিতে বলিতে গোবরধন বাড়ীতে ঢুকিয়া ক্ষুধার শানে গলার সুর কত ধারালো হইতে পারে তাহার পরিচয় দিল। কাছে আসিয়া কোলের উপর ধুপ করিয়া পড়িয়া বলিল "কি যে তোমরা কেবল কেবল কাঁদছ তা জানিনি খে-তে-দে-বে—কি না—বল—জ্যাঠাইমা—?" জ্যাঠাইমা গোবরকে বুকে চাপিয়া চুম্বনে তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া বলিলেন—"চলো বাবা চলো—বাবা নয়তো সব শত্রু!—কেন এমন করে আমায় বাঁধলি বল্‌তো?" "বা রে বা কই বাঁধলুম? হ্যাঁ মা জ্যাঠাইমাকে আমি বেঁধেছি?" সত্ত আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে গেল। গোবর অবাক হইয়া জ্যাঠাইকে বলিল "হ্যাঁ জ্যোঠিমা মা কাঁদছে কেন?" জ্যেঠিমা বলিলেন "আমি মেরেছি।" গোবর হাসিয়া বলিল—"যাঃ তুমি মেরেছ! তাই বুঝি হয়!'

য। (হাসিয়া বলিলেন) হয় না? মার্‌তে পারিনি?

গো। কখ্‌খনো না—

য। তবে কাঁদছে কেন?

গো। (চুপি চুপি) বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—

কিরণ। কি ঝগড়া গোবু?

গো বাবা মাকে মামার বাড়ী যেতে বল্‌ছিল তা মা যাবে না তাই বাবা মাকে বকেছে—

য। চল্ ভাত দিগে খিদে পেয়েছে।

যজ্ঞেশ্বরীর কত কি ভাবনা হইল। দেখিলেন স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত অশান্তিতে কাল কাটাইতেছে। তাঁহার মত স্থির করিতে আর বিলম্ব হইল না। সত্ত গোবরকে ডাকিলেন "ভাত খাবি আয়।" গোবর ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িল। যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন "যা বা ভাত খেগে যা মা ডাক্‌ছে—।" গোবর চলিয়া গেলে যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন, "কিরণ বিজুকে চিঠি লেখ্, এসে আমাদের নিয়ে যাগ

মাস খানেক কাশীপুরে গিয়ে থাকিগে, এর মধ্যে একটা ঘর তুলে এসে ঐ খানেই বাস করবো।”

কিরণ। ঘর আবার কেন মা? এতেও তো আমাদের ভাগ আছে?

ম। ঘর আসলে তোর জন্যে কিরণ—এইতো খান বারো কুটুরী ছেলে-পুলের বিয়ে থা হলে তোর মাথা গোঁজবার স্থান নেই আর আমার ইচ্ছে নয় মা, ভাই ভগরের অন্নদাসী হয়ে বিধবা বোনেরা থাকে—আলাদা থাকবি সম্ভাবও থাকবে—মা বোনের একমুঠো হবিষ্যি জুটে যাবে—কার মনে কি আছে মা কে জানে? ইহকালের সুখ সাধ তো ঘুচেছে যে কটা দিন থাকবি শান্তিতে থাকিস এই ইচ্ছে আমার—যাগ এসব কথা পরে হবে এখন পত্র লিখগে তোর দাদাকে। পরশুই এসে নিয়ে যায়—দিন ভাল আছে কোনো মতে বিলম্ব করে না যেন লিখিস্—। তিনি উঠিয়া কার্য্যান্তরে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—“লিখিস্ আমরা যে যাবো তা যেন লোক জানাজানি না হয়···ভাইঝির বিয়েতে নেমন্তন্ন এই বল্‌তে হবে—তা না হলে শত্রুরা খুব নাচবে যে ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে।”

* * * *

বিজয় পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইল। মা যে উপস্থিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিতে চায় ইহাতে সে খুসী হইল না মাস খানেক আগে হইলে হইত। মায়ের আসার সঙ্গে সঙ্গে মাসখানেকের জন্য তাহার পল্লীবাস বন্ধ হইবে, সেই আশঙ্কাতেই সে সুখী হইল না; তাহার তরুণ জীবনাকাশের পূর্ব্বভাল যে সুখ-রবির গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার দর্শনানন্দ হইতে যে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, এই তার ভয়; তবে মা যে আবার গ্রামে ফিরিবেন এবং সেখানেই বাস করিবেন এ আশায় সে আশ্বস্ত থাকিল। ছুটী ছিল না পাইবেও না; অথচ মাতৃআজ্ঞা পরশুই তাহাদের আনিতে হইবে। বিজয় সমস্যায় পড়িল; তারপর ভাবিয়া এক উপায় স্থির করিয়া পঞ্চুকে পত্র দ্বারা এই কার্য্যটী সমাধা করিবার অনুরোধ করিল। কিন্তু চলিয়া আসার যে কারণ, পঞ্চুকে তাহা জানাইল না—পত্রে লিখিল মামাতো বোনের বিবাহ উপলক্ষে আনা। মাকেও সেই ব্যবস্থার সংবাদ দিল। পঞ্চু পত্র পড়িয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইল; যে কিশোরীটীর···লজ্জামুগ্ধ···মুখের অরুণিমা ও চোখের স্নিগ্ধ কটাক্ষ···প্রথম দরশনেই তাহার হৃদয়বীণার গোপন তারে এমন অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন রাগিণী তুলিয়া দিয়াছে যে রাগিণীর অনাহত ধ্বনি

তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশ্বের নূতনতর ও গভীরতর অর্থ শুনাইয়া দিয়াছে তাহাকে আর যে নবলব্ধ বন্ধুটির স্বভাব-মাধুর্য্য ও সঙ্গসাহচর্য্য তাহার পল্লী-জীবনের তিক্ততা নষ্ট করিয়াছিল তাহাকেও কিছুদিন দেখিতে পাইবে না। কিন্তু উপায় কি? বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা অপ্রিয় কার্য্য হইলেও করিতে হইবে। তবে জোর মাস খানেক এই বিরহভোগ এই যা সান্ত্বনা। পঞ্চু যজ্ঞেশ্বরীকে গিয়া বিজয়ের পত্রসংবাদ দিল। যজ্ঞেশ্বরীও খবর পাইয়াছিলেন।

যথাদিনে পঞ্চু উহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় রাখিতে গেল। তর্ক-সিদ্ধান্তের বাড়ীর নিকট আসিয়া পাল্কী থামাইয়া যজ্ঞেশ্বরী নামিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে গোপনে জানাইলেন, সিদ্ধান্ত মহাশয় বলিলেন "এই মতলবই ভাল, তবে ফিরে এস মা—জন্মস্থানে হাজার দোষে দোষী হলেও তোমাদের মত লোকের সংস্পর্শ হতে বঞ্চিত হলে আর তার কোনো কালে সদ্গতি হবে না। শুধু সেই জন্যেই মা এত লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করেও মাটী আঁকড়ে এখানে পড়ে আছি।" যজ্ঞেশ্বরী প্রতিজ্ঞা করিলেন ফিরিয়া আসিবেন। কন্যাদের সহিত পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহারা পাল্কীতে চাপিলেন।

গ্রামের লোকে জানিলেন যজ্ঞেশ্বরী ভাইঝির বিবাহে কলিকাতা গেলেন। সদুও আসল মতলব চাপিয়া গেল। মনে যার পর নাই ব্যথা পাইয়া সে শুইয়া রহিল। সেদিন ভোলানাথ কোনো এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে পড়িয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরী চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল; সদু প্রথমে উত্তর না দিয়া পরে বলিল—"ভালইতো হয়েছে, কদিন হতে তুমি তো চাইছই তাই!" ভোলানাথ বিরক্তভাবে বলিল "ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল তা কেহ জিজ্ঞাসা করছে না—তবে এমন করে থাকা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।" সদু বলিল, "বেশতো এইবার সম্ভব হবে।" ভোলানাথ উত্তর করিল —"তোমার যদি এতই দরদ হয়েছিল তুমিও গেলে পারতে—।" "পারলে কি বলতে হতো তোমায়? তুমি নিশ্চিন্ত হলে, কিন্তু আমি জানলুম যে ঘরের লক্ষ্মী হারালুম—এইটে জেন যে সব যায়গায় স্ত্রীলোকেই ঘর ভাঙ্গে না, স্বামীকে ভাই ভাজ থেকে ভেন্ন করে না; এটা তোমার মত পুরুষেরই দ্বারা হয়ে থাকে। উপলক্ষ হয় শুধু আমার মত হতভাগীরা।" এই বলিয়া সৌদামিনী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভোলানাথ মর্ম্মে মর্ম্মে নিজের কাপুরুষতার জন্য লজ্জিত হইলেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া স্বস্তিবোধ করিল। (ক্রমশঃ)

উদ্বোধন

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

আয়রে বাঁধন-কাটা রঙিন্ নবীন সাধক দল,
মায়ের বুকের কলজে-ছেড়া যে গান আজি উঠে্ছে বেজে
তোরা শুন্‌বি ওরে শুন্‌বি ওরে শুন্‌বি তোরা চল।
মেঘ-ছুটা আজ উষার গগন দেখ্‌না চেয়ে ওরে,
অঙ্গনে যে ফাগ লেগেছে, শিশিরবুকে জাগছে তৃণ ভোরে,
ওরে টুটা আগল দোরে।
বিহগ-কুলায় নূতন গীতি,
ভয় ভেঙেছে মায়ের প্রীতি ;
আজ মিলেছে খোঁজা বীথি,—
মায়ের ছেলে মায়ের বুকে আয়গো।
রঙ চঙে ও কথার মোহে ভুলিস্‌নেরে তোরা,
আপন গেহে উজল-স্নেহে বাঁধরে বুকে বল॥
মিলন যাদের নাইকো ঘরে বিশ্বপ্রেমে মাতলে হাসি পায়,
কাঙাল যারা আপন দোরে পরের দেশের আন্‌বে অতিথ হায়!
হেলা-ঠেলা পল্লী তোদের ডাকছে—'ওরে আয়' ;
শিল্প তোদের মরে আছে জাগিয়ে দেরে তাই।
ফিরে পা'বি লুপ্ত তোদের তপোবনের ঋদ্ধি হ'তে
ফোটা মহান্ ফল।
তোরা শুনিসনেরে ছল!!
ভূমার লাগি ভূখা হৃদয় যার,
দলন-নীতি করবে কি ভাই, তার ?
গোপন কারায় আজ লেগেছে আলো,
অমারাতি করবে কি আর কালো ?
মরার মত মরতে হ'লে বাঁচার মত বাঁচতে হবেগো,
মামুলীও মনভুলানো 'বিশ্বপ্রেমে' বাদ পরে কি
তোদের আঙিন-তল ?
ও সব জ্ঞানের ঝলমল,
ওরে নবীন সাধক দল!

ভুলভাঙ্গা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

১

'বাবা মা মত দিয়েছেন বল্‌চো, তবে আমার মতের দরকার ?'

'রাগ করোনা লক্ষ্মীটি, একবার শুধু হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও !'

'যাও—যাও, পুরানো অভিনয় রেখে দাও, পথ ছাড়ো—কাজ আছে, ভালো বিপদ সকালবেলা !'

'ওঃ ! আমি তা হলে তোমার একটা বিপদ ! এতদিন তা বুঝিনি, তা বিপদ নিয়ে ঘর করবার দরকার কি ? বালাই একেবারে দূর করে দিয়ে একজন সম্পৎ নিয়ে এলেই চুকে যায় !'

'আচ্ছা কে তোমায় সকালবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ডেকেছিল বল দেখি ? আমি কি তোমায় কোনো কথা বলেছি ? তুমি যাবে বাপের বাড়ী—জরুরী তাগাদা, বোনের বিয়ে—আমি কোনো কথা বলতে যাবো কেন ? আমি বল্‌লেই বা তা শুনবে কে ?'

'শোনো লক্ষ্মীটি, রাগ করোনা। একটী মাত্র বোন, তার বিয়েতে আমোদ আহ্লাদ করতে নিয়ে যাচ্ছে, যাবোনা তা হলে ?'

'তোমার সখের প্রাণ—আমার কোন কথাই আর তোমার শুন্‌তে হবে না।'—এই বলিয়া সবেগে নরেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। অনিলা ছুটিয়া জানালার কাছে লুকাইয়া কাঁদিতে বসিল।

বিপুল অশ্রুধারায় তার ঠোঁটের অলক্তরাগ উঠিয়া গেল, মান্দ্রাজী শাড়ী ভিজিয়া গেল, সে একবার মনে করিল যে তার কাকাবাবুকে ফিরাইয়া দেওয়াই ভালো, আবার কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে গেল।

শাশুড়ী পুত্রবধূকে তার কাকার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। সারা বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়াও নরেন্দ্রনাথের দেখা মিলিল না।

নরেন্দ্রনাথ একেবারে আফিস যাইবার সময় মাতা মহামায়ার কাছে আসিল। মহামায়া রান্নাঘরে ডাল সিদ্ধ করিতে গিয়া নামাবলী গায়ে আহ্নিক করিতেছিলেন। কর্ত্তার তখনও স্নানাহার হয় নাই, তিনি বাড়ীর ভিতরে

একটুকরা জমিতে কত আলু ফলাইতে পারা যায়, তাহা লইয়া বিশ্বম্ভর মণ্ডলের সঙ্গে আলোচনা করিতে ছিলেন। বামাচরণ বাবু সদাশয় মানুষ,—সকলে তাহাকে কৃপণ বলিত বটে, কিন্তু তিনি প্রাণপণে সকলের উপকারই করিতেন।

'মা, বাবা আজ কাছারী যাবেন না?'

'হাঁ, বাবা, যাবেন বৈকি। তোর খাবার সময় হলো, তুই খাবি কখন, নরেন?'

'এই যে মা, দাও ছুটী খেয়ে নিই। পাপ বিদেয় হয়েছে ত?'

'ষাট—ষাট! অমন অলুক্ষুণে কথা বলতে আছে! সিথের সিঁদুর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। আমার যত চুল—

'আচ্ছা, এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি? একেবারে সেখানেই আড্ডা নিলে হয়। দেখচো মা, বাবার কাণ্ড! ঐ একরত্তি জমি, ঐখানে উনি হাজার মণ আলু ফলাবেন! আচ্ছা এত টাকা খাবে কে?''

এক পুত্র কিনা—তাই নরেন্দ্রনাথের এত আদর। বামাচরণ বাবু তিনটী কন্যাই বহুদিন পূর্ব্বে সুপাত্রে ন্যস্ত করিয়াছেন। পিতাপুত্র দুইজনেই বেশ উপায় করেন। তিন বৎসর হইল, নরেন্দ্রনাথের এক ধনীগৃহে বিবাহ হইয়াছে। বড়লোকের মেয়ে অনিলা, দেখিতে একেবারে দেবকন্যা, অথচ একটুও গর্ব্ব নাই। সকলেই তার রূপগুণের সুখ্যাতি করে। কিন্তু এই তিনবৎসরে হয়ত মাত্র তিনবার নরেন্দ্রনাথ অনিলাদের বাড়ী গিয়াছে। তাহাও শ্বশুর সঙ্গে করিয়া লইতে না আসিলে যায় নাই। তাহার মত, যার যেমন অবস্থা তার সেই রকম থাকাই ভালো। এম, এ, বি, এল, পাশ করিলেও ধনী সেশন্স্ জজ্ শ্বশুরের উমেদারী ও সুপারিশে সে মুন্সেফী-পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়বাজারে দালালী করিতেছে। তাহার এই স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানবোধ দেখিয়া অনিলা মনে মনে বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিত। সেইজন্য সে সহজে বাপের বাড়ী যাইবার নামও মুখে আনিতনা। কিন্তু পরশু যে ছোট বোন প্রমীলার বিবাহ—সে বিবাহে না গেলে লোকে কি বলিবে?

২

সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া নরেন অন্যদিনের মত আর বেড়াইতে গেল না। শয়নগৃহের টেবিলে একখানা সদ্য প্রকাশিত ফরাসী নভেল লইয়া পড়িতে বসিল। প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে, কলিকাতা সহরের বায়ুমণ্ডলটা একটা ঘন

ধূমের আবরণে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। নরেন ক্রমশঃ চিন্তার ভারে এতই অবসন্ন বোধ করিতেছিল যে সহরের অনন্ত কোলাহল, ট্রামের শব্দ, ফিরিওলা-গণের প্লুতরব, মোটরের হৃদয়বিদারী গর্জ্জন—তাহার চিন্তার সমুদ্রে সব ডুবিয়া গেল। সে দেখিল টেবিলে ছুটো মাথার কাঁটা পড়িয়া আছে। তাহা একবার চকিতে নাসিকাগ্রে ধরিল, ক্রমে তাহার মনটা আবেশে বিভোর হইয়া উঠিল, সে গত রজনীর ব্যবহৃত শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া একেবারে শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিল। ঐখানে তাহার ট্রাঙ্ক ছিল, এখন সেখানটা অস্বাভাবিকরকম ফাঁকা, ঐখানে তাহার নীলাম্বরী, খড়কে-পাতা শাড়ী, সেমিজ ও ব্লাউজ থাকিত; সন্ধ্যার সময় শঙ্খধ্বনি করিয়া আসিয়া ঐখানে তাহাকে কত নমস্কার করিত; আর ঐ চেয়ারের পার্শ্বে নিঃশব্দপদসঞ্চারে কতবার আসিয়া সে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া গিয়াছে। সমস্ত কক্ষটী অনিলার মধুর স্মৃতিগন্ধে ভরপুর হইয়া আছে। কিন্তু আজ সে কোথায়? যে এত ভালবাসার নিদর্শন দিয়া গিয়াছে, সে কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে? কেন, কাল যাইলে কি চলিতনা? যাহাকে অত সুন্দর দেখিতে, তার কি পাষাণ দিয়ে গড়া হৃদয়! এদিকে তাহার একদিন বেড়াইয়া ফিরিতে দেরী হইলে অনিলার ক্রোধের সীমা থাকিত না। আর আজ সে তাহাকে কাহার কাছে রাখিয়া গেল? যাইবার সময় চোখ দুটী কি একবার ছলছলও করিল না? অথচ এদিকে সে কাজের দায়ে কতবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে, আর প্রতিবারই অনিলা কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। এ সবের অর্থ নরেন্দ্রনাথ মোটেই বুঝিলনা। সে ভাবিল, নারী মাত্রেই স্বার্থপর, বিলাসের দাসী। যেখানেই অসার ও ক্ষণিক আনন্দ, সেইখানে নারীই অগ্রণী। ভালবাসা বলিয়া কোন জিনিষ এ পৃথিবীতে নাই। ও-সব কবির কল্পনা। আবার ভাবিল এত কষ্টইবা কিসের জন্য? যে তাহাকে চায় না, সে-ই বা কেন তাহার জন্যভাবিয়া মরিবে? যাক্, আর সে অনিলার কথা ভাবিবে না, অনিলা বলিয়া এ জগতে কেহ ছিল না।

৩

নরেন্দ্রনাথের শ্যালক আসিয়া বিবাহ বাড়ীতে তাহাকে লইয়া গেল। সে নানারকম ওজর আপত্তি তুলিল, কিন্তু বৃদ্ধ বামাচরণের আদেশ হইলে আর সে দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না।

সে রাত্রে বিবাহ-সভা গুলজার। নূতন বর একে জমীদারের পুত্র দেখিতে তাহারচেয়েও সুন্দর। বিবাহ-সভায় সকলেই ব্যস্ত। সকলে তাহাকে

অন্দরে পাঠাইয়া দিল। তখন নূতন জামাতার বরণ হইতেছে। অনেক সুন্দরীর সমাবেশ হইয়াছে। এসেন্সের ও ফুলের নিবিড় গন্ধে সেই বিদ্যুদালোকিত প্রশস্ত গৃহপ্রাঙ্গনটী ইন্দ্রপুরীর মত হইয়াছে। দূরে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে সে বরণ দেখিতেছিল। ভয়ত্রস্তা বধূবেশা প্রমীলা বরের সম্মুখে গোলাপী চেলী পরিয়া অবনতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। আর চারিদিকেই তরুণীদের কোলাহল ও জনতা,—যেন কি-একটা অনেক কালের হারানো দুর্লভ জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, এমনি ভাব। নরেনের চক্ষুও সেই ভিড়ের মধ্যে যেন কাহাকে খুঁজিতেছিল। ঐ যে খয়ের রংএর সিল্ক সাড়ীপরা হাস্তমুখরা চঞ্চল মেয়েটী! বরের হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতেছে।—ঐ যে সপ্রতিভ বর মহাশয়ও কি-একটা বেশ জবাব দিলেন—সকলে খুব হাসিয়া উঠিল, শুধু ওই মেয়েটাই যেন লজ্জায় ভিড়ের ভিতর সরিয়া গেল। ঐ যে ঐ যে! নরেন্দ্র সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না।

সে বেশ বুঝিল, নূতনের আগমনে পুরাতনের অমর্য্যাদা অবশ্যম্ভাবী। তাহার বিদ্যা ও চরিত্রবল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ত এই বরের মত রূপের ও টাকার ঝলক্ নাই। বর ইন্দুপ্রকাশ তাহার মত রসবর্জ্জিত অকবি নয়,—কেমন চুলের পারিপাট্য, বেশের অভিনবলীলা, কেমন কবিত্বময় ভাবভঙ্গী। সকলেই ইন্দুপ্রকাশের সারল্য ও রূপের প্রশংসা করিতেছে। শেষে অনিলাও তাহা দেখিয়া ঢলিয়া পড়িল! এতদূর নরেন্দ্রনাথ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

নরেনের শাশুড়ী তাহাকে যত্ন করিয়া আহারাদি করাইলেন। তারপর বাসরঘরের পালা। গৃহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ঘরে খুব পুরু কারপেট বিস্তৃত একপ্রান্তে সুসজ্জিত, মাল্যদানবেষ্টিত, আলোকমালা মণ্ডিত 'খোপে' বর ও কনে, আর তৎসমক্ষে নানাবয়সের নারী একটা প্রকাণ্ড হারমোনিয়ম লইয়া বসিয়াছে। নরেন পার্শ্বের কক্ষ হইতে সব শুনিতেছিল।

'হাঁ বর তোমার শালী কোন্‌টা জানো ত?'

'খুব জেনেছি—যে গাল টিপে ধরেছিলেন! দিদি, শুনুন, এখন পালিয়ে গেলে চলবে না, এখন আমার ব্যথা সারিয়ে দিয়ে যান।'

অনিলা হাসিয়া বলিল, "না ভাই বর, আমাকে আর সারাতে হবে না, গালের অসুখ গালেই সারে—ঐ যে তোমার বাম পাশেই ঔষধ!"

প্রমীলা গুণ্ঠনের আড়াল হইতে অনিলাকে মস্ত বড় একটা কিল দেখাইল।

লাবণ্য বলিল, 'ভাই বর, একটা গান শোনাও!'

চারু বলিল, 'হাঁ ভাই, তোমার কথাই যখন এত মিষ্টি, না জানি গান আরও কত মিষ্টি!'

বৃদ্ধা ঠানদিদি বলিলেন, হাঁ দাদা, আগে তুমিই আরম্ভ করো, নইলে বাসর জমবে না।

ইন্দু বেশ ছেলে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে হারমোনিয়ম কোলে তুলিয়া প্রমীলার দিকে মুখ ফিরাইয়া গাহিল—

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনি!

তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনি!' ইত্যাদি।

গানের সুরলহরী সেই গন্ধাকুল কক্ষে ভাবের তুফান তুলিল। বয়োবৃদ্ধারা তেমন তারিফ্ না করিলেও অনিলা শতমুখে ইন্দুর সঙ্গীতনৈপুণ্যের প্রশংসা করিল। বেচারা প্রমীলা মাধবীরাতের মোহমুগ্ধার মতই সে ইঙ্গিতে ধরা পড়িয়া গেল—একবারে চিরজীবনের মত। তারপর ইন্দু অন্য সকলকে গাহিতে বলিল।

'আচ্ছা, তুই না বরের শালী, তুই গাইবিনা ত গাইবে কে?'

'না, দিদি, আমি গান জানি না, আমায় মাপ করো।' তার মনে হইতেছিল—নরেন্দ্রনাথের সেই গম্ভীর আদেশ।

সুহাসিনী বলিল, 'না তোকে গাইতেই হবে, ইন্দু একবার বলতেই কথা রাখলে আর তুই যে একেবারে নাছোড়বান্দা!'

ইন্দু বলিল, 'হাঁ, এখানে গাইতে আর আপত্তি কি, এখানে ত আর আপনার ভয় করবার কেউ নেই!'

নরেন্দ্রনাথ ঘরের ভিতর উৎকর্ণ হইয়া রহিল। সে শাশুড়ীর নিকট অসুস্থতার ছল করিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িয়াছে।

অনিলা ভাবিতে লাগিল—বাস্তবিক কি গান গাহিবে সে!

'আচ্ছা, আমি গানই জানি না—কি গান গাইবো!'

ইন্দু ধরিয়া বসিল, 'না, সে কথা শুনছিনি, শিকারী বেরালের গোঁপ দেখলেই চেনা যায়। তাই নরেন বাবু আপনাকে ছাড়তে চান না, সে খবরটুকু আমি আপনাদের বাড়ী এসেই একটী ছেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়েচি।'

ছিঃ ছিঃ, অনিলার বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল।

অশেষ আগ্রহের পর অনিলা গান গাহিতে রাজী হইল। ইন্দু হারমোনিয়মে স্থর দিতে লাগিলেন।

প্রথমে চাপা গলায় অনিলা ধরিল—

'হৃদি বাঁধিয়া কেন নয়ন জল
দাওনা সখা মুছিয়া।
'সে যে অতীতের স্মৃতি বিরহের গীতি
যাওনা কেন ভুলিয়া
(তুমি যাওনা কেন ভুলিয়া)।
কাতর প্রাণে ব্যাকুল হৃদয়ে
মিছে কেন ঘর ঘুরিয়া।
তুমি অমন করিয়া মুখেরি পানে
থেকোনা শুধু চাহিয়া
(তুমি থেকোনা সখা চাহিয়া)।'

বড় সুন্দর—বড় সুন্দর! সঙ্গীত ভক্ত ইন্দুও শেষ লাইনের সকরুণ সুরটী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া প্রীত হইল। নরেন ভাবিল—এতদূর? আর এদিকে আমি কতবার পায়ে ধরিয়াছি একটী গান গাহিবার জন্য বেশ, যথেষ্ট হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই পার্শ্বের দ্বার দিয়া নরেন্দ্র বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। বাহিরে গিয়াও তাহার গানের এক লাইন মনে পড়িতেছিল—

'সে যে অতীতের স্মৃতি বিরহের গীতি
যাওনা কেন ভুলিয়া' ইত্যাদি।

৪

প্রমীলার বিবাহের পর প্রায় কুড়ি দিন কাটিয়া গিয়াছে। অন্যবারে অনিলা বাপের বাড়ী গিয়াই চিঠি দিত, কিন্তু এবার কোনই সাড়াশব্দ নাই। নরেন্দ্র আরও ক্রুদ্ধ হইল। সে ভাবিল,সে অন্ধকারের জীব,—যাহারা আলোকের রাজ্যে বাস করে, তাহাদের কাছে তাহার আঁধার স্মৃতি যে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত। বর্ষার উচ্ছ্বসিত নদী যেমন আপন অন্তঃস্থলে মাটী কাটিয়া চলিয়া যায়, তেমনি অব্যর্থভাবে এই ধারণাটা নরেনের বুক চিরিয়া চিরিয়া গভীর হইয়া রহিল। মহামায়া দেখিলেন, ছেলের আর কোনও বিষয়ে তেমন অনুরক্তি নাই, তাহার মুখে সে দীপ্তিময় হাসিও নাই, সামান্য কথায় আজকাল সে বড়ই রাগিয়া যায়। তাহার শয়নগৃহ হইতে নরেন অনিলার স্মৃতি যথাসম্ভব মুছিয়া

ফেলিয়াছে। আজ সে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল। আহারাদির পর তাহার খুব জর আসিল। মহামায়া ও রামচরণ অত্যন্ত ভাবিত হইয়া পরদিনই অনিলাকে আনাইতে পাঠাইলেন।

প্রভাতের অরুণ কিরণ যখন ঘরের ভিতর নির্ম্মল হাস্যের মত প্রবেশ করিয়াছে, তখন যাতনায় অধীর হইয়া নরেন ডাকিল 'মা গো, একটু জল।' দ্বিপ্রহরের জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে বিভ্রান্তমনে উত্তেজিত হইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পরই অনিলা আসিল। সে জানেনা যে নরেনের অসুখ করিয়াছে। শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিতে গিয়া নরেনের কক্ষে ব্যাপার দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

মহামায়া বলিলেন, 'একটু চুপ করে শোও, বাবা। এই যে অনিলা মা এসেছে। দেখ বাবা।'

নরেন্দ্র প্রলাপের মতই বলিল, 'না, অনিলা, কিছুতেই গান গেয়ো না। ইন্দুকে কি এতই সুন্দর দেখতে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও গান শিখবো এবার থেকে, দেখো—দেখো'।

মহামায়া উঠিয়া গেলেন। অনিলা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বামীর শিয়রে বসিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

অনিলা বেশ বুঝিতে পারিল কিসের জন্য নরেনের এই অসুখ করিয়াছে। সে সহসা উঠিয়া নরেনের পদধূলি লইয়া সেই জ্বরতপ্ত পা দুখানি বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ওগো, জন্মে জন্মে যে তোমাকেই চেয়েছি। সে-সব লোক-দেখানো আনন্দ—তাহার ভিতর কি প্রাণ ছিল? তুমি আমার দেবতা হইয়া এ কথা বুঝিলে না? হে মদনগোপাল, এই বুকের রক্তে তোমার চরণযুগল ধুইয়া দিব, আমার স্বামীকে নীরোগ করিয়া দাও, প্রভু!'

মদনগোপাল জীউ অনিলার কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। সপ্তাহ পরে নরেন্দ্রনাথ পথ্য পাইয়া সুস্থশরীরে সন্ধ্যা বেলায় যখন হাসিতে হাসিতে অনিলার সযত্নরচিত কবরীটি নির্ম্মম ভাবে বিশ্রস্ত করিয়া দিল, তখন অনিলা বলিল, 'এই বুঝি আমার পুরস্কার? না, এটা আমার দোষের শাস্তি?'

'না, না, অনিলা, এটা পুরস্কার, আর এই শাস্তি' বলিয়া অনিলার কম্পমান আরক্তগণ্ডে নরেন্দ্রনাথ সস্নেহে চুম্বন করিল।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লাহোর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পরিচিতদের মধ্যে যাঁহাদের সহিত দেখা শুনা করিয়াছিলাম তাঁহাদের একজনের বিষয় এখানে কিছু বলিয়া রাখিতে চাই। ইনি বোধ হয় ঠিক পাঞ্জাবী ছিলেন না। ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস যুক্ত-প্রদেশেরই কোন স্থানে হইবে। তবে এখন পাঞ্জাববাসীই হইয়া গিয়াছিলেন এবং ইঁহার আচার ব্যবহার সব পাঞ্জাবী ধরণেরই হইয়া আসিয়াছিল। নিজের পূর্ব্ব পরিচয় নিজে না প্রকাশ করিলে ইনি যে পাঞ্জাবী নন এইরূপ ভ্রম কাহারও হইবে না। অনেক বাঙ্গালীই বাঙ্গলাদেশের বাহিরে বসবাস করিতে-ছেন, কিন্তু ইঁহারা নিতান্ত শীঘ্র শীঘ্র নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলেন না। তিন চার পুরুষ অথবা আরও বেশী দিন বিদেশে বসবাস করিয়াও অধিকাংশ স্থলেই ইঁহারা ঠিক বাঙ্গালীটিই থাকিয়া যান, বরং সে সকল স্থান বাঙ্গালীদের এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ বিশেষে পরিণত হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা দেখিয়াছি, ঐরূপ অবস্থায় বিদেশে বসবাস করিতে করিতে খুব শীঘ্রই নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া একেবারে সেই সকল দেশের লোক হইয়া পড়েন। যাহা হউক কাশী ফিরিবার পূর্ব্বে ইঁহার সহিত কথা-বার্ত্তায় ইঁহার ভিতর একটু সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া-ছিলাম। ইনি নানা কথার পর দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে বাঙ্গলাদেশ ঐ সময় তাঁহাদিগকে মোটেই অর্থের সাহায্য করেন নাই যদিও সেই মামলাতেই বসন্তকুমারের জন্য টাকা ও ব্যারিষ্টার প্রেরিত হইয়াছিল; এইরূপ আরও কিছু কিছু অভিযোগ তিনি বাঙ্গলার বিরুদ্ধে উপস্থিত করেন। আমি যদিও সে সময়কার সকল সংবাদ সম্পূর্ণরূপে জানিতাম না, কারণ দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি ঐ দলে প্রবেশ করি, কিন্তু আমি যাহা জানিতাম সেই অনুযায়ীই বলিলাম যে আমরা দল হইতে কাহাকেও কিছুই সাহায্য করি নাই, এবং টাকা ও ব্যারিষ্টার যে পাঠান হইয়াছিল তাহা বসন্ত বাবুরই কোনও বিশেষ বন্ধু নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ঐরূপ সাহায্য করিয়া-ছিলেন। পাঞ্জাবের নবীন শিখদলের বিষয় ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, যেন

এবিষয় ইনি কিছু জানেন না এইরূপ ভাবে উত্তর দিলেন, অথচ যাহা বলিলেন তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা গেল যে এই দলের বিষয় ইনি নিতান্ত যে কিছু জানেন না তাহা নহে, তবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। অথচ এই দলে তাঁহার নিকট হইতে এসকল বিষয় জানিবার অধিকার আমার ছিল। ইঁহার বলিবার ধরণে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছিল যে এই শিখদল নিজেদের খেয়ালমত সব কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহারা কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা রাখে না। অর্থাৎ কিনা "বাঙ্গলাদেশ! তুমি আবার কেন ইহার মধ্যে মাথা গুজিতেছ?" রাসবিহারী এ সময় পাঞ্জাবে আসিলে কাজের সুবিধা হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন হাঁ তিনি ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম "হাঁ, ইচ্ছা করিলে।" দেখিলাম রাসবিহারীকেও এদিকে আনিবার ইঁহার বিশেষ আগ্রহ নাই, অথচ ইনি রাসবিহারীর সহিত বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। কয়েকজন শিখ দলের নেতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করায় বলিলেন যে তেমন শিখ নেতাদের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই, অথচ ইতিপূর্ব্বে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে লাহোর হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি ইহাদিগকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন। যখন তিনি এইরূপে শিখদলের অনেক কথা আমার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন আমি কিন্তু তখন মনে মনে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম।

অহংকে যতই দূরে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি না কেন, অহংভাব কতরূপেই না আমায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এইরূপে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক ইহার সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, পাঞ্জাবীরা সকলেই এইরূপ ছিলেন। বরং যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী ছিলেন তাঁহারা অন্যদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীকে যেন অধিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং আমার মনে হয় অন্যান্য প্রদেশবাসীর অপেক্ষা এমন কি অনেক পাঞ্জাবীর অপেক্ষাও শিখেরা যেন বাঙ্গালীদের প্রতিই একটু অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। আমার বোধ হয় সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে যাঁহারা থাকেন না তাঁহারাই সমালোচক হন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটিও আমাদের কার্য্যে অনেক সময় অনেকরূপে সাহায্য করিতেন বটে কিন্তু মোটের উপর যেন আমাদের নিকট হইতে একটু দূরেই থাকিতেন। সেইজন্য আমরাও উঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিতাম না; তবে এই সময় পাঞ্জাবের ভিতরকার অবস্থা জানিবার জন্য সকলকার

নিকটই যাওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। বিপদে পড়িলেও ইনি যে কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবেন না এতটা বিশ্বাস ইহার উপর অবশ্যই ছিল এবং সে বিশ্বাস যে ঠিক ছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে কারণ তিনি বিপদেও পড়িয়াছিলেন যথেষ্ট।

যাহা হউক বিপ্লবায়োজনের এক অভিনব পর্ব্ব আরম্ভ হইল ভাবিয়া কাশী অভিমুখে লৌহযানে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। কেবল থাকিয়া থাকিয়া ইহাই মনে হইতে লাগিল কতক্ষণে কাশী গিয়া পঁহুছিব, কতক্ষণে রাসুদাকে গিয়া সকল কথা বলিব।

পাঞ্জাবের অবস্থা দেখিয়া ইহা বুঝিয়াছিলাম যে খুব শীঘ্র এই নবীন শক্তিকে সংহত ও সুসম্বদ্ধ করিতে না পারিলে হয়ত এই শিখেরা অসময়ে একটা এমন কিছু করিয়া বসিতে পারে যাহাতে সকল শক্তি সকল উদ্যম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে—তখন কে জানিত যে এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও, এত সন্তর্পনে এত সংযতভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াও পরিণামে সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে—অবশ্য এজগতে কিছুই ব্যর্থ হয় কিনা সে আলোচনা এখন করিলাম না।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথেই স্থির করিয়াছিলাম যে যত শীঘ্র পারা যায় দাদাকে এদিকে পাঠাইয়া দিতে হইবে, এবং আমাদের অঞ্চলেও সৈনিক-দিগের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। এতদিন কেন আমরা এই দিকে মন দিই নাই তাহা পরে বলিব। আমি মনে সঙ্কল্প করিলাম যে দাদাকে এইদিকে পাঠাইয়া আমি বাঙ্গলাদেশে চলিয়া যাইব। বহুদিন হইতেই আমার বাঙ্গলাদেশে গিয়া কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। আমি এবিষয় দাদাকে ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে তিনি মোটেই মত দিতেন না।

পাঞ্জাব ছাড়াইয়া যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিয়াছে; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার কামরাটীতে যাত্রী বড় বেশী কেহ ছিলেন না। বোধ হয় আমরা তিনচারিজন হইব। সে সব দিনে বোধ হয় জগতে এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা না হইত। পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় হইতে হইতে ইউরোপের মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠিল। আমার একটি সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহাদের গ্রাম হইতে সৈন্য সংগ্রহ কিরূপ চলিতেছে। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে সেনাদলে লোক সংগ্রহ আজ-কাল নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যদিও অনুনয় বিনয় ও

প্রলোভনের অন্ত নাই। প্রথমতঃ মাসিক বেতন খুব উচ্চহারে দেওয়া হইবে এবং একমাসের বেতন অগ্রিম পাইবে এইরূপ বলা হইতেছে। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছেন। যাহারা এইরূপ লোক সংগ্রহ করিয়া দিতেছে তাহাদিগকে খুব উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এত করিয়াও লোক পাওয়া যাইতেছে না? সৈনিক হইবার সামর্থ্য আছে এমন পুরুষেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া যাইতেছে। আমি বলিলাম তাহা হইলে বোধ হয় লোক সংগ্রহ একেবারেই হইতেছে না? উত্তরে তিনি বলিলেন, যে নিতান্ত যাহারা একেবারে গর্দ্দভ, প্রলোভনে পড়িয়া প্রথমতঃ তাহারা সৈনিকদলে প্রবেশ করিতে স্বীকার করিতেছে ও পরে যখন সৈনিকের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তখন তাহারা সৈনিক দল ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারিতেছে না, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া অনেকে পলায়ন তৎপর হইয়া পুনরায় পুলিশের কবলে লাঞ্ছিত হইতেছে।

পাঞ্জাবের অবস্থাও ঠিক এইরূপই শুনিয়াছিলাম, সেখানে নাকি সৈন্য সংগ্রহ করা আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময় কিন্তু আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কি রেলে, কি পথে ঘাটে সকলস্থানেই অশিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে তীব্র ইংরাজবিদ্বেষ যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। একদিন কাশীর একটি প্রান্তর কোনের ইঁদারায় বাঁধান সানের উপর বসিয়া একটি হিন্দু স্থানীর সহিত আমাদেরই কোনও কাজের কথা লইয়া আলোচনা হইতে ছিল। অদূরে একটি চাষী ঘাস কাটিতেছিল। এক সময় দেখি সে আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; একটু পরে ঘাস কাটিতে কাটিতে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু! ইংরাজ রাজত্ব থাকিবে কি না?" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি মনে হয়?" সে বলিল "বাবু! এবার ইংরাজ রাজত্ব আর থাকিবে না, ইহাদের সময় হইয়া আসিয়াছে।" "বাবু জার্ম্মানরা কতদিনে আসিবে।" আমরা তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম জার্ম্মানরা আসিলে আমাদের কোনও লাভ নাই; কিন্তু সে পুনরায় বলিল—"না বাবু! ইংরাজেরা আর ন্যায়ধর্ম্ম পালন করছে না, এদের এখন যাওয়াই ভাল"। ইহার পরে আমাদের যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছিলাম, এখন তা না বলিলেও চলিবে। এই সময় দেখিয়াছি বাবুরা ইহাদের কথায় সায় না দিলে বাবুদের উপর ইহারা অসন্তুষ্ট হইত।

পাঞ্জাব মেল কাশীতে বেলা তিনটার সময় আসিয়া পঁহুছায়। আমার

উপর আবার সে সময়ে পুলিশের খরতর দৃষ্টি। ভোর বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত পুলিশ বাড়ির দরজার সম্মুখে অথবা নিকটেই কোথাও বসিয়া থাকিত ও বাড়ির বাহির হইলেই আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্ত ছায়ার মত অনুসরণ করিত। বাড়ির বাহির না হইলেও আমার সহিত দেখা শুনা কাহারও পক্ষে নিরাপদ ছিল না, কারণ আমার সহিত যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা পুলিশের নজরে পড়িবে তাঁহারই দশা আমার মত হইবে। সেই জন্ত সে সময় আমাদের মত লোকের সহিত সহজ সরলভাবে মেলামেশটাও দোষের মধ্যে ছিল। এইরূপ কড়া পাহারার মধ্যে থাকিয়াও আমাদের সকল রকম কাজই করিতে হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে বোমা ও রিভলভার ইত্যাদি কাশী অঞ্চলে আনা আবার এই দিক হইতে এই সব পাঞ্জাবে বিভিন্ন প্রদেশে লইয়া যাওয়া, এ সবই এইরূপ কড়া পাহারা সত্ত্বেও করা হইয়াছে। পুলিশের চোখে ধুলা দেওয়াটা আমরা মোটেই কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম না। কি করিয়া আমরা পুলিশের তীব্র পাহারা ব্যর্থ করিতাম তাহার কতক পরিচয় দিয়া পরে অন্ত কথা বলিব।

পুলিশের দৃষ্টি এড়াইবার আমাদের সর্ব্বপ্রধান কৌশল ছিল প্রথম বাড়ির বাহির হইবার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কোনওরূপে প্রহরীকে:ফাঁকি দেওয়া। যদি প্রথম বাড়ির বাহির হইবার সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতে অকৃতকার্য্য হইলাম ত সেবার দলের কোন কাজ না করিয়া, দলের কাহারও সহিত দেখা না করিয়া সহপাঠীদের কাহারও বাটি চলিয়া যাইতাম অথবা বাজার ইত্যাদি ঘুরিয়া সংসারের কোন কাজ লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম, বাড়ির লোকে মনে করিত "আজ যে বড় শচী সংসারের কাজে মন দিয়েছে!" আর তা না হইলে কারমাইকেল লাইব্রেরীতে গিয়া মাসিক পত্র ও খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়িয়া বাড়ী ফিরিতাম। নিতান্ত পক্ষে গ্রীষ্ম কাল হইলে পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া মাথায় কিঞ্চিৎ তেল মর্দ্দন করিতে করিতে মা গঙ্গার পুণ্য সলিলে দেহ মন সিক্ত করিয়া সে যাত্রা প্রহরীকে অল্পেই নিষ্কৃতি দিতাম, কারণ কোন কোনও দিন বেচারা আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে নাকাল হইয়া যাইত। এই সকল প্রহরীদের প্রায় কাহারও সহিতই কোনরূপ ব্যক্তিগত বিরোধভাব ছিল না, চোখে চোখ পড়িলেই ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিতাম। হয়ত তেতালার জানালা দিয়া উকি মারিয়া দেখিতেছি প্রহরী ভায়া কোথায় কোন দিকে কি অবস্থায় আছেন,

এমন অবস্থায় প্রহরীও আমায় দেখিতে পাইল, আমি জানালা ভাল করিয়া খুলিয়া দিলাম বন্ধুবর মাথা নীচু করিয়া মন্থর গতিতে স্মিত হাস্যে বাড়ির সম্মুখ দিয়া একদিকে কিছু দূরে চলিয়া গেলেন। এ সব আমরা অধিকাংশ সময় কেবল উপভোগই করিতাম। এই সকল প্রহরীদের ফাঁকি দিতে পারিলেও মহানন্দ হইত আবার ফাঁকি দিতে যাইয়া ধরা পড়িলেও একটা হাস্য কৌতুকেরই সৃষ্টি হইত কিন্তু কখন কখনও এই সব প্রখর দৃষ্টির ফলে কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইলে ইহাদের উপর ভয়ানক রাগ হইত। অনেক সময় ইহাদিগকে আমরা বুঝাইতাম "ভায়া, নিজেদের চাকুরি যে কোনও উপায়ে পার বজায় রাখ, কিন্তু এরূপে সারাদিন বাড়ির সম্মুখে বসিয়া থাকাটা কি ভাল, বাড়ীর লোকে, পাড়াপ্রতিবেশীরাই বা কি মনে করিবে। আর দেখ সরকার বাহাদুর মনে কি করিতেছেন না জানি আমরা কি ভয়ানক কার্য্যই করিতেছি, এটা তাঁহাদের ভুল বিশ্বাস, যাহা হউক তোমাদের চাকুরী তোমরা অবশ্যই বজায় রাখিবে কিন্তু বৃথা আমাদের এরূপে ক্রমাগত বিরক্ত করিও না।" এই সব গুপ্তচরদিগের অনেকে আবার ভাল মানুষও ছিল, তাহারা আমাদের সহিত এত নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলিত যে তাহাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্রও হিংসাভাব ছিল না বরং তাহাদিগকে দেখিলে কেমন একটু সহানুভূতির ভাবই মনে আসিত। তাহারাও অধিকাংশ সময় নিতান্ত দায় পড়িয়া দিনান্তে অথবা সকাল বিকাল কেবল এইটুকুমাত্র খোঁজ লইয়াই ক্ষান্ত থাকিত যে আমরা কাশীতেই আছি কি না এবং পরে বাটিরই নিকটবর্ত্তী কোনও গলিতে অথবা বড় রাস্তার কোনও দোকানে বসিয়া অবশিষ্ট সময় হাস্যালাপেই কাটাইয়া দিত। কিন্তু আমাদিগকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিলে অনুসরণ করিতেও ছাড়িত না। আবার এক একজন এইরূপ ভাবেই আমাদের পিছনে লাগিত যেন আমরা তাহাদের জন্ম জন্মান্তরের শত্রু। আমরাও ইহাদিগকে নাকাল করিতে ছাড়িতাম না। হয়ত শুধু শুধুই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, এক গলি হইতে আর এক গলি ঘুরিয়া হঠাৎ খুব জন কোলাহলের মধ্যে গিয়া পড়িয়া পাস কাটাইয়া একেবারে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইতাম। যদি গুপ্ত পুলিশ বিভাগের কোনও দারোগা এইরূপে আমাদের অবাধে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতেন ত সে দিন যে প্রহরী আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার ভাগ্যে অম্ল মধুর রসের ব্যবস্থা হইত।

অনবরত এই সকল গুপ্তচরদিগের সহিত লুকোচুরি খেলার ফলে আমাদের

এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে ইহাদিকে দেখিবামাত্র গুপ্তচর বলিয়া অনুভব করিতে পারিতাম। আজত সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাই আজ আরও স্পষ্টভাবে আমাদের নিকট ইহা প্রতিভাত হইয়াছে যে আমরা পুলিশের কৌশলের নিকট কখনও পরাস্ত হই নাই। কেবল মাত্র আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া পুলিশ একটিও নূতন লোকের পরিচয় পায় নাই। ইহারা যখন চক্ষের মত আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত সেই সময়ই আমরা বোমা ও রিভলভার লইয়া কাশীরই বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসা করিয়াছি আবার এইসব আমরা কাশীর বাহির হইতে আনিয়াছি এবং কাশীর বাহিরেও প্রেরণ করিয়াছি। একদিন সকাল বেলা বাড়ী ফিরিতেছিলাম, বাটির সন্নিকটে আসিয়া পড়িত পর একেবারে গুপ্ত পুলিশের দারোগার সম্মুখে, সঙ্গে আবার তাঁহার একটি অনুচর। আমায় দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমিও ঠিক তেমনই প্রফুল্ল বদনে তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। "কোথাও গিয়াছিলেন মর্ণিংওয়াক করিতে বুঝি।" আমিও বলিলাম হাঁ একটু বেড়াইয়া আসিলাম। "এটা কি" বলিয়া আমার বুক পকেটের একটি ছোট খাতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ধরিলেন। তৎক্ষণাৎ খাতাটি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া দিলাম। খাতায় নেপোলিয়ানের কএকটি উক্তি ও ঐরূপ আরও দুই একজন খ্যাতনামা দগের জীবনের কোনও কোনও বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। খাতাটি ভাল করিয়া দেখিয়া আমায় তিনি পুনরায় ফিরাইয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে আমরা বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেলাম। সেই দিন সেই সময় আমার জামার নিম্নের পকেট গান্‌কটন্ ও ঐরূপ আরও অন্যান্য ভীষণ পদার্থে পূর্ণ ছিল।

দূর হইতে দেখিলেই যেন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিতাম যে ইহারা পুলিশের লোক। সাধারণ প্রহরীদের পাদুকা দেখিলেই অনেক সময় চিনিতে পারা যাইত। আবার অনেক সময় তাহাদের মাথার টুপি, চলিবার ভঙ্গি ও হাতে ছড়ি ধরিবার ধরণ এমন বিশিষ্ট রকমের ছিল যাহা আমাদের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে কখনও আত্মগোপন করিতে পারে নাই। অথবা কখন কখনও ইহাদিগের সঙ্গীদিগকে দেখিয়া ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইত। রাজপথে চলিবার সময় আমাদের এমন কতকগুলি অভ্যাস হইয়া-গিয়াছিল যাহা জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত দূর হয়

নাই। রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে হয়ত কাহারও সহিত গল্প করিতে দাঁড়াইয়া গেলাম এবং সেই অবসরে আগে পিছনে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা। রাস্তার মোড়ে একবার করিয়া পিছনে তাকানর অভ্যাসের ফলে এই সে দিনও অনেকের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছি। তাহা না হইলে হয়ত কোন দোকানে কিনিবার অছিলায় অথবা অন্য কোনরূপ বাহানা করিয়া চলিতে চলিতে একবার করিয়া অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া লইয়া রাস্তা চলিতাম না। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতাম যে আমাদের এতটুকুও অসাবধনতা হইলে একজনের জন্য দলকে দল হয়ত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে না দাঁড়াইয়া পিছন কখনও ফিরিতাম না। যদি একই মুখ কয়েকবার দেখিলাম ত তাহার উপর তখনই সন্দেহ হইয়া যাইত এবং সন্দেহ ঠিক কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কোনও নির্জ্জন গলিতে ঢুকিয়া পড়িতাম। তখন হয় তিনি ধরা পড়িয়া যাইতেন অথবা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনুসরণ ত্যাগ করিতে হইত। যখন এইরূপে আমাদের অনুসরণকারীকে ধরিয়া ফেলিতাম, তাহাকে কোনও রূপে ফাঁকি দেওয়াই তখন আমাদের প্রথম কাজ হইত এবং এরূপ ক্ষেত্রে ফাঁকি দিবার প্রধান অবলম্বন ছিল নির্জ্জন পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ খুব জনবহুল স্থানে আসিয়া ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ফেলা। তাহা ছাড়া প্রথম বাড়ীর বাহির হইবার সময়ই খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতাম এবং বিশেষ কাজের দিন অতি প্রত্যুষে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতাম। যখন বাড়ী ফিরিতাম, দেখিতাম আমার অনুসরণ কার্য্যে নিযুক্ত প্রহরীটী আমি বাড়ীতেই আছি ভাবিয়া বাড়ী আগলাইয়া বসিয়া আছে।

পুলিশের সহিত আমাদের এইরূপ সম্বন্ধ ছিল। এই অবস্থায় বেলা তিনটার সময় কাশী আসিয়া পঁহুছিলাম। পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া বাড়ী গেলাম আবার বাড়ী হইতে পুনরায় দাদার বাসায় গেলাম। রাসবিহারী সেসময় কাশীতেই ছিলেন। পুলিশ কিন্তু তখনও ঘুণাক্ষরেও আমাদের গতিবিধির বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই।

দাদার সহিত পরামর্শ ঠিক হইল যে যুক্তপ্রদেশেরও সৈনিকদিগের মধ্যে বিপ্লব প্রচার আরম্ভ করিতে হইবে এবং অবিলম্বে বাঙ্গলাদেশেও এই সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ৫ই ডিসেম্বরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কারণ পৃথ্বী সিংএর সহিত দেখা শুনা হইবার পর বাঙ্গলা দেশে যাইব এইরূপ স্থির

হয়। ইতিমধ্যে কাশীর সেনাবারিকে যাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায় তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দুই একদিন যাইতে না যাইতে কাগজে পড়িলাম আমেরিকা প্রত্যাগত কিছু শিখ একটী গ্রামে টাঙ্গা করিয়া যাইতেছিলেন। পুলিশ সন্দেহ করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিতে যায় ও তাঁহাদের নিকট হইতে রিভলভার ইত্যাদিও পায়। পুলিশ তাঁহাদিগকে ধরিতে যাইলে তাঁহারা গুলি চালান ও একজন পুলিশ বিশেষরূপে আহত হন। পরে প্রকাশ পায় ইঁহারা নাকি কোনও খাজানা লুট করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এমনই ইঁহাদের কর্ম্মকুশলতা যে পুলিশ দেখিবামাত্র ইঁহাদিগকে সন্দেহ করে।

এই উপলক্ষে কিন্তু গ্রামের লোকেরাও পুলিশকে সাহায্য করিয়াছিল। গ্রামের লোকদের ধারণা হয় যে পুলিশ মামুলি চোর ডাকাত ধরিতেছে, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই অবশ্য তাহারা পুলিশকে সাহায্য করে। ইহারও কিছুদিন পরের ঘটনা বলিতেছি, তখন বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবময় ধর পাকড়ের ধূমে এক বিচিত্র কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে, ভাই-পেয়ারাসিং নামের একটি যুবককে ধরিবার জন্য পুলিশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ একদিন এক পুলিশঘোড়সওয়ারকে একটি যুবকের পিছনে পিছনে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে দেখা গেল। এইরূপে যুবকটি প্রায় মাইল তিনেক ছুটিলেন। ঘোড়ার সহিত প্রতিযোগিতায় আর যেন পারিতেছেন না এমন সময় তাঁহারই স্বগ্রামবাসী আসিয়া পথ প্রতিরোধ করায় তিনি ধরা পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পুলিশ সওয়ার আসিয়া বহুদিনের পলাতক ভাইপেয়ারা সিংকে ধরিল। গ্রামের লোকেরা যখন জানিতে পারিল যে যাঁহাকে তাহারা ধরিয়াছে তিনি তাহাদেরই গ্রামের সুপরিচিত ও সকলেরই বড় প্রিয় ভাই পেয়ারা সিং তখন অনুশোচনার আর অবধি রহিল না। এই ভাই পেয়ারা সিংএর সহিত যিনিই মিশিবার সুযোগ ও অবকাশ পাইয়াছেন তিনিই ইঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইঁহার পেয়ারা নাম সার্থক হইয়াছে। ইনি যেমন নম্র প্রকৃতির ছিলেন তেমনই ইঁহার চরিত্রের মধ্যে কেমন এক শান্ত, সমাহিত ও সুসংযত তেজেরও আভাস পাওয়া যাইত। গ্রামের লোকেরা সত্যই ইঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল এবং বিধির নির্ব্বন্ধে এই মুগ্ধ গ্রামবাসীরাই যেন স্বহস্তে তাহাদের প্রিয়জনকে পুলিশের কবলে সমর্পণ করিল।

যাহা হউক পাঞ্জাবের গ্রেপ্তারীর খবর পড়িয়া আমরা একটু বিচলিত হইলাম, কারণ প্রতিক্ষণ আমরা এই ভাবিতেছিলাম যেন এরূপ মহাসুযোগ কোনও অনবধানতার জন্য নষ্ট হইয়া না যায়। এদিকে আমাদের দলের উপযুক্ত দুই একটি ছেলেকে আমাদের কর্ত্তব্যের বিষয় বলা হইল। এখন হইতে আমরা অন্য কোনও দিকে মনোযোগ না দিয়া কি করিয়া সৈনিকদিগের মন পরিবর্ত্তন করা যায় কেবল এই দিকে আমাদের সকল সামর্থ্য নিয়োগ করিলাম। একদিন আমিও আমার একটি মারাঠি বন্ধু সেনাবারিকের দিকে গেলাম। সোজা বারিকে না গিয়া প্রথমে আমরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কারণ যদিই আমাদের কেহ অনুসরণ করে ত যেন সেনাবারিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ হইয়া না পড়ে। ষ্টেশনে পঁহুছাইবার পর রেলের লাইন ধরিয়া বারিকের দিকে অগ্রসর হইলাম। ষ্টেশনে পৌছাইতে ও ষ্টেশনের লম্বা প্লাটফর্ম্ম পার হইতে হইতে আমাদের কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইত। আর যখন রেলের লাইন ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিতাম তখন সবই সুস্পষ্ট হইয়া যাইত। সেনাবারিকে যাওয়া আসার সময় কোনও দিন আমরা অনুসৃত হই নাই। রেলের লাইন আসিয়া সেনাবারিকের পাশ দিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড মাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মোড়ে আসিয়া দেখিলাম দুইটি শিখ যুবক সেনাবারিক হইতে বাহির হইয়া বোধ হয় বাজারের দিকে যাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেই তাঁহারা দাঁড়াইলেন। তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন, তাঁহাদের পল্টনের নাম কি, তাঁহাদের হাবিলদার কে, পল্টনে সে সময় কত লোক ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কোথায় ছিলেন, এখান হইতে তাঁহাদের শীঘ্র বদলি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, ইংরাজবারিকে কত সৈন্য আছে, এবং তাহারা কতদিন ধরিয়া এখানে আছে, ইত্যাদি নানা কথা তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। সব কথারই উত্তর দিয়া তাঁহারা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমাদের উপর হামলা করিবে নাকি?' আমরাও উচ্চরবে এমন হাসি হাসিয়াছিলাম যে সে হাসির পর আমাদের প্রশ্নসংক্রান্ত কোনও রূপ সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। তাঁহারা একদিকে চলিয়া গেলেন, আমরা রাস্তা ধরিয়া ধীরে ধীরে বারিকের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। বারিকের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদের ভরসা হইল না। একটু পরেই আর একটি

শিখ রাস্তার দিকে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে আমরা হাবিলদারের কথা জিজ্ঞাসা করায় বারিকের একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে সেইদিকে যাইতে বলিয়া একদিকে চলিয়া গেলেন। আমরা মনে করিলাম বোধ হয় বাহিরের লোকও অনায়াসেই বারিকের মধ্যে যাইতে পারেন। কিন্তু তবুও বারিকের কাহারও সহিত কোনরূপ পরিচয় না থাকায় সেদিন বারিকে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। দেশী ও ইংরাজ সৈন্যের কতক খবর লইয়া সেদিন সহরের দিকে ফিরিলাম। কাশীতে শিখ সৈন্য আছে দেখিয়া সেদিন কত উৎসাহান্বিত হইয়াছিলাম, কারণ পাঞ্জাবে গিয়া দেখিয়াছিলাম শিখদিগকে অতি সহজেই উত্তেজিত করিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া ভাবিলাম যদি এই শিখদল আরও কিছুদিন এখানে থাকে ত পাঞ্জাব হইতে শিখ নেতাদিগকে এইখানে আনিয়া অতি সহজেই কার্য্যোদ্ধার করা যাইবে। সেদিন আমি কেবল এইটুকু কামনা করিয়াছিলাম যে এই শিখদল যেন আরও কিছুদিন এখানে থাকে। এই সময় কোনও সৈনিকদল বেশীদিন একস্থানে থাকিত না। এই দলও অল্পদিনের মধ্যেই বহুস্থান ঘুরিয়া আসিয়াছিল এবং কবে যে পুনরায় ইহারা এখান হইতে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবেন তাহারও কিছু স্থিরতা ছিল না।

এদিকে ৬ই ডিসেম্বর আসিয়া পড়িল। যথা সময় ষ্টেসনে গেলাম। হু হু করিয়া পাঞ্জাব মেল ষ্টেসনের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। মনে হইল আমাদের বিপ্লবায়োজনের সহিত আমাদের ইঞ্জিনের কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাই তার প্রচণ্ড বেগ দেখিয়া মনে হইল যেন পাঞ্জাবের বিপ্লববার্ত্তা বহন করিয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, এখনই পাঞ্জাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে দেখিতে এই প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু গাড়ীতে পৃথ্বী সিংএর দেখা পাইলাম না। কত খুঁজিলাম কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্জাবীদের উপর বড় রাগ হইল, ভাবিলাম পাঞ্জাবীদের মোটে কাণ্ডজ্ঞান নাই। এখন কি করা যাইবে। উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা ত সোজা নহে। দাদাকে গিয়া সব কথা বলিলাম। ভাবা গেল হয়ত কোনও কারণে পৃথ্বীসিং ওই তারিখে আসিয়া পঁহুছাইতে পারেন নাই, সেই জন্য পরের দিন আবার ষ্টেসনে গেলাম, সেদিনও দেখা পাইলাম না। তার পরের দিন গিয়াও দেখা পাইলাম না।

(৫)

দাদার পরামর্শে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাঙ্গলাদেশে চলিয়া গেলাম।

যদিও বলিতেগেলে দাদাই সারা উত্তর ভারতের প্রকৃত নেতা ছিলেন তথাপি দলের পূর্ব্বানুবর্ত্তী পদ্ধতি অনুসারে আমাদের কার্য্যকলাপ আরও দুই এক-জনাকে জানাইতে হইবে। রাসবিহারী প্রথমে আরও অনেকের মতই দলের একজন অতি সাধারণ কর্ম্মী ছিলেন। ক্রমে স্বীয় অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতার গুণে সকলের অলক্ষ্যে এক বিচিত্র সংগঠনের সৃষ্টি করিয়া যেন সহসাই একদিন বিপুল কর্ম্মভার নিজের স্কন্ধে লইয়া নেতৃবর্গের সম্মুখে আত্ম প্রকাশ করেন। যাহা হউক পাঞ্জাবের পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার কথা আনিব না।

এই সময় আমাদের দলের প্রসার পূর্ব্ব বাঙ্গলার শেষ সীমান্ত হইতে পাঞ্জাব প্রবেশের সূচনা করিতেছিল। আমাদের প্রধান নেতা ও পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় নেতৃবৃন্দকে পাঞ্জাবের নবীন সংবাদ দেওয়াই আমার বাঙ্গলাদেশে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পূর্ব্ববাঙ্গলার কাহাকেও তখন কলিকাতায় পাইতাম না, কেবল যথা স্থানে খবর দিয়া রাখিলাম যেন যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ব্ববাঙ্গলার কেহ একজন কাশীতে একবার আসেন এবং পরে কেন্দ্রের নেতৃবর্গের নিকট গিয়া পাঞ্জাবের সকল সমাচার বিশদ ভাবে বলিলাম। তাঁহাদের মধ্যেও এক নব উৎসাহের তরঙ্গ লক্ষ্য করিলাম বটে কিন্তু এতটা যেন তখনও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের কথা বার্ত্তা হইল। যদি বিপ্লব সত্যই আরম্ভ হয় এবং যদি অবস্থা বিশেষে আমাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ না দিয়া পিছু হটিতে হয় ত সে সময় কোথায় আমরা আশ্রয় লইব; আমাদের খাদ্য সামগ্রী কিরূপে সরবরাহ করিব এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ সূত্র কিরূপে রক্ষা করা যাইবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সে সকলের উল্লেখ করিয়া এখন কোনও লাভ নাই। আমাদের নেতৃবর্গের নিকট আমার আরও একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল; বিদেশ হইতে অনেক শিখদল তখনও দেশে ফিরিতেছিলেন এবং অনেকেই কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া পাঞ্জাব যাইতেছিলেন। আমি নেতাদিগকে এইরূপ বিদেশাগত শিখদলের সহিত সংযোগ সূত্র স্থাপনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে বলিলাম। খুব শীঘ্রই যে প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈয়ারি করিতে হইবে এবং তাহার আয়োজন এখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত এ কথাও পরে আলোচিত হয়। পরিশেষে আমাদের অতি পুরাতন অথচ নিত্যনূতন আত্মসমর্পণ যোগের কথা ওঠে। এই কথা আরম্ভ হইলে আর যেন শেষ হইত না। পন্থা যতইকেন একই আদর্শ প্রণোদিত হউক না,

সেই একই কথা, একই ভাব, জনে জনে কত নূতন ভঙ্গীতেই না বিকাশ-লাভের চেষ্টা করে! তাই আমরা একভাবের ভাবুক হইয়াও, একই পন্থার অনুসরণকারী হইয়াও আমাদের পরস্পরের মধ্যে কত অসংখ্য স্থানেই না অমিল ছিল! গায়ক সে একই ব্যক্তি; কিন্তু সেই গায়কেরই সেই একই স্বরলহরী পাঁচজন শ্রোতার নিকট কত বিভিন্ন প্রকারের মূর্চ্ছনারই না সৃষ্টি করে! মিলও যথেষ্ট থাকে, কিন্তু অমিলও কি কম থাকে? যে আদর্শ প্রণোদিত হইয়া আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলাম, সে ভাব স্রোতের তরঙ্গ একই স্থান হইতে আসিলেও বিভিন্ন আধারে তাহা আপন বৈচিত্র্যের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আমাদের আদর্শের এই খুটিনাটির দ্বন্দ্বে এমন কত রাত্র পোহাইয়া ভোর হইয়া গিয়াছে, দ্বন্দ্ব কিন্তু মিটে নাই, একজন আর একজনকে ভুল বুঝিয়া যখন পথে বাহির হইয়া পড়িতাম, উষার রক্তিম রাগ অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমটির মত তখন পূর্ব্বগগনে ভাসিয়া উঠিত। পথ অতিক্রম করিতে করিতে নিদ্রালস-নয়ন-পল্লবের মৃদু আক্ষেপে বুঝিতে পারিতাম কতখানি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। নিশাবসানের পূর্ব্বেই এইসব কেন্দ্র হইতে সরিয়া পড়িতে হইত এবং পরদিবস নানা কর্ম্মের অন্তরালে গত রাত্রির আলোচনাপ্রসঙ্গ পুনরালাপের জন্য যেন অনুক্ষণ অবসর খুঁজিয়া বেড়াইত, কত দিবস কত কার্য্যাবকাশের মধ্যে কখন যে আসিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিত যেন জানিতেই পারিতাম না। এইরূপে ভাব ও কর্ম্মের মোহন আবেশে আমাদের বিচিত্র জীবন যাপিত ও গঠিত হইতেছিল।

কাশী ফিরিয়া দাদার নিকট শুনিলাম কার্য্য বেশ অগ্রসর হইয়াছে। দাদা বলিলেলেন, "আজই বিকালে অমুক বাগানে একটি সিপাহির আসিবার কথা আছে, তুমি আজ সেখানে যাইবে।" শুনিলাম সেই শিখ পল্টন বদলি হইয়া কাশী হইতে চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক রাজপুত পল্টন আসিয়াছে। বিকালে সেই বাগানে গেলাম। যে বন্ধুটি আমায় বাগানে লইয়া গেলেন পথে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিরূপে তাঁহাদের সহিত এই দলের পরিচয় হইল। বন্ধুবর বলিলেন "ইহারা বাজার ইত্যাদি করিতে আসিতেন, একদিন কেণ্টোনমেণ্টে যাইবার সময় পথে ইহাদিগকে সহরের দিকে আসিতে দেখি, আমরাও ইহাদের সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়া বাজারের দিকে ফিরিলাম। পথে বর্ত্তমান যুদ্ধসংক্রান্ত নানা কথা হইল। হিন্দু মুসলমান

সম্বন্ধীয়ও অনেক কথা হইল। হিন্দুর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও অধঃপতনের কথা হইতে হইতে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এইরূপে প্রথমদিনের পরিচয়ের পর তাঁহাদের সহিত বিশেষ কোন কথা আছে এবং সেইজন্য আর একদিন এইদিকে আসিতে বলিয়া তাঁহাদের নাম ধাম জানিয়া লইয়া সেদিনের মত তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। পরেরদিন পুনরায় তাঁহারা গঙ্গাস্নানের জন্য সহরে আসিলেন। সেদিন তাঁহাদের নিকট আমাদের ভিতরকার কথা পাড়িলাম। অন্যান্য আলোচনার পর বর্ত্তমান যুদ্ধে বিদেশে বিধর্ম্মিদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চাইতে স্বদেশে স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়ার আবশ্যকতা বুঝাইলাম। দেখিলাম অতি সহজেই কৃতকার্য্য হইয়াছি। স্বীয় পল্টনে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত এ বিষয় আলাপ করিয়া পুনরায় আজ আসিবার কথা আছে।" অল্লক্ষণ অপেক্ষার পর দেখিলাম হাতে বাজারের সামগ্রী লইয়া একটি লোক আসিতেছেন। বন্ধুবর বলিলেন ঐ আসিতেছেন। ইঁহার পরিচ্ছদ আপাদমস্তক ধপধপে সাদা ছিল, যেন অন্তরের পরিশুদ্ধতা বাহিরেও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। লোকটির সহিত আলাপ করিয়া খুব আনন্দিত হইলাম। হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ নমনীয়তা যেন ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে মাখান ছিল। ইঁহার মধ্যে কেমন এক উৎফুল্ল ও উৎসাহের ভাব দেখিয়াছি কিন্তু উত্তেজনার ভাব দেখিনাই। ইঁহার সহিত সেদিন একবারে বারিকের ভিতর গিয়া ইঁহাদের খাটে বসিয়া কত গল্প করিয়াছিলাম। আমরা ইঁহাদের খাটে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম এবং ইঁহারা আমাদের আদর অভ্যর্থনার জন্য নিকটের বাজার হইতে মিষ্টান্ন আনাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩২)

চারুর বাড়ী হইতে একেবারে বাসায় না ফিরিয়া রাখু প্রথমে গঙ্গাস্নান সারিয়া লইল। পথের মাঝে মাঝে যেরূপ জল জমিয়াছিল, আর সেজন্য পথ চলায় সে এমনি অসুবিধা বোধ করিতেছিল, বরাবর বাসায় যাইলে তাহার সেদিন স্নান করিতে আসার আর সময় থাকিত না। গঙ্গাতীর হইতেও সে একেবারে বাসায় ফিরিল না। নিকটেই ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী, সে মনে করিল যাইবার পথে তাঁহাদের খবরটা দিয়া যাই, যথাসময়ে পূজার জন্য সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিলে পাছে তাঁহারা আজও আসিবার বিষয় সন্দেহ করেন।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টা। বৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়িতেছে, মাঝে মাঝে আকাশও পরিষ্কার হইবার ভাব দেখাইতেছে, কিন্তু বাতাস তখনও বেশ প্রবল। সে বাবুর বাড়ীর দোর বন্ধই দেখিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু সদর দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই দেখিল, ভৃত্য হেম একটা ছাতা মাথায় দিয়া বাড়ীর বাহির হইতেছে।

বাহির হইতেই তাহার কথা বলিবার সুবিধা হইল বুঝিয়া যেমন রাখু হেমকে সম্বোধন করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি সে দেখিল তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, হেম ছাতা মুড়িয়া চোখের নিমেষে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। যখন রাখু দরজার মুখে উপস্থিত হইল, তখন হেমের অস্তিত্ব চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও দেখিতে পাইল না।

ওরূপ লুকোচুরি ভাবে চাকরটার চলিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে না পারিলেও রাখুর কেমন একটা খটকা লাগিল। কিন্তু চারুর বাড়ীতে রাত্রিবাস সম্বন্ধে হেমের যে উক্তরূপ ব্যবহারের কোন সম্বন্ধ আছে, এটা একেবারেই রাখুর মনে আসিল না। সে তো জানিত না যে হেমই তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে মনে করিল হয়তো বাড়ীর মেয়েদের কেহ বাহির বাটীতে আসিয়াছে, সেইজন্য হেম তাহাকে সতর্ক করিতে ছুটিয়া গেল। এর পূর্ব্বে

এত প্রাতঃকালে সে ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে কখনও পূজা করিতে আসে নাই। অন্য দুই তিন বাড়ীর পূজা সারিয়া সেখানে আটটার পূর্ব্বে কোনদিন সে আসিতে পারে নাই।

অন্য অন্য দিন রাখু বরাবর ভিতর বাড়ীতেই চলিয়া যাইত। আজ আর সে তাহা করিল না কি জানি কাপড় কাচা গা ধোয়া প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া মেয়েরা যদি অসাবধানে থাকে? ভিতর দিয়া যাইতে গেলে কলতলার পাশ দিয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হয়। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বহির্বাটীর কোনও স্থানে সে হেমকে দেখিল না। সে বাহিরের সিঁড়ি দিয়াই উপরে চলিল। কেমন একটা চিন্তা তাহার মনকে ঘেরিয়াছে, সে মাথা হেঁট করিয়া সিড়িতে উঠিতে ছিল শেষ সিড়িতে পা দিয়া প্রথমে মাথা তুলিতেই দেখিল, বাড়ীর গিন্নি সিড়ির পাশেই বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়েদের আবরু তখনকার কলিকাতার সাধারণ হিন্দু গৃহস্থ-দের অপেক্ষাও কিছু বেশী ছিল। বাড়ীর পুরুষদিগেরও, দিবাভাগে গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে গলায় সাড়া না দিয়া প্রবেশাধিকার থাকিত না। মেয়েরা কদাচ, বাড়ীতে একেবারে পুরুষ না থাকিলে, বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে আসিত। অধিক কি শুভা বিবাহযোগ্য বয়স হইবার পর হইতে আর বাহির বাড়ীতে আসিতে পাইত না।

রাখু সেটা জানিত। সে প্রায় তিনমাস ইহাদের ঘরে ঠাকুর পূজার কাজ করিতেছে। এই তিন মাসে সে দেখিয়া শুনিয়া ইহাদের আবরুর ব্যবহার বুঝিয়াছে। ইহার পুর্ব্বে যিনি এখানে পূজার কাজ করিতেন তিনি বৃদ্ধ, রাখুরই দেশস্থ। শারীরিক পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁর দেশে যাইবার একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান জানিয়া তিনি রাখুকে এখানে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কেন না, আবরু একটু বেশী রকম হইলেও, মেয়েরা পুরোহিত অথবা পূজকের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারে বিশেষ সঙ্কোচ প্রকাশ করিত না।

রাখু বৃদ্ধের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া এই গৃহে কয়মাস পূজার কাজ করিতেছে। সে অতি সঙ্কোচের সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করে, আবার সেইরূপ সঙ্কোচেই পূজা সারিয়া চলিয়া যায়। চক্ষু তাহার মেয়েদের মুখের সঙ্গে কচিৎ পরিচিত হইয়াছে। বৃদ্ধের উপদেশ মত সে ব্রজেন্দ্রের বিমাতাকে

মা বলে, নির্ম্মলাকে বউমা বলে, শুভাকে কেবল দিদি বলিয়া ডাকিতে পায়।

সুতরাং উপরে উঠিয়াই নির্ম্মলাকে বারান্দা ধরিয়া একটু অসঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া রাখু কিছু অপ্রতিভের মত হইল। তাঁহার মুখের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই বলিবার কথা ঠিক করিতে না পারিয়া মাথা নামাইয়া আবার সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "আপনি এখানে আছেন তা জানতুম না।" নির্ম্মলা অতি শান্তভাবে উত্তর করিল "আপনাকে এদিকে আস্তে দেখেই আমি দাঁড়িয়েছি। আপনি কি এখনই পূজা করবেন?"

"পূজার কি আয়োজন হয়েছে?"

"হয়নি একটু অপেক্ষা করলেই করে দি।"

"তা হলে আমি আসি?"

"কখন আসবেন?"

"আসতে একটু বেলা হবে, এই কথাই আমি বল্‌তে এসেছিলুম।"

"তবে একটু অপেক্ষা করুন না?"

"আমি এখনও বাসায় যাইনি। দৈবদুর্ব্বিপাকে কাল আমাকে এক জায়গায় আটকে পড়তে হয়েছিল।"

একথাটা যে নির্ম্মলা রাখুর মুখ হইতে এত শীঘ্র শুনিবে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। শুনিবামাত্র তাহার মুখে হাসি আসিল। কোন ক্রমে হাসি সংযত করিয়া সে বলিল—"আমি মনে করেছিলুম ঝড়ের জন্য কাল আপনি ঠাকুরের শীতল দিতে আস্‌তে পারেন নি।"

"বাসায় থাকলে নিশ্চয় আসতুম।"

সমস্ত জানিয়াও, নির্ম্মলা রহস্য করিবার একটু সুবিধা পাইয়া সেটা ছাড়িতে পারিল না। সে ঈষৎ সমবেদনার ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবেত কাল রাত্রিতে আপনার বড় কষ্ট গেছে?"

"না বউমা বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে কাল অনেক বেশী সুখে ছিলাম।

"তা হলে নারায়ণ বিপদে আপনাকে ভাল আশ্রয়ই দিয়েছিলেন বলুন?"

রাখু উত্তর করিল না।

"তারা কি ব্রাহ্মণ?"

"না।"

"কায়স্থ?"

"না।"

আর এগিয়ে যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হয় বুঝিয়া নির্ম্মলা প্রশ্ন করিল—

"আপনার তাহলে তো কাল আহার হয়নি!"

"অন্ন হয়নি তবে ফল মূল মিষ্টান্ন খেয়েছি।"

ঠিক এমনি সময়ে হেমকে ঘর হইতে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া ঈষৎ ত্রস্তভাবে রাখু নির্ম্মলাকে বলিল—"বেলা হয়ে যাচ্ছে বউমা, আমি এখন আসি।"

"আসুন।"

কিন্তু রাখু দুই তিনটা সিঁড়ি নামিতেই নির্ম্মলা বলিল—"একটু দাঁড়ান। ঠিক এমনি সময়ে বৃষ্টি আবার বেশ জোরে চাপিয়া আসিল। নির্ম্মলা আবার বলিল—"আমি শীঘ্র বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে আসচি। আমার না আসা পর্য্যন্ত যাবেন না" বলিয়াই সে দ্রুত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

এইরূপ হঠাৎ দাঁড়াইতে বলিবার কারণটা না বুঝিতে পারিলেও কতকটা বৃষ্টির জন্যও কতকটা তাঁর মান রাখিবার জন্য রাখু উপরে উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মলা ফিরিল। তার একহাতে একখানা গরদের ধুতি ও একখানা গরদের চাদর অন্যহাতে একটা ছাতি। নিকটে আসিয়াই সে রাখুকে কাপড়খানা পরিতে বলিল। বলিল—"ভিজে কাপড় চাদর ছেড়ে ছাতিটা নিয়ে চলে যান।"

রাখু বলিল—"না বউমা, প্রয়োজন নেই।"

"আপনার নেই আমার আছে, কাপড়খানায় আলতার রং লেগে আছে। কি জানি কেউ দেখে কি মনে করবে।"

চারুর ঘর হইতে চলিয়া আসিবার ব্যগ্রতায় মূর্খ ব্রাহ্মণ কাপড়খানার অবস্থা পর্য্যন্ত দেখিবার অবকাশ পায় নাই। নির্ম্মলার কথায় এখন কাপড়ের দিকে চাহিয়া সে একরূপ আড়ষ্টের মতই হইয়া গেল। নির্ম্মলা কিন্তু তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও থাকিতে দিল না। সে বলিল—"আপনি ঠাকুর এযুগের লোক নন, সুতরাং কলিকাতার লোকের স্বভাব আপনি কিছুই জানেন না। আপনার যে ব্যবসা কাজ কি, লোককে সন্দেহ করতে দেবারই বা দরকার কি? ঐখানে ছেড়ে রেখে যান, আমি কাচিয়ে ঠিক করে রেখে দেবো।"

বলিয়া নির্ম্মলা রেলিংএর কাপড় চাদর ও ছাতি রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

রাখু এই সময়ের মধ্যে আর একবার পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল, "আমি কি আবার আস্‌বো ?"

"সে কি এ আপনার ঘর, আপনি আসিবেন না কেন? শুধু আনা কি, বল্‌তে ভুলে গিছলুম—আজ এই বাদলে হাত পুড়িয়ে আপনি রেঁধে খাবেন না। ঠাকুরের ভোগ দিয়ে আপনি এই খানেই প্রসাদ পাবেন। আমার নিমন্ত্রণ করা রইল।"

নির্ম্মলা চলিয়া গেল। এক দয়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতে আর এক দয়ার আয়ত্তে পড়িয়া রাখু গোটা কতক চক্ষুজলে গরদের কাপড়খানা সিক্তিত করিয়া লইল। তারপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ভিজা কাপড় চাদর নির্ম্মলার কথামত সেইখানেই রাখিয়া সেই বৃষ্টিতেই ছাতি খুলিয়া নামিয়া গেল। এতক্ষণ ব্রজেন্দ্র ঘরের ভিতরে ইজিচেয়ারে ঠেশ দিয়া চোরটির মত চক্ষু মুদিয়া বসিয়াছিল। আর হেমা এক একবার ঘর হইতে উঁকি দিয়া রাখুর চলিয়া যাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবার উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইল। হেমা দূর হইতে এক একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টি দিয়া কর্ত্তাঠাকুরাণীর ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে পারিতেছিল না। এইবারে সে সিঁড়ির কাছে আসিয়া রাখুর পরিত্যক্ত অলক্তক রঞ্জিত বস্ত্র দেখিল। বামুনের রাত্রি-বাসের সেই অপূর্ব্ব নিদর্শন অতি উল্লাসে সে প্রভুকে দেখাইল। ফলে আবার সে ধমক খাইল! নূতন পুজারী আনিবার কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু তাকে বলিল, গিন্নিকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে যেন আর কোন কিছু না করে। সকল কাজে বাধা পাইয়া হেমা যেন মনমরা হইয়া গেল! রাত্রের ব্যাপার লইয়া প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সে যে এতটা চেষ্টা করিতে গেল বোকা প্রভুর জন্য সেটা তার সফল হইল না। ইহার উপর তার প্রভুপত্নী যখন তাকে শুধু নূতন বামুন আনিতে নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হইল না, রাখুকে বলিতে এমন কি আর কাহারও কাছে পূর্ব্বরাত্রির একটিও কথা কহিতে নিষেধ করিল, তখন তার সমস্ত বুদ্ধি জমাট বাঁধিয়া তাহাকে একবারে নীরব করিয়া দিল।

ইহার একটু পরেই বিশু আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে শুনাইল তাহার 'মা' ভোর-বেলায় সেই যে গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া বাহির হইয়াছে এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরে নাই। সে এবং ঝি দুজনেই গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, কোনও খোঁজ পায় নাই। এ কথা নির্ম্মলার শুনিতে বিলম্ব হইল না, ব্রজেন্দ্রই কাল বিলম্ব না করিয়া কথাটা তাহাকে শুনাইয়া দিল।

শুনিয়া যদিও নির্ম্মলা চারুর না আসায় নষ্টামির একটা ছিনালি ছাড়া তার বিপদ সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কিছু দেখিল না, তথাপি সে স্বামীকে বলিল "এরূপ অবস্থায় সেখানে তোমার একবার যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

বিশুকে আগে পাঠাইয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ী চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ডালি

স্বাধীনতা

(শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি)

"মৌলানা হজরত—মোহানি কংগ্রেসে এবং মস্‌লেম লীগের প্রেসিডেন্ট-রূপে স্বাধীনতার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ দুই বারই তিনি পরাস্ত হইয়াছেন। মৌলানার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কিছুই নাই। ইংরাজেরা আমাদিগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান করিলেও, খিলাফৎ-সমস্যার সুচারু সমাধান হইলেও, তিনি তাহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে চাহেন। 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' লাভ করিতে—না পারিলে খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হইতে পারে না—এ ক্ষেত্রে এ যুক্তি খাটে না। এ স্থলে আমরা কেবল মতবাদের আলোচনা করিতেছি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে যদি খিলাফতের মীমাংসা না হয়—অর্থাৎ যদি ইংরাজ সরকার মোস্‌লেম জগতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূলতাচরণই করিতে থাকে তাহা হইলে যে আমাদের বাধ্য—হইয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এ সম্বন্ধে কোনই মতভেদ নাই। ইংলণ্ড মুসলমানের মিত্র হইতে সম্মত না হইলে ভারত কিছুতেই ইংলণ্ডের সমর্থন করিতে পারে না বা তাহার নিকট বৈষয়িক বা নৈতিক কোন প্রকারের সাহায্যই গ্রহণ করিবে না।

কিন্তু আমি জানি ভারত প্রতাপশালী হইলে ইংরাজের ভাব অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জেদ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অন্যায় হইবে কারণ—তাহাতে আমাদের প্রতিশোধস্পৃহা এবং অসামঞ্জস্যই সূচিত হইবে।

ইংরাজকে শত্রুতে পরিণত করাতে বা সুযোগ পাইলেই তাহাকে ভারত-হইতে বিতাড়িত করায় ভারতের গৌরব পর্য্যবসিত হইবে না, তাহাকে বন্ধু-ভাবে, আমলাতন্ত্র প্রধান সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে এক অভিনব সাধারণ তন্ত্রের সভ্যরূপে গ্রহণ করাতে ইহার পর্য্যবসান ঘটিবে। এই সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর দুর্ব্বলতর, অনুন্নত জাতি সমূহের শোষণের উপর, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পশুবলের উপর ঘটিবে না।

ইংরাজ শাসনের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে 'স্বরাজ' অর্থে কি বুঝায় দেখা যাউক। ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে এই 'স্বরাজ' দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং 'স্বরাজ' ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট হইতে উপহার স্বরূপ গণ্য হইবে না, ইহাতে ভারতের আত্মপ্রকাশই সূচিত হইবে। পার্লামেন্টের বিধিবিশেষ দ্বারাই স্বরাজ ঘোষিত হইবে ইহা সত্য কিন্তু সে বিধির ভারতের লোকমতের সমর্থন ভিন্ন পৃথক্ কোন সংজ্ঞা থাকিবে না। 'হাউস্ অব্ কমন্স (House of Commons) দক্ষিণ আফ্রিকার 'ইউনিয়ন স্কিমের" (union scheme) একটি বাক্য বা বাক্যাংশ মাত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিবে তবে এ স্থলে এ 'সমর্থন' ব্রিটেনের সহিত ভারতের সন্ধিস্বরূপ গণ্য হইবে।

এরূপ 'স্বরাজ' এ বৎসর না আসিতে পারে, একপুরুষের মধ্যেও না আসিতে পারে, তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত নহি। মিটমাট হইবার সময় আসিলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতের লোকমতের সমর্থন করিতেই হইবে কিন্তু সে লোকমত আমলাতন্ত্রের মারফত পার্লামেন্টে পৌছিবে না, স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই এ লোকমত প্রকাশের যন্ত্র হইবেন।

কোনও জাতি কখনও অধীন জাতিকে 'স্বরাজ' উপহার দিতে পারে না, জাতির সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবন গুলির বিনিময়েই এ অমূল্যরত্ন ক্রয় করিতে হয়। এ রত্ন পাইবার জন্য প্রাণপণ সাধনা করিতে পারিলে ইহার 'উপহারত্ব' দূর হইবে। বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন 'তরবারির সাহায্যে আদায় করিতে না পারিলে পার্লামেন্টের মারফত ভিন্ন স্বরাজ আসিতে পারে না।'

ইংলণ্ড ভারতের নির্যাতনবরণরূপ নৈতিক 'চাপ' সহ্য করিতে অসমর্থ— শ্রোতাগণকে একথা অনুমান করিতে দিয়া তিনি ইংলণ্ডকে 'ছোট' করিয়াছেন আর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিবেচনা না

করিয়া যখন খুসী স্বরাজ দিবে একথা বুঝাইবার উদ্দেশ্য থাকিলে শ্রোতাগণের বুদ্ধিশক্তিকে অপমান করা হইয়াছে। মোট কথা—স্বরাজ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অসহনীয় যন্ত্রণাভোগের ফল।

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি তরবারির পরিবর্ত্তে স্বরাজ লাভের অন্য কোন উপায় কল্পনা করিতে পারেন না, এজন্য সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন যে শাসন পরিষদগুলিতে গলাবাজি করিয়া আমরা এক সময়ে ব্রিটিশপার্লামেণ্টকে স্বরাজ দানের প্রয়োজনীয়তা বা স্বরাজ প্রাপ্তির উপযুক্ততা সম্বন্ধে সচেতন করিতে সমর্থ হইব কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিবেন তরবারি অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর পন্থাও আছে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধই সেই পন্থা। ভারতের 'নিজস্ব' ফিরিয়া পাইতে হইলে দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়াই পথ, আর নিরুপদ্রব প্রতিরোধই যে ক্লেশসহনের পথ সুগম করিয়া দিবে তাহা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইতেছে।

আমরা আমাদের 'নিজস্ব'—এখনও পাই নাই। এখনও হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করেন, অস্পৃশ্য জাতিগুলি এখনও হিন্দুত্বের মাহাত্ম্য অনুভব করে নাই। পার্শি ও খৃষ্টানগণ এখনও নিশ্চিন্তরূপে জানেন না 'স্বরাজের' অধীনে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে; এখনও আমরা নিজেদের প্রবর্ত্তিত নিয়ম পালনের প্রয়োজনীয়তা বা কৌশল সম্যক্ শিক্ষা করিতে পারি নাই, এখনও 'খাদি' জাতীয় পরিচ্ছদে পরিণত হয় নাই, এখনও চরকা প্রতি গৃহস্থালীতে স্থান পায় পাই অর্থাৎ এখনও আমার আত্মরক্ষার কৌশলগুলি বুঝিতে ও শিখিতে পারি নাই।

এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ মনে করেন 'হিংসা' ভিন্ন 'স্বরাজ' মিলিতে পারে না। এই মতের পোষণকারিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও বর্ত্তমানে নিতান্ত নগণ্য নহে। ইঁহাদের মতে 'হিংসা' ও 'অহিংসা' উভয়কেই একত্র অবস্থান করিতে দেওয়া উচিত অর্থাৎ 'অহিংসা' 'হিংসার' জন্য প্রস্তুত হইবার উপায়-রূপে ব্যবহৃত হউক। ইঁহারা জানেন না জগৎকে কতখানি প্রতারিত করিতেছেন। লক্ষসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়রূপে অহিংসানীতির উপকারিতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—ইহাই আমাদের 'প্রতিজ্ঞা'। 'অহিংসা' দ্বারা অথবা 'হিংসা' ভিন্ন স্বরাজ লাভ করা যায় না—এই বিশ্বাস যাঁহার জন্মিবে তৎক্ষণাৎ আপন 'প্রতীজ্ঞা' নাকচ করিতে তিনি নৈতিক হিসাবে বাধ্য। যতদিন সম্ভব অহিংসা আমাদের ধর্ম্ম থাকিবে। পরীক্ষাত্মক বলিয়াই অহিংসানীতির উপযোগিতা এত অধিক। যতদিন 'অহিংসা'

আমাদের ব্রত থাকিবে ততদিন শুধু যে নিজে ইহার উপকারিতায় সম্যক্ বিশ্বাস করিতে ও কার্য্যে ইহা আচরণ করিতে হইবে তাহা নহে, অন্যকে হিংসানীতি বর্জ্জন করাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে এবং ইহার আচরণকারিগণের প্রতিবাদ করিতে হইবে। যাঁহারা কংগ্রেসের অনুশাসনকে মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কথায় ও কার্য্যে অহিংস থাকেন নাই এবং 'চিন্তায়' অহিংস থাকিবার চেষ্টা করেন নাই, এজন্যই আমার এখন পর্য্যন্ত লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারি নাই, আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া)

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ

জাতীয়শিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

অনেক দিন হইতেই আমাদের দেশে শিক্ষা-সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন ইহাকে একটী বিশিষ্ট আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে শিক্ষা আমরা এতদিন পাইয়া আসিয়াছি, তাহা যেন ঠিক আমাদের উপযুক্ত হয় নাই। এ যাবৎ যাঁহারা এ শিক্ষা পাইয়াছেন বা পাইতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল —তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, এই বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর কোন না কোন স্থানে একটা প্রকাণ্ড গলদ রহিয়া গিয়াছে। অসহযোগীরা বলেন এ শিক্ষার প্রধান গলদ—Slave Mentality—অর্থাৎ দাসজনোচিত মনোভাবের সৃষ্টি। কথাটী আদৌ অসঙ্গত নয়। ইহা যে ইংরাজী শিক্ষার দোষ এ কথা আমরা বলিতে চাহি না; তবে ইহা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ। কতকগুলি বিজাতিদ্বেষী ইংরাজ শিক্ষক ও লেখক হয়ত এ ভাবটী সৃজনের পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজের ইতিহাস বা সাহিত্য ইহার জন্য দায়ী নহে। ইংরাজ ব্যবসায়িগণের কল্যাণে যখন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে দেশীয়গণের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল—এবং নানাবিধ বৈদেশিক বিলাসব্যসনের আতিশয্যে আমাদের ঘর ও বাহির, মন ও দেহ ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল—

সেই সময় ইংরাজীশিক্ষার মন্ত্রপ্রভাবে আমাদের নিকট অর্থোপার্জ্জনের এক নূতন পথ খুলিয়া গেল ; সেটা ইংরাজের আপিস-আদালত ইত্যাদি কর্ম্মস্থানে চাকরি গ্রহণ। ক্রমে শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিতগণ চাকরির নাগপাশে বদ্ধ হইলেন। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিত আছে—"যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত" ; ছেলেবেলায় যখন লেখাপড়ায় একটু-আধটু শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছি তখনই আমাদের নিকট প্রলোভনের চিত্র ধরা হইয়াছে -লেখাপড়া শিখিলে বড় চাকরী পাওয়া যায়—উকিল হওয়া যায়, জজ্-ম্যাজিষ্টর হওয়া যায়, গাড়ী-ঘোড়া চড়া যায়, "লেখা পড়া শিখে যেই গাড়ী ঘোড়া চরে সেই।" এই আরাম উপভোগ বর্ত্তমান শিক্ষার যথার্থ আদর্শ। এ শিক্ষা আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জাগরিত করিয়া জীবন-সংগ্রামের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করে না। জীবনকে এক অখণ্ড সত্যরূপে উপলব্ধি করাইবার শক্তি এ শিক্ষায় নাই ; এ চায় শুধু আরাম, শুধু উপভোগ,—অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব, নিজের উপর নহে। জীবনের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া তাহার চরম পরিণতির প্রতি ইহার আদৌ লক্ষ্য নাই। আমাদের প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই—উহার গতি জীবনের চরম পরিণতির দিকে। আর্য্যেরা মানবজীবনের চারিটী স্তর আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে প্রথম স্তর ব্রহ্মচর্য্য —ছাত্রজীবন ; সর্ব্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন বর্জ্জন করিয়া ত্যাগ ও কঠোরতার দ্বারা জীবন-গঠন—তাহার সম্মুখে কোনরূপ আরামের চিত্র ধরা হয় নাই। কঠোর সংসার-সমরক্ষেত্রে যেরূপ সংযতভাবে সৈনিকপুরুষকে যুদ্ধ করিতে হইবে—তাহারই উপযোগী শিক্ষা সে পাইবে। তারপর গার্হস্থ্য ; এখানেও ধর্ম্মার্থে দারপরিগ্রহ কর্ত্তব্য—ইন্দ্রিয় চরিতার্থে নয়। অতিথিসেবা, দীন-দরিদ্র অনাথ আতুরের জন্য জীবনের সুখবিসর্জ্জন—ইহাও চাই। তারপর বানপ্রস্থ, পরে যতি। ইহাই ভারতের শিক্ষা। পরম সত্য যে ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত জীবনেরই লক্ষ্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রয়াস। তথাপি ভারতবর্ষ সংসারকে অতিক্রম করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করেন নাই। ভোগকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই। সাংসারিক সুখও ভারতের অন্যতম কাম্য ; তবে তাহা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া নহে। সে সুখেরও প্রারম্ভে বিদ্যাশিক্ষা আছে—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখং॥

কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের

সাথে"। সেবার যখন স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন একদল ছেলে স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়াছিল জাতীয় শিক্ষা পাইবার জন্য। অসহযোগ আন্দোলনের ফলেও অনেক ছাত্র বাহির হইয়াছিল। অনেকে আবার ফিরিয়া গিয়াছে। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে ছাত্রগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী উচ্ছেদের নিমিত্ত। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি ছাত্রগণকে অগ্র-পশ্চাৎ অনেক বিবেচনা করিয়া তবে এ আন্দোলনে যোগদিবার কথা বলিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা স্বতন্ত্র। একটী উচ্ছেদ আর একটী নব সৃষ্টি। তবে প্রথমটীর অবশ্যম্ভাবী ফল যে দ্বিতীয়টী তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করিলে এতদিন জাতীয় শিক্ষার আয়োজন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইত। আংশিক ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা পড়া চলিতেছে। দুই দশটা বিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিতেছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ কি? ইহার সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে আমাদের জীবনের সহিত ইহার মিল নাই। সেই জন্য এই শিক্ষা আমাদিগকে জীবনের গন্তব্য পথে পরিচালিত করে না, ইহার ভারে আমরা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের জীবন চিন্তাক্লিষ্ট দাসত্বভারে অবনত। নূতন সৃজনের শক্তি আমাদের নাই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতগণ সমগ্র বিরাট জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। দুর্ব্বল প্রতিবাসীর নিকট হইতে কোনও প্রকারে কিছু সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা দিনপাত করেন। ওকালতী ডাক্তারী ইত্যাদি ব্যবসায়ের নীতি ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিবাদের মীমাংসায় নয়, নূতন বিবাদের সৃষ্টিতে ব্যবহারাজীবের আনন্দ; রোগ আরোগ্য করায় নয়, দেশে নূতন নূতন ব্যাধির উদ্বোধনসঙ্গীতেই ডাক্তারের আনন্দ। কোন নূতনভাবের প্রচারে গ্রন্থকারের কিছু আগ্রহ দেখি না, কি করিয়া তাঁহার পুস্তকখানি সর্ব্বত্র কাট্‌তি হইবে ইহাই তাঁহার চেষ্টা। প্রতিবৎসরেই ছাত্রগণ অঙ্ক শিখিবার জন্য নূতন নূতন পাটিগণিত, বীজগণিত কিনিয়া থাকে। শিক্ষার অভাব যতই অনুভূত হইতেছে, শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যও ততই অধিক হইতেছে। আদালতে যেমন অনেক টাকা খরচ করিয়া বিচার ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, বিদ্যালয়েও সেইরূপ অতি উচ্চহারে বিদ্যা-বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে; অথচ জীবনযাত্রার পক্ষে সে বিদ্যার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, একথা বোধহয়

স্বীকার না করিলেও চলে। দরিদ্র ছাত্রগণের বিদ্যালয়ে স্থান নাই। তাহাদের নিজেদের বাসগৃহ যতই কুৎসিত হউক না কেন, বিদ্যালয়টী অট্টালিকা হওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা কর্ত্তৃপক্ষ যে বিদ্যালয়কে আমলেই আনিবেন না। কেহ পাঠ করুক বা নাই করুক, বিদ্যালয়ের পাঠাগার বহুমূল্য পুস্তক ও আলমারীতে পরিপূর্ণ করা চাইই-চাই। অথচ এই বাংলা দেশের এমন একদিন ছিল, যখন হরিঘোষের গোয়াল ঘর হইতে মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বাহির হইয়া সমগ্র দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভাঙ্গা চালের নীচে দরিদ্র অধ্যাপকের টোলে কুমার, নৈষধ, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাণিনির নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে। কিন্তু আজকাল শিক্ষার আয়োজনেই সর্ব্বস্ব ব্যয় হইয়া গেল, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষগণের নাসিকা-কুঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভার!

আজ দেশের সর্ব্বত্র কথা উঠিয়াছে জাতীয় শিক্ষা—শুধু নাম পরিবর্ত্তনে নয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-সংস্কারে নয়; এই শিক্ষা (অর্থাৎ এই শিক্ষাপ্রণালী) একেবারে বর্জ্জন করিয়া নূতন প্রণালীতে সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, সাধারণের সহিত শিক্ষিতগণের যোগসাধন করিতে হইবে। এই মিলন যদি কখনও সম্ভবপর হয় তবেই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা নহে। বঙ্গের পরিত্যক্ত পল্লীগুলিতে শিক্ষিতগণকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে, সহরে বসিয়া প্রবন্ধ লিখিলে বা বক্তৃতা করিলে, কোনও ফল ফলিবে না। একদল ত্যাগী কর্ম্মী আবশ্যক যাঁহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া এক একটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন। অনেককে মুখে বলিতে শুনিয়াছি, পল্লী-গ্রাম আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, অথচ তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে কেহই অগ্রসর হইবেন না, কিন্তু সেই পল্লীরই কৃষকগণের কঠোর পরিশ্রমের অর্থ লইয়া মটরগাড়ী চালাইতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নহেন। পল্লীতে আসিয়া পল্লীর সর্ব্বপ্রকার সুবিধা অসুবিধা মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিলে জাতীয় জীবনের মুক্তি অসম্ভব। প্রথম যাঁহারা আসিবেন সকল রকমের অসুবিধার মধ্যেই তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। নিত্য দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, অশিক্ষা ও কুসংস্কার তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে। ভয় করিবে না; সাহসে ভর করিয়া একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতে হইবে। একনিষ্ঠ সাধকের মত তাঁহাকে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। দেশের জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে হয়ত একাজ অতি সহজে

পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা সহসা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া মনে হয় না একদল শিক্ষিত যুবককে অগ্রণী হইতেই হইবে, তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে অনেক সহায়তা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন দেশব্যাপী এই আন্দোলন চলিতেছে; কার্য্যারম্ভের ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

প্রাচীনভারতে গণতন্ত্র

[শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় বি, এ]

(১)

(প্রাচীন-ভারতে প্রজাতন্ত্র রাজ্য—মালব ক্ষুদ্রক প্রভৃতি)

প্রাচীন ভারতের কোনও ইতিহাস প্রাচীন ভারতবাসী কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই, ফলে প্রাচীন ভারতের অবস্থার কথা জানিতে হইলে অনেক অনুসন্ধান করিয়া বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক বিবরণ করিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এক্ষণে কতকটা এ অভাব ঘুচিয়াছে এবং কতিপয় মহাত্মার সমবেত চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাই আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকারে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি। প্রাচীন ভারতে প্রজাদের হস্তে শাসনভার যে আদৌ ন্যস্ত ছিল না এবং রাজাই যে সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ছিলেন সে ধারণা এখন কিন্তু অনেকের মনে বদ্ধমূল। বহুদিন হইতে আমরা শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি যে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ প্রজাতন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিতেন না এবং প্রজারাও যে ইচ্ছা করিলে শাসনকার্য্যের অনেকখানি হস্তগত করিতে পারে সে কল্পনা তাহাদের মনে কোনও দিন স্থান পায় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চ্চার ফলে আমরা বুঝিয়াছি যে প্রাচীন ভারতে শুধু প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এমন নহে ভারতের অনেক অংশ পুরাকালে প্রজাদের দ্বারাই শাসিত হইত। ১৯০৩ সালে অধ্যাপক Rhys Davids তাঁহার "বৌদ্ধভারত" নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—"অতি প্রাচীনকালে ভারতের যে সকল অংশ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল তাহার কয়েক অংশে

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল......................অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ জাজ্জ্বল্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচীন ভারতে ন্যূনাধিক স্বাধীনতার অধিকারী হইয়া প্রজারাই খানিকটা শাসন করিত।" (Buddhist India p. p. 19-20) উক্ত সালেই Vincent Smith Royal Asiatic Society Journal এ প্রাচীন পাঞ্জাবের প্রজাতন্ত্রাধিষ্ঠিত স্থান সমূহের একখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়া তাহাতে দেখাইয়াছিলেন যে ঝাঙ্গ জেলায় Maloi নামে Amritasar, Gurudaspur, Kangra এবং Hosiarpur প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে Oxydrakai নামে, এবং লাহোরের উত্তরে রাবিনদীর পূর্ব্বতীরে Kathaioi নামে প্রজাদের দ্বারা শাসিত তিনটী রাজ্য ছিল। Dr. Thomas প্রমাণ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত 'গণ' শব্দের দ্বারা যেসকল স্থানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই সকল স্থানকে বুঝাইত। Mr. Jayaswal ১৯১২ সালে হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের জন্য হিন্দীতে এবিষয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও পর বৎসরের Modern Review এ "An Introduction to Hindu Polity" শীর্ষক প্রবন্ধে 'গণ' শব্দ যে এইরূপ অর্থেই প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত হইত সে সম্বন্ধে নানাস্থান হইতে অনেক প্রমাণ দিয়াছিলেন। Bhuler মনুস্মৃতির অনুবাদ কালে 'গণ' শব্দকে ইংরাজীতে "Corporation" (অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রমজীবিগণের সমিতি) বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোনও দোষ নাই; তিনি মনুস্মৃতির টীকাকারগণের পদাঙ্কনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। মনুস্মৃতি যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সে সময়ে হয়ত ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু মনুসংহিতার টীকাকারগণ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্রের একেবারে বিলোপসাধন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং ব্যবসায়ী শ্রমজীবিগণের সমিতি বুঝাইতে সংস্কৃত সাহিত্যে "সম্ভূয় সমুত্থান" "শ্রেণী" "পুগ" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকিলে ও তাঁহারা সে কথা বিস্মৃত হইয়া "গণ" পদের প্রতিশব্দে "সমূহো বণিগাদীনাম্"এর প্রয়োগ করিয়াছেন। [মনু ১ম অঃ, ১১৮ শ শ্লোকের কুল্লুক ব্যাখ্যা]

(২)

প্রাচীন হিন্দুরাজা যথেচ্ছাচারী ছিলেন না—জাতক; রামায়ণ মহাভারতাদির প্রমাণ।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের বহুদিন হইতেই বিশ্বাস যে দিকপালগণের অংশে রাজাদের উৎপত্তি অর্থাৎ 'Divine Origin of Kings theory'টী ভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু তাই বলিয়া রাজারা যে

যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন এমন নহে ; এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। তেলপত্ত জাতকে একটী গল্প আছে যে তক্ষশীলার একজন অধিপতি এক যক্ষিণীর মায়ায় অভিভূত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে যক্ষিণী যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার রূপে ও মোহিনী মায়ায় রাজা এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহার কোনও আব্দার রক্ষা না করা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল তখন সে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্রী হইবার আশায় রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সকল ক্ষমতাই নিজহস্তে গ্রহণ করিতে চাহিল। রাজা তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে বলিলেন—'রাজ্যের সমস্ত প্রজা আমার অধীন নহে অথবা আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাদের প্রভু নহি, যাহারা রাজদ্রোহী অথবা অন্য কোনও অপরাধে অপরাধী তাহারাই আমার অধীন, সুতরাং সমস্ত রাজ্যের অধিকার আমি কেমন করিয়া তোমার হস্তে দিব ?" এই গল্প হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে যে রাজার ক্ষমতার একটী সীমা ছিল, যাহা-ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। অন্ততঃ যে সময়ের কথা উপরিলিখিত পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে সে সময়ের ভারতীয় রাজগণ বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাহীন না হইলেও অনেক বিষয়ে যে তাঁহাদিগকে সংযতভাবে চলিতে হইত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আবার Eka-panna Jataka নামক গল্পে আছে যে এক রাজপুত্র এতই দুর্দ্দান্ত ও ক্রোধপরায়ণ ছিলেন যে তাঁহার নাম হইয়াছিল 'দুষ্টকুমার'। সেই দুষ্টকুমারের পিতা পুত্রের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য একজন বিজ্ঞ শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষাভার অর্পণ করিলেন। প্রবীণ শিক্ষক ছাত্রকে একটী বৃক্ষের মুখে লইয়া একটী বৃক্ষপত্রের আস্বাদ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। রাজপুত্র সেই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পত্র ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই চর্ব্বণ করিবামাত্র বৃক্ষপত্রের তিক্ত আস্বাদে এতই ক্রুদ্ধ হইলেন যে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া সমূলে বৃক্ষটিকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সেই ঋষি বলিলেন—"রাজপুত্র ! এই বৃক্ষটী বড় হইলে ইহার দ্বারা পৃথিবীর মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইবে এই আশঙ্কায় আপনি যেমন এটিকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, সেইরূপ আপনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া রাজা হইলে প্রজাদের প্রভূত অহিত সাধন করিবেন এই ভয়ে প্রজারাও আপনার ক্রোধপরায়ণতা দর্শনে আপনাকে রাজা হইতে দিবে না এবং আপনাকে বনে গমন করিতে

হইবে।" এই গল্পটী হইতে বেশ বুঝা যায় যে প্রাচীন ভারতে এককালে রাজারাও যেমন যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না তেমনি রাজপুত্ররাও যদি অনুপযুক্ত বা প্রজাদের অহিতকামী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, প্রজারাই তাঁহা-অভিষেককালে বাধা দিত।

মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে আছে যে মহারাজ প্রতীপ যখন বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার প্রিয়পুত্র দেবাপিকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন প্রজা'বৃন্দ তাহাতে আপত্তি করিল। দেবাপি সুযোগ্য হইলেও রোগগ্রস্ত ছিলেন সুতরাং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় প্রজারা তাঁহার অভিষেককালে বাধা দিল। প্রতীপ তাহাদের বাধা প্রদানে দুঃখিত হইয়া অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন মাত্র, তথাপি প্রজাবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেবাপিকে সিংহাসনে বসাইতে পারেন নাই। আবার শান্তিপর্ব্বে আছে, সূর্য্যবংশীয় নরপতি সগর প্রজাদের ইচ্ছানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অসামঞ্জস্যকে ক্রুদ্ধস্বভাবের জন্য স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ-পর্ব্বে আছে যে, মহারাজ ক্ষণিকনেত্রকে তাঁহার প্রজাবৃন্দ অপসারিত করিয়া তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। রামায়ণে আছে যে মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণগণ, বলমুখ্য এবং পৌর ও জানপদবর্গের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। যযাতি পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রজাগণকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং তাহাদের অভিমত অনুসারে তাঁহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

আর একটী বিষয় আলোচনা করিলে বেশ দেখা যায় যে রাজার ক্ষমতা কতদূর সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রজাদের হস্তে কতখানি অধিকার ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র উভয়পুস্তকেই আছে যে প্রজার অর্থ অপহৃত হইলে রাজা যদি সেই অর্থের পুনরুদ্ধার করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে নিজ ধনাগার হইতে তাঁহাকে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। পূর্ব্বে রাজারা এইরূপ করিতেন, তাহা না হইলে উভয় পুস্তকেই এইরূপ ব্যবস্থা করিবার তাৎপর্য্য কি? এই সামান্য বিষয়েও যখন রাজাকে প্রজাদের মুখ চাহিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত তখন রাজারা যে কতকাংশে প্রজাদের করায়ত্ত ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। (ইতিহাস ও আলোচনা)

———

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত।

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিকৃত স্বর পাঁচটি যথা কোমল, ঋ, জ্ঞ, দ, ণ এবং কড়ি হ্ম। নারদ মতে শুদ্ধ সপ্ত স্বর কতিপয় পশু পক্ষীর স্বর হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক স্বরের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছেন। স্বরগুলি সাধিবার সময় ঐ সকল দেবতার রূপ ভাবিয়া সাধিতে হয়।

কোন্ প্রাণী হইতে কোন্ স্বর লওয়া হইয়াছে এবং কে কোন্ স্বরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

	প্রাণী—	স্বর—	সংজ্ঞা—	অধিষ্ঠাতৃদেবতা।
১।	ময়ূর	ষড়জ	সা	অগ্নি।
২।	বৃষ	ঋষভ	রে	ব্রহ্মা।
৩।	ছাগ	গান্ধার	গা	সরস্বতী।
৪।	সারস	মধ্যম	মা	মহাদেব।
৫।	কোকিল	পঞ্চম	পা	বিষ্ণু।
৬।	অশ্ব	ধৈবত	ধা	গণেশ।
।	হস্তী	নিষাদ	নি	সূর্য্য।

"ষড়্জ রৌতি ময়ূরোহি গাবোনর্দ্দন্তিচর্ষভম্।
অজা বিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চোনদতিমধ্যমম্॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলোরৌতি পঞ্চমম্।
অশ্বশ্চধৈবতং রৌতি নিষাদং রৌতিকুঞ্জরঃ॥"

—সঙ্গীতদর্পণম্।

"বহ্নিব্রহ্মসরস্বত্যঃ সর্ব্বশ্রীশ গণেশ্বরাঃ।
সহস্রাংশুরিতি প্রোক্তাঃ ক্রমাৎষড়্জাদিদেবতাঃ॥"

—সঙ্গীতদর্পণম্।

৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়কৃত সঙ্গীত সারের মতে "পঞ্চম" স্বরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা 'লক্ষ্মী"।

সঙ্গীত সময় সারের মতে সপ্তস্বরের নিরুক্তি এইরূপ,—নাসা, কণ্ঠ, বক্ষ,

তালু, জিহ্বা এবং দন্ত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া "ষড়্জ" ; ঋষভের অর্থাৎ ষাঁড়ের শব্দের ন্যায় বলিয়া "ঋষভ" ; নাভি হইতে উদিত হইয়া কণ্ঠ এবং শীর্ষে সমাহত হইয়া গন্ধর্ব্ব গণের সুখ উৎপাদন করে বলিয়া গান্ধার ; নাভিতে সমুত্থিত হইয়া হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থলে সমাহত হয় বলিয়া মধ্যম ; নাভি, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, শির এবং হৃদয় এই পঞ্চ স্থানে সমুদ্ভব হয় বলিয়া পঞ্চম; নাভি, কণ্ঠ, তালু, শির এবং হৃদিস্থলে ধৃত হয় বলিয়া ধৈবৎ ; এবং নাভিতে সমুত্থিত বায়ু কণ্ঠতালু শিরোহত হইয়া নিষণ্ণ (স্থিত) হয় বলিয়া নিষাদ নামে অভিহিত হয়।

রত্নাবলিতে স্বরোৎপত্তিবিষয়ে বলা হইয়াছে যে ঋগ্বেদ হইতে ষড়জ এবং ঋষভ, যজুর্বেদ হইতে মধ্যম এবং ধৈবত, সামবেদ হইতে গান্ধার এবং পঞ্চম, আর অথর্ব্বেদ হইতে নিষাদের জন্ম।

বাহুল্যভয়ে উল্লিখিত উৎপত্তি বিবরণের মূল সংস্কৃত শ্লোকাবলি উদ্ধৃত করা হইল না।

সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বপ্ত স্বরের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কোন জাতি ; জম্বুদ্বীপাদি কোন দ্বীপে, দেব' পিতৃ, ঋষি, অসুর প্রভৃতি কোন কুলে ইহাদের জন্ম, কাহার কোন ঋষি এবং কাহার কি ছন্দ তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এ সকলের মূল শ্লোকও দেওয়া হইল না।

কোন রসে কোন স্বর ব্যবহার্য্য তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র রসে—সা এবং রে। ভয়ানক এবং বীভৎস রসে—ধা। করুণ রসে—গা এবং নি। হাস্য এবং আদিরসে—মা এবং পা। যথা—

সরীবীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধো-বীভৎসে ভয়ানকে।
কার্য্যো গ-নী—তুকরুণে—হাস্য শৃঙ্গারয়োর্ম্পৌ॥

সঙ্গীত দর্পণ।

ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে ঐ সকল রসে ঐ সকল স্বরেরই বহুল ভাবে ব্যবহার হওয়া উচিত।

উল্লিখিত স্বপ্ত স্বর ব্যতীত আরও কতগুসি সূক্ষ্ম স্বর ভারতীয় সঙ্গীতে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে শ্রুতি বলে। শ্রুতির ব্যবহারই হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্ব। কি কণ্ঠে কি যন্ত্রাদিতে বিশুদ্ধ ভাবে শ্রুতির ব্যবহার করিতে পারিলে সঙ্গীতে অনির্ব্বচনীয় মধুরতা উৎপন্ন হয়, এবং শ্রোতার মন বিমোহিত করিয়া ফেলে। সারঙ্গ এস্রাজ বেহালার গমক এবং বীণ, সরদ, রবাব, সুরবাহার সেতারের মীড় এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বাজান হয়।

সঙ্গীত শাস্ত্রে শ্রুতির লক্ষণ
এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"স্বরূপমাত্র শ্রবণান্নাদোঽনুরণনং বিনা।
শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্মতাঃ॥"

—সঙ্গীত দর্পণম্।

অনুবাদ—অনুরণন ব্যতীত ধ্বনি স্বরূপ মাত্র শ্রবণ হেতু
শ্রুতি বলিয়া অভিহিত, তাহার দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ স্বীকৃত।

"শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বানিরেব শ্রুতিভবেৎ।"

—বিশ্বাবসু।

অনুবাদ—শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়াই ধ্বনি শ্রুতি
রূপে পরিচিত হইয়া থাকে।

শ্রুতির সংখ্যা মোট ২২টি। যথা—

সা^{৪} রে^{৩} গা^{২} মা^{৪} পা^{৪} ধা^{৩} নি^{২} সা$^{\circ}$ = ২২

উল্লিখিত সারণী হইতে দেখা যাইবে যে সপ্ত স্বর পরস্পর একটির পর আর একটী কতশ্রুতি অন্তর অবস্থিত। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতির নাম জাতি প্রভৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বর—			শ্রুতির নাম—		জাতি।
১।	ষড়জ—	সা	১।	তীব্রা	দীপ্তা।
			২।	কুমুদ্বতী	আয়তা।
			৩।	মন্দা	মৃদু।
			৪।	ছন্দোবতী	মধ্যা।
২।	ঋষভ—	রে	১।	দয়াবতী	করুণা।
			২।	রঞ্জনী	মধ্যমা।
			৩।	রক্তিকা	মৃদু।
৩।	গান্ধার—	গা	১।	রৌদ্রী	দীপ্তা।
			২।	ক্রোধা	আয়তা।
৪।	মধ্যম—	মা	১।	বজ্রিকা	দীপ্তা।
			২।	প্রসারিণী	আয়তা।
			৩।	প্রীতি	মৃদু।
			৪।	মার্জ্জনী	মধ্যা।

স্বর—		শ্রুতির নাম—	জাতি—
৫। পঞ্চম—	পা	১। ক্ষিতি	মৃদু।
		২। রক্তা	মধ্যা।
		৩। সন্দীপনী	আয়তা।
		৪। আলাপিনী	করুণা।
৬। ধৈবত—	ধা	১। মদন্তী	করুণা।
		২। রোহিনী	আয়তা।
		৩। রম্যা	মধ্যা।
৭। নিষাদ—	নি	১। উগ্রা	দীপ্তা।
		২। ক্ষোভিণী	মধ্যা।

সপ্ত স্বরের ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধ গতির নাম অনুলোমগতি বা আরোহণ, আর নিম্নগতির নাম বিলোম গতি বা অবরোহণ।

সপ্তস্বরের ক্রমে আরোহণ ও অবরোহণের নাম "মূর্চ্ছনা"। সাতটি করিয়া তিন গ্রামে মূর্চ্ছনার সংখ্যা একুশটি যথা—

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।,,
মূর্চ্ছ নেত্যুচ্যতে গ্রামত্রয়ে তাঃ সপ্ত সপ্তচ॥

গ্রাম, ষড়জ, গান্ধার এবং মধ্যম ভেদে তিনটি। সঙ্গীত শাস্ত্রমতে ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম মর্ত্তে আর গান্ধার গ্রাম স্বর্গে প্রচলিত। যথা—

"ষড়জ মধ্যম গান্ধারাস্ত্রয়োগ্রামামতাইহ।
ষড়্জ গ্রামো ভবেদত্র মধ্যম গ্রাম এবচ।
স্বরলোকে চ গান্ধারো গ্রাম প্রচরতি স্বয়ং॥

—সঙ্গীত চন্দ্রিকা ধৃত বচন।

উক্ত সাতটি স্বরই রাগ বিশেষ বাদি, সংবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কোন একটি রাগে যে স্বরটি খুব বেশী ব্যবহৃত হয় তাহাই "বাদী", যে স্বরটি বাদী স্বরাপেক্ষা কম কিন্তু অন্য স্বরাপেক্ষা বেশী লাগে তাহা "সংবাদী", যে স্বর সর্ব্বাপেক্ষা কম লাগে তাহা অনুবাদী, আর যে স্বর একেবারেই লাগে না অর্থাৎ যে স্বর ব্যবহার করিলে কোন রাগ অশুদ্ধ হয় তাহাই "বিবাদী" স্বর বলিয়া কথিত হয়। বাদী স্বর যেন রাজা, সম্বাদী যেন তা'র মন্ত্রী, অনুবাদী যেন ভৃত্য, আর বিবাদী যেন তাহার শত্রু।

চতুর্বিধঃ স্বরো বাদী সংবাদীচ বিবাদ্যপি।
অনুবাদীচ বাদীতু:প্রয়োগে বহুল স্বরঃ ॥
—রত্নাকর।

বাদী রাজা স্বরস্তস্ত সংবাদী স্যাদমাত্যবৎ।
শত্রুর্বিবাদী তস্ত স্যাদনুবাদী তু ভৃত্যবৎ॥"
সঙ্গীতদর্পণম্ ॥

গীতের আদিতে যে স্বর স্থপিত হয় তাহাকে গ্রহস্বর এবং যে স্বরে গীত সমাপ্ত হয় তাহা ন্যাস স্বর বলিয়া কথিত হয়। বাদী স্বরকে অংশ স্বর ও বলা হয়। যথা—

গীতাদৌ স্থাপিতো যস্ত স গ্রহস্বর উচ্যতে।
ন্যাস স্বরস্ত বিজ্ঞেয়ো যস্ত গীত সমাপকঃ।
বহুলত্বং প্রয়োগেষু স চাংশস্বর উচ্যতে ॥
—সঙ্গীতদর্পণম্।

তিনটীমাত্র মূল বর্ণের সকৌশল মিশ্রণে যেমন নানা বর্ণের উৎপাদন করিয়া প্রকৃতিবাণী প্রভাতে সন্ধ্যায় কত ভঙ্গীরইনা রঙের খেলা দেখাইয়া আমাদের নয়ন মন মোহিত করিতেছেন, সেই রূপ ৭টি মাত্র মূল স্বরের বিচিত্র বিন্যাস কৌশলের দ্বারা কত কত বিচিত্র রাগ রাগিণী সৃষ্টি করিয়া যুগ যুগান্ত হইতে মানবকুল শ্রোতৃচিত্তে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। ভারতীয় রাগ রাগিণী সমুহের উৎপত্তি কাহিনী এইরূপ।

শিবশক্তির সমাযোগেই রাগরাগিণীর উদ্ভব হইয়াছিল। শিবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি আর গিরিজার বদনকমল হইতে আর একটি এই ছয়টি রাগের সৃষ্টি হয়। শিবের সদ্যোবক্ত্র হইতে শ্রীরাগের, বামদেব হইতে বসন্ত, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম এবং ঈশানাখ্যবদন হইতে মেঘরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর গিরিজা যখন লাস্যলীলায় ব্যাপৃতা ছিলেন তখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে জন্মিয়াছিল নাটনারায়ণ নামক ষষ্ঠ রাগ। যথা—

"শিবশক্তি সমাযোগাদ্ রাগাণাং সম্ভবো ভবেৎ।
পঞ্চাস্যাৎ পঞ্চরাগাঃ স্যুঃ ষষ্ঠস্ত গিরিজামুখাৎ।
সদ্যোবক্তাতু শ্রীরাগো বামদেবাদ্ বসন্তকঃ।
অঘোরাদ্ ভৈরবোঽভূৎ তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোঽভবৎ।

ঈশানাখ্যাণ্মেঘরাগো নট্টারম্ভে শিবাদভূৎ।
গিরিজায়া মুখাল্লাস্তে নট্টনারায়ণোঽভবৎ।।"

—সঙ্গীত দর্পণম্।

হরপার্ব্বতীর মুখ হইতে ছয়রাগের সৃষ্টি হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রথমে ব্রহ্মা এই সকল রাগ শিক্ষা করেন। পরে তিনি প্রত্যেক রাগের পত্নীরূপে ছয়টি করিয়া ছয়ত্রীশটি রাগিণী সৃষ্টি করেন, এবং সেই সমস্ত রাগ রাগিণী নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু (ইনিই তাম্বুরার সৃষ্টি কর্ত্তা), হুহু এবং ভরত এই পাঁচজন শিষ্য ও শিষ্যাকে শিক্ষা দেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই একখানি করিয়া সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দেবর্ষি এবং ভরত প্রণীতগ্রন্থ ভূতলে, রম্ভার গ্রন্থ :স্বর্গে এবং হুহু ও তুম্বুরুর সংহিতা পাতালে প্রচলিত হয়। যথা—

"ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তুম্বুরুমেবচ।
পঞ্চশিষ্যাং স্তুতোঽধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাদিশদ্বিধিঃ॥
ততঃ সঙ্গীতকং কৃত্বা গ্রন্থং সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্।
আনন্দয়ন্ দেবরাজং শিষ্যাস্তে ভরতাদয়ঃ॥
রম্ভয়া রচিতা স্বর্গে ততঃ সঙ্গীত সংহিতা।
প্রচচার তয়া শক্রো নাট্যানুষ্ঠানমতনোৎ॥
প্রচার চ পাতালে হুহুতুম্বুরু সংহিতা।
দেবর্ষের্ভরতস্যাপি সংহিতা ভূতলে স্থিতা॥"

ইতি শ্রীনারদকৃত পঞ্চমসার সংহিতায়াং রাগনির্ণয়ে
তৃতীয়াধ্যায়ে।—উপক্রমণিকা সঙ্গীত সার।

একদা রম্য কৈলাসশৃঙ্গে বিল্বমূলে শিব সমীপে সুখাসীনা পার্ব্বতী ভগবানকে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, রাগ রাগিণীগুলির কোনটী রাগ কোনটীই বা রাগিণী, তাহাদের রূপইবা কেমন, কোন্ ঋতুতে কোন্ সময়ে কোনটি গাওয়া যায় এ সমস্ত আমায় কৃপা করিয়া বলুন।

তখন ঈশ্বর বলিলেন,—শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ এবং বৃহন্নাট (অর্থাৎ নট্টনারায়ণ) এই ছয়টি রাগ বলিয়া কথিত হয়। যথা—

"শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘ রাগো বৃহন্নাটঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥"

তাহার পর বলিলেন,—

মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, এবং পাহাড়িকা এই ছয়টী শ্রীরাগের বরাঙ্গণা।

দেশী, দেগিরী, বরাটী, তোড়িকা, ললিতা, এবং হিন্দোলী এই ছয়টী বসন্তের বরাঙ্গনা।

ভৈরবী, গুর্জ্জরী, বামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী এই ছয়টী ভৈরবের বরাঙ্গনা।

বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী এবং পঠমঞ্জরী এই ছয়টি পঞ্চমের অঙ্গনা।

মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, ও হরশৃঙ্গরা এই ছয়টী মেঘমল্লারের যোষিৎ।

কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও নট্টহম্বীরা এই ছয়টী নট্টনারায়ণের অঙ্গনা।

এই গুলির আর মূলশ্লোক দেওয়া হইল না।

রাগিণীযুক্ত	শ্রীরাগ	শীত	ঋতুতে গাইবে।	
”	বসন্ত	বসন্ত	”	”।
”	ভৈরব	গ্রীষ্ম	”	”।
”	পঞ্চম	শরৎ	”	”।
”	মেঘরাগ	বর্ষা	”	”।
”	নট্টনারায়ণ	হেমন্ত	”	”।

সর্ব্বশেষে বিধান দেওয়া হইয়াছে সে সুখপ্রদা সর্ব্ব ঋতুতেই যথেচ্ছা অর্থাৎ সকল রাগ রাগিণীই গান করিবে। যথা :—

"যথেচ্ছয়া বা গাতব্যা সর্ব্বর্ত্তুষু সুখপ্রদা ॥"

—ইতি সোমেশ্বরমতম্। সঙ্গীতদর্পণম্।

রাগরাগিণী গাইবার সময় সম্বন্ধেও শ্লোক আছে। তবে এখন যেরূপভাবে রাগ রাগিণী গাহিবার সময় প্রচলিত হইয়াছে তার সঙ্গে পূর্ব্ব নিয়মের কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের "সঙ্গীত চন্দ্রিকা নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বহু রাগ রাগিণীর ঠাটসহ গাইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহা এইস্থলে আর প্রদত্ত হইল না। (ক্রমশঃ)

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান।*

(দ্বিতীয় গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মিশ্র খাম্বাজ——দাদ্‌রা।

ছায়া।

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে' প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদ'র উপকূলে।
জানি না ত, প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ চাঁদের হাসি;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী।

```
        ১´           ০              ১´            ০
সা II { -া  ন্ধা  ন্া । সা  -রা  রা I  -া  ন্সা  সা । পা  মা  -গা I
আ       য়   রে°   ব    স   ন্   ত      •   ও•  তোর্  কি  র   •

        ১´                          ১´       ॥ ০
I       -রা  সন্া  সা । রা  পা  মা I  গা  -া  -া । ( -া  -া  সা ) } ।
        ণ্   মা°   খা । পা  খা  তু     লে  •   • ।    •   •  "আ"
```

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "নারায়ণের" প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

০ ১´ ০ ১
। -া -া হ্মা I { হ্মা হ্মহ্মা হ্মহ্ম পা পা -া I হ্মপা -ধপা মগরা।
• ◦ নি য়ে আয় তোর্ নৃ ত ন্ গা◦ •• নে••

০ ১´ ০ ১´
। রা রগা -পমা I -গা রসন্া সসা। রা পপা মা I গা -া -া ।
নৃ ত◦ •• ন্ পা•• তায় নৃ তন্ ফু লে ◦ •

০ ০
। (-া -া হ্মা) } I -া -া সা II
• • 'নি' ◦ • "আ"

অন্তরা।

০ ১´ ০ ১´
। -া -া রা II { গা পা পা। ধধা ধা -ণা I ণা ধা -া ।
• • শু নি প ড়ে প্রে ম • ফাঁ দে ◦

০ ১´ ০ ১´
। -া -া পহ্মা I হ্মা হ্মা হ্মা । পা হ্মপা -ধা I পহ্মা পা -া ।
◦ • তা◦ রা স ব হা সে◦ ◦ কাঁ◦ দে •

০ ০ ১´ ০
। (-া◦ -া রা) } I -া -া হ্মা I { হ্মা হ্মা হ্মা । পা পা পা I
• ◦ 'শু' ◦ • আ মি শু ধু কু ড়া ই

১´ ০ ১´ ০
I হ্মপা -ধপা মগরা। রা রগা -পমা I -গা রসন্া সসা। রা পা মা I
হা◦ •• সি•• সু খ◦ •• ◦ ন◦◦ দীর্ উ প কূ

১´ ০ ০
I গা -া -া। (-া -া হ্মা) } I -া -া সা II
লে • • • ◦ 'আ' ◦ • "আ"

সঞ্চারী।

০ ১ ০ ১´
। -া -া পা II { পা ধা না । ধনা -ধনা সা I সা সা -া ।
• • জা নি না ত প্রে •• ম কি সে •

০ ১´ ০ ১´
। -া -া ন্া I সা রা গা । রা পা মা I গা -া -া ।
• • চা হি না সে ম ধু বি যে • •

০ ০ ১´ ০
। (া -া প্া) } I -া -া হ্মা I { হ্মা হ্মা হ্মা । পা পা পা I
• • 'জা' • • আ মি শু ধু বে ড়ি য়ে

১´ ০ ১ ০
I হ্মপা -ধপা মগরা । রা রগা -পমা I -গা রসন্া সা । রা গা হ্মা I
বে০ •• ড়া০ই নে চে• •• • গে য়ে প্রা ণ খু

১´ ০ ০
I পা -া -া । (-া -া হ্মা) } I -া -া পা I
লে • • • • 'আ' • • নি

আভোগ।

১´ ০ ১´ ০
I { পা ননা ননা । র্সা র্সা নর্সর্া I র্সা র্সা -া । -া -া র্সা I
য়ে আয় তোর কু সু ম•• রা শি ০ • • তা

১´ ০ ১´ ০
I র্নর্সা না ধপহ্মা । পা না ধা I নর্সা না -া । (-া -া পা) } I
রায় কি র০ণ্ চাঁ দে র হা• সি • • • 'নি'

০ ১´ ০ ১´
I -া -া হ্মা I { হ্মা হ্মা হ্মা । পা পা পা I হ্মা পা -া ।
• • ম ল য়ে র ঢে উ নি য়ে আ য়্

০ ১´ •• ০ ১´
। গা গা পমা I -গা রন্সা সসা । রা পা মা I গা -া -া ।
উ ড়ি য়ে• • দে•• এই এ লো চু লে ০ •

০ ০
। (-া -া হ্মা) } I -া -া সা II II
• • 'ম' • • 'আ'.

এ স্বরলিপি একতালা তালেও বেশ বাজাইতে পারা যায়। সে অবস্থায় একতালার তৃতীয় আঘাতের তৃতীয় মাত্রা হইতে ধরিতে হইবে।—লেখিকা।

নারায়ণের নিকষমণি

মানসী—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী লিখিত, অন্নদা বুক ষ্টল হইতে প্রকাশিত, আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রয়োদশ গ্রন্থ। ইহাতে একটি ছোট গল্প আর একটী ভ্রমণ কাহিনী আছে, গল্পটীর নামেই পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। গল্পের ঘটনা আধুনিক ধরণের বটে। অপ্রত্যাশিতভাবে নায়ক নায়িকার মিলন —কেহ কাহাকেও চেনেন না—তারপর অলক্ষিতে ভালবাসা—তাহার পর বিবাহের প্রস্তাব (অবশ্য দুই তিনবার না এর পর) তাহার পর আলাপ, তাহার পর বিরহ, তাহার পর হা হুতাশ, তাহার পর নৈরাশ্য—বিবাহ হইল না। ইতি সমাপ্ত। পুরীর ভ্রমণ কাহিনী সুখপাঠ্য হইয়াছে। বর্ণনাভাগে যথা—মাঝে মাঝে অসঙ্গতি আছে, ভ্রমর কৃষ্ণ চুলের গোছা চোখে মুখে লুটোপুটি খাচ্চে," তারপর পট পরিবর্ত্তন করিয়াই লেখক কহিতেছেন 'যাবার সময় দোলান বেনীটা তার পিঠে কয়েকটা আছাড় খেল মাত্র' কবি ভ্রাতারা বলিতে পারেন কিরূপে উহা সম্ভব হয়? আর এক স্থানে লেখক বলিতেছেন '৫ টায় ত ট্রেণ ছাড়বে ইত্যাদি' তারপর 'তখন বেলা ৪টা...গার্ড হুইসেল দিলেন...লাফ দিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে চড়িয়া বসিলাম।" ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। ভাল ছাপা কাগজ ও মলাট সুন্দর।

স্বরাজ সাধন—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য চারি আনা।

প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা

ভারত জুড়ে যে প্রচণ্ড আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তার একটা পরিচয় দেবার জন্য এই পুস্তিকাখানি লেখা হয়েছে। এর—বিষয় নির্ব্বাচন দেখলেই তা বুঝতে পারা যাবে—নবযুগের আহ্বান, অসহযোগিতা জাতির প্রাণের কথা, অসহযোগিতার অর্থ ও কারণ, পাঞ্জাবের কথা, খিলাফতের কথা, অন্নকষ্ট ও বস্ত্রের অভাব, মহাত্মা গান্ধী, অস্ত্রধারণ জাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও স্বাধীনতা-লাভের অন্তরায়, মহাত্মার বাণী, অসহযোগিতা আত্মশুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতার পথ, এবং আত্মত্যাগ ও নির্ভীকতা—এই কয়টি বিষয় এই পুস্তকখানিতে আলোচনা করা হয়েছে। বইখানি পড়ে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। আমাদের মনে হয় এখানি পড়লে মোটামুটি বর্ত্তমান আন্দোলনের

ধারাটিকে বুঝতে সহজ হবে। সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিখিত হয়ে বইখানি আরও সুখপাঠ্য হয়েছে। আমরা এ পুস্তক খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

যাত্রী

[শ্রীবুদ্ধদেব বসু]

অসীম পথে চলেছি যবে
ফিরব না আর ফিরব না,
অকূল মাঝে ভেসেছি যবে
ভিড়্‌ব না আর ভিড়্‌ব না।

পথের মাঝে থাকনা কাঁটা,
সাগর জলে ঢেউয়ের ঝাঁটা
দুঃখ আসুক ঘিরে আমায়
টল্‌ব না কো টল্‌ব না।

শিকল যত পড়্‌বে পায়ে
আসবে বাধা যত,
মুক্তি তরে চিত্ত আমার
উঠবে নেচে তত।

বিঘ্ন বাধা আস্‌বে যত,
নীরব হ'য়ে সইব তত,
শত বাধায় লক্ষ্য অমার
ভুলব না কো ভুলব না।

পিতলকে সোণা বলিয়া চালাইলে সোণার গৌরব ত বাড়েই না, পিতলটার ও জাত যায়। অথচ, সংসারে ইহার অসদ্ভাব নাই। যায়গা ও সময় বিশেষে হ্যাট মাথায় দিয়া খাতির আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু চোখ বুজিয়া একটু-খানি দেখিবার চেষ্টা করিলেই দেখা অসম্ভব নয় যে একদিকে এই খাতিরটাও যেমন ফাঁকি, মানুষটার লাঞ্ছনাও তেমনি বেশী। তবুও এ চেষ্টার বিরাম নাই। এই যে সত্যগোপনের প্রয়াস, এই যে মিথ্যাকে জয়যুক্ত করিয়া দেখানো এ কেবল তখনই প্রয়োজন হয় মানুষ যখন নিজের দৈন্য জানে। নিজের অভাবে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু এমন বস্তু কামনা করে যাহাতে তাহার যথার্থ দাবী দাওয়া নাই। এই অসত্য অধিকার যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া পড়িতে থাকে, অকল্যাণের স্তূপও ততই প্রগাঢ় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে; আজ এ দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার যো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা সিডিশন অথচ দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে সুরু করিয়া কনেষ্ট-বল পর্য্যন্ত সবাই বলিতেছেন সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা এমন কি তীব্র ও কটু হইলেও—নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়। চিত্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়,—এম্‌নি। অর্থাৎ অত্যাচার অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই, যাহাতে প্রজা-পুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ-দৈন্যের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ঠিক এম্‌নিটি না ঘটিলেই তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব করি? দুই জন পাকা ও অত্যন্ত হুঁসিয়ার এডিটারকে একদিন প্রশ্ন করিলাম, একজন মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন ওটা ভাগ্য। অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে সিডিশন হয়না—ওটা বিগড়াইলেই হয়। আর একজন পরামর্শ দিলেন, একটা মজা আছে। লেখার গোড়ায় 'যদি' এবং শেষে "কি না?" দিতে হয়, এই দুটা কথা নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারিলে আর সিডিশনের ভয় থাকে না। হবে ও বা, বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম—কিন্তু আমার পক্ষে একের পরামর্শও যেমন দুর্ব্বোধ, অপরের উপদেশও তেম্‌নি অন্ধকার ঠেকিল। লিখিয়া লিখিয়া নিজেও বুড়া হইলাম, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক মতই কোন একটা বিষয় ন্যায়সঙ্গত কি না স্থির

করিতে পারি, কিন্তু যাহার আলোচনা করিতেছি তাহার রুচি ও বিবেচনার সহিত কাঁধ মিলাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কি করিয়া যে লেখার আগাগোড়ায় 'যদি', ও 'কিনা', বিকীর্ণ করিয়া সিডিশন বাঁচাইব ইহাও যেমন আমার বুদ্ধির অতীত, জোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য যাচাইয়া তবে লেখা আরম্ভ করিব সেও তেমনি সাধ্যের অতিরিক্ত। অতএব সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায়, কোনটাই আমি সম্প্রতি পারিয়া উঠিব না। তবে প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করিব না।

এই প্রবন্ধটা বোধ করি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভূমিকায় এই কথাটাই আরও একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। একদিন এ দেশ সত্য-বাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সত্যবাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি বা কেহ লেখে ছাপা ওয়ালা ছাপিতে চায় না,—প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা যাঁহাদের পেশা, জীবিকার জন্য দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকতা যাঁহাদের করিতে হয়, অসংখ্য আইনের শতকোটী নাগপাশ বাঁচাইয়া কি দুঃখেই না তাহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয় রাজ রোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্ক ভাষার ফাঁদে ফাঁদে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে, তখন তাহার বিক্ষত, বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। ভাষা যেখানে দুর্ব্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যে ছেলে অবস্থার বশে ইস্কুলে কাগজ-পেন্সিল চুরি করিবার ফন্দি শিখিতে বাধ্য হয়, আর একদিন বড় হইয়া সে যদি প্রাণের দায়ে সিঁদ কাটিতে সুরু করে তখন তাহাকে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আইন প্রয়োগ করে তাহার মহত্ব বাড়ে না এবং ইহার নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রতায় দর্শকরূপে লোকের মনের মধ্যেও যেন সূচ বিঁধিতে থাকে।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোধ করি আরও একটু পরিস্ফুট হইবে।

(ক্রমশঃ)

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]   [চৈত্র, ১৩২৮

আলোর উদ্দেশে

[দরবেশ]

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
ঘুচাও তোমার বর্ণেগন্ধে অন্ধকারের কালো।
এই ভারতের দেশে দেশে,
মরণ-বরণ ঘুমের শেষে,
কণক কিরণ দেখাও হেসে,—
জীবন-জাগন ঢালো।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিটোল ছন্দে
বাজাও তোমার বাঁশী;
ঘুমভাঙাদল নয়ন মেলে
খেলুক হাসি হাসি।
রঙীণ ডানার পরশ পেয়ে,
তরুণ প্রবীণ চলুক ধেয়ে;
পথের বিপুল আঁধার ছেয়ে
হোমের আগুন জালো।

বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাষা বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস।

(১) পাশ্চাত্য প্রদেশে ভাষা বিজ্ঞান চর্চা

(২) প্রাচ্য দেশে ভাষা বিজ্ঞান চর্চা

(পুরাতন ও আধুনিক)

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় ভাষাসমূহ লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন সেই সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিব।

(১) ভাষা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা আধুনিক কালেই হইয়াছে। সেকালের ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহার চর্চা ছিল না বলিলেই হয়। গ্রীকজাতি ব্যাকরণের ধার ধারিত না। অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চা অবশ্য তাহারা খুব করিত। পরের ভাষা শিক্ষা করা তাহারা নিজেদের সম্মানের হানিকর বলিয়া মনে করিত। অন্য সকলের ভাষাই অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রথম গ্রীক ব্যাকরণ একজন রোমীয় কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। ইংরেজ পণ্ডিতগণ এবিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক। কিন্তু জার্ম্মণরা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং এখনও পুরোবর্ত্তী আছে।

বপ্ (Bopp) নামক জার্ম্মাণ পণ্ডিত তুলনামূলক ব্যাকরণের (comparative grammar) প্রথম রচয়িতা। তিনি ১৭৯১—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সংস্কৃত, জৈন, গ্রীক, লাতিন, জর্মাণ, প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দো—ইউরোপীয় ভাষার তুলনা মূলক ব্যাকরণ তিনিই লিখিয়া যান।

গ্রীম্ (Grimme, 1786—1859) আর একজন জার্মাণ পণ্ডিত তিনি ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি মূল সূত্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে আবিষ্কার করিয়া যান। সুবিখ্যাত Grimm's Law ইহারই আবিষ্কার।

পট্ (Pott, 1802—1887) নামে জার্মাণ পণ্ডিত অর্থ সম্বন্ধীয় আলোচনার সূত্রপাত করেন (Etymological Studies)।

ম্যাক্‌সমুলর (Maxmnller) যদিও বিলাতে বসবাস করিয়াছিলেন—কিন্তু জাতিতে তিনি জার্ম্মাণ ছিলেন।

ম্যাক্‌সমুলর ভাষাবিজ্ঞান চর্চ্চাকে লোকের মধ্যে বিস্তার করেন। তিনি এবং পাউল (Paul) নামক জার্মাণ পণ্ডিত "ভাষার ইতিহাস" (History of Language) অংশের আলোচনার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

শব্দার্থ তত্ত্বের (Semantics) আলোচনা আরম্ভের পূর্ব্বে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ফরাসী অধ্যাপক ব্রেআল (Breal) ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) বিষয়ে গ্রিম, বার্ণার, গ্রাসমাণ, ফরচুনাটফ্ (Grinmm, Verner, Grassmann, Fortunatov) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরচুনাটফ্ রুশীয় ছিলেন। ইঁহারা ধ্বনিতত্ত্বের এক একটি সূত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গ্রিমের মূল সূত্রে যে সমস্ত দোষ ছিল, বার্ণার, গ্রাসমান, ফরচুনাটফ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত সূত্রের সাহায্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। ব্যুলর (Biihler) নামক জার্মাণ পণ্ডিত ভারতীয় অক্ষরের ইতিহাস (Indian Paleography) রচনার জন্য অমর হইয়া গিয়াছেন। তুলনামূলক বাক্যবিন্যাসপদ্ধতির (comparative Syntax) আলোচনায় ডেলব্রুক (Delbriick) নামক আর একজন জার্মাণ পণ্ডিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। শুনিয়াছি অধ্যাপক ডেলব্রুকই একমাত্র লোক যিনি ঠিক নিজের মাতৃভাষার মতই অপর একটি ভাষায় দখল লাভ করিয়াছেন। সাধারণতঃ মাতৃভাষার মত অন্য ভাষার সমান অধিকার সম্ভবপর হয় না। তুলনামূলক বাক্যবিন্যাসপদ্ধতির আলোচনায় এরূপ জ্ঞান খুবই সাহায্যপ্রদ।

শব্দ সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস আলোচনায় জার্ম্মান পণ্ডিত শ্রাডার (Schrader) সবিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন।

ভাষাবিজ্ঞান চর্চ্চার আগে অনেক গলদ ছিল। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সর্ব্ব প্রথমে জর্ম্মাণির নব-বৈয়াকরণিকেরা প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা উপহাস করিয়া ইঁহাদের নাম দেন Jimg, grammatikers —the Neo-grammarians অর্থাৎ "ছোক্‌রা বৈয়াকরণিকের দল"। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর লেসকিয়েন, থাইনটাল, পাউল, ব্রুগমান, ডেলব্রুক (Leskien, Steinthal, Paul, Brugmann, Delbriick) প্রভৃতি এই

দলের লোক প্রচার করেন অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ধ্বনি বিজ্ঞানের সূত্রাদ কার্য্য করে। পূর্ব্বে সূত্র গুলির ব্যতিক্রম ব্যাখ্যা না করিয়া গোঁজা মিল দেওয়া হইত। ইহাঁরা এমন ভাবে সূত্র গুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষায় একটী শব্দ এইরূপ হইলে গ্রীক ভাষায় এইরূপ ধ্বনি বিশিষ্ট হইবে—ইহা বলা সম্ভবপর হইয়াছিল। হয় তো পরে গ্রীক ভাষায় ঐরূপ শব্দ হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকের বাণী সফল করিয়াছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ও দ্রাবিড়ী মূলভাষা হইতেই আমাদের ভারতীয় ভাষা-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। তাই এই দুই প্রধান বিভাগের আলোচনাকারী পণ্ডিতগণের নাম নিয়ে উল্লেখ করা হইল।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধে প্রধান বিশেষজ্ঞ জার্ম্মাণ পণ্ডিত ব্রুগমান এবং ফরাসী পণ্ডিত মেইয়ে (Meillet)। ব্রুগমান জীবিত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইন্দো-ইউরোপীয়ের ভারত সংশ্লিষ্ট দুইটি প্রধান শাখার মধ্যে ইন্দো-ইরাণীয় ভাষায় গোল্ডনার, বার্থলোমাই ও জ্যাকসন (Goldner, Bartholomae, Jackson) বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গোল্ডনার ও বার্থ-লোমাই জার্ম্মাণ—জ্যাকসন্ আমেরিকান হইলেও জার্ম্মাণিতেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ইন্দো-ইউরোপীয়ের ভারতসংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় প্রধান শাখার ইন্দো-আর্য্য ভাষা যাহা হইতে আমাদের সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও বর্ত্তমান চলিত ভাষাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। পিশেল, উলেনবেক্, স্পাইয়ার, টুম্, বাকারনাগেল, টমাস (Pischel, Speijer, Uhlenbeck, Thumb, Wackernagel. Thomas) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই শাখায় বিশেষ পারদর্শী।

বিম্‌স্, হর্ণলে, গ্রিয়ারসন্, এণ্ডারসন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বাঙ্গলা ও তৎসংশ্লিষ্ট আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা করিয়াছেন। দ্রাবিড়ী শাখা সম্বন্ধে ডাঃ কলডয়েল (Caldwell) ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (Srinivas Aiyanger) মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

(২) প্রাচ্যদেশে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চ্চা।

(ক) পুরাতন।

(খ) আধুনিক।

প্রাচ্যদেশ বলিতে এখানে আমাদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিব।

চীনদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আরব প্রদেশে অতি পুরাতন কাল হইতেই ভাষা বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হইতেই ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেই যাস্ক বৈদিক সংস্কৃতের অর্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ-রচয়িতা মহর্ষি পাণিনিকে ভাষাবিজ্ঞান জনক বলিলেও চলে কারণ তিনিই প্রথমে ধাতুবাদের (Theory of roots III. 1, 91) অবতারণা করিয়া যান। পরবর্ত্তী যুগেও শত শত বৈয়াকরণিক ভাষাতত্ত্বের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শেষে নবদ্বীপের নব্য ন্যায়ের কূটতর্কের ভিতর ভাষাবিজ্ঞান জড়াইয়া মরে।

বর্ত্তমান কালে রামকৃষ্ণ গোবিন্দ ভাণ্ডারকর, পাণ্ডুরং দামোদর গুণে, ডাঃ ইরাক সোরাবজী তারাপুর ওয়ালা প্রভৃতি সুধীবর্গ ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকটা আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এখন বাঙ্গলা ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বলিব। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের History of the Bengali Language (বাঙলা ভাষার ইতিহাস) বাঙলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সখ করিয়া যাঁহারা বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের কতকগুলি লেখাও অবধানযোগ্য।

বৈজ্ঞানিকভাবে যাঁহারা বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তিনি বাঙলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। বাঙলা-ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ লিখিবার চেষ্টায় মৌলভী মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় হাত দিয়াছেন।

বাঙলাঅক্ষরের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীযুত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একখানি চমৎকার পুস্তক রচনা করিয়াছেন। শব্দার্থ তত্ত্বের আলোচনায় বর্ত্তমান লেখক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগসম্বন্ধে বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা এখনও পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই।

দুঃখের বিষয় বিদেশের পণ্ডিতগণ আমাদের ভাষার আলোচনা লইয়া জীবনপাত করিতেছেন, আর আমাদের দেশের সুধীবর্গের এদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই। জ্ঞানের জননী ভারতের সন্তান আজ মাতৃভাষার আলোচনার জন্যও পরমুখাপেক্ষী এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি আছে। এ লজ্জাভাঙার সূত্রপাত হইয়াছে, আশা করি অচিরে এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িবে।

অন্নপূর্ণা

[শ্রীসুনীতি দেবী]

(১)

যখন বৃদ্ধ রামতনু ভট্টাচার্য্য তদীয় একমাত্র দুহিতার বিবাহের ভাবনায় সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, এমনি সময় একদিন তাঁহার বাল্যবন্ধু জমিদার কালীপদ মুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতুলালয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বাড়ীর নিকটে ছিল। এখন মাত্র কয়েকটা ছাড়া ভিটা ভিন্ন তথায় আর কিছুই নাই। পুত্রহীন মাতামহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীপুরে আসা যাওয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে তিনি আজ তথায় আসিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আজ কত প্রভেদ। তথাপি জমিদারমহাশয় বাল্যসৌহার্দ্দ্য স্মরণ করিয়া জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিবার সময় ভট্টাচার্য্যের গৃহে অতিথি হইলেন।

ভট্টাচার্য্য প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই দেখিয়া কালীপদ বলিলেন, "কি ভায়া, তোমার কালীপদকে কি একেবারে ভুলে গে'ছ?"

ভট্টাচার্য্য জমিদার মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া, মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া "আসুন" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কালীবাবু সহাস্যে বলিলেন, 'আসুন' কি ভাই? আমাকে 'আপনি' বল কেন; আজ ছোট বেলার মত দুজনে একসঙ্গে বসিয়া নুন লঙ্কা দিয়া ভাত খাব, এই আশায় এ পথে আসিয়াছি। তোমার সেই কালু ভিন্ন যদি আমাকে আর কিছু ভাব, তবে আমি এই বেলাতেই প্রস্থান করি।" ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, এ সেই কালুই বটে!

পরিধান বস্ত্রাদিও যে ভট্টাচার্য্যের অপেক্ষা বড় ভাল, তা নয়; তবে পরিষ্কার বটে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন মেয়েকে ডাকিলেন, "অন্নপূর্ণা।" অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি আসিতে গিয়া নূতন লোক দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইল। কালীবাবু বলিলেন, "এস মা, এস। লজ্জা কিসের? আজ অন্নপূর্ণার রাঁধা অন্ন খাইতে আসিয়াছি।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মা, তাড়াতাড়ি রান্না করগে। আমার বন্ধু এখানে খাবেন।"

অন্নপূর্ণা রান্নার যোগাড় করিতে গেল। গাছের বেগুন, লাউ ইত্যাদি তুলিয়া সুক্ত, ঘন্ট, ভাজা, দা'ল প্রভৃতি খুব শীঘ্র পাক করিয়া পিতাকে ডাকিল। দুই বন্ধু একত্র ভোজনে বসিলেন। কালীবাবু বলিলেন, "ভাই, আজ যেন বাস্তবিক অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়াছেন। এমন রান্না তো বাড়ীতে কখনো খাইনে। ভেবেছিলাম নুন-লঙ্কা দিয়ে ভাত খেয়ে যা'ব। তা' মা যে রান্না করেছেন, একটুও পাতে রাখা হ'বে না। কিন্তু ভাই, আমার একটা কথা, —এ মেয়েটি আমাকে দিতে হবে, রোজ রাঁধবার জন্যে। এ রান্না খেয়ে পাচকের রান্না রুচ্‌বে না কিন্তু।" রামতনু প্রথমে ভাবিলেন ঠাট্টা। পরে যখন কালীবাবু বলিলেন, "আমার ছেলে সতীশ বি-এ পড়িতেছে। তাহাকে লইয়া আমি মাঘ মাসে আসিয়া তোমার মেয়েকে লইয়া যাইব।" তখন ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা, সবই তোমার ইচ্ছা! তুমি যে ভার দিয়েছ, তুমিই তাহা হইতে পরিত্রাণ করিবে। তোমাকে ভুলিয়া যাই, তাই এত ভাবনা।" কালীবাবু অন্নপূর্ণাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলিলেন, "ভাই, বিবাহের আয়োজন কর; এই পৌষ মাসান্তে মা আমার গৃহে যাইবেন।"

(২)

জমিদার গৃহিণী তরকারি কুটিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "মা, কর্ত্তা আসিয়াছেন।" গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিতেছেন, এমন সময় কর্ত্তা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "উঠতে হ'বে না, বস। একটা শুভ খবর আছে।" গৃহিণী সোৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

কর্ত্তা। সতীশের বিয়ে স্থির করেছি।

গৃহিণী। কোথায়? কত টাকা দেবে?

কর্ত্তা। বাঃ! আগেই টাকার কথা? তোমার কি অভাব আছে নাকি? বিশ হাজার টাকার উপরে তোমার জমিদারীর আয়, তবুও—

গৃহিণী। তা বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, টাকা না নিলে লোকে বলবে ছেলের কি খুঁত আছে। তাই বিনে টাকায় বিয়ে দিল। তা' কিছুতেই হ'বে না। সে দিন রামের মা আমাকে বলিতেছিল, "দিদি, তোমার ছেলের একখানা পাশের দাম, দু'হাজার টাকা।" টাকা দিতে বলিও।

কর্ত্তা। টাকা দেবে কোত্থেকে? তাদের অবস্থা তো তেমন নয়। সেকি টাকা দিতে পারে?

গৃহিণী। না, দীন-দরিদ্রের মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। ভাল টাকাই না দিল, বড় লোকের মেয়ে হ'লেও ত হ'ত। লোকে বলিবে কি?

কর্ত্তা। আমি সব স্থির করিয়া আসিয়াছি, আর বকাবকি করিও না। বিবাহের যোগাড় করগে।

ইহা বলিয়া কর্ত্তা উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী তো রাগে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "যেমন কপাল, তেমনই ঘটে। কর্ত্তার যে কি বুদ্ধি হইয়াছে,—মান-অপমান জ্ঞানও নাই!"

(৩)

দশ দিন হইল অন্নপূর্ণার বিবাহ হইয়াছে। শ্বশ্রূ বৌ দেখিয়া খুসী হন নাই। দরিদ্রের মেয়ে, একখানা গহনামাত্র দেয় নাই। সে সব দুঃখ তো আছেই। ফুলশয্যার দিন কালীবাবুর অত্যন্ত জ্বর হয়, আজ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কবিরাজ বলিয়াছে রাত্রি কাটিবে না। গৃহিণী দিনরাত্র বালিকাবধূর প্রতি রোষাগ্নি বর্ষণ করিতেছেন। অন্নপূর্ণা কেবলই কাঁদে। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া যাঁহার স্নেহে প্রতিপালিতা হইয়াছে, যাঁহাকে ছাড়া সংসারে সে আর কাহাকেও জানিত না, সেই পিতার বিচ্ছেদ তাহার প্রাণে অত্যন্ত লাগিয়াছিল। গৃহিণী কঠোর স্বরে বলিলেন, "দিনরাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনিও না। এমন অপয়া মেয়েওতো দেখি নাই। ঘরে আসিতেই আমার সংসার ভাঙ্গিবার যো হইয়াছে।" বালিকা ভয়ে ভয়ে চুপ করিত বটে, কিন্তু চোখের জল বারণ মানিতে চাহিত না।

দাসী আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা বৌমাকে ডাকিতেছেন।" এবং অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ অন্নপূর্ণাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, দাসী চলিয়া গেল। এবার পরিষ্কার কণ্ঠে কালীবাবু ডাকিলেন, "সতীশ।" সতীশ পাশের ঘরে ছিল, ডাকিবামাত্র পিতার নিকট উপস্থিত

হইল। বৃদ্ধ বলিলেন, "সতীশ, তোমাদের উভয়কে একত্র দেখিব, তাই ডাকিয়াছি। মা অন্নপূর্ণা, নরম নরম হাত দুখানি কপালে বুলাইয়া দেও তো মা।" অন্নপূর্ণা হাত বুলাইতে লাগিল। বৃদ্ধ সতীশকে বলিতে লাগিলেন, "বড় লক্ষ্মী মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলাম। দুঃখ এই, ভাল করিয়া দেখিতেও পারিলাম না। মা আমার আজন্ম দুঃখের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা, সাধ ছিল মাকে মনের মতন সাজাইব, স্নেহের অভাব ঘুচাইব, অন্নপূর্ণা আমার গৃহে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিবেন। আমি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব। সে সাধ পূরিল না, আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি চলিলাম। আমার আশা, তোমরা মায়ের দুঃখ ঘুচাইবে। আর এক কথা। পিতামাতা কিম্বা যে কোন গুরুজনই হউক না, কাহারও আদেশে ন্যায়ের পথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে, এ কথা স্মরণ রাখিও। তোমার মাকে এখন একবার আসিতে বল।" কথা শেষ না হইতে গৃহিণী সে ঘরে ঢুকিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি চলিলাম, অন্নপূর্ণার মাতার অভাব তুমি ঘুচাইও। সতীশ তোমার আজ্ঞাধীন ছেলে, যেন তাহাকে এমন কোন আদেশ করিও না যাহাতে তাহাকে ন্যায় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া একটু জল চাহিলেন। সতীশ মুখে বেদানার রস দিতে গেলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "আর ওসব কেন, গঙ্গাজল দেও।" সতীশ গঙ্গাজল দিয়া একবার ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে গেলেন। এই ৭।৮ দিনের পর আজ বেশ জ্ঞান হইয়াছে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শেষবার জ্বলিয়া এখনই হয়তো নিবিয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় সতীশের মন অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু গৃহিণী ভাবিলেন, বুঝি অবস্থা ভাল হইয়াছে। ডাক্তার প্রভৃতি অনেক লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গৃহিণী বধূকে লইয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলেরই চক্ষে জল, কর্ত্তার ব্যবহারে সকলেরই তাঁহার প্রতি অগাধ ভক্তি ছিল। কর্ত্তা সকলকে বলিলেন, "আমাকে যাত্রা করাও, ভগবানের নাম শুনাও, আর দেরী নাই।" সতীশ সাশ্রু চক্ষে পিতার ললাটে বক্ষে গঙ্গামৃত্তিকায় রামনাম লিখিয়া দিলেন। শিবদৃষ্টি দেখিয়া গৃহের বাহিরে আনিয়া তারাব্রহ্ম রামনাম শুনাইতে লাগিলেন। সজ্ঞানে ভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে ধার্ম্মিকবরের প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল।

(৪)

যখন রামতনু ভট্টাচার্য্য অন্নপূর্ণাকে নিতে আসিলেন, মনে মনে কত আশা

অন্নপূর্ণা কত আদরে, কত উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইতেছে! আহা! মেয়ে কখনও কোন উৎসব বা সুখের মুখ দেখে নাই। নিতান্ত ভগবান্ দয়া করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন! হয়তো যাইয়া দেখিবেন, অন্নপূর্ণা যেমন করিয়া পিতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিত, তেমনি ভাবে কালীবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাঁহার স্নেহে হয়তো সে পিতার অভাব অনুভব করিতে পারিতেছে না, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ী প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন উৎসব বা আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই, সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া। রামতনু জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ত্তা কোথায়? শুনিলেন আজ দুই দিন হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, হায়! অন্নপূর্ণার জন্য বুঝি ভগবান্ আদর যত্ন লেখেন নাই! পরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সমস্ত বাড়ীটাই যেন শোকে মুহ্যমান। সতীশের মুখে তাঁহার হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা যেন প্রকাশিত হইতেছে।

রামতনু বেহানকে কহিলেন, "আমি না জানিয়া অন্নপূর্ণাকে নিতে আসিয়াছি। তা' এ অবস্থায় আর কেমন করিয়া লইয়া যাইব। বেহাই এত শীঘ্র যে তোমাদের শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই।" সতীশ বিশেষ কিছু বলিল না। রামতনুর আহারাদির ব্যবস্থা অন্য ব্রাহ্মণ বাড়ীতে করা হইল; অশৌচ, এ জন্য এ গৃহে তাঁহার আহার করা হইবে না।

সতীশের মার কিন্তু অন্নপূর্ণাকে রাখিতে সাহস হইতেছে না। এমন অপয়া মেয়ে, গৃহে আসিতেই ত শ্বশুর গত হইয়াছেন। সতীশের যদি উহার গায়ের বাতাসে কোন অমঙ্গল হয়? ভাগ্যি এ যাবৎ তাহার সতীশের সংস্পর্শ ঘটে নাই! তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "আপনি আপনার মেয়েকে লইয়া যান, এমন ডাইনী মেয়েকে রাখিতে আমার সাহস হয় না।" কালীবাবুর অভাবে, এ বাড়ীতে যে অন্নপূর্ণার কি রকম আদর, ব্রাহ্মণের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। যাহা হউক, ভগ্ন হৃদয়ে কন্যাকে লইয়া তিনি তথা হইতে যাত্রা করিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর গৃহ হইতে অন্নপূর্ণার অন্ন উঠিল।

(৫)

দুই তিন দিন পরে সংবাদ আসিল, রামতনু ভট্টাচার্য্যের মৃত দেহ পাওয়া

গিয়াছে, সম্ভবতঃ নৌকা-ডুবি হইয়াছিল। মেয়েটার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এ সংবাদ সকলেই শুনিল।

রামের মা আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "দিদি, শুনিলাম, বৌটার বাপের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সে-ও মরিয়াছে। বলিলে কি বল্‌ব দিদি, সেই মরা ত মরিল, আর কিছুদিন আগে মো'লে হয়তো তোমার এ সর্ব্বনাশ হইত না।" গৃহিণী নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। রামের মা বলিতে লাগিলেন, "তা তোমার দুঃখ হতে পারে, তোমার দয়ার শরীর কিনা। আমি কিন্তু দেখিয়াই বলিয়াছি মেয়েটার লক্ষণ তত ভাল নয়। অত ছোট কপাল কি ভাল হয়? আমার মেয়ের কপাল খানা দেখিয়া সে দিন গণক ঠাকুর কত ভাল বলিলেন, যেমন বড় উঁচু কপাল তেমনি বড় ও উঁচু ঘরের বৌ হ'বে। আমি বলেছিলাম, তেমন বেশী টাকা তো নাই যে বড় ঘরে বে হ'বে। গণক বলিল, এই জমিদার বাড়ীতেই বিবাহ হওয়া সম্ভব। তখন অসম্ভব ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখছি ভগবানের ইচ্ছায় সম্ভব হইতেও পারে। কর্ত্তা তো বিনে টাকায় আমার চেয়েও দরিদ্রের ঘরের মেয়ে এনেছিলেন।"

গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না। ইতিমধ্যে বাটীর একটি পরিচারিকা সেখানে আসিয়াছিল। বৌয়ের জল-মগ্ন সংবাদ শুনিয়া বলিল, "অমন বৌ কিন্তু আর জুটিবে না। যখন গহনাগুলি ও বেনারসী পরাইয়া দিয়াছিলেন, যেন দুর্গা-প্রতিমার মতই দেখাইতেছিল। উঠানখানি যেন আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আহা! কথাগুলিও যেন"—

পরিচারিকার কথায় বাধা দিয়া রামের মা বলিলেন, "ওর মত সুন্দর মেয়ে ঢের মিলবে। বড় ফ্যাকাশে রং যেন চোখ ধরে। আমার মেয়েকে দেখিয়া অনেকেই বলে, মেয়ে-মানুষের এমন বর্ণই ভাল! বেশ লক্ষ্মীর শ্রী।" গৃহিনীকে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি গহনাগুলি কি সব দিয়াছিলে?" গৃহিণী কহিলেন, "আমি ভাবিলাম এ ক'দিন তো আর গহনা পরবে না; তাদের ভাঙ্গা ঘরে চোরে লইয়া যাইবে, তাই সঙ্গে দিই নাই। তখন তো ভেবেছিলাম' আবার এই খানেই আসতে হবে। এমন যে হ'বে তা কে জানত। কেবল কর্ত্তা সতীশ ও বৌয়ের জন্যে এক-রকম নূতন ফ্যাসানের আংটী গড়িয়েছিলেন, সেই আংটীটা ছিল।" রামের মা বলিলেন, "তা ভালই করেছিলে, দিদি। বৌতো গিয়াছে, গয়নাগুলোও যেত। সেও পরত না, তোমারও জিনিষ নষ্ট হ'ত।"

এমন সময় কর্ম্মচারী আসিয়া ডাকিল, "গিন্নী মা, এদিকে আসুন, কথা আছে।" গৃহিনী উঠিয়া গেলেন।

মহা সমারোহে কর্ত্তার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গিয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, তিনি যেমন সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার কার্য্যও তেমনি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। কাঙ্গালীরা দুইহাত তুলিয়া সতীশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা বলিলেন সতীশ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছে। সকল কাজ সম্পন্ন হইয়া গেলে সতীশ মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

(৬)

সতীশ কলিকাতায় পৌছিয়া তাঁহার বন্ধু বিনোদলালের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। পিতৃশোকে মন যেন বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মানসিক অবসাদ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার আশায়, বিনোদের আসার অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই তাহার বাসায় গেলেন।

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "কি ভায়া, এবার ফিরিতে পারিলে তো? আমি তো ভাবিয়াছিলাম, বৌদিদি বুঝি আর তোমাকে এ যাত্রা ছাড়িয়া দিবেন না।" বিনোদ বিবাহ পর্য্যন্ত জানিত। তৎপরে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সব কিছুই জানিত না।

সতীশ তখন সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিনোদলালকে বলিলেন। তৎপর কহিলেন, "ভাই, যেদিন আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব এ জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতে এক মুহূর্ত্তও যেন শান্তি পাইতেছি না। প্রাণের কি যে হাহাকার করিতেছে, তাহা মানুষকে বলিয়া বুঝাইতে পারি না। যিনি অন্তর্য্যামী তিনি ভিন্ন আর কেহ এ প্রাণের যাতনা বুঝিবে না। হৃদয় ভার অসহ্য বোধ হইতেছিল, তাই এখানে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমার পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমাকে দেখিয়া তোমার কাছে দুঃখের কথা বলিয়া, প্রাণে একটু শান্তিবোধ হইতেছে।"

বিনোদ সতীশের কথাগুলি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার অন্য কোন কথা-বার্ত্তা হইয়াছে কি? তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে কি?"

সতীশ কহিলেন, "কথা বলিবার সুযোগ আর ঘটিল কৈ? ফুলশয্যার রাত্রে যখন শুইতে গেলাম, চাকর আসিয়া বলিল কর্ত্তা ডাকিতেছেন। গিয়া

দেখিলাম, বাবার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিয়া, তাঁহার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার সামান্য পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম। অনেক রাত্রে যখন তাঁহার একটু হুস হইল, তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি এখনও শোও নাই? যাও, আমি এখন একটু ভাল আছি।' তাহার পর শয্যায় গিয়া দেখিলাম, অন্নপূর্ণা ঘুমাইতেছে। তাহার ঘুমন্ত মুখখানি যেন ফুটন্ত পদ্মফুলের মত শোভা পাইতেছে। তাহাকে আর ডাকিলাম না। পরে তাহার সে মুখখানি আর দেখি নাই। বাবার ব্যারামেই ব্যস্ত ছিলাম, আগেতো আর জানি নাই যে এই শেষ দেখা!"

বিনোদ বলিল, "মনে কর যদি ভবিষ্যতে কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাও, তবে কি চিনিতে পারিবে? তাঁহার শরীরে বিশেষ কোন চিহ্ন আছে?"

সতীশ বলিলেন, "যদিও আমি দেখি নাই, তবু যতটুকু দেখিয়াছি, আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া দেখিয়াছি। দেখি যদি, চিনিতে পারিব বৈকি? তাহার ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে একটী তিল আছে। কিন্তু আর কি তাহাকে ফিরিয়া পাইব? জানি না, যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে কি ভাবে আছে। 'সে যে আজন্ম দুঃখের কোলে প্রতিপালিতা'—বাবার এই কথাটি কেবলই যেন আমার প্রাণে বাজিতেছে!"

বিনোদ বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, আবার দেখা হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে খুঁজিতে হইবে।"

সতীশ বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছি।"

(৭)

এই ঘটনার পর চারি বৎসর গত হইয়াছে। ৺কাশীধাম বিশ্বেশ্বরের দর্শন-মানসে এক রুগ্ন ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিয়াও মন্দিরে ঢুকিতে পারিতেছেন না। পরে অতিকষ্টে কোনরূপে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন, অমনি কতকগুলি লোক তাহার উপর যাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "মা অন্নপূর্ণা কোথায় তুই? তোর ভরসায় আমি যে এত কষ্টেও এখানে আসিয়াছি।"

একজন বিদ্রূপ-স্বরে বলিলেন, "অন্নপূর্ণা যেন তোমাকে কোলে করিয়া তুলিবেন!" এমন সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী দেবী মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিয়া বাস্তবিক ব্রাহ্মণকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলেন। একজন প্রবীন বয়সের লোক ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিতে

অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনার বাসা কোথায় বলুন। আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিতেছি।"

তৎপর তিনি ব্রাহ্মণের সমভিব্যহারে তাঁহার বাসায় চলিলেন।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম কি ?"

"শশীভূষণ মিত্র।"

"এখানেই থাকেন ?"

"না, দুই-তিন দিন মাত্র আসিয়াছি। মুঙ্গেরে ওকালতি করি।"

"আপনি সদাশয় বলিয়া মনে হইতেছে। আর পাঁচ দিন পরে আপনি দয়া করিয়া একবার এখানে আসিবেন। বিশেষ কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে ?"

"হাঁ।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ অন্নপূর্ণাকে বলিলেন, "মা আর সপ্তাহ মধ্যে আমার জীব-লীলা সাঙ্গ হইবে। তাই ভাবিতেছি, তোমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব! যিনি রক্ষা করিবার তিনি রাখিবেন ;—মানুষ উপলক্ষ মাত্র। কাহাকেও চিনিতাম না। এই ভদ্রলোকটিকে ভগবান্ যথাসময়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি ভাবিতেছি, তোমাকে উঁহার কাছে রাখিয়া যাইব। বিন্দুমাত্র ভীত হইও না। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। তোমার দুঃখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর অল্পদিন পরে তুমি অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে। মা, তোমাকে পাইয়া সন্তানের সকল অভাব ভুলিয়াছিলাম। তুমি মায়ের মত যত্ন করিতে, সন্তানের মত ভক্তি করিতে। ভগবানের কৃপায় আর মাসখানেক পরে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।"

অন্নপূর্ণা নীরব রহিল। অশ্রুধারা তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া যেন শিশির-সিক্ত পদ্মফুলের মত তাহার সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছিল।

ব্রাহ্মণ আবার কহিলেন, "মা, কাঁদিও না, তুমি গীতা পড়িয়াছ, ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। অনন্ত জীবনের তুলনায় এ ক্ষুদ্র জীবন কতটুকু? সুখ-দুঃখ যাহাই আসুক না, কিছুতেই দৃক্‌পাত না করিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহাতেই হৃদয়-মন সমর্পণ কর ;—ধীরে ধীরে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হও। নিজেকে নিরাশ্রয়া মনে করিও না। যাহাকে দেখিবার কেহই নাই, তাহাকে

তিনিই দেখেন।—তাঁহাকে ভুলিও না। এইবার তোমার দুঃখের চরম। এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তাঁহার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাইবে।"

ঠিক পাঁচ দিন পরেই শশীভূষণ মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "দয়াময় ভগবান্ আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আমার এ জীবনের আর দুদিন মাত্র বাকী আছে। দু'দিন পরে এ দেহের সম্বন্ধ ঘুচিবে। এ মেয়েটিকে কোথায় কাহার কাছে রাখিয়া যাইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় ভগবান্ আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ইঁহাকে আমি মেয়ের মতই মনে করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

(ক্রমশঃ)

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

তত্ত্বসমাসের সংক্ষিপ্ত সার

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

কোনো এক ব্রাহ্মণ সংসার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শান্তি কামনা করিয়া মহর্ষি কপিলের শরণাপন্ন হইয়া বলেন—'মহর্ষি সংসারের ত্রিবিধ তাপে আমি নিতান্তই তপ্ত, কি করিলে এই দুঃখের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইব? শান্তির সন্ধান কোন্ পথে আমায় দয়া করিয়া বলিয়া দিন।" কপিলমুনি দয়া পরবশ হইয়া বলিলেন, "প্রকৃতি পুরুষের বিবেকাহ্বানেই মুক্তি—অন্য পন্থা নাই। মৎকথিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের হৃদয়ঙ্গম হইলেই বিবেকজ্ঞান হইবে; শ্রবণ কর—।"

তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি প্রকার—

১। অব্যক্ত প্রকৃতি ২। অষ্টবিধ বুদ্ধি বা মহৎ। ৩। ত্রিবিধ অহংকার

৪-৮ পঞ্চতন্মাত্রা ৯-২৪ যোড়শ বিকার যথা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন পঞ্চভূত। ২৫। পুরুষ—ত্রৈগুণ্য। শংকর। প্রতিশংকর। অধ্যাত্ম। অধিভূত অধিদৈবত। পঞ্চ অভিবুদ্ধি। পঞ্চ কর্ম্মযোনি। পঞ্চবায়ু। অবিদ্যা। অসক্তি, অতুষ্টি, অসিদ্ধি। তুষ্টি। সিদ্ধি। মুলিকার্থ অনুগ্রহসর্গ। ভূতসর্গ। বন্ধ। মোক্ষ। প্রমান। দুঃখ।

তত্ত্ব ব্যাখ্যা।

১। প্রকৃতি—অব্যক্ত unmanifested ঘট পটাদি ব্যক্ত। **লক্ষণ** অনাদি এক অবিচ্ছিন্ন, অশ্রুত, অস্পর্শ, অনশ্বর, অনন্ত, অগন্ধ, অপরিণামী, সূক্ষ্ম, নির্গুণ, অপ্রসূত। প্রসবী; সর্ব্বসাধারণ।

অপর সংজ্ঞা—প্রধান; ব্রহ্মন; পুর; ধ্রুব; অক্ষর, ক্ষেত্র, তমস্, প্রসূতি।

২। বুদ্ধি—অধ্যবসায়। ইহা নয় উহা নয় বিচার বৃত্তি। ইহার অষ্ট প্রকার যথা—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য—আসক্তি; ঐশ্বর্য্য, অসক্তি। প্রথম চারি প্রকার হইল বুদ্ধির সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। শেষ চারি প্রকার তামসিক অভিব্যক্তি।

বুদ্ধির অপর সংজ্ঞা—মন, মতি, মহৎ, ব্রহ্মা, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, শ্রুতি, ধৃতি; প্রজ্ঞান সন্ততি; স্মৃতি, ধী।

৩। অহংকার অভিমান (self-consciousness) বিজ্ঞান বা প্রত্যয়ের (perceptive object বা mental state.) সহিত আত্মার একত্ববোধ, আমি ইহা, আমি উহা, আমার ইহা, আমার উহা ইত্যাদি।

অহংকারের বিবিধ প্রকার—(১) বৈকারিক—সত্ত্বপ্রধান ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক।

(২) তৈজস্ রজপ্রধান, মন্দকাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৩) ভূতাদি—তমপ্রধান—গুপ্তকাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৪) সানুমান—অজ্ঞাতভাবে ভাল করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৫) নিরনুমান—অজ্ঞাতভাবে মন্দ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

এই পাচ প্রকার অহংকার বিধা—ভালমন্দ কাজের প্রবর্ত্তক।

cosmic creation এর সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই।

(৪) পঞ্চতন্মাত্রা—অহংকার হইতে উৎপন্ন। জ্ঞানমাত্র, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান—বিবিধ প্রকার জ্ঞানের মূল ভাব মাত্র

essence of percptions । **সংজ্ঞা (ক) অবিশেষ** অর্থাৎ undifferentiated শব্দ মাত্র, কিরূপ বা কিসের বা কি মাত্রার এ সব বোধ রহিত।

(খ) মহাভূত ভূতের আদিরূপ। (গ) অন্ধ (ঘ) অশান্ত (ঙ) অঘোর (চ) অমূঢ়। এই সব নামের অর্থ বোধ হয় এই যে প্রত্যয় মাত্র essence of perception এখনো জীবের মনে নানা ভাব (সুখদুঃখাদি) আনিতে পারে না। যথা শব্দের মাধুর্য্য আছে, কর্কশত্ব আছে, তীব্রত্ব আছে এবং সেই অনুসারে প্রেয় বা হেয়; কিন্তু প্রথম অবিশেষ জ্ঞানে শিশুর আদি চেতনায় উহার কোনো ভাবান্তর ঘটাইতে এখনো পারে না। জীব এই অবস্থায় (অতি শৈশবে) অনুভূতির ভালমন্দ হেয় প্রেয় বিচার করিতে পারে নাই; কাজেই উহারা বন্ধনের কারণ হয় না, এই অর্থ না বুঝিলে অঘোর, 'অমূঢ়' 'অশান্ত' এসব সংজ্ঞার সার্থকতা দেখিনা। অব্যক্ত হইতে তন্মাত্রা পর্য্যন্ত এই অষ্ট প্রকৃতি এখনো প্রকৃতি নামে উক্ত, কেননা উহারাই কেবল 'প্রকুর্ব্বন্তি' প্রসবকারী—অর্থাৎ পরবর্ত্তী বিকার প্রসূ সুতরাং সংসার সৃষ্টি আদি তত্ত্ব।

যোড়শ বিকার।

দশ ইন্দ্রিয় মন ও পঞ্চভূত এই সকল ১৬ বিকার। শিশুর যত চেতনায়-বিশেষত্ব differentiation ঘটিতে থাকে ততই বহির্জগৎ বোধ বাড়িতে থাকে। রূপরস শব্দাদির প্রত্যয় যখন হয় তখন কোথা হইতে হয়, কি উপায়ে হয় কোন যন্ত্রে এই বোধ ঘটে কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রথম বুদ্ধিসঞ্চারে এই মাত্র হয় চেতনা ও তাহাতে প্রতিফলিত অনুভূতি; শব্দ হইল, গন্ধ আসিল, রূপ জাগিল এই পর্য্যন্ত কার চেতনা, কি শব্দ, কার শব্দ কোথা হইতে, কি ভাবে অনুভূত কিছু না; পরে অহংকার অভিব্যক্তি। diffused impersonal চেতনা পরিণত হইল আমার চেতনা; আমি এক, অনুভূতি বা প্রত্যয় অন্য; subject ও object বোধ। কাজেই অহংকারকে Subjectivation বলা যায়। তারপর generic শব্দ, generic রূপ, ইত্যাদি। উহাদের বিভিন্নতার বোধ তখনো নাই বা বাহির হইতে জড়াঘাতে বা স্পন্দনে যে এইসব অনুভূতি তাও মনে হয় না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তির সঙ্গে এই জড়ও বাহির বোধ হয়। প্রথম নিজ দেহের স্থানবিশেষের দ্বারা অনুভূতি জ্ঞান হয়। চোখ দিয়া দেখিতেছি, কান দিয়া শুনিতেছি, নাকদিয়া শুঁকিতেছি এই সব জ্ঞান হয়

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের localisation হয়। শব্দ হইলে শিশু কান ফিরায়, রূপ জাগিলে চোখ খোলে, হেয় রূপ হইলে চোখ বোজে ; হেয় স্পর্শ হইলে অঙ্গ সংকুচিত করে। তারপর কর্ম্মেন্দ্রিয় বোধ। কথা কয়, হাত নাড়ে, পা নাড়ে ইত্যাদি। হেয় বস্তুর নিকট হইতে পলায়, প্রেয়বস্তু চায়, ইচ্ছা প্রকাশ করে ইত্যাদি :কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চালনায় হেয় বর্জ্জন ও প্রেয় অর্জ্জন করিতে শিখে। মন একাদশ ইন্দ্রিয় ইহা কতক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ করে, কতক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে ; মনের কাজ সংশয় করা, বিচার করা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা, বিজ্ঞানগুলিকে সংযোগ করতঃ বিষয় জ্ঞানে পরিণত করা ইত্যাদি।

সব শেষে জড় পঞ্চভূতের অনুভূতি ; ক্ষিতি, অপ্ তেজ মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত। 'ভূত-বিশেষ' অপর সংজ্ঞা। অন্যান্য সংজ্ঞা যথা———বিকার, আকৃতি, বিগ্রহ, শান্ত, ঘোর, মূঢ়। তন্মাত্রা যখন সবিশেষ ভাবে localised হয় তখন ভূতের জ্ঞান হয়। Objeetified sensationকে ভূত বলা যায়। বাহিরের জড়জগতের ধারণা পঞ্চভূতের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং এই সকল যখন আবার সুখ দুঃখ ; আশক্তি বিরক্তি ; হেয় প্রেয় ; কাম্য, অকাম্য বিবিধ মনোভাবের States of consciousness সঙ্গে identified হয় তখনি জীবের পূর্ণ সংসার জ্ঞান হয়।

তারপর পুরুষতত্ত্ব——পুরুষ চেতনরূপী আত্মা ; উহার লক্ষণ সূক্ষ্ম, বিভু, চেতনাযুক্ত ; নির্গুণ, বিশুদ্ধ, অনাদি, অনন্ত, দ্রষ্টা, কর্ত্তা, ভোক্তা অপ্রসবী। পুরাণাৎ এই হেতু পুরুষনাম। দেহী। পুরে কিনা দেহে ক্ষেত্রে শয়তে এই অর্থে পুরুষ। সংখ্যা শাস্ত্রে পুরুষ জীবস্থ অনুআত্মা বহু, (monads) পুরুষের সংজ্ঞা—আত্মা, পুমান, ক্ষেত্রজ্ঞ ; নর, কবিব্রহ্মন, অক্ষর, প্রাণ, 'যঃকঃ' সৎ।

স্বরূপে পুরুষ কর্ত্তা নয় ; কর্ত্তা হইলে শুধু ভাল কাজই করিত ; গুণত্রয়ভেদে প্রকৃতিই কার্য্যশীলা ; সত্ত্বপ্রভাবে ভাল, রাজপ্রভাবে মন্দ, তমপ্রভাবে মূঢ় কাজ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। পুরুষ এক নয় বহু, এই জন্য জীবভেদে পুরুষ নানাভাবে ভাবিত, নানা ভোগের ভোক্তা ; কেহ দুঃখী কেহ সুখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ মূঢ় ; যেমন গুণময় দেহের বা প্রকৃতির সহিত যুক্ত। পুরুষ বেদান্তমতে এক হইলে একজীব সুখী হইলে সকলে সুখী হইত। কিন্তু তাহা দেখা যায় না। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ পূর্ব্বে যে সব লক্ষণে লক্ষিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে 'এক' অখণ্ড, বিশুদ্ধ গুণাতীত বিভু বলিয়া মনে হয়; তবে আবার পুরুষ বহু এ বিরোধী উক্তি কেন? আমার মনে হয় দেহী পুরুষ অর্থাৎ যিনি প্রকৃতি সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত

হইয়া 'ভূতাত্মা' নামে অভিহিত, সেই পুরুষই বহু; কেন না ভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত দেহের দেহী হওয়াতে তাহার প্রতীয়মান বহুত্ব ঘটিয়াছে। বিবেক জ্ঞানবলে মুক্ত হইলে তো সব পুরুষ সমধর্ম্মী হইয়া যান! বেদান্তের উপাধিযুক্ত জীবাত্মাই সাংখ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধ দেহী পুরুষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রবন্ধে যে মৈত্রায়ণী উপনিষদের উক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় দর্শনশাস্ত্রের আধুনিক রূপ লাভের বহু পূর্ব্বে সাংখ্য বেদান্ত মতদ্বয়ের মধ্যে মূল বক্তব্যে বড় বিরোধ ছিল না; ভাব একই ভাষা বা সংজ্ঞাই যেন আলাদা। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণী উপনিষদে এইরূপ উভয় সাদৃশ্যের অনেক উক্তি আছে।

এই যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইল ইহাতে তত্ত্বসমাসকার বুঝাইলেন পুরুষ বা আত্মা ও প্রকৃতি স্ব স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ের সংযোগ ফলে এই প্রত্যয়াত্মক empirical জগৎ এবং প্রকৃতির স্বভাবজ গুণত্রয়ের তারতম্যে ও তদ্‌প্রভাবে এই সংসার। Thesis, antithesis ও Synthesis যাবতীয় moral ও physical qualities দিয়া (প্রকৃতি) জগৎকে হেয়+প্রেয় রূপ দিয়া সংসারে পরিণত করিয়াছে। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত বিকৃতির অধোগতি হইল সাংখ্যেয় শংকর (Evolution) এবং পশ্চাৎগতি হইল প্রতি শংকর বা Involution। তত্ত্বজ্ঞানী ইহা জানিলে দুঃখের কবল হইতে মুক্ত হন।

তারপর অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবত বিচার। তত্ত্বসমাসকার দৃষ্টান্ত-যোগে ইহাদের পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

বুদ্ধি অধ্যাত্ম (Subjective)
বস্তু বা বিষয় অধিভূত (objective)
ব্রহ্মা—অধিদৈবত (Dety)
চক্ষু—অধ্যাত্ম
দৃষ্টবস্তু—অধিভূত
সূর্য্য—অধিদৈবত
নাসা—অধ্যাত্ম
গন্ধদ্রব্য—অধিভূত
পৃথিবী—অধিদৈবত ইত্যাদি

এই কথা তিনটির আসল মানে বোধ হয় এই যে—জ্ঞানব্যাপারে জ্ঞাতা

ও জ্ঞেয় চাই ; no subject without object, no objeet without subject এবং অধিদৈবত হইল এই উভয়ের সংযোগ ঘটনকারী সূক্ষ্ম-কারণ-রূপী আর এক শক্তি। শুধু চেতনা ও শুধু বস্তু থাকিলেই জ্ঞান হয় না, বস্তুর অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আর একটী শক্তি চাই যাহা এই সংযোগ ঘটাইবে। চোখ আছে, দ্রব্যও আছে, কিন্তু আলোকরশ্মি না থাকিলে দৃষ্টি জ্ঞান হইবে না। আত্মচৈতন্য ও অচেতন জড় উভয়ের মধ্যে যে মারাত্মক ভেদ তাহাতে একের উপর অপরের ক্রিয়া কেমন করিয়া হইবে? একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপরটী ঘোর জড় কাজেই তৃতীয় একটি শক্তি যাহা সূক্ষ্মকারণ রূপে অনুভূতি ব্যাপার ঘটাইতে পারে তাহার প্রয়োজন; উহাই অধিদৈবত স্থানীয়। অবশ্য ঠিক বুঝান গেল না ব্যাপারটা কি। গীতায় অধিদৈবত বলা হইয়াছে জড়ের অভ্যন্তরস্থ কারণরূপী সূক্ষ্মপুরুষকে। জীবের চিত্তে যে জড় অনুভূতি হয় তাহা কি করিয়া ঘটে, উভয়ে যখন এত বিপরীত ধর্ম্মী? তাই বোধ হয় এই অধি-দৈবতের অবতারণা। জীবের অন্তরে অন্তর্যামী আত্মা আছেন, জড়ের অন্তরেও কুটস্থরূপে আত্মা আছেন ; উভয় আত্মাই একই পরমাত্মার অংশ বলিয়া উভয়ের স্বধর্ম্মত্ব ফলে এই অনুভূতি ব্যাপার ঘটে। like affects like।

অতঃপর অভিবুদ্ধি বিচার। অভিবুদ্ধি পাঁচ প্রকারের—যথা—ব্যবসায়, অভিমান, ইচ্ছা, কর্ত্তব্যতা, ক্রিয়া। ইহা করিতে হইবে—আমি করিব—এই কৃরিব—তদুদ্দেশে ইন্দ্রিয় নিয়োগ—কার্য্যসম্পাদন ইতি। হেয় প্রেয় কি ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া সংসারী জীব হেয়কে বর্জ্জন ও প্রেয়কে অর্জ্জন করিতে যে সব সঙ্কল্প ও চেষ্টা করে তাহারই বিবিধ stage হইল অভিবুদ্ধি।

অতঃপর কর্ম্মযোনি :—যে সব মানসিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় জীব সংসারে ভালমন্দ কর্ম্ম কার্য্য করিয়া বসে তাহাদের নাম কর্ম্মযোনি :—(ক) ধৃতি অপেক্ষা (খ) শ্রদ্ধা faith (গ) সুখ (ঘ) অবিবিদিষা carelessness (ঙ) বিবিদিষা (জ্ঞানেচ্ছা)। ইহাদের কতকগুলি প্রেরণা জাগায়, কতক গুলি উত্তেজনা জাগায় ; অবিবিদিষা ভুল কাজ করায়।

অতঃপর বায়ু-বিচার। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু। এই বায়ুতত্ত্বে সাংখ্যকার বলিতে চান জীব যে কর্ম্ম করে তার ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্দেশ্য, প্রেরণা আসে মন ও বুদ্ধি হইতে। এইটী কর্ম্মের psychological element ; তা ছাড়া উহার একটা physilogical element আছে তো।

কেবল ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকিলেই তো কাজ হয় না, কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা দরকার বটে। এই যে শারীরিক ক্রিয়া হয় ইহা কতকগুলা vital function বটে এবং vital nervous energy প্রাণশক্তি এই সব কাজ সম্পাদনার্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালায়। বায়ু এই vital energy এক একটি বায়ুর এক একটা sphere of action ক্রিয়াস্থান আছে। প্রাণবায়ু মুখ নাককে চালায়। অপান নাভি দেশকে ক্রিয়াশীল করে। সমান অন্তঃকরণকে চালায়। উদানবায়ু কণ্ঠনালীর চালক। ব্যান সর্ব্বদেহের চালক। আচার্য্য মোক্ষমূলর বলেন এই বায়ু কথাটার ঠিক যে কি অর্থ তা স্থির হয় নাই। তিনি বায়ুকে wind বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। অথচ ঠিক কথাটী vital spirit নিজেই আন্দাজ করিয়া এবং ঠিক অর্থ বুঝিয়াও তবু ইহার সত্যতার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি বায়ুতত্ত্বের original অর্থ খুঁজিয়া পান নাই আক্ষেপ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁর যে পূর্ব্বাপর সংস্কার যে আদিম সাংখ্যমত cosmic creation এর ব্যাখ্যা করিয়াছে; psychological সংসার সৃষ্টিই যে কপিলের প্রধান প্রতিপাদ্য ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে নারাজ। এ অর্থ তাঁর মতে অর্ব্বাচীন সাংখ্য-বাদীদের স্বকপোলকল্পিত। এই ভ্রান্ত সংস্কার জন্যে তিনি অধিকাংশ তত্ত্বের ব্যাখ্যার গোলে পড়িয়াছেন। যেখানে cosmic creation মতকে গোঁজা দিয়া মিলাইতে পারিয়াছেন সেখানে তাহা করিয়াছেন; যেখানে পারেন নাই সেখানে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর কর্ম্মাত্মা-তত্ত্ব বিচার :—কর্ম্মাত্মা কি না ego as active; কর্ম্মকারী-আত্মা। ইহারা পঞ্চবিধ; যথা—(ক) বৈকারিক (খ) তৈজস (গ) ভূতাদি (ঘ) সানুমান (ঙ) নিরনুমান—অস্যার্থ :—বৈকারিক কর্ম্মাত্মা শুভকার্য্যের কারক; তৈজস কর্ম্মাত্মা মন্দকার্য্যকারী; ভূতাদি তামস-কার্য্যকারী (hidden acts)। সানুমান কর্ম্মাত্মা সজ্ঞানে শুভকারী; নির-নুমান কর্ম্মাত্মা, অজ্ঞানে মন্দকারী। অর্থাৎ অভিমানী দেহী জীবাত্মারা পাঁচ প্রকার দেখা যায়। একশ্রেণী ভালই কাজ করে, একশ্রেণী নিষ্ঠুর পীড়াদায়ক কাজ করে; একশ্রেণী জঘন্য মন্দকাজ করে; একশ্রেণী না জানিয়া মন্দ করে, একশ্রেণী জানিয়া ভাল করে। দৃষ্টান্ত—দাতা দীনপালকরা বৈকারিক কর্ম্মাত্মা দেশজয়ী বীররা তৈজস কর্ম্মাত্মা; চোর ডাকাত নরঘাতকরা ভূতাদি কর্ম্মাত্মা।

অতঃপর অবিদ্যা বিচার :—অবিদ্যা বা অজ্ঞান যথা—(ক) তমস (খ) মোহ (গ) মহামোহ (ঘ) তমিস্রা (ঙ) অন্ধতমিস্রা। তম ও

মোহ প্রত্যেকে অষ্টবিধ। মায়ামোহ দশ প্রকার। তমিস্রা ও অতমিস্রা প্রতেকে অষ্টাদশ প্রকার। তমোর ফল দেহাত্মবোধ। যোগলব্ধ বিভূতির গর্ব্বফলে মোহ অবিদ্যা। মহামোহ মুক্তি সম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞান তমিস্রা অষ্ট-সিদ্ধির প্রতি প্রকাশ্য হিংসার ফল। অষ্টসিদ্ধি লাভের পর মরণকালীন যে দুঃসহ দুঃখাবস্থা তাহাই অন্ধতমিস্রা।

অতঃপর অসক্তি দুর্ব্বলতা তত্ত্ব বিচার ঃ—

অসক্তি ২৮ প্রকার। একাদশ ইন্দ্রিয়ের ১১ দোষ ও বুদ্ধির ১৭ দোষ। অন্ধতা, মূকতা, বধিরতা ইত্যাদি খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুষ্ঠ, স্বরবদ্ধতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি বিশটী ইন্দ্রিয়দোষ, মনের উন্মত্ততা, এবং বুদ্ধির ১৭ সংখ্যাক অতুষ্টি ও অসিদ্ধি এই সব জীবের দুর্ব্বলতা।

অতঃপর অতুষ্টি ও তুষ্টিতত্ত্ব।

তুষ্টি contentment বা মনের pacific অবস্থা। উহা সংখ্যায় নয়টী। অতুষ্টি তদ্বিপরীত, এবং সংখ্যায় নয়টী। যথা ঃ—(১) অনম্ভা = প্রধানের অনস্তিত্ব বোধ (২) তামসলীনা = আত্মামহতের একাত্মতা বোধ (৩) অবিদ্যা = অহংকারের অস্বীকার (৪) অবৃষ্টি = তন্মাত্রার অস্বীকার (৫) অসুতার = ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণ (৬) অসুপার = ভোগসুখে আসক্তিস্থিতি (৭) অসুনেত্র = ধনাকাঙ্ক্ষা (৮) অসুমরিচীকা = যোগাসক্তি (৯) অসুত্ত-মস্তসিকা = পরের অনিষ্ট হইবে অগ্রাহ্য করিয়া ভোগসুখ।

অতঃপর অসিদ্ধিতত্ত্ব। সিদ্ধি অর্থাৎ perfection অতার—সুতার—অতরাতার—অপ্রমোদ—অপ্রমুদিত—অপ্রমোদন—অরম্য—অসৎপ্রমুদিতম। এই হইল অষ্ট প্রকার অসিদ্ধি। যথাক্রমে—অর্থ—একে বহুবোধ—তত্ত্বকথার ভুলবোধ—বুদ্ধিহীনতা দোষে তত্ত্বশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণে অক্ষমতা—তত্ত্বজ্ঞানে বিরক্তি—সম্বন্ধুর সুযুক্তিশ্রবণপরান্মুখতা শিক্ষকদোষে জ্ঞানলাভে অসমর্থতা—ইত্যাদি।

মুলিকার্থ তত্ত্ব ঃ—সাংখ্যশাস্ত্রের মূল অষ্ট প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। যথা প্রকৃতির অস্তিত্ব, একত্ব অর্থত্ব, পরার্থ্যত্ব; পুরুষপক্ষে—প্রকৃতি হইতে অন্যত্ব, অকর্তৃত্ব, বহুত্ব। প্রকৃতিপুরুষের ক্ষণিক সংযোগত্ব, এবং পরে স্বতন্ত্রত্ব। সূক্ষ্মশরীরে স্থিতি, স্থুলশরীরেরও স্থিতি (durability)

অনুগ্রহসর্গ = অর্থাৎ পুরুষের ভোগের জন্য প্রকৃতি কর্তৃক অনুগ্রহবশাৎ তন্মাত্রা হইতে জগৎ সৃষ্টি।

অতঃপর ভূতসর্গ = অর্থাৎ জীবজন্তুদের সৃষ্টি। দেবসৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, ইতরজীব সৃষ্টি ইত্যাদি।

অতঃপর বন্ধ বা ভোগতত্ত্ব। বন্ধ ত্রিবিধ—(১) অষ্ট প্রকৃতির বন্ধন (২) ষোড়শ বিকারের বন্ধন (৩) দক্ষিণাবন্ধন। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাদি যজন যাজনের জন্য যে দক্ষিণা দিতে লোকে ধর্মভয়ে বাধ্য হইত তাহাকেই কপিল দক্ষিণা বন্ধন বলেন। আসলে উহা মিথ্যাধর্ম্মের বন্ধন।

অতঃপর মোক্ষতত্ত্ব। —ত্রিবিধ মোক্ষ—(১) জ্ঞানাৎমোক্ষ (২) ইন্দ্রিয়-জয়াৎ (৩) সর্ব্বধ্বংসাৎ অর্থাৎ সংসারত্যাগাৎ বৈরাগ্যাৎ বা।

অতঃপর দুঃখতত্ত্ব—যে দুঃখের অবসানেই মোক্ষ। ইহাও ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ কায়মানসিক—আধিভৌতিক—হিংস্রজীব জন্তু চোর ডাকাৎ ইত্যাদি হইতে, আধিদৈবিক শীতাতপ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, প্লাবন ইত্যাদি।

এইখানে তত্ত্বসমাসের পরিসমাপ্তি। উহার তত্ত্বগুলির বিচারকালে যে সব বাক্য প্রতিবাক্য সংজ্ঞা ব্যবহার হইয়াছে তাহাতেই আরো বুঝা যায় যে এই গ্রন্থোক্ত সাংখ্য শাস্ত্র আসলে সংসার সৃষ্টি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। আর ইহাই সম্ভব—কেননা ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিতে বসিয়া দুঃখের মূল সংসার সৃষ্টি ব্যাখ্যাই ন্যায্য বিষয় হইবে; কি করিয়া nebu- lous homogenous জড় হইতে force যোগে নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত, আকাশ বাতাস, জীবজন্তু বন জঙ্গল হইল ইহা ভবরোগের চিকিৎসকের কাছে ধানভানতে শিবের গীতের মতই হইবে। 'সংসার-সৃষ্টি' আর cosmic-জগৎ সৃষ্টি যে মহর্ষি কপিল মতে ভিন্ন তত্ত্ব এবং প্রত্যেকের স্রষ্টা। যে ভিন্ন—তাহা—তত্ত্ব সমাসের ভাষ্যকার স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। সংসার সৃষ্টি—অবিবেকীপুরুষ ও ক্রিয়াশীল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সংযোগে ঘটে—আর বিশ্বসৃষ্টি তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। অনুগ্রহসর্গ তত্ত্ব বিচারে দেখা যায় ব্রহ্মা পুরুষের ভোগের জন্য পঞ্চতন্মাত্রা হইতে ইন্দ্রিয়দের অনুভূতির জন্য জড়জগৎ সৃষ্টি করিলেন; ভূতসর্গ বিচারে দেখা যায় ব্রহ্মা সেই উদ্দেশ্যে চতুর্দ্দশভুবনের দেব মনুষ্য জীবজন্তু তরুলতাদি সৃষ্টি করিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, প্রকৃতি যোগে জড় বা জঙ্গম জগৎ সৃষ্টির কোনো কথা নাই; এজন্য ব্রহ্মার কর্ত্তৃত্ব অনুমিতবা স্বীকৃত হইল। প্রকৃতি পুরুষ কেবল মাত্র সংসার সৃষ্টির জন্য দায়ী, যে সংসারজীবের সকল দুঃখের মূল। ইহা বিশুদ্ধ psychological creation মানস সৃষ্টি পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীগীতার১৩ দশঅধ্যায়তাহাই বলিয়াছেন। ২৬।২৭শ্লোকেরটীকাদ্রষ্টব্য।

এক্ষণে কি উপায়ে দুঃখ নাশ করা যায় তাহা নির্ণয় করিতে গেলে, দুঃখের যে হেতু তাহার বিচার চাই; অর্থাৎ সংসারই দুঃখের মূল। এই সংসার কি; কেমন করিয়া গড়িয়া ওঠে? কি করিয়া জীবকে বন্ধন করে? এ সবের বিচার কর্ত্তব্য; সংসারকে নাশ করিতে গেলে, যাহার ক্রিয়া ফলে সংসার, তাহার নাশ দরকার, কার্য্যকে উড়াইতে গেলে কারণকে উড়াইতে হইবে সংসার কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার ধ্বংস চাই; কেমন করিয়া অবিদ্যার নাশ হইতে পারে? উহার বিপরীত শক্তি জ্ঞান, বিবেক জ্ঞান তাহারি সাহায্যে অবিদ্যাকে নষ্ট করিতে হইবে; যেমন অন্ধকার নাশ করিতে গেলে আলোর দরকার। গীতাকার ১৩ দশ অধ্যায় ২৬।২৭ শ্লোক তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হিন্দু দর্শন শাস্ত্র যদি পাশ্চাত্য দর্শনের সমজাতীয় শাস্ত্র হইত, অর্থাৎ কেবলমাত্রই পরম তত্ত্বের আলোচনা হইত তাহা হইলে দুঃখনাশ করিবার হাঙ্গামা লইয়া এত মাথা বকাইত না; কি দুঃখ, কেন দুঃখ, কিরূপে ইহার নিবৃত্তি হইবে, হইলে কি অবস্থা হয় এসব তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারেনা। কিন্তু হিন্দু দর্শন আসলে মোক্ষশাস্ত্র গৌনভাবে তর্কশাস্ত্র। জীবের ভাগ্যের সঙ্গে জড়জগৎটা জড়াইয়া আছে বলিয়াই মোক্ষ-শাস্ত্রকার জড়জগতের স্থিতি উৎপত্তি লয় লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন; জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতির সঙ্গে উহার কোনো সম্বন্ধ না থাকিলে মোক্ষশাস্ত্রকাররা উহাকে আমলেই আনিতেন না, উহা অপরাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইয়া থাকিত। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রধান সমস্যার মধ্যে জীবের গতিমুক্তি ভাগ্যাভাগ্য একটা সমস্যাই নয়; উহা অবান্তর ভাবে আলোচিত। কিন্তু হিন্দু দর্শনের উহাই প্রধান প্রতিপাদ্য প্রধান আলোচ্য বিষয়। কাজেই মনে হয় সাংখ্য বা বেদান্তে Spencer Darwin এর Evolution তত্ত্ব খুঁজিতে যাওয়ায় সব স্থানে নিরাপদ নহে।

সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা পাশ্চাত্যদর্শন ও হিন্দুমোক্ষশাস্ত্রের মধ্যে parallelism খুঁজিতে গিয়া এখনো তর্কযুদ্ধ কত যে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই 'মায়া' 'অবিদ্যা', 'অজ্ঞান' অবিবেক কথা গুলাই যে মহাপ্রবল সাক্ষী যে ভারতীয় আর্য্য দর্শনশাস্ত্র মূলতঃ মুক্তিশাস্ত্র। তা না হইলে বিশ্বসৃষ্টি cosmic creation বুঝাইতে গিয়া 'মায়া' 'অবিদ্যা' ইত্যাদিকে ব্রহ্মের সৃজনাশক্তি বলা কেন? সোজা সরল বৈজ্ঞানিক কথা ব্যবহার করিলেই হইত না কি?

attraction, repulsion ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে সাংখ্য বেদান্ত spencer প্রভৃতির মত cosmic সৃষ্টির (ভৌতিক সৃষ্টির) শাস্ত্র নহে—সাংখ্য বেদান্ত সংসারসৃষ্টি লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন।—এই যে আসলে নির্গুণ জগৎটার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যগুলা আমার কল্পনার ধারা ভাল মন্দ, ছোট বড়, সুন্দর অসুন্দর, হেয়-প্রেয় রং মাখিয়া সংসার সাজিয়া আমাকে ভুলাইতেছে সুখ দিতেছে, দুঃখে মজাইতেছে ইহাই আমার সব কষ্টের মূল; আমার আসল স্বভাবে নির্ব্বিকার আত্মাটা এই রঙ্গীন আবরণ হইতে রং মাখিয়া দেহের সঙ্গে নিজেকে ভুল করিয়া অনর্থ ঘটাইতেছে—মোক্ষশাস্ত্র কৃপায় আমি বুঝিতে পারি আত্মা দেহ নয়, উহার কোনো বিকার হয়না, উহা নিঃসঙ্গ সুখ ভোগে নয়, সুখ আত্মবোধে; জগৎটা ব্রহ্মভাবেই সত্য, সংসারভাবে মিথ্যা, আর আমি জগতেরই একটা অংশ, জগৎই ব্রহ্ম; যেমন পাতা ফুল, মূল, কাণ্ড, লইয়া 'গাছ', তেমনি এই "নদ নদী-পাহাড় বন, মানুষ কীট পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস জল-স্থল, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, হর্ষ-বিষাদ", ইত্যাদির সমষ্টিকেই বলি ব্রহ্ম; একে বহু, বহুতে এক। এই দৃশ্যমান বিচিত্র সত্তা ছাড়া আর একজন হাত পা চোখ নাকওয়ালা ভগবান কোথাও নাই। যা সৎ তাই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। হইতে পারে তাঁর নির্ব্বিশেষ অবস্থা ছিল; কিন্তু সবিশেষেই তাঁহাকে দেখিতেছি, বুঝিতেছি, উপাসনা করিতেছি। অজ্ঞানে বা মোহে, জগৎকে ঈশ্বর হইতে অন্য দেখি, আর জগতের পরিবর্ত্তনশীল, পদার্থগুলিকে, পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া নিত্য ও অনশ্বর ভাবে আছে বলিয়া মনে করি। নিত্যকে অনিত্য অনস্তি ভাবি, আর অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ভুল করি। এই যে জগতে সংসার জ্ঞান, ইহা মিথ্যা নয়তো কি? মায়া নয়তো কি? কল্পনার খেলা নয়তো কি? শংকর সংসার সৃষ্টির মূলে অবিদ্যা বা মায়া বলাতে কিছুইতো অন্যায় করেন নাই, বরং অত্যন্ত খাঁটী কথাই বলিয়াছেন। তিনি যদি কোথাও বলিতেন অবিদ্যা বলে ইট কাঠ মাটী পাথর, জল স্থল পর্ব্বত এই সব তৈয়ারি হইতেছে আর ভগবান মোহ বলে, অবিদ্যায় মজিয়া, আকাশ বাতাস, জলস্থল নদ নদী পাহাড় জীবজন্তু করিতেছেন তাহা হইলে মানিতাম এ আবার কি। একি বুঝা যায়? আমি একটী ছবি আঁকিলাম; ওয়াট সাহেব ইনজিন করিলেন; লেসলি সাহেব সাঁকো গড়িলেন এসব কি অবিদ্যায় মজিয়া গড়িলেন? তার কি অর্থ হয়? কিন্তু যদি বলি রামবাবু সুখী হইবে বলিয়া মদ ধরিল, বা মোটর কিনিল, বা বিবাদী প্রতিবেশীকে খুন করিল, এবং

অবিদ্যা বলে এসব করিল, তখন মানিব তাহা সত্য। এখানেই অবিদ্যার কাজ; সাঁকো গড়া বা ছবি আঁকা বা এনজিন্ করা অবিদ্যার কাজ নয়। তেমনি ব্রহ্ম শক্তি বলে বিচিত্র বিশ্ব গড়িলেন; এ শক্তি মায়া নয়, অবিদ্যা নয়, অজ্ঞান নয়। মায়া রূপকভাবে বলিতে পার। মায়া জীবের বেলাতেই প্রযোজ্য। কিন্তু যখন জীব জগতকে নিজ উপযোগী হেয়প্রেয় ভাবাত্মক সংসারে পরিণত করে; তখনই বলিতে পারি আমার pure Ego শুদ্ধ বুদ্ধনির্ব্বিকার ব্রহ্ম অংশ বাহ্য জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া Empirical Ego বা self বা মায়া সংসার রচনা করিল। এই Empirical self কেই চরম সত্য মনে করাতেই জীবের যত দুঃখ ভজন।

শংকরাচার্য্য যেখানে জগৎকে অবিদ্যার বা মায়ার সৃষ্টি বলিয়াছেন সেখানে জগৎ মানেই সংসার বুঝিতে হইবে। কেন না জীবের বিশেষতঃ বদ্ধ জীবের চোখে জগৎ সংসার ভাবেই বিরাজ করে। জগতের সঙ্গে জন্মমাত্র হইতেই, হেয় প্রেয় সম্বন্ধ। জন্ম হইতেই জীব দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মাকে দেহের সঙ্গে এক মনে করে। এই জন্যই জগৎ তার চক্ষে সংসার সঙ্গে একার্থবোধক হইয়াছে। শংকর যখন বলিলেন জগৎ অবিদ্যাপ্রসূত; তখন তিনি বলিতে চান সংসার অবিদ্যাপ্রসূত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁৎ ধরিলেন জগৎ (cosmos) কি করিয়া অবিদ্যাপ্রসূত হইতে পারে? কেন না অবিদ্যা কার? ব্রহ্মের; কিন্তু ব্রহ্ম স্বভাবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নিত্য, তিনি কেন ignorance বা illusionএর দাস হইবেন? ইত্যাদি ইত্যাদি—

তাই বলিতেছি সাংখ্য বা বেদান্তকে—মুখ্যতঃ মোক্ষশাস্ত্র ভাবে বুঝিলে এই সব গোলমাল কাটিয়া যায়। শংকরের রচিত চর্পটচারিকা স্তোত্র (দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ etc) পাঠ করিলে দেখা যায় আচার্য্য এই সংসার সকল ভবব্যাধির মূল তাহাই অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারঃ। জ্ঞাতে তত্ত্বে—কঃ সংসারঃ॥ ১০॥ এই অর্দ্ধ শ্লোকেই শংকরের সমস্ত মায়াতত্ত্ব সংসারতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে।

অতএব শংকরাচার্য্যের দর্শন শাস্ত্রে আলোচিত জগৎতত্ত্ব ও মায়াবাদ বুঝিতে কোনই গোল হয় না যদি জগৎকে সংসার ধরা যায়। এবং উহাই সত্য অর্থ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রেমের জয়

[শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক]

আজি পাপের করিতে শেষ
ই ছুটিয়াছে কোটী প্রেমের মূরতি শচীনন্দন রে।
কিবা বীর সন্ন্যাসী বেশ!
সবে মেতে যায় গাহি সত্য মুক্তি জয় বন্দন রে!
ওই নিমাই এসেছে আজ
এল কোটী শচীমাতা ঘর দ্বার ছাড়ি ধীর সহিষ্ণু হিয়া,
সাথে পরিয়া শক্তি সাজ
এল বীর জায়া কোটী পুণ্য প্রতিমা দেবতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
ওই পথে পথে দ্বারে দ্বারে
চলে মাতা বধূ সুত বীরের বাহিনী—আননে দৃপ্ত হাসি;
কহে হুঙ্কারি বারে বারে
জয় সত্যম্ জয় মুক্তিঃ জয় মুক্ত-ভারতরানী'!
সবে লাঞ্ছনা ভীতি হারা—
চলে, অঙ্গে অঙ্গে স্ফুরিয়া উঠিছে করুণা স্নিগ্ধ বিভা!
চলে জীবন্মুক্ত পারা,
আহা বক্ষে বক্ষে প্রেমের পাথার উথলিয়া পড়ে কিবা!
আজি দেখ্ রে অবিশ্বাসি,
ওরা কত শত পাপী জগাই মাধাই করে গেল উদ্ধার,
শুধু বিলায়ে ক্ষমার রাশি
ওরা যেচে দিল প্রেম কত মার খেয়ে, নাহি নিল শোধ তার।
আজি অনাহত চির জয়ে
ওরা চলিয়াছে দেশ মথিয়া মথিয়া গাহিয়া বিজয় গান,
আজি ঘোষিতে সত্যময়ে
সবে মুক্তি পতাকা উড়ায়ে ছুটেছে, দেখে কাঁপে শয়তান!

আজি স্বাধীন করিতে দেশ
সবে চলে যায় দলি চরণে মরণ ভয় বন্ধন রে!
আজি পাপের করিতে শেষ
ওই ছুটিয়াছে কোটী প্রেমের মূরতি শচীনন্দন রে!

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩৭)

দশটা বাজিয়া গেল, তবু ব্রজেন্দ্র ফিরিল না। পূজারী ঠাকুর অন্যান্যদিন ইহার পূর্ব্বে ঠাকুরের পূজা সারিয়া চলিয়া যায়, সেও ত আসিল না। স্বামীর খবর লইতে নির্ম্মলা হেমাকে চারুর বাড়ী পাঠাইয়াছিল, এক ঘণ্টার উপর হইল, সেওত এখনও ফিরিয়া আসিল না!

নির্ম্মলা এইবারে বিশেষরূপ চিন্তিতা হইল। সত্য সত্যই তবে কি সর্ব্বনাশী অনুতাপের জ্বালা সহিতে পারিল না, গঙ্গাজলে প্রাণটা বিসর্জন দিল?

পূর্ব্বে যথার্থই নির্ম্মলার মনে চারুর মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, মনের আবেগে হয়ত মেয়েটা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গিয়া থাকিবে। আবেগটা শান্ত হইলেই আবার সে ফিরিয়া আসিবে। এখন যেন তার মন বলিতেছে সে আর আসিবে না।

কিন্তু ভট্টাচাজ্জি মশাই এখনও আসিল না কেন? তাহার না আসিবার একমাত্র কারণ হইতে পারে, পূর্ণপ্রকোপ না থাকিলেও, অবসানমুখে ঝড়ের এলোমেলো ভাব ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। কিন্তু এ কারণে নির্ম্মলা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। স্বামী ফিরিয়া আসিবার অথবা হেমা সেখান হইতে কোনও সংবাদ আনিবার পূর্ব্বে যদি রাখু ঠাকুরের পূজা ও ভোগ সারিয়া যাইত, তা হ'লে সে যেন নিশ্চিন্তা হইতে পারিত। ইহার পর, পূজার সময়ে যদি তাহার স্বামী অথবা হেমা হঠাৎ সে মেয়েটার মরার খবর লইয়া আসে? মেয়েটা নষ্ট হইলে কি হইবে—সে ভট্চাজ্জি মশায়ের স্ত্রীত বটে! সে মরিলে তাঁরত অশৌচ হইবে! সেরূপ অবস্থায় সে রাখুকে কেমন করিয়া ঠাকুর ছুইতে দিবে?

এগারোটা বাজিতেও যখন কেহ কোনওদিক হইতে আসিল না তখন পূজার জন্ত রাখুর অপেক্ষা করা নির্ম্মলার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তেতলায় ছিল ঠাকুর ঘর সেইখানে বসিয়া নির্ম্মলা রাখুর অপেক্ষা করিতে ছিল। সে ছাদে আসিয়া আলিসা হইতে মুখ বাহির করিয়া ডাকিল—"সরি"।

"তাকে আমি বাজারে পাঠিয়েছি বৌমা।"

নির্ম্মলা শুধু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার শাশুড়ী বলিতে লাগিল—"হেমা বাড়ীতে নাই, হিন্দুস্থানী চাকরটাও আসেনি—তুমি পূজারী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ ক'রেছ মনে নেই ?"

"যথার্থই সে কথা আমার মনে ছিলনা ত মা! পাঠিয়ে ভালই করেছ।"

"কিন্তু পূজাত এখনও ঠাকুরের হল না।"

"সেই জন্যই ত সরিকে ডাকছিলুম। ভট্‌চাজ্জি মশায় কেন আস্‌ছেন না জান্‌তে তাকে পাঠাব।"

"ব্রজেন্দ্র কি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে ?"

চমকিতার মত নির্ম্মলা প্রতি প্রশ্ন করিল—"এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে মা ?"

"সরি বল্‌ছিল।"

"আমি যা শুন্‌লুম না, তা সরি কেমন ক'রে শুন্‌লে ? সে কি বল্‌ছিল ?"

"বলছিল, বাবু আর ও বামুনকে ঠাকুর ছুঁতে দেবেন না। তার স্বভাব নাকি ভাল নয়!"

"কই মা, আমিত এ কথা তোমার ছেলের মুখে শুনিনি!"

"স্বভাব যদি ভাল না হয়, তাহ'লে তাকে পুজো করতে দেওয়া ত উচিত নয়।"

"নিশ্চয়। তোমার ছেলে এলে এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করব।"

"ব্রজেন্দ্রই বা আজ এমন দিনে কোথায় বেরুলো বউমা ?"

"একটা বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আমিই তাকে এক জায়গায় পাঠিয়েছি।"

"পাঠাবার কি আর দিন পেলেনা মা ?"

"তাঁর ফিরতে যে এতটা দেরি হবে সেটা তখন বুঝতে পারিনি। তাঁকে ডেকে আনতে হেমা হতভাগাটাকে পাঠালুম, সেও এখনও ফিরছেনা কেন বলতে পারি না।"

"বামুন যদি না আসে তাহ'লে পূজোর কি হবে?"

"বামুনের আসা না আসার কথা তোমার ছেলেই যদি জানে, সেই এসে পূজো করবে!"

শাশুড়ী বুঝিল বউএর একটু রাগ হইয়াছে। সে বলিল—"ছেলের উপর রাগ করবার কথা কিছুইত নেই মা।"

নির্ম্মলা উত্তর করিল না।

শাশুড়ী তখন কথাগুলা যতটা পারিবার' মিষ্ট করিয়া বলিল—"রাগ করনা বউমা, ছেলে আমার মূর্খ নয়। তোমার ননদের পানে আর চাওয়া যায় না—বুঝেছ?"

"শুধু ননদ কেন মা, স্বভাব খারাপ হ'লে, আমরাইবা কেমন করে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কব!"

"কলতলায় একখানা কাপড় দেখলুম, সেখানা কার? সরি বললে ভট্‌চাজ্জি মশার।"

"সরি ঠিক বলেছে, সেখানা তারই কাপড়।"

"সেখানায় কি রঙ লেগে রয়েছে দেখলুম।"

"বোধ হচ্ছে আলতা।"

"তুমি দেখেছ?"

"দেখেইত তাঁকে সে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়েছি।'

"তাতে একখানি আস্ত পায়ের দাগ।"

এ কথায় নির্ম্মলা হাসিয়া ফেলিল।

"মিছে কথা কইনি বউ মা—বিশ্বাস না হয় তুমি দেখে এসো।"

"মিছে কথা কেন হবে মা—আমিও তা দেখেছি।"

"তবে?"

ঠিক এই সময়ে শুভা উপরে আসিয়া বলিল—"সব রঙ উঠিয়ে দিয়েছি বৌদি।" বলিয়াই সে নির্ম্মলাকে রাখুর কাপড় দেখাইল।

"ভাইত রে, ধোপানীকে হারিয়ে দিয়েছিস যে! যা ভাই বারান্দার ভিতরে কাপড়খানা শুকুতে দে। ভট্‌চাজ্জি মশাইয়ের যাবার আগে যেন শুখিয়ে যায়।"

শুভা চলিয়া গেল। যতক্ষণ সে ছিল, তার মা শুধু অবাক হইয়া চাহিয়াছিল চাহিতে চাহিতে তার মুখখানা রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা তার মুখখানা দেখিল। তাহাকে লুকাইয়া একটু হাসিল।

কন্যা চলিয়া গেলে, যখন তার মা নির্ম্মলার দিকে ফিরিল, তখনও তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"কি মা, তোমার মেয়েকে দিয়ে ওই কাপড় কাচিয়েছি বলে কি তোমার রাগ হ'ল?"

"আমার রাগে কার কি এসে যায় মা। আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি।"

"এইটেই যে রাগের কথা হল মা—আমি জানতুম, আমরা তোমার ছেলে, মেয়ে নাতী নাতনী সব তোমারই আশ্রয়ে আছি।"

এমন মনুষ্যত্ব-হীনতা শুভার মায়ের ছিল না যে, এরূপ কথাতেও তার মুখ প্রফুল্ল না হয়। শুধু তার মুখ প্রফুল্ল হইল না, তার চোখের কোণে জল আসিল। বলিল "আমিও মা ব্রজেন্দ্রকে যে পেটে ধরিনি, এ একদিনের জন্যও মনে করতে পারিনি, মিছে কইব কেন, রাগ আমার হয়েছিল। বোকামেয়ে আইবুড়ো ননদকে দিয়ে—"

"আমি নিজেই কাদছিলুম মা, অভাগী পায়ে এমন রঙ লাগিয়েছে কোনও মতে তুলতে পারছিলুম না দেখে, তোমার মেয়ে উপর-পড়া হয়ে কেড়ে নিলে।"

"আবাগী কে?"

"গরীব ব্রাহ্মণের উপর তার অত্যাচারের যেটুকু বাকী ছিল, আবাগী তার কাপড়ের উপর দেখিয়েছে।"

"আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনা বউমা, আবাগীকে?"

'আবাগীর পরিচয় দিবার একটা সুবিধা নির্ম্মলার ঘটিয়াছিল, কিন্তু বলিবার মুখে তার এমন একটা সঙ্কোচ আসিল যে কিছুতেই কথা তার মুখ হইতে বাহির হইল না। এদিকে তার শাশুড়ী সাগ্রহদৃষ্টিতে উত্তরের প্রতীক্ষায় তার মুখের পানে চাহিয়া কি করে, নির্ম্মলাকে বলিতে হইল, সে চরণচিহ্নটির অধিকারীর কথা—

"মা! সেটি তোমার ছেলের সো-রাণীর।"

অতি বিস্ময়ে নির্ম্মলার চোখের উপর বিস্ফারিত দৃষ্টি রাখিয়া 'মা' বলিয়া উঠিল—

"বলিস্ কি গো! ব্রজেন্দ্র কি তবে বামুনকেই খুন করতে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিল?"

এ কথার উত্তর নির্ম্মলা দিতে না দিতে নীচে হইতে এক কণ্ঠস্বরে উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। "ঠাকুর মা কোথায় গো!"

কথা শুনিয়াই নির্ম্মলা বুঝিল স্বামী নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর ঈর্ষায় একটা অকার্য্য করিয়া বসিয়াছে। তার মুখ দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া গেল। শুভার মা বুঝিল, সে চরিত্রহীন বামুনটাকে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্র আর ঠাকুর ছুঁইতে দিল না।

কুতুহলীর মুখ লইয়া সে উপরে আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৩৪)

উভয়েই বুঝিল কে আজ পূজা করিতে আসিতেছে।

তাহার নাম মধুসূদন। যজমানেরা বলিত মধুঠাকুর। রাখুর পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে সে পূজারির কার্য্য করিত। পূজার পদ্ধতি ভাল জানিত না, আর মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া ব্রজেন্দ্র রাখুকে তাহার স্থানে ঠাকুর পূজার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল। উভয়েই বুঝিল সেই মধুই পূজারির কাজে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর মধুর সিঁড়িতে উঠার শব্দ যেই নির্ম্মলার কাণে গেল, অমনি সে আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া খাশুড়ীকে বলিল—"মা! আর বিলম্ব না ক'রে তুমি ঠাকুরের ভোগ নিয়ে এসো।"

প্রকৃতিস্থ বলিলাম কেন, এই ক্ষণমাত্র সময়ের মধ্যে এতগুলা চিন্তা একসঙ্গে তার মনকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, সেই ক্ষুদ্র পলটুকুর মধ্যে সে আপনাকে এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

"যাও মা, আর দাঁড়িয়ো না।"

"তাইত ব্যাপার টাকি বউ মা?"

"আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই মা, বুঝতে পারছি ঠাকুরের অদৃষ্টে আজ উপবাস আছে, তবু তার সমুখে অন্ন পাত্র ত একবার ধরতে হবে।"

বলিয়া নির্ম্মলা ঠাকুর ঘরে চলিল।

দোতলায় আসিবার দ্বারে পৌঁছিয়াই, শুভার মাকে দূর হইতে যেমন দেখা, মধু বলিয়া উঠিল—"কিগো ঠাকুর মা কেমন আছেন?"

হারানো চাকরির পুনঃ প্রাপ্তির উল্লাস—ঠাকুরমার কাছে আসিয়া কথা কহিতে মধুর দেরি সহিল না। তার উল্লাসের উচ্চারিত কথা নির্ম্মলা অতি দূর হইতেও শুনিতে পাইল। শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল মাত্র, নিজে আর ফিরিল না।

শুভার মা সেটা দেখিল। তার কৌতূহল রঞ্জিত দৃষ্টি সেই সঙ্গে সপত্নী পুত্র-

বধূর মুখে এমন একটা বিবর্ণতা দেখিতে পাইল যে, নির্ম্মলার অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত শুভার মা চোখকে আর মধুর দিকে ফিরাইতে পারিল না।

"কি ঠাকুর মা, কথা শুনতে পেলেন না?"

"কেও, মধু।"

"সেই মুখ্‌খু মধু। কেমন আছেন?"

শুভার মা উত্তর দিলেন না। সে মধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"দেখে আশ্চর্য্য হবারই কথা ঠাকুর মা।"

"তুমি যে আজ পুজো করতে এলে?"

"আবার আসতে হ'ল। নারায়ণ ত আর মন্তর খান না, বুজরুকিও খান না—খান শুধু ভক্তি। তাই আবার মুখ্‌খু মধুকে টান দিলেন।"

"ও ঠাকুর কি আর আসবে না?"

"আবার! কর্ত্তা মশাই তাকে, গলায় হাত দিয়ে, বাসা থেকে বার ক'রে দিয়েছেন।"

তাহারা অনেক পূজারি এক পূজারির আশ্রয়ে কার্য্য করিত। ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি বহু গৃহস্থ তাহারই যজমান। একা বহুলোকের গৃহে পূজা করা অসম্ভব বলিয়া যারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ যুবককে সে পূজার জন্য নিযুক্ত রাখিত। রাখু তাহাদেরই মধ্যে একজন। বৃদ্ধকে তাহারা কর্ত্তা মশাই বলিত। তাহারা কর্ত্তামশায়েরই সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকিত। সে যেখানে পূজার সামগ্রী চাল কলা দুগ্ধ মিষ্টান্ন পাইত, সমস্তই কর্ত্তার সম্মুখে উপহিত করিতে হইত। সেই সব আতপ তণ্ডুল হইতেই তাহাদের মধ্যাহ্নের আহার চলিত।

'কর্ত্তা মশায়'কে শুভার মা'র বুঝিতে বাকি ছিল না। এটাও বুঝিতে তার বাকি রহিল না, ব্রজেন্দ্রের রক্ষিতার ঘরে ওই মুখচোরা ভিজে বিড়ালের মত বামুনটা ঝড়ের সমস্ত রাত যাপন করিয়াছে।

তথাপি, যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবে বিস্মিতার মত শুভার মা প্রশ্ন করিল "কেন মধু?"

"আপনার আর সে কথা শুনে কাজ নেই ঠাকুর মা! সে অতি কুৎসিৎ কথা।" তারপর বলিবে না বলিবে না করিয়া, শুভার মা'র শুনিবার আগ্রহে, রাখুর চরিত্রগত এত কুৎসা মধুঠাকুর তাহাকে শুনাইয়া দিল যে, শুভার মা'র পিপাসু কর্ণও রাখুর ততটা নিন্দা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রাখু চিরটা-কাল যাত্রার দলে ঢোল পিটিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছে। তার স্ত্রী স্বামীর চরিত্র

দোষের জন্ত জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কুলীন হইলেও এই চালচুলা নাথাকা চরিত্রহীনটাকে আর কেহ কন্যাদানে সাহসী হয় নাই, স্বভাবের দোষের জন্ত, যে মামীর বাড়ীতে সে আজন্ম মানুষ হইয়াছে, সেখানেও আর তার স্থান নাই। তার মামী—রাখুর মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—হতভাগাটাকে বাড়ীতে রাখিতে সাহস করে নাই। পেটের দায়ে কলিকাতায় আসিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়া বোকা কর্ত্তামশায়ের চোখে সে ধূলা দিয়াছিল। 'বাবু' নিতান্ত সরল, মা', ঠাকুর মা—ইহারা ত মাটীর মানুষ—ইহাদের যে সে ধূর্ত্ত সহজে ভুলাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু সাধু সাজিলে কি হইবে, স্বভাব ত আর পরিচ্ছদে ঢাকা পড়ে না! ডুব দিয়ে জল খাওয়াত চিরদিন চলে না, বাছাধন পূর্ব্বরাত্রিতে একটা 'নটীর' ঘরে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছেন।—সমস্ত কথা বিনাইয়া বিনাইয়া মধু শুভার মাকে শুনাইল।

তবে কে যে রাখুকে ধরিল, আর কে যে সে কথা প্রকাশ করিল, একথা মধুসূদন হিসাব করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু ধরা পড়াটা যে ঠিক, একথা সে শালগ্রাম ছুঁইয়া হলফ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত ছিল।

সে রকম অসৎ স্বভাবের লোক দিয়া ত আর ব্রজেন্দ্র বাবুর মত মহৎ লোকের বাড়ীতে পূজার কাজ চলিতে পারে না, তাই ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা বিপত্তির মধুসূদনকে আবার সেখানে আসিতে হইয়াছে।

আরও কতক্ষণ তাহারা কথা কহিত ঠিক ছিল না, কেননা উভয়েই যে যার কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিল, যদি না নির্ম্মলা মধুর ঠাকুর ঘরে প্রবেশের অযথা বিলম্ব দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইত।

তাহাদের উভয়কেই দু'একটা মিষ্ট তিরস্কার করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও নির্ম্মলা তাহাদিগকে কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার না বলা কিছু বলার অপেক্ষা অধিক তিরস্কারের কাজ করিল। দুইজনেই অপ্রতিভের মত ক্ষণেক নিষ্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু শুভার মা যখন দেখিল, কোনও কথা না কহিয়া, তাহার সপত্নীপুত্রবধূ :চলিয়া যায়, তখন তাহাকে শুনাইয়া মধুকে বলিল—"যাও মধু, বউমা পূজোর আয়োজন ক'রে এসেছে। বাবু তোমাকে যখন আসতে বলেছেন তখন তোমার অপরাধ কি।"

"বাবু আসতে না ব'লে পাঠালে আসব কেন ঠাকুর মা!"

উভয়ে উভয়দিকে চলিয়া গেল।

ঠাকুরের অন্নভোগ শুভার মা রাঁধিত এবং ভোগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিত।

ব্রাহ্মণ গৃহের বিধবা সে, অন্নের সে-অন্ন-স্পর্শের অধিকার ছিল না। থাকিলে, নির্ম্মলা নিজেই তাহা ঠাকুর ঘরে বহন করিয়া লইয়া যাইত, ওই মিথ্যাবাদী বামুনটার মুখ হইতে রাখুঠাকুরের নিন্দা শুনিতে শাশুড়ীর অমন আগ্রহ দেখিয়া তাহারও উপরে তার এমন রাগ হইয়াছিল। মধু কি বলিয়াছে যদিও সে শুনে নাই, কিন্তু রাখুর চরিত্র সম্বন্ধে সে যে অনেক কথা বলিয়াছে, ইহাতে নির্ম্মলার সন্দেহ মাত্র ছিল না। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, রাখু পূজা করিতে আসুক আর না আসুক ও বামুনকে সে কখনই পুজারি নিযুক্ত হইতে দিবে না।

অনেকক্ষণ পুঁটিকে কোলে করিতে পারে নাই, আর এক ঝিয়ের কোলে দিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়াছে কন্যাকে দেখিবার ব্যাকুলতায় নির্ম্মলা সর্ব্ব নিম্নতলে সদরে রাহির হইবার দূরে উপস্থিত হইয়াই যেই ডাকিল 'ঝি', অমনি পিছন দিক হইতে শুভা তাহাকে ডাকিয়া উঠিল—"বৌদি!"

নির্ম্মলা পিছনে চাহিয়াই দেখিল শুভা।

"কি র‍্যা।"

"পুরুত মশাই চলে যাচ্ছেন কেন?"

কে পুরুত নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মলা দেখিল শুভার একহাতে ছাতি, অন্য হাতে গরদের কাপড়।

"চলে গেলেন!"

"বোধ হয় গেছেন। আমার হাতে এই দু'টো দিয়ে বললেন, তোমার বউদি'কে দিও। আর ব'ল আমার এখানে খেতে আসা হবে না, আজই আমি দেশে যাব।"

"তিনি চলে গেলেন কি না একবার দেখে আসবি শুভা।"

"বাইরে যাব?"

"তুই যা, কেউ কিছু বলে, জবাবদিহি আমার।"

শুভা চলিল, একটু দ্রুতই চলিল। নির্ম্মলা আবার তাকে বলিল—"দেখতে পাস্ ডেকে আনবি, আমার নাম ক'রে।"

ক্রমশঃ

রূপকথা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ]

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মানসিক সম্প্রসারণ শিক্ষা দিবার জন্ত দেশী ও বিদেশী অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ আবৃত্তি কেহ কণ্ঠস্থ করা কেহবা পড়িয়া যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু অত্যন্ত শিশুকালে আমাদের মনের মধ্যে যে শক্তি জাগ্রতী হইয়া থাকে তাহারই উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা কেহই বড় বেশী করে না। বিস্ সাহেবের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার খসড়ায় দেখা যায় যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্ত সে সব শিক্ষার উপায় ও পন্থা কল্পিত হইয়াছে, তাহা এদেশের পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। অথচ আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্, জার্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতি স্বাধীন দেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সব দেশে যাহাতে শিশু হৃদয়েও স্বদেশ-প্রেম, ভাবুকতা ও নির্ভীকতা জাগিয়া উঠে প্রাথমিক শিক্ষার মূলে তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে 'প্রথম ভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ,' 'শিশুশিক্ষা,' 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী নানাকারণে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ এই সব পুস্তক তোতাপাখীর মত পড়ান হয়, তাহাতে শিশুচরিত্রে উন্মেষিত না হইয়া স্তিমিতশক্তি হইয়া পড়ে।

শিশুচরিত্রের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ এই যে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা গল্প শুনিতে ভালবাসে। সন্ধ্যার আঁধারে বদ্ধ গৃহে ঠাকুরমা, দিদিমা, ঠানদিদি, রাঙাদিদি ও নূতন বধূরা যে সব গল্প, ছড়া রূপকথা ও হেঁয়ালি বলিয়া যান, তাহাতে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য অনেক। ছোট ছোট শিশুরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া নিদ্রাজড়িত নয়নে ছোট ছোট একটা 'হুঁ' দিতে দিতে কখন যে তাহাদের কোলে লুটাইয়া পড়ে, তাহা তাহারাই জানে না। শিশুরা চোখের দেখা ও কানের শোনা এই দুইটীরই পক্ষপাতী। কিন্তু চোখের দেখা পুস্তকের লাইন দেখা নয়, ইহা ছবি দেখা। একটা গরুর বর্ণনা অপেক্ষা সেই গরুটাই তাহারা সশরীরে দেখিতে চাহিবে। মনের ভিতরেও তাহারা অস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া যায় কেননা তাহাদের কল্পনা শক্তি খুবই প্রবল। মানসিক ভাবরাজি তাহাদের খুব তীক্ষ্ণ,—ভয়, প্রীতি, স্নেহ, বিস্ময়, আনন্দ, দয়া প্রভৃতি সমস্ত মানসিক বৃত্তিগুলিই অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া এত তীক্ষ্ণ। তাই কবি

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাহাদের 'trailing clouds of glory' বলিয়াছেন। শিশুরা কান দিয়া শুনিতে চায়—সঙ্গীত, ছন্দ, মিত্রাক্ষর রচনা, লীলায়িত গতি কবিতা; আর চোখ দিয়া দেখিতে চায়—বিচিত্র রেখার বিচিত্র অঙ্কন, ছবি, বর্ণচিত্র, আকার দেওয়া ভাব। তাহাদের নির্ম্মল মনটা গোধূলির আলো—আঁধারে ভরা; তাহারা কি চায় ও কি না চায়—তাহা তাহারাই ঠিক ভাল করিয়া জানে না। তাহাদের মন কখনো সচল রেখায় চলে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভুবনবিখ্যাত ক্রেস্কোগ্রাফে শিশুচিত্তের অবস্থা আঁকিলে ঐ রকম একটা হিজি-বিজি গ্রাফ তৈরি হইত। তাই যে-সব কবিতায় তরঙ্গায়িত ছন্দ ও সুললিত শব্দ সমাবেশ আছে, সেগুলি শিশুদের বড় আদরের; আর যে সব কাহিনীতে অদ্ভুতত্ব ও চিত্রপূর্ণ ঘটনা আছে, সেগুলিও তাহাদের বড় আদরের।

গল্পে তাহারা যা শোনে, তাহা সহজে ভোলে না। কারণ গল্পের ঘটনাগুলি ছবির মত তাহাদের মনের সুকুমার পটে আঁকিয়া যায়। সেই জন্য অনেক পাশ্চাত্য প্রাথমিক শিক্ষায়তনে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রভৃতি গল্পের ভিতর দিয়াই শেখানো হয়। ইতিহাসের মূল ঘটনাগুলি আবার অনেক সময়ে অভিনয় করিয়া দেখানো হয়। হুমায়ুন ও শেরসাহের নীরস ঘটনাগুলি সরস করিবার জন্য একজন ছাত্র হুমায়ুন ও অন্য একজন শেরসাহ সাজিয়া ব্যাপারটা অভিনয় করিয়া যায়। ইহাতে হুমায়ুন ও শেরসাহের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রাজত্বের ঘটনাবলীও বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমেরিকার অনেকস্থলে গ্রামোফনের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু আমরা আমাদের স্বদেশী রূপকথারই পক্ষপাতী।

রূপকথা—অর্থাৎ কথা বা কাহিনী যেখানে রূপ ধরিয়া মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়াছে। রূপের ভিতর দিয়াই ছেলে মেয়েরা গল্প শুনিতে মজিয়া যায়। তাই God save the king কবিতার আবৃত্তি বাঙ্গালী জীবনে নিরর্থক। পুস্তককারের প্রথম হইতেই চেষ্টা—বাঙ্গালীদের পরম রাজভক্ত প্রজা করিয়া তোলা। সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র জানি, শিশু জীবনে ঐ গানটী না শিখিয়া ডি, এল, রায়ের 'আমার জন্মভূমি' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরং' শিখিলে বাঙ্গালী বালকের জীবন সার্থক, মঙ্গলময় ও পুণ্যশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে। শিশু জর্জ ওয়াশিংটন চেরীগাছের ডাল কাটিয়াও পিতার কাছে নির্ভীকভাবে দোষ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী বালকের পক্ষে সত্যবাদিতার এই নজীর সম্পূর্ণ নিরর্থক। সত্যের জন্য বালক প্রহ্লাদ যাহা করিয়াছিল বা

শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন তাহার মূল্য ও সার্থকতা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। ভূতের রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়া শুনিয়া বুড়া বয়সেও আমাদের গাত্র-চর্ম্ম রোমাঞ্চই রহিয়া গিয়াছে, হাম্বা-রব শুনিয়াও দিনের মধ্যে অনেকবার আমাদের মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

রূপকথার কয়েকটা বিভাগ মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে—

(১) কাল্পনিক।

(২) পৌরাণিক।

(৩) ঐতিহাসিক ও

(৪) জীবন-চরিত বিষয়ক।

এই চারপ্রকার রূপকথার মধ্যে নিতান্ত শিশুদের জন্য প্রথমটীরই শ্রেষ্ঠতা দেওয়া উচিত। রাজপুত্র দুধের মত সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া বিজন বনের নিবিড় আঁধারের মধ্যে একাকী নির্ভয়ে ছুটিয়াছেন, টুকটুকে ঘুমন্ত রাঙা বউ পাবার জন্য নয় স্তর গ্যালাহাডের মত জীবনের আদর্শের সন্ধানে। কারণ পরিণত বয়সেও শিশু টুক্‌টুকে রাঙা বউএর মধুময় স্বপ্নটা মন হইতে তাড়াইতে পারে না। আলতার মত গাল, নবনীর মত ফুটন্ত কোমল দেহ, ফুলের মধু খাওয়া মুখ, মেঘের মত চুল, সোণার কাটি দিয়ে ঘুম পাড়ানো ও রূপার কাটি দিয়ে সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বর্ণ পালঙ্কে নিদ্রাভঙ্গ,—এ সবের যথারীতি পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমা, ঠান্‌দিদিরা তাঁহাদের চিরপুরাতন অথচ চির তরুণ গল্পগুলি হইতে এই সব রসাল অংশ বাদ দিতে চাহিবেন না জানি কিন্তু একটা জাতিকে মানুষ হইতে হইলে অনেক পুরাণো জিনিষ ভুলিতে হয় ও নূতন জিনিষের সম্যক্ গ্রহণ করিতে হয়। হাজার হাজার ভীষণ দর্শন ভৈরব রুদ্র রাক্ষস,—তাহাদের প্রাণ আছে একটী ছোট ভোমরার ভিতর; সে ভোমরাটী প্রমোদ সরোবরের যতই তলায় থাক ও কাশির কৌটার মত যতই গোলক-ধাঁধার মধ্যে সুরক্ষিত থাক, একবার কোন ক্রমে সেটাকে ধরিয়া 'পাশ পেড়ে কেটে ভূঁয়ে না রক্ত ফেলেছেই' অমনি কেল্লা ফতে;—হাজার হাজার রাক্ষস এক নিমেষে ধরাশায়ী হইবে। বুড়া বয়সেও এইরূপ রাক্ষস মারা আমাদের খুব সোজা কাজ হইয়া থাকে। শাঁকচুন্নি, পেত্নী, ভূত, ব্রহ্মদৈত্য কবন্ধ প্রেত, ডাইনী—বাঙ্গলার দিবস রজনী ভরিয়া বর্ত্তমান। তাহাদের এ পর্য্যন্ত মারা গেল না, যদিও রাক্ষস মারা কত সোজা!

এইরূপ অনেক সুন্দর রূপকথা শিশুজীবন হইতেই আমাদের মানসিক

বিকার উপস্থিত করে। ইহাদের পরিবর্ত্তনের ভার নবীনা বধুদের উপর দিলে আগামী বংশীয়েরা আবার মানুষ হইয়া উঠিবে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত-বিষয়ক গল্পগুলি শিশুদের নিকট সরস ও কৌতুহলোদ্দীপক করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান রূপকথার যে বিরাট saga বা 'মহাবংসো' আছে তাহার এখনও ভাল করিয়া আলোচনা করা হয় নাই। জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় এই কথাসাহিত্য ইতস্ততঃ ভাসমান শৈবাল-দলের মত অবহেলায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাঙ্গালার আকাশ বাতাস, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, উজ্জ্বল প্রভাত, হাসি অশ্রু, জয়-পরাজয় এই সব সামান্য কথা সাহিত্যের সঙ্গে চির বিজড়িত রহিয়াছে। যখন শীতের সুদীর্ঘ অলস সন্ধ্যাগুলি ঝিল্লীমন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠে, স্বর্গের প্রফুল্ল কোমল দেবদূতগুলি যখন সারাদিনের আমোদ কোলাহলে শ্রান্ত হইয়া স্নেহময়ীর অঞ্চল লগ্ন হইয়া বসিয়া থাকে, যখন সংসারের সব কাজ সারা হইয়া গিয়া একটী নিবিড় শান্তির জন্য সমস্ত চিত্ত ক্ষুধিত ব্যথাতুর হইয়া পড়ে,—তখন আমাদের স্নেহময়ীরা তাঁহাদের তরুণ জীবনের অরুণ স্বপ্নের মঞ্জুষাগুলি গাঢ় অনুরাগভরে একে একে উন্মোচিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের এই স্নেহের দান লাভ করিয়া আমরা সেই দানের উপযুক্ত হইতে পারি নাই। 'এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী'—এই রকম সরল ভাবে গল্প আরম্ভ করিয়া আমরা কত মতিমহল, শীষমহল, দেওয়ান-ই-খাস্, আরাম বাগ কল্পনায় পার হইয়া যাই; কত মুগ্ধা, কত অভিমানিনী, কত রূপসী আমাদের শিশুচিত্ত কমল আগামী যৌবনের মোহন পূর্ব্বরাগে অনুরঞ্জিত করিয়া যায়; কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত তেপান্তরের মাঠ বায়স্কোপের ছবির মত শব্দের নির্ঝরে আমাদের কল্পনা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে; আর সেই জুজুবুড়ী,—অমনি আমাদের মুখে চোখে ভয়ের অন্ধকার, হৃদয়ের দারুণ শঙ্কা, ঠিক কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের দশা—

'সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখংচ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥''

বৈষ্ণব কবিদের 'হিয়া দুরু দুরু পরাণ কাঁপনি!'

স্বীকার করি, সব দেশের কথাসাহিত্যেই অলৌকিক ও অবস্থা কাহিনীর সমাবেশ আছে। কিন্তু সে-সব গল্প ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইবার জন্য

প্রায় কথিত হয় না। আমাদের গৃহের নবীনা মাতারা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে শিশুদের দুরন্তপনা সহিতে না পারিয়া তাহাদিগকে অযথা জুজুর হাতে তুলিয়া দিতে চান; বাস্তবিকই জুজু মহাশয় তখন হইতেই শিশুচিত্তে জগদ্দল-পাথরের মত চাপিয়া বসেন। তাই পরিণত বয়সেও আমরা আশে পাশে জুজু দেখিতে পাই। স্বাদেশিকতা শুধু লেখাবাজি বা বক্তৃতার ফোয়ারায় প্রকাশ করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যময়,পূর্ণায়ত,সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশুর প্রয়োজন হইয়াছে। রূপকথায় কথিত সাহসী রাজপুত্রের মতই বিজন বনের গহন অন্ধকারে একলা ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহাদের চলিতে হইবে—ঘুমন্ত রাজকন্যার তরুণ বিম্বাধরে অনুরাগের প্রথম চুম্বনটী দিবার জন্য নয়,—সেই অনন্ত পথ, সেই তিমির-সঘন রাত্রি, সেই দুর্ব্বার বিপদ, সেই মায়া, সেই ভোজবাজি,—সেই সব উত্তীর্ণ হইয়া নবরুচিরকান্তি অরুণ প্রভাতে সত্য, শিব ও সুন্দরকে বরণ করিয়া লইবার জন্য! রূপকথা কেবল তখনি রূপরসে ভরিয়া উঠিবে, নহিলে নয়। রূপকথা আমাদের অন্তঃপুরের প্রাণশক্তি; রূপকথায় আমাদের দেশমাতৃকার স্বরূপ-প্রকাশ, রূপকথা আমাদের জন্মকোষ্ঠী। শিশুদের নবীন চিত্তের এই স্বাস্থ্যসম্পৎময় স্বদেশী উপাদানটীর প্রতি আর আমাদের উদাসীন হইলে চলিবে না।

গৌতমবুদ্ধ

[অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী]

(ভূপাল রাজ্যের অন্তঃপাতী সাঞ্চীশৈলবিহারের স্তূপ মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি ও মূর্ত্তি প্রভৃতির আভাষ অবলম্বনে লিখিত।) *

(১)

আন্দাজ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৬২ অব্দে গৌতমবুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করেন। নেপাল তরাই প্রদেশের প্রাচীন নগর কপিলবাস্তুর নিকটে তাঁহার জন্ম হয়। বোধগয়ার (বুদ্ধগয়া) পিপ্পল বৃক্ষের (বোধিদ্রুমের) তলে বোধলাভ (সম্বোধিলাভ) করিয়াই তিনি 'বুদ্ধ' এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পূর্ব্বে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' এই নামেই পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও কয়েকটী নাম ও উপাধি ছিল ; যথা—'শাক্যমুনি,' অর্থাত শাক্যকুলের মুনি ; 'সিদ্ধার্থ,' অর্থাৎ যিনি ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ; 'তথাগত,' অর্থাৎ যিনি সত্য লাভ করিয়াছেন বুদ্ধ এই শেষোক্ত নামেই সর্ব্বদা নিজের উল্লেখ করিতেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে বোধিসত্ত্ব কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নানাভাবে নানা স্থানে দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব

---

*Sir John Marshall Kt. মহোদয়ের 'Guide to Sanchi' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধের অধিকাংশই লিখিত হইল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সিদ্ধান্তবারিধি রায় সাহেব মহাশয়ের 'বিশ্বকোষ' ও শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, মহাশয়ের 'সারনাথের ইতিহাস হইতেও স্থানে স্থানে অনেক কথা সংকলন করিয়াছি। তাহা ছাড়া প্রাচীন পালি ও বৌদ্ধবিষয়ক সংস্কৃতগ্রন্থ হইতেও অনেক কথা লইতে হইয়াছে। সুতরাং আমি উক্ত সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া—ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, শ্রীযুক্ত মার্শেল সাহেব মহোদয়ের পূর্ব্বেও যাঁহারা সাঞ্চীর ইতিকীর্ত্তির কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের মতামত তুলনা করা বা বিবেচনা করা মোটেই আমার অভিপ্রেত নহে ; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। এমন কি, সাঞ্চীর স্তূপমালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নিদর্শনগুলিরও উল্লেখ হইতে বিরত হইয়াছি ; কাজেই একটা জটিল টীকাটিপ্পনী দিয়া জমাট জীবনচরিত লিখিবার চেষ্টা করি নাই, তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মহাপুরুষের জীবন কিরূপে মহামহিমান্বিত হইয়া প্রকাশ পায়, এবং তাহাতে দেশের ও দশজনের কি উপকার হয় ইহা দেখাইয়া দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণভাবে ইতিহাসের তথ্য জানাও আবশ্যক বটে কিন্তু তাহার উপর আমি বেশী জোর দেই নাই। লেখক।

জন্মে তিনি তুষিত-স্বর্গে জন্মিয়াছিলেন; সেই সময়ে দেবগণ তাঁহাকে নরলোকের পরিত্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি সেই প্রস্তাব স্বীকার করিবার পূর্ব্বে কোথায় কোন সময়ে কোন বংশে কাহার গর্ভে আবির্ভূত হইবেন এবং কবেই বা তাঁহার জীবনান্ত হইবে—এই সকল কথা স্থির করিয়া লইবার আবশ্যকতা মনে করিলেন। যথাকাল উপস্থিত হইলে তিনি সাব্যস্ত করিলেন, অন্যান্য বুদ্ধের ন্যায় তিনিও জম্বুদ্বীপের অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিবেন; কপিলবাস্তুর শাক্যকুলের শুদ্ধোধন তাঁহার জনক ও মায়া (বা মায়াদেবী) তাঁহার জননী হইবেন এবং তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার সাতদিন পরেই জননী মায়াদেবী মানবলীলা সংবরণ করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি তুষিত-স্বর্গ পরিত্যাগ করেন এবং মায়াদেবীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েন। মায়া স্বপ্ন দেখিলেন যে ভাবী বুদ্ধ এক শ্বেত হস্তীর কলেবর ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন। মহিষী স্বপ্নের কথা রাজার গোচর করিলে, রাজা শুদ্ধোদন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকাইয়া সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন যে রাণী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভজাত শিশু রাজচক্রবর্ত্তী বা বুদ্ধ হইবেনই হইবেন। গর্ভাবস্থায় চারিজন দিক্‌পাল বোধিসত্ত্ব ও মায়া দেবীকে সকল রকম অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কপিলবাস্তুর সমীপবর্ত্তী লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যানমধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেন; মায়াদেবী প্রসবকালে এক শালবৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মানা ছিলেন; প্রসূতি ধরিয়া দাঁড়াইতে পারেন এই জন্য ঐ গাছের একটী শাখা নত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া ছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই আসিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং চারিজন দিক্‌পাল জননী মায়াদেবীর দক্ষিণ দিক্ হইতে সন্তানকে ধরিয়া লইয়াছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল সন্তানের শরীরে ভাবী মাহাত্ম্যব্যঞ্জক বত্রিশটী মহাপুরুষ-লক্ষণ (মহাব্যঞ্জক) এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ লক্ষণ সমূহও (অনুব্যঞ্জক) বিদ্যমান আছে। জন্মিবামাত্রই নবকুমার সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং শতবার পদবিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমি জগতের শ্রেষ্ঠ"। ঠিক বুদ্ধ যেই মুহূর্ত্তে জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ভাবী সহধর্ম্মিনী রাহুলজননী যশোধরা, তাঁহার সারথি ছন্দক, প্রিয় অশ্ব কন্থক, ক্রীড়াসহচর কালুদায়ী এবং প্রিয়তম শিষ্য আনন্দও জন্মলাভ করেন।

বোধিসত্ত্বের জন্মদিনে স্বর্গে তেত্রিশ দেবতার মহোৎসবের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। ঋষি অসিত এই মহনীয় দিনের মহোৎসবের সংবাদ পাইয়া দিব্যদৃষ্টির বলে বলিয়াছিলেন যে এই শিশুই ভবিষ্যৎ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৌণ্ডিণ্য নামীয় অপর এক যুবক ব্রাহ্মণও এই প্রকার ভবিষ্যদ্ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্‌বাদী জ্যোতিষিকগণ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে এই নবজাত কুমার কালে চক্রবর্ত্তী হইবেন কি বুদ্ধ হইবেন তাহার নিশ্চয় নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছিলেন যে কুমার যদি সংসারে থাকেন তবে নিশ্চয়ই রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন এবং যদি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে নিঃসন্দেহ বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। রাজা শুদ্ধোধন পুত্র 'রাজচক্রবর্ত্তী' হয়েন ইহাই কামনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কি কারণে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, রাজা সকলকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর পাইলেন—চারিটি দৃশ্য—বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ও সন্ন্যাসী এই চারিব্যক্তির দর্শনেই কুমারের বৈরাগ্য জন্মিবে। তদবধি শুদ্ধোধন সতর্ক হইলেন; যাহাতে পুত্রের দৃষ্টিপথে কোন বৃদ্ধ বা পীড়িত ব্যক্তির দৃশ্য না পড়ে কিংবা কোন শব বা সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া না যায়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিলেন এবং পার্থিব বস্তুতে যাহাতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় সেই জন্য নিজে যতদূর পারিলেন যত্নবান্ হইলেন এবং যতদূর বা পরের সাহায্যে হওয়া সম্ভব তাহাও করিতে ক্রটী করিলেন না। কথিত আছে, রাজা শুদ্ধোধন একদিন—সম্ভবতঃ 'সক্রোত্থান' পর্ব্ব (ইন্দ্রদ্বাদশী কৃষি সংক্রান্ত পর্ব্ববিশেষ) উপলক্ষে কৃষিগ্রাম পরিদর্শনে বালক বুদ্ধকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন; এবং একটী জামগাছের তলায় নিজের রথে বুদ্ধকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেইখানে ধাত্রীরা কিছুকালের জন্য বুদ্ধকে ছাড়িয়া যায়; বুদ্ধ উঠিয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়েন, অবিলম্বেই তাঁহার সমাধি হয়। এই তাঁহার প্রথম সমাধি। যতক্ষণ তিনি সমাধিমগ্ন ছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃক্ষছায়া ততক্ষণ তাঁহার উপরিভাগে সমভাবে স্থির হইয়া ছিল। ইহা হইতে বুঝা গেল যে তাঁহার ভাবি জীবনের উন্নতির বীজ বাল্যকালেই তাহাতে নিহিত ছিল।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কোলিয় নামক রাজবংশের সহিত শাক্যকুলের বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া আসিতেছিল। এই বিবাদের নিঃশেষ ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত কোলিয়-বংশসম্ভূতা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরার সহিত ১৬ ষোল বৎসর বয়ঃক্রম

কালে বুদ্ধদেবের বিবাহ দেওয়া হয়। কথিত আছে বুদ্ধদেব সেই সময়ে অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন যুবক ছিলেন; ধনুর্ব্বিদ্যায় কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; দৈহিক বিক্রমে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; নানা কলাবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। শৈশবের ভবিষ্যদ্‌বাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শুদ্ধোধন পুত্রকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার ভোগবিলাসের সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন—যাহাতে পুত্র বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়া নিতান্ত বিষয়াকৃষ্ট হইয়া পড়ে দিবারাত্র সেই চিন্তা ও সেই চেষ্টাই করিতেন; এবং যাহাতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে পূর্ব্বলিখিত দৃশ্যচতুষ্টয়ের একটীও না পড়ে সেইজন্য অত্যন্ত সাবধান থাকিতেন। পাছে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কুমারের বৈরাগ্যোদয় হয় এবং সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসে মন দেয় এই চিন্তাই তাঁহার বলবতী হইয়া উঠে। কিন্তু যতই যাহা হউক পর পর কয়েকবার রাজকুমারের প্রাসাদের আরামোদ্যানে রথারোহণে ভ্রমণকালে, দেবগণ তাঁহার সম্মুখে সেই রকমের বিষাদ দৃশ্যাবলিই উপস্থিত করিয়াছিলেন; কখনও জরাজীর্ণ বৃদ্ধলোক, কখনও শীর্ণকলেবর ব্যাধিগ্রস্ত লোক কখনও আবার শবাকার গতপ্রাণ মানবদেহ (মৃত) তাহার সম্মুখে পতিত হইল। এই সকল বিষাদ দৃশ্য দেখিয়া যুবকের হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি করুণার্দ্রহৃদয়ে এই সকলের অর্থ ও কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে জরাব্যাধি ও মৃত্যুসংক্রান্ত সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া বুদ্ধদেব নিতান্ত অধীর ও শোকাকুল হইয়া উঠিলেন। অতঃপর চতুর্থ দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল—সুপবিত্র সৌম্যকায় শান্ত দান্ত ও সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকের মূর্ত্তি। দেখিয়াই তরুণ তাপসের হৃদয়ে গভীর সংস্কার বদ্ধমূল হইল। ভিক্ষুর সন্ন্যাসমূর্ত্তিই যেন নিজ হইতে তাঁহাকে বলিয়া দিল—সংসারে যে সকল দারুণ দুরবস্থার দৃশ্য দেখিয়াছ, যদি ইহার উপরে উঠিয়া থাকিতে চাও, তবে সংসার ছাড়িয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অবিলম্বেই তিনি ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন সমাধি অবলম্বন করিতে মনঃস্থ করিলেন। একদিন রাজপ্রসাদের নিদ্রাগত পরিচারিকা নারীবর্গের ঘৃণাকারজনক উচ্ছৃঙ্খলদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সংকল্প আরও দৃঢ় হইল; তিনি রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থাতেই নিজ পুত্র ও পরিবারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। ইহাই বুদ্ধদেবের মহাপ্রস্থান বা প্রব্রজ্যা (মহাবিনিষ্ক্রমণ)। এইরূপে ২৯ উনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধদেব সত্যের অনুসন্ধানে সংসার হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়েন। তাঁহার প্রিয় অশ্ব কন্থকে আরোহণ করিয়া তিনি নগর অতিক্রম করিলেন;

পাছে নগরের লোক কোন প্রকার শব্দে জাগরিত হইয়া উঠে এইজন্য দেবতারা সকাল অশ্বের ফোঁস ফোঁস শব্দ নিবারণ করিয়া তাহার পদ চতুষ্টয় ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অতি সত্বর নগরে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে দুর্ম্মতি মার (কন্দর্প বা কামদেব) গৌতমের অনুসরণ করতঃ তাঁহাকে নিখিল জগতের রাজচক্রবর্ত্তী পদের প্রলোভন দেখাইয়া লক্ষভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু, বলা বাহুল্য তাহার সেই চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হইল।

অদূরে অনোমা নদীর পরপারে পৌছিয়া গৌতম তাঁহার বিশ্বস্ত সারথির হস্তে নিজের অলঙ্কারপত্র সমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। পরে স্বহস্তস্থিত তরবারির দ্বারা নিজের কেশগুচ্ছ কাটিয়া লইয়া শিরস্ত্রাণের সহিত তাহা উর্দ্ধে আকাশে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"যদি আমি ভাবী বুদ্ধই হই—ইহাই ঠিক, তবে এই কেশদাম উর্দ্ধেই অবস্থান করুক নতুবা অচিরাৎ শিরস্ত্রাণের সহিত ইহা ভূপতিত হউক"। বলা বাহুল্য কেশরাশি নিমেষ মধ্যে উর্দ্ধে উধাও হইয়া গেল এবং সুবর্ণ পুটিকার মধ্যে স্বর্গের এয়ত্রিংশদেবতার সমীপে নীত হইয়া রহিল। অতঃপর দেবদূত ঘটিকার ব্যাধের বেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে বোধিস্বত্ব তাহার সহিত নিজের পোষাক পরিচ্ছদ বদলা বদলি করিয়া এবং সংসার ত্যাগের চিহ্ন স্বরূপ ঘোড়া লইয়া সারথিকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া একাকী পদব্রজে রাজগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় রাজা বিম্বিসার অবিলম্বে আসিয়া তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন; এবং নিজ রাজপদ পর্য্যন্ত গৌতমবুদ্ধকে ছাড়িয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বোধিস্বত্ব রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইয়া তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে আমি পূর্ণ মনোরথে স্বয়ং আপনার রাজ্যে আবার প্রত্যাগমন করিব। তথা হইতে গৌতম উরুবিল্বার (পালি উরুবেল) পথে প্রস্থান করিলেন। উরুবিল্বা মগধের পুণ্যভূমি গয়া নগরীর সন্নিকটে কোন গ্রাম বিশেষ। এইখানে বোধিস্বত্ব কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিয়া নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। ছয় বৎসরকাল এইরূপ তপশ্চর্য্যা চলিল। তখন বুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন যে তপস্যায় শরীরের কৃশতা সাধন দ্বারা জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আবার তিনি পূর্ব্ববৎ ভিক্ষুর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার পাঁচজন অনুচর (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ) তাঁহার প্রতি অনাস্থা পরায়ণ হইয়া অশ্রদ্ধায় তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং কাশীর সন্নিধানে মৃগদাবে (বর্ত্তমান 'সারনাথ') গিয়া অবস্থান করেন। বোধিস্বত্ব নৈরঞ্জনা নদীরতীরে গমনপূর্ব্বক নিকটস্থ

কোন গ্রামবাসীর কন্যা সুজাতার হস্তে সেই দিবস প্রাতরাশ ভক্ষণ করেন ভক্ষণান্তে সুজাতা যে সুবর্ণপাত্রে অন্নাদি আনিয়া দিয়াছিলেন তিনি তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "যদি অন্তই আমি বুদ্ধ হইতে পারি তবে এই ভোজনপাত্র স্রোতোজলে উজান বাহিয়া উঠুক ; নতুবা এই দণ্ডেই জলধিমগ্ন হউক।" আশ্চর্য্য যে সেই পাত্র কিয়ৎকাল স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া জলমগ্ন হইল এবং নাগরাজ কালের বাসভূমিতে চলিয়া গেল।

সেই দিবস সায়ংকালে বোধিসত্ত্ব বোধগয়ায় পিপ্‌পলীবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তদবধি সেই বৃক্ষ 'বোধিদ্রুম' নামে অভিহিত হইতে লাগিল। পথে স্বস্তিক (পালি, সাত্থির) নামে এক ঘাস-বিক্রেতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার নিকট বুদ্ধ আট আটি ঘাস লইলেন এবং বোধিদ্রুমের পাদদেশে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিক অবলোকন করতঃ ঐ বৃক্ষের পূর্ব্বভাগে সমস্ত ঘাসমুষ্টি ছড়াইয়া দিলেন। পরে তাহার উপর বসিয়া বুদ্ধ বলিলেন,—"যদিও আমার অস্থি, চর্ম্ম, মাংস সমস্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, যদিও আমার শরীরের শোণিত জীবনীশক্তির বিলোপসাধন করিয়া শুষ্ক হইয়া পড়ে, তথাপি আমি যতদিন না সত্যজ্ঞানের অধিকারী হইয়া বহুকল্পেও সুদুর্ল্ভ সেই সংবোধি লাভ করিতে না পারি, ততদিন এই যে বসিলাম, বসিলাম ; এই পরিগৃহীত আসন আর পরিত্যাগ করিব না।" বলা বাহুল্য, ইহার পরেই দুরন্ত ও পরের অভ্যুদয়ে কাতর মন্মথের আক্রমণ ও প্রলোভন আরও বাড়িতে লাগিল ; কন্দর্প নানা উপদ্রবের অবতারণা করিয়াও তাঁহাকে উদ্দেশ্যবিমুখ করিতে পরান্মুখ হইল না। তাহার অসুর প্রকৃতিক দলবলের ভীষণ অত্যাচার ও নিদারুণ উৎপাতের ভয়ে বোধিসত্ত্বের পার্শ্বচর দিক্‌পাল দেবগণও পলাইয়া গেলেন। কেবলমাত্র 'তথাগত' সেইখানে একাকী নিজের সিংহাসনে স্থির ও নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। দুরাচার মার ভীষণ বাত্যা-প্রবাহিত করিয়াও তাহার নিষ্কম্পিত শরীরকে কম্পিত করিতে পারিল না। তাঁহার উপরে অবিশ্রান্ত উপলখণ্ড, তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র জ্বলন্ত অঙ্গার ও ভস্মরাশির অভিবর্ষণ হইতে লাগিল ; তথাপি তিনি কোনমতেই বিচলিত হইলেন না বা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সেইগুলি তাঁহার শরীর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই কোমল কুসুমে পরিণত হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া সকলেই অবাক্! বোধিসত্ত্ব তখন সিদ্ধির আর দেরী নাই জানিয়া জয়লাভের মহানন্দে ধরিত্রীর দোহাই দিলেন এবং নিজের আসনে বসিয়া নিজের কাজ

করিবার অধিকার তাঁহার নিজেরই আছে এই কথা জানাইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। দেবী ধরিত্রী মহাশব্দে সেই আহ্বানের উত্তর দিলেন। দুরাচার মন্মথের সৈন্যগ্রাম সেই শব্দে ভয়াকুল হইয়া লজ্জানত মুখে প্রস্থান করিল। দেবগণ উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'জয় সিদ্ধার্থের-জয়! এতদিনে দুর্মদ কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল!' অবিলম্বে নাগলোক প্রভৃতির সমস্ত প্রাণীরা আসিয়া সিদ্ধার্থের জয়গান করিতে লাগিল। তখন সায়ংসূর্য্য অস্তমিতপ্রায়; বোধিসত্ত্ব প্রকৃতই শত্রুদল পরাজয় করিলেন এবং সেই রজনীযোগেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। চিরবাঞ্ছিত সংবোধি তাঁহার করায়ত্ত হইল। রজনীর প্রথম প্রহরে, তিনি জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের সমস্ত জ্ঞানলাভ করিলেন; দ্বিতীয় প্রহরে জীবজগতের যাবতীয় অবস্থা তাঁহার বিদিত হইয়া গেল; তৃতীয় প্রহরে, কার্য্যকারণ পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল; এবং রজনী প্রভাত হইলে কোন বস্তুর কোন বিদ্যাই তাঁহার অবিদিত রহিল না;—তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন।

এইরূপ সংবোধি লাভ করিয়া উদ্‌বুদ্ধ বুদ্ধদেব ৪৯ দিন উপবাস করিলেন। সুজাতা তাঁহাকে পূর্ব্বদিন যে অন্নপ্রদান করিয়াছিলেন তাহার বলেই অমানুষিক শক্তিতে এতদিন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। এই সুদীর্ঘ সাত সপ্তাহকাল বুদ্ধ নানাস্থানে যাপন করিলেন। প্রথমতঃ বোধিদ্রুমের তলে বা নিকটে;—এইখানে তিনি তাঁহার মুক্তির ফলভোগ করিলেন এবং অভিধর্ম্ম পিটকের সমগ্রাংশ প্রচার করিলেন; অতঃপর অজপালের ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ) মূলে, এইখানে সেই সদ্ধর্ম্মের শত্রু মারের রতি, প্রীতি ওতৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা তাঁহাকে লোভের ফাঁদে ফেলিবার প্রয়াস করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই; তৃতীয়তঃ মুচিলিন্দ (মুচলিন্দ) বৃক্ষের ছায়ায় এইখানে নাগরাজ মুচিলিন্দের ফণা তাঁহাকে বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে, রাজায়তন বৃক্ষের নিম্নে,—এইখানে সপ্তম সপ্তাহের শেষদিনে ত্রপুষ ও ভল্লিক নাম্নীয় দুই সহোদর তাঁহাকে আহারার্থ যবের রুটী ও কিছু মধু আনিয়া দেয়। এই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, বুদ্ধদেবের কাছে এমন কোন পাত্র না থাকায় চারিজন দিকপাল তাহাকে তৎক্ষণাৎ চারিটী পাথরের বাটী আনিয়া দেয়। তথাগত স্ব-আজ্ঞায় তদ্দণ্ডে সেই চারিটী প্রস্তর পাত্রকে একটিতে পরিণত করিয়া তাহাতেই অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করেন। বণিকদ্বয় তাঁহার প্রতি নিজেদের সম্পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার প্রার্থনা

জানাইলেন। বুদ্ধও তাহা পূরণ করিয়া অনতিবিলম্বে তাহাদিগের দুই জনকে বৌদ্ধসংঘের প্রথম উপাসকরূপে দীক্ষিত করিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

মায়ের ডাক

[শ্রীসত্যকুমার মজুমদার বি, এ]

১

শিবপুরের হারাণ বিশ্বাসের ছেলে পুলিন যে দিন তার সমপাঠী ক্লাসের ভালছাত্র প্রবোধ বসুকে ১০০ শত নম্বরের নীচে রাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিল, সে দিন প্রবোধ যে শুধু নিজেকে একলা অপমানিত মনে করিয়াছিল তা নয়, স্কুলের প্রায় সমস্ত ছাত্র এমন কি দীঘলিয়া গ্রামের অনেক ভদ্রলোকই তাহাতে নিজেদের অসম্মান বোধ করিয়াছিল। এই অশিক্ষিত নমঃ শূদ্রের ছেলেটা ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে পেছনে ফেলিয়া উপরে উঠিবে, তার মত অসম্মানে তাহাদের আর কি হইতে পারে! হারাণ বিশ্বাস নিজে সরস্বতীর সুনজরে পড়িবার সুযোগ না পাইলেও মা কমলার শুভদৃষ্টি তার উপর একটু বেশী পরিমাণে বর্ষিত হইয়াছিল। শিবপুরের নমঃ শূদ্রেরা সকলেই কৃষিজীবী। খাওয়া পরার ভাবনা তাঁহাদের বড় ছিল না। বিশেষতঃ এই কয়বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অনেকেই বেশ অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। হারাণ বিশ্বাসের অবস্থা ছিল সব চেয়ে ভাল। বিশ্বাস মহাশয় বাল্যকালে একবার মা সরস্বতীর ঘরে যাইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছেন তাই তার দৃঢ় সংকল্প পুলিনকে মানুষ করিবেন।

বিশ্বাস মহাশয় যেদিন পুলিনকে প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যান সেদিন প্রবোধের পিতা যোগেন্দ্র বসু তার বৈঠকখানায় বসিয়া ডাকিলেন, "কি হে হারাণ তোমার ছেলেকে স্কুলে দিয়ে গেলে না কি? এ সব দিকে ঝোঁক তোমাদের কবে থেকে হ'ল হে?"

হারাণচন্দ্র উত্তর করিলেন, "ঝোঁকটা অনেকদিন থেকেই ছিল বোস মশাই! ভাগ্য দোষে নিজে কিছু শিখ্‌তে পারিনি দেখি ছেলেটার যদি কিছু হয়।"

বসু মহাশয় তামাকটা পুরা দমে টানিয়া বলিলেন, "তা তোমাদের ত এ কাজ নয় হারাণ! তাই বলছিলুম কি, হয় ত কিছু শিখ্‌তে পার্‌বে না মাঝ খান থেকে চাষ বাস নষ্ট হবে।"

হারাণচন্দ্র জানিতেন এরূপ কুসংস্কারসম্পন্ন ভদ্র আখ্যাধারী প্রতিবেশীর নিকট হইতে তিনি নিরুৎসাহ ছাড়া বড় বেশী কিছু আশা করিতে পারেন না। হারাণচন্দ্রের অর্থবল ছিল তাই বুকের জোরটাও নেহাৎ কম ছিল না—অমনি মুখের উপর বলিয়া উঠিলেন, "তা বোস্ মশায়ের ত এতে মাথা ব্যাথা হওয়ার কারণ দেখ্‌ছি না। লেখাপড়া শিখাটা কারো নিজস্ব জাতিগত পেশা নয়। আর আমরা এমন নূতন কাজও কিছু কর্‌ছি না। আর আর জায়গায় আমাদের জাত বেশ শিক্ষিত হয়ে উঠ্‌ছে—এই শিবপুরেই কেবল মা সরস্বতীর পদার্পণ হয়নি। তা রাগ করবেন না বোস মশাই যে কতকটা আপনাদের দোষে! বাবা যখন আমাকে স্কুলে দিতে এসেছিলেন তখন এই গ্রামের অনেক ভদ্রলোক আপনার মত ঠিক এমনি—পরামর্শ দিতে এসেছিলেন। তা সেদিন আর নেই বোস্ মশায়।"

মুখের মত জবাব পাইয়া যোগেন্দ্র বাবু আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "বেটার দুটো পয়সা হয়েছে কি না আর মাটিতে পা দিতে চায় না।"

আজ পুলিন ক্লাসের প্রথম হইয়া বসুমহাশয়কে দেখাইয়া দিলেন যে মা সরস্বতী কোন জাতি বিশেষের একচেটিয়া নন।

ক্লাসের প্রমোশনের দুইদিন পরে যোগেন্দ্রবাবু হেডমাষ্টার গিরীশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মাষ্টারবাবু, আপনারা স্কুলে সব মুচি মুদ্দফরাস ভর্ত্তি ক'রে তাদিকে প্রথম ক'রে দিবেন এতে ভদ্রলোকদের মান থাকে কোথায়।"

হেডমাষ্টার বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "স্কুলটা শুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থের জন্য নয় বোস্ মশায়। এই যে আপনাদের একটা মজ্জাগত জাতিহিংসা এইটাই দেশের যত সর্ব্বনাশ করছে। এই গোঁড়ামিটার দোষেই আপনারা দেশটাকে উৎসন্ন ক'রে ফেল্‌লেন। বড় হ'তে হ'লে কাউকে বাদ রেখে বড় আপনি কি বল্‌তে চান পক্ষপাতিত্ব করে আমরা ফাষ্ট্ সেকেণ্ড করি!"

বসু মহাশয়ের গাত্রজালা হেডমাষ্টার বাবুর কথায় আরও বাড়িয়া গেল। একেই ত শিবপুরে তার কয়েক ঘর নমঃশূদ্র প্রজা তাহাকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখে না, তার উপর লেখাপড়া শিখিলে ত জমিদার বলিয়া খাতিরই করিবে না। বসু মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া ওদের শিক্ষার পথটা বন্ধ করিতে পারা যায়। কাজে তিনি বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না,

অধিকন্তু শিবপুরে তাহাদেরই উদ্যোগে একটা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

যোগেন্দ্রবসু গ্রামের মধ্যে একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। বড়লোক হইলেই তার কতকগুলি পার্শ্বচর থাকেই। এই একদল অকর্ম্মণ্য লোক পিতা পিতা-মহের উপার্জ্জিত অর্থ বসিয়া বসিয়া ধ্বংস করে, আর পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়! সন্ধ্যায় যোগেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় তাহাদের এক আড্ডা পড়িয়া যাইত।—দুই একছিলিম গঞ্জিকার আরাধনাও যে না হইত এমন নয়।

বসু মহাশয় তার পার্শ্বস্থিত রাম ভট্টাচার্য্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন ভট্টাচার্য্যমশায় দেশের ছোট লোকেরা বড় মেতে উঠেছে। এদের না থামালে আর ভদ্রলোকের মান থাকবে না।"

ভট্টাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "সে বটেই ত বোস মশায়! আমাদের যতীনও তাই বল্‌ছিল। সে বল্লে সে আর পড়্‌বে না। ভদ্রলোকের সম্মান তাহ'লে থাকবে না। ছোটলোকদের সঙ্গে সাম্‌নে বস্‌তে হয় তারপর মাষ্টার নাকি তাকে দিয়ে কাণ মলিয়ে উপরে তোলে।"

ভট্টাচার্য্য তার গুণধর পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বসিলেন। তাঁর পুত্রটী আবার এমনি গুণধর যে তিন বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে ফেল হওয়ার পর হেডমাষ্টার মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া প্রমোশন লইয়াছিল। এবার বাৎসরিক পরীক্ষায় নম্বর পাইয়াছে অঙ্কে ০, ইংরেজীতে ১৩, ইতিহাসে ৫, আর বাঙ্গলায় ২৩।"

বসু মহাশয় বলিলেন, "দেখ ত চক্রবর্ত্তী কত বড় অন্যায়। হেডমাষ্টারকে বলতে গেলুম, বেটা আমায় দুকথা শুনিয়ে দিলে। বেটা কেবল দেশ দেশ করে মরছে। ১০০ টাকা মাইনের চাকর আস্পর্দ্ধাটা দেখত। ভদ্রলোকের মান থাকল না সেটা আবার দেশ!"

চক্রবর্ত্তী বাম হাতে হুকা নামাইয়া বলিলেন, "ও বেটার কথা ছেড়ে দাও যোগেন। বেটা বামুনের ছেলেই নয়। বেটার জাত ভেদ জ্ঞান নাই-খৃষ্টান—খৃষ্টান। সেদিন মুসলমান পাড়ায় গিয়ে কেমন তাদের সঙ্গে এক বিছানায় ব'সে কেবল বকে যাচ্ছিল—দেশ—দেশ—দেশ! তা সেক্রেটারী রায় মশায়কে বল না কেন, তিনি ত সদ্‌ ব্রাহ্মণ।"

বসু মহাশয় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সে ও বলে দেখেছি ভায়া। ছেড়ে দাও ওদের কথা! দেশে কি আর ব্রাহ্মণ আছে। যা তুমি আর এই

ভট্টাচার্য্য মহাশয়। দিন দিন সব খৃষ্টানীভাব ধরছে। বলে—জাত মেন না ছোটদের বড় কর। তাই নাকি খাঁটি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ঘোর কলি—ঘোর কলি —সব সৃষ্টি ছাড়া কথা।"

২

জীবনে যত লোকের কাছে পুলিন উৎসাহ পাইয়াছে, তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহদাত্রী ছিল অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হরকুমার কবিরত্নের কন্যা। অল্প বয়সেই পণ্ডিত মহাশয় অন্নপূর্ণার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে সে বালবিধবা। পণ্ডিত মহাশয় অন্নপূর্ণাকে যথেষ্ট সৎ-শিক্ষায় সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবসর মত তিনি কন্যাকে দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন—যাহাতে তাঁর অভাগী কন্যা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মপথে মতি রাখে। দর্শন শাস্ত্রে গীতার কর্ম্মবাদটা অন্নপূর্ণার কাছে বড় ভাল লাগিত। কিন্তু সে বিধবা যুবতী কুলবালা, সংসারে তার কি কাজ থাকিতে পারে! সে তার কর্ম্মহীন জীবনটা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে পড়াইবার ভার অন্নপূর্ণা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রতিবাসীর রোগে শোকে অন্নপূর্ণা ছিল সকলের মাতৃস্থানীয়া। হরির ছেলের অসুখ, অন্নপূর্ণা রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। হারাণীর মেয়ের জ্বর, দুধ সাগু খাইবে, ঘরে দুধ নাই —দুধের বাটী লইয়া অন্নপূর্ণা হারাণীর দ্বারে উপস্থিত।

এত করিয়াও অন্নপূর্ণার সময় কাটিত না। দীর্ঘদিন যেন ফুরাইতে চাহিত না। অন্নপূর্ণা ভাল উলের কাজ জানিত। ছেলে মেয়েদের টুপী মোজা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া সে যে পয়সা পাইত তাহাতে দরিদ্র কবিরত্ন মহাশয়ের কম সাহায্য হইত না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হাতে পৈতা কাটার অভ্যাস তাহার ছোটবেলা হইতেই ছিল। কিন্তু পৈতা বিক্রয় শাস্ত্রানুসারে পাপ—কাজেই অন্নপূর্ণা প্রয়োজনের অধিক পৈতা কাটিত না।

ঘরের মাচার উপর বহুকালের পরিত্যক্ত একটা অর্দ্ধ ভগ্ন চরকা দেখিতে পাইয়া অন্নপূর্ণা পিতাকে বলিল, "এটা কি বাবা?"

কবিরত্ন মহাশয় চরকাটা বাহির করিয়া বলিলেন, "এটা চরকা, এতে আগে সুতো কাটা হ'ত তাই দিয়ে যে কাপড় হ'ত তাই ছিল সকলের পরিধেয়। এই যে বিলেতী কাপড় এটা খুব বেশী দিনের আমদানী নয়। আমিই খুব ছোট বেলায় হাতে কাটা সুতোর কাপড় পরেছি।"

অন্নপূর্ণা চরকা লইয়া বলিল, "আপনি আমায় তুলো কিনে দিবেন আমি সুতো কাটব।"

পিতা কন্যার কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সুতো দিয়ে কি হবে মা, কে কিনবে? বিলেতী ভাল সুতো খুব কম দামে পাওয়া যায়।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "কেন বাবা, প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিব। ভাল হলে ত পুরস্কার দেবে।"

পণ্ডিত মহাশয় কন্যার ক্ষমতার সন্দিহান ছিলেন না তাই তার ইচ্ছামত তুলা কিনিয়া দিলেন।

অন্নপূর্ণা মাঝে মাঝে তাঁতী পাড়ায় বেড়াইতে যাইয়া তাহাদের কাজগুলি বেশ পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে দেখিত। কৃষ্ণ বসাকের কন্যা তারি মত বালবিধবা। সংসারে তাদের কেউ ছিল না—এক বিধবা জননী আর সে নিজে মায়ে ঝিয়ে তাঁত চালাইয়া তাদের বেশ চলিতেছিল। অন্নপূর্ণা একদিন ললিতাকে বলিল, "তোদের এতে চ'লে ত ললিতা?"

ললিতা উত্তর করিল, "চলবে না কেন দিদি ঠাকরুণ! বিলেতী কাপড়ের জ্বালায় তেমন লাভ হয় না। তা খরচ বাদে আমাদের ১০।১৫ টাকা থাকে বইকি।"

বাড়ী আসিয়া অন্নপূর্ণা পিতাকে বলিল, 'আমাকে একটা তাঁত পেতে দিন না!"

কবিরত্ন মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "একেবারেই খেপে গেলে নাকি মা!"

এ হেন অন্নপূর্ণা ছিল পুলিনের উৎসাহ দাত্রী আর উপদেষ্টা শিক্ষয়ত্রী। বিধবা হইলেও তার মোটেই "ছুৎমার্গ" রোগ ছিল না। তাই পুলিন যেদিন একটা দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিল, অন্নপূর্ণা এই ছেলেটাকে কেন যেন স্নেহের চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু অতবড় একটা ছাত্রের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিলে তার মত যুবতী বিধবার পাছে কোন দোষের কাজ হয়, অন্নপূর্ণা তাই তার ছোট বোন সুরবালাকে দিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে পুলিনের পরিচয় লইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন উদার প্রকৃতির লোক বিশেষতঃ পুলিনের স্বভাব চরিত্রে তিনি একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। অনেক চেষ্টাতেও তিনি পুলিনে সংস্কৃত কাগজে ৫টী নম্বরের বেশী কাটিতে পারিতেন না

এইরূপে যাতায়াত আলাপ পরিচয়ে পুলিন পণ্ডিত পরিবারের স্নেহ লাভ করিয়াছিল। হারাণ বিশ্বাসের টাকা পয়সার অভাব ছিল না—পুলিনেরও একটা প্রকাণ্ড প্রাণ ছিল,—তাই দীঘলিয়ার অনেক দরিদ্র ভদ্রপরিবার অভাবের সময় পুলিনের অর্থ সাহায্য পাইত। সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান চাউলের দর বড় বাড়িয়া গিয়াছিল, পুলিন নিজের গোলা হইতে ২৫/০ মন ধান দরিদ্র অনাথ ভদ্রপরিবারের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিলাইয়া দিয়াছিল।

পুলিনের হাতে ঔষধের শিশি দেখিয়া অন্নপুর্ণা বলিল, "এত দৌড়ে শিশি হাতে কোথায় যাচ্ছ পুলিন ?"

পুলিন অন্নপুর্ণাকে দূর হইতে প্রনাম করিয়া বলিল, "রমেশ বাবুর ছেলের বড় অসুখ তাদের ডাক্তার বাড়ী যাবার লোক নেই এই ঔষধটা দিয়ে আসি।"

অন্নপুর্ণা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল; "তুমি পারবে পুলিন, ছোট থেকে বড়, মানুষ থেকে দেবতা কি করে হওয়া যায় তা তুমি জান।"

পুলিন হাসিয়া বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ দিদি, আমায় শিখিয়ে দিবেন কি করে মানুষ হওয়া যায়।"

অনেক দিন হইতেই অন্নপুর্ণা এই ছেলেটীর প্রত্যেকটা কাজ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। অন্নপুর্ণা কি একটা প্রবন্ধে পড়িয়া ছিল,—যে জাতি যখন জাগে তাদের মধ্যে তখন অনেক আত্মত্যাগী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। অন্নপুর্ণা পুলিনের ভিতর সেই ত্যাগীর ছায়া দেখিতে পাইয়া মনে মনে বলিত, বাঙ্গালী আবার উঠিবে সাধারণের ভিতর হইতে যদি এমন সন্তান বাহির হয়—তবে বাঙ্গলার দূর ভবিষ্যৎ নেহাৎ অন্ধকারময় হইতেই পারে না।"

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া পুলিন কলিকাতা আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলে মেসে থাকা লইয়া প্রথমে তাহাকে বড় বেগ পাইতে হইয়াছিল। হারাণ বিশ্বাস বিরক্ত হইয়া পুলিনের জন্ম ছোট একখানি বাসা ভাড়া করিয়া দিলেন সমস্ত অসুবিধা শেষ হইয়া গেল।

৩

পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা সুরবালা চোদ্দ পার হইয়া পনেরতে পা দিয়াছে, আর তার বিবাহে বিলম্ব করিলে চলে না। পণ্ডিত মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়া মাত্র ৩০০ শতটী টাকার যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ৫০০ টাকায় সুরবালার বিবাহ হয় না। যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ করেন

বরকর্ত্তা ৫০০ শত টাকার কমে কিছুতেই স্বীকার করেন না। কাজেই বিবাহও হয় না।

একদা পণ্ডিতগৃহিণী নথ নাড়া দিয়া বলিলেন, "মেয়েটার ত বিয়ে দিতে হবে। বাড়ী ঘর যা আছে বন্ধক দিয়ে দু'শো টাকা ধার করে ফেল।"

পণ্ডিত মহাশয় ম্লান মুখে বলিলেন, "বাঁধা না হয় দিলুম কিন্তু টাকা শোধ করব কি ক'রে! এই ৩০টী টাকা মাহিনে এতেত খোরাক্ জুটানই ভার!"

গৃহিণী একটু নরম হইয়া বলিলেন, "তা কি করবে বল! মেয়েকে ত আইবুড়ো ক'রে রাখ্‌তে পারবে না। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্ম দেওয়া কত জন্মের মহাপাপের ফল! পুলিন আমাদের বাড়ী আস্‌ত-জান ও পাড়ায় কি কলঙ্কের কথা-রটেছে। বলে পুলিন ত ওদের সাহায্য করবেই-ঘরে দুই দুইটী সোমত্ত মেয়ে!"

"নারায়ণ, নারায়ণ" পণ্ডিত মহাশয় কাণে আঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, "তা যোগেন বোস্‌দের বাড়ী ও সব কথা হয় বুঝি?

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "শুধু বোস্‌দের বাড়ী হবে কেন ভট্টাচার্য্য বাড়ীতেও হয়।"

কবিরত্ন মহাশয় অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা বলুকগে তারা। রাম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীত! তার ঐ গুণধর পুত্রের জন্য আমাদের সুরকে চেয়েছিল। না হয় তার ক'টি টাকা আছে তা বলেত মেয়েটাকে একটা গাধার হাতে তুলে দিতে পারব না। বাপে গাঁজা খায়—ছেলে আবার গাঁজা মদ দুটোই ধরেছে। আমার দেওয়া আমি দেখেই দিব—ভিটে ছাড়া হ'তে হয় তাও স্বীকার।"

এমন সময় পুলিন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিল।

পণ্ডিত মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "পুলিন যে, কল্‌কেতা থেকে কবে এলে?"

পুলিন উত্তর করিল, "কাল এসেছি—বড় দিনের ছুটী। দিদি কোথায়!"

অন্নপূর্ণা ঘরে বসিয়া মোজা প্রস্তুত করিতেছিল। বাহিরে আসিয়া বলিল, "দাওয়ায় উঠে ব'স—এতদিন শরীর ভাল ছিল ত!"

পরদিন পণ্ডিত মহাশয় গৃহিণীকে বলিলেন—"যাই তবে বাড়ীটা বাঁধা

দিয়েই দু'শ টাকা এনে দেখি। মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি পার না করলে দেখছি লোকে আমার দুর্নাম রটাবে। এর চেয়ে বেশী বয়সের মেয়েও কিন্তু ভদ্র-লোকের ঘরে আছে তা স্বর একটু বেড়ে উঠেছে বইত নয়! তবে এটা ঠিক যে এর পর ভিটে ছাড়া হতেই হবে।"

পুলিন ২০০৲ শত টাকার দুই খানি নোট পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ভিটে ছাড়া হ'তে হবে কেন পণ্ডিত মশাই। আপনার মত দেবতার যদি কন্যাদায়ে ভিটে ছাড়া হ'তে হয় তবে তার চেয়ে বাঙ্গালী জাতির দুর্দ্দশা আর কি হ'তে পারে! একটা ব্রাহ্মণ কন্যার জাত রক্ষার জন্য ভগবান এই ছোট লোকটার হাতে দু'চারটী টাকার অভাব ক'রে দেননি।"

পুলিন পণ্ডিত মহাশয়কে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই বাহিরে আসিতেছিল, পাছে তিনি টাকা গ্রহণে অস্বীকার করেন! কিন্তু বড় ঘরের দাওয়া হইতে অন্নপূর্ণা যখন ডাকিল, "পুলিন।" পুলিনকে তখন বাধ্য হইয়াই ফিরিতে হইল।

অন্নপূর্ণা বলিল, "অত উচুতে দাঁড়িয়ে কাজ করলে ভাল হয় না তা তোমায় অনেকদিন বলেছি।"

অন্নপূর্ণার কথার মর্ম্ম গ্রহণ না করিতে পারিয়া পুলিন বলিল, "বুঝতে পারলুম না দিদি কি মনে ক'রে আপনি বলছেন। এই টাকা ক'টির কথায় কি?"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "শুধু টাকার কথায় কেন, সংসারে যারা উঁচুতে দাঁড়িয়ে কাজ করতে থাকে, এত উঁচু যে মানুষ তাদের নাগালই পায় না, তাদের কাজ বুঝতে না পেরে সাধারণে তাদের কার্য্যে দোষ দেখতে থাকে। তাই মানুষের মধ্যে কাজ করতে হলে একটু নীচুতে নেমে আসতে হয়।"

পুলিন বিস্মিত হইয়া বলিল, 'তবে কি অসময়ে মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে না?"

অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিল, "আমি কি বলছিরে পাগল; সাহায্য ত করবেই সেইটাই ত মানুষের কাজ। তবে অযাচিত আত্মীয়তা—অযাচিত করুণায় মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না যে করুণাময়ের তাতে কোন দুরভিসন্ধি বা স্বার্থ নেই।"

পুলিন বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না কেন আজ অন্নপূর্ণা তাহাকে এত কথা

বলিতেছে। এটা কি তার সত্যিকার কথা না তাহাকে পরীক্ষা করা। যে অন্নপূর্ণা একদিন তাহাকে বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিল, যে একদিন জীবের মঙ্গলে তাহাকে অন্নদান করিতে উপদেশ দিয়াছিল। যার উপদেশে সে বুঝিয়াছিল কি করিয়া মানুষের সঙ্গে মিশিতে হয়, কি করিয়া পরকে—অতি বড় শত্রুকেও আপন করিয়া তোলা যায়। সেই অন্নপূর্ণা আজ তাহাকে কি সব বলিতেছে। পুলিন কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিতে লাগিল, "সংসারে বড় বড় কাজ কর্‌তে গেলে বড় কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়। পুলিন,—তুমি লোকের ভাল করছ মানুষে মনে কর্‌বে তুমি মন্দ করছ।"

এবার পুলিন বলিয়া উঠিল, "মানুষের কথায় ত ভাল মন্দ বিচার করা চলেনা দিদি—কাজের ভাল মন্দ তার ফলে।"

অন্নপূর্ণা বলিল, 'তাইত বলছি পুলিন—ফলটা মানুষ আগেই দেখে না। মানুষ প্রথমটাকে শেষ ধ'রে নিয়ে বিচার কর্‌তে আরম্ভ করে। সেই বিচার আবার এমনি গুরুতর যে সে নিন্দা অপযশ—শত্রুতা কত কি ছাড়িয়ে উঠা বড় শক্ত। পার্‌বে ত?"

পুলিন দৃঢ় স্বরে বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকিলে কেন পারব না দিদি কিন্তু ভাল কাজ করলেও মানুষ মানুষের শত্রু হ'বে কেন বুঝলুম না।"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "সংসারের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঠিক হ'লে সব বুঝবে। নিজে ভাল ত জগৎ ভাল কথাটা সব জায়গায় খাটে না। এমন লোকও জগতে বিরল নয় যে হাজার ভাল করলেও তাদের কাছে ভাল হওয়া যায় না।"

পুলিন বলিল "তত খারাপ লোকের সংখ্যা কিন্তু খুব কম। জানেন না দিদি, যে প্রবোধ বসু একদিন আমাকে তার শত্রু বলিয়া মনে করত, সে এখন আমার পরম মিত্র। সেবার মেসে তার খুব কলেরা হয়েছিল, সকলে তাকে মেস্ থেকে হাঁসপাতালে যেতে ভয় পেলে। আমি তাকে নিজের বাসায় এনে চিকিৎসা করিয়েছিলুম তার পর থেকে গত ব্যবহারের জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইলে। কিন্তু আজও তার পিতার সুনজরে আমি পড়তে পারলুম না। আমাদের জাতটার উপর তাঁর একটু জাতক্রোধ—নইলে—বাধ হয়—।"

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিল, "তা জানি পুলিন, ঐ জাত রোগেই ত সব গেল।

কিন্তু তোরা মানুষ হ, জাত তোদের বড় হ'বে। আশীর্ব্বাদ করি ঘরে ঘরে পুলিন তৈরী হোক জাত্যাভিমানী পায়ে লুটিয়ে পড়্বে।"

৪

ফরিদপুরের তার কতকগুলি স্বজাতি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে সংবাদ পাইয়া পুলিন কলিকাতা হইতে রওনা হইল। ঐ দলের নেতা পঞ্চানন রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "পঞ্চানন বাবু আপনাদের এসব কি? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে বিধর্ম্মী হ'চ্ছেন কেন?"

পঞ্চানন রায় উত্তর করিলেন, "হিন্দুধর্ম্মকে আপনি সনাতন বলতে চান? যে ধর্ম্মে তার জাত ভাইকে এত ঘৃণার চোখে দেখে, যে ধর্ম্মে সম ক্ষমতাপন্ন মানুষকে এত ছোট করে রাখে সেটাও কি আবার একটা ধর্ম্ম।"

পুলিন মৃদু হাস্যে বলিল, "হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র বোধ হয় রায় মহাশয়ের বেশী দেখা হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মে সমক্ষমতাপন্ন ভাই ভাইকে ছোট বলে মনে করেনা। তবে যেটা বাস্তবিক সত্যিকার ধর্ম্ম তা দেশে এত দিন বড় ছিল না আবার জেগে উঠছে। যাকে আপনি ধর্ম্ম বলে মনে করছেন সে একটা কুসংস্কার আর অশিক্ষার ফল হিংসা। সুখের বিষয় হিংসাটা দিন দিন কমে যাচ্ছে নিজ নিজের দোষে ছোট করে রেখে বড়র সমান হ'তে যাওয়া কি খুব যুক্তি সঙ্গত?"

পঞ্চানন রায় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি সব বলছেন নিজের দোষে আমরা ছোট করে রেখেছি, তাই বুঝি আমাদের জলটুকু পর্য্যন্ত খায় না?"

"সব দোষটাই যে আমাদের তা আমি বলছিনে তবে বেশীর ভাগ দোষটা যে আমাদেরই, বিচার করে দেখলে অস্বীকার করতে পারবেন না। নিজকে ছোট মনে করার মত বড় দোষত আমরি চোখে আর কিছু পড়ে না। নিজকে আমরা ছোট ভাবি তাই সবাই আমাদের ছোট মনে করে। তবে জল খাওয়াটার কথা বলছেন তাতেই আমি বলতে চাই, উপযুক্ত হ'লে বা আবার ব্যবহার ভাল দেখলে বামুনেও আমাদের হাতে জল খেতে আপত্তি করবে না। দেখুন পঞ্চানন বাবু, দেশে যে বাতাস বইতে সুরু করেছে এতে ওসব গোড়ামি আর বেশী দিন থাকবে না। সহরেত এক রকম অন্ততঃ জল খাওয়ার বিচারটা উঠেই যাচ্ছে। তারপর দেশের যাঁরা নেতা তাঁরা সমস্ত জাত এক ক'রে একটা অখণ্ড হিন্দু জাতিতে পরিণত করবার চেষ্টায় আছেন। তাই বলে কি

পিতা পিতামহের ধর্ম্মটা ছেড়ে দিবেন। আমাদের মত নিপীড়িত আরও কত জাত আছে। কেউত জল খাওয়াইতে পারে না ব'লে ধর্ম্ম ছেড়ে দিচ্ছে না, ধরুণ না এই যোগী জাতিটার কথা তারা কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত নিচ্ছে নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলতে চেষ্টা করছে। ব্যবস্থা ত ব্রাহ্মণেরাই দিয়েছে তাই ব'লে ব্রাহ্মণ সমাজ কি তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চায় না তাদের আচরণীয় বলে গ্রহণ করে! তাদের কত বড় দাবী, তাঁরা বলেন একদিন তাঁরা ভারতের রাজন্যবর্গের গুরু স্থানীয় ছিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করে তাহাদের বাঙ্গলার নবম গৌরব আখ্যা দিয়েছেন। তাতে তাঁদের কি ফল হ'চ্ছে! যতক্ষণ না তাঁরা নিজের কার্য্যে তাদের পূর্ব্ব গৌরব দেখাতে পারেন ততক্ষণ লোকে মান্‌তে চাইবে না। কতগুলি শাস্ত্র পুথির প্রমাণের উপর নির্ভর করে বড় হওয়া চলে না পঞ্চানন বাবু, এই সুবর্ণ বণিকদের কথাই ধরুন, বাঙ্গালায় তারা ধনে বিদ্যায় চেহারায় কোন্ জাতির চেয়ে হীন? জল তাদেরও কেউ খায় না। খায়না আবার খায়ও। স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণের মত তাদের সম্মান। সে শুধু তারা ভিতর থেকে বড় হ'য়ে উঠেছে বলে। আর কত নাম করব।"

"আপনি যাই বলুন না কেন পুলিন বাবু, ভদ্রলোকে আমাদিগকে বড় ঘৃণা করে।"

"ঐ ত মশায় দোষ! ভদ্রলোকে ঘৃণা করে। আপনি কি ভদ্রলোক নন? ভদ্রলোকে ঘৃণা করে না, ঘৃণা করে ভদ্র আখ্যাধারী ছোট লোকে। কিন্তু এও ঠিক জান্‌বেন যে যতই তারা ঘৃণা করুক আমরা ভিতর থেকে ভাল হয়ে উঠ্‌লে তাদের সেই ঘৃণা একদিন শ্রদ্ধারূপে পরিণত হ'বে। নিজের ভিতরকার উচ্চতা দেখিয়ে প্রমাণ করুন আমরা বড়। সমাজে শিক্ষার বিস্তার করুন আচার ব্যবহার ভাল করুন, হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান থাকুন, সবাই মাথায় তুলে নেবে। তা না করে লাফ দিয়ে ত' গাছে উঠা যায় না। আমরা আছি গাছের গোড়ায়, তারা আছে উপরে, আমাদেরও খানিক উঠতে হ'বে তাঁদেরও খানিক নামতে হ'বে, তবে আমরা তাঁদের লাগাল পাব।"

"তাঁরা সেটুকু নাব্‌বে না কত বড় হিংসা যে নাপিতটা পর্য্যন্ত আমাদের নেই।"

পুলিন ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। নিজের মনের একটা তীব্র দুঃখ চাপিয়া বলিল—"নেই হ'বে। হিংসা যা বল্‌ছেন

ধরতে গেলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে খুব কম। আমি ডাক্তার রায়ের একটা প্রবন্ধে পড়েছি, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এত হিংসা যে ছোট জাতির ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় চলবার অধিকার নেই, উঁচু জাতিরা তাদের সামনে আসা ত দূরের কথা, তাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। তারাই অস্পৃশ্য। বাঙ্গালায় তেমন অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই। আমাদের উঠবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁরা ক'রে দিয়েছেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই হ'ল। সে চেষ্টা না করে ধর্ম্ম ত্যাগ করলে কি ফল হ'বে।"

"আপনি ছেলে মানুষ জাতিহিংসার কামড় যে কত শক্ত তা এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি রাস্তায় কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়াতে আপনার আলাপ হ'ল, বেশ আলাপ, যেই আপনার নামটী তিনি শুনলেন, অমুক নমঃশূদ্র অমনি তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে বস্‌লেন। তার চেয়ে খ্রীষ্টান হয়ে নামের আগে এলবার্ট কি কিছু লাগিয়ে উপাধিটা ঝালিয়ে ফেল্‌লে কেউ জাতের খবর জিজ্ঞাসাও করবে না। আর নাক সিটকাইবারও দরকার ত হবে না।

পুলিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "পঞ্চানন বাবু তা কি কখন হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদে পড়েছি—

"নিশি যবে যায় কোন দেশে—
মলিন বদনা সবে তার সমাগমে"

ঐ যে যোগিদের কথা বলেছি না, তাঁদের উপাধি হ'ল নাথ। তার অর্থ প্রভু স্বামী। আর কায়স্থ জাতির সাধারণ উপাধি "দাস" মানে ভৃত্য। কিন্তু প্রভু উপাধি লাভ করেও তদুপযুক্ত গুণ হারিয়ে তারা হীন—আর দাস হয়েও সদ্‌গুণ সম্পন্ন বলে কায়স্থরা শ্রেষ্ঠ। চাই নিজেদের ভিতরকার উন্নতি।"

পঞ্চানন বাবু একটু নরম হইয়া বলিলেন, "তা যাই বলুন পুলিন বাবু, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিধর্ম্মী চামার হলেও লোকে তাকে ঘৃণা করে না কিন্তু নিজের জাতভাইকে ঘৃণা করা বাঙ্গালীর মজ্জাগত দোষ! হিন্দুজাতির সঙ্গে আমাদের নন্ কোঅপারেশন হওয়াই উচিত। দেখি এতগুলি লোককে ফেলে রেখে বাঙ্গালী কি করে তার অভীষ্ট লাভ করে।"

পুলিন মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, "তাতে ফল এই হবে যে দেশবাসীর চক্ষে চিরকাল ছোট থেকে যাবেন। দেশের ও দশের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফল কোন কালেই ভাল

হতে পারে না! এ সব ছেড়ে দিন পঞ্চানন বাবু, জাতের কথা ভুলে গিয়ে একবার দেশের কথা ভাবুন, আগে দেশ পরে জাত। যতই নিজের দেশকে আপনার বলে মনে করবেন জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ততই চলে যাবে। একদিকে দেশের সঙ্গে মিশে নিজকে তাদের একজন মনে করবেন, অন্যদিকে নিজের জাতটাকেও বড় করতে চেষ্টা করবেন। এই যে দেশে বড় বড় কাজের ফর্দ্দ হচ্ছে, তাতে কয়জন নেতা অনুন্নত জাতি থেকে বেরিয়েছে বলুন ত! নামে যারা বড় কাজেও তারা বড়। বড় বড় নেতা তৈরী করে তাদের দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে শিখান। মায়ের ডাক শুনতে পান্‌নি? সকলেই শুনেছে। আজ সমগ্র ভারতের ঘুম মায়ের ডাকে ভেঙ্গে গেছে। মায়ের ছেলে আমরা সব বড় আর ছোট ভাই। বড় ভাই ছোট ভাইকে ঘৃণা করতে হয় করুক্ আমরা ছোট ভাই মহত্বে বড় ভাইকে ছাড়িয়ে উ'ঠে মায়ের আদরের ছেলে হব পেছিয়ে পড়ে থাক্‌ব না আগেই যাব।"

বলিতে বলিতে পুলিনের চক্ষে জল আসিল পঞ্চানন বাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

৫

রাম ভট্টাচার্য্য যত বার পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন পণ্ডিত মহাশয় ততবারই অস্বীকার করিলেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র মনে করিয়াছিল দরিদ্র পণ্ডিত মহাশয় তার মত সুপাত্র আর কোথায় পাইবে! বিশেষতঃ সে যখন টাকা লইবে না তখন পণ্ডিত মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাটী নিশ্চয়ই তার ভাগ্যে জুটিয়া যাইবে। বিবাহের প্রস্তাবের পর হইতেই যতীন মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীর চারি ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত গান গাহিত আর শিশ দিত। কদাচিৎ সুরবালার দেখা পাইলে কুৎসিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিনীর কাছে পণ্ডিত মহাশয়ের শেষ অসম্মতির কথা বলিতেছিলেন ঠিক তখন বাহির বাড়ী হইতে যোগেন্দ্র বসু ডাকিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বাড়ী আছেন?"

যতীন তাহার পিতাকে ডাকিয়া দিলে বসু মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিয়ে ঠিক হল?"

ভট্টাচার্য্য সক্রোধে বলিলেন, "আর বিয়ে! কবিরত্নকে কত বল্‌লুম, মেয়ের বিয়ে তা কত দেমাক। যতীনের একান্ত ইচ্ছে, তাই একটা পয়সাও চাইলুম

না। সেধে বে' দিতে পারবে না—আমাদের ঘর কি আর ওদের ঘর কি! বেঁচে থাকলে যতীনের জন্য আমি হাজারটী টাকা নেব দেখ্‌বেন।"

বসু মহাশয় উত্তর করিলেন, "তাইত ভট্টাচার্য্য মশায়, মেয়ের বে' দিবে বলে পণ্ডিত মশায় আমার কাছে দু'শ টাকা ধার করতে গে'ছিলেন। তা টাকাই বা কোথায় পেল!"

মাঝখান হইতে যতীন বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি ঐ পুলিনটা টাকা দিয়েছে ঠিক্! গত বড়দিনের সময় তাকে চিঠি লিখে আনিয়েছিল। আজ-কাল ঐ একরকম জামাই কিনা। না বাবা আমি ও বিয়ে করব না।"

যথা সময়ে সুরবালার বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন তখন কলিকাতায়। তার হাতে তখন অনেক কাজ সে বিবাহে যোগ দিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা পুলিনকে আসিতে লিখিল, পুলিন উত্তর দিল সে যাইতে পারিবে না। এমন কি গরমের ছুটীতেও সে বাড়ী যাইবে না মায়ের ডাকে ছেলেরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে সেও মায়ের ছেলে। পারে ত পূজার ছুটীতে তাঁহাদের চরণ দর্শন করিবে।

পূজা আসিল। বাঙ্গালী আবার বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া মাতৃমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল। বাঙ্গালার রোগ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনশূন্য পল্লী আবার অনন্ত কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে নূতন বস্ত্র নূতন অলং-কারের সাজ।

পুলিনও নূতন সাজে সাজিয়া বাড়ী আসিল সে দিন সপ্তমী পুলিন সেই দিনই বাড়ী পৌছিয়েছে। পূজার গোল্‌মালে দীঘলিয়া যাইতে পারে নাই।

সপ্তমীর চাঁদ আকাশে মৃদু মৃদু হাসিতেছে, অন্নপূর্ণা তার গন্ধবিহীন ঝরিয়া পড়া ফুলের মত দেহখানি চাঁদের আলোকে বিছাইয়া দিয়া ভাবিতেছিল তার গন্তব্য আর কতদূর।

এমন সময় সুরবালা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, পুলিন দা এসেছে। আমি ওবাড়ীর শৈলদের সাথে ঘোষদের বাড়ী ঠাকুর দেখ্‌তে গিয়েছিলুম; দেখি, পুলিন দা বোসদের বাড়ীর প্রবোধের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় জিজ্ঞেস্ করলে কেমন আছ দিদি! আমি তার সাথে কথা কইতে পারলুম না ভট্টাচায্‌ বাড়ীর সেই যতীনটা আমার দিকে কটমট ক'রে চাইতে লাগলো। ঘোস্‌দের বাড়ী ঘু'রে ফিরতে দেখি সে তার কয়জন সঙ্গী নিয়ে বোতল থেকে কি ঢাল্‌ছে আর খাচ্ছে।"

অন্নপূর্ণা উঠিয়া বসিল, বলিল, "থাক্ কথনো ওদের সাম্নে বে'র হোস্নে। দেশের মুটে মজুরে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল আর ওরা ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে ছাড়্তে পার্ছে না। আমার ইচ্ছে ছিল না ও'মাতালটার সঙ্গে কথা কই তা দেখ্ছি না কইলে আর নয়।"

প্রবোধের হাত ধরিয়া পুলিন অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "একি বেশ ভাই তোমাদের ?"

পুলিন উত্তর করিল, "এই নূতন পূজার পোষাক দিদি। মা এসেছেন নূতন পোষাক পরব না। নূতন সবাই চায়—এ সব চেয়ে নূতন।—ঘরের দেওয়া জিনিষ দিদি! আপনি এবার সুতোকেটে দিবেন—খুব ভাল পোষাক হবে।"

অন্নপূর্ণা উভয়কে আসন দিয়া বলিল, "প্রবোধ, তোমাকে পুলিনের সঙ্গে দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি আজ থেকে তুমিও আমার ভাই।"

প্রবোধ উত্তর করিল, "পুলিনের কাছে সব শুনেছি দিদি, বাবার জন্যে এতদিন আমি ওর সঙ্গে মেশামেশি কর্‌তে পার্‌তুম না। তা বাবা আর এখন কিছু বলেন না। অশীর্ব্বাদ করুণ যেন ভাই ভাই এক হয়ে দেশ মাতৃকার দুঃখ দূর কর্‌তে পারি।"

অন্নপূর্ণার চক্ষে জল আসিল। অন্নপূর্ণা কেবল বলিল, "আজ আমার দু'টী ভাই!"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল—অন্নপূর্ণা জলযোগ না করিয়া উঠিতে দিল না। পূজাবাড়ীর কোলাহল তখন থামিয়া গিয়াছে, মুখরপল্লী আবার সুপ্তি ঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

অন্নপূর্ণা বলিল, "তোমাদের আর যেয়ে কাজ নেই রাত অনেক হয়েছে এখানেই থাক।"

প্রবোধ বলিল, "না দিদি বাবা আমায় বক্‌বেন।"

প্রবোধ উঠিয়া বাহিরে আসিল, পুলিন ডাকিয়া বলিল, "আস্তে হাট প্রবোধ আমিও যাচ্ছি। না দিদি, আমিও যাই আসতে মা কত বারণ করেছিলেন, সকালে চলে আসব ব'লে এসেছি।"

অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া পুলিন চলিয়া আসিতেছিল, সুরবালা দৌড়িয়া পুলিনের হাত ধরিল, বলিল, "পুলিনদা, তুমি যেওনা ভাল হবে না বলছি, কত বড় মাঠ একা যাবে! ভূত প্রেত কত কি রাতে চলা ফেরা করে।"

পুলিন হাসিয়া বলিল, "ভূতের ভয়! ভূত বলে কিছু নেই দিদি! ছেড়ে দাও!"

সুরবালা উত্তর করিল, "ভূত না থাক্ ভূতের বাবা মানুষ ত আছে। তা যাও—"

রাগ করিয়া সুরবালা পুলিনের হাত ছাড়িয়া দিল, পুলিন বাহির হইয়া পথে নামিল। সুরবালা শিহরিয়া উঠিল, সে মাতালগুলির কি একটা দুরভিসন্ধির কথা অল্প অল্প শুনিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া সে অন্নপূর্ণাকে বলিল, "পুলিনদাকে ফেরাও দিদি।"

সুরবালা নিজেই ডাকিল, "পুলিনদা ফে'র!" পুলিন একটু অগ্রসর হইয়াছিল, সুরবালার নারীকণ্ঠ শুনিতে পাইল না। রাস্তার ধারে একটা গাছ গাছের ছায়ায় অন্ধকার। পুলিন থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে রে প্রবোধ!"

যতীন ভট্টাচার্য্য বিকট মুখ ভঙ্গি করিয়া টলিতে টলিতে বলিল, "চিনতে পারছনা বাবা, মজা লুঠে খাচ্ছ। শালা রাতে যাতায়াত সুরু করেছ। তুমি আমার শীকার কেড়ে নিয়েছ, শালা ছোটলোক বামুনের জাত মারছ।"

"উহু—প্রবোধ!" বলিয়া পুলিন মাটিতে পড়িয়া গেল। এই চীৎকার শব্দে অন্নপূর্ণাও সুরবালা ছুটিয়া আসিল। প্রবোধও অনেক দুর অগ্রসর হয় নাই—সেও ঘটনা কি দেখিবার জন্য দৌড়িল।

যতীন দৌড়িয়া পালাইতেছিল, কিন্তু মদের ঝোকে একএকবার পড়িয়া যাইতেছিল। প্রবোধ বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরাধরি করিয়া পুলিনকে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। কেহ ডাক্তার বাড়ী কেহ শিবপুরে সংবাদ দিতে ছুটিল—সুপ্ত পল্লীর বুকে একটা করুণ আর্ত্তনাদ নৈশ প্রকৃতির জড়তা ভাঙ্গিয়া বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হইল।

(৬)

আজ:দশমী পুলিনের মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পার্শ্বে জননী অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। পুলিন ক্ষীণ স্বরে ডাকিল, "মা, কেঁদনা, বাবা কোথায়?"

হারাণ বিশ্বাস পূজার কাজে ব্যস্ত ছিলেন একজন তাহাকে ডাকিয়া দিল। বিশ্বাস মহাশয়ের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই—নীরবে রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুলিন বলিল, "বাবা, মা কাঁদ্‌ছে, সান্ত্বনা করুন, কেঁদনা মা, এবার আমি যাই আবার আস্‌ব। তোমার ঘরেই আস্‌ব মা আমার কাজ শেষ করে যেতে পার্‌লুম না।"

জননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বিশ্বাস মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "কাঁদ্‌ছ কেন? ছেলেকে আমি মায়ের সেবায় উৎসর্গ করেছিলুম ও আর আমাদের ছেলে নয়। দেবতার জিনিষ দেবতা নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের কি! পুলিন, দারোগাবাবু এসেছেন।"

পুলিন উত্তর করিল, "প্রবোধ আগে আসুক।"

জননী চক্ষে অঞ্চল দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। এ কয়দিন পুলিন ইচ্ছা করিয়াই জবানবন্দী দেয় নাই। একটু সুস্থ না হইলে জবানবন্দী দিবে না বলিয়া আপত্তি জানাইয়াছে।

প্রবোধ আসিল, পুলিন বলিল, "প্রবোধ, যতীনকে থানায় নিয়ে গেছে না?"

প্রবোধ উত্তর করিল, "আর কোথায়! হাতে মুঠে ধরা আসামী। বাঁচবার অনেক চেষ্টা করছে বটে তা'কি আর হয়।"

পুলিন ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "প্রবোধ, ওকে বাচালে হয় না? ওকে মারলে আর কি হবে।"

প্রবোধ স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। পুলিন বলিতে লাগিল, "চমকায়ো না প্রবোধ! ওকে বাচাতে হবে; সেই জন্ম ক'দিন আমি জবানবন্দী দিইনি। ওত আমাদেরি ভাই! সংশোধন ত শাস্তির উদ্দেশ্য! ওকে যদি ভাল বেসে শোধরাতে পারি। ভাই হয়ে ভাইকে জেলে দেওয়া কি ফাঁসি কাষ্ঠে তুলে দেওয়া ত মায়ের ছেলের কাজ নয় ভাই!"

প্রবোধ কথা কহিতে পারিল না। কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। কেবল বলিল, "পুলিন তুই কি মানুষ।"

পুলিনের অধরে ক্ষীণ হাসি খেলিয়া গেল।—বলিল, "মানুষ! একটা অপদার্থ জীব, ছোটলোক, তবে মায়ের ছেলে, যে তাঁর ডাক শুনেছে। হয় ত আমাকে মারবার উদ্দেশ্য ওর ছিল না। মদের নেশায় হাতের বোতলটা কি আর কিছু আমার মাথায় মেরেছে ওকে মারলে চলবে না ভাই, মানুষ ক'রে তুলতে হবে। আমাকে রাখা মায়ের ইচ্ছা নয় নইলে একটা বোতলের ঘায়ে আমি মরতুম না। দারোগাকে বল প্রবোধ "যতীনকে একা আমার কাছে পাঠাতে হবে নইলে জবানবন্দী আমি দিব না।"

অগত্যা দারোগা তাহাতেই সম্মত হইলেন; বিশেষতঃ রাম ভট্টাচার্য্যের টাকার থলিতে দারোগা বাবুর লোহার সিন্ধুক প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল।

কয়েদীকে পুলিনের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল, সঙ্গে রাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই গেলেন। ভট্টাচার্য্য যোড়হস্তে পুলিনের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাঁচাও বাবা আমার একমাত্র ছেলেটাকে। তোমাদের স্বদেশী ফণ্ডে আমি দু'হাজার টাকা দিব।"

পুলিন ভট্টাচার্য্যকে যোড় হস্তে নমস্কার করিয়া বলিল, "ছি ছি আপনি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র যোড়হাত হয়ে আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না। আশীর্ব্বাদ করুন যেন ফিরে এসে বাকী কাজগুলো ক'রে যেতে পারি। টাকার লোভ দেখাবেন না। যতীন বাবু প্রতিজ্ঞা করুন, আর মদ স্পর্শ কর্‌বেন না জাতিহিংসা ভূ'লে যাবেন, আর মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর্‌বেন।"

গৃহ নিস্তব্ধ, সকলে স্পন্দহীন চোখে পুলিনের দিকে চাহিয়া রহিল। পুলিন বলিতে লাগিল "আমি যাচ্ছি আমার স্থান আপনি পূর্ণ করুন। পিতার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুন, জীবনে কখনো মিথ্যাকথা কইনি, আজ আপনাকে বাঁচাতে কেবল মিথ্যাই বলে যাব।"

যতীন কাঁপিতে কাঁপিতে পিতার পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—'জীবনে মদ খাব না,—জাতিহিংসা কর্‌ব না, মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর্‌ব।"

রাম ভট্টাচার্য্যও পৈতা হাতে লইয়া বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি আজ থেকে ওকে তোমাদের দলে দিলুম নিজেও ঐ দলভুক্ত হলুম।"

পুলিনের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, "বল বন্দেমাতরম্।"

সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল, 'বন্দেমাতরম্'। পুলিন দারোগা বাবুকে আনিতে আদেশ করিল। দারোগা আসিলে পুলিন বলিল, "লিখ্‌তে থাকুন;—আমি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী থেকে আস্‌ছি—রাত্রি অনেক। পথের ধারে গাছের তলায় দেখ্‌লুম যতীন বাবু মদের নেশায় এক একবার পড়ে যাচ্ছেন। আমায় বল্লেন, আমায় একটু বাড়ী রেখে এস ভাই—আমি ধ'রে তুল্‌তে গাছের একটা শিকড়ে বে'ধে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলুম—হাতের মদের বোতলটা আমার মাথায় নীচে পড়ে গেল তার পর আমার কিছু মনে নেই জ্ঞান হলে দেখি আমি এখানে।"

দারোগা বাবু হাসিয়া জবানবন্দী লিখিলেন। যতীন এবার হাউ মাউ করিয়া উঠিল—গৃহের সকলের চোখেই জল। কাঁদিতে কাঁদিতে যতীন বলিল

"ভাই পুলিন, তুমি বেঁচে উঠ আমায় ক্ষমা ক'রে একবার বল আমি তোমার ভাই।"

পুলিন যতীনের দক্ষিণ হস্ত বুকের কাছে টানিয়া বলিল, 'তুমি আমার ভাই তোমরা রইলে!'

এমন সময় পুলিনের পিতা বলিল, "দারোগা বাবু একটু বাইরে যান, মেয়েরা আস্‌ছে।"

দারোগা বাহিরে গেলেন। অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিয়া পুলিনের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ডাকিল, "ভাই।"

পুলিনের মুখ হর্ষোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "দিদি, এই তোমার আর একটী ভাই। একে নাও আমি যাচ্ছি মা আমায় ডাক্‌ছেন। আমি আবার আস্‌ব দিদি, তাই যতীন তোমরা যখন আমাকে ডাক্‌বে। মা কেঁদনা।"

"ও কি," বলিয়া প্রবোধ চীৎকার করিয়া উঠিল। রক্তে পুলিনের মাথার ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়া নীচের বালিশ লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

পুলিন বলিল, "আঃ কি করছ। মা কেঁদ না, আমি আবার আস্‌ব। দিদি তুমি বেঁচে থে'কো তুমি থাক্‌লে আমার মত অনেক পুলিন তৈরী হবে। মা—মা—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অন্নপূর্ণা পুলিনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "যাও ভাই আবার তুমি এস—যেদিন সমস্ত বাঙ্গালী জাতিহিংসা ভু'লে তোমার আগমন প্রার্থনা করবে সেইদিন তুমি এসো। ততদিন ভাই আমার মায়ের কোলে তুমি সুখে বিশ্রাম ক'র।"

হারান বিশ্বাস স্থির চক্ষে দেখিলেন পুলিনের আঁখিপল্লব ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিতেছে। বিসর্জ্জনের বাদ্যে সমস্ত গ্রামখানি তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেই দিনই জীবনে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ সেনাবারিকে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ইতি পূর্ব্বে এই সেনা বারিকেরই কত অস্ফুট রহস্য মনের আনাচে কানাচে কতবার কতরূপেই না আনাগোনা করিয়াছে, সেদিন সেনাবারিকের মধ্যে বসিয়াও মনে হইতেছিল যেন সেই সকল রহস্য আমাদের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে; মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল কত কালের সুখ স্বপ্ন যেন এই সেনা বারিকের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

লম্বা বারিকের মধ্যে দুই ধারে সারি সারি খাট পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ খাটে বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ বই পড়িতেছে, কেহবা কার্য্যোপলক্ষে বারিকের মধ্যে যাওয়া আসা করিতেছে। আমরা বড় স্ফূর্ত্তিতেই পরিচিত সৈনিকদিগের সহিত কথা কহিতে ছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভিতর যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, ও আনন্দের এক বিচিত্র আলোড়ন হইতেছিল। প্রথমত যখন ইঁহারা আমাদের জন্য মিষ্টান্ন আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন আমরা অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ইঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ক্ষান্ত হই; অথচ যখন মিষ্টান্ন আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল তখন মাঝে মাঝে ভয় হইতে লাগিল বুঝিবা কিছু ফ্যাসাদ ঘটে, হয়ত বা কোনও কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের বিষয় সংবাদ দিতেই কেহ গিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশেপাশের সিপাহিরা আমাদের খাটে আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। আমরা সেনাবারিকে নিজেদের রাজপুত বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। কেবল রাজপুত দিগের জন্যই বারানসীতে একটি স্কুল ও কলেজ ছিল। রাজপুত ভিন্ন আর কেহ সেখানে পড়িতে পাইত না, অথবা সেখানকার বোর্ডিংএ থাকিতে পাইত না। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটির কথামত আমরা নিজেদের এই রাজপুত কলেজের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। বারিকের সৈনিকেরা আমাদের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা অম্লান বদনে নিজেদের অমর সিং ও জগৎ সিং ইত্যাদি নাম বলিয়া দিলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেমন একটু ভয় হইতে লাগিল পাছে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে আমরা নেহাৎ বাঙ্গালী পরিচ্ছদে সেখানে যাই নাই। অমাদের একজনের মাথায় পাগড়ি ও আর একজনের মাথায় টুপি ছিল এবং পরণের কাপড় হিন্দুস্থানী ধরণে পরাছিল। আমি পাগড়ি ভাল বাঁধিতে পারিতাম না বলিয়া অধিকাংশ সময় টুপিই পরিতাম।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটি বলিয়াছিলেন যে একজন হাবিলদারের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন। এই হাবিলদারটির সহিত নাকি তিনি পূর্ব্বেই আমাদের বিষয় লইয়া কথা কহিয়াছেন এবং হাবিলদারও নাকি আমাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। ক্ষনিক পরে হাবিলদারের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। ইঁহার নাম দিল্লা সিং। দিল্লা সিং একটু সঙ্কোচের সহিতই আলাপ করিলেন এবং একটু পরেই একটা কাজ সারিয়া এখনই আসিতেছি বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। আমার কিন্তু দিল্লা সিংকে তখন হইতেই কেমন যেন ভাল লাগেনাই, এবং যখন দিল্লা সিং কাজের অছিলায় কোথায় চলিয়া গেলেন, আমি সভয়ে পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটিকে অতি সন্তর্পনে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিল্লা সিংকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় ত?" অবশ্য সৈনিকটি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে না দিল্লা সিং ভাল লোক। আমার যে দিল্লা সিংকে ভাল লাগিতেছে না এ কথা সে দিনও আমি ইঁহাদের কাহারও নিকট গোপন রাখি নাই। সে দিন দিল্লা সিং যতক্ষণ না পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ততক্ষণ কেবল ক্ষণে ক্ষণে আমার বন্ধুটিকে বলিতেছিলাম "কিহে, এ যে আসেনা, কোথায় গেল?" এবং পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আমরা দুজনাই মুচকি হাসিতেছিলাম। যাহা হউক আমাদের সংশয় দূর হইল, সেদিনের মত দিল্লা সিং পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। এমন সাধারণ কথাবার্ত্তায় সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল এবং পরে আমাদের সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবার মানসে দিল্লা সিং সেই পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটিকে লইয়া আমাদিগের সহিত সেনা বারিকের বাহিরে আসিলেন। দিল্লা সিং আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বারিকের আরও অন্যান্য সিপাহিদের সহিত এ বিষয় কথাবার্ত্তা কহিয়া রাখিবেন বলিলেন। দিল্লা সিং চলিয়া যাইবার পরও কিন্তু পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটি আরও কিছুক্ষণ আমাদের সহিত রহিলেন। ইঁহাকে দিল্লা সিংএর প্রতি আমার সন্দেহের কথা পুনরায় বলায়, আমাদিগকে এবিষয় নিঃসন্দেহ হইতে বলিলেন। তখন একজন হাবিলদারকে দলে পাওয়া গিয়াছে মনে করিয়া মনে মনে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিলাম। এইরূপ এই

সেনা বারিকে আমাদের যাতায়াত আরম্ভ হইল এবং মাস দুই একের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে আমরা ১০।১২ বার এইখানে যাওয়া আসা করিয়াছি। এই সকল সৈনিক দিগেরও অনেকেই সহরে আমাদের বাসায়ও আসিয়াছেন এবং আমরাও প্রতিবারই রসগোল্লা ইত্যাদি নানারূপ বাঙ্গলা মিষ্টান্ন দ্বারা ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি।

বোধ করি সারা ভারতে এমন কোনও সহর নাই যেখানে স্বদেশী বোমার দলের কথা কেহ না জানে; আমরাও যে সত্যই ঐরূপ বোমার দলের লোক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এই সব সৈনিকদিগকে বাড়ীতে আনাইয়া ইহা-দিগকে বোমা, রিভলভার, মশার পিস্তল ইত্যাদি দেখান হইয়াছে। ঐরূপ কিছুদিন যাওয়া আসার পর ইহাদিগকে পাঞ্জাবের সৈনিকদিগের মধ্যেও যে কিরূপ বিপ্লবায়োজন হইতেছে, বলা হইল। ইহাদের নিকট এই সকল ব্যক্ত করায় যে বিপদের সম্ভাবনা কতখানি ছিল তাহা আমরা জানিতাম, কারণ ইহাদের নিকট হইতে যদি সরকার পক্ষ ঘুণাক্ষরেও এই সব জানিতে পারে ত পঞ্জাবের সকল আয়োজন পণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু না বলিলেও সুবিধা হইত না; যখন ইহাদিগকে এইরূপ বলিলাম "যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস না কর ত তোমাদের কাহাকেও অল্প কয়দিনের জন্য পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দাও, আমরা আমাদের মতাবলম্বী সকল রেজিমেন্টের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিব" তখন আমাদের কথার উপর ইহাদের অনেকটা বিশ্বাস হইল। এই রূপে ক্রমে তিন চারিজন হাবিলদার ও জনকতক সিপাহীদের সহিত আমাদের পরিচয় হয়।

অধিকাংশ সময়ই আমরা সন্ধ্যার সময়ে অথবা :সন্ধ্যার পর বারিকে যাইতাম। কিন্তু দুই একবার দিবা দ্বিপ্রহরেও যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ একদিন আমরা দুইজন বারিকের অদূরে ঘন বৃক্ষশ্রেণীর ছায়াতলে অপেক্ষা করিতেছিলাম এবং আমাদের আর একজন বারিকের মধ্যে গিয়া দুই একজন সিপাহিকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন সঙ্গীটি ফিরিলেন না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম, ভয় হইতে লাগিল বুঝিবা কোনও বিপদ ঘটিয়াছে, এবং যদি সত্যই কোনও বিপদ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আর এখানে এরূপে অপেক্ষা করাওত যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু সঙ্গা-টিকেইবা ফেলিয়া যাই কেমন করিয়া; ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা আলোচনা করিতে লাগিলাম। যদিও আমাদিগের বিশেষ ভয় হইয়াছিল বটে তথাপি

ভয়ে আমরা অভিভূত হইয়া পড়িনাই, আমাদের বিশ্বাস এতটুকুও বিষাদের কালিমা আমাদের মুখে প্রকাশ পায় নাই। আর যতবারই বারিকে আমরা আসা যাওয়া করিয়াছি, কোন বারই সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যাওয়া আসা করিতে পারি নাই, প্রতিবারই যখন নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছি তখনই ভাবিয়াছি, যাক্—আজকার দিনও নিরাপদে কাটিল; কিন্তু পুনরায় আবার কতবার বারিকে গিয়াছি। যাহা হউক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন বন্ধুটি ফিরিলেন না তখন ভাবিলাম সত্যই বিপদ ঘটিল না কি! ভাবিলাম আমরা বাঙ্গালী, হাতে টুপি ও পাগড়ি, বারিকের অতি নিকটে গাছতলায় ভদ্রলোকের ছেলেরা বসিয়া রহিয়াছে, এই ঘন বৃক্ষরাজির পাশদিয়াই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে, যদি কোনও অফিসার আমাদিগকে এইরূপে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখে ত কি ভাবিবে! ইত্যাদি প্রকারের নানা কথাই আলোচনা করিতেছি, এমন সময় দেখি বন্ধুবর দুইজন সিপাহিকে লইয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমাদের মাথা হইতে যেন এক গুরু ভার নামিয়া গেল। ইহার পরে সকালেও দুই একবার এই বারিকের নিকট আসিয়াছি সিপাহিরা তখন কুচ কাওয়াজ করিতেছিল, আমাদেরই পরিচিত জনকএক হাবিলদার সেনা-পরিচালনা করিতেছিলেন দেখিয়া মনে হইল এই রেজিমেণ্ট আমাদেরই নিজস্ব। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যেন এই সকল আয়োজন, সম্মুখদিয়া দুই একজন ইংরাজ অফিসারও অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন, কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে, তখন ত কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহের লেশমাত্রও ছিল না।

একদিনের কথা বেশ মনে আছে। তখন আর একবার পঞ্জাব হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছি, বিপ্লবের আয়োজন সব সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, একদিন সেই ঘন বৃক্ষরাজির পদমূলে বসিয়া ইংরাজ সেনাবারিকের অতি সন্নিকটে ইংরাজ রাজত্বেরই উচ্ছেদকল্পে কি ভীষণ ষড়যন্ত্রই করা হইতেছিল। সেদিন জন তিনেক হাবিলদার ও নায়েক হাবিলদার ও আরও জন কতক সিপাহি সন্ধ্যার পর সেই বৃক্ষমূলে একত্র হইয়াছিলেন, আমরাও তিনজনা ছিলাম। এই বৃক্ষশ্রেণীর এক পাশ দিয়া রেলের লাইন এবং আর এক পাশ দিয়া গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। এই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পাশে খানিকটা মাঠের পর সেনা বারিক। জন কএক সিপাহি সড়কের ধারে বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া ছিলেন, যদি কাহাকেও সেদিকে আসিতে দেখেন অথবা ঐরূপ যদি কোনও সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় ত তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন।

আমরাও যথাসম্ভব বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া আসন্ন বিদ্রোহের দিন, সময় ও অন্যান্য অসংখ্য খুটিনাটির কথা আলোচনা করিতেছিলাম। মাঝে মাঝে এক কথায় ইহারা সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছিলেন। সেদিন যেন কত যুগের সঞ্চিত রোমান্স মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই অন্ধকারের মাঝে আবছায়ার মত আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল ; সেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর আবার সেই তাণ্ডব নৃত্যের মহা আয়োজন হইতেছে ভাবিয়া দেহ মন পুলক-ভরে সত্যই রোমাঞ্চিত হইতেছিল। সেদিন কত আন্তরিকতার সহিতই না তাঁহারা আমাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ঐরূপ ঘন বৃক্ষরাজির পাদমূলে ঐরূপ গোপনে আমাদের সহিত আলাপ করিবার সময় যদি সৈনিকদিগেরই কেহ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সকল বিষয় গোচর করাইয়া দিত তাহা হইলে ত কোর্টমার্শলে তাঁহাদের প্রাণ লইয়া কতই না বিপন্ন হইতে হইত। এই জন্যই সেদিন বৃক্ষমূলে আসিয়াই তাঁহারা ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কারণ ঐরূপ আয়োজনের মধ্যে যেন লুকোচুরির ভাবটা অতি সহজেই চোখে পড়ে, সেই জন্য আমি ঐরূপ বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করিবার প্রয়াসের বিরোধী হইয়াছিলাম এবং ঐরূপে বার বার সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে বারণ করিয়াছিলাম। আমরা যখন যেখানে ঐরূপ পরামর্শের জন্য নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করিতাম, তখন ইহা আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতাম যেন সহজ সরল ভাবটা সর্ব্বসময়ে বজায় থাকে। সেদিন কিন্তু ঐরূপ বারণ করা সত্ত্বেও যখন সিপাহিরা আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করিলেন তখন মনে মনে এই ভাবিলাম, যে ইহারা নিতান্ত সরলপ্রাণে ও অত্যন্ত আগ্রহভরেই এখানে আসিয়াছেন, এবং সত্যই এই বিপ্লবের আয়োজনে ইহারা আন্তরিকভাবে যোগ দিয়াছেন। তাই এইরূপে আমাদের নিকট আসা যাওয়া করায় তাঁহাদের প্রাণ লইয়াও টানাটানি হইতে পারে ইহা জানিয়াও, এই সকল বিপদ ঘাড়ে লইয়াও তাঁহারা আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের সহিত বিপ্লবায়োজনের পরামর্শ করিতেও পশ্চাদপদ হইতেন না। এইরূপ একবার নহে কতবারইনা তাঁহারা আমাদের নিকট আসিয়াছেন।

এদিকে যেমন আমরা সেনাবারিকে প্রবেশ লাভ করিলাম অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গলা দেশ হইতে ফিরিবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমেরিকা প্রত্যাগত এক মারাঠা যুবকের আগমনে পাঞ্জাবের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ

পাতাইবার এক নূতন সূত্র পাওয়া গেল। এই মারাঠা ব্রাহ্মণটির নাম পিঙ্গলে। ইহার সম্পূর্ণ মারাঠী নামটি এখন মনে নাই। স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে জাহাজেই ইহারা স্থির করেন যে পিঙ্গলে বাঙ্গলাদেশে গিয়া সেখানকার বিপ্লব দলের খোঁজ লইয়া পাঞ্জাবে আসিবেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদের সাহায্যে কলিকাতায় বিপ্লবদলের অনেক লোকের সহিতই ইনি দেখা করেন; ফলে পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজনের কথা কলিকাতাময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। এদিকে তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত আমাদের দলেরও সম্বন্ধ ছিল এবং এই সূত্রে পিঙ্গলেকে আমাদের দলে পাওয়া গেল। আমাদের দলের সংস্রবে আসিবামাত্রই তাঁহাকে সোজা কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিঙ্গলে বাঙ্গালাদেশে অনেকের নিকট বোমার সাহায্য চান। সে সময় সারা বাঙ্গলাদেশে প্রধানতঃ আমাদের কেন্দ্র হইতেই বোমা যোগান হইত। সেই জন্য বোমার খাতিরে পিঙ্গলের সহিত আমাদের বিশেষ ঘনিষ্টতা হইয়া যায়।

ঠিক এই সময় কাশীতে আমাদের মনে এইরূপ আশঙ্কা জাগিতেছিল, বুঝিবা পাঞ্জাবের সহিত পুনঃ সংযোগ স্থাপন নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িবে; ৫ই ডিসেম্বার পৃথ্বী সিংহের আসিবার কথা ছিল, পৃথ্বীসিং আসিলেন না এবং পাঞ্জাব হইতে আর কোন সংবাদ ও পাওয়া গেল না; এমন সময় পিঙ্গলেকে পাইয়া আমাদের মনে হইল যেন কতদিনের হারান নিধিকে ফিরাইয়া পাইলাম। পিঙ্গলেকে পাইয়া আমরা সত্যই বড় স্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম। পিঙ্গলের সমুন্নত বলিষ্ট দেহ, উজ্জ্বল গৌর কান্তি তাঁহার চোখ মুখের দীপ্তিতে সেই যে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার আভাস, সেদিন তাহা আমাদের মনে এক সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ইহাকে দেখিয়া, ইহার সহিত কথা বার্ত্তা বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহার দ্বারা আমাদের অনেক কাজ হইবে। অতীতের অনেক কথা স্মরণ পথে আসায় আজ যেন মনে হইতেছে যে দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ বলিয়া আমাদের ধারণা, প্রকৃত পক্ষে সে সম্বন্ধ কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠতর।

পিঙ্গলের সহিত মনুষ্য জীবনের আদর্শ বিষয়ে নানা কথা হইতে হইতে কেমন করিয়া মনে নাই গীতার কথা আসিয়া পড়ে, এবং সেই সময় গীতার কএকটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া যাওয়ায় আমরা বুঝিলাম গীতা তাহার কণ্ঠস্থ। তিনিও বলিলেন যে পূর্ব্বে যখন তিনি সাধু হইয়া গিয়াছিলেন তখন সমগ্র

গীতাটি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহাতে পিঙ্গলের অতীত জীবনের ইতিহাসের কিছু জানিতে চাহিলে, পরিধানের জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি পূর্ব্বে কেমন করিয়া সাধু হইয়া ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং পরে কেমন করিয়া পুনরায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্য আমেরিকা চলিয়া যান, তৎপরে সেখানে গিয়া কেমন করিয়া তিনি এই বিপ্লব দলের সংস্পর্শে আসেন, সব বলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

খদ্দরের গান

[শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত]

সাত পুরুষের মাটীর' পরে নিজের ঘরে যে ধন পাই,
সাত সাগরের ওপারে তা' কিসের দুঃখে ভিক্ষা চাই ?
মা-বোন আপন হাতের দানে ঘুচা'তে চান দেহের লাজ,—
সোনার মুকুট ধূলায় ফেলে' কোথায় খোঁজ' রাংএর সাজ !—
    হোক্‌না মোটা হোক্‌না খাটো, এ যে আমার দেশের দান—
    খদ্দরে দে ভদ্র ইতর মাথায় তুলে' রাজার মান। ঐ ॥
দেশের ভূঁয়ে কাপাস থুয়ে' করিস্ কোকো চায়ের চাষ,—
সন্ধ্যা দেওয়ার সল্‌তাটুকু তা-ও না নিজের ঘরে পাস্!
এই দেশেরই বউ-ঝিয়ারি কাট্‌ত সুতা মস্‌লিনের,
আজ কেন সে বিবির বেশে পুতুল হ'য়ে রয় চীনের ?
চর্‌কা ছেড়ে' খড়-পাকাটীর ব্যবসা চলে কোথায় আর,—
গলায় দড়ির কোষ্ঠা পেতে' দৃষ্টি হীনের চেষ্টা কার ?
কোন্ দেশে কার্ পত্নী মরে লাজ-না-ঘোচার আপ্‌শোষে ?
অন্নহীনের শব-ঢাকারও চীর জোটেনা কার্ দোষে ?
কোন পুরুষের আঙুল কাটা,—দূর হ'ল না জুজুর ভয়,—
দেড়শো বছর তুলোর মত তাই সয়ে' কার গোষ্ঠি রয় ?
কোথায় পুরুষ কোথায় নারী,—ঘর-জুড়ে' দে চর্‌কা-তাঁত,
তিরিশ কোটীর লাগারে ভীড়, গড়ুক্ জোলা-তাঁতির জাত।

এক ক'রে দে গরীব-ধনী,—ঘুচুক্ বিলাস—ভূষার মান ;
ধর্ম্মে কর্ম্মে মনে মর্ম্মে মিলুক্ হিন্দু-মুসলমান ;
সখ্যে মিলুক্ রায়ৎ রাজা, ঐক্যে করুক্ দ্বন্দ্বক্ষয় ;
বাক্যে—সকল নির্ভয়ে বল্—'গান্ধী-মহারাজার জয় !'

সত্য ও মিথ্যা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে থিয়েটার কেবল আনন্দ নয়, লোক শিক্ষারও সাহায্য করে। বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর বইখানা এক সময়ে বাঙলার ষ্টেজে প্লে হইত। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া এক ব্যক্তি ইংরাজ নীলকর অতিশয় কদাচারী বলিয়া ইহাতে লেখা আছে। কর্ত্তাদের হঠাৎ একদিন চোখে পড়িল ইহাতে ক্লাস হেট্রেড নাকি এমনি একটা ভয়ানক বস্তু আছে যাহাতে অরাজকতা ঘটিতে পারে। অতএব, অবিলম্বে বইখানা ষ্টেজে বন্ধ হইয়া গেল। থিয়েটার-ওয়ালারা দেখিলেন ঘোর বিপদ। তাঁহারা কর্ত্তাদের দ্বারে গিয়া ধন্না দিয়া পড়িলেন, কহিলেন, হুজুর, কি অপরাধ? কর্ত্তারা বলিলেন লরেন্স ফষ্টর নামটা কিছুতেই চলিবে না, ওটা ইংরাজি নাম। অতএব, ওটা ক্লাশ হেট্রেড। থিয়েটারের ম্যানেজার কহিলেন, যে আজ্ঞা প্রভু। ইংরাজি নামটা বদলাইয়া এখনি একটা পর্ত্তুগীজ নাম করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি ডিক্রুজ্ না ডিসিল্‌ভা না কি এমুনি একটা—যা মনে আসিল অদ্ভুত শব্দ বসাইয়া দিয়া কহিলেন এই নিন্।

কর্ত্তা দেখিয়া কহিলেন, আর এই "জন্মভূমি" কথাটা কাটিয়া দাও—ওটা সিডিশন্।

ম্যানেজার অবাক হইয়া বলিলেন, সে কি হুজুর, এ দেশে যে জন্মিয়াছি।

কর্ত্তা রাগিয়া বলিলেন, তুমি জন্মাইতে পার কিন্তু আমি জন্মাই নাই। ও চলিবে না।

'তথাস্তু' বলিয়া ম্যানেজার শব্দটা বদ্‌লাইয়া দিয়া, প্লে পাশ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। অভিনয় সুরু হইয়া গেল। ক্লাস হেট্রেড হইতে আরম্ভ

করিয়া যায় সিডিশন পর্য্যন্ত বিদেশী রাজ-শক্তির যত কিছু ভয় ছিল দূর হইল, ম্যানেজার আবার পয়সা পাইতে লাগিলেন, যাহারা পয়সা খরচ করিয়া তামাসা দেখিতে আসিল তাহারা তামাসার অতিরিক্ত আরও যৎকিৎকিৎ সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিল—বাহির হইতে কোথাও কোন ত্রুটি লক্ষিত হইল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুটা ছলনায় ও অসত্যের কালিতে কালো হইয়া রহিল। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া হয়ত কেহ ছিল না, ম্যানেজারের কল্পিত অদ্ভূত পর্ত্তুগীজ নামটি মিথ্যা। ব্যাপারটাও তুচ্ছ, কিন্তু ইহার ফল কোনমতেই তুচ্ছ নয়। স্বর্গীয় গ্রন্থকারের বোধ করি ইচ্ছা ছিল সে-সময়ে বাঙ্লা দেশে ইংরাজ নীলকরের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত হইত তাহারই একটু আভাস দেওয়া। ইহারই অভিনয়ে ক্লাস হেট্রেড জাগিতে পারে রাজ-শক্তির ইহাই আশঙ্কা। আশঙ্কা অমূলক বা সমূলক এ আমার আলোচ্য নয়, কিম্বা ইংরাজ নামের পরিবর্ত্তে পর্ত্তুগীজ নাম বসাইলে ক্লাস হেট্রেড বাঁচে কি না সেও আমি জানি না,—ইংরাজের আইনে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে—কিন্তু যে আইন ইহারও উপরে যাহাতে 'ক্লাস' বলিয়া কোন বস্তু নাই তাহার নিরপেক্ষ বিচারে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করিলে যে বস্তু মরে তাহার দাম ক্লাস হেট্রেডের চেয়েও অনেক বেশি। সেদিন দেখিলাম এই ছোট ফাঁকিটুকু হইতে ছোট ছেলেরাও অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদের সামান্য পাঠ্য পুস্তকেও এই অসত্য স্থান লাভ করিয়াছে। নূতন গ্রন্থকার আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিলাম এই আশ্চর্য্য নামটি আপনি সংগ্রহ করিলেন কিরূপে? গ্রন্থকার সলজ্জে কহিলেন প্রাণের দায়ে করিতে হয় মশায়। জানি সব, কিন্তু গরিব মানুষ, পয়সা খরচ করিয়া বই ছাপাইয়াছি তাই ওই ফন্দিটুকু না করিলে কোন স্কুলে এ বই চলিবে না।

তাহাকে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিলাম যে রাজ্যের শাসন-তন্ত্রে সত্য নিন্দিত, যে দেশের গ্রন্থকারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়, লিখিয়াও ভয়ে কণ্টকিত হইতে হয়, সে দেশে মানুষে গ্রন্থকার হইতে চায় কেন? সে দেশের অসত্য-সাহিত্য রসাতলে ডুবিয়া যাক্ না! সত্যহীন দেশের সাহিত্যে তাই আজ শক্তি নাই, গতি নাই, প্রাণ নাই। তাই আজ সাহিত্যের নাম দিয়া দেশে কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ দেশের রঙ্গ-মঞ্চ ভদ্র-পরিত্যক্ত পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য! সে না দেয় আনন্দ, না দেয় শিক্ষা। দেশের

রক্তের সঙ্গে তাহার যোগ নাই, প্রাণের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের আশা ভরসার সে কেহ নয়—সে যেন কোন্ অতীত যুগের মৃত দেহ। তাই পাঁচশত বছর পূর্ব্বে কবে কোন্ মোগল পাঠানকে জব্দ করিয়াছিল, এবং কখন কোন সুযোগে মারহাট্টা রাজপুতকে খোঁচা মারিয়াছিল সে শুধু ইহারি সাক্ষী এ ছাড়া তাহার দেশের কাছে বলিবার আর কিছুই নাই! দেশের নাট্টকার গণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখন সত্য ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে, তাই সত্যবর্জ্জিত নাট্টশালা আজ দেশের কাছে এমনি লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন। রুল ব্রিটানিয়া গাহিতে ইংরাজের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু 'আমার দেশ' আমার দেশে নিষিদ্ধ। এই যে আজ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপিয়া ভাবের বন্যা ও কর্ম্ম ও উদ্যমের স্রোত বহিতেছে নাট্যাগারে তাহার এতটুকু স্পন্দন এতটুকু সাড়া নাই। দেশের মাঝখানে বসিয়াও তাহার দরজা জানালা ভয় ও মিথ্যার অর্গলে আজ এম্‌নি অবরুদ্ধ যে দেশ-জোড়া এতবড় দীপ্তির রশ্মি-কণাটুকু তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই। কিন্তু কোন্ দেশে এমন ঘটিতে পারিত! আজ মাতৃভূমির মহাযজ্ঞে বুকের রক্ত যাহারা এমন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, কোন্ দেশের নাট্টশালা হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আজ এমন করিয়া বারিত হইতে পারিত! অথচ সমস্তই দেশেরই কল্যাণের নিমিত্ত! দেশের কল্যাণের জন্যই আজ দেশের নাট্টকার গণের কলমের গাঁটে গাঁটে আইনের ফাঁশ বাঁধা। এবং এমন কথাও আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে যে দেশের কবি, দেশের নাট্টকারগণের অন্তর ভেদিয়া যে বাক্য, যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শক্তি নাই। বিদেশী রাজপুরুষের মুখ হইতে এ কথাও আজ আমাদের মানিয়া চলিতে হইতেছে! কিন্তু এই নির্ব্বিচারে মানিয়া চলার লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশের আজ সময় আসিয়াছে। এবং ইহা কি শুধু একা আমাদেরই ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে? যে ইহা চালাইতেছে সে ছোট হয় নাই? আমরা দুঃখ পাইতেছি কিন্তু মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখাইবার দুঃখ ভোগ সেই কি চিরদিন এড়াইয়া যাইবে? ঋণ পরিশোধের দুঃখ আছে,—আজ আমাদের ডাক পড়িয়াছে, কিন্তু দেনা শোধ করিবার তলব যেদিন তাহার ও ভাগ্যে আসিবে সেদিন তাহারই কি মুখে হাসি ধরিবে না!

ব্যাপারটা কাগজে কলমে লোকের চোখে কি ঠেকিতেছে ঠিক জানি না, হয়ত এই বাঙলা দেশেই এমন মানুষ ও আছেন যাঁহাদের কাছে আগাগোড়া

তুচ্ছ মনে হওয়াও বিচিত্র নয়, এবং যদি তাই হয়, তবুও আরও এম্‌নি একটা তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এপ্রসঙ্গ এবারের মত বন্ধ করিব। সেদিন University Institute এ কবিতা আবৃত্তির ছেলেদের মধ্যে একটা প্রতি-যোগিতার পরীক্ষা ছিল। সর্ব্বদেশ পূজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক কবিতাটি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল।

তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে এই সুদীর্ঘ কবিতার যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ,—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী যেথায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কুকার্য্য কে করিল!

ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে, নির্ব্বাচনের ভার যাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা।

মনে করিলাম, রত্ন ইঁহারা চিনেন না, তাই, এও বুঝি সেই চোব্‌রা আঁটির ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা সমস্তই জানেন, তবে কিনা ওতে দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা আছে তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা সিডিশন্‌।

কহিলাম কে বলিল?

ছেলেটি জবাব দিল আমাদের কর্ত্তৃপক্ষরা।

যাক্‌,—বাঁচা গেল। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্ব্বাচীন শিশুগুলার মঙ্গল চিন্তা করিতে এ পক্ষেও পাকা মাথার অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম আচ্ছা, তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না?

সে কহিল, পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন পারা উচিত নয়, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল,—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে প্রকাশ্য সভায় তাহার অবৃত্তি সিডিশন্‌,—তাহা অপরাধের। এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে এবং কর্ত্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই, যে ফ্যাসাদ বাধিতে পারে। (ক্রমশঃ)

সুখের ঘরগড়া

দ্বিতীয় ভাগ।

(তারার কথা।)

যজ্ঞেশ্বরী পল্লীবাটী ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভবানীপ্রসাদ পঞ্চুর সহিত দেখা করিতে গিয়া তর্কসিদ্ধান্তের কাছে শুনিলেন পঞ্চু যজ্ঞেশ্বরীকে লইয়া কলিকাতা গিয়াছে; অনুসন্ধানে জানিলেন তখনও আধঘণ্টা হয় নাই। যাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা না পাওয়াতে ভবানীপ্রসাদ বড় ক্ষুন্ন হইলেন। যজ্ঞেশ্বরী যে অকস্মাৎ তাঁহাকে না জানাইয়া চলিয়া যাইবেন ইহাই বেশী সম্ভব তবু যেন তাহার মনে হইল এই দেখা না হওটায় তাঁহারই ক্রটী হইয়াছে; ভবানীপ্রসাদ মনে মনে তর্ক করিয়া দেখিলেন তখন বেলা এগারটা আন্দাজ, কিন্তু গাড়ী ১১।১৫ মিনিটের সময় ষ্টেশনে পৌছিয়াও অন্ততঃ তিন কোয়াটার তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে হইবে; সুতরাং তখনি রওনা হইলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। বেশ বদলাইবার চিন্তা না করিয়া তিনি খালি গায়ে চটী পায়ে সরকারী সড়ক ধরিয়া ষ্টেশনের অভিমুখে চলিলেন।

নেউগী পুকুরের কাছে আসিয়া তত্রস্থ দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন এ পথ দিয়া দুটা পাল্কী ষ্টেশন অভিমুখে কতক্ষণ গিয়া থাকিবে। কিন্তু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আগেই ঘাট হইতে একটা অস্ফুট বালিকাকণ্ঠ নিঃসৃত চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক বৃদ্ধা রমণী পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছেন আর এক কিশোরী সুন্দরী বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে টানিয়া উপরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। বাক্যব্যয় না করিয়া জুতা ফেলিয়া ভবানীপ্রসাদ ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধাকে টানিয়া তুলিলেন। বৃদ্ধা আঘাতে সংজ্ঞা হারাইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। বালিকা ভবানীপ্রসাদকে চিনিল; ভবানীপ্রসাদও তাহাকে কতকটা চিনিলেন তবু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সে তাঁহাদেরই বাড়ীর বাউনঠাকুরাণীর মেয়ে সন্ধ্যামনি। কি করিয়া তাহার ঠাকুরমা পড়িয়া গেল জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শুনিলেন, জলে নামিতে গিয়া পিচ্ছিল ধাপে পা ফস্‌কাইয়া গিয়া পড়িয়া

গিয়াছে। সিড়ির ধাপের উপর বৃদ্ধাকে ধরিয়া বসাইলে সে বসিতে পারিলনা কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল; সন্ধ্যা ঠাকুরমাকে গতপ্রাণা ভাবিয়া হেট হইয়া কাণের কাছে মুখ দিয়া ব্যাকুল হইয়া বার কতক ঠাকুরমা ঠাকু'মা করিয়া ডাকিল, সাড়া না পাইয়া বুড়ী মরিয়া গিয়াছে স্থির করিয়া সন্ধ্যা বসিয়া পড়িয়া ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভবানীপ্রসাদ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "কেঁদনা, তোমার ঠাকুরমার মন্দ কিছু হয়নি; শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন; এখনি জ্ঞান হবে"। এই আশ্বাস বাক্যে সন্ধ্যা যে কত শান্তিলাভ করিল তাহা তাহার সরল সজল ছুটী চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল। ভবানী তাহাকে বলিল "চল একে বাড়ী নিয়ে যাই—তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলো কত দূরে বাড়ী?" "ওই বাগান পেরিয়ে,—কাছেই।" ভবানী বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘাট পার হইয়া চলিল। ষ্টেশনে যাওয়ার মতলব ছাড়িতে হইল।

বাড়ী পৌছিয়া সন্ধ্যা দাওয়াতে একটা মাদুর বিছাইয়া ছিল, ভবানীপ্রসাদ বৃদ্ধাকে তাহাতে শোয়াইলেন; এবং সন্ধ্যাকে বলিলেন, "তুমি চট্‌করে একখানা শুক্‌না কাপড় এনে পরিয়ে দাও তোমার মা কোথা!" সন্ধ্যা বলিল, "মা তো আপনাদের বাড়ীর কাজে গেছে।" ঠিক সেই সময় সন্ধ্যার ছোট ভাই নীলু কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত; সন্ধ্যা তাহাকে বলিল, "নীলু মাকে শীগ্‌গির ডেকে আন্, ঠাকুমা জলে ডুবে গিছ্‌লো—"এই বলিয়াই সে ভবানীর মুখের দিকে তাকাইয়া অতি সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল "মাকে ডেকে আন্‌বে?" ভবানী উত্তর করিল—"নিশ্চয়ই; তা আবার বল্‌তে?" নীলু ছুটিয়া বাহির হইয়া মাকে আনিতে গেল। ভবানী জলমগ্ন অজ্ঞান ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার পদ্ধতি প্রক্রিয়া জানিত তাহার প্রয়োগ ফলে বৃদ্ধার জ্ঞান সঞ্চার হইল। সন্ধ্যাকে দিয়া একটু গরম দুধ আনাইয়া খাওয়াইয়া দিলেন। তারপর তাহার গায়ে একটা মোটা কাঁথা চাপা দিয়া কাছে বসিয়া তারামণির আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল ও সন্ধ্যার সহিত কথা জুড়িয়া দিল। একটা ঘটনা লক্ষ করিয়া ভবানী এই মেয়েটীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইল। বৃদ্ধাকে লইয়া আসিবার সময় ভবানী চাতালে দণ্ডায়মান দোকানদারকে ডাকিয়া বলে—"ওহে আমার জুতো জোড়াটা রেখে দিওতো"। দোকানী নাকে তিলক পড়া মালা-ধারণ করা বৈরাগীনন্দন তখন মালা জপিতেছিল। এসময় গো-চর্ম্ম নির্ম্মিত জুতা স্পর্শে শুচিবিভ্রাট

ঘটিবার ভয়ে সে কথাটা তত গ্রাহ্য করিল না ; সন্ধ্যা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল ; সে নীরবে জুতা জোড়াটী ভবানীর অলক্ষ্যে তুলিয়া লইয়া সঙ্গে আনিয়াছিল।

তারামনি সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া বাড়ী আসিলে, ভবানী তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া এবং তাহার পিসি তখন ভাল আছেন, আর ভয় নাই আশ্বাস দিয়া চলিয়া যাইবে এমন সময় সন্ধ্যা জুতা জোড়াটী আনিয়া নতমুখে ভবানীর পায়ের কাছে ধরিয়া দিল। ভবানী জানিত জুতা দোকানেই আছে অথচ এখানে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "জুতা কোথা হতে এলো ?" সন্ধ্যা তেমনি নতমুখে মৃদুভাবে বলিল—"দোকানী তুললেন না দেখে আমি নিয়ে এসেছিলাম"। "ছিঃ কেন আনতে গেলে হাতে করে ? তোমার কাছে যে খাবার জলের কলসী ছিল ?" সন্ধ্যা কি উত্তর দিবে ? তারামণি কৃতজ্ঞতা ভরা গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল—"তাতে দোষ হয় নি কিছু কলসীর ও-জল আমাদের কাছে আজ গঙ্গাজল তুল্য হয়েছে"। ভবানী উত্তর শুনিয়া লজ্জিত হইয়া "না ও কথা বলনা বাউন মা"। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ভবানীপ্রসাদ চলিয়া গেল। পথে আসিতে এই দুঃখিনী বিধবার সংসারটীর আর সংসারের মধ্যে এই কন্যারত্নটীর কথা ভাবিতে লাগিলেন! খুবই সদ্বংশের মেয়ে যে এই মা ও মেয়ে তা আজ একটী ঘটনায় তাহার প্রমাণ তিনি পাইলেন।

(ক্রমশঃ)

ডালি

[ওকাকুরার Ideals of the East হইতে]

ইউরোপ আজ বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তির বলে তোলপাড় হয়ে রয়েছে কিন্তু তাই ব'লে এসিয়ার শান্ত সরল জীবনকে তার সঙ্গে তুলনা কর্ত্তে লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচের কোন দরকারই নাই। আমাদের এই বাণিজ্য বিপুল প্রাচীন জগৎ, গ্রাম্য শিল্পী ও পণ্য ব্যবসায়ীর এই কর্ম্ম মুখের ভূভাগ,—যেখানে গ্রামে গ্রামে হাট বসে, যেখানের দেবতার উৎসবে মেলা হয় দেশের পণ্য সম্ভার বুকে করে ছোট ছোট তরণী বিশাল নদ নদী মালার উপরে ভেসে ভেসে বেড়ায় যেখানে প্রাসাদে ও রাজ সভায় বণিককুল আপন আপন মণিরত্ন ও অন্যান্য মহার্হ বস্তু সম্পদে যবনিকার অন্তরালবর্ত্তিনী "ললিতলবঙ্গলতা" ললনাগণকে রত্ন সমুদয় ক্রয় করবার জন্য প্রলুব্ধ করে—আমাদের সে জগৎ এখনও সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ে নাই। বাইরে তার আকৃতির পরিবর্ত্তন যতই হ'ক না কেন একটা গুরুতর ক্ষতি না হওয়া পর্য্যন্ত এসিয়া তার আধ্যাত্মিকতাকে ম'রতে দিতে পারে না। কেন না সমগ্র শ্রমশিল্প, যুগযুগান্তরের পৈত্রিক সম্পত্তি, এখনও তারই, এবং সম্পত্তি ত্যাগ করতে হ'লে, এর সঙ্গে, কেবল যে শিল্প সৌন্দর্য্য হারাতে হবে তা নয়, শিল্পীর আনন্দ, তাররূপ দর্শনের স্বাতন্ত্র্য ও সেই সৌন্দর্য্যের মানুষ তৈরি করবার সমগ্র ক্ষমতা এ সমস্তই লোপ পাবে। স্বহস্ত নির্ম্মিত তন্তুজালে নিজেকে ঘিরে ফেলার অর্থ আপন ঘরে আপনাকে বদ্ধ ক'রে রাখা—আত্মশক্তির বিকাশের জন্য।

কালের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে গ্রাস করাই সার ধর্ম্ম। সেই বাষ্পীয় যন্ত্রের তাণ্ডব আনন্দ এসিয়া এখনও জানে না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজকের ভিতর দিয়ে প্রকৃত ভ্রমণের নিগূঢ় সার পদার্থটিকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে; যিনি গ্রাম্যগৃহিণীগণের নিকটে ভিক্ষা করে অথবা সন্ধ্যা সমাগমে গাছের তলে বসে স্থানীয় যুবক দলের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান সেই ভারতীয় সন্ন্যাসীই প্রকৃত ভ্রমণকারী। পল্লী মায়ের শান্ত কোমল সহজ শোভাই তাঁর কাছে একমাত্র দৃশ্য নয়। তিনি অন্তত মুহূর্ত্তের জন্যও একদিন না একদিন সংসারের সুখ দুঃখের বোঝা নিজেই বহন করেছেন; তার হৃদয়ে আজও যে ভালবাসা ও কমনীয়তার মধু রয়েছে,

তা মানবের উপর, তার জন্মগত সংস্কারের উপর, আচার পদ্ধতি সমাজ রীতির উপর রক্ষিত হয়ে পড়ে। সেই মহামানবের সঙ্গে একটা সংযোগের ডোর এই পল্লীশোভা গেঁথে দেয়।

আবার দেখি জাপানে কৃষকভ্রমণকারী কোন সুন্দর জায়গায় গেলে, ছোটগান তৈরী না ক'রে—সরল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি না ক'রে, সেখান থেকে চলে যায় না।

এই রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রাচ্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিণত ও জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে,শান্ত বীর্য্যবান মানবতার ভাব ও চিন্তাকে একতানে ঝঙ্কৃত ক'রে তোলে। প্রাচ্যে এই রকম আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই মনুষ্যের পরস্পর সংশ্রবের অভিব্যক্তি ; মুদ্রিত পুস্তকই এখানে সভ্যতার চিহ্ন নয়। :

বৈষম্যের দীর্ঘধারা এমনি ক'রে যতদূর ইচ্ছা জড়ান যেতে পারে ; কিন্তু এসিয়ার গৌরব শুধু তাতেই নয় ;—এ হ'তে আরও একটা জলন্ত সত্যের দিক আছে, এসিয়ার শুভ্রগর্ব্ব, প্রত্যেক হৃদয়ে যে শান্তির স্পন্দন হচ্ছে, সেই স্পন্দনে সেই প্রাণ বায়ুতে, এসিয়ার গৌরব সেই সাম্যের মহিমাময় একতায় যার জন্য সম্রাট ও কৃষক একপ্রাণ ; এসিয়ার বিমল অহঙ্কার সেই সুমহান্ একত্ববিশ্বাসে, প্রেম, ও বিশ্বজনীন সচ্ছলতা যার ফল, যার ফলে জাপান সম্রাট তাকাকুরা তুষারশীতল রজনী অনাবৃত বস্ত্রে যাপন ক'রতেন, কেননা তাঁর দরিদ্র প্রজা শীতে জড়ীভূত, অথবা তাই সে আহার পরিত্যাগ ক'রেছিলেন কেন না প্রকৃতিপুঞ্জ দুর্ভিক্ষ ক্লেশে পীড়িত। বিশ্বের শেষ পরমাণু পর্য্যন্ত যতক্ষণ অনন্দের রাজ্যে যেতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণলাভ ক'রতে না দিয়ে যে ত্যাগের স্বপ্ন বোধিসত্ত্বকে বিচিত্র ক'রে তুলেছে তাতেই সেই গৌরব। যে স্বাধীনতা কালিমাময়ী মূর্ত্তিতে মহত্বে 'স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলা' ক'রে তোলে, ভারতীয় রাজাকে যোগীর ন্যায় বেশ ভূষায় কঠোরতা শিখিয়ে দেয় ; চীনদেশে এমন রাজসিংহাসন গ'ড়ে তোলে যার অধিপতিকে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিপতিকে, কখন তরবারি ব্যবহার ক'রতে হয় না, সেই স্বাধীনতার উপাসনাতেই ত এসিয়ার গৌরব।

এই সবই হচ্ছে এসিয়ার জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্যকলার গুপ্ত আত্মশক্তি। প্রাক্তন সংস্কার থেকে বিচ্যুত হয়ে, ভারতবর্ষ আজ জাতীয়তার সারভূত ধর্ম্মজীবন বিসর্জ্জন ক'রলে যা নীচ, যা মিথ্যা, ও যা নূতন তারই উপাসক হয়ে প'ড়বে। চীন, নৈতিক সভ্যতার বদলে লৌকিক সভ্যতায় মত্ত হয়ে উঠে,

প্রাচীন আত্ম সম্মানও নীতিকে বিসর্জ্জন দেবে,—যে নীতি অনেক কাল আগেই দেশীয় বণিকদের মুখের কথাকেই পশ্চিমের লিখিত দলিলের মত প্রামাণ্য করে তুলেছিল এবং কৃষি সম্পৎ একার্থবোধ বা শব্দের মত ক'রে দিয়েছিল। তা হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসিয়ার আজকার কর্ত্তব্য—এসিয়ার রীতিনীতি রক্ষা করা ও যা নষ্ট হয়েছে তা ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু তা ক'রতে হলে, তাদের প্রথমে নিজে নিজে ঐ আচার পদ্ধতির জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে নিতে হবে। কারণ যা অতীতের ছায়া, তাই আবার ভবিষ্যতের আশা। বীজে যে শক্তি নিহিত আছে, তা থেকে বেশী শক্তি কোনও গাছের হ'তে পারে না। চিরদিন অন্তর্মুখী হওয়াটাই জীবন। কত ভগবদভক্তই না এ সত্যের প্রতিধ্বনি ক'রেছেন, Delphic oracles এর সব চাইতে বড় কথা "নিজেকেই জান" "তোমাতেই সব" এই হচ্ছে কনফুসিয়সের শান্তির বাণী "আত্মানং বিদ্ধি তত্ত্বমসি" এই একই সত্যের আহ্বান নিয়ে ভারতে যে একটি কথিত প্রচলিত রয়েছে তা আরও প্রাণস্পর্শী। বৌদ্ধেরা বলেন যে একদিন ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যগণকে নিয়ে যখন বসেছিলেন তখন মহাজ্ঞানী বজ্রপাণি ভিন্ন আর সকলের চোখ হঠাৎ আলা মালায় ঝলসে দিয়ে এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। তিনি মহাদেব শিবশঙ্কর। সাথের সাথীরা অন্ধ হয়ে পড়লো দেখে বজ্রপাণি ভগবানেরদিকে চেয়ে বললেন "দেব বলুন আমাকে এতদিন সমগ্র নক্ষত্র ও দেবতার মধ্যে—সংখ্যায় যারা গঙ্গার বালুকণার সমান, তাঁদের মধ্যে এই জলন্ত শরীর দেখতে পাই নাই কেন? ইনি কে?" বুদ্ধ বললেন "তিনি তুমিই;" এবং বজ্রপানি তখনই ভূমায় মিশিয়ে গেলেন।

এই আত্মবোধের সামান্য কণিকাই জাপানকে পুনর্জ্জীবিত করেছে এবং যে ঝড়ে প্রাচ্যজগতের এতটা ডুবে গিয়েছে সেই ঝড় সইবার শক্তি দিয়েছে। সেই আত্মজ্ঞানের নবজাগরণই এসিয়াকে ধৈর্য্যশালী ও বীর্য্যবান করে গড়ে তুলবে চারিদিক থেকে আশার শতধারা বর্ত্তমান যুগকেবিহ্বল করেছে। বহু তত্ত্ব সমাচ্ছন্ন "মোহন্ধ" রাজত্বের সময়েও জাপান আপন ভবিষ্যতের সূত্রটিকে ঠিক করে ধরতে পারে নাই, তবে অতীত নির্ম্মলও বাধারহিত ছিল।

* * * *

কিন্তু আজ প্রাচ্যজগতের ভাবরাশি আমাদের অস্থির কচ্ছে, সত্যাই রাজদ্রোহের Revolution সঙ্গে সঙ্গে জাপান তার প্রার্থিত নবজীবন নিয়ে অতীতে ফিরে গিয়েছে বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া হয়েছে, যেন সত্যের পুনঃ

প্রতিষ্ঠার মত কেননা আশিকগো যা আরম্ভ করেছিলেন সেই কলা সৌন্দর্য্যের প্রকৃতির নিকট আত্মত্যাগ আজ এসে জাতির নিকট মানুষের নিকটে দাঁড়িয়েছে।

আমরা স্বভাবতই জানি যে, আমাদের ভবিষ্যতের পথের খোঁজ আমাদের ইতিহাসেই আছে এবং আমরা অন্ধের মত সেটাকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু যদি ভাব সত্য হয়, যদি অতীতেই নবজীবনের অমৃত উৎস লুকিয়ে থাকে, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এই মুহূর্ত্তে একটা মহান্ নবশক্তির প্রেরণায় বিশেষ দরকার, কেননা বর্ত্তমানের নীচতা ও ক্ষুদ্রতার জালা, জীবন ও সৌন্দর্য্যকে শুষ্ককণ্ঠ করে ফেলেছে।

সৌদামিনীর যে প্রভাময় তরবারি খানা আজ অন্ধকারকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেল্‌বে তারই অপেক্ষায় বসে আছি, এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গতে হবে, নববলের বাধা সম্পাত ধরণীর শুষ্ক হৃদয় সরস হ'য়ে উঠবে তবেইত তার হৃদয় নবীনকুসুমের পেলবকান্তিতে শোভাময় হতে পারবে। কিন্তু সত্যের মহান্ আহ্বান শুনতে পাওয়া যাবে এসিয়া থেকেই, জাতীয়তার প্রাচীন রাজপথে চলেই।

চাই ভেতর হতে জয়, অথবা বাহির থেকে এক মহান্ মৃত্যু।

নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ।

বীরভাবের কথা

[লেখক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

খৃষ্টের মুখ লইতেও একথাটি আমরা শুনিতে পাই—I came not to send peace, but a sword—তিনি শান্তিস্থাপনের জন্য আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন অসি হাতে যুদ্ধের জন্য। শুধু কথায় নয় কার্য্যতঃ ও এক সময়ে কশাঘাতে তিনি যেরুসালেমের বণিকদিগকে তাহাদের পণ্যশালা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। তবুও খৃষ্টের ধর্ম্ম শক্তিধর্ম্ম ছিল না, তাহা ছিল অতিমাত্রই প্রেমের ধর্ম্ম। আবার বুদ্ধ যাঁহাকে আমরা জানি করুণারই অবতার বলিয়া, যিনি বিশ্বের দুঃখে কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে ততখানি কান্তস্বভাব ছিলেন না, যতখানি ছিলেন শক্তির বিভূতি—শুধু তাহাই নয়, শাক্যসিংহের মধ্যে যে শক্তি খেলিয়াছে তাহা শান্ত রসাস্পদ বলিয়া মনে হয় না, তাহার প্রতিষ্ঠা তাহার প্রাণ বীরভাব, এমন কি একটা রুদ্রভাবেরই মধ্যে। তাঁহার সাধন-প্রণালী, তাঁহার কর্ম্মের ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন এক তপ্ত তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যখন বোধিদ্রুমতলে প্রায়োপবেশনে বসিলেন, যখন তাঁহার অন্তরাত্মা গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল, "এই আসন গ্রহণ করিলাম, শরীর যায় আর থাক সিদ্ধি ব্যতিরেকে এখান হইতে উঠিব না"—ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—তখনই পাই বুদ্ধের প্রাণের ধর্ম্মের ইঙ্গিত। পুরাতন বৈদিকধর্ম্মকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন; কোন ভগবান, কোন দেবতা, কোন কিছু সত্তার উপর ভর করিয়া তিনি তাঁহার সাধনাকে দাঁড়াইতে দেন নাই—তাঁহার ধর্ম্ম নিরালয়, এক উগ্র তপঃ-শক্তির বলে ক্ষণিকবেদনাসমষ্টি এই যে সৃষ্টি তাহাকে ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাপিত হওয়া, শূন্যে মিলিয়া যাওয়াই নিঃশ্রেয়স।

মানুষ কি বলে, কি ভাবে, কি চায়, কি করে, সেই বস্তুর মধ্যে প্রকৃত মানুষটিকে ঠিক ততখানি পাই না, যতখানি পাই সেই বলার, সেই ভাবার সেই চাওয়ায়, সেই করার ভঙ্গিমার মধ্যে। অন্তরাত্মার যে মূলভাব, যে বিশিষ্ট আবেগটী তাহা অঙ্কিত হইয়া চলিয়াছে স্থূল উপকরণাদির গঠনের চলনের ভঙ্গিমারই মধ্যে—মানুষকে চিনিতে হইলে, পূর্ণরূপে চিনি এই জিনিষটির সহায়ে। কারণ আর সকল জিনিষ মানুষ সহজেই আহরণ করিতে পারে, বাহির হইতে অন্যের নিকট হইতে জ্ঞানতঃ হউক অজ্ঞানতঃ হউক ধার করিয়া লইতে পারে—আর সব জিনিষ সম্বন্ধে মানুষ ভাণ করিতে পারে, আপনাকে লুকাইতে পারে কিন্তু ভঙ্গীর মধ্যে সে চিরদিনই আসিয়া ধরা পড়ে। তাই ফরাসী মনীষী বুফন (Buffon) বলিয়াছেন—Le style c'est l'homme—রচনার যে ভঙ্গী সেখানেই রহিয়াছে সমগ্র মানুষটি। জগৎকে সে কোন দৃষ্টিতে দেখিতেছে, তাহার জীবনের শাস্ত্র কি তন্ত্র কি সমস্তই প্রতিফলিত এই style এর মধ্যে। এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রাণের ধর্ম্ম; এখানে যাহা নাই সে সব হইতেছে তাহার বুদ্ধির ধর্ম্ম।

বুদ্ধির ধর্ম্ম আর প্রাণের ধর্ম্ম—মানুষের আছে এই দুই ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাদের একটী মানুষের স্বভাবসিদ্ধ আর একটী আরোপ মাত্র, অন্যূনপক্ষে তাহার

সাধ্য বস্তু। একটী কল্পনার রচনা আর একটী নৈসর্গিক সৃষ্টি, একটীকে ধরিতে প্রয়াস করিতে হয়, আর একটী অযত্ন সুলভ, আপনিই আসিয়া ধরা দেয়। মানুষের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, জাগতিক প্রতিষ্ঠানে তাহার মূল্যটী নিরূপণ করিতে হইলে এই প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে যথাযথ মানদণ্ড। বুদ্ধির ধর্ম্মটী যতখানি প্রাণের সহিত একীভূত হইয়াছে ততখানিই সে ধর্ম্ম জাগ্রত, জীবন্ত, কর্ম্মকুশল। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম্মের অর্থ এই প্রাণের ধর্ম্ম। প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে স্বধর্ম্ম, বুদ্ধির ধর্ম্মের সহিত পরধর্ম্মেরই একটা সাজাত্য আছে।

হইতে পারে প্রাণের ধর্ম্মটী অপেক্ষা বুদ্ধির ধর্ম্মটিই উচ্চতর মহত্তর। বুদ্ধির ধর্ম্ম দেখাইতেছে আমার আদর্শকে, আমি কি হইতে চাহিতেছি। আমি কি হইতে চাই, আমার আকাঙ্ক্ষা কি তাহার একটা মূল্য আছে, বিশেষ মূল্যই আছে—কিন্তু আশার কল্পনার যে মর্য্যাদা আমার নিভৃত ব্যক্তিগত সাধনার পক্ষে তাহা যতই বৃহৎ হউক না কেন, যতক্ষণ সে সব আমার প্রাণে সজীব হইয়া উঠে নাই ততক্ষণ সত্য হইয়াও উঠে নাই, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মার সৃষ্টি তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, বিশ্বের সহিত আমার যে প্রকৃত সংযোগ তাহা সে সকলের মধ্য দিয়া নহে, তাহার আমার প্রাণের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে সত্য তাহারই মধ্যে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া আমি আমার যে একটা ধর্ম্ম খাড়া করি, জগৎ রহস্য সম্বন্ধে যে শাস্ত্র রচনা করি তাহা যে আবার আমার প্রাণের ধর্ম্ম প্রাণের তত্ত্ব হইতে উচ্চতর হইবে এমন কোন কথা নাই। অনেক সময়ে এমনও দেখিতে পাই প্রাণেরই মধ্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে একটা সমুচ্চের উপলব্ধি, আর বিচার বুদ্ধিই তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, বিকৃত করিয়া দিয়াছে। প্রাণের যে সহজাত দৃষ্টি দিয়া জগৎ দেখিয়াছি, তাহাই সত্যতর, তাহাই উদার মহৎ বুদ্ধির কারুকার্য্যই তাহাকে মলিন বিরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রায়ই দেখি কবি তাঁহার কাব্যে যখন আপনার প্রাণটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তখনই তিনি পাইয়াছেন, দেখাইয়াছেন খাঁটি জিনিষটি আর সেই কবিই যখন আপনাকে সমালোচনা করিতে বসিয়া গিয়াছেন কাব্যরচনা সম্বন্ধে শাস্ত্ররচনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তখনি তিনি সত্য হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

বুদ্ধির ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বদাই তাই মিশিয়া থাকে কেমন একটা মিথ্যাচারের

অবাস্তবতার আভাস। সেখানে পাইনা সত্য ধর্ম্মের অটুট অব্যর্থতা অকুণ্ঠিত ঋজুতা। কথায় বস্তুতে সেখানে প্রাণধর্ম্মের যতখানি পরিত্যাগ করি না কেন, কথার ভঙ্গিমায় বস্তুর গঠনে সেটুকু কোন না কোন প্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিবেই। এমনও হয় যে যে-বস্তুটি প্রাণে নাই ঠিক সেই বস্তুটাই বুদ্ধি অতিমাত্র আঁকড়িয়া ধরে। স্বভাবের এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রাণের তন্ত্রীতে সহসা একটা ভিন্ন সুর বাজিয়া উঠে। কিন্তু কান পাতিয়া শুনিলে আমরা অনুভব করিব সে সুর কেমন তাল কাটিয়া চলিয়াছে তাহাতে রহিয়াছে একটা বৃথা আরম্বর নতুবা তাহা হইতেছে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষ বুদ্ধির ধর্ম্ম দিয়া যাহাই ধরিতে চাহে না কেন, একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে দেখিব তাহার ভাবে ভঙ্গিমায় ইঙ্গিতে প্রাণেরই ধর্ম্ম বাহির হইয়া পড়িতেছে, প্রাণের ধর্ম্ম অজ্ঞাতসারে কেমন তাহাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ যাহা হইতে চায় তাহা অপেক্ষাও বলীয়ান হইতেছে মানুষ যাহা হইতেছে।

(২)

প্রত্যেক মানুষই এক একটি ভাবের বিগ্রহ। এক একটি মূলভাব যাহা তাহার প্রাণে তাহার ধাতুতে তাহার রক্তের মধ্যে অনুস্যুত হইয়া রহিয়াছে তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর সকল ভাব ইহাকেই অনুসরণ করিতেছে, ইহারই ছায়ায় গড়িয়া উঠিতেছে। বীরভাব, তপঃশক্তি, ক্ষত্রিতেজ এইরূপ যাহার প্রাণের ধর্ম্ম তাহার সকল কথাই ইহারই ব্যঞ্জনা লিপ্ত রহিয়াছে। বিপরীত কথা বলিলেও সেখানে পাইব এই ভাবেরই একটা ইঙ্গিত। আর যে মানুষের মূল প্রকৃতিতে এটি নাই যেখানে কোমলতারই আধিক্য সেখানে সকল বীরত্ব সকল দর্পের মধ্যেও পাইব এই কোমল ভাবই। শেলী ছিলেন স্বাধীনতার নবী, অত্যাচারের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। বিপ্লবকেও আহ্বান করিতে তাঁহার কিছু ইতস্ততঃ ছিল না। তবুও শেলী নারী-সুলভ মাধুর্য্য ও কোমলতারই প্রতিমূর্ত্ত। বীরত্বের মহিমা তাঁহার বিশেষরূপে জানা থাকিলেও তাঁহার অধিগত জিনিষটি ছিল কমনীয়তা Helles অথবা Revlt of Islamএর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে শেলী —প্রকৃত শেলী নাই। প্রকৃত শেলী হইতেছেন তিনি যিনি পান (Pan) দেবতার স্তুতি করিয়াছেন, যিনি স্কাইলার্কের বন্দনা করিয়াছেন, যিনি গাহিয়াছেন প্রেমের তত্ত্ব (Love's philosophy) শেলী যখন বলিতেছেন—

Arise arise arise
There is blood on the earth that denies ye bread !

তখন সেখানে তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মাটি তিনি ধরিয়া দেন নাই। কিন্তু যখন তিনি বলিতেছেন—

Like a cloud big with a May shower
My soul weeps healing rain
In thee, thou withered flower—

তখন তাঁহার প্রাণের সমস্ত নিগূঢ়তম রহস্যটিই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে আমরা বোধ করি। শেলীর সহিত তুলনা করুন বায়রণ। বায়রণও ছিলেন স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের উপাসক—আর সেই জন্যই উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু দুইজনের মধ্যে কি প্রভেদ? বায়রণ ছিলেন শক্তির বীর্য্যের বরপুত্র—তাঁহার কথার ভঙ্গিমায় কি এক তপঃশক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তিনি যখন বলিতেছেন—

The Assyrian came down like a wolf on the fold—

অথবা—

Jehov's vessels hold
The godless heathen's wine !

তখন যে সুর আমাদের শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হয় তাহার তুলনা শেলীতে কিছু নাই, তখনই আমাদের সম্যক বোধগম্য হয় প্রকৃত বীরভাব জিনিষটি কি। এই সঙ্গে আর একজন স্বাধীনতার মুক্তির উপাসকের কথা মনে পড়িতেছে। তিনি শক্তিকে বীরত্বকে তাঁহার ধর্ম্ম তন্ত্র হইতে বর্জ্জিত করেন নাই। তিনি শেলীর মত অতিমাত্র নারীপ্রকৃতি ছিলেন না, তাঁহার স্বভাবে পুরুষোচিত একটা সামর্থ্য ধৈর্য্য স্থৈর্য্যের ইঙ্গিত পাই। তবু কিন্তু বায়রণ হইতে তাঁহারও কতখানি প্রভেদ। কিন্তু বায়রণ হইতে তাঁহারও কতখানি প্রভেদ। আমরা বলিতেছি মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা। যে Wordsworthএর মুখ হইতে আমরা শুনি বাহির হইয়াছি।

—Liberty shall soon, indignat raise
Red on the hills his beacon's comet blaze

—যিনি ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে প্রথমে লিখিয়াছিলেন মুক্তি, তিনিই পরে সে বিপ্লবের ঘোর বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সহিত আর সহানুভূতি করিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যের তালে আর তরঙ্গায়িত হইতে চাহিল না। বস্তুতঃ বায়রণের মত ওয়াড্সওয়ার্থের চণ্ড ক্ষাত্র প্রকৃতি ছিল না। তাঁহার মধ্যে প্রধান ছিল ব্রাহ্মণ্যভাব।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] [বৈশাখ, ১৩২৯।

মহাত্মাজী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

মহাত্মাজী আজ রাজার বন্দী। ভারতবাসীর পক্ষে এ সম্বাদ যে কি সে কেবল ভারতবাসীই জানে! তবুও সমস্ত দেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দেশব্যাপী কঠোর হরতাল হইল না, শোকোন্মত্ত নর-নারী পথে-পথে বাহির হইয়া পড়িল না, লক্ষ-কোটী সভা সমিতিতে হৃদয়ের গভীর ব্যথা নিবেদন করিতে কেহ আসিল না —যেন কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই,—যেমন কাল ছিল আজও সমস্তই ঠিক তেম্‌নি আছে, কোনখানে একটি তিল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয় নাই—এম্‌নি ভাবে আসমুদ্র হিমাচল নীরব হইয়া আছে। কিন্তু এমন কেন ঘটিল? এতবড় অসম্ভব কাণ্ড কি করিয়া সম্ভবপর হইল? নীচাশয় এ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা যাহার যাহা মুখে আসিতেছে বলিতেছে, কিন্তু প্রতিদিনের মত সে মিথ্যা খণ্ডন করিতে কেহ উদ্যত হইল না। আজ কথা কাটা-কাটি করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত কাহারও নাই! মনে হয় যেন তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম বেদনা আজ সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অতীত।

যাইবার পূর্ব্বাহ্ণে মহাত্মাজী অনুরোধ করিয়া গেছেন, তাঁহার জন্ত কোথাও কোন হরতাল, কোনরূপ প্রতিবাদ-সভা, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমাত্র আক্ষেপ উত্থিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন আদেশ। কিন্তু তথাপি সমস্ত দেশ তাঁহার সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে। এই কণ্ঠরোধ, এই নিঃশব্দ সংযম, আপনাকে দমন করিয়া রাখার এই কঠোর পরীক্ষা যে কতবড় দুঃসাধ্য

এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তবুও এ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যাইতে তাঁহার বাধে নাই। আর একদিন যেদিন তিনি বিপন্ন দরিদ্র উপদ্রুত ও বঞ্চিত প্রজার পরম দুঃখ রাজার গোচর করিতে যুবরাজের অভ্যর্থনা নিষেধ করিয়াছিলেন, এই অর্থহীন, নিরানন্দ উৎসবের অভিনয় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত হইতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন সে দিনও তাঁহার বাধে নাই। রাজরোষাগ্নি যে কোথায় এবং কত দূরে উৎক্ষিপ্ত হইবে ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু কোন আশঙ্কা কোন প্রলোভনই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা কত বজ্রপাত কত দুঃখই না বহিয়া গেল, কিন্তু, একবার যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যুবরাজের উৎসব সম্বন্ধে শেষ দিন পর্য্যন্ত সে আদেশ তাঁহার প্রত্যাহার করেন নাই। তার পর অকস্মাৎ একদিন চৌরি চৌরার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরুপদ্রব সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস টলিল,—তখন এ কথা সমস্ত জগতের কাছে অকপট ও মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহার লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হইল না। নিজের ভুল ও ত্রুটি বারম্বার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আসন্ন ও সুতীব্র সংঘর্ষের সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা স্বহস্তে রোধ করিয়া দিলেন। বিন্দুমাত্রও কোথাও তাঁহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত হইতে সমস্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল বিলম্বে দিল্লীর নিখিল-ভারতীয়-কংগ্রেস-কার্য্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন I have lost all fear of men জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা এ দেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়া গেছেন, তাহার দণ্ডভোগ ও তাঁহাদের ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি ভয় হীনতার পরীক্ষা তাঁহাদিগকে কেবল এই দিক দিয়াই দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে বড় পরীক্ষা ছিল,—অনুরক্ত ও ভক্তের অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও বিদ্রূপের দণ্ড—এ কথা লোকে এক প্রকার ভুলিয়াই ছিল—যাবার পূর্ব্বে দেশের কাছে এই

পরীক্ষাটাই তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল, অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া যাইতে হইল যে সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, যশঃ এমন কি জন্মভূমির উপরেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ইহা পারা যায় না। কিন্তু এতবড় শান্তশক্তি ও সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠার মর্য্যাদা ধর্ম্মহীন উদ্ধত রাজশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিল। মহাত্মাকে সেদিন রাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছুকাল হইতে এই সম্ভাবনা জনশ্রুতিতে ভাসিতেছিল, অতএব, ইহা আকস্মিকও নয়, আশ্চর্য্যও নয়। কারাদণ্ড অনিবার্য্য। ইহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। ভাবনা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিজের জন্য নয়, এ চিন্তা সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত দেশের জন্য। যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহারা কোথাও কোন কিছু নাই, আর্ত্তের জন্য পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে লইল। দেশের মঙ্গলেই রাজশ্রীর মঙ্গল, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ শাসন তন্ত্রের এই মূল তত্ত্বটি আজ এ দেশে সত্য কি না, এখানে দেশের হিতার্থেই রাজ্য পরিচালনা, প্রজার ভাল হইলেই রাজার ভাল হয় কি না, ইহা চোখ মেলিয়া আজ দেখিতে হইবে। আত্ম বঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া নয়, হিংসা ও আক্রোশের নিষ্ফল অগ্নিকাণ্ড করিয়া নয়,—কারারুদ্ধ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইয়া এবং তাঁহারি মত লোভ, মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া। অর্থহীন কারাবরণ করিয়া নয়,—কারাবরোধের অধিকার অর্জ্জন করিয়া।

হয় ত ভালই হইয়াছে শাসন যন্ত্রের নাগপাশে আজ তিনি আবদ্ধ। তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত বিশ্রামের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু দেশের ভার যখন আজ দেশের মাথায় পড়িল,—একটা কথা যে তিনি বার বার বলিয়া গিয়াছেন, দানের মত স্বাধীনতা কোনদিন কাহারও হাত হইতে গ্রহণ করা যায় না, গেলেও তাহা থাকে না, ইহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জ্জন করিতে হয় —তাঁহার অবর্ত্তমানে আপনাকে সার্থক করিবার এই পরম সুযোগটাই হয় ত আজ সর্ব্ব সাধারণের ভাগ্যে জুটিয়াছে। যাহারা রহিল তাহারা নিতান্তই মানুষ, কিন্তু মনে হয় অসামান্যতার পরম গৌরব আজ কেবল তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

আরও একটা পরম সত্য তিনি অত্যন্ত পরিস্ফুট করিয়া গেছেন। কোন

দেশ যখন স্বাধীন, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেশাত্মবোধের সমস্যা ও খুব জটিল হয় না, স্বদেশ প্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিরতিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয় না। সে দেশের নেতৃস্থানীয়গণকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলেও হয় ত চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত, রুগ্ন ও মরণাপন্ন হইয়া উঠে তখন ঐ ঢিলাঢালা কর্ত্তব্যের আর অবকাশ থাকে না। তখন এই দুর্দ্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন সকল দেশের সমস্ত চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে পরার্থপরতার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয় কাজে, চালাকির মারপ্যাঁচে নয়, সরল সোজা পথে, স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়, সকল চিন্তা সকল উদ্বেগ সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিয়া। ইহা অন্যথা বিশ্বাস করা চলে না। এই পরম সত্যটিকে আর আমাদের বিস্মৃত হইলে কোন মতে চলিবে না। এই পরীক্ষা দিতে গিয়াই আজ শত সহস্র ভারতবাসী রাজ কারাগারে। এবং এই জন্যই ইহাকে স্বরাজ আশ্রম নাম দিয়া ও তাঁহারা আনন্দে রাজদণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন।

প্রজার কল্যাণের সহিত রাজশক্তির আজ কঠিন বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিগ্রহ এই বোঝাপড়া কবে শেষ হইবে সে শুধু জগদীশ্বরই জানেন, কিন্তু রাজায় প্রজায় এই সংঘর্ষ প্রজ্বলিত করিবার যিনি সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত আজ যদিও তিনি অবরুদ্ধ, কিন্তু, এই বিরোধের মূল তথ্যটা আবার একবার নূতন করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সংশয় ও অবিশ্বাসই সকল সদ্ভাব, সকল বন্ধন, সকল কল্যাণ পলে পলে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। শাসনতন্ত্র কহিলেন এই, প্রজাপুঞ্জ জবাব দিতেছে,না এই নয় তোমার মিথ্যা কথা; রাজশক্তি কহিতেছেন, তোমাকে এই দিব এতদিনে দিব, প্রজাশক্তি চোখ তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে কোন দিন কিছু দিবে না,—নিছক বঞ্চনা করিতেছ।

"কে বলিল ?"

"কে বলিল ! আমার সমস্ত অস্থি মজ্জা, আমার সমস্ত প্রাণশক্তি আমার আত্মা, আমার ধর্ম্ম, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পেটের সমস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি গুলা পর্য্যন্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া কেবল এই কথাই ক্রমাগত বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শোনে কে ? চিরদিন তুমি শুনিবার ভাণ করিয়াছ কিন্তু শোন নাই। আজও সেই পুরোনো অভিনয় আর একবার নূতন করিয়া করিতেছ মাত্র। তোমাকে শুনাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জগতের কাছে আমার লজ্জা ও হীনতার অবধি নাই কিন্তু আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তোমার কাছে

নালিশ করিব না, শুধু আর একবার আমার বেদনার কাহিনীটা দেশের কাছে একে একে ব্যক্ত করিব।"

ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব সেবার যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন এই বাঙলা দেশেরই একজন বিশ্ব বিখ্যাত বাঙ্গালী তাঁহাকে একখানা বড় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহার মস্ত একটা জবাবও পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আগা গোড়া ভাল ভাল ফাঁকা কথার বোঝাই ভরা চিঠিখানির ফাঁকিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই, এবং বোধ করি মনেও থাকে না। কিন্তু এপক্ষের মোট বক্তব্যটা আমার বেশ স্মরণ আছে। ইনি বার বার করিয়া, এবং বিশদ করিয়া ওই বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্কটাই চার পাতা চিঠি ভরিয়া সাহেবকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। যেন এত বড় নূতন তত্ত্ব কথা এই ভারতভূমি ছাড়া বিদেশী সাহেবের আর কোথাও শুনিবার সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ আমার বিশ্বাস সাহেবের বয়স অল্প হলেও এ তত্ত্ব তিনি সেই প্রথমও শুনেন নাই এবং সেই প্রথমও জানিয়া জান নাই। কিন্তু জানা এক এবং তাহাকে মানা আর। তাই সাহেবকে কেবল এমন সকল কথা এবং ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল যাহা দিয়া চিঠির পাতা ভরে কিন্তু অর্থ হয় না।

কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিকই সত্য? জগতে কোথাও কি ইহার ব্যতিক্রম নাই। গভরমেণ্ট আমাদের অর্থ দিয়া বিশ্বাস করেন না, পল্টন দিয়া বিশ্বাস করেন না, পুলিশ দিয়া বিশ্বাস করেন না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু শুধু কেবল এই জন্যই কি আমরাও বিশ্বাস করিব না এবং এই যুক্তিবলেই দেশের সর্ব্বপ্রকার রাজ-কার্য্যের সহিত অসহযোগ করিয়া বসিয়া থাকিব? গভরমেণ্ট ইহার কি কি কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন জানি না, খুব সম্ভব কিছুই দেন না, দিলেও হয়ত ওই মণ্টেগু সাহেবের মতই দেন যাহার মধ্যে বিস্তর ভাল কথা থাকে কিন্তু মানে থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের অফিসিয়াল বুলি ছাড়িয়া যদি স্পষ্ট করিয়া বলেন, তোমাদের এই সকল দিয়া বিশ্বাস করি না খুব সত্য কথা, কিন্তু সে শুধু তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত।

আমরা রাগ করিয়া জবাব দিই, ও আবার কি কথা? বিশ্বাস কি কখনও একতরফা হয়? তোমরা বিশ্বাস না করিলে আমরাই বা করিব কি করিয়া?

অপর পক্ষ হইতে যদি পাল্টা জবাব আসিত, ও বস্তুটা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে একতরফা হওয়া অসম্ভবও নয় অস্বাভাবিকও নয়। তাহা হইলে কেবলমাত্র

গলার জোরেই জয়ী হওয়া যাইত না। এবং প্রতিপক্ষ সাধারণ একটা উদাহরণের মত যদি কহিতেন, পীড়িত রুগ্ন ব্যক্তি যখন অস্ত্র চিকিৎসায় চোখ বুজিয়া ডাক্তারের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে তখন বিশ্বাস বস্তুটা একতরফাই থাকে। পীড়িতের বিশ্বাসের অনুরূপ জামিন ডাক্তারের কাছে কেহ দাবী করে না এবং করিলেও মেলে না। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, তাঁহার সাধু ও সদিচ্ছাই একমাত্র জামিন এবং সে তাঁহার নিছক নিজেরই হাতে। পরকে তাহা দেওয়া যায় না। রোগীকে বিশ্বাস করিতে হয় আপনারই কল্যাণে, আপনারই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য।

এ পক্ষ হইতেও প্রত্যুত্তর হইতে পারে, ওটা উদাহরণেই চলে বাস্তবে চলে না। কারণ অসঙ্কোচে আত্ম-সমর্পন করিবারও জামিন আছে কিন্তু তাহা ঢের বড়, এবং তাহা গ্রহণ করেন চিকিৎসকের হৃদয়ে বসিয়া ভগবান নিজে। তাঁর আদায়ের দিন যখন আসে তখন না চলে ফাঁকি না চলে তর্ক। তাই বোধ হয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজ-শক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারা-মারি কাটা-কাটি, অস্ত্র-শস্ত্র বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং সহানুভূতিই যখন জীবের সকল সুখ দুঃখ,সকল জ্ঞান, সকল কর্ম্মের আধার তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আজ স্বার্থ ও অনাচারে ইহা যত মলিন যত আচ্ছন্নই না হইয়া থাক একদিন ইহাকে নির্ম্মল ও মুক্ত করিতে পারিবেন এই অটল বিশ্বাস হইতে তিনি এক মুহূর্ত্তও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু লোভ ও মোহ দিয়া স্বার্থকে ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না তাহা মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতেই এই ধর্ম্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতা-কলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা-বন্দুক-বারুদ কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে এই পর সত্যকে তিনি,সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসা ব্রতকে মাত্র ক্ষণেকের উপায় বলিয়া নয়, চির জীবনের একমাত্র

ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেম। এবং এই জন্যই তিনি ভারতীয় আন্দোলনকে রাজনীতিক না বলিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় দিনের পর দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছিলেন। বিপক্ষ উপহাস করিয়াছে, স্বপক্ষ অবিশ্বাস করিয়াছে কিন্তু কোনটাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন কিন্তু মানুষ ইংরাজদের কোনদিন কোনদিন আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে!

কিন্তু এই অচঞ্চল নিষ্কম্প শিখাটির মহিমা বুঝিয়া উঠা অনেকের দ্বারাই দুঃসাধ্য। তাই সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু যখন মহাত্মাজীর কথা—"I would decline to gain India's Freedom at the cost of non violence, meaning that India will never gain her Freedom without non—violence" তুলিয়া ধরিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে 'মহাত্মাজীর লক্ষ্য—সত্যাগ্রহ, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ এই লক্ষ্যের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মূল লক্ষ্য নহে" তখন তিনিও এই শিখার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অপরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কত বড় সত্যবস্তু এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আগ্রহ ও যে কত বড় স্বরাজসাধনা তাহা তিনিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রভৃতি নাই, সত্য সম্পূর্ণ এবং সত্যই সত্যের শেষ। এবং এই চাওয়ার মধ্যেই মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার এবং সর্ব্বো-উত্তম লক্ষের পরিণতি রহিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়। তাহার ক্ষুব্ধ চিত্তের কৃপণের দেয় অর্থ নয়, তাহার দাতার প্রসন্ন হৃদয়ের স্বার্থকতার দান। অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে কোথাও ত একটি তিলও কম পড়ে নাই! তাই তিনি আজও সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন, পণ করিয়াছিলেন মানবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীনতা বা স্বরাজকামী যখন তিনি ইংরাজ রাজত্বে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন

তখন তাঁহাকে বিস্তর কটূকথা শুনিতে হইয়াছিল। বহু কটূক্তির মধ্যে একটা তর্ক এই ছিল যে ইংরাজ রাজত্বের সহিত আমাদের চির দিনের অবিচ্ছিন্নবন্ধন কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। নিরুপদ্রব শান্তির জনাই বা এত ব্যাকুল হওয়া কেন? পরাধীনতা যখন পাপ এবং পরের স্বাধীনতা অপহরণকারীও যখন এত বড় পাপী তখন যেমন করিয়া হৌক ইহা হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম্ম। ইংরাজ নিরুপদ্রব পথে রাজ্য স্থাপন করে নাই, এবং রক্ত পাতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই, তখন আমাদেরই শুধু নিরুপদ্রবপন্থী থাকিতে হইবে এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করি কিসের জন্য? কিন্তু মহাত্মাজী কর্ণপাত করেন নাই, তিনি জানিতেন এ যুক্তি সত্য নয়, ইহার মধ্যে একটা মস্ত বড় ভুল প্রচ্ছন্ন লইয়া আছে। বস্তুতঃ, এ কথা কিছুতেই সত্য নয় জগতে যাহা কিছু অন্যায়ের পথে অধর্ম্মের পথে একদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে আজ তাহাকে ধ্বংস করাই ন্যায় যেমন করিয়া হোক তাহাকে বিদূরিত করাই আজ ধর্ম্ম! যে ইংরাজ রাজ্যকে একদিন প্রতিহত করাই ছিল দেশের সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম! সেদিন তাহাকে ঠেকাইতে পারি নাই বলিয়া আজ যে-কোন-পথে তাহাকে বিনাশ করাই দেশের একমাত্র শ্রেয়ঃ এ কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। অবাঞ্ছিত জারজ সন্তান অধর্ম্মের পথেই জন্ম লাভ করে অতএব ইহাকে বধ করিয়াই ধর্ম্মহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করা যায় তাহা সত্য নয়।

বন্দী বীর

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

(দ্বীপান্তরিত দেশ-নেতা)

সময়—প্রভাত।

ওরে বন্দী করিল কে!
গর্ব্বী আমার মত্ত পরাণে বন্ধন দিল রে!
বন্ধ করেছে লৌহকারায়—তারি পাশে দৃঢ় ভীম
প্রাচীর-পরিখা ঘেরিয়া দাঁড়ায়—প্রাণ করে ঝিম্‌ঝিম্,
আকাশ নেহারি নীল-অর্ণব নির্ব্বাক দয়াহীন
প্রভাত-অরুণ-করুণ ছটায় তেমনি ত দিশি লীন।

ঐ শোনা যায় সিন্ধু গর্জ্জে আছড়ি পড়িছে জল
লৌহকারায় কম্পন লাগে, প্রাণ করে টলমল,
ভাঙি দিব আজ লৌহকারায় চূর্ণি পরিখা বেড়
সিন্ধুর কল কল্লোল পাশে দাঁড়াইয়ে উদ্বেল
উত্তাল চল চঞ্চল ক্ষ্যাপা প্রবল করিব প্রাণ,
উচ্চ উর্ম্মি দলিয়া চরণে করে যাব অভিযান
স্বদেশে আমার স্বর্গে আমার—দৃঢ়তর বলীয়ান
দৃঢ়তর বীর কর্ম্ম অটল ; করে' লব গরীয়ান
অবনত ম্লান দীন দেশভূমি, শক্তমুষ্টি-বল
শত্রুর মাথে পরখ্ করিব ; অন্যায় কলা-ছল
চূর্ণিয়া দেশ করিব মুক্ত ভাস্বর দিবা প্রায়,
আয় রে সিন্ধু-কলকল্লোল আয় আয় বুকে আয়।

সময়—মধ্যাহ্ন।

দুপুরে সূর্য্য বিকট বীর্য্য ছড়ায় সকল দিক
সিন্ধুগর্জ্জে ভীম ভীমতর দাপটি ঝাপটি ;—ধিক !
ধিক্ ধিক্ মোরে আলস-বিলাসী কাজহীন অক্ষম
নিশ্চল বসি নির্জীব হেথা, হোথা পাপ নিরমম
শত্রু সাধিছে, আর্ত্ত কাঁদিছে কে মুছাবে আঁখি-জল
কে বলিবে—"ভাই, কোন ভয় নাই, নহি নহি দুর্ব্বল,
এই আমি আছি চলে এস কাজী বর্ম্ম কৃপাণ কই
দুর্জ্জয় জয় বাসনা বক্ষে দীন নহি, ক্ষীণ নই।"
কল্প নয়নে দেখি—অন্যায়ী তুলি উদ্ধত হাত
নির্ব্বাক দেশসেবীর মাথায় করিছে অস্ত্রাঘাত,
ভূমে ঝরে পড়ে লক্ষ ধারায় জীবের শোণিত স্রোত—
সে স্রোতের টীকা ললাটে পরিয়ে দৃপ্ত দুর্নিরোধ
কে যেন জাগিল গর্জ্জি জাগাল লক্ষ ত্রস্ত প্রাণ,
নৃত্যে মাতিয়া মৃত্যু বরিছে, কাটি করে খান খান
অত্যাচারীর দম্ভ পূরিত গর্ব্বিত শত শির,
নির্দ্দোষ শত ভ্রাতারে বাঁচায়, বীর বটে সে যে বীর।

ঐ ঐ পথে চলে যে দুখিনী ক্ষীণ শিশু বুকে রয়
শত্রুর গোলা তাহারে গ্রাসিতে ছুটে আসে দুর্জ্জয়—
এই এই আমি, আমি লব গোলা বক্ষ পাতিয়া আজ
ও দীনা নারীরে রক্ষা করিতে হাসিয়া বরিব বীজ।
যাই যাই!—একি চরণে টানে যে লৌহের শৃঙ্খল,
কারার দুয়ারে হাত নাহি যায়, একি জঞ্জাল বল্!
ছিঁড়িব বলয় মুক্ত চরণে দুয়ারে করিব ঘাত
সাতারি' সিন্ধু ভেদিয়া চলিব নিমেষে হতে না রাত,
বীরের মতন ছুটিয়া যাইব আর্ত্ত-ভ্রাতারি মাঝ,
দেখিয়া সঘনে গাবে উল্লাস, বলিবে যে—"সাজ সাজ।"
আমি ফুকারিয়া আকাশ ফাঁড়িয়া বলিবরে—"জয় জয়,
জয় জয় জয়ী হে দেশতনয়, জন্মভূমির জয়।"
শীত কুঞ্চিত বৃক্ষপত্র প্রভাতে তুলে সে শির—
তেমনি গর্ব্বে উঠিবে জাগিয়া ম্লান অনুচর বীর;
মৃত্যু দলিয়া নৃত্য করিব—শত্রুর অবসান;
নাহিক গোপন,—অরুণ-কিরণ সমান দীপ্তিমান
আঁধার বিতাড়ি' নির্ম্মল পূত করিব জননী দেশ,
না রবে ভ্রূকুটি পীড়নের নীতি, নাহি নাহি রবে ক্লেশ।
প্রখর রৌদ্র পড়িয়াছে ঐ কারার প্রাচীর গায়
তাহারি ওপাশে সিন্ধু উছসে, বলে যেন—আয় আয়,
যাই যাই আমি গর্জ্জন ডাকে, নর্ত্তন দেয় দোল,
হে পিতা সিন্ধু, রুদ্র দীক্ষা দাও দাও মোরে কোল,
পিতার সমান লালিয়া পালিয়া দাও মোরে বল দাও,
ঊর্ম্মি বাহুতে লুফিয়া লুফিয়া লয়ে যাও লয়ে যাও,
দুর্দ্দম দাও শক্তি প্রচুর উদ্দাম-গতিমান,
তুমি যে সিন্ধু মূক ধরণীর জাগ্রত চল প্রাণ।
অসহ রৌদ্র, তাহাতে রুদ্র সিন্ধুর গরজন,
আমি যে বদ্ধ!—দুঃসহ ক্লেশ! ভাঙ ভাঙ বন্ধন।
সূর্য্য প্রখর তূর্য্য বাজাও হে জীবন-সুধা-রস,
সিন্ধু মহান মাতাল-পরাণ, কর মোরে নিরলস।

সময়—সন্ধ্যা।

দিবা শেষ হয় আজি হল ছয় দিবস হেথায় আমি—
রুদ্ধ পরাণ বক্ষ-খাঁচায় আছড়িছে দিবা যামি ;
এই যে আজি কে কারার উপরে একটি দিবস মরে
কর্ম্মবিহীন অলস নীরব,—কে জানে রে দেশ-ঘরে
এই দিবসের প্রতি নিমেষেই উঠেছে আর্ত্তস্বর—
অত্যাচারীর গোপন অস্ত্র পাড়িয়াছে ভূমি'পর
নির্দ্দোষ মম ভ্রাতাভগিনীরে অন্যায় রোধী ধীর,
হায়রে অলস বাহুযুগ মোর ভাঙ কারা চৌচির।
হয়ত একটি নির্ভীক ভ্রাতা আজিকে সারাটি দিন
রক্ষিতে শত নির্দ্দোষ প্রাণ যুঝিয়াছে শ্রমহীন,
শেষে সে পড়েছে বৃক্ষ সমান বৈশাখ ঝটিকায়,
কে তাহার স্থানে দাঁড়াতে আছে রে,—ধিক্ ধিক্ হায় হায় !
মনে পড়ে আজ সন্ধ্যা এমনি ঘিরে ঘিরে আসে দিক—
দশ জন মোরা সাগর-বেলায় দাঁড়াইয়ে অনিমিখ
ক্ষুব্ধ পিষ্ট ক্লিষ্ট দেশের মুক্ত করিতে দুখ
করেছিনু পণ,—আশা ও হর্ষ ভরে' ভরে' তুলে বুক
সে দিনের নিশা করে' দিয়েছিল জননীর শুভাশিস্—
পূত মঙ্গল পূজার নিমেষ ; দেখেছিনু দিশে দিশ
পুণ্য আলোক হৃদয়াভিরাম। সেই দিন হতে সেই
দলে দলে বীর মন্ত্রে যুবক আসিল, শঙ্কা নেই।
কারার শঙ্কা মরার শঙ্কা কেটে গেল, নির্ভীক
লক্ষ তনয় দুঃখী মাতার জয়গানে ভরে' দিক
যাত্রা করিল দৃপ্ত সতেজ পরিয়া বর্ম্ম-সাজ ;
আজি কি সকলি বিফল ভাগ্য নিহত, বিশ্বরাজ ?
কে বলে বিফল কে বলে নিহত ?—আজো রই আমি বেঁচে
আজো বাহু মোর শক্ত সুদৃঢ়, লব কি মরণ যেচে ?
আকাশের পানে দেখিরে যাচিয়া নেমে গেছে কূল পানে,
ঐ ঐ দিকে স্বদেশ আমার ঐখানে ঐখানে,

ঐখানে সেথা দেখেছি সে দিন ঝাপ্‌সা ধোয়ায় ঢাকা
স্বদেশ-স্বর্গ জাগিছে আমার স্নেহ-প্রেম দিয়ে মাখা।
ব্যথিত পীড়িত ক্রন্দননত জননী স্বদেশ মোর
বেদনা তোমার সিন্ধু বাতাসে ছুটিয়া লাগায় ঘোর।
ঐ ধোঁয়া মাঝে সুদূর বেলায় শান্ত আকাশ-তলে
স্বদেশে আমার কি বা সে বেদনা অবিরাম ছলছলে!
আর্ত্তের উঠে ক্রন্দন-রোল দুঃখীর দুখতাপ
নির্দ্দোষ ক্ষত হৃদয় হইতে কত না সে পরিতাপ;
কত অন্যায় কত অবিচার অত্যাচারের ঘায়
বিহ্বল দেশতনয় কাতরে অন্তরে মোরে চায়।
প্রাণ কাতরায় যায় দিবা যায় ষষ্ঠ দিবস শেষ,
প্রভাতের আশা নিভে যায় যে রে, ভাঙি কিসে এই ক্লেশ?

সময়—রাত্রি।

নিদ্রা?—ঘুমাতে করে না লজ্জা?—কি শান্তি নিয়ে শু'স্
অন্তর জ্বালা কিসে জুড়াইল, দেশত্যাগী কাপুরুষ!
রাত্রি শীতল ঢালিছে উতল শান্তি,—পাষাণ চাপ
এ যে মোর বুকে বাজিছে বিষম নির্দ্দয় অভিশাপ।
মুগ্ধ সিন্ধু প্রহরী ঘুমায়, স্তব্ধ সকল রব,
মোর অন্তরে জ্বলিছে আগুন, করিতেছে কলরব
বিফল আহত শতেক বাসনা দুর্দ্দম মনোবেগ
গর্জ্জন রত বজ্রগর্ভ যেন বৈশাখ মেঘ
ফাঁড়ি মৌনতা ছাড়ি হুঙ্কার ভেঙে দিতে চায় ঘুম
শান্তি দাত্রী নিথর রাত্রি মরুক্ সে নিঝ্‌ঝুম।
শান্তি কে চায়, কে চায় নিদ্রা, রাত্রি কে চায় বল্
চাহি চঞ্চল চপল দিবস, কর্ম্মমুখর পল,
উচ্ছ্বাসময় সিন্ধু আবার, উল্লাসময় তান,
শান্তিঘাতিনী সর্ব্বনাশের কৃপাণনিষ্ঠ প্রাণ।
মৌনতা টুটি উঠুক্ রে ফুটি দুর্দ্দম মম আশ,
উতল করুক্ নিথর রাত্রি দুরাশারি উল্লাস।

শ্রবণে যে আসে মর্ম্মপীড়িত বিধবার ব্যথা-সুর,
পুত্রবিহীন জনক জননী-ক্রন্দনে পরিপূর
স্বদেশ আমার, জাগিছে বেদন ঝরিতেছে আঁখি-নীর,
আমি যে ভর্ত্তা আমি যে পুত্র শত দুখী-দুখিনীর।
পাষাণ রাত্রি মৃত্যু-ধাত্রী, এত ব্যথা উচ্ছল
বক্ষে পুষিয়া নির্ব্বাক রহ ব্যথাহীন অচপল ;
ও বুকে তোমার বাজে না বেদনা ? মর্ম্মের শোক-বাণ
তোমারে বিঁধিয়া অস্থির করি তুলিবে না গতিমান ?
দেশের লক্ষ দুখীর বেদনা আমার মরম-শোক
ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া টুটিয়া তোমারে উঠুক আকাশ-লোক ;
কোন্ কোণে আছে কোথায় গোপনে বলি যারে ঈশ্বর
বাক্‌হীন মূক অন্যায়-পোষী ;—মঙ্গল ভাস্বর ?—
যদি কোথা থাকে যদি বা সে থাকে যদি কোনো নিরালায়
নাড়িয়া ঝাঁকিয়া বস্থক্ আমার দুঃসহ ব্যথা তায়—
সে নহে পুরুষ নহে ধার্ম্মিক অন্যায়-নিবারক,
নহে ব্যথাহারী পুণ্য বিকাশ পিষ্টের রক্ষক ;
ভীরু কাপুরুষ হৃদয়বিহীন অক্ষম দুর্ব্বল
অত্যাচারীর গুপ্ত পোষক, নিতি ভীতি-চঞ্চল।
যদি সে ধর্ম্ম জ্বলিয়া উঠুক্ পুণ্য-পাবক তার
অধর্ম্ম আর অন্যায় দহি' করে' দিক্ ছারখার।
ধরুক্ মূর্ত্তি করাল ভীষণ পাপনাশী শঙ্কর
তাথই তাথই নাচিয়া নাশুক্ অন্যায় ভূমি' পর।
আমি বিদ্রোহী দাপটি ঝাপটি শাস্তি করিব শেষ,
হইব বিজয়ী জিনিয়া মৃত্যু নাই ঘুম সুখ-লেশ।
ঐ আছাড়িল সিন্ধু উর্ম্মি রাত্রির কাঁপে বুক,
কাঁপে বুক কাঁপে অন্তর মোর আছড়িছে সেথা দুখ।
লৌহকারায় লৌহ আঙুলে শাসিয়া বলিছে—"হায়,
বৃথা রে চপল তব আলোড়ন বৃথা নাচা দুরাশায়।
শোণিত শুষিয়া চুষিয়া মাংস পিষিয়া অস্থিচয়
বাসনা তোমার আশা উচ্ছ্বাস করে' দোব সবি লয়॥"

তার চেয়ে আজি রাত্রির বুকে মাগি চির অবসান
মাগিরে মৌন মৃত্যুর মাঝে হইতে মজ্জমান।
কিন্তু মরিতে বিষম বেদনা! নাহি রে মরিতে সাধ,
রাত্রির বুকে লুকাইয়া থাকি ঘটাই পরমাদ।
রাতির মৃত্যু নিবিড় কালিমা ভেদিয়া সূর্য্যবীর
যথা বাহিরায় শক্তি-পাবক দুর্জ্জয় অস্থির,
তেমনি বিষম ভীম দুর্দ্দম উন্মুখ মম প্রাণ,
এ প্রাণ লইয়া স্ফূর্ত্তি মাখিয়া করিব রে অভিযান।

অন্নপূর্ণা

[শ্রীসুনীতিদেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস গত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পরে যখন সেই মৃতদেহ লইয়া আকুলপ্রাণে মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মিত্রজা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃতদেহের যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া অন্নপূর্ণাকে বলিলেন, "এস মা, আমার সঙ্গে এস।" তৎপর গৃহিণী ও অন্নপূর্ণাকে লইয়া তাঁহার কর্ম্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় তাহার পুত্র ও পুত্রবধু ছিলেন। অন্নপূর্ণা কেমন যেন উদাস প্রাণে নূতন স্থান সকল দেখিতে দেখিতে বাসায় আসিয়া পৌছিলেন। গাড়ী হইতে নামিবার সময় অবগুণ্ঠনবতী তরুণীকে দেখিয়া বিপিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে? পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কন্যা।"

অন্নপূর্ণা আসিয়া রন্ধনগৃহের ভার লইলেন। মিত্র-গৃহিনীকে বলিলেন, "মা ব্রাহ্মণ রাখার প্রয়োজন নাই। আমিই রাঁধ্‌ব।"

বিপিনের স্ত্রী শৈলবালা অন্নপূর্ণার সমবয়সী। দেখিতে মন্দ নয়। তাঁহার স্বামী বিপিন শিক্ষিত, কিন্তু বড় সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি, নিজের চরিত্রও নির্ম্মল নহে। সন্দিহান হইয়া শৈলবালার প্রতি মাঝে মাঝে বড় অত্যাচার করিতেন। শৈলবালা অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। প্রথমতঃ সে পরমাসুন্দরী,—

তাহার কাছে শৈলবালাকে কেহ সুন্দরী বলিবে না। দ্বিতীয়তঃ এ অনুপম রূপলাবণ্যবতী তাঁহার স্বামীর চক্ষে না পড়ে। অন্নপূর্ণার সহিত তিনি ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। যে তাহার বাড়ীর রাঁধুনী তাহার সঙ্গে—তিনি অবস্থাপন্ন লোকের স্ত্রী হইয়া সমবয়সীভাবে কথা কহিলে সম্মানহানির সম্ভাবনা। যাহা হউক, অন্নপূর্ণার সে জন্য কোন দুঃখ ছিল না। গৃহিণী তাহাকে ভালবাসিতেন, সেও তাঁহার খুব যত্ন করিত।

বিপিনের সাক্ষাতে অন্নপূর্ণা কখনও বাহির হইতেন না। সুতরাং তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যও বিপিনের চক্ষে পড়িত না। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ অন্নপূর্ণাকে একখানি গীতা দিয়াছিলেন। সে অবসর মত সেই গীতাখানি পাঠ করিত,—তাহাই তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল ও শান্তির উপায় ছিল।

একদিন অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া চুলগুলি খুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন অবস্থায় বিপিন তাহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, এমন অনুপম রূপ তিনি আর কোথাও দেখেন নাই!—দেখিয়াই তিনি মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিলেন। ইদানীং যথেষ্ট মদ খাইতেন,—তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। তাই মদে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সে দিন রাত্রিতে বিপিন বাসাতেই রহিলেন,—ইদানীং তিনি প্রায়ই থাকিতেন না।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ-মণ্ডল নিবিড় মেঘে আছন্ন। বায়ু স্থির,—ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া সকলেই সকাল সকাল কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া নিজ নিজ গৃহে কপাট বন্ধ করিয়াছে। দ্বিতলগৃহ, উপরে পাঁচটা ঘর। একটীতে কর্ত্তা ও গৃহিণী থাকিতেন, একটা বিপিনের শয়ন-ঘর, মাঝে দুইটি ঘরে জিনিষ-পত্র-পুস্তকাদি, পাশের ঘরটায় অন্নপূর্ণা একাকী শয়ন করিত। অন্নপূর্ণা শয়ন করিতে যাইয়া দেখিল, কপাটের খিলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে কপাট ভেজাইয়া, উহাকে একটি ছোট বাক্স ঠেকা দিয়া রাখিল। তৎপরে ঘরের জানালা খুলিয়া প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

বাতাস জোরে বহিতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। পাশের ঘরে কথা কহিলেও অন্য ঘরে কাহারও শুনিবার সম্ভাবনা নাই! তাই অন্নপূর্ণা নিশ্চিন্ত হইয়া গাহিতেছিল—

> কি যেন চাহে মন কি যেন চাহে,
> জানি না ভাষা তার যে প্রকাশি তাহে;
> কিসের আবেগে এ পরাণ আকুল,
> কেমনে পা'ব যাহা জগতে অতুল!

দিন তো ক্রমে এল ফুরা'য়ে আমার,
এখনো কোথা যাহা জীবনের সার!
বিনা সে ধন যেন বাঁচি মরিয়ে,
যা'বে কি দিননাথ, এমনি করিয়ে!

যখন অন্নপূর্ণা আকুলপ্রাণে তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছিল, সেই সময় বিপিন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে সেই গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। সন্ধ্যার সময় গৃহের খিলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং গৃহে প্রবেশ করিবার কোন বাধা ছিল না। সেই ভীষণ ঝড় যখন রাশি রাশি গৃহ ভূমিসাৎ করিতেছিল, তেমনি সময় সে আস্তে আস্তে অন্নপূর্ণার গৃহের কপাট খুলিল। অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতেই সহসা অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়া সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল!

সেই নেশার ঘোরে কাণে বাজিতে লাগিল, "কি যেন চাহে মন কি যেন চাহে!" বাহিরে ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন, ঝটিকার প্রচণ্ড আঘাতে, গৃহগুলি যেন কাঁপিতেছিল। তাহার মনের ভিতরও তেমনি প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতে লাগিল। সে তখন আস্তে আস্তে নিঃশব্দে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে কেবল এই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল, "মন কি চাহে মা?"

(২)

প্রভাত হইয়াছে। প্রথমে মেঘের হাত এড়াইয়া সূর্য্যদেব যেন উঠিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমে আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হইয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন। বিপিন শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। সেখানে তখন জনপ্রাণী ছিল না। আকাশপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এই ত ঝড়-বৃষ্টির পরে আকাশের মেঘ কাটিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। আমার এই পাপ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে কি জ্ঞান-সূর্য্য উদয় হইবে না? এই ত সূর্য্যালোক উদ্ভাসিত জগৎ হাসিতেছে, আমার হৃদয় কি জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়া শান্তি-কিরণে হাসিবে না? "দিন ত এলো ফুরায়ে আমার, এখনো কোথা যাহা জীবনের সার",—এ জীবনের সার কি? এতদিন ত ভোগেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেছি। অথচ তাহাতে কি কখনও শান্তি পাইয়াছি? কি একটা অভাব যেন সর্ব্বদাই অনুভূত হইয়াছে! দিন ত ফুরাইয়ে আসিল,—কে আমাকে বলিয়া দিবে মা, "কিসের আবেগে এ পরাণ আকুল?" যে স্ত্রীজাতিকে আমি জ্ঞানহীনা বলিয়া ঘৃণা করিতাম, আজ সেই স্ত্রীজাতি আমার

অন্ধত্ব ঘুচাইয়া, আমাকে দিব্য জ্যোতিঃ প্রদান করিলেন! যাঁহার কৃপায় আমি এ নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি,—পাষণ্ড আমি সেই জননীকে অবমাননা করিতে গিয়াছিলাম! ধিক্ আমাকে! তিনি নিশ্চয়ই জানেন, মন কি চাহে। কিন্তু যে নরক হৃদয়ে লইয়া সেই পবিত্র দেব-মন্দির কলঙ্কিত করিতে গিয়াছিলাম, কোন্ মুখে আবার সে গৃহের সম্মুখীন হইব? তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিব,—এ জীবনের সার কি?"

এমন সময় রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল,—

"খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্রে পা'বি
হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।"

সহসা বিপিন "জয় দীননাথ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশের মেঘের সঙ্গে আজ যেন তাঁহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। "যে ধন জগতে অতুল" প্রাণ-মন দিয়া খুঁজিলে তাহা হৃদয়ের মধ্যেই পাইবে!—এই আশায় তাঁহার মন উৎফুল্ল হইল। বাসা হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে একটা বিস্তৃত প্রান্তর, তৎ-সন্নিকটে একটি বটবৃক্ষচ্ছায়ে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বিপিন পায়চারি করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির উদার দৃশ্য তাঁহার প্রাণে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় সুপ্ত ভাবকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। বিপিন কতদিন এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন, আরতো কোন দিন এমন লাগে নাই?

বেলা প্রায় প্রহরাতীত। চাকর আসিয়া ডাকিল, "বাবু, মা ডাকিতেছেন।" বিপিনের চমক ভাঙ্গিল। "এই যাচ্ছি, তুমি যাও,"—বলিয়া ভৃত্যকে বিদায় দিলেন।

বিপিনের বড় গরম বোধ হইতেছিল। ভাবিলেন, পুকুর হইতে স্নান করিয়া যাই। পূর্ব্বদিনের ঝড় বৃষ্টিতে ঘাটের অবস্থা বড় খারাপ হইয়াছিল। বিপিন যেমন নামিতে গিয়াছেন, অমনি হঠাৎ পা পিছলাইয়া গড়াইতে গড়াইতে শানের উপর পড়িয়া বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

জ্ঞান হইলে দেখিতে পাইলেন, তিনি একটি অপূর্ব্বদৃষ্ট নূতন গৃহে শয়ান রহিয়াছেন। সম্মুখে অপরিচিত একটি ভদ্রলোক, বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। বিপিনের জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া চাকরকে গরম দুধ্ আনিতে বলিলেন। দুধ্ আসিলে নিজের হাতে বিপিনকে খাওয়াইতে গেলেন। বিপিন বলিলেন, "আমি কোথায়?" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আগে একটু সুস্থ হয়ে

নন্, পরে সে কথা হ'বে।" দুধ পান করিয়া বিপিন কহিলেন, 'আপনি কে? আর ত কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না, অথচ পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এ স্থানে আমি নূতন আসিয়াছি। আমার নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।"

"ওঃ, আপনি এখানকার নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্? আপনার নাম শুনিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যে আপনি অচেনা লোককেও এমন আত্মায়ের মত যত্ন করেন।"

বিনোদ হাসিয়া কহিলেন, "আমাকে ওরূপ অবস্থায় পতিত দেখিলে কি আপনি ফেলিয়া যাইতে পারিতেন। ইহাতে মানুষকে ধন্যবাদ দিবার কি আছে?"

বিপিন বাসায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিনোদলাল তাঁহাকে পাল্কি করিয়া পাঠাইয়া নিজে সঙ্গে চলিলেন।

(১০)

বিপিনের সঙ্গে এই সূত্রে বিনোদের বেশ সদ্ভাব জন্মিল। একদিন বিপিনের মাতা বিনোদের বাসায় বেড়াইতে আসিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী সুরমাকে তাঁহার বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। সুরমা যাইতে স্বীকৃত হইলেন, ও বিনোদকে বলিয়া পরদিন বিনোদের বাসায় বেড়াইতে গেলেন।

শৈলবালার সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সুরমা ঘুরিয়া ঘরগুলি দেখিতেছিলেন। অন্নপূর্ণার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি পরমা সুন্দরী তরুণী জানালার কাছে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া যেন গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে!

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" শৈল বলিলেন, "আমাদের রাঁধুনী বামনী।" সুরমা কহিলেন, "বাঃ চমৎকার সুন্দরী কিন্তু। দেখিলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।" শৈল সুরমাকে ডাকিলেন, "আসুন।" সুরমার যেন সেখান থেকে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। শৈল আবার ডাকিলেন, অগত্যা সুরমাকে আসিতে হইল। কিছু জল খাইবার আয়োজন করিয়া গৃহিনী ডাকিতেছিলেন। সুরমা কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া, শৈলবালার সঙ্গে একটা নিভৃত কক্ষে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটীর বাড়ী কোথায় জানেন কি?"

শৈল। আমি বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, বাড়ী ঘর থাকিলে কি আর পথে পথে বেড়ায়?

সুর। ওঁকে আপনার কি রকম প্রকৃতির মনে হয়?

শৈল। জানি না, তবে সচ্চরিত্রা হইলে এই বয়সে গৃহের বাহির হইল কেন? ওর হাতে একটি বহু মূল্যবান্ আংটী আছে। আমি ত ইংরাজি জানি না, তাহাতে ইংরাজিতে কাহার নাম লেখা আছে। খুব বড় লোক ভিন্ন ওরূপ আংটী সাধারণের সম্ভবে না। উহার নিজস্ব হইলে উহা বিক্রয় করিয়াও ত কতদিন চালাইতে পারিত। উহার শ্বশুর কিম্বা বাপের একটা ভিটাও কি নাই? তাহাতেই মনে হয়, উহারি প্রণয়াস্পদ কেহ আংটী দিয়াছে, প্রণয়-চিহ্ন বলিয়া বিক্রয় করে নাই।

সুর। এ তো সব আন্দাজী কথা। কিন্তু আমার মনে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না,—আপনি কি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?

শৈল চুপি চুপি সুরমার কর্ণে মুখ সংলগ্ন করিয়া কি একটা কথা বলিলেন, শুনিয়া সুরমা শিহরিয়া উঠিলেন।

বেলা শেষ। সূর্য্যদেবকে গমনোন্মুখ দেখিয়া সুরমা সেদিনকার মত বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মনটা যেন বড়ই ভারাক্রান্ত বোধ হইতে লাগিল।

(১১)

বিনোদ অত্যন্ত প্রসন্ন মুখে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "সুরমা!"

সুরমা রাধিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

বি। আমি যে আনন্দ রাখিবার জায়গা পাইতেছি না, তাই তোমাকে বিলাইতে আসিয়াছি।

সু। ব্যাপার কি তাই বল না?

বি। তোমার কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম, মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। আজ কথাপ্রসঙ্গে বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমাদের পাচিকা ব্রাহ্মণী নাকি ভারী সুন্দরী? তোমরা তাহাকে কোথায় পাইলে? বিপিন কহিল, কাশীধামে এক ব্রাহ্মণ মৃত্যুর সময়ে তাঁহার কন্যাকে বাবার কাছে রাখিয়া যান। ব্রাহ্মণের পরিচয় জানি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাঁহার প্রকৃতি তোমার কেমন মনে হয়? বিপিন বলিল, আমার

মনে হয়, তিনি দেবী নহিলে আমার মত মহাপাপিষ্ঠের মতি ফিরিয়া যায়? আমি বলিলাম, তোমার কথার অর্থ তো আমি বুঝিলাম না।

বিপিন কহিল,—আমি তাঁহাকে মনে মনে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছি, সুতরাং মা-ই বলিব। তিনি কোন দিন আমার সমক্ষে বাহির হন নাই, সুতরাং আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না। একদিন, সেই ভীষণ ঝড়ের দিন, তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এই পাযণ্ডের চক্ষে পড়িল। আজ আমার পাপের কাহিনী তোমাকে বলিয়া আমার হৃদয়ের ভার লঘু করিব। তাঁহাকে দেখিয়া তখন আমার মনে হইল, যেমন করিয়া হউক ইহাকে পাইতে হইবে কিন্তু সে কথা এখন মুখে বলিলেও পাপ বলিয়া মনে হইতেছে।

সেই ভীষণ ঝড়ের সময়ে আস্তে আস্তে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম,—ইহাতে পলাইবার পথ নাই, রক্ষা করিবারও কেহ নাই, সুতরাং আমার পথ—থাক্। অকস্মাৎ কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত আমার কাণে প্রবেশ করিয়া, এ দগ্ধ প্রাণে যেন অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে পাইলাম। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবনের গতি ফিরিল, আমি অতি সন্তর্পণে সে ঘর হইতে আমার শয়ন গৃহাভিমুখে চলিলাম।

বিপিনের সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা হইল, সে সব কথায় তোমার প্রয়োজন নাই। এইবার বিপিনের স্ত্রীর কথার সঙ্গে মিলিতেছে কি না? ঝড়ের দিন তো তিনি দেখিয়াছেন, বলিয়াছিলেন? আর সেই মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করায় যে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? তিনি তো কিছুই টের পান নাই। বিপিনের স্ত্রী যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু তাহাতে তো কোন ক্ষোভের কারণ নাই। সে গানটা আমি লিখিয়া আনিয়াছি, তোমাকে দেখাইব।

সুরমা আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বাস্তবিক দেবী মূর্ত্তি যেন! এমন সৌন্দর্য্য মানুষে এখন পর্য্যন্ত দেখি নাই।—দেখি, সে গানটি কি?"

বিনোদ দেখাইলেন। তৎপর বলিলেন, "শোন সুরমা, আমার কেন এত আনন্দ হইতেছে। তোমার কথা শুনিয়া অবধি আমার কেবলই মনে হইতেছিল,—এই যদি সতীশের স্ত্রী হয়! কিন্তু যেরূপ প্রমাণ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আর সে সম্বন্ধে খোঁজ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। এখন আমার মন অত্যন্ত অধীর হইতেছে। তাহাকে আর একদিন কোন ছলে আনিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি বাস্তবিকই সতীশের স্ত্রী অন্নপূর্ণা

হয়, তবে কত সুখের হইবে!—সুরমা, ইহা ভাবিয়া আমি আনন্দে অধীর হইতেছি। আমার প্রাণ-প্রতিম বন্ধু সতীশ একাকী,—আর আমি তোমার সঙ্গে কত সুখে দিন কাটাইতেছি, ভাবিলে আমার মন যেন কেমন করে! সে তো স্থির করিয়া বসিয়া আছে, দেশের এবং দশের কাজে জীবনটা কাটাইয়া দিবে। আর বিবাহ করিবে না,—ইহা তাহার স্থির সঙ্কল্প। যদি অন্নপূর্ণাকে আনিয়া তাহাকে দিতে পারিতাম, তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিতাম,—তবে আমার কত আনন্দ, কত সুখ হইত! যাই হোক্ সুরমা, আর দেরী করিয়া কাজ নাই। কালই তাহাদের নিমন্ত্রণ করি;—তুমি কি বল?"

সুরমাও অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, "আমি আপত্তি করিব নাকি?"

(১২)

অন্নপূর্ণা এবং বিপিনদের বাসার সকলে পরদিন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বিনোদের বাসার আসিয়াছেন।

সুরমা রন্ধনকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। ক্ষিপ্রহস্তে, সকল কাজ সারিতেছেন। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সুরমার বড় কষ্ট হইতেছে। তখন তিনিও সুরমার সাহায্যে প্রবৃত্তা হইলেন। যখন যাহা জোগাড়ের প্রয়োজন বুঝিতেছেন, তখনই তাহা করিতেছেন। সুরমা নিষেধ করিলেন না। সকলের আহারাদি শেষ হইলে শৈলবালা ও তাঁহার শ্বশ্রূর সঙ্গে সুরমার কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হইল। তৎপরে বিপিনের মাতা বলিলেন, "তবে আজ আসি মা, বেলা গিয়াছে।"

সুরমা বলিলেন, "আমার শরীর কিছু অসুস্থ বোধ হইতেছে। আপনার রাঁধুনিকে যদি আজ রাখিয়া যান, তবে আমার বড় উপকার হয়।" বিপিনের মাতা সম্মত হইয়া কহিলেন, "সে কি মা, তোমার অসুখ-বিসুখ হইলে, শুধু রাঁধুনি কেন, আমরাও তোমার কাজ করিয়া দিব। এখন তবে যাই।"

বিপিনের মাতা প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিলে, সুরমা অন্নপূর্ণার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "চল ভাই, আমরা ছাতে যাই।" উভয়ে ছাতে চলিলেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ মাঠ। সেই দৃশ্য দেখিয়া অন্নপূর্ণার মন যেন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

সুরমা বলিলেন, "ভাই, এ পর্য্যন্ত কথা বলিবার অবকাশ ঘটে নাই। এখন এস, এখানে বসিয়া তোমার অতীত-জীবনের কাহিনী শুনিব। আগে বল, তোমার নাম কি অন্নপূর্ণা?"

সুরমার মিষ্ট ব্যবহার অন্নপূর্ণার প্রাণ স্পর্শ করিল;—এমন ব্যবহার তিনি আর কোন রমণীর নিকট পান নাই। এমন লোকের কাছে তাঁহার আত্ম-কাহিনী বলিতে কোন আপত্তি হইল না। কিন্তু অপরিচিতার মুখে তিনি নিজনাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন;—এখানে তো কেহ জানে না যে তাঁহার নাম অন্নপূর্ণা? এখানে যে তিনি অন্য নামে পরিচিতা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করিয়া জানিলেন যে আমার নাম অন্নপূর্ণা?"

সুরমা তাঁহার প্রার্থিত উত্তর পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে 'আপনি' বলিও না ভাই, আমাকে তোমার সখী বলিয়া জানিও। তুমি আমায় চেন না বটে, কিন্তু আমরা তোমাকে চিনিয়াছি!"

বিস্মিতা হইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কেমন করিয়া চিনিলেন?"

সুরমা বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া প্রথমে সন্দেহ হয়। তারপর, আজ তোমার হাতের আংটীতে তোমার স্বামীর নাম দেখিয়া চিনিয়াছি;—বুঝিয়াছি, তুমি আমার স্বামীর বন্ধু সতীশ বাবুর জলমগ্না স্ত্রী অন্নপূর্ণা। আর তোমার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে একটি তিল আছে, ইহাও তোমার স্বামীর মুখে শুনিয়াছিলাম। এখন তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে এখানে আসিলে, তাহা জানিতে বড় আগ্রহ হইতেছে।"

অন্নপূর্ণা বলিতে লাগিলেন, "পিতার সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী হইতে রওনা হইয়া যখন একটা বড় নদীর মাঝখানে আসিলাম, তখন হঠাৎ বানচা'ল হইয়া নৌকা ডুবিতে লাগিল। বাবা ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিলাম। তিনি সম্ভবতঃ ঘুমের ঘোরেই বলিয়া উঠিলেন, 'মা আমাকে ডাকৃছেন, আমি যাই।' নৌকা ডুবিল; বাবা চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই মা, ভগবান্ আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা কর্‌বেন।'—শুনিতে শুনিতে ডুবিলাম। অল্প অল্প সাঁতার জানিতাম, কিন্তু সে প্রবল স্রোতে সাধ্য কি যে কূলের দিকে অগ্রসর হই? তখন একবার বাবার কথিত সেই পুরাণ পুরুষকে মনে পড়িল। তা'র পরে কি হইল, মনে নাই। যখন চক্ষু মেলিলাম, দেখিলাম একজন প্রাচীনা আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ করুণ দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। সংসারে তিনি এবং তাঁর স্বামী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁদের সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁ'রা আমাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতই দেখিতেন। মায়ের স্নেহ যে কি বস্তু তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, এখানে আসিয়া তাহা অনুভব করিতে পারিলাম। আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম। আহা! সেই মায়ের

মত মা-ই বা ক'জনের ভাগ্যে মিলে! ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তিনি তোমাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন না কেন?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "একদিন মা তাহাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন যে আর পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার স্বামী-দর্শন ঘটিবে না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। আড়ালে থাকিয়া আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়াছিলাম, সুতরাং আমিও আর কিছু বলিনাই। তারপর চারিবৎসর পরে সে মাতাও আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। তিনি বড় সাধ্বী ছিলেন। তাঁর শোকে কিছু কাতর হইয়াছিলাম। পিতৃতুল্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, গীতার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। ক্রমে মন অনেকটা শান্ত হইল। শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। শেষ দিন নিকট জানিয়া তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দশ-বার দিন পূর্ব্বে আমরা ৺ কাশীধামে পৌছি।"

তৎপর তথা হইতে যে ভাবে মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে অন্নপূর্ণা মুঙ্গের আসিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন।

(১৩)

এমন সময়ে বিনোদলাল বাড়ী আসিয়াছেন সাড়া পাইয়া সুরমা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন, এবং স্বামীকে বলিলেন, "অনুমান সত্য। সতীশ বাবুকে আসিবার জন্য আজই তার কর, দেরী করিও না।"

বিনোদ সহাস্যে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সতীশচন্দ্র আসিয়াছেন। শশব্যাস্তে আসিয়া দেখিলেন, বিনোদলাল তাঁহারই প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়া আছেন। সতীশ বলিলেন, "তোমাকে তো ভাই সুস্থ শরীরে দেখিতেছি। তবে কি জন্য আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছ?"

বিনোদ সহাস্যে বলিলেন, "কেন আমাকে কি রুগ্ন অবস্থায় দেখিতে চাও নাকি? না হয়, দু'দিন কালেজে অন্য কেহ তোমার পরিবর্ত্তে অধ্যাপনা করিবেন।" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে উভয়ে বাসায় আসিলেন।

বিনোদ ববিলেন, "ভাই, আর কতদিন বিবাহ না করিয়া থাকিবে? তোমাকে সংসারে একাকী ভাবিয়া আমার বড় কষ্ট হয়। তাই আমি পাত্রী

স্থির করিয়াছি, এবার তোমার ঘাড়ে চাপাইব। তুমি যাই বল, তোমার কথা আর শুনিব না। আমার কথা তোমাকে শুনিতেই হইবে।"

বিস্মিত সতীশ বলিলেন, "সে কি? এই জন্যই কি কারণ না জানাইয়া আসিতে বলিয়াছ? কিন্তু ভাই,"—

বিনোদ। আর কিন্তু-টিন্তু শুনিব না। এবার তোমাকে একাকী ছাড়িয়া দিব না।

সতীশ। একাকী কি ভাই? আমার কত ছেলে রহিয়াছে। তোমার মত বন্ধু আছে, ঘরে মা আছেন;—কেমন করিয়া একাকী হইলাম?

বিনোদ। বাজে কথায় কাজ নাই। এখন বল, কি প্রকার পাত্রী দেখিতে চাও? এখন তো নানারূপে পরীক্ষা করে, তুমি কি ভাবে পরীক্ষা করিবে?

সতীশ একটু বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংকল্প, দেশের এবং দশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন, আর বিবাহ করিবেন না। তাঁহার সে সঙ্কল্প বুঝি বিনোদ ঘুচাইয়া দিবে। মন খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন,—মন বিবাহে ইচ্ছুক নহে! এখনও অন্নপূর্ণার সেই মুখখানি সতীশ ভুলিতে পারেন নাই। এখনও তাহার আশা ছাড়েন নাই।

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "বলি, একেবারে নিরুত্তর যে? তবে আমি আমার পছন্দ মত পরীক্ষা করিব। আমার মতে স্ত্রীর হাতের রান্না না খেলে তৃপ্তি হয় না। সেই জন্য আমি বামুন রাখি না। তবে রান্না খেয়েই পরীক্ষা করা যা'ক।"

সতীশ কিছুই বলিলেন না। বিনোদের সকল কথা তাঁহার কাণে গিয়েছিল কিনা, সন্দেহ। এখনও তাঁহার পক্ষে অন্নপূর্ণা আছে। বিবাহ করিলে বুঝি আর আসিবে না! বিনোদ বন্ধুর মনের ভাব বুঝিলেন। তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে আসিতে দেখিলেন, অন্নপূর্ণা অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের কথা শুনিতেছে;—চক্ষে অশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছে! বিনোদ পূর্ব্বে কখনও অন্নপূর্ণাকে দেখেন নাই। আজ দেখিয়া ভাবিলেন,—বাস্তবিক এ মুখ ভুলিবার নহে!

বিনোদ বাহিরে আসিয়া সতীশকে বলিলেন, "আর ভাবিলে কি হইবে? যাহা স্থির করিয়াছি তাহা করিতেই হইবে। এখন চল; নাইতে যাই।"

সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন। আর অন্নপূর্ণা? তাঁহার মন যে আজ কি করিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন! তিনি সুরমার কাছে পূর্ব্বে সকল

কথা শুনিয়াছিলেন। তার পর স্বকর্ণে সতীশের কথা শুনিলেন। আনন্দে তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল!

সুরমা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুন্‌লে তো ভাই, তোমাকে আজ রাঁধ্‌তে হ'বে।" অন্নপূর্ণা রন্ধনশালে গেলেন। বাল্যাবধি তিনি রন্ধনে অভ্যস্তা ছিলেন, কিন্তু আজিকার মত এত আনন্দ তো আর কখনও হয় নাই! তাঁহার মন অনেক সময়েই অন্তর্জগতে ঘুরিয়া বেড়াইত, এ জন্য তিনি একটু অন্যমনস্কা ছিলেন। শৈলবালার কাছে কত সময়ে এ নিমিত্ত তিরস্কৃত হইয়াছেন। সেই মন যেন আজ বাহ্যজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই অন্তর্নিবিষ্ট হইতে চাহিতেছে না। রন্ধনাদি শেষ হইল,—তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সুরমার আনন্দ যেন ধরিতেছে না! দুইটী সখী একত্র হইয়া বড় সুখ দুঃখের কাহিনী বলিতে ও শুনিতে লাগিলেন। সকারণ, অকারণ, কতবার হাসিলেন, কতবার কাঁদিলেন!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, দুই বন্ধু আহারে বসিলেন। সুরমা বলিলেন, "ভাই অন্নপূর্ণা, আজ তোমার পরিবেশন কর্‌তে হ'বে।" অন্নপূর্ণা আজ আপত্তি করিলেন না।

(১৪)

সতীশকে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, রান্না খেয়ে রাঁধুনীকে পছন্দ হ'বে তো? আমার কিন্তু খুব পছন্দ হ'চ্চে।"

সতীশ এবার হাসিয়া কহিলেন, "তবে আর কি? বৌদিদি শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন,—তা তুমিই না হয় বিয়ে কর। কুলীনের ঘরে বেমানান হবে না।"

পাতে ভাত নাই দেখিয়া অন্নপূর্ণা পুনর্ব্বার ভাত দিতে আসিলেন। সহসা তাঁহার অঙ্গুলির দিকে সতীশের চোখ পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। আহারান্তে বিনোদের বিশ্রামগৃহে বসিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ, ইনি কে?"

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "এখন কেন গো?

সতীশ। বলনা ভাই, তুমি কি বুঝিতেছ না আমার মন কি করিতেছে!

বিনোদ। কেন? দেখ্‌লেই তো চিন্‌তে পারবে বলেছিলে?

সতীশ। আমি তো দেখি নাই, কিন্তু বল বিনোদ, এই কি সেই অন্নপূর্ণা?

বিনোদ। তোমার ভাবী স্ত্রী।

সতীশ। ঠাট্টা রাখ, বল ইঁহাকে কোথায় কি ভাবে পাইলে?

এবার বিনোদ যাহা যাহা জানিয়াছিলেন, সকলই সতীশকে বলিলেন। সতীশচন্দ্র স্থিরভাবে সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কোন প্রকার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। হৃদয়ের আনন্দের প্রতিবিম্ব তাঁহার নয়নদ্বয়ে প্রতিফলিত হইতেছিল।

এ দিকে সুরমা ও অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিলেন। সুরমা অন্নপূর্ণার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, ছাতে যাই।"

উভয়ে ছাতের উপর গিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন সুরমা কতকগুলি ফুল ও ফুলের মালা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি ভাই?"

সুরমা কহিলেন, "আজ তোমার যথার্থ বিবাহ। এই অনন্ত অসীম নীল-চন্দ্রাতপতলে অগ্নি-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সাক্ষী, তুমি আপনি আজ আত্মসমর্পণ করিবে। তাই আজ তোমাকে ফুলের সাজে সাজাইব।"

অন্নপূর্ণা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্না তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার কাছে বাহ্য ও অন্তর্জগৎ যেন একাকার দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আত্ম-হারা হইয়া চির-মঙ্গলময়ের উদ্দেশে যুক্তকরে ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে নমস্কার করিলেন।

সুরমা ততক্ষণ অন্নপূর্ণাকে সাজাইতেছিলেন। ফুলের সাজে সজ্জিতা অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সুরমার মনে হইতে লাগিল, আজ এই অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-বতীকে দেখিয়া সতীশবাবুর না জানি কত সুখ, কত আনন্দ হইবে! তাহা ভাবিয়াও আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে! প্রকাশ্যে অন্নপূর্ণাকে বলি-লেন, "ভাই, আমি তবে চলিলাম। সতীশবাবুকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

অন্নপূর্ণা স্থিরভাবে বসিয়া অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র আসিলেন, অদূরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে সেই পবিত্রতা মাখা অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন —তাঁহার মনে হইতেছিল, মূর্ত্তিমতী সাধনা যেন ভগবানের আরাধনা করিতেছে। পরে ধীর পদবিক্ষেপে অন্নপূর্ণার সম্মুখে আসিলেন। আজ সামান্য পদশব্দে অন্নপূর্ণার ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ধ্যানের দেবতা, —যাঁহাকে এতদিন মনে মনে পূজা করিয়াছেন,—ধ্যানে যাঁহার কল্পিত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—যে পাদপদ্ম দর্শনাশায় অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও বাঁচিতে সাধ হইয়াছে,—যাঁর স্মরণে আনন্দ, দর্শনে আনন্দ, সেই পরমানন্দময়

স্বামী,—তাঁহার সেই সারাৎসার পরাৎপর,—তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত রত্ন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে উঠিয়া শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার স্বামীর পাদমূলে নিপতিতা হইলেন, সেই চিরআকাঙ্ক্ষিত পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া অশ্রু বিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—প্রভু এতদিনে কি দাসীর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে? তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

সুরমা অন্তরালে থাকিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাহার মনে হইতেছিল ভগবানের পাদপদ্মে যেন ভক্তি-কুসুম আপনাকে অর্পন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন! তাহার চক্ষে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল।

সতীশচন্দ্র সাদরে অন্নপূর্ণার হস্ত ধারণ করিয়া স্নেহার্দ্র কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন —"এস আমার অন্নপূর্ণা! আমার আঁধার ঘরের আলো! এস আমার গৃহলক্ষ্মী! এখন আমার গৃহে চল।"

বাঙ্গালা ও তামিল উচ্চারণ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

আমরা লিখি 'কাক,' বলি 'কাগ'; লিখি 'শাক,' বলি 'শাগ'; লিখি 'বক,' 'শকুন,' 'খাত,' 'পাক,' 'ছাত,' 'গাত,' 'শোক,'প্রভৃতি; কিন্তু বলি 'বগ,' 'শগুন,' 'খাদ' (যেমন 'অখাদ সলিলে ডুবে মরি'), 'পাগ' ('গুড়ের পাগ'), 'গাদ' ('গরুটা গাদে পড়েছে'), 'শোগ' ('রোগে শোগে') প্রভৃতি। আবার সংস্কৃত 'কৃপা স্থানে প্রাকৃতে হয় 'কিবা,; 'ঋতু' স্থানে 'উদু,' 'রজত'স্থানে 'আঅদ', আগত স্থানে 'আঅদ', 'নিবৃত্তি' স্থানে 'নিব্বুদ্দি', 'আকৃতি' স্থানে 'আইদি', 'সংযত' স্থানে 'সংজদ', 'শাপ' স্থানে 'সাব', 'শপথ' স্থানে 'সবহ', 'উলপ স্থানে 'উলব', 'উপসর্গ' স্থানে 'উবসগগ', 'কপাল' স্থানে 'কবাল', 'কোপ' স্থানে 'কোব', 'নট' স্থানে 'ণড়', 'বিটপ' স্থানে 'বিড়ব', 'কটু' স্থানে 'কড়ু', ইত্যাদি। সংস্কৃত 'কুথ' ধাতু স্থানে প্রাকৃতে 'কঢ়', 'বেষ্ট' স্থানে 'বেঢ়', 'পত' স্থানে 'পড়', স্ফুট স্থানে 'ফুড়', 'পঠ', স্থানে 'পঢ়', ইত্যাদি। এই-সকল স্থানে অনাদি শ্বাসবর্ণ হয়; কিন্তু কারণ কি? হইলে স্বরবর্ণের পুঞ্জে শ্বাসবর্ণের

নাদবর্ণতা সংস্কৃতেরও নিয়ম ; যেমন দিগন্ত, বাগীশ। 'দিকন্ত' বা বাকীশ' কি আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত হইতে পারে না ?

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গোঁড়া ভক্ত যে হিন্দু বেদের ভাষা হইতে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার উদ্ভব কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, যাঁহার উদ্ভাবনীশক্তির অপূর্ব্ব কৌশলে সংস্কৃত 'পুস্তক' হইতে আরবী 'কিতাব' নিষ্পন্ন হয় *, তাঁহার নিকট আমার নিবেদন এই যে তিনি এ প্রবন্ধ পাঠ না করিলে লেখক ও পাঠক উভয়েরই সুবিধা। কিন্তু যে সহিষ্ণু পাঠক স্বীকার করিতে পারেন যে দুই জাতি একত্র বাস করিলে উভয় জাতির ভাষা পরস্পরের ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানের একত্র সম্পর্কে উর্দ্দুর ন্যায় মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হইতে পারে, ইরাণীয় ও সেমিতীয় জাতির একত্রনিবন্ধন আধুনিক পারস্য ভাষা প্রসূত হইতে পারে, ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলনে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা পরস্পর প্রভাবান্বিত হইতে পারে, তিনি বিচার করিয়া দেখিলে আশ্বস্ত হইবেন যে যে আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে একত্র হইবার পর আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের আধুনিক ভাষাসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই দ্রাবিড়জাতিসমূহের ভাষায় এমন একটা উচ্চারণ নিয়ম প্রচলিত আছে যাহা আমাদের এই উচ্চারণের অনুরূপ। দ্রাবিড় ভাষাসমূহের মধ্যে তামিল ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এই ভাষার বর্ণমালায় স্পর্শ বর্ণের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রতি বর্গে দুইটি বর্ণ ;—প্রথম বর্ণ ও পঞ্চম বর্ণ। অন্য বর্ণের আবশ্যকতা ইহাদের হয় নাই। মহাপ্রাণ বর্ণ ইহাদের নাই ; উচ্চারণেও নাই, লিপিতেও নাই। কিন্তু শ্বাসবর্ণ ও নাদবর্ণ উভয়েরই উচ্চারণ থাকিলেও লিখিবার সময় বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। কারণ ইঁহাদের উচ্চারণ প্রণালীতে এমন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে যে তাহাতে এক বর্ণের দ্বারা দ্বিবিধ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না। ইঁহাদের সেই বিধিটা এই :—

"তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনাদি অযুক্ত শ্বাসবর্ণের উচ্চারণ নাদবর্ণের ন্যায় হয় ; কোনও বর্ণ দ্বিগুণিত হইলে তাহার শ্বাস উচ্চারণ হয় ; পদাদিতে দ্বিগুণিত বর্ণ থাকে না।"

---

* আরবেরা দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখে বলিয়া সংস্কৃত 'পুস্তক' ইহারা 'কতপু' পড়িয়াছে এবং ইহাদের ভাষায় স্বরবর্ণের নিতান্ত বিশৃঙ্খলতাবশতঃ 'কতপু' স্থানে 'কিতাপ' বা 'কিতাব' হইয়াছে।

এই বিধি এত প্রবল যে সংস্কৃত, ইংরাজী বা অন্য কোনও ভাষার শব্দ তামিল ভাষায় গৃহীত হইলে এই বিধির অনুরূপ তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে। সংস্কৃত 'দন্ত' শব্দ তামিল ভাষায় লিখিত হইবে 'তন্তম্', পঠিত হইবে 'তন্দম্'। সংস্কৃত 'ভাগ্য' লিখিত ও পঠিত হইবে, 'পাক্কিয়ম্'।

এসিয়া ও ইউরোপের আধুনিক বা প্রাচীন আর্য্যভাষাসমূহে এ-প্রকার বর্ণব্যত্যয়ের বিধি নাই। তবে এরূপ উচ্চারণ তামিল ভাষায় আসিল কি প্রকারে? যদি ভারতবর্ষে এই উচ্চারণ প্রথম উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে সংস্কৃত হইতে তামিলে এ উচ্চারণের সংক্রমণ যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় না কিন্তু সংস্কৃত যেরূপ রক্ষণশীল ভাষা তাহাতে অন্যান্য আর্য্যভাষায় যে বিধির কোনও উদাহরণ পাওয়া যায় না এরূপ বিধি সংস্কৃতে থাকিলে বলিতেই হইবে যে সে-সকল দ্রাবিড় দস্যু (বা ভবিষ্যতে শূদ্রত্বে উন্নীত) জাতির সহিত আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে শত্রুভাবেই হউক আর মিত্রভাবেই হউক মিশিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান আবশ্যক হওয়ায় তাহাদিগের পক্ষে যেমন সংস্কৃতবহুল ভাষার ব্যবহার অপরিত্যাজ্য হইয়াছিল, আর্য্যগণের পক্ষেও সেইরূপ দ্রাবিড়ী ভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এবং এই প্রভাবই সংস্কৃত ভাষার উপর বহিঃপ্রভাব। এই প্রভাবই সংস্কৃতের পক্ষে অন্যান্য আর্য্যভাষায় অপ্রাপ্য বিশিষ্টতার হেতু। হিব্রু-ভাষায় ব, গ, দ ও ক, ফ, থ, বর্ণের পরিবর্ত্তন কতকটা তামিল ভাষার এই পরিবর্ত্তনের অনুরূপ। হিব্রুর Be GaD ও Ke PHa TH বর্ণসমূহের স্থান বিশেষে দ্বিবিধ উচ্চারণ হয়। সে বিষয়ে আমরা অধিক আলোচনা করিব না। কারণ হিব্রুর নিয়মও তামিলের নিয়মে সম্পূর্ণ অনৈক্য নাই, অনুরূপতা মাত্র আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তের ভাষার ন্যায় হিব্রু বহিঃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তামিল ভাষার সহিত যে সকল ইউরোপীয় সংযোগধর্ম্মী (agglutinative) ভাষার সবিশেষ সম্পর্ক আছে সেই সকল ভাষার কোনও-কোনও-টীতে অর্থাৎ লাপলাণ্ড ও ফিনলাণ্ডের দুইটী ভাষায় এবিষয়ে উচ্চারণ বিষয়ক বিধি সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন পদাদি বা অক্ষরাদিতে (beginning of a syllable) এই দুই ভাষায় (Finnish and Lappish) নাদ বর্ণের ব্যবহার কুত্রাপি নাই। ইরাণ দেশীও বেহিস্তন-লিপিতে শক-ভাষার যে প্রাচীন আদর্শ সংরক্ষিত আছে তাহাতে পদাদিতে কেবলমাত্র শ্বাসবর্ণ ও অন্যত্র কেবলমাত্র নাদবর্ণের ব্যবহার হয় কিন্তু অনাদিবর্ণ দ্বিগুণিত হইলে

তাহার নাদ উচ্চারণ হয় না, শ্বাস উচ্চারণ হয়*। টিউটনিক ভাষায় গ্রীক-কৃত বিধির কোনও কোনও স্থানে অনুরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। যেমন 'দ্বি' বা 'দ্ব' স্থানে 'two', 'দন্ত' স্থানে 'tooth' 'দ্রু' স্থানে 'tree' 'দশন্' স্থানে 'ten' 'ধিত' বা 'হিত' স্থানে deed, শ্রুত স্থানে 'loud' ইত্যাদি। টিউটনিক ভাষার এই বর্ণ পরিবর্ত্তন বা Sound shifting বিধিও অন্য কোনও আর্য্য ভাষায় নাই ; সুতরাং এটীও খাপ-ছাড়া নিয়ম। এ বিষয়ে গ্রীম-ভার্ণার-ক্রুগ্‌মান্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের ঐন্দ্রজালিক বচনকে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার কাল অতীত হইয়াছে। কোন্ বৈদেশিক ভাষার সংস্পর্শে এ ভাষার এ প্রকার পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়াছে।

প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ পালঘাটনিবাসী শ্রীরামচন্দ্র নায়ার নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত সবিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত ভাষা বেশ জানিতেন এবং অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন ; কিন্তু না-হিন্দি না-ইংরাজী না-বাঙ্গালা কোনও ভাষাই জানিতেন না। অথচ এ অঞ্চলে আসিয়া তিন ভাষাই শিখিতেছিলেন এবং তিন ভাষার মিশ্রণে এবং সময়ে সময়ে সংস্কৃত ভাষারই সাহায্যে ভাব প্রকাশ করিতেন। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং এ দেশে (দারভাঙ্গা ও কলিকাতায়) ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় শ্রীযুক্তকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে ইঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই। ইনি বাঙ্গালা বলিবার সময় সংস্কৃতের অনুবাদ চেষ্টায় এ প্রকার অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিতেন যে তাহাদের ভাষার প্রকৃতি (morpholgy) ও আমাদের ভাষার শব্দ মিলিয়া এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী প্রস্তুত হইত। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "কামাখ্যানাথ পণ্ডিত কেমন পড়াইতেছেন ?" তিনি তাহার উত্তর দিলেন "পণ্ডিত কামাখ্যানাথ অভিমানী (গর্ব্বিত) আছেন, কিন্তু পঠিবার (পড়িবার) নিমিত্ত সময়ে (অধ্যয়ন দশায়) তাহাতে আমাদের কোনো দোষ (ক্ষতি)

---

*আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাতেও কোনও কোনও স্থানে এ প্রভাব বর্ত্তিয়াছে। সংস্কৃত 'ব্রজতি' স্থানে প্রা 'বচ্চই', 'গৃহ্লাতি' 'গৃভ্ণাতি' স্থানে প্রা 'ঘেপ্পই' 'বদতি', স্থানে 'বোচ্চই', স 'উৎঘোষমান স্থানে পৈশাচী 'উক্‌খোসমান', 'নষ্ট্বা' স্থানে পৈশাচী 'নৎথূন', ইত্যাদি প্রাকৃতে যুক্তবর্ণের একটার লোপ ও শেষভূতটার দ্বিত্ব তামিল ভাষার উচ্চারণের অনুরূপ।

নাই।" সংস্কৃত প্রত্যয়ের প্রভাবে এক 'পঠনায়' পদদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায় তাহার জন্য ইনি একটি অতিরিক্ত 'নিমিত্ত' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ ইঁহাদের ভাষা সংযোগধর্ম্মী বা সমাসধর্ম্মী (agglutinative), অর্থাৎ এক একটী শব্দ ইঁহাদের প্রত্যয়ের কার্য্য করে, আবার আবশ্যক হইলে সেই প্রত্যয় স্থানীয় শব্দটীর স্বাধীন ব্যবহারও হইতে পারে। স্বাধীন ব্যবহার সর্ব্বত্র না হইলেও তাহাদের এক একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকে ; সংস্কৃতে তাহা নাই। এই জন্য নিজের ভাষার প্রভাবে প্রত্যয়ের পরে প্রত্যয়ের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য ইনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা ভাষার রীতির বিরুদ্ধে একটী অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ-সংস্কৃত 'পঠ' ধাতু অবিকল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিয়া ফেলিলেন! কারণ 'পঠ' ধাতু স্থানে 'পড়' উচ্চারণ তাঁহার নিজের ভাষাতেই হয় বলিয়া প্রাদেশিকতা পরিহার কল্পে সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় রাখা আবশ্যক মনে করিলেন! এই সামান্য উদাহরণ যাহা দেখা গেল সেই ভাবেই দুই দুই ভাষার মিলন ও পরস্পর প্রভাব বিস্তার চলে। সং 'পঠ' উচ্চারণ করিতে আমরা অসমর্থ নহি, কিন্তু তথাপি 'পড়' উচ্চারণ আমাদের সংস্কারের সহিত মিশিয়া গেল কি প্রকারে? এ সেই অতি প্রাচীন কালের দ্রাবিড়ীয় সম্পর্ক, সেই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বর্ণিত বানরগণের প্রভাব, সেই অগস্ত্যপ্রবর্ত্তিত বিন্ধ্যশৈলের দর্পহরণের ফল স্বরূপ আমাদের ভাষায়, তথা সংস্কৃত ও বেদের ভাষায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব বর্ত্তিয়াছে। নতুবা মীমাংসাচার্য্য জৈমিনি, ভাষ্যকার শবরস্বামী ও টীকাকার কুমারিল ভট্ট বেদে ম্লেচ্ছ শব্দ বা (দ্রাবিড়ীয় শব্দ) দেখিতে পাইতেন না এবং তাহাদের তত্তদ্দেশ প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

আমাদের ট-বর্গের উচ্চারণের জন্যও আমরা দ্রাবিড়ীয়গণের নিকট ঋণী। মূর্দ্ধণ্য বর্ণের উচ্চারণ আর্য্যভাষায় প্রাচীন নহে। ইংরাজী ভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাসমূহেও এই টবর্গের উচ্চারণ নাই। এমনকি পারস্যের ভাষায় এ উচ্চারণ নাই এবং কোনও কালে ছিল না। ইংলণ্ডের t ও d বর্ণের উচ্চারণ না-দন্ত্য না-মূর্দ্ধণ্য। কিন্তু আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে এরূপ উচ্চারণ হয় না এবং আমাদের কাণে ওরূপ উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ধরা যায় না। সে যাহাই হউক ইংলণ্ডের উচ্চারণ ও বহিঃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু এ কথা খাঁটি যে ইংলণ্ডের সহিত আমাদের সম্পর্কের বহু পূর্ব্বেই আমাদের ভাষায় ট-বর্গের উচ্চারণ স্থান পাইয়াছে এবং আমাদের বেদে এই উচ্চারণ আছে। সুতরাং ইংলণ্ডের প্রভাব

এটা নহে। আমি মনে করি এ উচ্চারণ প্রাচীন দ্রাবিড়ীয়ভাষা হইতে প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় সংক্রমিত হইয়াছে। এ ধারণার পক্ষে প্রধান হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা যায় :—

(১) তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষার বহু ধাতুতে দন্ত্যবর্ণ ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ভেদ সহ অর্থ ভেদ আছে; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মুর্দ্ধণ্য বর্ণের সে প্রকার ব্যবহার হয় নাই। সংস্কৃতে দন্ত্য বর্ণ ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণে (বিশেষত ন ও ণকারে) প্রভেদ কেবলমাত্র স্থিতি জন্য; অর্থ জন্ত নহে। ঋ, র, ষ প্রভৃতি বর্ণের পরবর্ত্তী দন্ত নকারই মূর্দ্ধণ্য নকারে পরিণত হয়।

(২) সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট ইউরোপ ও এসিয়ার অন্যান্য আর্য্য-ভাষা সমূহের কোনওটাতেই ট বর্গ নাই। গ্রীক ভাষায় নাই, লাটিন ভাষায় নাই গথিক, কেল্‌টিক, লিথুআনীয় শ্লাবনীয় বা প্রাচীন ও আধুনিক পারস্য ভাষায় নাই। উর্দ্দু ভাষায় ট ড প্রভৃতি লিখিবার জন্য নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। কেবল ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ীয় ভাষায় ট বর্গ আছে। বেলুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষায় আছে। প্রকৃত ভাষায় ট বর্গীয় বর্ণসমূহের সমধিক ব্যবহার করিয়াছে*।

(৩) সংস্কৃত শব্দ দ্রাবিড়ীয় ভাষায় গৃহীত হইলে তাহার উচ্চারণের সংস্কার বিনাব্যতিরেকে হইয়া থাকে। তামিলভাষিগণ প্রথমে সংস্কৃত শব্দকে তামিলভাষার অনুরূপ উচ্চারণে পরিবর্ত্তিত করিবেন পরে সে শব্দের তামিল ভাষায় ব্যবহার করিবেন। সংস্কৃতের অনুরূপ উচ্চারণ তাঁহারা কোনও কালেই করেন নাই ও করেন না। এজন্য সংস্কৃতের কোনও মহাপ্রাণ বর্ণ তামিল ভাষায় স্থান পায় নাই। এমন কি সংস্কৃত উষ্মবর্ণ মূর্দ্ধণ্য ষ তামিল ভাষায় নাই। সুতরাং সংস্কৃত হইতে তামিল ভাষায় ট বর্গের উচ্চারণ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

---

* বেদের ভাষায় যে মুর্দ্ধণ্য ছিল, পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় তাহার পরিহার হইয়াছে। কিন্তু দ্রাবিড়ীয় ভাষাসমূহে মূর্দ্ধণ্য কারের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই আছে। সংস্কৃত শব্দ কানারিজ্ বা মালয়ালম্ ভাষায় গৃহীত হইলে তাহার মূর্দ্ধণ্য ফুটিয়া উঠিবে—সংস্কৃত শব্দে সে থাকুক আর নাই থাকুক। তামিল ও তেলেগু ভাষায় ণ বর্ণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। মহারাষ্ট্রী ও কঙ্কণী ভাষা আর্য্য ভাষা হইলেও বৈদিক ণ কারের সমাদর বজায় রাখিয়াছে। অথচ আর্য্যাবর্ত্তের অন্য কোনও ভাষা এ ণ উচ্চারণ করিতে হয় অসমর্থ, না হয় অসম্মত।

(৪) তেলেগু ভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে সমধিক প্রভাবান্বিত হইলেও তামিল অপেক্ষা তেলেগু ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তামিল ভাষাতেই মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ব্যবহার অধিক।

(৫) বেইস্তনের ফলকলিপিতে যে শকভাষায় প্রাচীন আদর্শ সংগৃহীত আছে তাহাতে ট বর্গীয় বর্ণসমূহের সত্তা দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ফিন্‌লাণ্ড, লাপ্‌লাণ্ড প্রভৃতি স্থানের অনার্য্য শকভাষায় যে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাই বেহিস্তন লিপি ও ব্রাহুই ভাষার মধ্য দিয়া দ্রাবিড়ীয় ভাষায় গিয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে এ উচ্চারণ শকভাষার বৈশিষ্ট্য, এবং শকভাষাসমূহ বা ফিন্‌লাণ্ড লাপলাণ্ড, তুর্কী, হাঙ্গারী, সাইবিরিয়া মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে যে সমাসধর্ম্মী (agglutinating) ভাষাসমূহ পরিদৃষ্ট হয় দ্রাবিড়ীভাষাও সেই শ্রেণীর ভাষা এবং এই সকল ভাষার সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার সবিশেষ সম্পর্ক আছে। সুতরাং এ উচ্চারণ এই সকল ভাষাতেই মৌলিক ভাবে সমুদ্ভূত।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতদিগের নানা মুনির নানা মত। সুতরাং সেই সকল মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। বেন্‌ফি বলিয়াছেন, "মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণ সমূহের উচ্চারণ সম্ভবতঃ ভারতের প্রাচীন অনার্য্য আদিমনিবাসিগণের বর্ণমালা হইতে সংস্কৃতের বর্ণমালায় আসিয়াছে, এবং সংস্কৃতে তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" * বেন্‌ফি সাহেবের এমত নিতান্তই সম্ভাবনামূলক ; ইহাতে কোনও বিশেষ যুক্তির অবতারণা হয় নাই। সুতরাং ইহার তেমন মূল্য নাই। বুলর (Buhler) সাহেব যুক্তিসহ প্রতিকূল মত দিয়াছেন। ঋ, র, ও ষ মূর্দ্ধণ্য বর্ণ, এবং ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও ইরাণীয় জেন্দ্‌ভাষায় এই তিনটী বর্ণই আছে। ইউরোপীয় ভাষায় ষ না থাকিলেও 'sh' উচ্চারণ আছে। আবার তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ষ নাই। ঋ এবং র আর্য্য ভাষার মৌলিক উচ্চারণ। সংস্কৃত ভাষায় এই ঋ, র বা ষ এর প্রভাবেই মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বুলর্ বলেন যে সংস্কৃতে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ব্যতিরেকেই স্বাধীন ভাবে ট বর্গীয় উচ্চারণের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার মতে সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ী উভয় ভাষাতেই স্বাধীনভাবে পৃথক পৃথক কারণে মূর্দ্ধণ্য

---

* The mute cerebrals have probably been introduced from the phonetic system of the Indian aborigines into Sanskrit, in which, however, they have become firmly established"—Muir's Sanskrit Texts vol II. 460.

স্পর্শবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ে উভয় ভাষাই পরস্পরের প্রভাব নিরপেক্ষ। স্বাধীন সৃষ্টির উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে টিউটনিক (বিশেষতঃ ইংরাজী) ও স্লাবনিক ভাষায়ও মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের সত্তা আছে, ব্যাকরণে থাকুক আর নাই থাকুক। উইল্‌সনের সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে তিনি একটা স্থান উদ্ধৃত করিয়া * বলিতে চাহেন যে উইল্‌সন ইংরাজী ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের সত্তা দেখিয়াছেন। সুতরাং বুলরের মতে স্বাধীনভাবে যখন একটী আর্য্য ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তবে অপর আর একটী ভাষায় তাহা না হইবে কেন? তিনি আরও বলেন যে পর-ভাষার উচ্চারণ গ্রহণ করা কোনও ভাষাতেই দেখা যায় নাই এবং সে প্রকার পর প্রভাবের কোনও মতবাদ এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। * সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব স্বীকার করিবার হেতু নাই।

বুলারের কথায় ঋ, র ও ষ বর্ণের প্রভাবে যখন মূর্দ্ধণ্য বর্ণের উৎপত্তি হয় তখন ইহাকে তিনি অন্য-নিরপেক্ষ উৎপত্তি বলেন কি প্রকারে? দ্রাবিড়ী ভাষায় অন্য নিরপেক্ষ ভাবে এই সকল বর্ণের সত্তা এবং দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রভেদে অর্থের প্রভেদ যেরূপভাবে হয়, তাহাতে দ্রাবিড়ী মূর্দ্ধণ্য বর্ণ

---

* The Sanskrit consonants are generally pronounced as in English, and we have, it may be suspected, several of the sounds of which the Sanskrit alphabet has provided distinct signs. This seems to be the case with the *cerebrals.* We write but one *t* and one *d*, but their sounds differ in such words as *trumpet* and *tongue*, *drain* and *den*, in the first of which they are *cerebrals*, in the second *dentals*.—H. H. Wilson, Sanskrit Grammar, p 3.

* The possibility of borrowing of sounds by one language from another has never as yet been proved. * *. Comparative philologists have admitted loan – Theories too easily, without examining facts. * * *. Regarding the borrowing of sounds it may suffice for the present to remark that it has never been shown to occur in the languages which were influenced by others in historical times, such as English, Spanish and the other Romance languages, Persian, etc. * * * We find still stronger evidence against the loan-theory in the well-known fact that nations which, like the Jews, the Parsees, the Slavonian tribes of Germany, the Irish, etc. have lost their mother-tongue, are, as nations, unable to adopt with the words and grammatical laws also the pronunciation of the foreign language.—Madras Journal of Literature 1864, pp 116-136, in an article contributed by Dr. Buhler.

স্বাধীনভাবে উদ্ভূত, অথবা সংস্কৃত অপেক্ষা অতি প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড়ী ভাষায় প্রচলিত এ কথা স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু যে ভাষায় এই উচ্চারণ সাধারণতঃ এই উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণবিশিষ্ট অন্য বর্ণের সম্পর্কে জাত হয়, তাহাকে অন্য নিরপেক্ষ বলা যায় না! যে উচ্চারণ তোমার পরিচিত সেই উচ্চারণের সহায়তাতেই অপরিচিত উচ্চারণ লক্ষিত করা সম্ভব-পর। তাই সংস্কৃতে ঋকারাদি বর্ণের সাহচর্য্যে এবং ইংরাজী trumpet, drain প্রভৃতি শব্দেরও ণ বর্ণের সম্পর্কে মূর্দ্ধণ্য স্পর্শ বর্ণ লক্ষিত করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কোণ, কুণি, গণ, গুণ, পণ, পণ্য, বণিক্, প্রভৃতি বহু শব্দে স্বাধীন মূর্দ্ধণ্য ণ (ব্যাকরণের স্বাভাবিক ণ) দৃষ্ট হয়। কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় র বর্ণের তিন প্রকার উচ্চারণ ও ল বর্ণের দ্বিবিধ উচ্চারণ এবং যাবতীয় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের স্বাধীন উচ্চারণ (অবশ্য মহাপ্রাণ বর্ণ বা উষ্ম বর্ণ নাই), প্রভৃতি কারণে এবং অতি দূরদেশবর্ত্তী ভাষা সমূহের সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার সম্পর্ক এবং সে সকল ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের সত্তা প্রভৃতি কারণে বলিতে হয় যে দ্রাবিড়ী ভাষায় বা যে ভাষা হইতে দ্রাবিড়ী ভাষা সমুদ্ভূত সেই প্রাচীন ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণে উচ্চারণ অতি প্রাচীন ; এবং বহু-কাল একত্র নিবাস হেতু সংস্কৃত ভাষায় এ উচ্চারণ সংক্রমিত হইয়াছে!

তামিল ভাষায় দন্ত ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রভেদ-প্রদর্শক কয়েকটী শব্দ :—

{ কুদি — উল্লম্ফন
{ কুড়ি — পানকরা

{ পুদেই — আচ্ছাদন বা গোপন করা
{ পুড়েই — সরা অপসরণ

{ এন্ — বলা
{ এণ্ — গণা

{ মনেই = গৃহ
{ মণেই — বিষ্ঠা

{ কত্তু — শব্দ করা
{ কট্টু — বাঁধা

{ কোত্তু — খনন করা
{ কোট্টু — ঢাক বাজান

{ অরি — চর্ব্বণ করা
{ অরি´ — জানা
{ অরি = বিনাশ করা

{ অরু — বিরল হওয়া
{ অরু´ — কাটিয়া ফেলা
{ অরু — অশ্রুত্যাগ করা, রোদন করা

{ কোল্ — হত্যা করা
{ কোণ্ গ্রহণ করা

{ তুলেই = শেষ করা
{ তুণেই = ছিদ্র করা *

---

* Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian Languages, 2nd Edition, 1875, pp 37-38.

ইংরাজী ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শ বর্ণের অন্য-নিরপেক্ষ ব্যুৎপত্তির কথা যাহা বুলর বলিয়াছেন তাহার উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে অন্য-নিরপেক্ষ নহে। টিউনিক ভাষায় গ্রীমের আবিষ্কৃত ঐন্দ্রজালিক ধ্বনি পরিবর্ত্তনের বিধির ন্যায় এস্থলেও প্রকৃত কারণ নির্ণয় বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। লাপলাণ্ডের ভাষা হইতে স্কান্দিনেবিয়ার মধ্য দিয়া নর্ম্মানগণ তাহাদের এ উচ্চারণ পাইয়াছে কিনা কে জানে? ইংরাজী উচ্চারণ যে দক্ষিণ-ই উরোপের উচ্চারণ হইতে (এমন কি ফরাসী ও জর্ম্মণ হইতে) বিভিন্ন এবং ভারতবর্ষের দন্ত্য বর্ণ অপেক্ষা মূর্দ্ধণ্য বর্ণের অধিক সন্নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। r বর্ণ পূর্ব্বে থাকিলে t, d বা n বর্ণের সম্পূর্ণ মূর্দ্ধণ্যতা প্রাপ্তি ঘটে। যেমন mart, yard, barn : এই সকল স্থলে মূর্দ্ধ্যতা trumpet ও drain অপেক্ষা অধিক। ণ-বর্ণের সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক ইংরাজী t ও d বর্ণের উচ্চারণ আমাদের নিকট মূর্দ্ধণ্য। Director শব্দ বাঙ্গালা অক্ষরে হইবে 'ডিরেকৃটর' ('দিরেক্তর্' নহে)।

আর একটা কথা উঠিয়াছে, উচ্চারণ বিষয়ে কোনও ভাষায় পরপ্রভাব প্রমাণিত হয় নাই। বুলরের সে যুগে এটা অপ্রমাণিত থাকিলেও এ যুগে প্রমাণিত হইয়াছে। পৃথিবীর অনেক জাতিই অন্য জাতির ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। এলাহাবাদ প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্তান হিন্দু, উর্দ্দু ও বাঙ্গলা সমভাবে শিখে এবং তিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়। কল্‌ড্ওয়েল (Bishop Caldwell) বুলরের কথার একটু ঘুরাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। বুলর বলেন ইংরাজী ভাষায় নর্ম্মানদিগের আগমনের পর নর্ম্মান প্রভাবে ইংলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসী সাক্‌সানদিগের ভাষায় শব্দসম্পদ ও প্রত্যয়াদি বিষয়ে ভূয়ান্ পরিবর্ত্তন হওয়াসত্বেও উচ্চারণ-গত কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং সাক্‌সানেরা ফরাসী a বা u উচ্চারণ করিতেও শিখে নাই। ইহা হইতেই বুলার প্রমাণ করিতে চাহেন যে উচ্চারণ প্রণালী এক ভাষা হইতে ভাষান্তরে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু তিনি একথা ভুলিয়া গেলেন যে নর্ম্মানেরা সাকসানদিকের উচ্চারণ গ্রহণ করিয়াছে। স্কান্দিনেবিয়া বা উত্তর দেশ হইতে আসিয়া নর্ম্মানেরা (Northmen) ফ্রান্সে দুই শতাব্দীমাত্র বাস করিয়া ফরাসী উচ্চারণ গ্রহণ করে এবং তাহার পরে ইংলণ্ডে যাইয়া আবার সেখানকার উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়। ইহা অপেক্ষা পর প্রভাবের উজ্জ্বল উদাহরণ আর কি হইতে পারে? বুলরের যুক্তি গ্রহণ করিলে তাঁহারই কথায় তাঁহাকে বলা যায় যে যেমন করিয়া নর্ম্মানেরা ইংলণ্ডে আসিয়া সাকসানদিগের উচ্চারণ প্রণালী

গ্রহণ করে, সেই প্রকারেই আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া দ্রাবিড়ীয় উচ্চারণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। Caldwell আফ্রিকার ভাষা হইতে পরপ্রভাবের আরও অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না।

গৌড়ীয় ভাষাসমূহের ব্যাকরণ লেখক বিম্‌স্ এ বিষয়ে একটী অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়া বুলরের মতের প্রায় সমর্থন করিয়াছেন। তিনি জলবায়ুর প্রভাবে উচ্চারণ প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া ভারতবর্ষে অন্তনিরপেক্ষভাবে সংস্কৃতভাষায় ট বর্গের উচ্চারণ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া দীর্ঘ বিচার করিয়াছেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের একালপর্য্যন্ত যে চর্চ্চা হইয়াছে তাহাতে ভাষা বা উচ্চারণের উপর জলবায়ুর প্রভাব স্বীকৃত হয় নাই। তবে এ বিষয়ে আলোচনাও নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু একথা খাঁটি সত্য যে ভারতে আর্য্য ও দ্রাবিড় উভয় জাতিই দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণ সমূহের সমভাবে উচ্চারণ করিতে সমর্থ। জলবায়ুর কোনও প্রভাব এদেশে স্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। বাগ্‌যন্ত্রের গঠনপ্রণালীগত কোনও বিশেষ প্রভেদ আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে নাই।

অতঃপর উষ্মবর্ণের কথা। তামিল ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ষকারের উচ্চারণ নাই একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দন্ত্য সকার ও ইহাদের ভাষায় নাই। চ বা তালব্য শ লিখিবার একমাত্র অক্ষর। ইহার দ্বিত্ব হইলে 'চ্চ' হয়, একক থাকিলে 'শ' হয়। সংস্কৃতের প্রভাবে এক্ষণে শ, ষ ও স তিন বর্ণই দ্রাবিড়ী ভাষায় স্থান পাইতেছে এবং 'গ্রন্থ' অক্ষর ব্যবহৃত হইতেছে।

আর্য্যভাষাসমূহের উচ্চারণের ক্রমভেদে দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে; —কেণ্টুম্ (Centum) ভাষাসমূহ ও শতেম্ (Satem) ভাষাসমূহ। এই দুই শ্রেণীর প্রথমগুলিতে মৌলিক তালব্য ক (*K) বর্ণের 'ক' উচ্চারণ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'শ' উচ্চারণ হয়। এ উচ্চারণের বিভিন্নতার কারণ নির্ণয় চেষ্টা হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু কারণ নির্ণয় চেষ্টা করিলে তাহা যে ফল প্রসব করিতে পারে না ইহা মনে করি না। কারণ যে সকল ভাষায় শ উচ্চারণ দেখা যায়, সেই সকল ভাষা শক ভাষাসমূহের নিকটবর্ত্তী। এবং কেবলমাত্র নবাবিষ্কৃত তুখারীয় (Tokharian) ভাষা ভিন্ন অন্য যে সকল ভাষায় 'ক' উচ্চারণ হয়, সে সকল ভাষা শক ভাষাসমূহ হইতে বহু দূরবর্ত্তী। আমার মনে হয় যে মূল ভাষা হইতে দ্রাবিড়ী ভাষা সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই ভাষাতে এই

উচ্চারণ ছিল এবং সেই জন্যই তামিল ভাষায় এ উচ্চারণ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 'শতম্' ইরাণীয় জেন্দ্ ভাষায় 'satom' (শতম্), লিথো শ্লাবনীয় 'szimtas' প্রভৃতি 'শ' বা উষ্ম বর্ণের উচ্চারণ এবং গ্রীক '(he) katon' (হেকাটোন্), লাটিন 'Centum' (কেন্টুম্), কেল্‌টিক cet (from 'Kent') গথিক 'hund' (এখানে 'ক' স্থানে 'খ' বা 'হ' হইয়াছে, Grimm's Law) তুখারীয় 'Kandh' প্রভৃতিতে 'ক' উচ্চারণ হইয়া থাকে। সংস্কৃত 'দশন্' (=১০), জেন্দ্ 'দশ', আর্মিনীয় 'tasn', গ্রীক 'deka', লাটিন 'decem' ('dekem'), প্রাচীন আইরিশ্ dech ইত্যাদি। এই সকল ভাষায় 'ক' ও 'শ' উচ্চারণ যে গোলযোগ দেখা যায় দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহেও তাহা লক্ষিত হয়। কানারিজ 'কিন্ন' (=ক্ষুদ্র) স্থানে তামিল 'শিন্ন' কানারিজ 'কিবি' (শ্রবণেন্দ্রিয়) স্থানে তামিল 'শেবি' কানারিজ 'গেয়্' ('কেই', করা) স্থানে তামিল 'শেয়্'।

সস্কৃত 'অম্ল' স্থানে বাঙ্গালায় 'অম্বল' উচ্চারণ করিয়া আমরা উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ একটী অতিরিক্ত 'ব' আনিয়া ফেলি, তামিল ভাষায় উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ অনুনাসিক বর্ণের সহিত এই প্রকার সহায়ক বর্ণের উচ্চারণ বিরল নহে। সংস্কৃত 'গোধূম' শব্দের তামিল উচ্চারণ 'কোদুম্বৈ'। এ উচ্চারণকে ভাষাবিশেষের সম্পত্তি বলা যায় না, কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষিত হয়। সংস্কৃত 'স্বনঃ', লাটিন 'sonus' ইংরাজীতে sound কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় সময়ে সময়ে এই উচ্চারণের একমাত্র অতি-পরিণতি দেখা যায়; এ স্থানে সময়ে সময়ে অনুনাসিক অংশ লোপ পাইয়া 'ম' স্থানে 'ব' হয়। অমাদের বাঙ্গালা দেশের স্থান বিশেষে 'নামা' স্থানে 'নাবা', 'তামা' স্থানে 'তাঁবা', 'আম' স্থানে 'আঁব' প্রভৃতির উচ্চারণের নিন্দা করিয়া অন্য স্থানের অধিবাসীরা অনেক সময় 'মামা' শব্দের 'ম' স্থানে 'ব' উচ্চারণ করিলে যে অর্থ বিকৃতি ঘটে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানিয়া রাখুন তামিল ভাষায় 'মামন্' (='মামা') এবং 'মামি' (=মামী) শব্দের 'ম' স্থানে কুর্গী ভাষায় 'ব' হয়; তবে উভয়ত্র নহে, প্রথম মকার ঠিক থাকে। তামিল 'মামন্' (=শ্বশুর)—কুর্গী 'মাবু', তামিল 'মামি' (=শ্বশ্রূ)—কুর্গী 'মাবি'। তামিল ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় এবং প্রাদেশিক তামিল ভাষায় এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

স্থানে স্থানে অনুনাসিকের লোপ করা যেমন দ্রাবিড়ী ভাষার একটী লক্ষণ, স্থানে স্থানে অতিরিক্ত অনুনাসিকতাও এ ভাষার সেইরূপ একটী বৈশিষ্ট্য। তামিল ভাষায় ইহার অসংখ্য উদাহরণ—'ক্কু' (বা 'গু') প্রত্যয় যোগে—

অড়ু গু=অড়ঙ্গু। সংস্কৃত 'শুনকঃ' (=কুকুর) তামিল ভাষায় হয় 'শুণঙ্গন্' ও 'শোণঙ্গি'। আ+ডু=আণ্ডু (=সেখানে, সে সময়ে)। অ×গু=অঙ্গু (=সেখানে)। 'পশু' স্থানে 'পঙ্গু' (=অংশ, ভাগ) উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। আমাদের ভাষায়ও এই প্রকার অতিরিক্ত অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ বিরল নহে। উদাহরণ ঘোটক—ঘোঁড়া; অক্ষি—আঁখি; কক্ষ—কাঁখ; কাচ—কাঁচ; বাস—বাঁস; কোরক—কুঁড়ি, কোঁড়া; ইষ্টক—ইঁট; স্ফোটক—ফোঁড়া; উচ্চ—উঁচু, শস্য—শাঁস; বক্র—বাঁকা। পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেই এ উচ্চারণ আরম্ভ হইয়াছে। ইরাণীয় জেন্দ্ ভাষায়ও এই প্রকারের একটা দেখা যায়, তাহাতে অনাদি দন্ত্য 'স' বর্ণের হকারে পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে একটা অতিরিক্ত অনুণাসিক বর্ণের আমদানি হয়। উদাহরণ—নাসত্য—নাওং হইথ্য, বসু-বংহু; শফাসঃ (বৈদিক)—শফাওংহো; বসনম্—বংহনেম্ (vanha-nem), অবসঃ—অবংহো; ইত্যাদি। সর্ব্বত্র কিন্তু এ নিয়ম খাটে না; অসুর—অহুর; ভরসি—বরহি। *

দুইটী স্বরবর্ণ একই পদের মধ্যে একত্র থাকিবার বাধা না থাকিলেও দ্রাবিড়ী ভাষায় স্বরদ্বয়ের মধ্যে 'য', 'ব', 'ন', বা 'ম' এই চারিটী বর্ণের কোনও একটীর ব্যবহার হইয়া থাকে। পালি ভাষায়ও এ নিয়ম আছে। * তামিল ভাষায় তালব্য স্বরের পর 'য়্' ও অন্য স্বরের পর 'ব' হয়। বর+ইল্লেই=বরবিল্লেই (আসে নাই, অনাগত, not come), বরি+অল্ল=বরিয়ল্ল (রাস্তা নহে, (it is not the way), অন্যান্য বর্ণের আগম এ ভাষায় নাই। সুতরাং অন্যান্য দ্রাবিড়ী ভাষার কথা এখানে আলোচ্য নহে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও আমরা অনুরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি। আমাদের 'হ' ধাতুর পর 'আ' প্রত্যয়

---

* ১৩১৯ সালের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ২য় খণ্ডে বঙ্গভাষার অনুনাসিকতা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তখন তামিল ভাষার এ বৈশিষ্ট্য জানিতাম না।

* "যবমদন তরলা চাগমা। কচ্চায়ন ১।৪।৬। সরে পরে যকারো বকারো মকারো দকারো নকারো তকারো রকারো লকারো ইমা আগমা হোন্তি।" উদাহরণ যথা×ইদং= যথয়িদং, ভক্তা×উদিক্খতি=ভক্তাবুদিক্খতি, লহু×এস্সতি=লহুমেস্সতি, সম্ম+অঞ্ঞা= সম্মদঞ্ঞা, ইতো আয়াতি=ইতোনায়াতি, যস্মা+ইহ=যস্মাতিহ, আরগ্গে×ইব= আরগ্গোরিব, ছ+আয়তনং=ছলায়তনং। সংস্কৃতেও এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উদাহরণ —সখ আগচ্ছ, সখয়াগচ্ছ; প্রভ এহি, প্রভবেহি; শ্রিয়া অর্থঃ, শ্রিয়ার্য্থঃ; রবা অস্তমিতে, রবাবস্তমিতে; অ ঐক্য=অনৈক্য।

করিলে উভয় স্বরের মধ্যে বকারাগম হয় না বটে, কিন্তু বকারের উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণ ওকার দ্বারা লক্ষিত হয়, যেমন 'হওআ' বা 'হওয়া'। প্রাকৃত 'ইঅ' প্রত্যয় বাঙ্গালায় 'ইয়া' হয়, যেমন 'করিয়া', 'যাইয়া'। প্রাকৃত ভাষাতেও এ উচ্চারণ দেখা যায় এবং জৈন-প্রাকৃত বা জৈন ধর্ম্মগ্রন্থাদির ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী 'য়' উচ্চারণ 'য-শ্রুতি' নামে পরিচিত। নেতিবাচক 'অ' উপসর্গ ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না বটে, কিন্তু স্বরবর্ণের পূর্ব্বে বাঁধ দিবার জন্য একটা নকারকে ডাকিয়া আনে। এইরূপ নকারের উচ্চারণ সংস্কৃত, জেন্দ ও গ্রীক ভাষায় হইত। অন্যান্য আর্য্য ভাষায় নকারের লোপ হইত না। এই লইয়া Bragmann এর বিখ্যাত Sonant nasal theory.

যতই আলোচনা করা যায় ততই এ বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায় অথচ প্রবন্ধের কলেবর বিপুল হইয়াছে। সুতরাং আমরা বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

যুগ-পথ।

[শ্রীভোলানাথ সাহা]

মহা মিলনের মন্ত্রসাধন উৎসবে
আজ্ জুট্ সবে—
ল'য়ে প্রাণের বিপুল বেদনায় ভরা আঁখি,
সয়ে সব জালা সব কর্ম্মের মাঝে থাকি,
শোন্ সঙ্গীত,
দেখ্ ইঙ্গিত
করে রক্তিম রোষে শক্তিময়ী যে—"স'রে যা ভণ্ড, কূট সবে,
আয় সরল, প্রেমিক সাধকেরা আয় আমার প্রসাদ লুট সবে।"
এযে শান্তি যুদ্ধ—
চিত্ত শুদ্ধ—
ধর্ম্মের প্রসারণ;
এযে 'মা' ব'লে ডাকা, বুক পেতে থাকা, অন্যথা অকারণ।

এযে জ্ঞানের সাগরে হাবুডুবু, শিরে শান্তির বারি ল'য়ে ;
এযে অকূলের কোনে আলোকের আভা এতকাল র'য়ে র'য়ে।
ওরে যুগের প্রভায় আজ্
প্রভাময় হ'য়ে ভারত আজিকে পরিয়াছে শিরে তাজ—
বোবা, কালা যত শোনে, কথাকয়।
কাণা, খোঁড়া যত দেখে খাড়া র'য়।
অভাবুক যত হয় ভাবময়
স্বাধীনের পরে সাজ।
বাজে পরাধীন হ'য়ে প'ড়ে থাকা বুকে বাজের অধিক লাজ।
ওই, দূর হ'তে ডাকে কে ?
অমৃতের বাণী গুরুগম্ভীরে কর্ণে পশিল রে।
শোন্ শোন্ ওই শোন্,
এখনো ধ্বনিছে শোন্—
জননীর খাসা প্রাণময়ী ভাষা এখনো ধ্বনিছে শোন্—
"সৃষ্টির সেরা মানব যে তুমি ছাড় সৈনিক-সাজ,
শক্তি আজি যে সাধনার পথে, হত্যা নহে তো কাজ।"
প্রাণ খুঁজে নে রে ওরে মহাপ্রাণ,
ছাড়্ড়ে হিংসা, রাখ্ রে কৃপাণ,
হৃদয়ের বলে হ'রে আগুয়ান্—অদম্য, নির্ভয় ;
সত্যের গূঢ় শক্তির বলে সয়তানে কর জয়।
যে কহে—"অস্ত্র আন্,
ভায়ের বক্ষে হান্"—
মিত্র সে নহে, মান্য সে নহে, হোক শত বলবান্।
নর-আত্মায় গড়িতে যে চায় পশুর অধম করি,
আপন স্বার্থে অন্যের প্রাণ পাপে দিতে চায় ভরি,
তার উপদেশ না করি পরশ্
দু'হাতে বিলায়ে মৃত্যু, মড়ক
বরি ল'বে কি অনন্ত নরক পরকালে তার ফলে ?
অমর আত্মা মরণের বর মাগিবে যে পলে পলে ?
তুই কেন র'বি দূরে ?

আজি মার বন্দনা এ মহাজাতিরে মিলাইল একসুরে।
ক্ষুধা নাই, তবু অছিলায় তার
বিষপান ক'রে নিদ্ স্নান কার ?
অন্তরে দেখ্ আছে অভয়ার বরাভয় রূপ জুড়ে ;
(তুই) রুগ্ন মনের দুষ্ট ক্ষুধায় যাস্ শুধু জ্বলে পুড়ে।
ওরে সন্তান ! আজ সব তান ধর্।
এক তান কর্
সব তানে,
ছাড়্ ভাণ, তোর যাক্ প্রাণ তবু
চল্ মহাবল—
সন্ধানে।
ভগবান্ ! আজি ভক্তির মাঝে শক্তি বিতর মন্-প্রাণে,
ভাষা দাও যাতে ভেসে যায় দেশ,
ভাব দাও যাতে ভেবে পায় শেষ,
জ্বালা দাও যাতে জ্বলে মোহ, দ্বেষ—
সবে কয়—"এই পন্থা নে"—
তব 'পাঞ্চজন্য' মিলায় সিদ্ধি ত্রিংশ কোটি সন্তানে।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়।

ভাষা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

ভাষা কি—ভাষার উৎপত্তি—ভাষা ও জাতি

পরস্পরের মনোগতভাব বিনিময় করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় মানুষ অবলম্বন করে তাহাকেই ভাষা বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত প্রবর টাইলর বলিয়াছেন—উচ্চারিত ধ্বনিবিশেষের সহিত সাধারণত· সংশ্লিষ্ট ভাবের প্রকাশ ক্রিয়া ভাষা দ্বারা সাধিত হয় (the expression of ideal by means of

articulate sounds habitually allotted to those ideas)। ভাষা উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু সমস্ত উচ্চারিত ধ্বনিই ভাষা নয়—কারণ তাহার ভিতর ভাব না থাকিতেও পারে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কেত, চিত্র, গ্রন্থিযুক্ত রশি কিম্বা নানারূপ রঙ্ অথবা অন্যান্য অনেক প্রকারে কৌশল ব্যাপকভাবে ভাষা কাজ করে বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

হাত, চোখ, মুখ প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা আমরা অনেক সময় অনেক ভাব প্রকাশ করি। ভিন্ন ভাষা ভাষী দুইজন লোকের প্রথম ভাব বিনিময়ের চেষ্টায় এই জাতীয় সঙ্কেতের বাহুল্য দেখা যায়। মিশর প্রভৃতি দেশে চিত্রের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হইতে—ক্রমে এই—সমস্ত চিত্র হইতে বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। চীনদেশে একটি ভাববাচক একটি চিত্র বা তাহার অংশ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন মেক্সিকো দেশে গ্রন্থিযুক্ত রশি দ্বারা সংবাদাদি পাঠানো হইত। এখনো সৈন্য বিভাগে Signalling সঙ্কেতের দ্বারা অনেক কাজ করা হয়।

এইরূপ ভাব বিনিময়ের নানা প্রকার উপায়ের মধ্যে ধ্বনি দ্বারা ভাব বিনিময় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া মানুষের ভাষার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। আদিম মানবের পক্ষে দূর হইতে শব্দ করিয়া সঙ্কেত করা প্রশস্ত উপায় ছিল—দৃষ্টির আড়ালে থাকিলেও এই সঙ্কেত সম্ভবপর হইত এবং দূরত্ব বা অন্ধকার ইহাতে কোনও বাধার কারণ হইত না।

ভাষার উৎপত্তি কি প্রকারে হইল তাহা ঠিক করা এক প্রকার অসম্ভব। নানা মুনির নানা মত এ বিষয়ে চলিয়াছে। কোনটাই ঠিক নহে, অথচ সকল গুলিই কতক কতক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করে। বেদে এবং বাইবেলে ভাষায় দৈবী উৎপত্তি (Divine origin) সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পণ্ডিত প্রবর যেস্‌পার্‌সেন্ (Jesprsen) বলেন— আদিমানব প্রেমের নৃত্যগীত করিতে করিতে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল। গানের সুরের মধ্য দিয়াই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে—এবং শব্দগুলি ক্রমশ বিভিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আচার্য্য ম্যাক্‌সমূলর কতকগুলি মজার থিওরি করিয়াছেন। ইংরেজীতে এইগুলির নাম্ দিয়াছেন—Bow-wow, Pooh pooh. ding dong, ye-ho-ho। আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর bow wow theory বাঙ্গলা করিয়াছেন—“ভেউ ভেউ” বাদ। অন্যান্য তিনটি থিওরির নাম আমরা যথা ক্রমে থুথু, ঢংঢং এবং হেঁইয়ো হেঁইয়ো বাদ দিব। ভেউ ভেউ বাদের দ্বারা কতকগুলি শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় যেমন— ম্যাঁও (বিড়াল), ঝুম ঝুমি (এক প্রকার

খেলনা) ঘুঘু .(অনুরূপ শব্দকারী পক্ষী বিশেষ) ইত্যাদি। থুথু বাদের উদাহরণ— ছ্যা ছ্যা, ফ্যা ফ্যা, ইত্যাদি।

ঢং ঢং বাদের উদাহরণ :—টগ্ বগ্, টক্ টক্ টক্, আঁকা বাঁকা ইত্যাদি—

হেঁইয়ো হেঁইয়ো বাদের উদাহরণ :— পাল্কী বেয়ারার হুঁহুঁ ইত্যাদি

ভেউ ভেউ ও ঢংঢং বাদের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে প্রথমটিতে শব্দ অনুসারে নামকরণ হয়, এবং দ্বিতীয়টিতে শব্দ হইতে ভাবের ধারণা মনে আসিয়া পড়ে। ঝুম্ ঝুম্ শব্দ করে বলিয়া খেল্না বিশেষের নাম ঝুমঝুমি হইল, আর টগ্ বগ্ কথাটি কোনও জিনিসের নাম হইল না বটে কিন্তু ভাত প্রভৃতি ফুটিলে কিরূপ শব্দ হয় তাহার একটা ধারণা কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে আনিয়া দিল।

ম্যাক্সমুলের এই সব থিওরি এখন বিশেষজ্ঞগণ হাসিয়া উড়াইয়া দেন। য়েস্পার্সেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রোমানেসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে মানুষের ভাষা সৃষ্ট হইবার ঢের পরে কুকুর মানুষের পোষ মানিয়াছিল। কুকুর ভেউ ভেউ করিত বলিয়া তাহার নাম "bow wow" হইল ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা নয়। যাহা হউক এই কয়েকটি থিওরি হইতে ভাষার গোটা কয়েক মাত্র শব্দের উৎপত্তি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট রাশি রাশি শব্দ কোথা হইতে আসিল; ভাষা বিজ্ঞান এখনও ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। পণ্ডিতগণ কেবল মাথা ঘামাইয়া রাশি রাশি থিওরি আওড়াইতেছেন মাত্র। এ মূল তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে কিনা কে জানে।

ভাষা এবং জাতির কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে একজাতি হইলেই এক ভাষা হইবেই আর এক ভাষা হইলেই এক জাতি হইবে। ইহার কোনটাই সত্য নয়। জন্মের সহিত যেমন কেহ লিখিতে পড়িতে শিখে না, সেইরূপ ভাষাও শিখে না। ভাষাকেও চর্চ্চা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। বাঙালীর ছেলে যে একজন ইংরেজের ছেলের চেয়ে সহজে বাঙলা শিখিবে এমন নয়। অবশ্য পারিপার্শ্বিক উভয় ক্ষেত্রেই সমান অবস্থার হওয়া চাই। যদি ছেলেটিকে একবারে নির্জ্জনে রাখা যায় সে কিছুই শিখিবে না।

তবে জাতির চিন্তা করিবার ধরণের সঙ্গে ভাষার কিছু সম্বন্ধ আছে। এবং এই সম্বন্ধটা সহজে যায় না। যখন এক জাতি অপর একজাতির ভাষা গ্রহণ করে তখন তাহার চিন্তাপদ্ধতি অনুযায়ী সে ভাষাকে খানিকটা বদলাইয়া লয়।

আমেরিকার নিগ্রোরা তাহাদের ইংরেজীকে নিজেদের ভাবাপন্ন করিয়া

লইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত যাবতীয় প্রচলিত ভাষাগুলির বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির (syntax) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

ভাষার সমস্ত শব্দ বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভাগবত এই কাটামোখানা সহজে বদলায় না। আধুনিক পারস্য ভাষার শব্দ সমূহ অধিকাংশই আরবী হইতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহা মূলত আর্য্যভাষার ভাবিবার ধরণ –বজায় রাখিয়াছে এবং আরব্য প্রভৃতি সেমেটীক ভাষা হইতে আর্য্যভাষার বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির যে প্রভেদ তাহা কতকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। ভাষার জাতি বিভাগের সময় এই ভাবগত সাদৃশ্যই প্রধান লক্ষণ।

কুচবিহারের কোচেরা তিব্বতি মঙ্গোলীয় নামক মানবজাতির শাখাবিশেষের বংশধর। কিন্তু তাহারা আর্য্যভাষা বাঙ্‌লাকে কথিত ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে। রক্তের সংমিশ্রণের সঙ্গে ভাষার সংমিশ্রণ খুবই চলিয়াছে। তবে মূল ধাতটি দেখিয়া ভাষার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। রক্তের সহিত ভাষার কোনও সম্বন্ধ নাই। আয়র্লণ্ডের লোকেরা সকলেই প্রায় ইংরেজী বলে—তাহারা এবং ইংরেজরা জাতি হিসাবে পৃথক—ইংরেজরা Anglo saxon, আইরিসরা Celtic কেল্টিক। এখন আবার আয়র্লণ্ডের প্রাচীন জাতীয় ভাষার পুনরুদ্ধারের খুব চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপে ভাষা বদল হয়। সুতরাং জাতি এবং ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিছুই নাই।

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৩৪)

মধু যতটা বলিল ততটা না হইলেও রাখুর ভাগ্যে কর্ত্তামশায়ের তিরস্কারটা বড় কম হয় নাই।

নির্ম্মলার নিকট হইতে কাপড় ও ছাতি লইয়া প্রথমে সে অপরাপর যজমানদের বাড়ী পূজা সারিতে চলিয়া গেল। নির্ম্মলাদেবীর নিমন্ত্রণে যখন সে না বলিতে পারিল না, তখন সে স্থির করিল সব কাজ শেষ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইবে এবং পূজাশেষে ঠাকুরের ভোগ দিয়া নিমন্ত্রণ সারিয়া

বাসায় ফিরিবে। সেখানে কর্ত্তা মশাইকে ঠাকুরপূজার জন্ম অন্ত কাহাকেও নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া সে কলিকাতা, বোধ হয়, চিরদিনের জন্মই ত্যাগের সংকল্প করিল। সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও, রাখুচারু চারুরাখু এই ভাবটা এমন একটা উন্মত্ত করা ছায়াভাবে তাহাকে অভিভূত করিয়াছে যে, দেশে ফিরিয়া কিছুকাল নির্জ্জনে চক্ষুজল না ফেলিতে পারিলে সে যেন পূর্ব্বরাত্রির সেই স্বপ্নকথা স্মৃতি হইতে মুছিতে পারিবে না। কলিকাতায় থাকিলে তাহার পা দু'টা হয়ত কোনদিন তাহার অন্তমনস্কতায় তাহাকে চারুর বাড়ীতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আবার যাইলে আর কি সে পূর্ব্বরাত্রির সে-জীবনের সেই অভিনব-আস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে? চারুর সে সজল বিলোল দৃষ্টির ভিতর দিয়া তার সেই কিন্নরকণ্ঠের ঝঙ্কৃত মধুগীতির আবেদন—আনন্দের পূর্ণভারে আর কি তার সমস্ত হৃদয়টাকে একটা অপূর্ব্ব উল্লাসকর পীড়নে চাপিয়া ধরিবে! তার প্রাণটা কেবল বলিতেছে চারুরাখু হো'ক। কিন্তু তা হওয়ার সম্ভাবনা সে যে কল্পনার কোনও দিক দিয়া অনুমান করিতে পারিতেছে না! রাখু চারু হো'ক একথা কিন্তু মনের একটা কোণ হইতেও সে উচ্চারিত করিতে পারিল না। গৃহস্থ কন্তা বিশেষতঃ বঙ্গ পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলবধূ এমন হীনব্যবসায় অবলম্বন করিতে কেমন করিয়া এই এতবড় জনাকীর্ণ সহরের ভিতরে আসিবে? যদিই বা এ অসম্ভব সম্ভব হয়, তা সেটা তার স্বামীর কি অপরাধে হইবে? রাখুচারু একথা মনে মনে উচ্চারণ করিতে গিয়াও মৃত্যু নিজে আসিয়া যেন তার গলাটা চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিল।

সে স্থির করিল, পূজাকার্য্যে ইস্তফা দিয়া, শুধু সে দেশে ফিরিবে না, ফিরিয়া বিবাহ করিবে। সে দরিদ্র হইলেও বড় কুলীন। তাহাকে ঘর জামাই করিবার জন্ম ইহার পূর্ব্বে অনেক স্থান হইতে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল—সে রাজী হয় নাই। সে পল্লীগ্রামে বসিয়া বসিয়া অনেক ঘর জামায়ের দুর্দ্দশা দেখিয়াছিল। শুধু তাই নয়, ঘর জামায়ের পুত্র হওয়ায় যে কি লাঞ্ছনা মামীর নিকট হইতে ব্যবহার পাইয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। সেই জন্য এতকাল সে বিবাহ করে নাই, গান বাজনার চর্চ্চায় এতকাল মনটাকে সংসার হইতে সে উদাস করিয়া রাখিয়াছিল।

এতদিন পরে আবার তাহার বিবাহে ইচ্ছা হইল। বিবাহের ফল যাই হ'ক, না করিলে চারুর স্মৃতিযন্ত্রণার দায় হইতে কিছুতেই সে নিষ্কৃতি পাইবে না।

সে ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, এখানে সেখানে পা ফেলিয়া কোনও রকমে যজমানদের বাড়ীর পূজা সারিতে ব্রজেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইল। এক ব্রজেন্দ্র বাবু ছাড়া অপর সকল যজমানদের পূজা করিয়া সে একবার বাসায় ফিরিতেছিল। তখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। ছাতি লইয়াও সে পরিধেয় বস্ত্রকে ভিজা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং সে কাপড় পরিবর্ত্তনেরও তার প্রয়োজন হইয়াছিল। বাসাবাড়ীর দ্বারমুখে যেই সে প্রবেশ করিবে, অমনি সে দেখিতে পাইল হেমা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই হেমা কতকটা সঙ্কুচিতের ভাব দেখাইল। রাখু সেটা লক্ষ্য করিল। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময়েও সে আর একবার হেমার এইরূপ ভাবের মত একটা ভাব দেখিয়াছিল। কিন্তু সঙ্কোচের কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"পূজার তাগিদ করিতে এসেছ নাকি হেমচন্দ্র ?"

হেমচন্দ্র অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে উত্তর করিল—"হুঁ।"

"বাড়ীতে গিয়া তোমার মাকে বল, আমি যত শীঘ্র পারি যাচ্ছি।"

হেম এ কথার কোনও উত্তর দিতে না দিতে, পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল—"আর তোমাকে সেখানে যেতে হইবে না।"

হেমার পশ্চাতে কিছু দূরে রাখু প্রশ্ন কর্ত্তাকে দেখিতে পাইল। সে কর্ত্তা মশায়ের ঝি। নামে ঝি হইলেও কার্য্যে সে এক রকম বাসার কর্ত্রীই ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ সন্তান সেখানে থাকিয়া পুজারির কাজ করিত, তাহাদের অধিকাংশই তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিত। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যকদের মধ্যে যাহারা এই দাসীর সহিত কোনও সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে নাই রাখু তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু সে তাহাকে যে নামে সম্বোধন করিত, স্বয়ং কর্ত্তামশাই ও একদিনের জন্য তাহাকে সে কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। রাখু তাহাকে বলিত ঝি, কর্ত্তা মশাই দিবসের অধিকাংশ সময় বলিত 'ওগো'। নিতান্ত দূরে থাকিলে কিম্বা চোখের অন্তরাল হইলে কখন কখন নাম ধরিয়া তাহাকে যেন আপ্যায়িত করিত। অবশ্য অনেকেই এই সম্বোধন বাক্যের ভিতর দিয়া কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে এই পরিচারিকার একটা সম্বন্ধের আভাস দেখিতে পাইত। দেখিলেও সে কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না।

তার কথার উত্তর দিবার পুর্ব্বেই রাখু ভিতরে আর হেমা বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাখু ঝিকে বলিল—"একবারে না আজ?"

ঝি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"বোধ হয়।"

"কি বোধ হয় ঝি,—আর কি আমাকে কোনও দিন ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী যেতে হবে না।"

"বোধ হয়।"

শুনিয়া রাখুর মুখখানা সহসা মলিন হইয়া গেল, অথচ নিজে সে ঝিয়ের উত্তরের কোনও অর্থ বুঝিতে পারিল না।

ঝি তার মুখ দেখিয়া হাসিল। বলিল—"কেন যেতে হবে না বুঝতে পেরেছ ঠাকুর?"

"বুঝতে পারিনি ঝি!"

"খুব ন্যাকামি জানত দেখছি। কাল কোথায় রাত কাটিয়েছে মনে নেই?"

রাখুর মুখ দেখিতে দেখিতে আরক্তিম হইল।

"মনে পড়েছে?" ঝি হাসির তরঙ্গ রোধ করিতে পারিল না। এই বিদ্রূপ হাসি রাখুকে যেন আরও অপ্রতিভ করিয়া দিল।

ঝি বলিতে লাগিল—"ভিজে বেরালটির মত থাক, ওমা, তোমার ভেতরে এত ছিল!"

রাখু এখনও কোন উত্তর দিতে পারিল না কোনও কথা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। একবার অন্যমনস্কের মত পিছনে চাহিতেই দেখিল হেমা আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে।

রাখুর সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই হেমা সন্ত্রস্তের মত সরিয়া গেল।

তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে না দেখিয়া কথায় এইবারে অনেকটা করুণার সুর বাঁধিয়া ঝি বলিল—"গরিবের ছেলে, দু পয়সা রোজকার করতে কলকেতায় এসেছ, এমন বোকামিও করে! কলকেতা সহর—আমোদ করবার কি আর জায়গা ছিল না, তাই বেছে বেছে বাবুর মেয়েমানুষটির ঘরেই ঢুকেছ?"

রাখু এইবারে বুঝিল—পূর্ব্বরাত্রির কথা তার মনে পড়িল—সে তবে ব্রজেন্দ্র বাবুরই রক্ষিতার গৃহে আশ্রয় পাইয়া সারারাত পরম আনন্দে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে!

"তুমি কি মনে করেছ ঝি?"

সে বয়সে হাসিকে যতটা কোমল মধুর করিবার করিয়া ঝি উত্তর করিল—

"আমি ত যা মনে করবার করেইছি, আর পাঁচজনে আরও কত রকম মনে করেছে, যারা তোমার কীর্ত্তিকলাপ দেখেছে।"

রাখুর মাথাটা অবনত হইল। সেই ঝঞ্ঝাগর্ভ ঘনতমসার রাত্রি চারুর সঙ্গে তার মধুর মিলনের এত সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছিল ?

ঝি তার অবস্থা দেখিয়া কতকটা ক্ষুণ্ণ হইল। রাখুকে আশ্বস্ত করিতে সে বলিল "যা হ'য়ে গেছে তার জন্ম ভেবেত কোনও ফল নেই। কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা কর। বুড়ো যা বলবে সব কথা কাণে তুলোনা। আমি এখনি ফিরে আসছি। এসে যা বলতে কইতে হয়, আমিই বলব, তুমি কোনও উত্তর ক'র না। বলিয়াই ঝি চলিল। চলিতে চলিতে একবার মুখ ফিরাইয়া যখন সে দেখিল, রাখু পাথরের মূর্ত্তির মত ভূমির উপরে নিরর্থক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া এখনও সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে, তখন নারীসুলভ স্নেহোচ্ছল কথায় তাহাকে বলিয়া উঠিল—"পুরুষমানুষ, কিসের লজ্জা এত তোমার ? যাও বুড়োর সঙ্গে দেখা কর। আর, না পার, আমার ফিরে আসার অপেক্ষা কর। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী আর যেতে না পাও, কলকেতায় কি আর পূজো করবার বাড়ী নেই। তবে বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা করবার প্রয়োজন নেই। বাঁয়া তবলা বিছানায় গড়াগড়ি দেখে রাগে সে একবারে আগুন হ'য়ে গেছে। তুমি গরীবের ছেলে, সে বড়লোক। টাটকা রাগ হঠাৎ একটা অপমান ক'রে বসতে পারে।" বলিয়া আরও দুই চারিটা আশ্বাসের কথা তাহাকে শুনাইয়া কি বলিয়া গেল।

মাথা হেঁট করিয়া রাখু ব্রজেন্দ্র সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিল। ঝির মুখে ব্রজেন্দ্রের নাম সেটা আরও প্রখর করিয়া তুলিল। সে মনে করিতেছিল ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করিবে, তাহাকে সমস্ত ঘটনার কথা সরলভাবে বলিবে। কলিকাতা ত্যাগ ত সে করিবেই—চোরের মত ত্যাগ করিবে কেন ? ঝির কথায় বুঝিল, বাবুর সঙ্গে দেখা করায় অপমান ভিন্ন তার অন্যলাভ ঘটিবে না। চরিত্রগত দুর্ব্বলতায় বাবু ত সবল চোখে তার নিষ্কলঙ্ক মুখের পানে চাহিতে পারিবে না। লালসা-কোলাহলে বধির কর্ণ তার মুখের সত্য কথা-গুলাত তার হৃদয়ের কাছে উপস্থিত করিবে না ; হলফ করিয়াও যদি সে বাবুকে, রাত্রে যা যা ঘটিয়াছে, শুনাইয়া দেয়, এ মর্ম্মাহত ধনী শক্তিমানত তার একটা কথাও বিশ্বাস করিবে না !

ব্রজেন্দ্রের ক্রোধের মাত্রাটা অনুমান করিতে গিয়া রাখু শিহরিয়া উঠিল।

তার বেশ বোধ হইল, এখন অদৃষ্টে যাই থাকুক, চারুর ঘরে এই বাবুর চোখে না ফেলিয়া ভগবান তাহাকে বেশ্যা-গৃহে অপঘাত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভ্রমটাও সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল, কি একটা অশুভক্ষণে স্মৃতির মোহে চারুকে রাণীর মত দেখিয়া আত্মহারা সে এমন একটা কাজ করিয়াছে যে, এতদিনের দুঃখে দারিদ্র্যের ভিতরেও যে মূল্যবান বস্তুটি কাল পর্য্যন্ত কেহ তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে পারে নাই, আজ তাহা সেই তার চির-নির্ম্মল চরিত্র-খ্যাতি সহসা কর্দ্দমাক্ত হইয়া কলিকাতার পথে যে সে লোকের পদদলনে মথিত হইতে চলিয়াছে! তার নিষ্কলঙ্কতা বুঝাইবার কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া সে চক্ষু মুদিল।

মুদিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল, দীপালোকের শত সূক্ষ্ম রশ্মির তারে গাঁথা সেই অপূর্ব্ব গানের আধার চারুর হাসি-অশ্রুর প্রয়াগ-সঙ্গম মুখশ্রী। একটি পলক-ব্যাপী রূপের ইঙ্গিতে যেন আকাশ হইতে মর্ম্ম-বেদনা মাখিয়া সে তাহাকে শুনাইতে বলিয়া উঠিল—ওগো, আমাকে ভেঙে দিয়োনা।

সে স্থির করিল, ভাগ্যে যাই থাকুক, কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে একবার সে দেখা করিবে।

কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা হইতেই রাখুর যথেষ্টই তিরস্কার ভাগ্যে ঘটিল। ঘটিল তার অনেক সম-কর্ম্মীর সম্মুখে। তাহারাও বৃদ্ধের তিরস্কারের সঙ্গে দুই একটা টিট্‌কারীর কথা যোগ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। যে ভয়ে রাখু চারুর দত্ত পট্টবস্ত্র পরিয়া তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে নাই, তাহাও সে এড়াইতে পারিল না—বাড়ীওয়ালার ঘরের মেয়েরা গৃহিনী হইতে ছোট ছোট মেয়ে বউ পর্য্যন্ত রাখুর রাত্রি-বিলাস কথা শুনিতে অন্দরের দুয়ারে আসিয়া কবাটের ফাঁকে ফাঁকে চোখ দিয়া দাঁড়াইল।

সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, রাখু আপনার যা কিছু সব লইয়া ক্রুদ্ধ কর্ত্তার নির্দ্দেশ মত বাসা পরিত্যাগ করিল।

(৩৬)

ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রাখু যখন বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন যেদিক দিয়া প্রতিদিন ঠাকুর পূজা করিতে যাইত, সেই পথ ধরিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে মেয়েদের মধ্যে কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হইল।

যে সময় নির্ম্মলা ও শুভার মা'র মধ্যে তার সম্বন্ধেই কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তখন ত্রিতলে উঠিতে রাখুর মাত্র পাঁচ ছয়টা সিঁড়ি বাকি। দৈব-নির্ব্বন্ধে সে সেই কথাগুলা শুনিতে পাইল। শুনিবামাত্র তার মনে হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তার সহসা কম্পিত পদদ্বয় আর তাকে উপরে উঠিবার সাহায্য করিল না। ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সাহসও সে হারাইল।

অতি সন্তর্পণে নামিয়া আসিতে যেমন সে সর্ব্বনিম্ন সোপানে পা দিয়াছে অমনি সে দেখিতে পাইল,আধমুক্ত বক্ষ দুই হাতে ঢাকিয়া শুভা তাহাকে দেখিয়া পলাইতেছে। শুভা কলতলা হইতে স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছিল। রাখু বুঝিল চোরের মত চলিয়া আসা কাজটা তার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। নহিলে তার পদশব্দে বালিকা নিজকে সাবধান করিতে পারিত।

এখন আর সে ভুল সংশোধনের উপায় নাই বুঝিয়া পলায়নপর বালিকাকে সে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দিদি! তোমার বৌদি এই কাপড় ছাতি আমাকে আজ ব্যবহার করিতে দিয়েছিলেন, এইখানে রেখে যাচ্ছি, তুমি তাঁকে দিয়ো।"

ইহার মধ্যে শুভা কাপড় ঠিক করিয়া লইয়াছে। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"আপনি আজ পূজা করিবেন না?"

"না।"

"কেন?"

"সেটা তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর!"

"বৌদি যে আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ ক'রেছেন!"

"আমি থাকতে পারব না। আজই আমাকে দেশে ফিরতে হবে। খেতে গেলে গাড়ী পাব না। তোমার বৌদিকে ব'ল।"

উত্তরের আর অপেক্ষা না করিয়া রাখু একবারে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিল।

যদি সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টির একটা বড়রকমের ঝোঁক না আসিত আর বুঝি নির্ম্মলার সঙ্গে তার দেখা হইত না। বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া সে ক্ষণেকের জন্য বৃষ্টির বেগ হ্রাসের অপেক্ষা করিল। তাহার নিজের একটা ছাতি ছিল, কিন্তু তাহা এমন জীর্ণ ও এতস্থানে ছিন্ন, সেই ধারাবর্ষণে সেটা তাহার বিশেষ কিছু উপকারে আসিত না। যদিও ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে আর একমুহূর্ত্তও থাকিতে তার ইচ্ছা ছিল না, মানুষের মজ্জাগত আত্মরক্ষার অভিলাষ আরও কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে সদর দরজায় ধরিয়া রাখিল।

যতই রাখু ধীর হউক, শুভার মা'র মুখের কথা শুনিয়া, এক মুহূর্ত্তেই সে বাড়ীর সকলের উপরেই তাহার কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। সে সেই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল, যদি ইহার পর কখনও কোনও কালে ইহারা তার নির্দ্দোষিতা বুঝিয়া অনুতপ্ত হয়, তথাপি আর সে এ বাড়ীতে পূজারির কাজ করিবে না। ইহাদের শত অনুরোধে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে রাখুর কেমন একটা তন্ময়তা আসিল। তাহার পল্লীগত আজীবনের দারিদ্র্য কতকগুলা অভিমান সেই তন্ময়তায় প্রবিষ্ট করাইয়া তার দেহটাকে পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিয়া দিল। সহসা তার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত একদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। অমনি পশ্চাতে এক মৃদু আর্ত্তনাদ। তার বজ্রমুষ্টি এক অতি কোমল দেহে আঘাত করিয়াছে।

অতি বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া যাহা সে দেখিল, তাহাতে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল। শুভা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইতে অশক্ত, একবারে বসিয়া পড়িয়াছে। রাখু দেখিল তার অঙ্গুলি ভেদিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

"আমি একি সর্ব্বনাশ করলুম!"

"কিছুই করেন নি।" বলিয়া নির্ম্মলা অন্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সত্বর শুভাকে উঠাইয়া তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিল।

রাখু প্রাণহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নির্ম্মলা বসনাঞ্চলে শুভার মুখ মুছাইতে মুছাইতে রাখুর চোখে সমবেদনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল—"আপনি কিছু মনে করবেন না। যা কিছু ঘটেছে সব আমার দোষে। আমি অভাগী যদি আপনাকে দূর হইতে ডাকিতাম! আপনি আজ যেতে পাবেন না। আমি কোনও মতে আপনাকে যেতে দিব না।"

ঠিক এমনি সময়ে, কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া বারান্দার দিক হইতে নালু বাবু ছুটিয়া আসিল। সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে নির্ম্মলা তাহাকে বলিল—"ভট্টাচার্জ্জি মশাইকে তোর পড়বার ঘরে নিয়ে যা।" খবরদার ওঁকে যেন চলে যেতে দিস্‌নি।" বলিয়াই নির্ম্মলা শুভাকে লইয়া চলিয়া গেল। অন্দরের দোর দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল নালু বাবু এক হাতে বুচকি, অন্য হাতে রাখুর হাত ধরিয়া তাহাকে বারান্দায় তুলিতেছে।

(৩৭)

চারুর চিঠিখানা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই ব্রজেন্দ্রের সদ্‌বুদ্ধি জাগিয়াছিল, কিন্তু গঙ্গাস্নানের নামে ঘর হইতে বাহির হইয়া তখনও পর্য্যন্ত ফিরে না আসার সংবাদ তাহাকে কতকটা হতবুদ্ধি করিয়া দিল। বিশুর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়াও, চারুর গঙ্গাস্নানে যাওয়া কথাটাই ধারণা করিতে তার মনের ভিতরে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী সংশয় সহসা প্রবিষ্ট হইয়া তার বুদ্ধিকে এমন জটিল করিয়া তুলিল যে, প্রথমে সে সংবাদটাকে কোনও মতে সত্যের পার্শ্বে বসাইতে পারিল না। অথচ মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করাইতেও তাহারা তাহাকে কোনও একটা নির্দ্দেশের ইঙ্গিত করিল না।

দুই একটা বড় পার্ব্বণ ছাড়া, যতদিন চারু তাহার কাছে ছিল, একদিনের জন্যও তাহাকে সে গঙ্গাস্নানে যাইতে দেখে নাই। যে দুই একদিন সে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, ব্রজেন্দ্রের অনুমতি লইয়াই গিয়াছিল। এবং গিয়াছিল ব্রজেন্দ্রেরই গাড়ী করিয়া। দুরস্থ নদীতীরে কোনও দিন তার জ্ঞানতঃ চারু পদব্রজে যায় নাই। গঙ্গাস্নানে যাইতে কখনো যে চারুর আগ্রহ ছিল, তাহাওত একদিনের জন্য ব্রজেন্দ্র বুঝিতে পারে নাই! চারুর স্নানে বিলাস ছিল, খরচ ছিল।

সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া ঠিক ঐরকম দিনে তার গঙ্গায় যাওয়া এবং ফিরে না আসা—এই দুইটী অদ্ভুত ব্যাপার রহস্যের আকারে তার বুদ্ধিটাকে যে সংশয়-কলুষিত করিবে ইহাতে বিচিত্রতা কিছু ছিল না। তথাপি সদ্‌বুদ্ধি তখনও পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া শত সংশয়ের আক্রমণ হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল।

মনে মনে এটাত সে স্থির করিয়াইছিল, চারুর চিঠি, বামুনের সঙ্গে রাত্রিবাস, হেমার মুখ হইতে শুনা সমস্ত ঘটনা, চারুর স্নানে যাওয়াও ফিরে না আসা—এ সকলের সঙ্গে যত কিছু রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, এখন হইতে চরিত্রে আর কখন সে অসংযত হইবে না। আর যদি সত্যসত্যই চারু গঙ্গায় ডুবিয়া থাকে এবং সে নিশ্চিত বুঝিতে পারে ওই পূজারি বামুনই তার হতভাগ্য স্বামী, তাহা হইলে চারুর সম্পত্তিতে তাহাকে অধিকারী করিতে তার সমস্ত এটর্ণী বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে সে কুণ্ঠিত হইবে না। অন্ততঃ যতটা পারে ব্রাহ্মণকে পাওয়াইয়া চিরদিনের জন্য মনকে সে অনুশোচনা হইতে নিষ্কৃতি দিবে।

চারুর চিন্তায় ব্যাকুল হইতে গিয়া ব্রজেন্দ্র শেষে তার বিষয় অধিকারের চিন্তাকেই একটু গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বসিল। প্রথমতঃ সে স্থির করিল,

চারুর অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ বাহির হইতে না হইতেই যখন তার সম্পত্তি লইয়া একটা গণ্ডগোল বাধিবেই, কোম্পানীর কাগজ কয়খানা সে আর হাতছাড়া করিবে না। দ্বিতীয়তঃ নূতন বাড়ীখানার দলিল এখনও পর্য্যন্ত যখন তাহার আফিস হইতে আনা হয় নাই, তখন সেটাকে সম্পূর্ণভাবেই আয়ত্ত করিতে হইবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি। তখনকারমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিবার যতপ্রকার উপায় হইতে পারে স্থির করিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কিন্তু চারুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যেমন সে চারু ও রাখুর পূর্ব্বরাত্রির মিলন-নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিল, অমনি তার ঈর্ষাকুণ্ঠিত দৃষ্টি তার মনে একটা বিষম ক্রোধের ভাব প্রবেশ করাইয়া সমস্ত তার সদ্‌বুদ্ধিকে কুক্ষিগত করিবার জন্য অগণ্য বাহুদিয়া যেন আঁকড়িয়া ধরিল। যদি একটু শিক্ষার কোমলতা, এবং মর্য্যাদার অভিমান সান্ত্বনার আভাসে তার ক্ষুব্ধচিত্তকে অনেকটা শান্ত না করিত, তাহা হইলে নিশাশেষে হেমার মুখ হইতে ঘটনা শুনিয়া রিভলভার লইয়া সে যে অভিনয় করিতে বসিয়াছিল, রাখুকে নিকটে পাইলে অথবা চারুকে উপস্থিত দেখিলে সেই প্রকারের একটা অভিনয় না দেখাইয়া সে ক্ষান্ত হইতে পারিত না।

দেখামাত্র সে প্রথমটা প্রকৃতি হারার মত হইল। সোফার উপর সাজানো বাঁয়া, তবলা, হারমোনিয়ম উভয়ে উভয়ের সম্মুখে রাখিয়া রাখু ও চারু যেরূপ মুখামুখী বসিয়াছিল, সেইরূপভাবেই পড়িয়াছিল। সোফার নীচে খোল, দাঁড়া আরসীর তলায় অযত্নরক্ষিত বুরুষ চিরুণী, ঘরের প্রায় একরূপ মধ্যেই রাখুর ভুক্তাবশেষ বুকে লইয়া শ্বেতপাথরের থালাবাটি। এই সকল দেখিয়া এবং তাহাদের সাহায্যে চারুর ও রাখুর অবস্থান কল্পিত করিতে গিয়া সে পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা যেন প্রত্যক্ষের মত দেখিয়া ফেলিল।

সে যেন দেখিল গায়িকা চারুর বিলোল দৃষ্টি এই নবাগত বাদকের চতুর কটাক্ষের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছে। তার বাজানোর বোলের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে, চারুর সেই অপার্থিব সুরতরঙ্গ অবলম্বন করিয়া, লালসার পর লালসা তার মুখে, চোখে, অধরে, নিশ্বাসে পাগলের মত জড়াইয়া ঘরের বাতাসকে এমন কি সমস্ত বস্তুগুলাকে পর্য্যন্ত পাগল করিয়াছে। সকলেই যখন পাগল হইয়াছিল, তখন ওই ভিখারী বামুন—ওই চাঁদ হাতে করা বামন—ওই কি একাই কেবল স্থির ছিল?

প্রশ্নটা মনে উঠিতেই ব্রজেন্দ্র নিজেই তার যথাযোগ্য উত্তর আপনাকে শুনাইয়া বাস্তবিকই কিছুক্ষণের জন্য ক্রোধে প্রকৃতি হারার মত হইয়া উঠিল। পূর্ণ তিন বৎসর ধরিয়া সে যে চারুর একরূপ পূজা করিয়াছে। অর্থের পর অর্থ তার পায়ে ঢালিয়া অলঙ্কারের পর অলঙ্কারে তার অঙ্গ সাজাইয়া তাহার শান্ত সুশীলা স্ত্রী আজিও পর্য্যন্ত যে আদর তার কাছে পায় নাই, তার শতগুণ আদর আপ্যায়ন ইষ্টদেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলির মত চারুর শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে সে উপঢৌকন দিয়াছে। এততেও সে সর্ব্বনাশী বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ইতস্ততঃ করিল না!

সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা মনে করিতে সাহস না হইলেও চারুর চিঠির অনেক কথাতেই ব্রজেন্দ্রের বিষম সন্দেহ হইল। তার গঙ্গায় ডুবিয়া মরাটা সে কিছুতেই মনে আনিতে পারিল না। রাত্রির ক্রিয়া কলাপ সমস্তই বিদিত হইয়াছে জানিয়া বিশ্বাসঘাতিনী বাড়ীর আশে পাশে কোনও স্থানে গা ঢাকা দিয়া আছে। কোথায় আছে, ঝি চাকর দুজনেই, অন্ততঃ ঝি নিশ্চয়ই জানে।

তথ্য বাহির করিবার নানারূপ চেষ্টা যখন ব্রজেন্দ্রের ব্যর্থ হইল তখন সে উভয়কে যত পারিল তিরস্কার করিল এবং যখন তাহাদের নির্দ্দোষিতার হাজার রকমের কৈফিয়তে তার কর্ণ বধির হইবার উপক্রম করিল, তখন সে মনে মনে স্থির করিল চারুকে যে কোনও উপায়ে জব্দ করিতে হইবে। নহিলে কি হঠাৎ একটা দৃষ্টির নেশায় পড়িয়া পাপিষ্ঠা ব্রজেন্দ্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তি ওই বামুন-নামধারী একটা বর্ব্বরের সেবায় উড়াইয়া দিবে।

ব্রজেন্দ্রের যখন ঠিক এইরূপ মনের অবস্থা, তখন হেমা তার তত্ত্ব লইতে নির্ম্মলা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সেও গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চারুর রাত্রিকালের বিলাসচিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সুতরাং আগে হইতেই মোহগ্রস্ত প্রভুকে কথায় উত্তেজিত করিতে তার বিলম্ব হইল না। সেই উত্তেজনার মুখে ব্রজেন্দ্র তাহাকে বলিয়া দিল, বামুন যাতে তার বাড়ীর ঠাকুর আর স্পর্শ না করে তার ব্যবস্থা করিতে।

চারু মরিয়াছে এবং বাঁচিয়াছে এই দুইটা অনুমানের ভিতরে ব্রজেন্দ্র যত পারিল চিন্তার একটা অভঙ্গ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। যখন তার মনে হইল চারু বাঁচিয়া আছে, তখন সে ঘরের ফরাসের উপর চিন্তাচঞ্চল মস্তক লইয়া বহুবার পাদচারণ করিল। যখন সে বুঝিল মরিয়াছে, তখন তার চিন্তানত

মাথা চারুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির যেগুলা অতি সহজে হস্তান্তরিত করিতে পারা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল।

* * * * * *

চারু মরিয়াছে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া এবং সে জন্ম যথা কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কলাশিল্পে সত্য

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

শিল্প সম্বন্ধে পুরাতন ও নূতন ভাবুকদের জন্য এক চিরন্তন বিবাদ রহিয়া গিয়াছে। পুরাতনপন্থীরা স্বভাবতঃই বয়োধর্ম্মবশতঃ সংরক্ষণশীল, আর নূতন ভাবুকের দল চিন্তারাজ্যের সব বাড়ীগুলাই ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়। কলাশিল্পে—অর্থাৎ কাজে, চিত্ররচনায় ও ভাস্কর্য্যে এই বিষয়টা গভীরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গের জোয়ার যেমন বাঁধ বাঁধিয়া সীমাবদ্ধ করা যায় না, তেমনি নূতনের দল কোন বাধাই মানিতে চায় না। ফরাসী নাট্যকার ব্রিয় (brieux) একখানা নাটক লিখিলেন—"Damaged goods" নাটকের বস্তু—উপদংশ—ঘটিত ব্যাধি সমাজশৃঙ্খলার অভাববশতঃ কেমন করিয়া পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। ওস্কার ওয়াইল্ডের 'Salome' ইবসেনের Ghosts, বিয়রন্‌সনের Marit ইত্যাদি আজকালের সৌখীন সমাজ পাঠ্য বইগুলি নবীনগণের মধ্যে আদর লাভ করিলেও বয়োবৃদ্ধগণের নিকট ইহারা দুষ্পাচ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইয়োরোপের যে দেশের কথাই ধরি না কেন, খ্রীষ্টান সভ্যতা যে খ্রীষ্ট প্রদর্শিত পথে চলিতে পারে নাই, তাহা ইয়োরোপীয় সাহিত্যালোচনায় বেশ বোঝা যায়। তাই বোধ হয় দার্শনিক অধ্যাপক Seeley তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত Ecce Homo নামক পুস্তকে খ্রীষ্টের অতিমানুষ ও মানুষ মূর্ত্তির সমন্বয় ব্যাখ্যা করিতে নামিয়াছিলেন।

বৃদ্ধের দল নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিবেন—'সাহিত্যকে ধাপার মাঠ করিলে তাহাতে জোর ফসল ফলাইতে পারিবে সত্য, কিন্তু ও ভুমি যে দেবোত্তর করা

চলিবে না! ও কলুষ ভূমিতে দেবতার দেউল কেমন করিয়া নির্ম্মাণ করিবে?' তাঁহাদের মতে সাহিত্যে 'সুরুচি' বলিয়া একটা মস্ত বড় জিনিষ আছে। অবশ্য, এটা এই দেশের মত। যে পাশ্চাত্য দেশ আমাদের ভাষা ভাব, ধ্যান ধারণা, আশাআকাঙ্ক্ষা এমন অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, সেই দেশের Laus Veneris বা মকরকেতনের স্তবোক্তি আমাদের মস্তিষ্কে যাহাতে কোনও রূপে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য তাঁহারা আমাদের সবকটা ইন্দ্রিয়ের দ্বার একবারে বন্ধ করিয়া দিতে বলেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, উদ্দেশ্য লইয়া কখনো কোনও শিল্প রচনা হইতে পারে না,— হইলেও সে শিল্প সর্ব্বজন গ্রাহ্য বা Classic হইতে পারে না। শিল্পীর মন আকাশের বায়ুর মত স্বৈরগতি, ঝরণার জলের মত অবিরাম ও উদ্দাম। নদী কবে পাহাড়ের নিভৃত নির্জ্জন আঁধার কন্দর হইতে বন্ধুর কঠোর কূলভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে নিজেই জানেনা, কিন্তু তবুও তার ছোটার বা বহিয়া যাইবার বিপুল আবেগ একটুও কমে নাই। শিল্পীর মন যখন কোনও একটা বিশেষ কল্পনাসৃষ্টির মোহে আবেশময় হইয়া পড়ে, তখন সে বুঝিতেই পারে না যে কোথায় তাহার শেষ! সব সৃষ্টির মূলে এই আঁধার, এই গোপনতা, এই আনন্দ বিভোর আত্মবিস্মৃতির ভাব। ধ্যানপ্রশান্ত শিব যেমন আপনার ধ্যান লোকেই আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সিসৃক্ষু শিল্পী তেমনি সৃষ্টির মোহে আপনার মধ্যেই আপনি আত্মসংবৃত হইয়া যান। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া শিল্পী আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৌশল দেখাইতে পারেন নাই, যদিও বা দেখাইতে চেষ্টা করেন,সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া যায়।

সুতরাং শিল্পীর রচনার মূলই যখন উদ্দেশ্যহীন, তাহার বিরুদ্ধে কোনও সুরুচি বা কুরুচির উদ্দেশ্য আনা চলে না। অন্ততঃ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ব্যতিব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। পাখী গান গায়—কারণ গান তাহাকে গাহিতেই হইবে, সে গান শুনিয়া কেহ আনন্দ পা'ক আর না-ই পা'ক, তাহাতে তার কিছু আসে-যায় না। যুঁই ফুল ফুটিলেই সৌরভ ছুটিবে, কিন্তু ফুল সে সৌরভের উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া কখনো গন্ধের নির্য্যাস প্রকাশ করে না। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' আগাগোড়া পড়িয়া গণিতজ্ঞ নিউটন্ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'And what does it prove—কি বুঝাতে চায় বইখানা?' শিল্প যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় ও শিল্পীর প্রাণের কথাটী অভিব্যক্ত করে, তাহা হইলে সে শিল্পটী জনসমাজে চিরকালের আসন পায়। মানবের হৃদয়ের যেগুলি

মুখ্য বৃত্তি—দয়া, প্রেম, বাৎসল্য, প্রতিশোধেচ্ছা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি ইহারাই উচ্চদরের শিল্পীগণের কল্পনাকেন্দ্র অধিকার করিয়া থাকে। পুস্তকের যেখানটা আমাদের খুব ভাল লাগে, সেখানটা এইরূপ মনের একটী সহজ, অখণ্ড ও সরল ভাবই প্রকাশ করে। লেডী ম্যাকবেথের উন্মাদ অবস্থার কাহিনী, প্রতি-শোধপরায়ণ ওথেলোর ডেসডিমনাকে হত্যা, পাপভ্রষ্ট আডামের ঈভ্‌কে ক্ষমা, এব্‌সালোমের মৃত্যুতে করুণ খেদোক্তি—সাহিত্যে এইগুলি সহজেই আমাদের হৃদয়মন সমবেদনাতুর করিয়া তোলে। তাই শ্রেষ্ঠ রচনার রসসৃষ্টিভেদে আমাদের মানসিক ভাবটীও তদনুরূপ ভাব-প্রণোদিত হয়।

কলাশিল্পের যে মূর্ত্তি অমোদের চোখে পড়ে, তাহা সত্যেরই মূর্ত্তি। সত্যকে মিথ্যার আচরণ দিয়া শিল্পী কথনো প্রকাশ করেন না। তাই Rowley Poems এর রসমাধুর্য্য যে কৃত্রিম, তাহা রসগ্রাহীর নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। জনন-ক্রিয়াটা যে সকলের কাছে 'প্রকাশ্য গোপনতা (open secret of nature) তাহা জার্ম্মান কবি গয়টে একদিন বন্ধু একার্‌মান্ (Echermann) এর নিকট বলিয়াছিলেন। এই প্রকাশ্য গোপনতাটা আমরা যতই লুকাইয়া রাখি না কেন, সে কেবল আমাদের মনকে চোখ ঠারা! অতএব ইহাতে শিল্পীরও অধিকার আছে। শিল্পী বিশ্বের মহেশ্বর—সর্ব্বত্র তাহার অবারিত দ্বার। শিল্পীর এই স্বাধীনতাটুকু তিনি নিজ কল্পনাশক্তির বলেই পাইয়া থাকেন। ইহার জন্য কোনও সমালোচকের নিকট charter বা ছাড়-পত্র তাঁহাকে নিতে হয় না। শিল্পী সেক্‌স্‌পীয়রের ভাষায় 'unchartr'd libertine'. সমগ্র ইয়োরোপীয়ান সাহিত্য গ্রীশের গথিক্ ও আওনিক্ (Gothic and Ionic) ভাবে প্রবুদ্ধ। গথিক্ সাহিত্যের ধারা ঐরাবত-গতির মত, আর আইওনিক্ সাহিত্যের ধারা সর্প-বিসর্পী সূক্ষ্ম গতির মত। গ্রীশ সভ্যতা সুরুচি ও কুরুচির দোহাই দিয়া সাহিত্যের গণ্ডী কদাচ সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয় নাই! আইওস্ ষ্টেফানস্, (বা কুসুম-মুকুটশোভী আইওনিয়া) সমগ্র জগৎটাই শিল্পীর ইম্পীরিয়ালিজ্‌মে আনিয়া দিয়াছিল। তাই সেখানে ফিডিয়াস, হোমর, ঈস্‌কাইলাস, সফোক্লিস ও প্লেটো। আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠি ত বড় বেশী লম্বা নয়, সুতরাং আমাদের জন্মগত সংস্কার লইয়া কোনও সাহিত্যের আলোচনা করিয়া যদি সেখানে আমাদের সংস্কার-বিরুদ্ধ কিছু দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের নাসিকা-কুঞ্চন না করাই ভাল।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বা কলাবিৎগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

এই কারণেই সমাজে অনাদৃত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী এই জন্যই একদল লোকের নিকট চির-নিন্দিত হইয়া আছে। বৈষ্ণব কবিগণের এমন অনেক রচনা আছে যাহাতে রূপকের কোনই অবসর থাকে না। সেগুলি যেন নিছক কাম-স্তুতি। ইহা সত্য হইলেও মানবজীবনে যে বৃত্তিটা নিয়ন্তারূপে গোপনে সৃষ্টির ধারা সনাতনকাল হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন্ সাহসে যুদ্ধ প্রচার করিব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সত্যকে লুকাইয়া রাখা যায় না, রেডিয়ামের মত ইহা বাহির হইয়া পড়িবেই।

কিন্তু এই যুক্তিতেও প্রাচীনের দল নীরব হইবেন না। তাহারা বলিবেন, 'মানিলাম, বাপু, তোমার কাম-রচনার সার্থকতা। কিন্তু ওটার উপর অত ঝোঁক (emphasis) দাও কেন, বলত? কাজকর্ম্ম না পেলেই কি খুড়ার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা?'

সাহিত্যে যাঁহারা বিদ্রোহবাদী, তাঁহারা নিজের প্রতিভার গতি হিসাবে স্বকীয় পন্থা স্থির করিয়া লন। এইরূপে ভিক্টোরিয়া যুগের শেষ সময় সুইন্‌বার্ণ-প্রমুখ 'কমলবিলাসী' কবিকুলের (Fleshly school of poets) উদ্ভব হইয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও ভাবের নগ্নতাই (Eterde sur la nude) যাঁহারা স্বীয় শিল্পের মুখ্য উপাদান করিয়া লইয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহারা হিন্দুবধূর লজ্জাবরণগুণ্ঠিতা মূর্ত্তি দেখাইবেন? এ যে অদ্ভুত দাবী!—পরন্তু আমাদের মনের ভাবের বাহ্য প্রচার হইলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল? প্রতিভার বিকাশ 'মৌনং হি শোভনং' উক্তি মানে না, এই যা দুঃখ! বিশাল বিশ্বসৃষ্টির মূলে সর্ব্বত্রই একটা উদ্দাম প্রকাশের ইচ্ছা। যৌবন লইয়াই সৃষ্টি। বৃদ্ধের জীবনেও এই উষার অপূর্ব্ব তারুণ্য ফুটিয়া বাহির হয়। তাই আমেরিকান্ লেখক লাওয়েল্ গয়্‌টের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে জীবনের দুই দিকেই তিনি কিশোর (He was a child at both ends of his career')। সৃষ্টি এই চিরকিশোরকে লইয়াই আপন অভীষ্ট পথে অনন্তকাল ধরিয়া ছুটিয়াছে। জীবনে যাহা সত্য বলিয়া পূজা করি, আদর করি, বুকে টানি,—শিল্পেও তাহার সমান পূজা, সমান আদর, সমান সম্মান। 'ভারতীয় শিল্পকলা পদ্ধতি' তাই এতদিন অনাদর ও উপেক্ষার আওতায় পড়িয়া আজ সমাজে একটু স্থান পাইয়াছে কিন্তু এখনও 'জলাচরণীয়' হইতে পারে নাই। চিরাচরিত প্রথাগুলি বীজ গণিতের নিয়মের মত—$(a \times b)^2 = a^2 \times 2ab + b^2$। শিল্প কিন্তু এই নিয়মের গণ্ডীতে ধরা পড়ে না। তাই শিল্পের সাধনা—কঠোর সত্যের সাধনা।

হৃদয় যখন অরুণ শতদলের মত বিকচ প্রফুল্ল হইয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই শিল্পের প্রকাশ হয়। এমন কথা বলিতেছিনা যে কুরুচিপূর্ণ পুস্তক বা শিল্পমাত্রই আদরণীয় বা উচ্চভাবদ্যোতক। কিন্তু যে শিল্পে শিল্পীর যথার্থ মূর্ত্তিটী ধরা পড়িয়াছে, তাহা আর শিল্পীর নিজস্ব 'সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত থাকে না,—তাহা তখন সর্ব্বলোকের ও সর্ব্বকালের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। আর যথার্থ শিল্প কয়টাই বা দেখিতে পাওয়া যায়? তাহা অবতারের আবির্ভাবের মতই কদাচিৎ পাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের মত গরলপানেই শিল্পীর নিবিড় আনন্দ, সেই গরলপানের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে শিল্পী যুগে যুগে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ানো না গেল॥'

অবসাদ

[শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক]

বলি বক্ষে কেন রে থেমে এলো ঘন স্পন্দন?
কেন কণ্ঠে রে তোর ক্ষীণ হয়ে এলো জয়বন্দনা গীতি আজ?
কেন অর্দ্ধেক পথে থমকি দাঁড়ালি,
উচ্ছ্বসি ওঠে হাহাস্বরে ভীরু ক্রন্দন?
বলি কম্পিত বুকে অঙ্কিত, একি!
কিসের অলীক ভীতি লাজ?
এলো ক্ষীণতর হয়ে জয় বন্দনা গীতি আজ!
ওই তীর্থ যে তোর দেখা যায়,—নহে বেশীদুর!
তবু বন কণ্টকে ছিন্ন চরণ
পশ্চাতে কর দৃক্‌পাত্ ওরে শ্রমাতুর?
ছি·ছি! রক্তে কি তোর জ্বলে নাই তবে শাশ্বত হোমশিখা?
ললাটে কি তোর শোভে নাই তবে
সত্যের পূত সিতচন্দন-লিখা?
হায় পরাণে কি তোর বাজে নাই তবে মুক্তির বীণা রে?

ওহো তা'না হলে কেন আঘাতে কাঁদিয়া—
লুটিয়া পড়িছ ধূলায় ভূতলে বনবীথি মাঝ ?
এলো ক্ষীণতর হয়ে জয় বন্দন গীতি আজ !
কেন মন জোড়া তোর অবসাদ এত অবসাদ ?
কেন আলস আসিছে অঙ্গেতে হায়,—
মিটিয়া গিয়াছে আজি কিগো তবে তব সাধ ?
কেন অবসাদ—এত অবসাদ ?
বলি আগুণ জ্বালান কথার আড়ালে
আপন লুকায়ে উল্লাসে তুই ছুটিয়া চলিলি কদিন বেশ !
ভাবিলি মানসে এইবার তোর
দুয়ারে এলোরে সে মহাতীর্থ, —স্বাধীন দেশ !
একি ছেলে খেলা—মিছে ছেলে খেলা ?
একি বাক্য-বাতাসে বালির দেওয়াল ঠেলে ফেলা ?
ওরে চল্ চল্ জোরে চল্ চল্ !
আজি আত্মায় তোর উঠুক্ জ্বলিয়া সত্যের জ্যোতি জ্বল্ জ্বল্ !
আজি সুপ্তি মাখান মুক্তি ব্যথায় ঝরুক অশ্রু
নয়নে রে তোর ছল ছল !
তুই চল্ চল্ আজি চল্ চল্ !
আজি কর্ম্মের ঘায়ে ভেঙে ফেল্ —ফেল্
পাষাণ-কঠিন সব বাঁধ !
কেন অবসাদ —মিছে অবসাদ ?

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

পিঙ্গলের অতীত জীবনের প্রায় কোন কথাই আজ আমার আর তেমন সুস্পষ্ট মনে নাই। কেবল তিনি যে সাধু হইয়া সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছিলেন, পরে আমেরিকায় গিয়া মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িবার সময় তথাকার বিপ্লবদলের সংস্পর্শে আসেন, এই টুকুই এখন মনে আছে, কিন্তু কেমন করিয়া এবং কেন প্রথমে সাধু পরে ইঞ্জিনিয়ার ও তৎপরে বিপ্লবপন্থী হইলেন তাহা আর আমার কিছুই মনে নাই, পিঙ্গলেও এ বিষয়ে আরও কিছু বলিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

এই অধ্যায় হইতে আমার বলিবার অনেক কথাই যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাই হয়ত কত কথা আর বলা হইবে না। এই ভুলে যাওয়া ও মনে থাকার সহিত আমার মনে হয় আমাদের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমাদের স্মৃতিপটে কত বড় জিনিষ ছোট হইয়া যায়, ও ছোট জিনিষ বড় হয়, আবার অনেক কথা কেমন আমরা ভুলিয়াই যাই তাহার অর্থ বোধ হয় এই যে যাহা আমাদের স্বভাবের অনুকূল যাহা আমাদের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় তাহা ঘটনাই হউক বা কোনও দার্শনিক মতই হউক, অথবা আর যাহাই হউক না কেন, তাহা যেন জ্ঞাতসারে আমাদের স্মৃতিপটে ছবির মত আপনিই অঙ্কিত হইয়া যায়; আর যাহা আমাদের স্বভাবের প্রতিকূল তাহা হয় ভুলিয়া যাই আর না হয়ত যেন কেবল খণ্ডন করিবার জন্যই তাহাকে গ্রহণ করি এবং এই খণ্ডন করিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি ও ঘটনা আমাদের সাহায্য করে সেগুলিও বয়স ও অভিজ্ঞতার সহিত অর্জ্জন করিতে থাকি।

আর একদিন আণ্ডামানে থাকিতে, বোধ হয় রামেন্দ্রবাবুর জিজ্ঞাসা অথবা বিচিত্র প্রসঙ্গ পড়িয়া ঠিক এইরূপই আরও নানারূপ চিন্তার ধারা মনের মধ্যে গভীরভাবে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং এগুলি আমি একটি নোট বুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। উপেনদাকে প্রায়ই সেগুলি আমি দেখাই-

তাম,উপেনদা ভাল বলিলে মনে বড় আনন্দ হইত। কি করিয়া সেই নোট বইটি নষ্ট হয় আণ্ডামানের কাহিনীর সহিত তাহা বলিব।

পিঙ্গলের কাশী আসিবার দিনদুইএকের মধ্যেই তাঁহাকে পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিঙ্গলের বিশেষ অনুরোধ ছিল যেন আমরা পাঞ্জাবে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বোমা পাঠাই; সেই জন্য পিঙ্গলেকে বলা হইয়াছিল যে বোমা পাঠাইতে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু এক একটি বোমা করিতে প্রায় টাকা ১৬ করিয়া খরচ, তাই টাকার সাহায্য না পাইলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বোমা পাঠান সম্ভব হইবে না। তাঁহাকে পৃথ্বী সিং ও কর্ত্তার সিংদিগের কথাও বলা হইয়াছিল। এই টাকার জন্যও পাঞ্জাবীদের যথাযথ খোঁজ লইবার জন্য পিঙ্গলে পাঞ্জাবে গেলেন। পিঙ্গলের নিকট তাঁহার কয়েক-জন সঙ্গীর ঠিকানা ছিল। প্রায় সপ্তাহকালের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। রাশুদারও পাঞ্জাবে যাইবার এখন আর কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু তাঁহার যাইবার পূর্ব্বে আমি আর একবার পিঙ্গলের সহিত পাঞ্জাবে গেলাম।

ডিসেম্বর মাসের সকালবেলায় কন্‌কনে শীতে সাধারণ হিন্দুস্থানির বেশে আমিও পিঙ্গলে অমৃতসর সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমি পাঞ্জাবি ভাষা বলিতে পারিতাম না, কিন্তু পিঙ্গলে পারিতেন। আমরা একটি গুরুদ্বারায় আসিয়া নামিলাম। এইখানে পিঙ্গলে একজন পাঞ্জাবি নেতার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইঁহার নাম মূলাসিং।

মূলাসিং শ্যাংহাইতে পুলিশের কাজ করিতেন ও সেখানেও পুলিশ ধর্ম্মঘট কারীদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এবারে পেনাঙ্গের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীদিগের সহিত ও পরিচয় হইল। এই সময় গ্রামের অনেক শিখদিগকে এখানে যাওয়া আসা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা অধিকাংশই চাষা মজুর শ্রেণীর লোক, কিন্তু তাঁরাও দেশের কাজের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, শিখসম্প্রদায়ের এমনই শিক্ষা দীক্ষা। ইঁহাদের কাহার ও কাহার ও শরীর দেখিতে যেন ঠিক দৈত্যের মত ছিল।

এইবারে আমি মূলাসিংকে কেন্দ্রের আবশ্যকতা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি এবং ইহার পর হইতে মূলাসিংই কেন্দ্রের ভার লইয়া বসেন। কিন্তু মূলাসিং এইরূপে কেন্দ্রে না বসিলেই ভাল হইত।

পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশাগত কর্ম্মীরা কর্ম্মের অভাবে ও খাওয়া দাওয়ার

অসুবিধায় খুঁত খুঁত করিতেছিলেন এবং ইঁহাদের অনেকের মধ্যেই এক অসন্তোষের ভাব গুমরিয়া উঠিতেছিল। ইহার জন্য মূলাসিংই প্রধানত দায়ী ছিলেন। এই সব কর্ম্মীরা অনন্যমনা হইয়া দেশের কাজ করিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে বাড়ী ঘর ইত্যাদি সব ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহই অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন না বা তখনকার অবস্থায় করিবার উপায়ও ছিল না। এই অবস্থায় যদি পেটের জন্য এ'বেলা ও'বেলা কর্ত্তাদের নিকট অর্থের তাগাদা করিতে হয় ত সত্যই তাহা সকলকারই বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। ইঁহারা সকলেই থাকিতেন গুরুদ্বারায়, খাইতেন সন্নিকটস্থ হোটেলে। আমাদের দেশে দেশের কাজ করিতে গিয়া অনেক সময়ই এইরূপ নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিই অনেকের মনে বেদনা দিয়াছে এবং তাহা হইতে অনেক সময় অনেক অনর্থও ঘটিয়াছে। তাই অনেক সময় মনে হয় আর্থিক হিসাবে স্বাধীন না হইতে পারিলে দেশের ও দশের কাজে নামা উচিত নহে; আবার ইহাও দেখিয়াছি, আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে যাইয়া অনেক সময়ই অর্থোপার্জ্জনই সার হইয়া পড়ে, এবং অনন্যমনা হইয়া দেশের কাজে না লাগিলে প্রায়ই কোন কাজ হয় না। আবার অন্যদিকে কর্ম্মের অভাবেও অনেক দল নষ্ট হইয়া গিয়াছে! এই সময় পাঞ্জাবে উপযুক্ত নেতার অভাবে অনেক কর্ম্মীই এইরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন; কর্ম্মহীনতায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, অথচ কর্ম্মীরা কর্ম্ম খুঁজিয়া পাইতেছেন না। রাসবিহারীই ঐরূপ নেতা ছিলেন যিনি উন্মত্ত জনসংঘকে কতক্ পরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিলেন। আমি আপাততঃ এই গোলমাল যতটুকু পারি শোধরাইবার চেষ্টা করিলাম। মূলাসিংএর নিকট শুনিলাম অনেক রেজিমেণ্টই বিপ্লবের সময় দেশবাসীর দিকেই যোগ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে। যে সকল রেজিমেণ্টে তখনও লোক যায় নাই তাহার তালিকা করিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশাগত কর্ম্মীদিগকে সেই সব রেজিমেণ্টে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

মূলাসিংহের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া পিঙ্গলে অন্যান্য পরিচিত শিখদিগের খোঁজে "মুক্তসর"এর মেলায় চলিয়া যান। এই মুক্তসর মেলার পশ্চাতে এক অপূর্ব্ব ইতিহাসের কথা পাঠক বর্গকে না শোনাইলে আমি কিছুতেই সোয়াস্তি পাইব না :—

একবার "আনন্দপুর" দুর্গে গুরুগোবিন্দ সিং স্বীয় পরিবার পরিজন বর্গকে লইয়া প্রায় সাত মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন! এই অবরোধ ব্যাপারে উভয়

পক্ষই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। মুসলমান পক্ষ হইতে "আনন্দপুর" ত্যাগ করিবার জন্ত গুরুর নিকট বারম্বার প্রস্তাব আসিলেও গুরু তাহাতে সম্মত হইলেন না। গুরু কোন মতেই সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া অনেক বহির্গমনেচ্ছু শিখেরা গুরুমাতা গুজরীকে স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন। গুরু গোবিন্দ সিং কিন্তু তবুও স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ক্ষুধার তাড়নায় ও অবরোধের নানা জ্বালায় কিন্তু অনেক শিখেরাই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পেটের জ্বালায় তখন তাঁহারা গুরুর আদেশও লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত। তখন গুরু গোবিন্দসিং বলিলেন—"তোমরা এতদিন শিখ গুরুর আশ্রয়ে ছিলে, এখন ক্ষুধার তাড়নায় গুরু বাক্য লঙ্ঘন করিয়া শঠদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়াছ, ইহাতে শিখ গুরুর দায়িত্ব কাটিয়া গেল; অতএব সকলে তদনুরূপ "বে-দাওয়া" লিখিয়া দিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর।" কেবল ৪০ জন শিখ ব্যতিরেকে আর সকলেই ঐরূপ "বে-দাওয়া" লিখিয়া দিয়া গুরুকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে গুরু গোবিন্দ সিংকেও সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল এবং শত্রু তাড়িত হইয়া তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সেই ৪০ জন শিখ কিন্তু কোন অবস্থায়ই গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে গুরু গোবিন্দ সিং মদ্রদেশ আসিয়া পৌঁছিলে সেই "বেদাওয়া" শিখদিগের অনেকে আসিয়া গুরুদেবের সহিত দেখা করেন। তখন গোবিন্দ সিং বলেন—তোমাদের ইচ্ছা হয় "আমরা শিখ নহি এই কথা লিখিয়া দিয়া তোমরা চলিয়া যাইতে পার।" তখন পুনরায় ৪০ জন শিখ "আমরা শিখ নহি" এই কথা লিখিয়া দিয়া গুরু দেবকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এই বিপদের দিনে শ্রীগুরুকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার কিছু পরেই তাঁহাদের মনে বিষম অনুতাপ উপস্থিত হয়। এদিকে "খেদরানা তালাও" নামক এক পুষ্করিণীর নিকট শত্রুপক্ষ পুনরায় গুরু গোবিন্দসিং এর দলকে আক্রমণ করিল। ঘোর সংগ্রাম করিতে করিতে গুরু গোবিন্দসিং দেখিলেন যে শত্রু পক্ষকে আর এক দল কোথা হইতে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে; গোবিন্দসিং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না উহারা কারা। মুসলমানেরাও এই নবাগতদের উন্মাদনায় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর প্রায় সকলেই ধরাশায়ী হইলেন। এইরূপ এক মুসলমানের বল্লমে ধরাশায়ী মৃতদেহ তুলিয়া দেখা গেল মৃতদেহ নারীর। ইঁহার নাম মায়ী ভাগো, ইঁহারই পরামর্শে ও প্রেরণায় "বেদাওয়া"

শিখগণ স্বীয় দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানের পর গুরু গোবিন্দসিং রণস্থলের প্রতি মৃত শিখের নিকট গিয়া রণক্লান্ত মুখ মুছাইয়া পিতার ন্যায় আদর যত্ন করিতেছিলেন। অবশেষে একজনের দেখিলেন তখনও প্রাণ আছে। ইঁহার নাম মহাসিং। মহাসিংএর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে নানা প্রকারে আদর যত্ন করিতে করিতে গুরু গোবিন্দ জিজ্ঞসা করিলেন "মহাসিং তুমি কি চাও!" মহাসিংএর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। মহাসিং বলিলেন "আমাদের লেখা আমরা শিখ নহি' পত্রটি নষ্ট করিয়া ফেলুন। এতক্ষণে গুরুজি বুঝিলেন এ দিকে কাহারা যুদ্ধ করিতেছিল। দেখিলেন সেই ৪০ জনাই এখানে প্রাণ বলি দিয়াছেন। মৃতদেহ মধ্যে নারী দেহও দেখিতে পাইলেন। গুরু গোবিন্দ সিং সেই "শিখ নহি" পত্রটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মহাসিং ও মহানিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলেন। তখন গুরুগোবিন্দ সিং উপস্থিত সকল শিখকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যে 'খালসা' মধ্যে এমন মহাপ্রাণ আছে সে 'খালসা" সহজে নষ্ট হইবে না। একটিও ভক্তপ্রাণ যে স্থানে আত্মাহুতি দেয় সেস্থান পবিত্র হইয়া যায়। যেখানে এতগুলি মহাপ্রাণ প্রাণ বলি দিয়াছেন—অতঃপর সেই স্থানের নাম "মুক্তসর" হইল এবং এস্থানের জলাশয়ে যে স্নান করিবে সেই মুক্ত হইবে।" এইরূপে 'মুক্তসর' মেলার পত্তন হয়। ইহা শিখদিগের মহা মেলা; এখানে প্রতিবৎসর প্রায় লক্ষাধিক শিখ এক হইয়া থাকেন। শিখদিগের প্রতি উৎসবের সহিতই এইরূপ এক একটি অপূর্ব্ব ইতিহাস কথা জড়িত আছে এবং প্রত্যেক শিখই এইরূপ উৎসবউল্লাসের মধ্যেই লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছেন। আমার বিশ্বাস শিখেরা ভারতের এক অপূর্ব্ব জাতি।

পিঙ্গলে যখন "মুক্তসর"এর মেলা হইতে ফিরিলেন তখন কর্ত্তার সিং, অমর সিং ইত্যাদি সকলেই গুরুদ্বারায় উপস্থিত হইয়াছিল। কর্ত্তার সিং আমায় দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "রাসবিহারী কবে আসিবেন?" আমি বলিলাম, "এই এইবার তিনি আসিবেন, এখানে থাকিবার একটা সুবন্দোবস্ত করা হউক, আপনাদেরও কার্য্যের একটু শৃঙ্খলা হউক তবেত আসিবেন।" এই সময় আমি কর্ত্তারসিংকে কেন্দ্রের আবশ্যকতা বিশেষ করিয়া বোঝাই এবং বলি যে মুলাসিং এই কেন্দ্রের ভার লইয়া বসিয়াছেন। রাশবিহারীর জন্য অমৃতসর সহরে দুইটি ও লাহোরে দুইটি বাড়ী লইতে বলি। এ সব বিষয়ে দাদা পূর্ব্ব হইতেই আমায় সব বলিয়াছিলেন;

জেন একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়ি নিজেদের হাতে রাখা হয়। এইরূপই ব্যবস্থা হইল; আমি অমৃতসরের বাড়ি স্বয়ং দেখিয়া পছন্দ করিলাম। লাহোরের বাড়ির জন্ম আর একজন গেলেন। কর্ত্তারসিং এর নিকট পাঞ্জাবের তদানীন্তন অবস্থায় কথা শুনিয়া বড় আশান্বিত হইলাম, ভাবিলাম এইবার একটু কাজের মত কাজ হইতেছে। এই সময় আর একদল আমেরিকা প্রত্যাগত শিখ অমৃতসর এ আসেন। ইহাঁদের একজন নেতাকে আমি দেখি, একজনত এত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে গালের মাংসগুলি ঝুলিবার উপক্রম করিয়াছিল। যত দূর স্মরণ হয় বোধ হয় ইনিই সেই বৃদ্ধ, যিনি আন্দামানেও অদ্ভুত তেজের সহিত নিজের দিনকয়টি কাটাইয়া ৬০। অথবা ৭০ বৎসর বয়সে আন্দামানেই জীবন বিসর্জ্জন দেন। এত বৃদ্ধ বয়সেও ইনি আন্দামানের ধর্ম্মঘটকারীদিগের সহিত একত্র ধর্ম্মঘট করিতেও কখন পশ্চাদপদ হন নাই। এই দলের কেহ তখন ও পর্য্যন্ত বাড়িতে যান নাই। ইনি পূর্ব্বেই স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ হইতে আমাদের ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

এই সময় কর্ত্তারসিং অদ্ভূত পরিশ্রম করিতেছিলেন, প্রত্যহ প্রায় ৪০।৫০ মাইল বাইক্‌এ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতে ছিলেন; এত পরিশ্রম করিয়া ও কিন্তু ইঁহার ক্লান্তি ছিল না, যতই পরিশ্রম করিতেছিলেন, ততই যেন ইঁহার স্ফূর্ত্তি বাড়িতেছিল। এই ঘুরিয়া আসিয়া আবার যে সকল বড় বড় রেজিমেণ্টে যাওয়া বাকি ছিল সে সব রেজিমেণ্টে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে কিন্তু নিজেদের কাজ করিবার দোষেই ইঁহাদের অনেকের নামেই ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তার সিংকে ধরিবার জন্ম এই সময় একবার পুলিশে এক গ্রাম ঘেরাও করে, কর্ত্তারসিং; গ্রামের সন্নিকটেই কোথায় ছিলেন, পুলিশের কথা শুনিয়া বাইক্‌এ করিয়া সেই গ্রামেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিশ অবশ্য তাঁহাকে চিনিত না। সেবার কর্ত্তারসিং এইরূপ অসম সাহসিকতার গুণেই নিষ্কৃতি পাইলেন, তা না হইলে পথে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

এই সময় টাকার খরচ এত বাড়িয়া যায় যে দানের টাকায় আর কাজ চলিতেছিল না, তাই ইঁহারা কিছু কিছু ডাকাতি করিতে বাধ্য হন। পরে জানা গিয়াছে মূলাসিং লোক ভাল ছিলেন না; ইনি নাকি আবার দলের টাকাও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। যখন এ সব জানা যায় তখন আর প্রতি-কারের উপায় ছিল না। কারণ যত দূর স্মরণ আছে ইহার অল্প পরেই মাস্তাল

অবস্থায় ইনি ধরা পড়েন। ইনিই নাকি আবার ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া একজনার বাড়ীতে ডাকাতি করান।

বড় বড় আন্দোলন মাত্রেই দেখা গিয়াছে যে সাধু ও মহৎ চরিত্রের সহিত এইরূপ নরপিশাচ ও দলে আসিয়া জোটে; এ সব আন্দোলনের দোষ নহে, এ আমাদের মনুষ্য চরিত্রের দোষ। লেনিনও নাকি বলিয়াছেন প্রতি খাঁটি বলসেভিকের সহিত অন্তত ৩৯ জন বদমাইস ও ৬০ জন আহাম্মক তাঁহাদের দলে আসিয়া জুটিয়াছিল। (Russia's Ruin P 249 by H E Wilcox)

এবার পাঞ্জাবে প্রায় সপ্তাহ খানেক ইঁহাদের সহিত থাকিয়া ইঁহাদের অনেক আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। যদিও ইঁহারা অত দারুণ শীতেও অতি প্রত্যুষে স্নানাদি সারিয়া গুরুগ্রন্থ সাহেব ইত্যাদি পাঠ করিতেন কিন্তু হোটেলে খাইতেন বলিয়া খাওয়া দাওয়া অত্যন্ত নোংরা ধরনের ছিল। ইঁহাদের পরস্পরের ব্যবহার কিন্তু বড় সুন্দর ছিল; সম্বোধন করিবার সময়ে "সন্তো," "সজ্জনো," "বাদশাও" ইত্যাদি প্রকারের সম্মান সূচক শব্দ ছাড়া অন্য কোনরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেন না। ভাই নিধান সিংএর সহিত এইবার আসিয়া দেখা হয়। ইনিই সেই ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ। ইনি প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর দেশ ছাড়া ছিলেন ও চায়নায় থাকিতে এক চীনা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইঁহাকে প্রায়ই ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিতাম। একবার ষ্টেসনে গিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্ম্মে বসিয়াও ক্ষুদ্র একটি ধর্ম্মপুস্তক লইয়া আপন মনে পাঠ করিতেছেন। ইনি যে কেবল লোক দেখানর জন্যই ঐরূপ করিতেন তাহা নহে। কারণ আন্দামানেও ইঁহাকে ঠিক এইরূপই দেখিয়াছি। ইঁহার যেরূপ তেজ ছিল অনেক প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সেরূপ তেজ দেখি নাই।

সাধারণতঃ পাঞ্জাবীদিগের নৈতিক চরিত্র বিশেষ মন্দ এবং পাঞ্জাবিদের মধ্যে আবার শিখদিগের চরিত্র অতি জঘন্য। বোধহয় এইরূপ হইবার প্রধান কারণ পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এখানে অসঙ্গত রূপে কম এছাড়া বোধহয় পাঞ্জাব তমোমুখী রাজসিক ভাবে পূর্ণ। চিরকাল বৈদেশিক-দের সহিত সংঘর্ষের ফলে ক্রমাগত নিম্নতর সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এখান-কার শ্রেষ্ঠ সভ্যতা যেন ক্রমেই ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য অব-নতির দিনে এইরূপ বিদেশীর সংস্পর্শ যেমন হানিকারক, উন্নতির দিনেও আবার তেমনই এই স্থানেই শ্রেষ্ঠ সভ্যতার বিকাশ সম্ভবপর। যাহারা মন্দের পথে সহজে যায়, ভাল হইবার ক্ষমতাও আবার তাহাদের মধ্যে যেমন

আছে তদ্রূপ মধ্যে সেরূপ আছে বিনা সন্দেহ; তাই অসংযম, নিষ্ঠুরতা, নীচতা ও হিংসা বৃত্তিতে শিখ চরিত্র যেরূপ কলঙ্কিত, সেইরূপই আবার সংযম, ঔদার্য্য ও ক্ষমা বৃত্তিতে তাহাদের তুলনা মেলা কঠিন। তাই এই সে দিনও এই অধঃপতিত শিখদিগের মধ্য হইতে "নানকানা সাহেব"এ অমন অদ্ভূত বীৰত্ব ও সংযমের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর নামেই কলঙ্ক অধিক কিন্তু এই পাঞ্জাবেই আবার সেদিনও সতীত্বের এমন গৌরবোজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ হইয়াছিল যে এ কলিযুগে তাহার তুলনা নাই। লাহোর ডি, এ, ভি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভাই পরমানন্দের খুল্লতাত ভ্রাতা, ভাই বালমুকুন্দ দিল্লিষড় যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়েন। এই বালমুকুন্দেরই সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ মতিদাসকে সেই শিখ অভ্যুদয় কালে করাত দিয়া বিদীর্ণ করিয়া মারা হইয়াছিল। ধরাপড়িবার মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রামরাখি পরমাসুন্দরী পূর্ণবয় যুবতী ছিলেন। স্বামীর ধরা পড়িবার পর হইতেই ইনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং নানারূপ আত্মনিগ্রহে দিন কাটাইতে থাকেন। পরে স্বামীর মৃত্যুদণ্ডা-দেশ শুনিয়া স্বামীর সহিত দেখা করিতে যান। কিন্তু তাঁহার জীবন সর্ব্বস্বকে তাঁহার মর্ম্মাশ্রু যেন ভাল করিয়া দেখিতেই দিলনা। বাড়ি ফিরিয়া একরূপ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দিন কাটাইতে থাকেন। একদিন স্বীয় কক্ষ হইতে শুনিতে পাইলেন বাহিরে যেন একটা চাপা ক্রন্দন রোল উত্থিত হইয়াছে। ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া শ্রীমতী রামরাখি সব বুঝিতে পারিলেন। এবার আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, সতীসাধ্বী সুস্থ নীরোগ দেহে স্বামীধ্যানে বসিয়া যেন স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া গেলেন; মাটিতে মিলাইবার জন্যই শুধু দেহখানি পড়িয়ারহিল। এরূপ স্বামীপ্রেম, এরূপ আত্মোৎসর্গের তুলনা কোথায়? ধন্য বালমুকুন্দ! ধন্য বালমুকুন্দের স্ত্রী!! হায়রে ভারতের অদৃষ্ট! এমন স্বামী এমন স্ত্রীও তোমার কপালে সইল না!!

(ক্রমশঃ)

সুখের ঘর গড়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(তারার কথা)

পর দিন বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় ভবানীপ্রসাদ তাহার বৌদিদির নিকট বসিয়া তারামণির পিসির দুর্ঘটনার কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন ; বৃদ্ধার অবস্থা শুনিয়া নয়নতারা দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কথায় কথায় ভবানীপ্রসাদ তারার মেয়ে সন্ধ্যার গুণের পরিচয় দিল। "সত্যি বউদি, ভাল বংশের মেয়ে যে তার ভুল নেই—"নয়নতারা হাসিয়া বলিলেন "তাতে ভুল হবার আছে কি ? বাউনের ঘরের মেয়ে—তার ওপর বাপ ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোক, ভালরকম চাকরীই করতেন, আজ না হয় দুরবস্থায় পড়ে তোমার বাড়ী রাঁধুনীগিরি করছে তাতে কি আর বংশের গুণ উপে যাবে ?" ভবানী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না তাই কি হয় ? আমি তাই-ই বলছি সাধারণ রাধুনীর ধরণ ধারণ লক্ষণ নয় —সত্যি বউদি ভারি চমৎকার মেয়েটি" নয়নতারা চাপা কৌতুকে দেবরের মুখের ভাব ও মনের প্রীতিমাখা প্রফুল্লতা দেখিয়া রহস্য করিয়া বলিল— "গুণেরই তো পরিচয় দিলে, আর অমন যে চমৎকাররূপ তা বুঝি চোখেই পড়ল না ?" এমন ভাবে টানিয়া হিঁচড়াইয়া ভবানীর মনোগত নীরব রূপ প্রশংসাটীকে বাহির করিয়া সুমুখে ধরাতে সে লজ্জিত হইয়া বলিল— হ্যাঁ দেখ্‌তেও বেশ —"

ন। বেশ্‌ তো বটেই ! যেন কত দয়া করে তারিপ করছ ; অথচ ঐটেই তোমার ভালকরে আগে প্রশংসা করা উচিত ছিল—

ভ। কখ্‌খনো না, ভদ্রলোকের মেয়ের রূপের প্রশংসা অপরিচিত পুরুষের মুখে শোনায়না ভাল—

ন। তার কারণ কি জান ? মানুষের রূপ জিনিষটাকে আমরা একটা মন্দ ভাবের সঙ্গে সংযোগ করে দেখি বলে নয় কি ? একটা বাসনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করে রাখার জন্তে এই ভয় সংকোচ ; গুণের মত রূপকেও যদি আমরা ভক্তির চোখে পবিত্রভাবে দেখ্‌তে শিখতাম তা হলে এ সংকোচ হতো না— জোর করে সমানে বলতে পারতাম—বাঃ পুরুষটীর বা স্ত্রীলোকটির কি সুন্দর রূপ !" তা বল্‌তে পারলে নিজেদের মনের সরলতারই পরিচয় দিতে পারতাম,

রূপেরও ঠিক সম্মান করতে পারতাম। যাই বল আর যাই কর ভাই, আমাদের দেশের লোকেরা ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ দানকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার ক'রে তার মর্য্যাদার ন্যায্য সম্মান দেখতে পারে না—

ভ। সত্যি বউ দি, ভোগের সঙ্গে দেহের রূপকে আমরা এমনি মিশিয়ে ছোট আর হীন করে দেখতে শিখিছি—

ন। সত্যি নয় কি? আকাশের সন্ধ্যার রংবাহার বা ফুটন্ত গোলাপের বর্ণ মাধুরী দেখে আমরা কেমন সরল মনে বলে উঠি বা কি সুন্দর! পারিনি শুধু মানুষের রূপের এমনি ভাবে প্রশংসা করতে! সে যাক্—

ভ। আচ্ছা বৌদি মেয়েটিতো বেশ বড়ই হয়েছে; ওর মা না জানি তার বিয়ের ভাবনায় কতই অস্থির হয়েছেন—

ন। তা আর হয় না? বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, তারপর গরীব—ভাবনার কি আর কুল কিনারা আছে? টাকা অত পাবে কোথা?

ভ। তা তো বটে সইত্যি বৌদি—

ন। তবে যদি কোনো বড়লোকের ছেলে মেয়েটির গুণ দেখে মুগ্ধ হয়ে বিনিপণে তাকে বিয়ে করে ফেলে তার মাকে দায় উদ্ধার করে তবেই রক্ষে তা লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে মেয়ের কপাল বা ফলে—

ভবানী হাসিয়া লজ্জানত মুখে বলিল—"বৌদি কিন্তু খুব যাহোগ, আমি যেন কথার ধাচ্ বুঝিনি—

নয়নতারা হাসিয়া বলিলেন "আমিও যেন মনের ভাব বুঝিনি"

ভ। একটি মেয়েকে ভাল বল্লেই বুঝি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে জানানো হয়?

ন। হলেই বা দোষটা কি? ভালঘর, ভালবংশ, রূপ গুণ দুই-ই আছে তবে বলতে পার রাধুনীর মেয়েকে জমীদারের ভাইপো হয়ে বিয়ে করতে পারে?

ভ। আমি মানুষকে অত ঘেন্না করিনি। গরীব হওয়াটাই কি এত অপরাধ বৌদি?

ন। তুমি না করতে পার,তোমার অভিভাবকরা করেন। সে যাগ তা হলে ঐটিকে রাণী করবার ইচ্ছে হয়েছে?

ভ। বা! বা! তাই বুঝি বল্লুম আমি?

ন। তা হলে মুখের প্রশংসা শুধু?

ভ। এও তো মুস্কিল খুব! প্রশংসা করলেই বিয়ে করতে হবে? তা হলে তো কাকেও ভাল বলবার জো নাই—

ন। আর যাকে কোনো কালে দেখলাম না বুঝলাম না, কোনো পরিচয় পেলাম না তাকেই বিয়ে করতে হবে?—না হয় এটিকে বৌ করলে?

ভ। বলিছি তো বউদি বিয়ে আমি করবো না—

এমন সময় রান্না ঘরের দিকে মহেশ পত্নীর কর্কশ কণ্ঠ নিঃসৃত গর্জ্জন শোনা গেল, ভবানী বলিল, "কিসের অত চেঁচামেচি? পিসিমা কাকে বকুছেন?"

নয়ন। হয়েছে; বুঝিছি—তুমি তারামণিকে বারণ করে এসেছিলে আস্‌তে, তাই হয়েছে রাগ 'কে রাঁধবে?' আমি বল্লাম "তাতে কি পিসিমা ওর বিপদ আপদ, কি করে আস্‌বে? আমিই চালিয়ে দেবো কদিন—" তাতে কত কথাই শোনালেন; সন্ধ্যা বেলায় ঘর থেকে শুনলাম ঝিকে হুকুম করছেন, তার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিতে বলো সকালে। সেই বা এসেছে তাকেই বকুছেন্ চলতো ব্যাপার কি দেখে আসি—'ঐ মেয়ে পারে এই হেঁসেলের ধাক্কা সাম্‌লাতে?', এই বলিয়া ভবানী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উভয়ে রান্না ঘরে ঢুকিয়া দেখেন—সত্যই সন্ধ্যা কাজে আসিয়াছে। জলন্ত উনানে একটা প্রকাণ্ড ভাতের হাঁড়ী, তার কানাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সন্ধ্যা ভয়ে, লজ্জায় ও তিরস্কারের নিষ্ঠুরতায় মর্ম্মাহত হইয়া দু হাতে দুটা ন্যাতা লইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; গৃহিণী কাদম্বিনী দেবী বর্ষার কালো মেঘের মত গর্জ্জন করিতেছেন ও গালি দিতেছেন—একধারে আহ্লাদীর মা বুড়া ঝি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বাটনা বাটিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মনিবপত্নীর তিরস্কার বাক্যকে টীকা টিপ্পনীর দ্বারা বিশদ করিতেছে।

ভবানীকে দেখিয়া সন্ধ্যা সন্ধ্যারই মত হইয়া গেল; ভবানীর সম্মুখে তাহার অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় বাহির হইয়া পড়িবে আর ভবানীর সম্মুখে থাকিয়া তাহাকে এত নিন্দা ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইবে, জানি না এ ভাবনাটা কেন সন্ধ্যাকে এত মলিন করিয়া দিল। অথচ আশ্চর্য্য এই তাহাকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে পরমুহূর্ত্তেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অনুত্তরনীয় এই সংকটে যেন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইল।

দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তে দেবর ভাজ ব্যাপার খানা বুঝিয়া লইলেন। উভয়কে দেখিয়া কাদম্বিনী একটু সুর নরম করিয়া কিন্তু বাক্যের বিষ তেমনি মাত্রায় রাখিয়া বলিলেন "অত বড় ষোলো বছরের ধেড়ে মেয়ে একটা হাঁড়ি নামাতে

পারেন না—এমন নয় বাপু যে কখনো রাঁধিনি- -বাড়ীতে তো পিণ্ড সেদ্ধ দুবেলা হয়—"

ভবানীর অসহ্য হইল সে বলিল "পিসিমা তুমি কি গো? একটু দয়া মায়া নেই? অই অত বড় হাঁড়ী বাগাতে পারে? শুধু শুধু গাল দিচ্ছ—"; নয়নতারা বলিল "বলিছিলামতো মা যে আমিই কদিন রাঁধ্‌বো, কেন মেয়েটীকে কষ্ট দেওয়া?"

কাদম্বিনী ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"করলে না কেন মা এসে? আসল কথা তা ত নয়—পেকারান্তরে বলা তুমি কি কচ্ছ বসে বসে? দুদিন রাঁধলেই পারতো—তা কি আর পারিনি বাছা! না পাল্লেই বা হবে কি করে? গতর না খাটালে ভাত দেবেই বা কে?—"

ন। আমি কি এই-ই বললাম পিসি মা? কেন অনথ কাণ্ড তুচ্ছ কথা নিয়ে বাধাও বলতো?

কা। আমিই তো বাধাই গো- আমার স্বভাবই যে তাই- না মা! আমার দেখছি এগুলেও আঁটকুড়ীর ঝি পেছুলেও তাই—দাসদাসী লোকজনকে কোনো কথাই যে আমার বলবার জো নেই—এতো জ্বালা কম নয়!

ভবানী কোনো কথায় যোগ না দিয়া আগাইয়া গিয়া সন্ধ্যার হাত হইতে ন্যাতা লইয়া আপনি সাবধানে কানা ভাঙ্গা হাঁড়ীটা নামাইয়া দিল। "বাবা! এই হাঁড়ী ওই কচিমেয়ে নামাতে পারে?—"

ন। আমি তোমাকে কখন গতর খাটাবার কথা বল্লাম পিসিমা? কেন মিথ্যে অপবাদ দিয়ে অশান্তি ঘটাও—লোকজনকে বলতে কে মানা করেছে? বলার ত একটা ধাঁচ ধরণ আছে?

কা। ধাঁচ ধরণ কি আমরা জানি মা? পাড়াগেয়ে ভূত আমরা—তোমার মত রাজার বৌ হতুম তো ধাঁচ ধরণ শিখতুম। কি কথা গো! বাউনি মাগী মিথ্যে ওজর করে বাড়ী বসে থাক্‌বে আর আমি কোনো কথাই বল্‌তে পাব না?—আঃ রে পোড়া পেটের ভাত!

নয়ন। (উত্তেজিত হইয়া) তুমি বলছ কি পিসিমা?

ভবানী। বাস্তবিকই ত পিসিমা কথাগুলো তোমরা কেমন সহজে এলোধাপাড়ী বলে যাও, কাকে কোথায় কতটা বাজে তা একবার ভাবনা—বাউন মেয়ে মিথ্যে ওজর করেনি, আমি সাক্ষী।

পি। ও বাবা তা হলে আর কথা আছে! আমার ঘাট হয়েছে বাবা, ঘাট হয়েছে, বৌ মা! লোকজনকে আমার কিছুই বলা উচিত নয়—

ভ। কেন বলবে না?

পি। তার কারণ তারা আর আমি এক জাতের; গতর খাটিয়ে তারা ভাত মাইনে পায় আমি শুধু ভাতই পাই! দোষ আমারই যে?—জমীদারের বউ আর বোন এই দুয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ—যতই দিন যাচ্ছে ততই বুঝছি—

'কি হয়েছে কাদু?' বলিয়া রতন রায় ঘরে ঢুকিলেন "এত চেঁচামেচি কিসের?" নয়নতারা ও ভবানী সরিয়া দাঁড়াইল, কাদু ভাইকে দেখিয়া একেবারে মূর্ত্তিমতী দীনতা হইয়া পড়িল। কাদু কাঁদুনে সুরে বলিল 'চেঁচামেচি করি আমি; যার এবাড়ীতে জোর কম তার গলা বেশী বড় হবেই তো!

র। কি পাপ? সোজা কথা কি তোমরা কইতে পার না? যেমন বোনটী তেমনি বোনাই। সোজা সাদা কথায়—

কাদু। আমরাই তো হয়ে পড়িছি যত উৎপাতের।

র। বলি ব্যাপারটা কি তাই বল না? কি হয়েছে বৌ মা?

নয়নতারা যথাযথ যা ঘটিয়াছে তাহাই বলিলেন—শুনিয়া রতন রায় ভগ্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এই তো কথা? না?"—

কা। অমনি করে বল্লে অম্নি দাঁড়ায়—বিশেষ উনি তোমার বউ; আর এ হ'ল ব্যাটার মত। আমি তোমার অন্নদাসী। যাগ্ দাদা যা হয়েছে তা হয়েছে পেটে খেলে পিঠে সয়—"

এই বলিয়া কাদম্বিনী চকিতের মত গৃহ ত্যাগ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া সকলেই নির্ব্বাক রহিল। তারপর রতন রায় ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"দেখ বাবাজী; তুমি দেখ্‌ছি ক্রমশঃই অসহ্য করে তুল্‌ছো! সব বিষয়ে সব স্থানে সব কথাতেই দেখছি ঘোঁড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস্ খেতে আরম্ভ করেছ; বলি কেন বলতো? শুধু বাইরের সরকারী বে-সরকারী ব্যাপারেই নয় বাড়ীর ভিতর ও ঘরগেরস্থালীর ব্যাপারেও মেয়ে ন্যাকড়ার হদ্দ হয়ে উঠছো তোমার যদি আমার বেঁচে থাকা সত্বেও স্বাধীনভাবে কর্ত্তালি করবার সাধ হয়ে থাকে তা বলো আমিও আমার মনের ভাবটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দি?"

নয়নতারা দেবরকে এমনি ভাবে অকারণ তিরস্কৃত হইতে দেখিয়া তাহার হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, রতন রায় তখনি তাঁকে বাধা দিয়া বলিলেন—থামো বৌ মা—আমার কথা শেষ করতে দাও—কি বলছিলাম—কিন্তু

আশা এখন তোমায় স্থগিত রাখ্‌তে হবে পরমায়ু আমার আছে আমি গদী ছাড়ছিনি এ জেন, আর আমি আমার ইচ্ছে বুদ্ধিতেই চল্‌বো ও সবাইকে চালাবো আর তোমার মত চ্যাংড়ার কর্ত্তামি সহ্য করবো না—একটা কথা জান্‌তে চাই সে দিন ভোলা মাষ্টারের বাড়ীতে বাউন ভোজনের ব্যাপারে তুমি কেন গিয়েছিলে? এবং গিয়েইছিলে যদি কেন তুমি ওই বর্ব্বর ব্রাহ্মণের হয়ে চৌধুরীকে সভামধ্যে অপমান করেছিলে? উনি শুধু তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ নন, উনি তোমার পিসে, গুরুজন, আর উনি নিজের মত অনুসারেই যে এই ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তা নয়, নিশ্চয়ই এতে আমারও সম্মতি ছিল; আর না থাক্‌লেও উনি নিজে গ্রামের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি; নিজে সবদিক ভাল বুঝেই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন, এক্ষেত্রে তোমার মাঝে হতে গায়ে পড়ে কর্ত্তামি করবার কি দরকার ছিল; তারপর একটা সামাজিক ব্যাপার, গ্রামের জমীদারের যতটা মীমাংসা করবার বা যথাযথ দেখবার অধিকার আছে এতটা তার একজন নগণ্য প্রজার নেই; এসব বুঝে সুঝেও তুমি কি জন্য বাড়ীর অপমানটা সভার মধ্যে নিয়ে এলে শুনি? মোদ্দা কথা, এদানীং দেখছি তুমি কিছু বেশী রকম মাতব্বর হয়ে উঠেছো।—কিন্তু আমি যদ্দিন বর্ত্তমান তদ্দিন তোমার এ সব মুরব্বী আনা কিছুতে সহ্য করতে পারবোনা; যখন তোমার আমল আস্‌বে তখন তুমি যা হয় করো এখন যেমন মানুষ তেমনি থাক্‌বে যা বুঝি আমি। কাজ না থাকে, লেখাপড়ায় ইস্তফা দিতে হয় দাও কিন্তু সোজা কথা যা বুঝি, এখন তুমি না হয় অন্যত্র—"

নয়নতারা কথাটার ইঙ্গিৎ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি শ্বশুরকে হাত জোড় করত নিরস্ত করিয়া বলিলেন "বাবা আপনার পায়ে পড়ি, ও সব কিছু মনে করবেন না, ঠাকুর পো আপনার ছেলের মত, অবুঝ হয়ে যদি কিছু করে থাকে তার জন্যে—"

ভবানীও বৌদিদির কথার আঁচ বুঝিয়া বাধা দিয়া বলিল—'না বৌদি ওঁকে বল্‌তে দিন; কাকা বাবু যা আদেশ করছেন আমি তাইই করবো; সত্যই আমার এখানে থাকাই আর উচিৎ হচ্চেনা—আমি আমার নিজের অবস্থা আর মূল্য বুঝতে পেরেছি—আমি আর কিছুতে থাক্‌তে চাইনি যেমন ছিলাম—

রতনরায় বলিলেন—"হ্যাঁ কলকাতায় যেমন ছিলে তেমনি থাকগে মাসে মাসে খরচ পাঠাবো যা খুসি তাই করো—সোজা কথা যা বুঝি—যখন তোমার

সময় হবে এখানে এসে রাম রাজত্ব কর—" এইবলিয়া রতনরায় ক্রোধ সংযত করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

নয়ন তারা দেবরকে বলিলেন—"ঠাকুর পো, রাগ করনা, রাগ করে একটা হটকারিতা দেখিও না কলকাতায় গিয়ে বাস করবে কেন শুনি ?"

ভ। এখানে বাড়ীতে এমনি ভাবে থাকৃতে বলো বৌদি ?

ন। বলি, একশোবার বলি—পিতৃতুল্য গুরুজন, অভিভাবক যদি দুটো কড়া কথা বলেন—

ভ। কড়া কথার জন্তে নয় বৌদি—বাপ মা খুড়ো জ্যাটা কড়া কথা বলবেনা তো বলবে কে ?

ন। তবে ?

ভ। আমি থাকৃতে চাইনি এই জন্তে যে এখানে থাকৃলে আমার মনুষ্যত্ব দিন দিন হীন হয়ে আস্‌বে। আমি চোখের উপর এই সব অত্যাচার অনাচার যার প্রতিকার করতে পারবো না তা সহ্য করতে পারবো না। নিজে যা ভাল বুঝবো তা যদি করতে না পারি তা হলে আমার শুধু খুড়োর অন্নদাস হয়ে পড়ে থাকা আমার মনে জ্ঞানে অন্যায় বলে বোধ হচ্চে। কাজ কি বৌদি এমন হয়ে হীন হয়ে জীবন ধারণ করা ? খুড়োমশাই বা পিসে পিসি মনে করছেন আমি জমীদারীর লোভেই বুঝি লোকের কাছে প্রিয় হবার চেষ্টা করছি তার দরকার নাই ; আমি গরীব গেরস্তর ছেলে, গরীবানা ভাবেই থাকৃতে চাই ; কলকাতাতেই গিয়ে থাকৃবো, চাকরী একটা জুটিয়ে নিয়ে নিজের পেট চালাতে শিখ্‌বো—

বৌ। ছি ঠাকুরপো পাগলামি ছাড়— আর এক কথা আমি কি কেউ নই ? আমার মায়া কাটাতে তুমি পার আমি কি করে তোমার মায়া কাটাবো ?

ভ। পাগলামি আমার না তোমার বৌদি ? আমি এই বাড়ী ছেড়েই যেতে চাই— তোমায় ছেড়ে তোমার মায়া কাটিয়ে যাব এ কথা কি ক'রে সিদ্ধান্ত করলে ? আমি কি গ্রাম ত্যাগ করছি বৌদি ? আমি যেখানেই যাই বা থাকি তোমার স্নেহ মমতা মায়া আমাকে সেইখান হতে টান্‌বে—ও কথা বলো না বৌদি আমার মা নেই তুমি আমার মা হয়ে মানুষ করেছ তা আমি ভুলিনি ভুলবোও না—যখন ডাকৃবে তখনই আস্‌বো, না ডাকৃলেও আস্‌বো সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব নইলে আমায় কে দেখ্‌বে ?

বৌ। না না ও সব মতলব ছাড়—বিবেচনা হয়েছে, বুদ্ধিমান হয়েছ— পিতৃতুল্য খুড়ো একটা কড়া বলেছে আর অমনি গৃহত্যাগ করতে বস্‌লে ? তার

মনে কষ্ট হবে না ? গুরুজনকে কষ্ট দিয়ে ভাল ফল হবে কি ? এক কথায় এত রেগে যাও কেন ? ভাই সংসার না জল-আগুন-কাঁটা ভরা অরণ্য, এখানে বাস করতে হলেই, জলে ভিজতে হবে, আগুনে পুড়তে হবে, কাঁটা বেধা সইতে হবে— এখনি এত অধৈর্য্য হচ্ছ ? তবে মানুষ হয়ে ফুটবে কি করে শুনি ? পাঁচদিক হতে ঘা খাচ্ছ বলেইতো তোমার এক একটি গুণ ফুটে উঠ্‌ছে ? যেখানে কোনো জাল জঞ্জাল নেই সেখানে একা মুখ চোখ বুঝে পড়ে থাকাও যা আর মাটির মধ্যে মাটি চাপা পাথর হয়ে পড়ে থাকাও তা নয় কি ?

ভবানী। বুঝি বৌদি কিন্তু—

ন। কিন্তু মিন্তু শুনছিনি—এখন যাও আবার কথা হবে—যা বললাম বুঝে দেখগে। ভাল কথা, হাঁড়ী নামালে হাত ধুলে না ? ভুলে গেছ বুঝি ?

ভবানী লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল "মনে ছিল না বৌদি একটু জল দাও।"

নয়নতারা সন্ধ্যাকে বলিলেন "দাওতো গা ঠাকুরপোর হাতে জল—"

সন্ধ্যা এতক্ষণ নীরবে দেবর ভাজের কথা শুনিতেছিল। আর মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া সভয়ে ভবানীকে সভক্তি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। নয়নতারার আদেশ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া জলের ঘটী লইয়া অগ্রসর হইল ; ভবানী হাত পাতিয়া দিল. সন্ধ্যা লজ্জালাল মুখখানি নত করিয়া ভবানীর হাতে জল ঢালিতে গেল, কে জানে কেন হঠাৎ হাত কাঁপিয়া উঠায়—প্রয়োজন মাত্রাতিরিক্ত জল হাতে না পড়িয়া ভবানীর হরিণচর্ম্মের চটী দুটা ভিজাইয়া দিল। ভবানী হাসিয়া উঠিল, বলিল—'বাঃ, বেশ জল দিলেতো ?' সন্ধ্যা ভয়ে ও লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি নিজের অঞ্চল দিয়া চটী দুটা মুছাইয়া দিতে গেল ; ভবানীও পায়ে হাত দেওয়া নিবারণ করিতে গিয়া সন্ধ্যার কচি দুখানি হাত ধরিয়া সরাইয়া দিল, "বলিল ছিঃ ছিঃ কি করছ ? জুতো ভিজলোইবা।" একই মিনিটের মধ্যে এই ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। লজ্জাবতী লতা যেমনি স্পর্শ মাত্রে কুঞ্চিত হইয়া যায়, ভবানীর কর স্পর্শে সন্ধ্যা তেমনি লজ্জা সংকুচিতা হইয়া হেঁসেলের দিকে চলিয়া গেল। নয়নতারা হাসিমাখা কৌতুক দৃষ্টিতে এই সুমধুর দৃশ্যটুকু উপভোগ করিতেছিলেন। দুজনেই বাহিরে আসিলেন। সন্ধ্যার হাত ধরিয়া বাধা দেবার পরমুহূর্ত্তেই ভবানীর মনে একটা খটকা লাগিয়া গিয়াছিল ; ভাবিল বৌদিদি না জানি কি মনে করিলেন ? বৌদির মন হইতে সেই ভাবটা সরাইয়া দিবার জন্য বলিল—'মেয়েটী কি ভীতু বৌদি ?

জুতোটা কি না আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে এসেছে!—” বৌদি একটু হাসির রসান দিয়া বলিলেন—“তা না এলে কি এই পানিপীড়নটা হতো ভাই? এখন হাতটী যে ব্যাচারার উচ্ছিষ্ট করে দিলে আর তো ও দুটী হাতে আর কেউ হাত দেবেনা?”

ভ। (লজ্জিত হইয়া) যাও বৌদি কি বল যে তার ঠিক্ নেই—যদি কেউ শুন্‌তে পায় একথা—কি মনে করবে?

ন। মনে করবে গন্ধর্ব্ব মতে কন্যালাভ হচ্ছিল আর আমি বৌদিদি তার সাক্ষী বা পুরোহিত ছিলাম—

ভ। বিয়ে এত সস্তা নাকি বৌদি? যেখান হ'তে হোগ যাকে হোগ্ কুড়িয়ে এনে একটা বিয়ে করলেই হলো নাকি?

ন। এটা তোমার মনের কথা, না—আমার মন বোঝবার জন্যে তোমার মুখের কথা? যদি শেষটা হয় আমি কিছুই উত্তর দেবই না—

ভ। যদি মনের কথাই হয় বৌদি?

ন। তবে বলবো কি জান? তুমি মূর্খ, অন্ধ, অজ্ঞ, রত্ন চেন না—যদি চিন্‌তে তাহ'লে কাদা ধূলো মাথা একটী মণির কুঁচির জন্যে নিশ্চয়ই তুমি ছাই আস্তাকুড়, কাঁটাবোন, কিছুই বিচার করতে না—সকল কষ্ট ক্ষতি স্বীকার করে রাংতার খেয়াল ছেড়ে মণি টুকরাটাই জোগাড় করতে! আমার যদি তোমার বয়সী ছেলে থাকৃতো আমি ঐ রত্নটী কুড়িয়ে ত দূরের কথা, ভিক্ষে করে এনে ছেলেকে দিতাম; ছেলে নেই তুমি আছ তার স্থান দখল করে, আমি ইচ্ছে করিছি ঐ রত্নকণাটী এনে তোমার কপালের টিপ করে দি?

ভ। না বৌদি আমার সেটা মনের কথা নয় সত্যি বলছি বৌদি—সে যাগ্ আচ্ছা ওটী যে কোহিনুরের টুক্‌রো তা কি করে জান্‌লে? পরিচয়টা কি ওই জুতো মুছিয়ে দেওয়াতেই পেলে?

ন। না ভাই সেদিন হাতে করে পুকুর পাড় হতে জুতো জোড়াটী; খাবার জলের কলসীর সঙ্গেই এক করে পৌছে দিয়েছিল ওই মেয়েটী নয়?

ভ। হাঁ বৌদি।

ন। আরও পরিচয় চাও? একটী আমের একটুক্‌রো চাকৃলেই বোঝা যায় কি জাতের আম? নয় কি?

ভ। হাঁ বৌদি--কিন্তু সে যাগ্ রত্ন হোগ্। যদি আমার রত্নের লোভ না থাকে?

ন। আজ না থাক্, কাল হতে, পারে—দু বছর পরে হতে পারে?

ভ। আর যদি নাই-ই হয়?

ন। তুমি যে যিশুখৃষ্ট, চৈতন্য বা পরমহংস নও তা দিব্বি করে বল্‌তে পার?

ভ। না—না; এত আস্পর্দ্ধা রাখিনি।

ন। তবে চুপ কর।

ভ। না বৌদি ও সব মতলব করনা—তোমাকে জোড় হাত করে বলছি। আমার দিব্য রইল। আমার মানসিক অবস্থা ভাল নয়; পরে তোমায় বলবো এখন; বিয়ের অভাবে এখন রাজ্য বয়ে যাচ্ছে না।

ন। আচ্ছা কিন্তু তুমিও আমার অনুমতি ব্যতীত আর কোথায়ও যেন স্বয়ংবর হয়ে বা করে বসো না কেমন?

ভ। হ্যাঁ সে ভয় নেই।

ন! আমার একটু ঠাকুর ঘরে কাজ আছে যাই—

ভ। বৌদি একটা কথা, আমি যদি কলকাতায় চাকরী করে বাসা করি তুমি যাবেতো সেখানে? আমায় কে দেখবে?

ন। অনেক বারই ত বলেছি ভাই এ বাড়ী ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব কেন—আবার বুঝিয়ে বলবো—

ভ। আমাদের সাবেক মেটে বাড়ীতে যদি গিয়ে থাকি?

ন। পরে এসব কথা শুনবো—

ভ। আচ্ছা।

এই বলিয়া দুজনে যে যার কাজে চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

ডালি

গান্ধিজী

[শ্রীশ্রীনিবাশ শাস্ত্রী]

দৈনন্দিন জীবন হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। গান্ধীও এই অটুট সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না। কেন না জীবনের অস্বাভাবিকতা বিদূরিত করিয়া উহাকে স্বভাব ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—যাহাতে জীবন সরল ও পবিত্র হইয়া উঠে। ঘটনা চক্রে কখন বা তাঁহার কার্য্য

কলাপ কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে নিবদ্ধ; কখনও বা রাজশক্তির সম্মুখীন হইয়া তিনি শাসকের রোষাগ্নি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিতেছেন; কখনও বা তাঁহার ভারতের স্বরাজের বাণী সমগ্র পৃথিবী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে আর সমস্ত জগৎ তাঁহার স্বরাজের স্বরূপ জানিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া আছে। তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য হইতেছে মনুষ্য জাতির আমূল আত্যন্তিক সংস্কার। 'স্বভাব ধর্ম্মে ফিরিয়া আইস্' ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র। তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘোর বিরোধী। তাঁহার স্বরাজ আন্দোলন পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বৃহৎ সংগ্রামের অঙ্গমাত্র। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সেই বিশাল সংগ্রাম পরিচালিত হইবে সেই পদ্ধতিতেই স্বরাজ আন্দোলন চলিতেছে; যে যে অস্ত্র শস্ত্র সেই বিশাল সংগ্রামে ব্যাবহৃত হইবে, তাহাই এই স্বরাজ সমরে ব্যবহৃত হইতেছে; যে যে গুণরাজিতে ভূষিত হইলে কালক্রমে সেই বিশাল সংগ্রামে জয়ান্বিত হওয়া সম্ভব স্বরাজ সাধনায় ও সেই সেই গুণেই তিনি ভূষিত হইতে বলিতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংগ্রাম ও স্বরাজ সাধনা উভয়েরই মূল সূত্র অহিংসা। অন্তরে ও বাহিরে নিরুপদ্রব হও। কায়-মনোবাক্যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট সাধন করিও না। তাঁহার নিকট ব্যক্তিগত ভাবে কেহই শত্রু নন। তোমার প্রতিপক্ষ এই আত্মিক বল মানিতে চায় না বলিয়া তোমাকে অনেক নির্য্যাতন ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। নির্য্যাতনেও ক্ষতি, হর্ষ প্রকাশ কর, সানন্দে উহাদিগকে বরণ করিয়া লও। যদি এই দুঃখ দৈন্য প্রফুল্ল বদনে বরণ করিতে না পার, দূরে সরিয়া দাঁড়াইও না বা কোন অভিযোগ আনিও না। শত্রুকে ভালবাস - যদি ভালবাসিতে পার ক্ষমা চাহিও কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না। পশুশক্তি পরিহার্য্য সুতরাং উহা দমন করিয়া রাখিও। আত্মিক বল দুর্দ্ধর্ষ সুতরাং সেই অজেয় শক্তি অর্জ্জন কর। যাহাই ঘটুক না কেন সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইও না—সত্যের জয় অনিবার্য্য। এই মূল নীতি হইতেই স্বরাজ সংগ্রামের সফলতার জন্য অন্যান্য কয়েকটী বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বর্ত্তমান ব্রীটিশ শাসন যন্ত্রের হাত হইতে আমাদিকে মুক্ত হইতে হইবে সুতরাং এই উভয় শয়তান সন্তানের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক রাখিব না। যে সকল বিশালও শক্তিশালী অনুষ্ঠান আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিতে সহায়তা করিতেছে,তাহা হইতে সকল সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই হইল বিদ্যালয়, আদালত ও ব্যবস্থাপকসভা। বিদ্যালয় পরিত্যাগ কর, ন্যায় বিচারের

আশায় আদালতে নালিশ রুজু করিও না ; কখনও ভোট দিতে যাইও না। যন্ত্র সমূহ সয়তানের আবিষ্কার আর কলকারখানা ভারতে ব্রীটিশ প্রাধান্য স্থাপনের প্রধান অবলম্বন অতএব দুইই বর্জ্জন করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিও না, প্রতিগৃহে চরকার ব্যবস্থা কর। চরকার গতিতে নিগূঢ় শক্তি নিহিত রহিয়াছে—আত্মা পবিত্র হয়। এই চরকায় প্রস্তুত বস্ত্রই মনুষ্যদেহের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির।

গান্ধীর জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে হইলে, যে সকল নিয়ম গঠন করিয়া তিনি আমেদাবাদ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠানের নাম সত্যাগ্রহাশ্রম। আশ্রমটি অদ্যাপি ক্ষুদ্র।

ইহার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই প্রতিষ্ঠাতার শক্তি নানা কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে সুতরাং ইহার জীবনীশক্তির পরিচয় দিবার অবসর আজ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যের সাফল্য দুইটি সর্ত্তের উপর নির্ভর করিতেছে, প্রথমতঃ সংখ্যাবৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ তাহার অল্পসংখ্যক ভক্তবৃন্দ যে কঠোর আদর্শে জীবনযাপন করিতেছে সে আদর্শ সাধারণের বিনা আপত্তিতে গ্রহণ। ভবিষ্যতে ইহার প্রভাব কি পরিমাণে হইবে অনুমান করিবার পূর্ব্বে তাহার নূতন গীতার সত্য প্রকৃতি বিশদ ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। নির্ম্মল সত্য সেইখানেই কেবল বিরাজ করে, যেখানে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। সকল প্রকার বল-প্রয়োগ ও বাধ্যকরণ সে হেতু বর্জ্জনীয়। অন্তরে অন্তরে যে বিদ্রোহী তাহার নিকট বাধ্যবাধকতা, প্রভুত্বও শাসন উন্নতির অন্তরায়। তিনি কখনও বলেন তাহার ধর্ম্মের সার প্রেম। কখনও বলেন সত্য, কখনও বলেন অহিংসা। তাঁহার নিকট ইহার সকলেরই এক অর্থ। আদর্শজগতে কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনই সমর্থন যোগ্য নহে। বৃটিশ শাসনের গুণ এই যে, ইহাতে ব্যক্তিগত —স্বাধীনতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি পরিবারে ও বিদ্যালয়ে স্নেহ ও নৈতিক যুক্তির বলের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিবে। উৎকট অশিষ্ট অপরাধের স্থালন কল্পে তিনি নিজে শাস্তি গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য উপবাস করেন। প্রতিবারেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোষীপক্ষ অনুতপ্ত হন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলে ভীষণ ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য তিনি এই উপায় অবলম্বন করেন—পাপের ভয়ে কলের কর্ত্তারা যুক্তি সঙ্গত সর্ত্ত মানিয়া লয়েন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাজ. কুমারের আগমন প্রাক্কালে বোম্বাই নগরে অসহযোগের নামে কয়েকজন ব্যক্তি বল প্রয়োগ করায় তিনি

আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত এই উপবাস গ্রহণ করেন—ইহার ফলও সর্ব্বতোভাবে আশানুরূপ হইয়াছিল। এই আন্দোলনে যতটা অত্যাবশ্যক তাহার অধিক কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অভাবের অধিক গ্রহণ করা চৌর্য্য অপরাধের তুল্য। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছেন। অনেক বৎসর বিচক্ষণতার সহিত তিনি আইন ব্যবসা করিয়াছিলেন—কিন্তু আজ কয়েকখানি পরিধেয় বস্ত্র এবং ঐগুলি ধারণের জন্য একটি থলিয়াই তাহাদের সর্ব্বস্ব। আমেদাবাদ আশ্রমে কেবল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী রহিয়াছে।

আপনার পরিশ্রমের দ্বারা প্রত্যেকে আপনার অভাব মোচন করিবে। যে শস্য তুমি ভক্ষণ কর, নিজের হাতে উৎপাদন করিবে, যে বস্ত্র পরিধান কর স্বহস্তে বয়ন করিবে ইহাই তাহার আদর্শ। যাঁহারা মস্তিষ্কের পরিশ্রম করেন, তাঁহারাও এই দৈহিক পরিশ্রম হইতে রেহাই পাইবেন না। বাস্তবিকই তিনি চরকার উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ইহার সঙ্গীতে মুগ্ধ। ছাত্রগণ পুস্তক ফেলিয়া চরকা চালাক; আইন-ব্যবসায়ী জীবগণ মামলা ফেলিয়া চরকা গ্রহণ করুক, চিকিৎসকগণ রোগপরীক্ষার যন্ত্র ফেলিয়া চরকা ঘুরাক। অদ্যাবধি চরকার প্রস্তুত বস্ত্র বড় মোটা—কিন্তু তিনি বলেন স্ত্রী কি পুরুষকে স্বহস্ত-প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করিলে যেরূপ দেখায়, অন্য কিছুতে সেরূপ দেখায় কি? তাঁহার একটি ছাত্রী স্বহস্ত প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইলে, তিনি বলিলেন যে তাহাকে দেবীর ন্যায় দেখাইতেছে। তাঁহার চক্ষে তিনি ঐরূপই দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মনে ঐ রূপই বোধ হইয়াছিল—সন্দেহ নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইহা বড় কঠিন ও সময়সাপেক্ষ—কিন্তু ইহা নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মমভাবে পালন করিতে হইবে। ভোগবিলাস সর্ব্বদা পরিহর্ত্তব্য। ভোগকে দিন দিন কমাইয়া আনিতে হইবে। রসনাকে দৃঢ়রূপে সংযত করিতে হইবে। সামান্য আহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আশ্রমবাসীদিগকে চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে বলেন। দাম্পত্য সম্বন্ধ পরিহার করিয়া ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে স্বীকৃত হইলে বিবাহিত দম্পতিকেও আশ্রমে গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত আছে বলিয়াই তিনি কল-কারখানা বর্জন করিতে বলেন। এগুলি সয়তানের রাজ্যের। কলকারখানায় শ্রমজীবীর মনুষ্যত্ব হানি হয় সুতরাং তাঁহার রাজ্যে উহাদের স্থান নাই। তিনি [illegible] ও রেলপথের নিন্দা করেন ইহার সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্র উঠাইয়া

দিবারও পক্ষপাতী। যখনই তিনি উহাদের ব্যবহার করিতে বাধ্য হন, মনে বড় ব্যথা পান। দ্রুতগামী ও সহজগম্য গমনাগমনের উপায়গুলি কেবল অপরাধ ও রোগের বৃদ্ধি করিতেছে। ভগবান মানুষকে পা দিয়াছেন এই অভিপ্রায়ে যে যতদূর পদব্রজে গমন করা সম্ভব তাহার অধিক পথ তাহারা না যায়। সাধারনতঃ যাহাকে রেলপথের উপকারিতা বলা হয়, তিনি তাহাকে অপকারিতা বলেন যেহেতু এতদ্দ্বারা আমাদের ভোগ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হইতেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রও তাঁহার কঠোর সমালোচনা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। তিনি বলেন ঔষধ সেবন করিয়া বাঁচা অপেক্ষা মরণ অধিক শ্রেয়! মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ সেদিন হইবে, যেদিন প্রকৃতির ব্যবস্থার উপর সে নির্ভর করিবে এবং জীবনকে সহজ ও সরল করিয়া তুলিবে।

সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই সমুদয় উপদেশ বিকট ঠেকিবে সন্দেহ নাই কিন্তু মহাত্মার নীতিশাস্ত্রের ইহাই সারাংশ। মনে করিবেন না তিনি এইসকল নৈতিক উপদেশ প্রদান করিয়া বা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, তিনি প্রাত্যহিক জীবনে অক্ষরে অক্ষরে উহা পালন করেন। তাহার পার্থিববস্তুর ত্যাগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পীড়িত হইলে তিনি চিকিৎসক ডাকেন না। তিনি সুখাদ্য গ্রহণ করেন না। স্বহস্ত-প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করেন এবং এই পরিচ্ছদে নগ্নপদে এমন কি ভারতলাটের নিকট উপস্থিত হন। তিনি লোক-ভয়ে ভীত নন অপরকে যাহা করিতে আদেশ করেন তাহাহইতে কখনও পশ্চাৎ পদ হন না। দুঃখ কষ্ট তাঁহার বড় প্রিয় যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস দুঃখ কষ্ট দ্বারাই আত্মিক উন্নতি সম্ভবিত হয়। তাঁহার হৃদয় সমবেদনা ও কোমলতায় সমুদ্রের ন্যায় অসীম। একদিন তাঁহাকে স্বীয় বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া কুষ্ঠরোগীর ক্ষতস্থান ধৌত করিতে দেখিয়াছিলাম। ফলতঃ তিনি ইন্দ্রিয় পূর্ণমাত্রায় সংযত করিতে ও আত্মজীবনে সন্ন্যাসীর কঠোর আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ জনসাধারণের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন এবং আপনাকে মহাত্মা আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি জাতি প্রথার সমর্থন করেন কিন্তু কখনও জাতির অহঙ্কারের অনুমোদন করেন না তিনি মনে করেন পূর্ব্বের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলে জাতিপ্রচার উপকারিতা আছে এবং এই বর্ণাশ্রমই হিন্দুধর্ম্মের মেরুমজ্জা। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চাহেন। তিনি তথাকথিত নিম্নজাতির উন্নতি করিতে

চান। তিনি বলেন যে সকল কর্ম্মী এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে তাহাদের একস্তরে নামিয়া আসিয়া উহাদেরই ন্যায় পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। এই রূপেই যথার্থ সমবেদনা ও সহানুভূতি জাগিবে ও পতিতজাতির আস্থা অর্জ্জন করিতে পারিবে এবং তাহাদের উন্নতি সম্ভবপর হইবে। তাহার অনুচরবর্গ জনসেবা ব্রতের সহিত রাজনীতি মিশাইয়া ফেলেন সেইজন্য অনেক সময় তাহাদিগকে কাজে বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয়। তাঁহার মত রাজনীতিক স্বাধীনতা জনসঙ্ঘের নিকট কিছুমাত্র প্রয়োজনে আইসে না সামাজিক দুর্নীতি যতদিন না দূর হয়। যুগপৎ সামাজিক সংস্কার না হইলে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

মহাত্মার শিক্ষার আদর্শ কি তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই। তবে সুন্দর সুন্দর ঐতিহাসিক গবেষণা অর্থনীতিক আবিষ্কার, কলকারখানাও নানা ভাবে ঋদ্ধি বৃদ্ধির উপায় তাঁহার ব্যবস্থায় স্থান পায় নাই! তিনি সমগ্র ভারতে এক ভাষা প্রচলন করিতে চান—তাঁহার মতে হিন্দিই সমস্ত ভারতের ভাষা হইবার উপযুক্ত।

আমি তাঁহার শিক্ষা সহানুভূতি পূর্ণচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছি। তাঁহার মহানচরিত্র—হৃদয়শুদ্ধির ক্ষমতা আমি অনুভব করিয়াছি। তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হৃদয়ে বল পাইয়াছি। এই জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা জাগিয়াছে। আর সময়ে সময়ে তাঁহার হৃদয়কন্দরে যে সম্পৎ বিরাজ করিতেছে তাহার ক্ষীণআভা পর্য্যালোকন করিয়াছি আর সম্ভ্রমে দেখিয়াছি—তাঁহার মহিমা মণ্ডিত জীবনের কত না সন্তাপ ও সংগ্রাম।

["Gandhi the man" প্রবন্ধের অনুবাদ]

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান।*

(তৃতীয় গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

ইমন্——একতালা।

সৈনিকগণ।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা ;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা ;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আনন খানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরণী মুগ্ধ-নয়নে চাহে ;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটী ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে ;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি ;
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

	০				১				২´				৩			
II {	না	ধা	ধা	।	না	পা	পা	I	হ্মা	পা	পা	।	হ্মা	গা	গা	।
	য	খ	ন		স	ঘ	ন		গ	গ	ন		গ	র	জে	

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে 'নারায়ণে'র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

০ ১ ২´ ৩
। গা পা পা । ক্ষা গা রা I ক্ষা -পা -ধা । না -া -া } ।
ব রি ষে ক র কা ধা • ॰ রা • •

০ ১ ২´ ৩
। { পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা ।
স ভ য়ে অ ব নী আ ব রে ন য় ন

০ ১ ২´ ৩
। সা -রা গা । গা -া গরা I ক্ষা -পা -ধা । না -া -া } ।
লু প্ ত চ ন্ দ্র॰ তা • • রা • ॰ } ।

০ ১ ২´ ৩
। { পা -ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা ।
দী প্ ত ক রি সে তি মি র জা ॰ গে

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্রা র্রা । র্সর্রা র্গা র্গা I র্রা -সা -না । ধা -পা -া ।
কা হা র আ॰ ন ন খা • • নি ॰ ॰

। ধুয়া } II

০ ১ ২´ ৩
II { গ গা -া রা । পা পা পা I পা -া পা । পা পা পক্ষা ।
জ্যোৎ স্ না হ সি ত নী • ল আ কা শে॰

০ ১ ২´ ৩
। গা গা রা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
য খ ন বি হ গ॰ গা • ॰ হে ॰ ॥॰

০ ১ ২´ ৩
। স সা -গা গা । রা সা সন্ I ধ্ ন্ ধ্ । ন্ সা সা ।
স্নি গ্ ধ স মী রে॰ শি হ রি ধ র ণী

০ ১ ২´ ৩
। সা -গা গা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া } ।
মু গ্ ধ ন য় নে॰ চা ॰ • হে • •

০ ১ ২´ ৩
{ গা গা -পা । প পা পা পা I না ধা না । পা -ক্ষা -গা ।
ত খ ন্ স্ম র ণে বা জে কা হা • র্

০ ১ ২´ ৩
। ররা গা রা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
মৃ দু ল ম ধু র৹ বা ৹ ৹ ণী ৹ ৹

। ধুয়া } II

০ ১ ২´ ৩
II { পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা ।
আঁ ধা রে আ লো কে কা ন নে কু ঞ্ জে

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্রা র্রা । র্সর্রা র্গা র্গা I র্রা -র্সা -না । ধা -পা -া
নি খি ল ভু৹ ব ন না মা ৹ ঝে ৹ ৹

০ ১ ২´ ৩
। পা ধা পর্সা । র্সা র্সা র্সা I না ধা ননা । পা -ক্ষা গা ।
তা হা রই হা সি টী ভা সে হৃ দ ৹ য়ে

০ ১ ২´ ৩
। রা গা রগা । পা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া } ।
তা হা রই মু র লী৹ বা ৹ ৹ জে ৹ ৹

০ ১ ২ ৩
। { সা গা রা । সা সা ন্া I ধ্া ন্া ধ্া । ন্সা সা -া ।
উ জ ল ক রি য়া আ ছে দূ রে৹ সে ই

০ ১ ২´ ৩
। সা গা গা । পা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
আ মা র কু টী র৹ খা ৹ ৹ নি ৹ ৹

। ধুয়া } II

০ ১ ২´ ৩
II { গা গা গা । রা পা পা I পা পা পা । পা পা -ক্ষা ।
ব হু দি ন প রে হ ই ব আ বা র্

০ ১ ২´ ৩
। সা গা রা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
আ প ন কু টী র৹ বা ৹ ৹ সী ৹ ৹

০ ১ ২´ ৩
। সা গা গা । রা সা সন্া I ধ্া ন্া ধ্া । ন্া সা সা ।
দে খি ব বি র হ৹ বি ধু র অ ধ রে

০ ১ ২´ ৩
। সা গা -া । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া } ।
মি ল ন্ ম ধু র০ হা • • সি • •

০ ১ ২´ ৩
। { গা গা পা । পা পা পা I না ধা না । পা -ক্ষা গা ।
শু নি ব বি র হ নী র ব, ক ন্ ঠে

০ ১ ২´ ৩
। রা গা রা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
মি ল ন মু খ র• বা • • ণী • •

ধুয়া :—

০ ১ ২´ ৩
। পা ধা -পা । র্সা র্সা র্সা I পা -ধা -না । ধা -পা -া ।
আ মা র্ কু টী র রা • • ণী • •

০ ১ ২´ ৩
। সা রা গা । ক্ষা পা -া I র্না র্না না ধা । র্প র্ক্ষা গা -া } IIII
সে যে গো আ মা র্ হৃ দ য় রা• ণী •

দ্রষ্টব্য।—যে যে জায়গায় 'ধুয়া'—বলে লেখা আছে, সে সে স্থানে উল্লিখিত সুরে ও তালে 'ধুয়া' গেয়। বলা বাহুল্য যে এ গানখানি বহুল প্রচলিত গান; তাই মত্ বিশেষে গানটি একটু পারিবর্ত্তিত সুরেও গীত হ'য়ে থাকে, এবং পংক্তি বিশেষ বাদ্‌ও দেওয়া হয়। যাই হ'ক্। এখানে কিন্তু অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গাওয়া হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হ'ল।——লেখিকা।

শোক সংবাদ—চট্টলের প্রিয়কবি বঙ্গকাব্যকুঞ্জের একজন কলকণ্ঠপিক কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তাঁহার প্রতিভা-রবি মধ্যগগনে উপনীত হইয়াই অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িল, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। জীবেন্দ্রকুমার আমাদের নারায়ণের একজন নিয়মিত লেখক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহারে অভাব নারায়ণের বুকে বড়ই বাজিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার স্বর্গগত আত্মা শান্তিলাভ করুক। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

ভ্রম সংশোধন—গতবারের পঞ্চপ্রদীপে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের 'বীরভাবের কথা'র নিয়ে ভ্রমক্রমে 'প্রবর্ত্তকের নাম ছাপা হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত।

দ্রষ্টব্য—নারায়ণের ষাণ্মাসিক সূচী জ্যৈষ্ঠ মাসে বাহির হইবে

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

"জালিয়ানওয়াল বাগ-স্মৃতি"

(শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়)

ভারতের আজি পুণ্যদিন,
বালক, যুবক, বৃদ্ধ একসাথে হইয়াছে লীন
বিশ্বজননীর অঙ্কে;
আজিকার দিনে, এই ধরণীর পঙ্কে
ফুটিয়া উঠিল পুণ্য ত্যাগের কমল
শতবক্ষরক্ত হ'তে লভি' রূপ সুন্দর অমল।
নির্দ্দোষ যখন যেথা আপনারে দিল বলিদান
সেইদিন পুণ্যদিন,সেথা হ'ল মহা-তীর্থ-স্থান।
সুমহান্ আত্মত্যাগে যা'রা আজ হ'ল বরণীয়,
মরিয়া অমর হ'ল, হ'ল যারা চির-স্মরণীয়,
কি বাণী রাখিয়া গেছে? কি মন্ত্র করিয়া গেছে দান?
আকাশে বাতাসে আজি ধ্বনিতেছে সেই মহাগান—
"নির্ভয় যা'রা, দুর্জ্জয় তা'রা, লভিল যে জয়টীকা
জ্বাল গো আপন ললাটে দীপ্ত-সত্য-অমল-শিখা"
এ উদাত্ত সুরে আজি ভরি' লহ প্রাণ,
নির্ভয়ে আপনা ভুলি' গাহ আজ সত্য-জয়-গান,
কোটী-কণ্ঠ-সম্মিলিত-সুর বিশ্বে আজ হউক ধ্বনিত,
মিথ্যার আসন আজ ধূলায় লুটা'য়ে যাক্, হ'ক বিচূর্ণিত!

বহুদিন গেছি ভুলি' সত্যের মহিমা
দাসত্ব-অঙ্কিত-ভালে দিন দিন কলঙ্ক-কালিমা
হইয়াছে গাঢ়তর ;
দুর্দ্দশায় জর জর
ভিখারীর বেশে ফিরি' দ্বারে দ্বারে,
অপমানে অত্যাচারে
ভরিয়াছি ঝুলি !
আজি ভার হ'য়েছে দুঃসহ ; তাই হৃদয় আকুলি
শতাব্দীর পরে জাগে ঘোর অসন্তোষ,
নয়নের কোণে জলে ক্ষুব্ধ তীব্ররোষ !
ওরে মূঢ় চির-দাস !
নিজ হাতে আপনার গলে দিয়া ফাঁস
কার পরে কর রোষ ?
কার পরে এত অসন্তোষ ?
ভয়ে দুখে যা'র কাছে কর শির নত,
সে তোরে করিবে পদাহত—
এই বিশ্বনীতি !
পর-পদলেহী কবে লভিয়াছে শুদ্ধা বিশ্ব-প্রীতি ?
অতএব উঠ আজি,
সত্যের ভৈরব-ভেরী ঐ শুন উঠিয়াছে বাজি' ;
মুক্তির মন্দির-চূড়ে
বিজয়কেতন যেথা উড়ে
সকল বন্ধন-জ্বালা-শিখা
আঁখি মেলি' পড় আজ সে আগুন-লিখা—
"হও ধীর, হও বীর
নির্ভয়ে উন্নত কর শির
নির্ভয় যা'রা, দুর্জ্জয় তা'রা, লভিল যে জয়টীকা
জ্বালগো আপন ললাটে দীপ্ত সত্য-অমল-শিখা।"

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

চতুর্থ অধ্যায়।

(ক) জগতের ভাষাসমূহ।

জগতে যত প্রকার ভাষা চলিত আছে, তাহাদিগকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভাষার অন্তর্নিহিত গঠনপ্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ চলিতে পারে (morphological classification)। ইহাতে ভারতের দ্রাবিড়ী এবং দক্ষিণ আফরিকার বাণ্টু ভাষা এক শ্রেণীভুক্ত হইবে (agglutinating) আবার দেশ হিসাবে ভাষার শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে—ইহাতে আমাদের বাঙ্‌লা ও সুদূর ইংলণ্ডের ইংরেজী এক শ্রেণীভুক্ত হইবে।

দেশ হিসাবে সাধারণতঃ জগতের ভাষাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয় :—

(১) আমেরিকান ভাষাসমূহ
(উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় কথিত রেড্-ইণ্ডিয়ান্ ভাষাগুলি)

(২) উত্তর আফ্রিকার ভাষাসমূহ
(মিশর দেশের ভাষা এবং ঐ দেশের কপ্‌ট্ copt প্রভৃতি ভাষাগুলি)

(৩) মধ্য আফ্রিকার ভাষাসমূহ
(নিগ্রোজাতির ভাষাগুলি)

(৪) দক্ষিণ-আফ্রিকার ভাষাসমূহ
(বাণ্টু প্রভৃতি ভাষা)

(৫) প্রশান্ত মহাসাগরের ভাষাসমূহ
(ফিলিপাইনদ্বীপ প্রভৃতির ভাষা)

(৬) মালয়-পলিনেশীয় ভাষাসমূহ
(মালয় উপদ্বীপ, পলিনেশিয়া প্রভৃতির ভাষা)

(৭) উরল-আল্‌তাই ভাষাসমূহ
(উরল ও আল্‌তাই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভাষাসমূহ)

(৮) ককেশীয় ভাষাসমূহ
(ককেশস্ প্রদেশের ভাষাগুলি)

(৯) চীন দেশীয় ভাষাসমূহ
(চীন জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষাগুলি)

(১০) আরব্য ভাষাসমূহ
(আরবী, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা)

(১১) দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহ
(দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলি)

(১২) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ
(উত্তর ভারত হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত প্রচলিত ভাষার শ্রেণীবিশেষ)

(১৩) অবশিষ্ট ভাষাসমূহ
(ইটালীর ইট্রাস্কান্—Etruscan স্পেনের সীমান্তবর্ত্তী বাস্ক্—Basque প্রভৃতি যে সমস্ত ভাষাকে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

এই তেরোটি শ্রেণীর মধ্যে ভারতের সহিত দুইটি শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ—(১) দ্রাবিড়ী, (২) ইন্দো-ইউরোপীয়। আবার ইন্দো-ইউরোপীয়ের একটি উপশাখা ইন্দো-আর্য্য ভাষা হইতেই বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, এবং আধুনিক উক্ত ভারতীয় ভাষাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই উপশাখার কথা পরে বিস্তৃতভাবে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

(খ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ।

এই শ্রেণীর ভাষাগুলির নাম 'ইন্দো-জার্ম্মাণ'ও বলা হয়। জার্ম্মাণির পণ্ডিতগণ প্রায়ই এই নাম ব্যবহার করেন। ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে ইংরেজী, ডচ্, বেলজিয়ান, সুইডিস, নরওয়েজিয়ান প্রভৃতি যে সমস্ত ভাষা চলিত আছে, সবগুলিই আদি জার্ম্মাণভাষা হইতে উৎপন্ন। সেজন্য পূর্ব্বদিকের ইণ্ডিয়া ও পশ্চিমদিকের জার্ম্মাণির উল্লেখ করিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এখন আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও এই শ্রেণীর ভাষা চলিত হইয়াছে—কিন্তু তাহার অধিকাংশই আদি জার্ম্মাণ ভাষার বংশধর। এতদ্ব্যতীত জার্মাণ পণ্ডিতগণের নিজের দেশের নামটির প্রতি মমতাও ইহার মূলে আছে।

ইন্দো-জার্ম্মাণকে সাধারণতঃ ইন্দো ইউরোপীয় নামে অভিহিত করা হয়। ম্যাক্সমূলর এই শ্রেণীকে আর্য্যভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এখন ইন্দো-ইউরোপীয়ের উপশাখা ইরাণীয় ও ভারতীয় ভাষা-শ্রেণীকে বুঝাইতে আর্য্যশব্দ প্রয়োগ করেন। কারণ এই দুই ভাষাভাষীরাই আদিতে নিজেদের আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিত।

ইন্দো-ইউরোপীয় শাখাকে পণ্ডিতগণ দুইভাগে ভাগ করেন—"শতেম্" এবং "কেন্টুম্" উপবিভাগ (Satem and Kentum groups) অর্থাৎ যে সকল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একশত বাচক শব্দে 'শ' আছে, তাহাদিগকে এক উপবিভাগ এবং যে গুলিতে 'ক' আছে তাহাদিগকে আর এক উপবিভাগে গণনা করা হইয়াছে। তালব্য এবং কণ্ঠ বর্ণের উচ্চারণ প্রভেদে এই বিভেদ করা হইয়াছে। জেন্দ ভাষায় "শতেন্" শব্দটি ও লাতিনে "কেন্টুম্" শব্দটিতে একশত বুঝায় এই দুইটি কথা লইয়া উপবিভাগের নামকরণ হইয়াছে।

"কেন্টুম্" ভাষাসমূহ—গ্রীক্, লাতিন, ইংরেজী, তুখারিয়ান্, হিটাইট্ ইত্যাদি।

"শতেম্" ভাষাসমূহ—সংস্কৃত, অবেস্তা, শ্লাভিক ইত্যাদি।

প্রথমটিতে যতগুলি ভাষা আছে উহার মধ্যে একশতবাচক শব্দে 'ক' এই কণ্ঠ্যবর্ণ আছে—দ্বিতীয়টিতে শতবাচক শব্দে 'শ' এই তালব্যবর্ণ আছে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বে মনে করিতেন যে পাশ্চাত্যভাষাগুলি সমস্ত কেন্টুম্ জাতীয় আর প্রাচ্যভাষাগুলি শতেম জাতীয়। কিন্তু মধ্যএসিয়ার তুখারিয় ভাষা আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে এই ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। শ্লাভিক ভাষাসমূহেও 'শ' রহিয়াছে—এই শ্রেণীর মধ্যে রুশীয় প্রভৃতি ভাষা পড়ে।

ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষার উপবিভাগগুলির নাম মনে রাখিবার জন্য ইংরাজীতে বেশ একটি সুন্দর সংকেতবাক্য তৈয়ারি করা হইয়াছে The cigar Abstainer. নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

T H e C I G Ar. A B S T Ainer—এস্থলে বড়হাতের অক্ষরের সহিত ছোট অক্ষর থাকিলে একসঙ্গে ধরিতে হইবে।

T = Tokharian—তুখারীয়

He = Hittite—হিটাইট্

C = Celtic—কেল্টিক্

I = Italic—ইতালিক

G = Greek—গ্রীক্

Ar = Armenian—আর্মেনিয়ান্

Ab = Albanian—আলবেনিয়ান্

S = Slavic—স্লাভিক্

T = Teutonic—টিউটনিক্

A = Aryan—আর্য্য

in = Indo-Aryan—ইন্দো-আর্য্য

er = Eranian.—Aryan = ইরাণী-আর্য্য

শেষের দুই উপবিভাগের শাখা—এই দুইটির সহিত আমরা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

(গ) ইন্দো-ইরাণীয় ভাষাসমূহ।

ভারতীয় এবং ইরাণীয় লোকেরা আদিতে নিজেদের আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিত—সংস্কৃত "আর্য্য" শব্দ ও ইরাণীয় "অইর্য্য" শব্দ একই। প্রকৃত পক্ষে এই শাখার নামই "আর্য্য" শাখা। আর্য্য শব্দটি "ইন্দো-ইউরোপীয়" বা "ইন্দো-জার্মাণ" এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়, যদিও কয়েকজন পণ্ডিত ইহা এইরূপভাবে ব্যবহার করেন।

পার্শীদের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ "অবেস্তা" এবং হিন্দুদের ঋগ্বেদের ভাষার এত মিল আছে যে মাত্র ধ্বনিতত্ত্বের কতকগুলি সূত্র প্রয়োগ করিলেই উভয়ভাষা রূপান্তরিত হইয়া প্রায় একই আকার ধারণ করে। নিম্নে ইহার উদাহরণ দেওয়া গেল—

অবেস্তা—তেম্ অমবন্তেম্ যজতেম।
স্থরেম্ দামোহু সেবিষ্টেম্ মিথ্রেম্
যজৈ জা ও থ্রাব্যো।

বৈদিক—তম্ অমরন্তম্ যজতম্।
শূরম্ ধামসু সবিষ্টম্
মিত্রম্ যজৈ হোত্রাভ্যঃ।

প্রাচীন ইন্দো-ইরাণীয় অবেস্তার ভাষা হইতে মধ্যযুগের পারস্তভাষা এবং আধুনিককালের পারসীভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। তবে আধুনিক পারসীতে আরবী প্রভৃতি ভাষার শব্দ বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রেণী হিসাবে পারসী কিন্তু আরবী হইতে একেবারে বিভিন্ন।

বালুচি, পোষ্তু প্রভৃতি ভাষা ইন্দো-ইরাণীয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের খুব অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার চলন আছে। তবে ইন্দো-ইরাণীয় অনেক শব্দ বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ উর্দ্দুভাষায় আরবী, পার্শী প্রভৃতির ছাপ প্রতি পদে রহিয়াছে।

সুতরাং ভারতীয় শাখার—প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলির চর্চ্চা করিতে হইলে ইরাণীয় শাখার জ্ঞান অনেক সাহায্য করে।

পতিতার সিদ্ধি।

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৩৮)

শুভার রক্তাক্ত মুখখানা লইয়া যদি নির্ম্মলা তাহাকে তার মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করিত, তা হইলে বোধ হয় শুভার মা চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা তাহা না করিয়া প্রথমেই তাহাকে কলতলায় লইয়া গেল। সেখানে সযত্নে তার নাক মুখ, এমন কি সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন করাইয়া দিল। তার শাশুড়ী তখন মধুঠাকুরের সাহায্য করিতে ঠাকুর ঘরে ছিল। অবকাশ পাইয়া নির্ম্মলা শুভাকে তার মায়ের ঘরে লইয়া শয্যায় শয়ন করাইল। বলিয়া দিল তার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কিছুতেই যেন সে শয্যাত্যাগ না করে। তারপর নালুকে ডাক্তার আনিতে উপদেশ দিয়া ঠাকুরঘরে শাশুড়ীর সহিত দেখা করিতে চলিয়া গেল। নাক মুখ ধোয়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তপড়া একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। তবু ডাক্তারকে শুভার নাকের অবস্থা না দেখাইয়া নির্ম্মলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। নিজের বুদ্ধির দোষে শাশুড়ী কিম্বা স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হইতে নির্ম্মলার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার বড়ই ভয় হইয়াছে তার অপরাধে ইহারা নিরপরাধ ব্রাহ্মণের উপর পাছে কটূক্তি প্রয়োগ করে।

নালুকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া নির্ম্মলা 'মা'য়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। শুভার মা ঠাকুরসেবাকার্য্যে মধুর সাহায্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, সে কৌতূহলী হইয়া তাহার মুখ হইতে রাখুর রাত্রিবাস কাহিনী শুনিতেছিল।

নির্ম্মলা যখন সে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও মধুসূদনের

কাহিনী বলা শেষ হয় নাই। অন্যসময় হইলে মধুকে সে তিরস্কার করিত, কেননা ওই প্রগল্‌ভতা দোষের জন্যই নির্ম্মলা তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

এই তিরস্কারের ভিতর দিয়া নির্ম্মলা তাহার বুদ্ধিহীনা খাশুড়ীকেও দুইকথা সে শুনাইতে ছাড়িত না। শুভার মা তাহার প্রায়ই সমবয়সী। ঠাকুরঘরে বসিয়া বামুনের সঙ্গে এতক্ষণ ধরিয়া তার গল্পকরা নির্ম্মলার বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইল। তথাপি সে কোনও কিছু না বলিয়া কেবল ডাকিল—'মা'।

ঘরের ভিতর পুঁটি ছিল, মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিতেই সে বাহিরে ছুটিয়া আসিল। শুভার মা শশব্যস্তার মত দাঁড়াইল, আর মধুঠাকুর বড়্‌বড়্‌ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল।

পুঁটিকে কোলে তুলিয়া নির্ম্মলা আবার ডাকিল—"মা"

শুভার মা একাগুই অপ্রতিভের মত বাহিরে আসিয়াই বলিয়া উঠিল—"ব্রজেন্দ্র ও বামুনকে ছাড়িয়ে দিয়েছে শুনে প্রথমটা আমার মনে সত্যি সত্যিই কষ্ট হয়েছিল বৌমা, কিন্তু মধুর মুখে শুনে বুঝলুম' ছেলে আমার ভালই করেছে। ওর অশেষ গুণ, মদ পর্য্যন্ত খাওয়া আছে। বাসায় যখন আসে, তখনও পর্য্যন্ত তার মুখ থেকে ভর্‌ভর্‌করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। ওরকম লোককে গেরস্ত-বাড়ীর চৌকাটে মাথা পর্য্যন্ত গলাতে দেওয়া উচিত নয়।" এসব কথার কোনও উত্তর না দিয়া নির্ম্মলা বলিল—"পূজোর সাজগোছ সব হয়ে গেছে!"

শুভার মা বলিল—"শুধু নৈবিদ্যিটে সাজিয়ে দিলেই হয়।"

"সে ওই বামুনকেই ক'রে নিতে বল। ব'লে আমার সঙ্গে এস।"

"কোথায়?"

"তোমার ঘরে।"

নির্ম্মলার কথার ভাবটা ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া শুভার মা একটু যেন ভীতার মত বলিয়া উঠিল—"কেন বল দেখি!"

"তোমার মেয়ে আজ মরতে মরতে বেঁচে গেছে।"

"বলকি!"

"দেখবে এস।"

ব্যাকুলার মত শুভার মা নির্ম্মলার অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে একবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বুঝতে পারছিনা যে বৌমা!"

"সেই মাতাল বামুন ঘুসী মেরে তার নাক ভেঙে দিয়েছে।"

হাসিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—"তামাসা।"

"না মা, তামাসা নয়। তবে মনে হচ্ছে বিশেষ অনিষ্ট হয় নি। বোধ-হয় এখনো আমাদের পুণ্য আছে।"

"সত্যি ঘুসী মেরেছে ?"

"সত্যিই মেরেছে মা! তবে মারবো বলে মারেনি। মাতাল মানুষ—নেশায় হাত ছুঁড়েছে। তোমার মেয়ের নাক তার কাছে ছিল—লেগে গেছে।"

আর কোনও কথা না বলিয়া শুভার মা মেয়েকে দেখিতে নির্ম্মলার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল। সত্যসত্যই সে দেখিল কন্যা আহত হইয়াছে, তাহার নাক ফুলিয়াছে। তখন সে শয্যাশায়িনী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ রকমটা কি ক'রে হল শুভা ?"

শুভা উত্তর করিল না। তৎপরিবর্ত্তে নির্ম্মলা বলিল—"এই ত তোমাকে বললুম মা, রাখু ঠাকুর ঘুসী মেরেছে। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হ'লনা।"

"আমাকে মারেনি ত বউদি!"

"মারে নি ?"

শুভা চোখমুদিয়া উত্তর করিল—"না।"

শুভার মা বলিল—"তবে কি ক'রে নাকের মাথা খেয়ে এলে ?"

শুভা পাসফিরিয়া চোখমুদিয়া পড়িয়া রহিল। নির্ম্মলা সমস্ত ইতিহাস বলিবার জন্য হাসিমুখে শাশুড়ীকে বাহিরে চলিতে ইঙ্গিত করিল।

সমস্ত ইতিহাস শুনাইয়া যখন নির্ম্মলা চারুর পত্রখানি শাশুড়ীর সম্মুখে পাঠ করিল, তখন শুভার মা'র চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে।

চিঠিপড়া শেষ করিয়া নির্ম্মলা শাশুড়ীর করুণা-সিক্ত মুখেরপানে চাহিয়া বলিল—"মা! প্রায়শ্চিত্তের কি আমাদের উপায় আছে!"

"তোমার কথা বুঝতে পেরেছি।"

"গরীব বামুন কি সাধ করে মাতাল হয়েছে মা?" "কি, করতে, চাও; বল।"

"আমার পুট যদি আর বছর চারেকেরও বড় হত, তা হলে ওই সাধুকে আমি দান করতুম। দিয়ে বুঝতুম কন্যাকে আমার কখন সোয়ামীর ব্যবহারে চোখের জল ফেলতে হবে না।"

"এ কথা তোমার বলতে অধিকার আছে বৌমা!"

"মা! তোমার মেয়েকে একবার আশীর্ব্বাদ করেছিলুম, তার সোয়ামী যেন মুখ্যু হয়। মূর্খ স্বামীর অপমান মূর্খ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় পণ্ডিত চরিত্রহীন হ'লে প্রবোধ দেবার যে কিছু থাকে না মা!"

"একটি কথাও মিথ্যা বলনি মা!" বলিয়া শুভার মা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিল। তারপর বলিল—"ওকে মেয়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি থাকিত না, যখন জানতে পারলুম ঠাকুর আমাদের ঘর। কিন্তু ওর যে কিছুই নেই মা। অবশ্য ছেলে আমার বেঁচে থাক্। সে বেঁচে থাকলে, মেয়ের আমার কষ্ট দেখতে পারবে না।"

"সে ভাবনা কাউকেও ভাবতে হবে না মা—বিধাতা আগে থেকেই তা ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছেন। আগে হ'তেই তোমার মেয়ের জন্য আমার হাতে পোনেরো হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অতি বিস্ময়ে শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম ?";

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আর বিধাতা যদি পূর্ণ কৃপা করেন, তা হ'লে বোধ হয় আরও একলাখ্ অবশ্য বাড়ীঘর, গহনা আসবাব নিয়ে। তা হ'লেও কি তোমার মেয়েকে ভাতের ভাবনা ভাবতে হবে মা ?"

মুখ অল্প অবনত করিয়া শুভার মা বলিল—"বুঝতে পারছি আবার নাও পারছি।"

"সে কালামুখী আত্মহত্যা করেছে।"

"না ?"

"তোমার ছেলে ফিরে এলেই সব ঠিক জানতে পারব।"

ঠিক এই সময়ে নালু আসিয়া ডাক্তার-আসার খবর দিল।

ডাক্তার যখন শুভার নাসিকা পরীক্ষা করিয়া আঘাত সম্বন্ধে সকলকে নির্ভয় হইতে বলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল। তখন নির্ম্মলা খাশুড়ীকে বলিল—"মা! ব্রাহ্মণকে যেতে দিই নি। তুমি ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা ক'রেই, ফিরে এস। তোমার ছেলে কখন আসবে তার ঠিক নেই। ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা আমাদেরই করতে হবে।"

(৩৯)

সারাদিনের মধ্যে রাখুর আর ব্রজেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় রহিল না। প্রথমটা সে বুদ্ধিহারার মত, নালুবাবুর দ্বারা যেন চালিত হইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সে কাহাকে কি বলিবে, কি করিবে কিছুই যেন স্থির করিতে না পারিয়া চলিতে হয় তাই চলিল, বসিতে হয় তাই বসিল

যে ঘরে নালু তাহাকে বসাইল, সেটা বাহিরের দরজা বন্ধ করিলে অন্দর হয়, ভিতরের দরজা বন্ধ করিলে হয় সদরের একাংশ।

সেখানে বসিয়া শুভার মায়ের মুখ হইতে সহসা ফুটিয়া ওঠা একটা ক্রন্দন-শব্দ শুনিবার নিশ্চয়তায় সে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। রোদন ত শুনিলই না, সে-ঘরে বসিয়া ভিতর-বাড়ী হইতে মেয়েদের দুই একটা কথাবার্ত্তা শুনিবারও যে সম্ভাবনা ছিল, তাহাও সে শুনিতে পাইল না। বৃষ্টির শব্দও মধ্যে মধ্যে বায়ুর হুঙ্কার—এ দু'টা না থাকিলে সে বেশ বলিতে পারিত এ বাড়ীতে লোক নাই।

নালু তাহাকে বসাইয়াই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং থাকিবার মধ্যে এখন সেখানে আছে কেবল সে। কিন্তু কোথায় আছে, এ কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বোধ হয় উত্তর দিতে পারিত না।

বাড়ীর নিস্তব্ধতা তাহার সমস্ত অন্তর-বাহিরের কথাগুলাকে বুঝি চির-কালেরই মত নিস্তব্ধ করিয়া দিত, যদি না একটা স্বপ্নেরও অপ্রত্যাশিত-মধুর কথা তার নতচক্ষুকে এক শান্ত-সুন্দর মুখের দিকে তুলিয়া ধরিত।

"তামাক খান।"

রাখু দেখিল, নির্ম্মলা একটা হুঁকা হাতে কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

"এ কি—আপনি?"

"নালুকে একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছে। সরি বাজার গেছে, বাইরের ঝি চাকর আসেনি—"

নির্ম্মলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই রাখু ঈষৎ চঞ্চলভাবেই তার হাত হইতে হুঁকা লইল—লইয়া পার্শ্বস্থ দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিল মুখের কাছে লইতে তাহার হাত আসিল না।

"কোন সঙ্কোচ করবেন না—খান।"

রাখুর মস্তক আবার নত হইল।

ইহাতে নির্ম্মলা যাই বুঝুক, সে বলিল—"আপনি কি কারও হুঁকোয় তামাক খান না?"

"আপনার সুমুখে—"

"দোষ কি?"

তবু রাখু হুঁকা মুখের কাছে লইতে পারিল না, লইতে গিয়া, কলিকায় ফুঁ দেওয়া চারুর মূর্ত্তি-স্মৃতি প্রবল উজ্জ্বলতায় তাহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। অমনি হুঁকা মুখের কাছে আসিতে আসিতে মধ্যপথে দাঁড়াইয়া গেল।

"তবে আপনি বসুন, আমি ফিরে আসছি। দেখবেন অসাক্ষাতে যেন চ'লে যাবেন না। আপনার এখানে আহারের কথা সকালে যে বলেছিলুম, সেটাকি আপনার মনে ছিল না?"

"ছিল।"

"তবে? কাউকে কিছু না ব'লে চলে যাচ্ছিলেন কেন?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমি মনে করলুম, মধু ঠাকুরকে ঠাকুরপূজা করতে দেখে আপনি রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। বাড়ীতে এমন কাউকেও দেখতে পেলুম না, যাকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠাই। কাজেই শুভাকে দিয়েই আপনাকে ধ'রে আনতে পাঠিয়েছিলুম।"

"রাগ কি জন্ম হবে বৌমা!"

"আপনি কি আর ফিরে আস্‌তেন?"

রাখু উত্তর দিল না।

"ভাবে বোধ হচ্ছে, আপনি আস্‌তেন না।"

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে রাখু উত্তর করিল—না।"

"তাই বুঝতে পেরেই আপনাকে ধরতে পাঠিয়েছিলুম। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন আপনি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন এটা মনে করতে আমার অপরাধ নেই।"

"আমি দেশে যাচ্ছিলুম।"

"কোথায় কিছুই নেই, হঠাৎ দেশে যাবার জন্ম আপনি ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? শুনেছি, অনেককাল থেকে ত আপনার সংসার নেই।"

রাখু আবার নিরুত্তর।

এই সময়ে নির্ম্মলা অনেকগুলা প্রশ্ন পরপর করিয়া লইল। রাখু কেমন করিয়া যাইত হাঁটাপথে, না রেলে? যদি হাঁটাপথেই তার যাবার ইচ্ছা থাকিত, তা হলেই বা সেখানে দু'টি আহার করিয়া যাইতে তার দোষ কি ছিল! রেলপথ হইলেও নির্ম্মলা জানিল, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে হাওড়া হইতে তার গন্তব্য ষ্টেশনে যাইবার গাড়ী নাই।

দুইচারিটা প্রশ্নের পর একটি রহস্য করিবার অবকাশ পাইয়া নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রের আহারটা কি বড়ই গুরুতর রকমের হইয়াছিল?"

"ওর জন্তই চলে যাচ্ছিলুম বৌমা!"

"পেটভ'রে খাবার জন্তে?" বলিয়া নির্ম্মলা অতি মৃদুহাসির ইঙ্গিতে রাখুকে যেন বিশেষ রকমে অপ্রতিভ করিয়া দিল। "আপনি তামাক খান। তার কাছে যা খেয়েছেন, তাতে যদি আপনার সপ্তাহ ক্ষিধে না থাকে, তবু আপনাকে না খাইয়ে আমি ছেড়েদিচ্ছি না!"

এই সময়ে ঠাকুরঘরে ভোগনিবেদনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শুনিয়া রাখু বলিল—"তা হ'লে যত শীঘ্র পারেন, ঠাকুরের প্রসাদ আমাকে আনাইয়া দিন।"

"ঠাকুরের অদৃষ্টে ত আজ কেবল ভাতেভাত।"

"আমার তাই যথেষ্ট হবে।"

"আপনাকে কি আজ যেতেই হবে। এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের দিনে?"

"যেতে হবে বৌমা!"

"কিন্তু আমি যে মনে করছি, আপনাকে আজ কিছুতেই যেতে দেব না।"

"আমি যে বাসাছেড়ে চলে এসেছি!"

"এইখানে থাকবেন।"

ঠিক এমনি সময়ে নালু ভিতর হইতে ডাকিল—"মা!"

"তামাক খান" বলিয়া নির্ম্মলা ভিতরদিকে চলিয়া গেল। রাখুর আর শুভার সংবাদ জানিবার সময় হইল না।

নির্ম্মলা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু বার দুই হুঁকায় টান দিয়া দেয়ালে ঠেসিয়া বসিল। তার পর দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া অনর্থক পুঞ্জে পুঞ্জে আগত অশ্রুগুলাকে অঙ্গুলি দিয়া অপসারিত করিতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া এই একটু পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কতকগুলা স্নেহের কোমল স্পর্শতার চির দুঃখ-নিষ্পীড়িত অসাড় হৃদয়ে কতকগুলা মধুর স্পন্দন ঢালিয়া দিয়াছে। সে গুলা গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিকে স্নিগ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু চক্ষু দুটাকে লোকের কাছে অপদস্থ করিবার জন্ত বড় অন্যায় রকমেরই তারা উৎপীড়ন করিতেছিল। শুভার নাসিকা মধ্য পথে পড়িয়া যদি না এই মধুর স্পন্দনের মধ্য দেশটা ভাঙ্গিয়া দিত, তা হইলে বোধ হয় তার রোদনের নিবৃত্তি হইত না।

রাখু চোক বুজিয়াই ভগবানের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করিল—হে ঠাকুর, শুভাকে নিরাপদ করিয়া আমার এই সুখ-স্বপ্নের ভাঙা প্রবাহকে আবার তোমার করুণার হাত দিয়া জুড়িয়া দাও।

আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই রাখুর স্নেহ বিড়ম্বিত মন তার সারা-অতীতের ইতিহাস কথা ব্যাকুল ভাবে ধরিতে গেলে একটাকেও সুবিধামত ধরিতে না পারিয়া, তাহার চক্ষুপলককে নিস্পন্দ করিয়া, মাথাটা তার হাঁটুর উপর টানিয়া ঘন ঘুমে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রায় এক ঘণ্টা সে ঘুমাইয়াছে, এমন সময় সে কার যেন কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিল।

চোখ মেলিতেই রাখু দেখিল, জলখাবার মেঝেতে সাজাইয়া আসন পাতিয়া শুভা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সে শশব্যস্তের মত উঠিয়া বসিল। দেখিল, তার নাকে একটা পটি।

"তাই ত শুভাদিদি, কেমন ক'রে আমি তোমার নাকে আঘাত করলুম ?"

শুভা কোনও উত্তর দিতে পারিল না।

ভিতর হইতে আবার কথা আসিল—"মুখ চোক ধুয়ে ওঁকে জল খেতে বল্।"

রাখু বুঝিতে পারিল ভিতর হইতে কে কথা কহিতেছে। সে বলিল—"জল-খাবার কেন মা, একবারে ভাত দিলেই ত হইত।"

শুভার মা এইবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ভাত হ'তে কিছু বিলম্ব হবে বাবা। বাজার বসে নি, সরি বাজারে গিয়ে কিছু পায় নি। যদি কিছু মাছ পাওয়া যায়, তাই অন্ত বাজারে লোক পাঠিয়েছি।"

"ঠাকুরের প্রসাদ—ভাতে ভাত দিলেইত হ'ত।"

"কোনও কিছু না পেলে, কাজেই আপনাকে তাই খেতে হবে। আজ আপনাকে নিমন্ত্রণ করে বৌমা বড়ই অপ্রস্তুত হয়েছে।"

"অপ্রস্তুত হবার ত কিছুই দেখছি না। এই যা সাজিয়ে দিয়েছেন, এই সমস্ত খেলে আজ ত আর খাবার প্রয়োজনই হবে না।"

শুভা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। তার পট দেওয়া নাক লইয়া প্রথমে সে রাখুর কাছে আসিতেই চাহে নাই। শুধু বউদিদির তাড়নায় আসিয়াছে। তবু একা আসিতে পারে নাই, মাকে সঙ্গে আসিতে হইয়াছে। এইবারে

সে নাকের কথা ভুলিয়া গেল। ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—"তা বলে আপনি কিছু রাখতে পারবেন না, বউদিদি বলে দিয়েছে আপনাকে সব খেতে হবে।"

তাহার কথাগুলা যে কিঞ্চিৎ অনুনাসিক হইয়াছিল, সেটাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কথা কহিতেই তার মা বলিয়া উঠিল—"আর পেতনীর মত কথা কইতে হবে না ঘর থেকে পান নিয়ে আয়। আর সরিকে বল্, সে একছিলিম তামাক সেজে দিক্।" শুভা পলাইল।

তাহাদের যেন সব গড়াপেটা ছিল। মুখ চোক ধুইয়া যেই রাখু জলযোগ করিতে আসনে বসিল, অমনি সরি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ঠাকুর মা, আমি এখানে থাকছি, আপনি একবার ভিতরে যান—মা কিজন্য আপনাকে ডাকছেন। তার একহাতে পানের ডিবা অন্য হাতে কলিকা।

"তবে তুই কাছে থাক্" বলিয়া শুভার মাও চলিয়া গেল।

এখন সে ঘরে রহিল কেবল রাখু ও সরি। রাখু জলযোগে প্রবৃত্ত হইল, আর সরি পানের ডিবা আসনের কাছে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁদিতে লাগিল। গোটা দুইচার মিষ্টান্ন রাখু মুখে তুলিতেই সে বলিয়া উঠিল—"ঠাকুরমার বড়ই ভাবনা হয়েছে, পাছে মেয়েটির নাক থাঁদা হয়ে যায়।"

খাওয়া বন্ধ করিয়া রাখু মুখ তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"সেরূপ কোন সম্ভাবনা হয়েছে নাকি?"

"ডাক্তারত বলে গেছে নাকের একটা কচিহাড় ভেঙে গেছে। যদি জোড়া না লাগে তা হ'লে অমন বাঁশীর মত সরল নাকটি আর থাক্‌বে না।"

রাখু খাওয়া বন্ধ করিয়া শুধু পাত্রে হাত রাখিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিল। তার সে অবস্থা দেখিয়া সরি হাসি টিপিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তারপর আবার বলিতে লাগিল—"একে ত মেয়ের ওইরূপ—"

"কেন সরো, আমি ত শুভাদিদিকে খুব সুন্দর দেখি।"

"আপনি দেখলে কি হবে, যারা বিয়ে করতে যায় তারাত দেখে না। বাবু ওর পাত্তর খুঁজতে খুঁজতে হায়রাণ হয়ে গেলেন। অমনি অমনিই পাত্তর মিলছে না, দেখবার মত ঐ নাকটী মাত্র ছিল তাও গেলে কি আর মিলবে!"

রাখু আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

"ওকি করলেন ঠাকুর মশাই!"

একথার কোনও উত্তর না দিয়া রাখু হাত মুখ ধুইয়া পূর্ব্বে যেখানে বসিয়া-

ছিল, সেইখানে বসিল। বলিল—"তাইত সয়ো, এদের ত' তাহ'লে বড়ই বিপদে ফেলে দিলুম।"

"আপনি খাওয়া ছেড়ে উঠবেন জানলে একথাত বলতুম না ঠাকুর মশাই।"

"বলে তুমি ভাল করেছ ঝি, এরা যে কত মহৎ তুমি একথা না বললে আমি বুঝতে পারতুম না। তুমি যদি বৌমাকে একবার ডেকে দাও, তা হ'লে বড় ভাল হয়।"

"তাই ত, মা'র কাছে কি ক'রে মুখ দেখাব ঠাকুর?"

"কেন, তোমার ত কোনও অপরাধ নেই ঝি! একথা না বললে বরং তুমি অন্যায় করতে। বৌমাকে একবার ডেকে দাও। তাঁর সঙ্গে কথা ক'বার আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে।" অগত্যা রাখুকে তামাক দিয়া সরি সে স্থান পরিত্যাগ করিল। ক্রমশঃ।

সুদূরের ডাক।

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

১

গুরু গম্ভীর মৃদু মৃদঙ্গ
মরম হর্ম্মে বাজেরে,
প্রলয় লহরী এলো যে পুরীর
মাঝারে!
আজিকে সহসা এমন করিল বলো কে,
তাল কেটে যায় প্রমোদ নৃত্যে পলকে,
মলয় অনিলে কেন কালানল ঝলকে
ধূলোটের সুর বেজে উঠে সব কাজে রে।

২

প্রাণমন কাড়া পরিচিত সাড়া
গৃহ হারা কাছে এলোরে,
বলে দিন তোর গেল ফুরাইয়া
গেলরে।

জড়তার ঠাট বিলাসের হাট সাজানো,
প্রেমের পুরীতে সাধের সারঙ বাজানো,
রূপের পেয়ালা অলসলালস মজানো
দূরে ফেল, আঁখি মেলোরে।

৩

কোন সুদূরের বারতা বহিয়া
আসিল এ দূত পুরীতে,
কণক দেউলে কস্ ধরাইল
ত্বরিতে।
আজি মৃদঙ্গ কি ভোলা কাহিনী আলাপে
থর কণ্টক জেগে উঠে ফোটা গোলাপে,
'কদলী পত্তন' ছেড়ে 'মীননাথ' পলাবে
মধুকরে হবে উড়িতে।

৪

ভাঙ্গার বেদনা হারাণোর ব্যথা
ভুলানো কি কথা স্মরালে।
খুলি রাজসাজ গৈরিক আজ
পরালে।
আজি কারে মনে পড়েছেরে মনে পড়েছে
নাহি কটাক্ষ জলেতে নয়ন ভরেছে,
সকল ভুলায়ে হৃদয় উদাস করেছে
মানস ডেকেছে মরালে।

বাঙ্গালা নাটকের প্রথম যুগ।

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতীয় জীবনে এক মহাসন্ধিক্ষণ আসিছিল। দেশময় খৃষ্টান মিশনারিগণের দীক্ষামন্ত্রে লোকে মহাসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তড়িৎ ও বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন, ছাপাখানার সুলভ প্রচার, পাশ্চাত্য মহাদেশের নানাপ্রকার প্রমোদবিলাস এদেশের লোকের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন

আনিয়া ফেলিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসপাঠে লোকে স্বাধীন রাষ্ট্রের উচ্চভাব ও কল্পনাটী ক্রমে আয়ত্ব করিতে শিখিল। যুগধর্ম্মের ধ্বজাবাহক রামগোপাল ঘোষ ও হিন্দু পেট্রিয়টের তেজস্বী সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই ভাব-প্রচারে অগ্রণী হইলেন। শিশু বাঙ্গলা সাহিত্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের সাহায্যে তারুণ্যে মণ্ডিতশ্রী হইয়া উঠিল। কিছু পুর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উদ্দেশে বেদান্তের একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রবল বাসনাটা দেশবাসীর মনে অনেকটা সংযত করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক মিলন সাধনে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সাফল্যের কয়েক বৎসর পরে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশটী সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে তাঁহার সহযোগী নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত পরিপালন করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মসংঘর্ষের এই বিপুল আন্দোলনে বাঙ্গলা নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি। খ্রীষ্টান পাদরিগণের লিখিত অষ্টাদশ শতাব্দীর কতকগুলি বাঙ্গলা রচনায় এই নাট্য সাহিত্যের প্রথম বিকাশ দেখা যায়। কেশব চন্দ্র নিজেও একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ছিলেন। *

এই শতাব্দীর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ "তত্ত্ববোধিনী সভা" স্থাপন ও ইহার মুখ পত্র স্বরূপ একটী মাসিকপত্র প্রকাশ করিলেন। কিশোরিচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি—পরিসেবিত Citizen নামে আর একখানি সাময়িক পত্র বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের সমালোচনা করিয়া নাট্যকলার সম্যক উন্নতি করিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাময়িকের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রবর্ত্তিত "সর্ব্ব শুভকরী" (১৮৫০), সুধী

---

* সারথী, শ্রাবণ, ১৩২৭, ৭৮ পৃঃ। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির সহিত পনেরো ষোল বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র তাঁহার জন্মস্থান গৌরীভা গ্রামে হাম্‌লেটের অভিনয় করেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কৃত অধুনা দুষ্প্রাপ্য, 'নববৃন্দাবন' নামক সুবিখ্যাত নাটকে কেশবচন্দ্র পাহাড়ী বাবা ও যোগীর অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নাটকে উন্মাদিনীর দৃশ্যটী তাঁহারই রচিত ও ঋত্বিকের ভূমিকাটী নরেন্দ্রনাথ—পরে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রহণ করিতেন। এই আধ্যাত্মিক নাটকটী আলবার্ট হল, কমলকুটীর, মহারাজা স্যর যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রমানাথ ঘোষ ও রংপুর কাকিনার মহারাজার প্রাসাদে অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটকের মূল আধ্যাত্মিক ভাবটী বুঝিতে হইলে কেশবচন্দ্র রচিত "দৈনিক প্রার্থনা"র অংশবিশেষ পড়া প্রয়োজন। সুকুমার কলা, যাত্রা-গান ও সেক্সপীয়রের নাটকের কেশবচন্দ্র পরম ভক্ত ছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থসংগ্রহ", রেভা কৃষ্ণবন্দ্যো সম্পাদিত বিদ্যাকল্পদ্রুম ও হিন্দু কলেজের ছাত্র পেয়ারী চাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার প্রতিষ্ঠিত ও সরল ভাষায় লিখিত "মাসিক পত্রিকা" (১৮৫৪) নাট্য গ্রন্থের ও অভিনয়ের ধারাবাহিক সমালোচনা করিয়া এই সুকুমার কলাসাহিত্যের যথেষ্ট পরিপুষ্টি করিয়াছে। আবার অনেকগুলি বাঙ্গালা সাময়িকের চেষ্টা ছিল—সমাজের ত্রুটী ব্যঙ্গচ্ছলে দেখাইয়া দিয়া সেগুলির সংশোধন করা। উৎকৃষ্টতম বাঙ্গালা নাটক তখন না লেখা হইলেও নাটকাভিনয় দর্শনের জন্ম তখন সকলের মনে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে। ক্ষণিক সাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠা গুলি খুঁজিলে এই সময়কার একটী চিত্র পাওয়া যায়। ক্রমে লোকের মনে যাত্রা গান শুনিবার আগ্রহ ঘুচিয়া গেল। "বিদ্যমঙ্গল" ও "ভদ্রার্জ্জন" নাটক প্রথমে সমধিক সমাদর লাভ করিল। *

গত শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বৎসর নাটকাভিনয়ের ইতিহাস নানা দুর্য্যোগে পরিপূর্ণ। প্রথম ও প্রধানতম অন্তরায় ছিল নারীর ভূমিকা গ্রহণে। সামাজিক ব্যবস্থা, যুগগত কুসংস্কার ও হিন্দুমুসলমান রমণীগণের পর্দ্দানশিনত্ব এই ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল। পণ্ডিতগণের অমোঘ শাসনবজ্র ও সাহিত্যদর্পণকারের বিধানাবলী যত্র তত্র বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের বিরুদ্ধ ছিল। সেক্সপীয়রের ট্র্যাজিডির মত কোন ও ট্র্যাজিডির বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা তখন সম্ভবপর ছিল না। চুম্বন, জৃম্ভন, আলিঙ্গন, বা অন্য কোনও প্রকার বীভৎসভাব প্রকাশের অবকাশ সংস্কৃত রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইত না। নাটকের যেখানে এই সমস্ত ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইত, সেখানে সেগুলি নাটকীয় উক্তির মধ্যে অভিব্যক্ত হইত কিংবা সমগ্র নাটকীয় ক্রিয়াকলাপগুলি একটী ক্ষুদ্র দৃশ্যে নিবদ্ধ হইত। নাট্য সূত্রানুসারে এই দৃশ্য সমূহের নাম 'বিষ্কম্ভক।' *

এই সমস্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়া এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা নাট্যকারগণ পূর্ব্ব পন্থা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উপরন্ত 'দক্ষযজ্ঞ' প্রভৃতি নাটক কোনও হিন্দুগৃহে অভিনীত হইতে পারিত না, কারণ ইহাতে শিব সতীর অমর্য্যাদাসূচক দৃশ্যাবলী আছে ও মহা নৃত্যের প্রলয়ঙ্কর বিবরণ আছে। নাটকের গঠন প্রণালী

---

* রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত "রত্নাবলী"র ভূমিকা।

* "বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষেপার্থস্তু বিষ্কম্ভো মধ্যপাত্র প্রযোজিতঃ॥"—দশরূপকম্।

(Technique) লইয়াই সংস্কৃত পণ্ডিতগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল। যাত্রাভিনয়ের ঠাট বজায় থাকিলেও এ যুগের কয়েক খানি শ্রেষ্ঠ নাটক সংস্কৃত সূত্রের বিরুদ্ধে লিখিত। পাশ্চাত্য নাট্যকলার কৌশল ও অভিব্যক্তি বাঙ্গলা নাটকের মধ্যে প্রথমে অতি ক্ষীণভাবেই অনুস্যূত হইতেছিল। কিন্তু তদানীন্তন পণ্ডিতগণ নব্য আদর্শকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছিলেন। বাঙ্গালা নাটকের দ্রুত উন্নতির পক্ষে ইহাই প্রধান অন্তরায় ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইব যে নাট্য সহিত্যের এই উষাকালে কয়েকজন সুধী পাশ্চাত্য অভিনেতাও বাঙ্গালীর সঙ্গে এক যোগে কার্য্য করিয়া জয় সাফল্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল মাত্র কারবারের খাতিরে রঙ্গমঞ্চ চালাইবার ধৃষ্টতা এমন অবস্থায় সম্ভবপর হইতে পারে না বলিয়াই বাঙ্গালা নাট্যকলার আদি উৎসাহিগণ ইংরাজী রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাঙ্গালায় সখের দল প্রবর্ত্তিত করিলেন। এ বিষয়ে দেশের বড় বড় রাজামহারাজা ও জমীদারগণ প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেন দেখিয়া তাঁহাদের অন্নজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহাদেরই অর্থানুকুল্যে এই নাট্যকলার প্রচার হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে এই সমস্ত অভিনয়ের সময় নানা জাতীয় লোকসমাগম হইত। অভিনয় সাফল্য হইলে অনেকের বিরুদ্ধ মত খণ্ডিত হইত, অনেক অনুকূল সমালোচনা ও আন্দোলন হইত। বাঙ্গালার জাতীয় রঙ্গমঞ্চগঠনের প্রথম যুগে নাট্যকারগণ এই সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটাইয়া কেমন করিয়া পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া তুলিলেন এইবার তাহার আলোচনা করিব।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর ভবনে, প্রথম 'এমেচার' বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনীত হয়। দর্শক ও অভিনেতৃগণ দৃশ্য পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানও পরিবর্ত্তন করিত এবং প্রতি দৃশ্যের প্রারম্ভে ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে প্রস্তাবনা আবৃত্তি হইত। এই সময়ে হিন্দু কলেজের ইংরাজীর খ্যাতনামা অধ্যাপক কাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ড্সন ও অবসর প্রাপ্ত ব্যারিষ্টার ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অধ্যাপক হারমান্ জাফ্রয় নিজ নিজ ছাত্রগণকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী নাটক হইতে অভিনয় শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের এই সাহিত্যানুরাগ ছাত্রগণকে নানাপ্রকার অভিনয়কুশলী করিয়া তুলিয়াছিল। এই ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে একজন পরে বেলগাছিয়া থিয়েটার ভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটকের

অভাবে ইংরাজী নাটক সমূহ কলিকাতাস্থ জমীদারগণের ভবনে মহাসমারোহে অভিনীত হইত। কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়ার বাগান-বাড়ীতে ইংরাজী অনুবাদে ভবভূতির "উত্তর রামচরিত" অভিনীত হয়, ইহাতে উইলসন্ সাহেব নিজে নাটকের পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরে ডেভিড হেয়ার একাডেমীতে সেক্স্পীয়র রচিত "মার্চেন্ট অফ ভিনিস্" ও "জুলিয়াস্ সিজারে"র অভিনয় হয়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারের পূর্ব্বতন ছাত্রেরা প্রথমে "টাউন্ থিয়েটার" স্থাপন করিয়া পরে এই বিদ্যালয়েই "ওরিয়েন্টাল্ থিয়েটার" নামে তাঁহারা আর একটী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান যেখানে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ প্রতিষ্ঠিত (৩০, পার্ক ষ্ট্রীট), ঐখানে তখন যে সাঁ সুচি Sans Souci theatre) থিয়েটার ছিল সেখানকার মিঃ ক্লিঙ্গার নামক এক-জন অভিনেতা এই নবস্থাপিত ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের নাটক পরিচালক হইলেন। এইখানে সেক্স্পীয়রের "ওথেলো", "মার্চেন্ট অফ ভিনিস্" ও চতুর্থ "হেনরির" প্রথমাংশ (যাহাতে ফলষ্টাফের কৌতুকময় দৃশ্য আছে) অভিনীত হয়। গ্রেগ্ (Mrs. Greig) নামক একজন সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী এই অভিনয়ে পোর্সিয়ার অংশ গ্রহণ করিয়া অভিনয়ে খুব সুখ্যাতি লাভ করেন। অভিনয় জগতে ইয়োরোপের প্রখ্যাত নামগুলির তুলনায় বাঙ্গালায় এই যুগে কোনও অভিনেতা না থাকিলেও বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য ইংরাজীর সংস্পর্শে আসিয়া যে উন্নত ফললাভ করিয়াছিল, তাহা সব জাতির সাহিত্যে সহজে ঘটে না। ইয়োরোপে ম্যাকরেডি, ফেলপস্, আর্ভিং, ট্রি, রিস্তোরি, হেলেন ফসিট, কেট ও এলেন টেরির নাম সুবিখ্যাত। সারা বার্ণার্ডের নাম না জানে এমন কে আছে? সাঁ সুচি থিয়েটারেও হোরেস হীমান উইলসন, ইংলিশ-ম্যানের সম্পাদক মিঃ ষ্টকুলার, পার্কার, টরেন্স্ ও হিউম্ নামে কলিকাতার এক জন মাজিষ্ট্রেট অভিনয় করিতেন!

ইংরাজী থিয়েটারের এই দ্রুত উন্নতির সময় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারে সমাজের অভিনয়সংক্রান্ত অনেক কুসংস্কার সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার হইল, কলিকাতায় ঠাকুর প্রাসাদে ভারত বিখ্যাত অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদের সমাগম হইল এবং অনেক স্থলে সঙ্গীতসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বর্গীয় মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহনঠাকুর নিজ প্রতিভাগুণে সঙ্গীতে ও বাদ্যে বিশ্ব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসঙ্গীত ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের করুণরসাত্মক প্রার্থনাবলী বাঙ্গালা নাটকের পরিপোষণে প্রধান

সহায় হইল। ইহাতে নাটকের কথোপকথনে ভাষা, নাটকীয় চরিত্র চিত্রণ ও সঙ্গীত যোজনের উপায় অনেকটা সংস্কৃত হইয়া উঠিল।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে মিউটিনীর বৎসরে অনেকগুলি নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। "বিদ্যাসুন্দর", "রুক্মিণীহরণ" "মালতী মাধব", "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব," "শকুন্তলা" (ইহা বিডন ষ্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাটীতে অভিনীত হয়), "মহাশ্বেতা" "বেণীসংহার" (যোড়াসাঁকোয় কালীসিংহের বাড়ী অভিনীত), ও "বিক্রমোর্ব্বশী" (কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে অনূদিত) নাটক এই সময় সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই শেষোক্ত নাটকের অভিনয়ে একটী প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন ও ভারতগবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী স্যর সিসিল্ বিডন্ ইহার অভিনয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। শিবতলায় (বর্ত্তমান ঠাকুর ক্যাস্‌ল্ ষ্ট্রীট্) রামজয় বসাকের গৃহে ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকের সর্ব্ব প্রথম অভিনয় হয়। রংপুরের জমীদার ও দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের পরমবন্ধু কালীচরণ চৌধুরী এই নাটক রচনাকল্পে পণ্ডিত রামনারাণে তর্করত্নকে উৎসাহিত করিয়া অর্থ সাহায্য করেন। তিনি "পদ্মিনী উপাখ্যান"-কার রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অর্থ সাহায্য করেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ক্রীত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (পরে, মহারাজা স্যর্) সুরম্য উদ্যানবাটিকায় বিখ্যাত বেলগাছিয়া থিয়েটার স্থাপিত হয়। পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিং এই নবীন উদ্যমে যতীন্দ্রমোহনের সহযোগী ছিলেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের ন্যায় যতীন্দ্রমোহনও সে যুগে সর্ব্ববিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের উন্নতিসাধন ও বাঙ্গলা নাটকের পরিপুষ্টি বিষয়ে ইঁহারা সকলেই একযোগে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। *

শ্রীহর্ষ-প্রণীত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক "রত্নাবলীর" পণ্ডিত রামনারায়ণ-কৃত বঙ্গানুবাদের অভিনয় সময়ে বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম "কন্সার্ট পার্টি" আরব্ধ হয়।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১লা জুলাই তারিখে "রত্নাবলী" নাটক "বেলগেছিয়া থিয়েটারে" অভিনীত হয়। উপর্য্যুপরি কয়েক রজনী ধরিয়া একই নাটকের

---

* মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কৃত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় আছে—Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising National Theatre." তাঁহার "কৃষ্ণকুমারী নাটকে"র উপহার-পত্রও দ্রষ্টব্য।

এরূপ সমারোহে পুনরভিনয় সহজে ঘটে না। ইংরাজ, মুসলমান, বাঙ্গালী, ইহুদী ও মাড়োয়ারি দর্শকের এমন একত্র সম্মিলনও নাট্যের ইতিহাসে বিরল। বঙ্গদেশের ছোটলাট স্তর ফ্রেডেরিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের অনেক জজ ও অন্যান্য বহুপদস্থব্যক্তি এই অভিনয়দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দৃশ্যপট ও বেশভূষার পারিপাট্য সম্বন্ধে যে সমস্ত নজীর পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে রাজভ্রাতৃগণ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য মাইকেল দত্ত "রত্নাবলী" নাটকটী ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'রত্নাবলীর" অভিনয় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। এই অভিনয়ের অপূর্ব্ব সাফল্য হইতে লোকে বুঝিতে পারিল যে বাঙ্গালা নাটকের একটা গৌরবময় ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মাইকেলের "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক লিখিত হয়। কবি ইহার ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছিলেন যে নাটকখানি সংস্কৃত নাট্যসূত্রের বিরুদ্ধপন্থী। অবশ্য ইহাতে পূর্ণমাত্রায় ইংরাজীপ্রভাব বর্ত্তমান ছিল। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ৩রা সেপ্‌টেম্বর যখন ইহা বেলগেছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইল, তখন পণ্ডিতবর্গের আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। *

---

* ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকের সমালোচনা করেন—"বিবিধার্থসংগ্রহ," ৫ম পর্ব্ব, ৫৮ সংখ্যা, শক ১৭৮০, মাঘ। মাইকেল এই নাটকের সম্বন্ধে একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama, but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, and the plot interesting, the characters will maintain, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's Poetry, because it is full of orientalism, Byron's Poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides remember that I am writing for that portion of my Countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking*, and that it is my intention to throw of the fetters forged for us by a servile admiration for everything Sanskrit" গৌরদাস বসাককে লিখিত এই পত্রখানি মাইকেল-চরিতকার বসু এবং সোম মহাশয়দ্বয়ের পুস্তকে উদ্ধৃত। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে "শর্ম্মিষ্ঠা"-অভিনয়ে লোকের মতামত সম্বন্ধে মাইকেল দত্ত লিখিয়াছেন,—"When *Carmistha* was acted at Belgachia the impression it created was simply indescribable. Even the best romantic spectator was charmed with the character of *Carmistha* and shed tears with her. As for my

এই সময়ে বেলগেছিয়া থিয়েটারে মাইকেলের অন্য কয়েকখানি নাটকও অভিনীত হয়—"পদ্মাবতী", "একেই কি বলে সভ্যতা?" "বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ" ও "কৃষ্ণকুমারী নাটক"। "পদ্মাবতী" নাটকে একটী গ্রীক পুরাতন কাহিনী হিন্দু প্রতিবেশপ্রভাবের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" বাঙ্গালায় যে প্রহসনের ধারা আরব্ধ করিয়াছিল তাহা বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। নব্যবঙ্গের অর্দ্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিতগণের মধ্যে যে কলুষতা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত করিয়া দেওয়াই এই প্রহসনের উদ্দেশ্য। "সধবার একাদশী" ও "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে মাইকেলের আদর্শ সম্যক্ পরিস্ফুট। মাইকেলের প্রহসন-রচনার অনতিকালপূর্ব্বে এই ধরণের কয়েকখানি সামাজিক প্রহসন রচিত হইয়াছিল ও সেগুলি যথেষ্ট খ্যাতিও লাভ করিয়াছিল, যথা—"নববাবু বিলাস," "নববিধি বিলাস,*" "বুঝলে কিনা"? "উভয়সঙ্কট" ইত্যাদি।

শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল্ সোসাইটীতেও "একেই কি বলে সভ্যতা"র অভিনয় হয়। কিন্তু মাইকেলের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আর "পদ্মাবতী নাটকের" অভিনয় হয় নাই। বেঙ্গল এমেচার থিয়েট্রিকাল্ কোম্পানীর দ্বারা বড়তলায় (২৪৬, অপারচিৎপুর রোড্) ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার সর্ব্বপ্রথম অভিনয় হয় ও ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের দত্তগণের বাড়ীতে ইহা যাত্রাকারে প্রদর্শিত হয়। "কৃষ্ণকুমারী নাটক" বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম নাটকীয় অমিত্রাক্ষর রচনা। ইহা বিয়োগান্ত বলিয়া রাজমাতার অসম্মতিবশাৎ পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে অভিনীত হয় নাই, কিন্তু শোভাবাজারের দলের দ্বারা ইহা ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে অভিনীত হইয়াছিল।

নাটকাভিনয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালা নাটক রচনার গতিও শ্লথ হইয়া পড়িল। "একেই কি বলে সভ্যতা?" ও "বুড়ো-

---

own feelings, they were things to dream of not to tell. Poor old Ramchandra (an old tutor of Hindu College) was half mad and grasped my hand saying. "Why, my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! Oh it is beautiful!"

* ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটী সমালোচনায় বলিয়াছেন, "আমাদের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই (একেই কি বলে সভ্যতা) সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" এই মত উক্ত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাবিত্রী লাইব্রেরীর একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য।"

শালিকের ঘাড়ে রোঁ।” তদানীন্তন কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ যুবককে লক্ষ্য-করিয়া রচিত হইয়াছিল বলিয়া রাজারা এই দুইটী নাটক বেলগেছিয়া নাট্য-শালায় অভিনয় করিতে সম্মত হন নাই। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা নাটকের অভাব উপলব্ধি করিয়া কয়েকখানি ইংরাজী প্রহসন রচনা করাইয়া সেগুলির অভিনয় করান, যথা Prince for an Hour (Abou Hossain ?), Power and Principle, Fast Train, High Pressure, Express ইত্যাদির ইহাদেরমধ্যে একখানিও মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ঠাকু বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে ইংরাজী নাটকের অভিনয় করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে ২৯শে মার্চ্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা নাটকের উন্নতি সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িল। লোকে তখন বুঝিতে পারিল যে সখের অভিনয়ে নাটকের স্থায়ী উন্নতি সম্ভবপর নয়। কিন্তু তখন লোকের মনে একটা নাটকানুরাগ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাই ক্রমশঃ পেশাদারী থিয়েটারের দল কলিকাতার স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ প্রবন্ধে আমর আর সে ইতিহাসের অনুসরণ করিব না।

“আকামের গোঁসাই”

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

(১)

তার মুখের জন্য তাকে কেউ দেখতে পারতো না। তেমন ঠোঁটকাটা দুনিয়ায় দুটো ছিল না। বয়স, পদ, মানের দিকে দৃক্‌পাত নাই—যখন যা মনে আসত, তখন তাই সবার মুখের সামনে ব’লে দিত। কিন্তু যে স্বভাব ম’লেও যায় না, তা সে কেমন ক’রে হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের অনুরোধে অথবা বাক্যযন্ত্রণাভাগীদের অভিশাপে একবারে বদলে ফেলবে! ভগবান সাপকে কেন বিষ দিলেন! এক বিকার রোগের ওষুধের সময় সে বিষ কাজে লাগে, অন্য সময় সাপের দংশনে মানুষ মরেই যায়। বিধাতা যাকে কোনও গুণ না দেন, তার দোষের মাত্রাটা যেন কিছু বেশীরকম হ’য়ে থাকে। ছেলেটিকে মা ডাকতেন “আকামের গোঁসাই”। পুরুষের আত্মম্ভরিতা, আর নারীর

অভিমান তার চরিত্রে পুরোমাত্রায় ছিল। বাবা বলতেন এত মান-অভিমান নিয়ে যারা থাকে তাদের দ্বারা কাজ হয় না।

(২)

সে মনে করত জীবনে কাজ আবার কি আছে ; মশা, মাছিকে ভগবান কোন্ কাজের জন্ম সৃষ্টি করেছিলেন ? মশারি বিক্রী হ'বে ব'লে মশার সৃষ্টি হয়েছিল এরূপ ভাবাও যা, অমুক উপকারটা হবে ব'লে একজনের জীবনের সৃষ্টি হয়েছে বলাও তাই।

তাই "আকামের গোঁসাই"—মায়ের দেওয়া নামে খুসীই থাকতো। মায়ের পাঁচটা ছেলে ছিল—কিন্তু আকামের একটিই মা ছিল। অন্য ছেলেরা মায়ের উপযুক্ত ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি রূপে গুণে তাদের সন্তান ব'লে, পরিচয় দিতে মায়ের বুক গরবে ফুলে উঠত। কিন্তু আকামকে নিয়ে মায়ের মুস্কিল হয়েছিল। সংসারে কত রকম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে তার মত ওস্তাদ কেউ ছিল না। মার শত তিরস্কারেও তার চৈতন্য হ'ত না। কখনও অভিমানে ভরা বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে মার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকতো—আবার কখনো বা চাইতে চাইতে চোখের পাতা ভিজে আসতো। কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই।

(৩)

"আকাম" একদিন কি মনে ক'রে বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। কাজের মানুষ ছিল না ব'লে তার অভাবটা সংসারে তেমন একটা শূন্যতা এনে দিল না। তবে সে ছিল মানব দেহের প্লীহা যন্ত্রটির মত—কেন আছে ডাক্তাররা বলতে পারেন না—অথচ না থাকলেও প্রাণ বাঁচে না। হাজার হোক মায়ের প্রাণ, ছেলাটা হতভাগা হলেও তার জন্য মনটা কেমন কেমন করত। পথে পাওয়া সন্তান হ'লেও মা তাকে পেটের ছেলের মত করেই মানুষ করেছিলেন। তাই বাড়ীর অন্য লোকে খুসী হলেও মা একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব প্রথম প্রথম অনুভব না ক'রে পারতেন না।

(৪)

পশ্চিমের একটা সহরে "আকামকে" নিয়ে একটি সুন্দরী যুবতী ভিক্ষা ক'রে বেড়াত। জগতে কেউ যাকে দেখতে পারতো না, শিশুর সরলতা যার যৌবনের অপরাধ হয়েছিল, প্রেমের কোমলতা যাকে পাগল নাম দিয়েছিল, হৃদয়তন্ত্রীর ছিন্ন তারের ঝঙ্কার যার জীবনের গানকে ক্রন্দনের প্রলাপ করেছিল, আর

অন্তরের বিষণ্ণ অন্তর্মুখীনতাকে অলসতার আখ্যা দিয়েছিল—সেই সৃষ্টিছাড়া হতভাগার জীবনসঙ্গিনী হতে সে রমণীর সাধ হয়েছিল। ভগবান এক একজনকে এমনি করেই দুঃখের নেশায় পাগল করেন! চোখ খারাপ না হ'লেও যেমন কেউ কেউ সখ ক'রে চশমা পরে, এই সকল ব্যক্তিও সেইরূপ সাধ ক'রে দুঃখকে বরণ ক'রে নেয় এবং সেই দুঃখের বেদনার মাঝে নিজের জীবনের গভীরতম সুখের উৎস খুঁজে পায়।

৫

টাইফয়েডে "আকামের" চোখ দুটী অন্ধ হ'য়ে গেছে—আর কথা কইবার শক্তি জন্মের মত লোপ পেয়েছে। তার জীবনসঙ্গিনী রোগের সময় শুশ্রূষা করতে করতে আকামের উপর অনুরক্ত হয়। সম্পদের স্নেহক্রোড়ে লালিত পালিত হ'লেও এই যুবতী বাপমায়ের অমতেই ঐ হতভাগ্য যুবকের দুঃখময় জীবন স্রোতে ঝাঁপ দেয়। আজ তার সেই অনুপম প্রেম তাকে পথের ভিখারিণী করেছে।

৬

সংসারে সে-রূপের চেয়ে রূপ অনেকেরই ছিল। কিন্তু প্রাণের সে করুণ মধুর সৌন্দর্য্যের রূপ কোন্ মুখে এমন ক'রে ফুটে উঠেছিল? সেই ডাগর ডাগর চোক, তুলি দিয়ে আঁকা হাঁটু পর্য্যন্ত এলানো ঢেউখেলানো চুল ক্ষীণ দেহ খানিতে সৌন্দর্য্যের চিক্কণতা—মুখখানিতে কি স্বর্গীয় করুণার ম্লান তেজ, যেন রাস্তার লোককে ক্ষণেকের জন্য অমিয় ধারায় স্নান করিয়ে দিত। এত দুঃখ এত কষ্ট, তবুও তার কুন্দ ফুলের মত দাঁতের হাঁসির রেখাঙ্কণে কি সুন্দর ছবি খানিই ফুটে উঠতো।

৭

"আকাম" এখন পক্ষাঘাতে শয্যাগত। কুটীরের মধ্যে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে "আকাম" আজ তার স্বর্গরচনা নিয়ে ব্যস্ত। কেবল দুটি ভিক্ষার জন্য তার অন্ধের নয়নমণি যখন বাহিরে যায়, তখন সে ছটফট করে—এককালে যাহা এত সুন্দর ছিল সেই দৃষ্টিহীন বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে ধারা বয়ে যায়। করুণাময়ী ফিরে এসে কত বকে, কত আদর করে—নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ায়। "আকামে"র আজ একবারেই চোখে দৃষ্টি নাই, মুখে বাক্‌শক্তি নাই, দেহ পক্ষাঘাতে অবসন্ন, মার আশীর্ব্বাদে সে যে আজ সত্য সত্যই আকাম হয়েছে; তার কোনও

কাম নেই—সংসারে মুদিত আঁখিতে সে এক আনন্দমূর্ত্তি দেখে আর গোঁসাই বাবাজীর ভক্ত শিষ্যাটি কেবলই গান করে শোনায়—

"মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা,
নিতুই নূতন পীরিতিরতন
যতনে রাখিল তারা।"
"পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া রেথ,
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ!"

আবার :—"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই, সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহুক তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা,
তোরা নিসাড় হইয়া আয়, না, সজনি,
আঁধার পেরিলে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা,
ও দেশের কথা এদেশে কহিল
লাগিল মরম ব্যাথা।"

গৌতম বুদ্ধ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

[অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী]

(৭)

বুদ্ধত্বলাভের পর রাজায়তন বৃক্ষ হইতে বুদ্ধদেব অজপালের বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার মনে নানা তর্কবিতর্কের উদয় হইল। তিনি এই নির্জ্জনে চিন্তা করিলেন—"আমি যে সকল সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান পাইয়াছি সেই সকল সাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা কেবল সময় ও শক্তির অপব্যবহার মাত্র হইবে কিনা? যে সংসারী, তাহার সার বস্তু সংসার; ভোগবিলাসের কোলে যে লালিত পালিত, উপভোগে তাহার কামনার পরিতৃপ্ত হয় না। সত্যালোকের জ্যোতিঃ বা নির্ব্বাণের পথ খুঁজিয়া বাহির করা বড় সহজ ব্যাপার নহে এবং সংসারীর পক্ষে সেই পথে চলা ফেরা করাও নিতান্ত কঠিন। কাজেই এখন আমি যদি এই সত্যধর্ম্ম জগতে প্রচার করি, আর যদি লোক তাহা না বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, তবে আমার সকল শ্রমই পণ্ড হইবে।" এই ভাবিয়া যখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বতোভদ্র বুদ্ধদেব প্রচারে বিরত হইবেন স্থির করিলেন, তখন স্বয়ংভূ ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবযোনিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভুতদয়া ও বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া বলিলেন—"যদি আপনি ধর্ম্মপ্রচার না করেন,—যদি আপনি মুক্তির পথ দেখাইয়া না দেন, তবে এই সমগ্র জীবলোক ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।" দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া বুদ্ধ চিন্তা করিলেন,—কাহার নিকট তিনি সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের সত্যসমাচার প্রচার করিবেন। সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল। তিনি পূর্ব্ব সঙ্গী অরণ্যবাসের প্রধান সহায় পাঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু পাঁচ জনের অনুসন্ধান করিবার মানসে বারাণসীর সন্নিহিত মৃগদারে (মিগদায় বা ঋষিপত্তনে—ঈশিপত্তনে বর্ত্তমান সারনাথে) গমন করিলেন। সেইখানে সেই পাঁচজনের সম্মুখেই তিনি প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিলেন—অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মমত ও উপদেশ প্রচার করিলেন। তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন সকল বিষয়েরই অতিমাত্রা পরিহার করিয়া, মধ্যপথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। একদিকে সংসারের ভোগবিলাসিতার অনুসরণ, অন্যদিকে নিরর্থক

কঠোর তপশ্চর্য্যার অবলম্বন এই উভয় পথই একান্ত পরিহার্য্য। মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই জ্ঞান ও নির্ব্বাণের অধিকারী হইতে পারা যায়। এমন কি, তাহাই একমাত্র পথ, ইহাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিলেন। ক্রমে ক্রমে বুদ্ধদেব ব্যাধি, ব্যাধির উৎপত্তি ও চিকিৎসা বা নিবৃত্তি এবং কোন পথে চলিলেই বা ব্যাধির চিরকালের মত নিবৃত্তি হয়—এই চারিটী বিষয়ের ব্যাখ্যান প্রদান করেন। এইরূপে নানাভাবে নানাস্থানে নিজের মত প্রচার করিয়া বুদ্ধ নিজের পূর্ব্ব সহচর পঞ্চবর্ষীয় ভিক্ষু পাঁচজনকে স্বমতে দীক্ষিত করেন এবং এই পাঁচজনই বৌদ্ধসংঘের প্রথম শিষ্য।

(৮)

এই সময়ে বুদ্ধের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম্মপ্রচারার্থ মগধদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণেই কাটিয়াছিল। অচিরেই তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যের সংখ্যা পর পর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় লোকেরা আবাসের জন্ত তাঁহাকে বড় বড় বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিলেন। সমস্ত বর্ষাকালটা তিনি এইরকম কোন এক বিহারে থাকিতেন এবং বর্ষার শেষে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া চারি দিকের লোককে পবিত্র পুণ্যময় জীবনযাপন করিবার উপদেশ দিয়া বেড়াইতেন। প্রথম প্রথম যাঁহারা দীক্ষিত হইয়া তাঁহার শিষ্য হয়েন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাশ্যপেরা তিন ভাই, জটীল (জটাধারী) ভিক্ষুগণ এবং উরুবিল্বার সাগ্নিক (অগ্নিউপাসকগণ) গণই প্রধান। কতকগুলি অমানুষিক দৈবঘটনার প্রক্রিয়া বলেই তথাগত তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই সকল অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে জলে ভ্রমণ, অগ্নিমন্দিরের সর্পদমন প্রভৃতি কয়েকটার অতি জ্বলন্ত চিত্র সাঞ্চীস্তূপের পূর্ব্বতোরণে অঙ্কিত আছে। ইহার অল্প পরেই বুদ্ধদেব রাজগৃহে আরও কয়েকজন শিষ্যকে দীক্ষা দেন; এবং ইহারই অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। এই শিষ্যদিগের মধ্যে প্রধান সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এই দুইজনের অস্থি (দেহাবশেষ) সাঞ্চীর তৃতীয় স্তূপে বিনিহিত আছে।

(৯)

বুদ্ধদেব সেকালের যত প্রধান প্রধান রাজসভায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, সকল জায়গায়ই তিনি আদরের সহিত অভিনন্দিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনাজিৎ এবং মগধাধিপতি বিম্বিসার ও অজাতশত্রু মহা-

সমারোহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এই দুইটী প্রসঙ্গই সাঞ্চীর শিলা-স্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে। এই সময়ে অনেক উদ্যান, আশ্রম ও বিহার নিজ বুদ্ধকে কিংবা তাঁহার আশ্রিত ভিক্ষুসংঘকে দান করা হইয়াছিল। এই সকল দানের মধ্যে জেতবন উদ্যান ও শ্রাবস্তীর বিহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। অনাথ পিণ্ডিক নামে কোন ধনীশ্রেষ্ঠী (শেঠ) ইহা দিয়াছিলেন। রাজকুমার জেতের নিকট হইতে উহা বহুসংখ্যক সুবর্ণমুদ্রায় খরিদ করা হইয়াছিল;—কথিত আছে, যত সুবর্ণমুদ্রায় ঐ বিহার ও উদ্যানের ভূমিভাগ আবৃত হইতে পারে তত স্বর্ণমুদ্রাই মূল্য স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। অপর অপর দানের মধ্যে আম্রপালী নামে কোন বারাঙ্গণার দেওয়া বৈশালীর আম্রবন এবং বিম্বিসারের দেওয়া রাজগৃহের বেণুবন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব যখন প্রথম রাজগৃহে গমন করেন সেই সময়ে সেই সুপ্রসিদ্ধ বেণুবন নিজ বুদ্ধকেই দেওয়া হইয়াছিল। এই বেণুবন উত্তরকালে বুদ্ধের অতি প্রিয় ও প্রীতিপদ বাসস্থান হইয়াছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার এই স্থানে কিম্বা নিকটবর্ত্তী আরও দুই এক স্থানে অবস্থানের ব্যাপার সংক্রান্ত অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজগৃহে অবস্থানকালেই তাঁহার দুষ্ট জ্ঞাতিভাই দেবদত্ত তিনবার তাঁহাকে মারিবার উপক্রম করে; প্রথমে পয়সা দিয়া গুণ্ডা লাগাইয়া; পরে, তাঁহার উপরে বৃহৎ শিলারাশি নিক্ষেপ করিয়া এবং শেষে তাঁহার উপরে এক উন্মত্ত হাতী ছাড়িয়া দিয়া। বলা বাহুল্য, দেবদত্তের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল; গুণ্ডারা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়, প্রস্তর থামিয়া পড়ে, এবং হস্তী বুদ্ধের সম্মুখে ধীরভাবে অবনত হইয়া থাকে। সাঞ্চীর উৎকীর্ণ শিলাফলক-সমূহে এই সকল ঘটনার নিদর্শন আছে। এই রাজগৃহের নিকট ইন্দ্রশৈল গুহায় যখন বুদ্ধদেব সমাধিমগ্ন ছিলেন, তখন ইন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার পূর্ব্বাবধিই বুদ্ধের প্রধান সহায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র পিতৃহন্তা অজাতশত্রু প্রথমে দেবদত্তের পোষকতা করিয়া বুদ্ধের শত্রুতা সাধন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু শেষে তিনিও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

(১০)

বুদ্ধত্ব লাভের এক বৎসর পরে (দ্বিতীয় বৎসরে) পিতা শুদ্ধোদনের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া বুদ্ধদেব কপিলাবাস্তুর প্রাচীন রাজপ্রসাদে গমন করেন। তাঁহার বর্ত্তমান নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি নগরের বাহিরে কোন উদ্যানে অবস্থান

করেন। সেইখানে তাঁহার পিতা এবং শাক্য রাজকুমারগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেই সময়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল,—পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে আগে কাহাকে অভিবাদন করিবেন? বুদ্ধ অবিলম্বে নিজেই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি দৈবশক্তিতে ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক উপদেশাত্মক ধর্ম্মবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন জনক বিস্মিত হইয়া পুত্রের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন এবং থাকিবার জন্য তাঁহাকে বটবন প্রদান করিলেন। বুদ্ধের কপিলাবস্তুতে এই গমনের পরেই শাক্যবংশের অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন; তাহার মধ্যে আনন্দ, অনিরুদ্ধ, ভাদ্দীয়, ভাগু, কিম্বিল এবং দেবদত্ত প্রধান।

(১১)

যাঁহারা গৌতমের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে ছয় মাস তীর্থিকই প্রধান। ইহারা প্রত্যেকেই নাস্তিকদলের নেতা। ইহাদিগের নাম—পুরাণ, কাশ্যপ, মাখ্খালি গোশাল, অজিতকেশ, কম্বলী, পকুধ, কচ্চায়ন, নিগন্থ নাটপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলাথিপুত্ত। শেষোক্ত তীথিক কিছুকাল সারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল নাস্তিক দলপতি সেই সময়ে প্রসেনজিতের সভায় থাকিতেন; তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার মানসে বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রাবস্তীতে গমন করেন এবং তথায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধদিগের প্রবর্ত্তিত ও আচরিত নিয়মানুসারে অনেক বিস্ময়কর ও অলৌকিক অঘটন ঘটনা সংঘটিত করেন। তিনি ব্যোমমার্গে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্‌বলয় বিলম্বিত এক মহাপথের আবিষ্কার করিয়া তাহাতে আরোহণ করেন। তাঁহার শরীরের ঊর্দ্ধভাগ হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা ও নিম্নভাগ হইতে বিস্ফূরিত জলন্ত অগ্নিশিখা নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলৌকিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে এবং সেই হেমকান্তি দিব্যালোকে চারিদিক্ প্লাবিত হইয়া যায়। তিনি তখন সমবেত জনমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করেন এবং তাহাদিগের সকলকে সত্যপথের সন্ধান শিক্ষা দেন।

(১২)

এই অদ্ভুত ব্যাপারের পরে বুদ্ধদেব শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করেন। তথায় জননী মায়াদেবী ও দেবলোকের অতিথেয়দিগকে অভিধর্ম্মের ব্যাখ্যান দেওয়াই তাঁহার মনোগত ছিল। তিনি তিন মাস সেই স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পরে মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া

আসেন। আসিবার সময়ে ইন্দ্র আকাশপথে তাঁহার জন্য এক দিব্য মণিময় সিঁড়ি ঝুলাইয়া দেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র উভয়েই তাঁহার অনুগমন করেন; ব্রহ্মা দক্ষিণভাগে স্বুবর্ণময় সোপানে এবং ইন্দ্র বামভাগে স্ফটিকময় সোপানে তাহার সঙ্গে মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন। যে স্থানে তিনি সেই সময়ে মর্ত্ত্যলোকে পদার্পণ করেন তাহার নাম সাংকাশ্য (সংকাশ্য বা সংকিস্সা)।

(১৩)

আশীবৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের মৃত্যু (মহাপরিনির্ব্বাণ) সংঘটিত হয়। কথিত আছে শুষ্ক শূকরের মাংস অতি মাত্রায় ভোজন করিয়াই তাঁহার জীবনান্ত ঘটে। পাবা নামক স্থানের চন্দনামে কোন কর্ম্মকার (কাঁসারি) তাঁহাকে খাইবার জন্য উক্ত মাংস প্রস্তুত করিয়া প্রদান করে। বুদ্ধদেব তখন কুশনগরের (কুশীনগরে—কুসিয়া) পথে যাইতেছিলেন এবং পথিমধ্যে নিজের অন্তিমকাল উপস্থিত জানিতে পারিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী কোন শালবনের দুইটী শালবৃক্ষের মধ্যে শয্যা রচনা করিবার আদেশ করেন। এক পায়ের উপর অন্য পা রাখিয়া, দক্ষিণ পাশে ফিরিয়া, সিংহের মত, তিনি উত্তর শিরা হইয়া সেই অন্তিম শয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়েও তিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং সমাগত ভিক্ষুসংঘকে নানাভাবে আদেশ ও উপদেশ দিতে ত্রুটী করেন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগেকে শ্রদ্ধাভরে সম্প্রদায়ের যথানিয়মের অনুবর্ত্তনের জন্য প্রোৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের সেই শেষ মুহূর্ত্তে ও তাঁহার অনুমতি ক্রমে স্বুভদ্র নামক কোন যাযাবর নাস্তিককে তাঁহার সম্মুখে আনা হইয়াছিল। স্বুভদ্র বুদ্ধের উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার শেষ শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তখন বুদ্ধদেব স্বুভদ্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে এখনও এমন কেহ আছে কিনা যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম কিংবা সংঘ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত আছে। উভয়ে 'কেহই নাই' জানিতে পারিয়া তিনি সকলের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন —"সংসারের যাবতীয় বস্তুনিচয় ক্ষয়ান্ত; স্বুতরাং সযত্নে কেবল সেই মুক্তির জন্যই চেষ্টাপরায়ণ হও।"

(১৪)

বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালে মুহূর্মুহু বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইয়াছিল। কুশীনগরে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে সেখানকার মল্লরাজগণ অবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত

শালবনে উপস্থিত হইয়া ছয়দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত মিছিলে মিছিলে নৃত্য গীতবাদ্য প্রভৃতি করিয়া ভগবান্ বুদ্ধের পার্থিব শরীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরে সাত দিনের দিনে আটজন মল্লরাজ সেই সুপবিত্র শব নগরের বাহিরে মুকুট বন্ধন নামক মন্দিরে লইয়া গেলেন। তথায় ৫০০ পাঁচ শত বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া লৌহময় শবাধারে সুরক্ষিত করিয়া বুদ্ধদেবের মৃতদেহ যথা নিয়মে চিতার উপর রক্ষিত করা হয়। কিন্তু প্রিয়শিষ্য কাশ্যপ না আসায় বা উপস্থিত না থাকায় চিতায় অগ্নিসংযোগ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। কাশ্যপ তখন একদল ভিক্ষু লইয়া কুশীনগরের অভিমুখে সত্বর আগমন করিতেছিলেন। উপস্থিত হইয়া কাশ্যপ ভগবানের শবদেহের উদ্দেশে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। চিতার অগ্নিশিখা আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিল। সব ভস্মীভূত হইলে অলৌকিক বারিবর্ষণে আবার সেই উদ্দীপ্ত অনলরাশি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

(১৫)

ভগবানের দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইলে কুশীনগরের মল্লগণ সেই ভস্মাবশেষ (অস্থি) সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। অপর অপর সাত জায়গা হইতেও অনেকে ঐ ভস্মাবশেষের কিছু কিছু অংশ দাবী করেন, যথা—মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছাবিগণ, কপিলাবাস্তর শাক্যরাজগণ, অল্লকল্লের (অল্লকাপ্পার) বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয় রাজগণ, বৈঠদ্বীপের (বেথাদীপের) কোন ব্রাহ্মণ; এবং পাবার মল্লগণ। কিন্তু কুশীনগরের মল্লরাজগণ সেই ভস্মাবশেষের কিয়দংশও হাতছাড়া করিতে অসম্মত হইলে চারিদিক হইতে প্রার্থিগণ আগমন করেন। দ্রোণ নামক কোন ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যস্থতায় আর বেশী কোন বাদ বিসংবাদ ঘটে নাই। তাঁহার পরামর্শমতে সেই ভস্মাবশেষ ৮ আট ভাগ করিয়া আটজনকে দেওয়া হয় এবং পাত্রটীও পুরস্কার স্বরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্রোণকেই দেওয়া হয়।

(১৬)

ইহার কিছুকাল পরে আবার পিপ্পলীবনের মৌর্য্যগণ সেই ভস্মাবশেষের অংশপ্রার্থী হইয়া কুশীনগরে এক দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু কিছুই অবশিষ্ট না থাকায় দূত চিতাভূমি হইতে কতকগুলি অঙ্গার খণ্ড মাত্র লইয়া গিয়া তাহার উপরে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।

(১৭)

এইরূপে বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম আটভাগে বিভক্ত হইয়া গেলে তাহার উপরে আটটী স্তূপ নির্ম্মিত হয় ; তাহার মধ্যে সাতটীকেই মহারাজ অশোক খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্য হইতে সেই সকল ভস্মপুটিকা উঠাইয়া পরে আবারও ভাগে ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই ভস্মাবশেষ সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র নাগরক্ষিত রাম-গ্রামের স্তূপই সম্রাট্ অশোকের সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভারত-মঙ্গল

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

(গান)

বল জয় বল জয়,
বল গৌরবময়ী জগৎ-জননী ভারত-জননী জয়।
বল জয় বল জয়।
তিমিরাবৃত অজ্ঞানমৃত জগতে রশ্মিজাল
মোহ-বন্ধন-কলুষ-নাশন কল্যাণভাত ভাল,
মহীয়ান
মহাপ্রাণ,
বল ভুবন-দুঃখ-দৈন্য-হরণ শোক-অনুতাপ-ক্ষয়,
বল জয় বল জয়।
দিলীপ রাম ভীমার্জ্জুন শিবাজী প্রতাপজী
ক্ষাত্রবীর্য্য রুদ্র-শৌর্য্য দুর্জ্জয় ধীরধী
মহাবীর
স্থায়ী ধীর
ধরিল চরণ-নিম্নে ধরণী সাগর-গিরি চয়,
বল জয় বল জয়।

রাবণ-মধু বৃত্র-দলন দুর্জ্জন-পরিতাপ
অন্যায় অক্ষেমনাশী দুষ্টেরি অভিশাপ,
ত্রাস-নাশ
ছিন্ন-পাশ,
শক্তি পাবক মুক্তি-সাধক জিনিল হীন ভয়,
বল জয় বল জয়।
বুদ্ধ-নানক-নিমাই-কবীর-চরণপূত দেশ
ভব-ভবন মুক্ত-বেদন করিল, হরিল ক্লেশ,
দুঃখ তাপ
নাশে পাপ,
মরণোন্মুখ শান্তত প্রাণে অশোক নির্ভয়।
বল জয় বল জয়।
শক্তির সাথে সংযম ক্ষমা, অশুভেরে জিনে প্রেম,
সত্যের তরে সহিতে বেদন নাহি ভীতি, চাহে ক্ষেম,
ক্ষমাবান
গরীয়ান,
ধর্ম্মধাত্রী শান্তিদাত্রী সাম্যসাধিনী জয়,
বল জয় বল জয়।

লোক-শিক্ষা

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আঘাত-প্রাপ্ত দেশগুলি এখন নিজ নিজ সমাজের পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছে। সংস্কারও সকল বিষয়েই আবশ্যক হয়েছে। জনসমূহের শিক্ষাও তার অন্যতম। এই বিষয় উপলক্ষে ইংলণ্ডের শিক্ষা-সচীব The Right Hon, H. A. L. Fisher বলেন যে মনুষ্যত্বকেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করতে হবে। অন্য কোন অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপ বলে জীবনসম্বন্ধে লোকের পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল, এখন তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখনকার লোকের বিশ্বাস মনুষ্যত্বলাভেই মানবজীবনের সফলতা, এবং তার জন্য জ্ঞানরাজ্যে, ভাবরাজ্যে এবং আশার রাজ্যে যা কিছু

শ্রেষ্ঠ, তাতে মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে। জনসমূহের শিক্ষার দাবী এই অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত (১)।

Mr. Fisher "জনসমূহের: শিক্ষা" অর্থে "education of the Masses" বাক্য ব্যবহার করেছেন। Masses অর্থে অবশ্য বুঝতে হবে Masses of the people অর্থাৎ জড়পিণ্ডের মত জন-পিণ্ড—আধ্যাত্মিকতা বর্জ্জিত খণ্ড খণ্ড আধিভৌতিকতা মাত্র। সেটা ইতর মানুষের একটা সমষ্টি বটে, কিন্তু তাতে ব্যষ্টি নাই, ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য সুতরাং নাই। সেখানে মনোজগৎটাই নাই, সুখদুঃখের অনুভূতি নাই। বলা বাহুল্য ভদ্র মানুষের সমষ্টিকে Mass বলা যায় না। কারণ, তাঁদের সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি আছে, একক (unit) আছে, যে এককের ব্যক্তিত্ব আছে, ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্য আছে। সমবেত হলে সে এককের শ্রেণী হয়, বর্গ হয়—Class হয়, Mass হয় না। এই শ্রেণী বা বর্গের মূলে আছে আভিজাত্য, মাত্রাবিশেষে ; পরিণামেও আভিজাত্য, মাত্রাধিক্যে। এই অভিজাত বর্গ জনসমূহের (Mass-এর) উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, তাকে স্বার্থ-সাধনের জন্য অধীনতায় রাখেন, এবং তার জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। বিধিব্যবস্থার উদ্দেশ্য অবশ্য জন-পিণ্ডের মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হতে না দেওয়া।

কিন্তু অভিব্যক্তি প্রকৃতির নিয়ম ; জন-পিণ্ডের মধ্যেও তার অস্তিত্ব আছে। সেই নিয়মের বলে জন-পিণ্ডের মধ্যে ব্যক্তিত্ব জন্মে এবং ব্যক্তিত্ব সামাজিকতায় পরিণত হয়। সামাজিকতায় যে শক্তি জন্মে অভিজাত-বর্গ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখবার জন্য জনসমূহকে জ্ঞানবর্জ্জিত করে রাখতে চান। কারণ, জ্ঞান শক্তির সহিত সংযুক্ত হলে দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠে। জনসমূহ বলে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল তাদেরও ভোজ্য, এবং তারা সেই জন্য শিক্ষা চায়। এখন যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তা জীবনের অন্যান্য আরাম, বিলাসের মত অভিজাতবর্গের ভাগ্যেই ঘটে। জনসমূহের ভাগ্যে তা দুর্ঘট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-পাত্রে যে শিক্ষা পরিবেশিত হয়, তা ধনী-সন্তানদেরই ভোগ্য। দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে তা নিষিদ্ধ। Eton এবং Winchester

---

(1) "The education of the masses" declares the Right Hon. H. A. L. Fisher, "rests on the right of human beings to be Considered as ends in themselves, and to be entitled te know and enjoy all the best that life can offer in the Shere of knowledge, emotion and hope."

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় দরিদ্র ছাত্রদের জন্য—"Scholares panperes et indigentes." কিন্তু যখন কলেজগুলির সংস্কার হয়, দরিদ্র ছাত্রকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হল। অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে একবার একটি Royal commission নিযুক্ত হয়। এক কলেজের অধ্যক্ষ সেই কমিশনের কাছে বলেছিলেন "We do not want poor men, but able men." এর উত্তরে কমিশন তাঁদের রিপোর্টে লিখেছিলেন "the State does not want either." ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অকটোবর মাসের Pilgrim পত্রিকায় একজন লেখক বলেন "Money shall not purchase education for boys." সকল বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধেই এইরূপ বলা যেতে পারে। তার পর, প্রাথমিক শিক্ষা নামে ধনীসন্তানদের যে উচ্ছিষ্টাবশেষ দরিদ্র সন্তানকে বিতরণ করা হয় (অবশ্য বিনামূল্যে নয়), তাতে না বাড়ে জ্ঞান, না বাড়ে ব্যবসায় বুদ্ধি, না বাড়ে কর্ম্মশক্তি। অহৈতুকী ভক্তির দিন গিয়েছে। এ শিক্ষার উপরেও লোকে ভক্তি হারিয়েছে।

সমাজ সুবিধামত ভুলে যায় যে শরীর ও মনের সমবায়েই মানুষের জীবন এবং শরীরের পুষ্টির জন্য আহারের যে প্রয়োজন, মনের পুষ্টির জন্য শিক্ষারও সেই প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করলে, মানুষের জীবনের অর্দ্ধেককে—উৎকৃষ্ট অর্দ্ধেককে—পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করা হয়। সমাজের কর্ত্তারা আরও ভুলে যান যে মানুষের মধ্যে দরিদ্রই অধিকাংশ। এই অধিকাংশকে বাদ দিয়ে অল্পাংশের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধানই এ পর্য্যন্ত সমাজ করে এসেছে। সংস্কার বলতে এ পর্য্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর এবং মধ্য শ্রেণীর উন্নতিই বুঝিয়েছে। নিম্নশ্রেণী বা জনসমূহ কখন গণনার মধ্যে আসে নি। ফলে অল্পাংশ নিয়ে যে সমাজ তা বিকলাঙ্গ ক্ষীণ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এখন সমাজকে পূর্ণাঙ্গ, পুষ্ট ও সবল করতে হলে যে দরিদ্র জনসমূহকে পূর্ব্বে অবহেলা করা হয়েছিল, তাকে আবার আদর করে ডেকে সমাজে স্থান দিতে হবে। প্রাচীন সমাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তা করতে প্রস্তুত হচ্ছে না। তাই অর্ব্বাচীন রুশীয় সমাজ নতুন উৎসাহে এই কার্য্যে অগ্রসর হয়েছে।

আজকার শিশু কালকার মানুষ এবং পরবর্ত্তী বংশীয়ের জনক, নেতা ও উপদেষ্টা। এ কথাটা পুরোনো এবং সকল সমাজেই প্রচলিত আছে। এবং পুরোনো বলেই, বোধ হয়, লোকের মনে তার আর তেমন প্রভাব নাই। অন্ততঃ যে প্রভাব থাকলে মনের ভাব কাজে পরিণত হয়, সে প্রভাব নাই।

যে একটু আছে তাতে অভিজাত সন্তানদের, ধনীসন্তানদের, জন্য কিছু কিছু শিক্ষার আয়োজন হয়েছে। দরিদ্রসন্তান এখনও সমাজের অযত্নে, অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে। রুশিয়ার নতুন সমাজ আজ তাই তার ভবিষ্যদ্‌বংশীয়ের জনক, নবগঠিত সমাজের নেতা ও উপদেষ্টা ও জনতন্ত্ররাষ্ট্রের কর্ম্মী বলে তার শিশুশিক্ষার অদ্ভুত আয়োজন করেছে। Mr Goode. বলেন "শিক্ষার বিষয়েই আমার জীবন অতিবাহিত করেছি, এবং তাতে বিশেষজ্ঞ বলে কিছু খ্যাতিও উপার্জ্জন করেছি। সেই বিশেষজ্ঞতার বলে আমি বলতে পারি যে রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট শিশুমঙ্গলের জন্য যতটা চিন্তা ও যত্ন করেছেন, পৃথিবীর আর কোন গবর্ণমেন্টকে সেরূপ করতে দেখিনি। ষোলবৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিনামূল্যে উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হয়। অন্য অন্য আবশ্যক সামগ্রীর দানেও কিছুমাত্র কৃপণতা নাই। অবস্থার প্রতিকূলতার জন্য আর যার যে কষ্টই হ'ক, শিশুদের কেন বিষয়ে কোন কষ্ট নাই। তাদের শিক্ষার জন্য বেতন নেওয়া হয় না। শিক্ষাকে এমন ভিত্তির ওপর স্থাপন করা হয়েছে এবং তার বহুল প্রচারের জন্য এমন উপায় অবলম্বন করা হয়েছে যে তা দিয়ে নিরক্ষর রুশীয় জনসমূহের বহুকাল-সঞ্চিত অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হবে এমন আশা করা যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ অকটোবরের ক্রাসনায়া গেজেটে (Krasnaya Gazette) বর্ণিত হয়েছে যে যে-ছেলে এখনও মার কোল ছাড়ে নি তাদের জন্যও শিশুনিবাস (children's home) হয়েছে। এই শিশুনিবাসে এখন (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে) ৫০০ শিশুকে পালন করা হয়। এই শিশুদের বয়স তিন বৎসরের অনূর্দ্ধ। তিন বৎসর থেকে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র নিবাস আছে। এ ছাড়া ছেলেদের স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। যে সকল ছেলেদের স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন আবশ্যক, এই সকল স্বাস্থ্য-নিবাসে রেখে তাদের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করা হয়। Gatchino, Tzarskoe Selo, Sestrorezk এবং Grafski stationএ এইরূপ স্বাস্থ্য-নিবাস খোলা হয়েছে। এগুলি সবই পল্লীগ্রাম, পেট্রোগ্রাড থেকে বেশী দূর নয়। এ ছাড়া যুবকদের বিবিধ জ্ঞান উপার্জ্জনের সুবিধার জন্য কর্ম্ম-শিক্ষালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, জনসাধারণ-সমিতি প্রভৃতি আছে। মস্কো নগরে যুবকদের এইরূপ জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা কৃত্রিম উপায়ে আর উদ্রিক্ত করতে হয় না, তারা এখন স্বতঃই মহা-উল্লাসে এই সকল শিক্ষা স্থানের সদ্ব্যবহার করে। পল্লীগ্রামেও এই শিক্ষা পিপাসা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মেছে। কৃষকশ্রেণীর মধ্যেও নর, নারী, যুবক, প্রৌঢ় সকল রকমের লোক সকল রকম শিক্ষায় শিক্ষিত

হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। Mr. Goode বলেন রুশিয়ার জনসাধারণের হৃদয়ে জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদনের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা বদ্ধ হয়ে ছিল। এখন এই নতুন সামাজিক আবর্ত্তনে তার একটা সতেজ স্ফুরণ হয়েছে। তিনি বলেন শিশু-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই যে এই সকলের মূল উদ্দেশ্য তা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে সময়ের কথা বলেন সে সময়ে রুশিয়ায় দুর্ভিক্ষ হয় নি, কিন্তু সহরে খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হয়ে ছিল। পল্লীগ্রামে খাদ্যদ্রব্য সুলভ এবং প্রচুর ছিল। সহরের দুর্ম্মূল্যতা ছেলেদের আহার-বিষয়ে কোন ব্যাঘাত বা ত্রুটি না উৎপাদন করে, সেই উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মকালে তাদেকে সহর থেকে পল্লীনিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। অবকাশের সময়ে পড়াশুনা বন্ধ হলেও শিক্ষালয়গুলি বন্ধ হয় না। কারণ, তাতে ছাত্রদের আহারে বিশৃঙ্খলা ঘটবার সম্ভব। শিক্ষার এই আয়োজন ছাড়া, ছাত্রদের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থারও ত্রুটি নাই। কেবল ছেলেদের জন্যই মস্কো নগরে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে সাতটা থিয়েটার চলে।

শিশুদের কল্যাণের জন্য সন্তান-সম্ভাবিতা নারীদের পর্য্যন্ত রীতিমত সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় যথোচিত যত্ন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পরিচর্য্যা, পথ্য এবং চিকিৎসা কিছুরই কোন ত্রুটি নাই।

উপসংহারে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র কৃপণতা নাই। সকল কাযই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করবার জন্য প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করা হয়। (১)।

---

(1) Bolshevism at Work George Allen, & Mewin Ld.

জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য*

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

জাতীয় জীবনের নব জাগরণের দিনে একটা নূতন ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া জাতি গড়িয়া উঠে। কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনে বা কোনও একটা বিশেষ কারণে সেই ভাবধারা দেশে আসিয়া দেখা দেয়, কিন্তু সেই ধারা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখে জাতীয় শিক্ষা। সকল দেশেই জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সমভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এমন কোনও কথা নাই। যে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় জীবনের গতির সঙ্গে সম তালে চলিতে সমর্থ হয় নাই, বা চলিতে চেষ্টা করে নাই, সে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি নব যুগের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে আবার যে দেশের শিক্ষার বিধি তাহার জাতীয় জীবনকে একটা নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া একটা নূতন শক্তির বলে অগ্রসর হইয়াছে, সে দেশের শিক্ষা সমাজকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া জাতীয় জীবনের একটা নবতন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে সকল জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠিত বা স্বনিয়ন্ত্রিত, তাহাদের শিক্ষার পদ্ধতি ধীরেই হউক অথবা দ্রুতবেগেই হউক জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়িয়া উঠিয়াছে, কারণ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ সে সকল জাতির নিকট আপনিই ধরা পড়িয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় জীবনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; বাস্তবিক এই দুইটি এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে একের সুব্যবস্থায় অপরের সুগঠন অবশ্যম্ভাবি। আর একের শৃঙ্খলায় অপরের ধ্বংস সুনিশ্চিত। জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য নূতন ভাবধারার বিকাশসাধন আর জাতীয় জীবনের অভিপ্রায় তাহার ফলভোগ করা। সুতরাং এ উভয়ের সম্পর্ক ঠিক সঙ্গীতের তাল ও সুরের মত। জাতীয়শিক্ষার সহিত সম্পর্কহীন জীবন যেমন পঙ্গু, জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষাও তেমনি অসম্পূর্ণ।

---

* জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করিব। এই সকল প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় আলোচিত হইবে—জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি, জাতীয় শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য, জাতীয়শিক্ষায় স্বাদেশিকতার প্রেরণা, জাতীয় শিক্ষার অর্থকরী দিক ও আদর্শ বিদ্যালয়।

শিক্ষার প্রভাব জীবনের উপর এত অধিক যে তাহা অস্বীকার করা একটা জাতির পক্ষে আত্মহত্যার স্বরূপ এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে জাতীয় শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের গঠন অনেকাংশেই নির্ভর করে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে যে শিক্ষার সার্থকতা বা ব্যর্থতা অনেক পরিমাণে জাতীয় জীবনের ও জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্য বা দৈন্তের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষের দেহের হ্রাস বৃদ্ধির উপর তাহার বিশেষ কোনও হাত নাই, কিন্তু মনের হ্রাস বৃদ্ধি মানুষের অনেকটা ইচ্ছাধীন। তাই সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি মানুষ তাহার মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে এবং সেই গঠনের ভিতর মানুষের ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। সুতরাং সমাজ ও সভ্যতাকে জাতীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় একটা নূতন সুর দিতে হইলে দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয় যাহারা তাহাদের প্রাণে নূতন ভাবের সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং একমাত্র জাতীয় শিক্ষাই সেই নূতন সুর ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে পারে। কারণ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে আজ যাহারা ছাত্র তাহাদিগকে ভবিষ্যতের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানের তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগের অন্তরে নূতন জ্ঞানসঞ্চয় ও নূতন কর্ম্মকৌশল লাভের প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করিতে পারে এবং যতটা কর্ম্মশক্তি লাভ করিতে পারে, সে ততটা শিক্ষিত। কিন্তু দুটিই আসলে মনের লীলা এবং এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে এই একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যাহা আমাদের "আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার" সহায়। অবশ্য এ প্রচেষ্টা জীবমাত্রেরই সহজাত এবং মানুষেরও সেই কারণেই এ প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। কিন্তু পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এইখানে যে আমাদের ভিতর আর একটী প্রবৃত্তি রহিয়াছে, উহার নাম আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি। আমরা কেবল জীবন রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, আমরা মনে ও চরিত্রে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে পৌছিবার সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া থাকি এবং জাতীয় শিক্ষাই এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়। সুতরাং শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা যাহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশসাধন হয় এবং যাহার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হইয়া জাতীয় জীবনকে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্যে ভরপুর করিয়া তুলে।

শিক্ষার এই যে আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তোলা, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষায় সম্ভবপর হয় নাই। কারণ এ শিক্ষা জাতীয় জীবনের ধারাকে অবহেলা করিয়া বিজাতীয় হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এলাহাবাদে শিক্ষা-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"এ দেশের ছাত্রেরা এই শিক্ষার ফলে ইউরোপীয় আদর্শ ও ইউরোপীয় সাজসজ্জা ধরিয়াছে। তাহারা ইংরাজিতে চিন্তা করে, সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্য্য ও ব্যবসা-বানিজ্য ইংরাজিতে পরিচালনা করে। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষার ফলে এ দেশের শিক্ষিত ও জনসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে এই অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হইত না, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সেকালের শিক্ষার ভিত্তি ছিল; এইরূপ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আজও ভারতীয় সভ্যতা হাজার হাজার বর্ষের বিপ্লব ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া সজীব। বৈদেশিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া হয়ত আমাদের সভ্যতাকে কোন কোন বিষয়ে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া প্রয়োজন হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন কিছুতেই সমীচীন নহে।"

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান দোষ এই যে ইহা আমাদের সম্মুখে বিদেশী সভ্যতার আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের ধারায় যে আদর্শ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ইহা একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। বিদেশী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রভাবে পরিচালিত শিক্ষায় জাতীয় চরিত্রের বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বিদেশী ভাষায় অনুষ্ঠিত শিক্ষায় বিদেশী হাবভাব বিদেশী পোষাক পরিচ্ছদ ও বিদেশী ভঙ্গী ছাত্রের মনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া যায় যে তাহার সমগ্র প্রকৃতিটা বিজাতীয় হইয়া পড়ে। সুতরাং ভারতের শিক্ষা ভারতবাসীর দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া সে শিক্ষাকে গড়িয়া তুলিবে। ভারতের সাধনা জ্ঞান ও চরিত্রপ্রভাবের আদর্শ তাহাতে ফুটিয়া উঠিবে, ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতার যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহা সেই শিক্ষার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইবে।

জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে জীবনের বিকাশসাধন, সে বিকাশেই প্রকৃত স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তিলাভ করে। মানুষ আত্মচেষ্টার বলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাধা অতিক্রম করিয়া—আত্মোন্নতি সাধন করিবে, ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার জালকে ছিন্ন করিয়া—

দাঁড়াইতে হইলে তাহার জীবনের জটিলতা তাহাকে দূর করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে ভারতের প্রাচীন জাতীয় শিক্ষা অনেকাংশে সফল হইয়াছিল, তাহাতে জীবনের সরল পথ এমন ভাবে দেখাইয়া দিয়াছিল যে উহাতে একসঙ্গে মিতাচার ও উচ্চচিন্তা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের জাতীয় ইতিহাসের ধারায় অনুসরণ করিলে এবং ভারতের প্রত্যেক ধর্ম্মের আন্দোলনের আভ্যন্ত প্রণিধান করিলে এই কথাই স্পষ্ট মনে হয় ভারতবাসীর জীবন যখন সরল পথে চলিতে পারিত তখনই জ্ঞানের বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিতে সে সমর্থ হইয়াছে। সেই সরল যৌগিক সাধনার দিনেই হিন্দুর অনন্তগৌরব উপনিষদের জন্ম হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালেও নালন্দা ও তক্ষশিলার বৌদ্ধ মঠ ও বিহারে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান গরিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহপর ইসলাম ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়, আবুবকর ও প্রাচীন মুসলমান পীরগণের সাধনায় বিশ্বমৈত্রীর যে জলন্ত সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও ইসলাম ধর্ম্মকে ধন্য করিয়া রাখিয়াছে।— সুতরাং জাতীয় শিক্ষার ইহাও একটা প্রধান উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত জীবনকে সরল করিয়া—তাহার মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য মনকে গড়িয়া তোলা। যে শিক্ষায় মনের যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার বিলোপ সাধন হয় বা তাহার বিকাশের পথে বাধা আসিয়া পড়ে, সে শিক্ষার মত জাতীয় জীবনের আর কিছুই এত অনিষ্ট করিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের মনে কতকগুলি উচ্চভাব ও উচ্চ চিন্তা এবং নিজের বলিয়া কিছু বৈশিষ্ট্য আছেই, ভগবান তাহাকে এই পৃথিবীতে পাঠাইবার সময়ে কিছু শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছেন নিশ্চয়ই। তাহার কর্ত্তব্য সেই শক্তির মূল অনুসন্ধান করিয়া উহার পূর্ণ পরিণতির জন্য চেষ্টা করা এবং তৎপরে সেই বিকশিত শক্তির সদ্ব্যবহার করা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনের এই যে গুপ্ত শক্তি তাহাকে বাহির করিতে সাহায্য করা। সুতরাং অপরিণত মনের সম্মুখে এমন কোনও বহিরারোপিত বিজাতীয় আদর্শ ধরিতে নাই, যাহাতে উহা পঙ্গু হইয়া যাইতে পারে। বিধাতার বিধানে প্রত্যেক জাতিকে তাহার জাতীয় অতীত জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে হইবে, বর্ত্তমান জ্ঞানসৌধের রক্ষক হইতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানের স্রষ্টা হইতে হইবে, তাহার জাতীয় সাধনার মধ্য দিয়া তাহাকে এই সমস্তের উপযোগী হইয়া ফুটিতে হইবে। ইহাই জাতীয় শিক্ষার কার্য্য।

জগতের মধ্যে প্রত্যেক জাতির একটা বিশিষ্ট অধিকার আছে, জাতীয় শিক্ষা

তাহাকে সেই অধিকারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবে। বর্ত্তমান যে শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ "জাতীয় বিদ্যালয়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল কলেজে যেশিক্ষা লাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পলিটিক্যাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল্ ইকনমি। যাহা কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে, সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলিতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা স্থির করিয়াছি ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে, জাতি মাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্গতি। যাহা অন্যদেশের শাস্ত্রসম্মত, তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্যদেশের প্রণালীর অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র। মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনোমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা কি, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন, সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্ত্তি কি ভাবে দেখা যায় শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহা আবিষ্কার করিলাম কই? আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুথি আওরাই।

শিক্ষা আমাদিগকে এমনিভাবে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।"

প্রকৃত শিক্ষা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন-উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ইহা সমাজের মানসিকউৎকর্ষের সহায়তা করিবে, জনসাধারণের মনকে গড়িবা তুলিবে, জাতীয় চিন্তার ধারাকে পরিশুদ্ধ করিয়া জাতীয় আকাঙ্ক্ষার একটা বিশুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া ধরিবে এবং সাধারণ লোকের পারিবারিক জীবনেও

একটা শান্তির ধারা বহাইতে চেষ্টা করিবে। শিক্ষাই মানুষের স্বাতন্ত্র্য আনিয়া দিবে, তাহার নিজের অভিমত ব্যক্ত করিবার শক্তি দিবে এবং সেই অভিমত অনুযায়ী কার্য্য সাধনের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবে। শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা ফুটাইয়া তোলা এবং ইহাতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত চরিত্রের বিকাশসাধন হইবে। H. G. Wells তদ্রচিত "Outline of History' গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন– "Presently education must become again in intention and spirit religious and the impulse to universal service, and to devotion to universal service, and to a complete escape from self will reappear again, stripped and plain, as the recompensed fundamental structural impulse in human society" অর্থাৎ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মগত ও ব্যক্তিগত সাধনা, সার্ব্বজনীন সেবা ও পরার্থপরতা যাহা মানব সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়তা করিবে তাহাই হইবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন ইহা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে সে উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নহে। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে শিক্ষায় যদি মনের উৎকর্ষ সাধিত না হইল,তবে একটা জাতির জীবন মরণ সমস্যার মীমাংসাই বা কি করিয়া সম্ভবপর হইবে। Lord More ley এ সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন—"The questions of National, Education, answers them as you will, touch the life and death of nations" অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষার সমাধান যেমন ভাবেই কর না কেন, এ কথা মনে রাখিতে হইবে ইহাতে যেন জাতির জীবন মরণ সমস্যার সমাধান হয়।

বাস্তবিক জাতীয় শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই মানুষের দেহ মন আত্মার প্রকৃষ্ট উন্নতিসাধন। ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে ভারতের মাটীতে গড়া ছাত্রের মধ্যে যে বিশিষ্টতা তাহাই ফুটাইয়া তোলা, তাহার মধ্যে যে ভারতীয় সংস্কারের লীলাধারা ফল্গুনদীর মত বহিয়া যাইতেছে, তাহাকেই ওতপ্রোত ভাবে বহাইয়া দেওয়া অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্যই হইবে যে ভারতবাসীর মনে যে জাতিগত সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহাকে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়া; সেই সুযোগ পাইলেই পূর্ণ পরিণতির জন্য তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। একটা সহজ নিদর্শন দিয়া বোঝান যায় যে জাতীয়

শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ; জাতীয় সংস্কার যখন মানুষের মনে প্রথম অবস্থায় থাকে, তখন তাহা একটি গুল্মের মত, তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া পূর্ণপরিণতির পথে আনিতে হইলে প্রথমে তাহার চারিদিকে যে কাঁটাবন বা জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহাকে পরিষ্কার করিতে হইবে এবং তাহার পর সেই গুল্মটিকে বিশুদ্ধ জল বায়ুর দ্বারা সেবন করিতে হইবে; জাতীয় শিক্ষা জাতীয় সংস্কারকে ঠিক এমনিভাবে গড়িয়া তুলিবে, প্রথমে উহার উপর যে বিদেশী ছাপ পড়িয়াছে তাহাকে সরাইয়া ফেলিবে এবং পরে উহার পরিণতির উপযোগী উপায় অবলম্বন করিবে। সুতরাং জাতীয়শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র বিদ্যালাভ করা নহে, তাহাতে শ্রদ্ধা,নিষ্ঠা ও শক্তিলাভ হইবে, তাহাতে শিক্ষার্থীরা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়—দ্বিধা-বর্জ্জিত হইয়া তাহারা যেন আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে—তাহারা যেন অস্থি মজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।"

অন্বেষণ।

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী]

[শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া শারদীয়া পূর্ণিমা রজনীতে গোপিগণকে আহ্বান করিয়া মুরলীবাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজসুন্দরীগণ বেণু-মোহে মুগ্ধ হইয়া সংসারের কাজ ফেলিয়া বৃন্দারণ্যে ধাবিত হইল। যখন তাহারা কৃষ্ণ-চরণে আসিয়া একে একে মিলিত হইল তখন কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে সতী ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝাইয়া ভবনে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা ফিরিল না, বলিল—শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের পতি, তাহাদের পতিগণের পতি, সর্ব্ব জীবের অন্তর-বাসী। ব্রজ মঙ্গলের জন্য ভগবান্ নন্দ-গৃহে কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ। তাহারা ভগবানের চরণ হইতে এক পদও বিচলিত হইবে না। গোপিগণের একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের সহিত বন-বিহারে রত হইলেন। কৃষ্ণ-সঙ্গ পাইয়া তাহাদের মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইল। অমনি ভগবান্ তাহাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাহারা মনের দুঃখে প্রাণ-বন্ধুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমন করিতে লাগিল! এই ভগবদন্বেষণই বর্ত্তমান কবিতার আখ্যান বস্তু।]

১

মন্মথ-মথন সেই প্রাণ-মণ-রম
নাথের মূরতি যবে লুকাল সহসা,
যূথ-পতি অদর্শনে করী-যূথ সম
কাতরে কাঁদিলা গোপী বিরহ-বিবশা।

২

মনে পরে সেই কুঞ্জর গতি
বঙ্ক চাহনি মধুর হাস,
মনে পড়ে সেই বঁধুর আরতি
মধু আলাপন রতি বিলাস।
বঁধুয়ার সেই বিবিধ বিহার
ভাবিতে ভাবিতে প্রমদাগণ
একে একে সবে বঁধুর আচার
অনুকরে বঁধু মগন-মন

৩

বঁধুর কটাখ বঁধুর গমন
বঁধুর হাসিটি বঁধুর স্বর
করি অনুকার আবেশে বালার
ঘটে বঁধু ভ্রম আপনা পর।
নেহারি কাহারে কৃষ্ণ-কামুক
কহে বঁধুময়ী—"এই যে আমি,"
কভু ধরি করে অপরা চিবুক
বঁধু-বোধে চুমে বদন খানি।

৪

সমদশা যত ব্রজ-অঙ্গনা
বঁধুর বিরহে পাগলী পারা
বঁধু গুণগান করিতে করিতে
বন হ'তে বন ঢুঁড়িছে তারা

ব্যাপি চরাচর বহিরন্তর—
    রহে যে পুরুষ গগন প্রায়,
প্রতি তরুলতা পাশে তাঁরি কথা
    পুছে ব্রজবালা ধরিয়া পায়।

৫।৬

"হে বিরাট বট! অশথ বিশাল!
    বন-হরিতকী! কহ ত শুনি
প্রেমের দিঠিতে হাসিতে রসাল
    মন হরি' কোথা গেল সে গুণী?

"নব কুরুবক! চারু চম্পক!
    পুন্নাগাশোক! নাগকেশর!
মান হরে যাঁর হাসির চমক
    কোথা গেল সেই রাস-দোসর?

৭

"মাধব-চরণ-চুম্বিনি অয়ি
    চিরকল্যাণি তুলসি! তুমি
উন্মদ অলিঝঙ্কারময়ী,
    অচ্যুত-হৃদি বিহার-ভূমি।

"তুমি ত রমণী, রমণীর দুখে
    বিগলিবে তব করুণ হিয়া,
কহ লো সজনি! গেলা কোন্ মুখে
    প্রাণ-বল্লভ এ পথ দিয়া?

৮

"ওগো মল্লিকে! লো জাতি যূথিকে।
    মালতি লো! তোরা বঁধুর পিয়া,
বুঝি সে তোদিকে কাননে আজিকে
    কোটালে করের পরশ দিয়া।

"তোরাত ফুটলি নাথের পরশে
উথলে উরসে হরষে মধু,
বল্ না ফুটিয়া কোথায় নিবসে
এবে লো মোদের পরাণ-বঁধু ?

৯

"হে চুত ! পিয়াল ! রসাল ! তমাল !
ঘন দেবদার ! পলাশ' জাম !
বিটপ-বহুল বিল্ব বকুল !
ধূলি-কদম্ব পুলক-দাম !

"তোম্‌রা যাহারা পর উপকারে
যমুনার কূলে জনম নিলে,
শূন্ত-হৃদয়া বল সবাকারে
কৃষ্ণ-পদবী কেমনে মিলে ?

১০

"কত তপ তুমি করিলা ধরণি !
পুণ্যময়ি গো ! জীবনে তব,
তাই বুঝি দেহে লাগিলা সজনি !
হরি-পদ-পরশনোৎসব ?

"অঙ্গে অঙ্গে শষ্প-পুলক
জাগিল কি আজি সে পদ-পাতে
অথবা ফুটিছে সুখ-কণ্টক
আজিও বামন-চরণাঘাতে ?

"কিংবা যে সুখ দানিলা তোমারে
বরাহের রূপে বাঁধিয়া বুকে,
সে সুখ স্মিরিতি হৃদয় মাঝারে
আজো থাকি থাকি উঠিছে ফুটে ?

১১

"অয়ি লো হরিনি! বিলোল লোচনে
একি লো তৃপ্তি নেহারি আজ?
হরি-প্রিয়া তুমি, হরি-দরশনে
উথলে হরষ নয়ন মাঝ?

"কোরেছিলা বুঝি সোহাগ যতন
গমনের কালে তোমারে হরি?
থুয়েছিলা ক্ষণ জলদ-বরণ
কুন্দ-মালিকা কণ্ঠ পরি?

"তাই কি হেথায় পেতেছি মধুর
গোকুল-পতির দেহের বাস?
বক্ষ-জড়িতা বরজ-বধূর
কুচ-কুঙ্কুম-সুরভি রাশ?

১২

"কেন নত শির ওগো তরুগণ!
তোমাদের তলে আলো করি বন
রামানুজ যবে দাঁড়াল আসি,
গোকুল-নাথের চরণের তলে
নোয়াইয়া মাথা নত ফুল ফলে
প্রণমিলে বুঝি পুলকে ভাসি?

"বুঝি বা তখন বঁধু পাশে ছিল
প্রিয়তমা কেহ? তাহারে ধরিল
বাম বাহুখানি রাখিয়া কাঁধে?
তুলসীমালার গন্ধে অন্ধ
সঙ্গে চলিছে মধুপবৃন্দ,
ডাহিন ভুজে কি বীজন-চপল
ঘুরায়ে বঁধুয়া লীলা-উৎপল
বারিতে আছিল ভ্রমর-বাধে?

বদ্ধ হুকর, কেমনে শ্রীপতি
নন্দিল কহ তোমাদের নতি ?
বুঝি বা প্রণয়-পূরিত লোচন
ভঙ্গীতে করি অঙ্গীকার,
সহসা লুকা'ল কান্তার সাথে
দূর বনে দ্রুত চরণে তাঁর ?"

১৩

"ওলো সই শোন"—কহে গোপী কোনো—
"সন্ধান যদি চাহ বঁধুর,
পুছ তবে এই লতাবধুগণে
কোথা গেল সেই চোর চতুর ?

বনস্পতির বাহু-বেষ্টনে
বাঁধা আছে, তবু দেখলো সখি'
বরজ-নাথের নখর-পরশে
হের সারা তনু গোপন হরষে
উঠে কাঁটা দিয়া পুলকে সখি !"

১৪

পাগলীর মত প্রলাপ বচন
কহিতে কহিতে ব্রজবধুগণ
বঁধুরে ঢুঁড়িয়া বুলে ;
বিরহোন্মাদে হ'য়ে উন্মনা
বঁধুর মাঝারে হারায়ে আপনা
করিতে লাগিল পরাণ বঁধুর
কোমল কঠোর লীলা সুমধুর
অভিনয় মন-ভুলে।

———

বন্দী-জীবন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল।)

(৭)

এবার পাঞ্জাব হইতে নবীন উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া ফিরিলেও কাশী আসিয়া মনে হইল যেন এত দিন কত অনাচার অনিয়মের মধ্যে ছিলাম, আর পাঞ্জাবের তুলনায় কাশীকে কত মনোহর কত পবিত্র মনে হইল তাহা আর বলিতে পারি না। কেন যে এরূপ মনে হইল তাহা জানি না তবে এবার কাশীর যে স্নিগ্ধরূপ অনুভব করিয়াছিলাম বহুদিন কাশীতে থাকিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। কাশীর বাতাস গায়ে লাগিতেই যেন মনে হইল কতদিনের অপবিত্র দেহ শুদ্ধ হইয়া গেল, একটি দিন মাত্র কাশীতে থাকিয়াই মনে হইল কতদিনের সঞ্চিত গ্লানি যেন সহসা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। বিপ্লব পণ্ড হইবার পর রাসবিহারী যখন কাশীতে ফিরিয়া আইসেন তখন তিনিও নিজের মনের ঠিক এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

কাশী ফিরিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গলার একজন নেতার সহিত দেখা হইল। আমার পূর্ব্ব পরিচিত কএকজন নেতা ইতি পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া যান, তাই বিপ্লবের এমন আশার দিনে পূর্ব্ব পরিচিত সকলকে জেলে হারাইয়া কেমন এক অনির্দ্দিষ্ট বেদনা অনুভব করিতে ছিলাম, নানা কাজের ফাঁকে কত সময় এই কথাই মনে হইতে-ছিল, আজ তাঁহারা কেন আমার সঙ্গে নাই? সেদিনের সেই আনন্দ সকলে মিলিয়া ভোগ করিতে না পারায় সময়ে সময়ে সেই বিচ্ছেদ প্রাণকে কত ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল।

কলিকাতা অঞ্চলেরও এক সুপ্রসিদ্ধ নেতা, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সময় কাশী আসিয়াছিলেন। বিপ্লব যুগের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদিগের মধ্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। ইতিহাসে প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে যখন কোনও নূতন আন্দোলন সমাজের অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করে তখন সেরূপ আন্দোলনের যাঁহারা প্রাণ তাঁহাদের চরিত্র অনন্যসাধারণ না হইলে সেরূপ আন্দোলন টিকিতেই পারে না। তাই যখন কোনও সম্প্রদায় রাজরোষে

অথবা সমাজের নিগ্রহে নিপীড়িত হইতে থাকে তখনও যাঁহারা সেই সম্প্রদায় ভুক্ত হন তাহাদের চরিত্রের মধ্যে নিশ্চয় কোনও বিশেষত্ব থাকে। তাই এই রূপ সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা অল্প হইলেও সমাজের উপর ইহার প্রভাব বড় অল্প হয় না। বিগত বিপ্লব যুগের ইতিহাস হইতেও এই সত্যের যথার্থতা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। যতীন বাবু এইরূপ সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর স্বীয় চরিত্র বলে আপনার সুদৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বিপ্লবের কার্য্য অতি গোপনে করিতে হইত বলিয়া এবং তেমন তেমন শক্তি শালী মহাপুরুষের সর্ব্বগ্রাহী প্রতিভার আশ্রয়ের অভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের কত যে বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠিয়াছিল তা হয়ত আজও ভালরূপে জানা যায় নাই। এইরূপ হওয়ায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। এইরূপ বিভিন্নদল যাহাতে সম্মিলিত হইয়া একবিরাট দলে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা বহুদিন যাবৎ হইতেছিল কিন্তু তেমন শক্তিশালী নেতার অভাবে কোনও দলই আর একদলের সহিত মিশিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইতে স্বীকার করে নাই। এই সব দলের নেতারাই আবার অনেক সময় নিজেদের সামান্ত আধিপত্য টুকু বজায় রাখিবার জন্তই ঐরূপ মিলনের বিরোধী ছিলেন। মানুষ সহজে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না আবার তেমন শক্তিশালী পুরুষের নিকট মাথানীচু না করিয়াও থাকিতে পারে না। আবার যখন কোনও অভিনব আদর্শ অথবা বিচিত্র কর্ম্মের প্রেরণায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে তখনও এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অহংকার ও স্বার্থপরতা আর মাথা উঁচু করিয়া থাকিতে পারে না।

যতীন বাবুর নেতৃত্ব এইরূপ ধরণের ছিল যাহার প্রভাবে বাঙ্গলার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সম্মিলিত হইয়াছিল। ইনি যদিও তেমন বিদ্বান ছিলেন না কিন্তু ইহাঁর চরিত্রের প্রভাবে অনেক শিক্ষিত যুবক ইহাঁর নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর যেমন সাহস ছিল প্রাণটিও ছিল ঠিক তেমনই উদার। ইহাঁর চরিত্রবলের কথা বাঙ্গলার বিপ্লব বাদিদের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু বিভিন্ন দলের এই মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল সেইদিনই যেদিন পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজনের সংবাদে এক নবীন কর্ম্মের প্রেরণায় তাঁহারা সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও এই মিলন ব্যাপারে যতীনবাবুর চরিত্র বড়ই সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে কারণ দলের এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বড় অল্প ছিল না?

এই সব লোকদিগের চরিত্রও সাধারণ লোকদিগের চরিত্রের মত ছিল না, এই সব লোকদিগের মনের উপর আধিপত্য করা বড় কম শক্তির কথা নহে।

ঠিক বলিতে গেলে বাঙ্গলায় এই সময়ের দুইটি মাত্র বিপ্লব দল ছিল। তার একটির নেতা ছিলেন যতীন বাবু। দ্বিতীয় দলকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, একটি বাঙ্গলার বাহিরে কাজ করিতে ছিল অপরটি বাঙ্গলার ভিতরেই নিজেদের কর্ম্মের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গলার বাহিরের সকল কর্ম্মভার রাসবিহারীর উপর ছিল, কিন্তু বাঙ্গলার ভার কোনও একজন ব্যক্তি বিশেষের উপর ছিল না।

এই সময় যাহাতে সারা উত্তর ভারত এক সুরে গাঁথা হইতে পারে সেই জন্ত যতীন বাবুকে কাশীতে ডাকা হইয়াছিল। এইরূপে পাঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পুর্ব্ব বাঙ্গলা ও আসামের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ একযোগে বিপ্লবের জন্ত প্রস্তুত হইতে ছিল। পাঞ্জাবের সিপাহিরা এই সময় কিছু একটা করিয়া ফেলিবার জন্ত এমন অধীর হইয়া পড়িয়াছিল যে আর কিছুতেই তাহাদিগকে শান্ত করা যাইতেছিল না। জানিনা এইরূপে তাহাদিগকে সংযত করায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, কারণ আমাদের বাধা নাপাইলে পাঞ্জাবে নিশ্চয় একটা ভীষণ কিছু হইয়া যাইত এবং তার ফল যে কত দুর গড়াইত তাহা কে জানে। আমরা কেবল এই জন্ত তাহাদের চাঞ্চল্যে বাধা দিয়াছিলাম যাহাতে সমগ্রদেশ একযোগে বিপ্লবের তাণ্ডব নৃত্যে যোগ দিতে পারে।

যতীন বাবুর কাশী আসা বিষয়ে সরকার বাহাদুর কিছু জানেন কিনা, অথবা জানিলে কতটুকু জানেন তাহা আমার জানা নাই। তবু এখানে এ কথার উল্লেখ কেন করিলাম পাঠককে তাহা জানাইতে চাহি। আমি এপর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে একটিও গোপন কথা প্রকাশ করি নাই ; যে সকল ঘটনা নানা ষড় যন্ত্র মামলাতে আলোচিত ও আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে এযাবৎ কেবল সেই সব ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছি, এমনকি অনেক এমনও ব্যাপার আছে যাহা সরকার পক্ষ বেশ ভাল করিয়াই জানেন কিন্তু সে সকল ঘটনাও আমি ছাড়িয়া গিয়াছি, কারণ সে সকল ঘটনার সমর্থনযোগ্য উপযুক্ত প্রমাণ এখনও সরকারের নিকট নাই। যে সকল ঘটনা প্রকাশ করিলে কাহারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনাও নাই, অথচ যে সকল ঘটনা সরকার বাহাদুর বেশ ভাল করিয়া জানিলেও দেশবাসী তাহার অতি অস্পষ্ট আভাষ

ছাড়া আর কিছুই জানেন না, সেই সব ঘটনাই আমার ক্ষীণ শক্তি অনুযায়ী বিবৃত করিয়া যাইতেছি। বিগত যুদ্ধের সময় ভারতে যে সকল ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ সময়ই জেলের মধ্যে হইয়াছিল এবং সে সকল মামলার বিবরণ জন সাধারণ প্রায় কিছুই জানে না, কারণ পুলিশ এবং বিচারকদিগের অমনোনীত কোন সংবাদই, এমন কি যাহা বিচারদিগের সম্মুখে প্রমাণিত ও হইয়াছিল তাহাও প্রকাশিত হইত না, তাই এ সকল ঘটনা অনেকের নিকট একেবারে নুতন ঠেকিতে পারে। আমার কেবল এই বাসনা যে যাহা সরকার জানেন আহা দেশবাসীও জানুন। যাহা সত্যই দেশে হইয়াছিল, যাহা জানিলে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের বিষয়ও জানা যায়, আচার কোন খানে আমাদের দুর্ব্বলতা ছিল, কোথায় অমরা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছি, কোন খানে আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা ও কার্য্যের ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছিল, এ সব ও জানা যায় তাহাই অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া যাইতেছি। ইহাতে আমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছু হইবে না। দেশে বিপ্লবের কিরূপ বিরাট আয়োজন হইয়াছিল তাহা লুকাইবার কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না, বরং আম ইহাই চাই যে দেশবাসী ইহার সবটুকু জানুন। আমার লেখা সম্পূর্ণ হইলে দেশবাসী বুঝিতে পারিবেন যে বিপ্লবায়োজন জনকতক মুষ্টিমেয় বালক অথবা যুবকদের খেয়াল মাত্রই ছিল না, অথবা ইহার আয়োজনও তেমন অব্যবস্থিতের মত হয় নাই যেমন Rowlatt reoport এ প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল ঘটনা যে ন ভাবে বিকৃত করিলে দমন নীতির সাহায্য হইতে পারে অথচ যাহাতে দেশবাসীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না জন্মায় Rowlatt report কেবল সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই Report এ এমন অনেক কথা আছে যাহা অতিরঞ্জিত কিন্তু সে সব অতিরঞ্জন অতি তুচ্ছ বিষয় হইয়া, এবং সে গুলি এমন ভাবে বর্ণিত আছে যাহাতে দেশবাসীর সম্মুখে বিপ্লববাদিদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। আবার এমন গুরুতর বিষয় ছিল যাহা প্রকাশ করিলে দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার হইতে পারে তাহা বেমালুম চাপা দেওয়া হইয়াছে। কেমন করিয়া কত কাল ধরিয়া, কত সন্তর্পণে তিলে তিলে কত রত্ন সংগ্রহ করা হইয়াছিল, আবার কত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া, কত অন্তর ও বাহিরের নির্য্যাতনের কষ্টি পাথরে যাচাই হইয়া, কত নীরব বীরত্বের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া এই সব রত্ন দিয়া মালা গাঁথা হইয়াছিল তাহা Rowlatt report পড়িলে জানা যাইবে না, কিন্তু আমার দুঃখ এই যে সে সকল কথা উপযুক্তরূপে

প্রকাশ করিবার মত ক্ষমতা আমারও নাই, কিন্তু যাহা পারি তাহাই করিতেছি।

অনেকে একথাও মনে করেন যে এইরূপে প্রকাশ করিলে (যেন এ সকল কথা এখনও অপ্রকাশিত আছে!) সরকারের তরফ হইতে দমননীতির প্রচলন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, যে বিপ্লববহ্নি একদিন কেবল মাত্র বাঙ্গলার এক প্রান্তেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ ১৬।১৭ বৎসরের দমননীতির ইন্ধন সংযোগে তাহারই অগ্নিশিখা রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশাওয়ার পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাই যাঁহারা এই দমন নীতির মূলোচ্ছেদ করিতে চান তাঁহাদিগকে আমার ব্যক্তব্য এই যে বিগত যুগের বিপ্লব প্রয়াসকে হাস্যাস্পদ ও ছোট করিবার অথবা তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া, তাঁহারা যেন সরকার পক্ষকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন যে দেশের সত্য আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিবার চেষ্টা করিলে অথবা বৈধ আন্দোলনের বিকাশের সুযোগ ও অবকাশ না দিলে এইরূপে গোপনে প্রলয়াগ্নির উদ্ভব হইবেই। বৈধ প্রকাশ্য আন্দোলনের অপেক্ষা, গোপনে বিপ্লব প্রয়াস যে বড় কম শক্তিশালী তাহা ত মনে হয় না। ইংলণ্ডে এই প্রকাশ্য আন্দোলনের অবকাশ আছে বলিয়াই, আর—সে যতই কেন তীব্র আন্দোলন হউক না,ইংলণ্ডে এইরূপ প্রকাশ্য আন্দোলনে জন্ সাধারণ বাধা পায় না বলিয়াই ফ্রান্স অথবা ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সেখানে গোপনে বিপ্লবের চেষ্টা অনেক পরিমাণে কম হইয়াছে। দমননীতির দ্বারা মরনোন্মুখ জাতিকেই বশ করা যায়, কিন্তু বিকাশোন্মুখ জাতির আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে কোনও দমন নীতির দ্বারাই ব্যর্থ করা যায় না। এই কথা আজ দেশবাসীর ও সরকার পক্ষের উভয়েরই বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

যতীনবাবু আজ ইহজগতে নাই, তাই তাঁহার কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। এই সময় যে আমরা সারা উত্তর ভারত একযোগে একই উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করিতেছিলাম তাহা হয়ত আমাদের দেশবাসী ভাল করিয়া জানেন না, এমন কি বাঙ্গলার সব বিপ্লবদলও একথা হয়ত নিঃসংশয়রূপে জানেন না। ক্রমশঃ

ডালি।

আইরিশ জাতীয় জীবন।

ও

কবি এ ই—(জর্জ্জ রাসেল)

শ্বেতই হউক আর কৃষ্ণই হউক, দীর্ঘ পরাধীনতার ছাপ সকল জাতির অঙ্গে প্রায় এক আকারে দেখা দেয়। আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বিজেতার অমানুযোচিত অনুকরণ, দাসসুলভ মনোভাব, ভীরুতা, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ একতার অভাব প্রভৃতি কলঙ্ক স্বাধীনতা বিসর্জ্জনের পর ধীরে ধীরে জাতির মধ্যে বাসা বাঁধিয়া থাকে। তাই যখন কোন জাতি জাগিয়া উঠে, অধীনতার পাশ ছিন্ন করিতে উদ্যত হয় তখন প্রথমেই সংগ্রাম বাধিয়া যায় তাহার এই ভিতরকার শত্রুগুলির সহিত। সেইজন্য জগতে যে সকল জাতি পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছে তাহাদের ইতিহাস অন্ততঃ এই হিসাবে প্রায় অনুরূপ।

চিন্তাবীর মহাপ্রাণ আইরিশ কবি এ ই জগতের সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম জর্জ্জ রাসেল। তিনি তাঁহার "National Being" নামক পুস্তকে যে ভাবে জাতীয় জীবন গঠনের প্রয়াস পাইয়াছেন, যে সকল জাতীয় সমস্যার সে ভাবে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বহুদূরে এবং নানা বিভিন্ন অবস্থার ভিতর থাকিলেও তাহা আমাদিগের প্রণিধানযোগ্য। আইরিশ জাতীয় সমস্যা ও আমাদিগের জাতীয় সমস্যার অনেকগুলি মূলতঃ এক। অবশ্য আমাদিগের দেশে কতকগুলি এখনও তেমন তীব্র হইয়া উঠে নাই।

ভিতরকে খর্ব্ব করিয়া বাহিরকে বড় করিবার চেষ্টায় মানুষকেই পরিণামে ঠকিতেই হয়। বাহিরের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য যখন ভিতরের মহত্ব ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া না পড়ে তখন তাহার স্থায়িত্বের সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠে। বাহিরের শুষ্ক আচারকাণ্ড ভিতরের প্রাণকে প্রকৃত ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। যখন ভিতরের প্রাণের প্রেরণাই বাহিরে আচাররূপে ফুটিয়া উঠে তখনই সে আচার অর্থবান ও প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে এ কথা যেমন সত্য জাতির দিক দিয়াও ঠিক তেমান সত্য। সেই জন্য রাসেল এই গোড়ার কথাটিকে প্রথমে বিশেষ ভাবে ধরিয়াছেন। তাঁহার

ব্যক্তিকে লইয়া জাতি গঠিত সেই ব্যক্তির পরিবর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে জাতির সভ্যতার পরিবর্ত্তন ওঅবশ্যম্ভাবী। দেশের ভিতরে প্রাণকে সুন্দর ও মহৎ করিতে পারিলে তবেই দেশ বাহিরেও শোভন ও সম্মানীয় হইবে। জাতির ভিতরকে বড় না করিয়া বাহিরকে বড় করিবার চেষ্টা সফল হয় না। উত্তেজনার আধিক্যে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও যাহার মাথা তাহার তাহা চাইই; নতুবা হয় না। ইহাই জগতের নিয়ম।

জাতীয় জীবন গঠনের প্রথম কথাই হইতেছে জাতিপ্রকৃতি ও বিশিষ্টতার সহিত পরিচিত হওয়া ও সেই অনুযায়ী গঠন কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া। জাতির প্রকৃতি ও জাতীয় বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দেশের সকল সমস্যার মীমাংসা করা উচিত; নচেৎ অকৃতকার্য্যতার বোঝাই বহিতে হইবে।

জর্জ রাসেল বলিতেছেন কেবল মাত্র নিজের জন্যই রাশীকৃত অর্থ আহরণের চেষ্টা করিলে, সে যে শুধু ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘন করিবে তাহা নহে, আইরিস সমাজ ও জাতি প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, কারণ চিন্তা চারিত্রিক আভিজাত্য এবং অর্থ নৈতিক সাম্য ও একাকারই হইতেছে আইরিস জাতীয় জীবনের মূল। আইরিস সভ্যতা এই দুইটীর উপরই প্রতিষ্ঠীত রাখিতে হইবে; নচেৎ স্পেন, ও পর্টুগাল প্রভৃতির ন্যায় সভ্যতা ও স্বাধীনতার কেবল আবরণটিকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। জাতির পক্ষে তাহা স্বাভাবিক ও প্রাণের জিনিস হইয়া উঠিবে না।

এই জাতীয় ভাব, এই জাতীয় জীবন একটা বিশেষ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে। এই কার্য্য প্রণালী নানাদেশে নানা আকারে দেখা দেয়। রাসেলের মতে ইউরোপের নানাদেশে এই জাতীয়ত্ব তামর তন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্র সমরতন্ত্রতার দ্বারা আপন আপন দেশের জাতীয়ত্বকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু রাসেল এইভাবে আয়ারলণ্ডের জাতীয় ভাবকে রক্ষা করিতে বা ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন না। সমর তন্ত্রতা জাতিকে শৃঙ্খলা ও একতা শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু জাতির মন হইতে অনেক মহৎ ভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া আয়ারলণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে সমরতন্ত্রতা বিশেষ ফলপ্রদ নীতি নহে। যুদ্ধের সময় বেলজিয়ামই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। "Our geographical position and the slender population of our country make it evident that the utmost force which Ireland could organise would

make but a feeble barrier against assault by any of the greater States." এমন একটি নীতিকে ধরিয়া জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইবে যাহা শক্রর পাশব আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিতে পারিবে না। রাসেলের মতে সে নীতি হইতেছে সমবায় (co-operative) নীতি। এই নীতির উপর আইরিস জাতীয়ত্বকে দাঁড় করাইলে জাতির মধ্যে এমন একটি একতা ও শৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে যাহা শক্রর শারীরিক বলের সর্ম্পূর্ণ অজেয়। সেইজন্য রাসেল-বলিতেছেন যে জগতের অন্যান্য দেশে বাধ্যতামূলক সমর শিক্ষা বা military conscription প্রচলিত আছে, আমরা সেইরূপ civil conscription এর দ্বারা দেশের সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিব। মানুষ মারিবার জন্য যদি দেশের যুবকবৃন্দ জীবনের শ্রেষ্ঠ দুই চারি বৎসর দান করিতে পারে, তবে এইভাবে দেশকে প্রকৃত স্বাধীন করিবার জন্য কেননা দান করিবে ?

একস্থলে রাসেল বলিতেছেন—অন্যান্য রাষ্ট্র যদি প্রাণ:সংহারের জন্য দেশের যুবকদিগের সহায়তা লাভ করিতে পারে, আয়ারলণ্ড তাহা হইলে প্রাণ রক্ষার জন্য, জাতীয় সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার জন্য কেননা সে সহায়তা লাভ করিবে ? সাধারণ (public) অট্টালিকা নির্ম্মাণ, পতিত জমির উদ্ধার সাধন অরণ্য রক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বজন হিতকর শ্রমসাধ্য কর্ম্মের দেশের তরুণের দল কি জীবনের দুই বৎসরও দান করিতে পারিবে না ?

বর্ত্তমান সভ্যতায় অর্থ নৈতিক সাম্য বা Democracy in Economics প্রায় একরূপ অসম্ভব। তাই রাসেল বর্ত্তমান সভ্যতার উপরই খড়্গহস্ত। বর্ত্তমান সভ্যতার এই সর্ব্বনাশকর কলকারখানা পল্লী সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া নাগরিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, পল্লী ও নগরের অর্থ নৈতিক ও প্রতিযোগিতা সকলকেই তিনি মানব সভ্যতার পরিপন্থী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন বর্ত্তমান শ্রমিকের যে অবস্থা, তাহাতে তাহাকে দাস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যে দাস তাহার মনে স্বাধীনতার স্থান কোথায় ? দাসত্ব প্রথা সমাজে লুপ্ত হয় নাই কেবল রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। গুপ্ত দাসত্ব জাতির স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে একেবারে শেষ করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে ভাল মন্দ যাহাই হউক না কেন দাসকে একজন প্রভুর অধীনে থাকিতে হইত; এখন উন্নতি এই হইয়াছে যে সে এক প্রভুর নিকট হইতে আর এক প্রভুর নিকট যাইতে পারে। কিন্তু দাসত্বের তাঁহার আর পরিবর্ত্তন নাই। দেশের সংখ্যাতীত লোককে এইভাবে দাস করিয়া রাখিয়া, তাহাদিগের আত্মাকে সর্ব্ব বিষয়ে

থর্ব্ব করিয়া যে সভ্যতার নির্ম্মাণ হয় তাহা বালুর উপর নির্ম্মিত প্রাসাদের মতই পতনশীল। বাহিরের ঐশ্বর্য্য সেইজন্য হঠাৎ একদিন ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। সেইজন্য রাসেল বলিতেছেন "আমাদের যেন এ ভুল না হয়। এইভুলে জগতে বড় বড় সভ্যতার পতন হইয়াছে। আমাদের সভ্যতা হইবে সমাজের দীনতম হীনতম অংশকেও লইয়া, কাহাকেও ছাড়িয়া নহে, কাহাকেও দূরে রাখিয়া নহে, সকলকে লইয়া আমাদিগকে উঠিতে হইবে।" জগতে অনেক প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ধ্বংসপ্রায় সভ্যতাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সে সকল সভ্যতা নির্ম্মিত হইয়াছিল যাহাদিগের রক্তে তাহারাই ছিল প্রধানতঃ ইহা হইতে বঞ্চিত। সেই জন্য এই যুগ যুগ সঞ্চিত অন্যায়ের বোঝা হইয়া সেই সকল সভ্যতার হটাৎ এক দিন ভরাডুবি হইয়া ছিল।

এখন কথা হইতেছে, সমাজের সকলকে লইয়া যে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইবে তাহা কি রূপ? বর্ত্তমান নগরকেন্দ্র সভ্যতাকে অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া যে সভ্যতার সৃষ্টি হইবে তাহার মধ্যে প্রকৃত Democracy বা গণতন্ত্রের স্থান নাই। তাই রাসেল বলিতেছেন যে সমবায় (Cooperative) নীতিতে পল্লী সভ্যতার পুনঃ প্রতিষ্ঠাতেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কারণ তাঁহার মতে "The farmer's industry, if we consider it closely is the most democratic of any in its application to society" রাসেলের মতে এই নাগরিক সভ্যতাই বর্ত্তমান সময়ে সকল জাতির পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দুঃখের হেতুই হইতেছে এই সভ্যতা। "Our civilisations are a nightmare, a bad dream they grow meaner and meaner as they grow more urbanised" আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। সভ্যতা পল্লী হইতে যতই নাগরিক হইয়া উঠিতেছে ততই হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। তাই এখন পল্লী সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকে তিনি জগতের একটি মহত্তম কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শুধু আয়ারলণ্ড কেন জগতের সমক্ষেই আজ এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কেবলমাত্র শ্রমিকের পরিশ্রম বাড়াইয়া বা কাজের সময় কমাইয়া বা লাভের সমান্য কিছু অংশ দিয়া আর ধণিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধকে প্রকৃত গণতন্ত্র অনুযায়ী করা চালবে না। এ সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। "the creation of a rural civilisation is the greatest need of our times."

বর্ত্তমান সভ্যতাকে পল্লীমুখীন করিতে হইলে সংস্কারককে প্রথমেই পল্লী-সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পল্লী-সমাজের স্থাপনা ব্যতীত পল্লীসভ্যতার কল্পনাও করা চলে না। এই সমাজের ক্রয় বিক্রয়, আমদানী রপ্তানী, উৎপাদন সকলই সমবায় নীতিতে পরিচালিত হইবে। রাসেল বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র সমবায় নীতির দ্বারাই প্রাচীন সমাজের সেই একতা পরস্পরের প্রতি সদ্‌ইচ্ছা ও সহানুভূতি ও একাত্মবোধ ফিরাইয়া আনা সম্ভব। সমাজটিকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে সেই থানেই লোকের আধ্যাত্মিক, মানসিক, ও সামাজিক সকল ইচ্ছারই তৃপ্তি হয়। পল্লীতে বাস করিয়া তাহার প্রাণ যেন হাঁফাইয়া না উঠে। পল্লী সমাজকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে তাহাকে পরিত্যাগ করা যেন বেদনাজনক হইয়া পড়ে। এই ভাবে পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠার পর যে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য পল্লীতে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহাদিগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। "The fight now is not to bring back to the land but to keep those who are on the land contented, happy and prosperous. And we must begin orginising them to defend what is left to them, to take, industry by industry, what was stolen from them." সহর হইতে পল্লীতে ফিরাইয়া আনা প্রথম যতদুর হউক আর নাই হউক যাহারা পল্লীতে অছে তাহারা যাহাতে পেটে ভাত মুখে হাসি লইয়া পল্লীতে থাকিতে পারে তাহাই দেখিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাসেলের মতে অর্থ নৈতিক ব্যাপারে যেমন সাম্য আবশ্যক নেতৃত্বে বা পরিচালনে তেমনি আভিজাত্যের প্রয়োজন। এ আভিজাত্য জন্মগত আভিজাত্য নহে; এ চিন্তা, চরিত্র, এক কথায় মনুষ্যত্বের আভিজাত্য। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এ অপূর্ব্ব আভিজাত্যের আবশ্যক, ইউরোপের অনেক দেশই বিশেষতঃ ইংলণ্ড সে ক্ষেত্রে একাকারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। সেই জন্য দেশের রাষ্ট্রশক্তি অনেক সময়ই অযোগ্য লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার democracy র প্রভাবে দেশের সাহিত্য ও যে কিরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছে রাসেল তাহাও দেখাইতে ভুলেন নাই। এই democratic সাহিত্য দেশের সম্মুখে মহত্বের উচ্চ আদর্শ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ফলে হইতেছে 'Failing any fingerpost in literature pointing to true greatness our democracies too often take the huckster from his stall, the drunkard from his pot, the lawyer from his court, and the

promoter from the director's chair, and elect them as representative men." অর্থাৎ সাহিত্য কোন জীবন্ত মহৎ চরিত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করায়, আমরা যে সে লোককে এমন কি মাতালকে পর্য্যন্ত তাহার পান পাত্র হইতে টানিয়া আনিয়া আমাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে লজ্জিত হই না।

আয়রলণ্ডের কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতি বিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া জাতির হীনতম, দরিদ্রতম ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত রাসেল এই গঠন কার্য্যে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছেন। কাহাকে ঘৃণা করিয়া নহে, কাহারও মুখ চাহিয়া নহে, আপন শক্তিতে এই গঠন কার্য্য চালাইতে হইবে। ঘৃণা ও ক্রোধের দ্বারা গোড়ায় কিছু কাজ হইতে পারে বটে কিন্তু পরিণামে এই ঘৃণা ও ক্রোধের বস্তু নিজেদের ম ধ্যই গজাইয়া উঠিতে থাকে। "Race hatred is the cheapest and basest of all possions and it is the nature of love, to change us into the likeness of that which we contemplate." কিন্তু রাসেল জাতীয়তাকে স্বর্গীয় ভাবে দেখিতে চান। ঘৃণার দ্বারা পুষ্ট এবং জাতি বিদ্বেষের দ্বারা উদ্ভূত যে জাতীয়তা তাহাকে তিনি সমর্থন করিতে পারেন না। যে জাতীয়তা মানবকে মহৎ না করিয়া তাহার মহত্বের এক কণা ও নষ্ট করিতে চায় তাহাকে তিনি গ্রহন করিবেন কি করিয়া? এ বিষয়ে তাহার শেষ কথা হইতেছে যে মানুষ যদি জগদীশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে, জগৎ তাহা হইলে স্বর্গের প্রতিকৃতি হইয়া উঠিবে না কেন? আমাদিগের সভ্যতা, আমাদিগের জাতিপ্রেম এই কার্য্যে সানন্দে যোগ না দিয়া বিরোধী হইয়া উঠিবে কেন?

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ

সাধনা ও সিদ্ধি

[আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়]

আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ করতে হবে—শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহামতি গোখলে বলেছেন—What Bengal thinks to-day,

the whole of India thinks to-morrow—বাঙালীর মস্তিকপ্রসূত চিন্তা সারা ভারত গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মস্তিষ্কচালনার ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী বলে' গণ্য হ'য়ে এসেছে—বাঙলার কোলে অনেক ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, সুলেখক, বৈজ্ঞানিক দেশবিশ্রুত বাগ্মী, জন্মগ্রহণ করেছেন—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রে এক এক জন দিক্‌পাল বাঙলার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী আগুয়ান্ হয়ে চলেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে, :তার চরিত্রের গলদ কোথায় ; অন্তরের কোন্ বাধাটা তার চলার পথে পথে আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে।

সক্রেটিস্ বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হয়েছে, তাদের উপদেশ দিয়ে কোন ফল নেই। তাই আমার বক্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে—যাঁরা আমাদের ভবিষ্যতের আশা—আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা এই যে "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে কথা ; —আমি বলি 'ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" অপ্রিয় সত্য বল্‌তে হবে—দেশবাসীকে প্রীতি নিবেদন করে' খুব স্পষ্টভাবেই তাদের ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে হবে। পত্রাবরণে ভগ্ন স্থান লুকিয়ে রাখ্‌লে দুর্গ-প্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ঢাক্‌লে অভাব ঘোচে না ; অভাবকে সকল সময়েই মোচন করতে হয় ;—আর তার জন্যে চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর বক্তৃতায় একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কথাগুলি এই, যে, অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে এবং যথেষ্ট ধৈর্য্যসহকারে তিনি মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠার হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৭০০ জন সরকারের চাক্‌রী করেছেন, তারও অধিক ইস্কুল মাষ্টার হয়েছেন, আর ৭৬৫ জন ডাক্তার হ'য়ে বাহির হয়েছেন। এই তালিকা দৃষ্টে এঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অতি সহজেই অনুমেয়। মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ জীবনের একটানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞানজগতে নব নব পথের সন্ধানে বের হন নি। আর মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে সেই কথাই সর্ব্বোতোভাবে প্রযুজ্য। বাঙ্গলা দেশেও ঐ—একই দশা—কেরাণী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধঃকরণ, উদ্‌গিরণ, পরীক্ষাপাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ,

তারপর মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্ আলেকম্। মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ,—তা মাদ্রাজী গ্রাজুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হ'য়ে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাঁধা ওই চাকরীর ঘানীতে আর সবার অন্তরের কথা হচ্ছে—"মা আমায় ঘুরাবি কত—কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।"

আবার এই গ্রাজুয়েট উৎপন্ন কর্‌বার শক্তি মাদ্রাজের চেয়ে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশী। এই ব্যাপারে কল্‌কাতা সবার অগ্রণী—কিন্তু হেসো না; এ-সব ঘরের কথা বাইরে না যায়। অসহযোগ; সহযোগ স্বীকার করি না; এবার ২০;০০০ ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে আর শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন পাশ হবে। কিন্তু একজন উপাধিধারী কি প্রকার কূপমণ্ডূক তা চিন্তা কর্‌লে মন বিষাদিত হয়। বর্ত্তমান প্রথানুসারে একজন এম-এসসি কিম্বা এম-এ'র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাক্‌লেও চলতে পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কলন; ফ্রাঙ্ক্‌লিন প্রভৃতির নাম শোনেন নি এমন গ্রাজুয়েটও অনেক আছেন। ভূগোল চাই না; ইতিহাস চাই না, দেশের কথা চাই না, পৃথিবীর কথা চাই না,—শুধু পাশ করে' যাও—মাট্রিক, আই-এ, বি-এ, ফাষ্টক্লাস, সরেস এম্-এ। উচ্চশিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাট্‌সিনীর নাম শুনেছেন—গ্যারীবাল্‌ডিকেও হয়ত মস্ত একটি বীর ব'লে জানেন কিন্তু কাবুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুল্‌কাতে আরম্ভ করবেন। যদি প্রশ্ন করি আমেরিকায় অন্তর্বিবাদ (Civil War) কেন হ'ল—এ বিপ্লবে কে কে রথী ছিলেন—লিঙ্কলন জ্যাকসন কে, কোন পক্ষ জয়ী হ'ল, বিরোধের ফলাফলে দেশের লাভ লোক্‌সান কি হ'ল? তাহলেই ফিলসফির ফাষ্টক্লাস এম্-এ একবারে অবাক হ'য়ে হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌বেন;—এ-সব আবার কি? প্রফেসারের কোনো নোটে ত এ-সব লাল নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কস্মিন কালে পাঠ করি নি।

চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গতবৎসর এই সময় আমি দেশে ফিরে আসি। সেখানে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্ম্মিংহাম্, লীড্‌স্, এডিন্‌বরা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। অনেকস্থলে এক একটা কলেজ এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা বিদ্যানুশীলনের জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে আর প্রত্যেক বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই বিশেষ বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন। আর পর পর এমন বড়লোক ঐ সকল বিদ্যামন্দির থেকে বাহির হ'য়ে আসছেন, যা ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। এঁদের অনেকে

একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণায় নেশায় ভরপুর হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করে' দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একের শূন্যস্থান অপরে পূরণ করছেন। আর এই-সকল বিষয়ের বৈচিত্র্যই বা কি! একখানা "নেচার" তুলে নিয়ে চোখ বুজে তার যে-কোন স্থান খুলে য়ুরোপে অনুশীলিত কত রকম বিদ্যার কত রকম রোজনাম্‌চা যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেখানে কতশত অনুসন্ধান-সমিতি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতিতে মানবের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ত পরিপুষ্ট করছে। এই ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত নিয়ত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে,, যে তার আর শেষ নেই। কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে কত শত প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কত একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধকের ঐকান্তিক চেষ্টা ঐ-সব দেশে বিদ্যার্থিগণের তথা জন-সাধারণের চিত্তবৃত্তিকে সদা জাগ্রত করে' রেখে দিয়েছে। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশর, আসীরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবনযাপন করেছিল সেই-সকল প্রত্নতত্ত্বের বিচারের ফলে য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ জ্ঞান-রাজ্যের এক একটা নূতন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যার নাম হয়েছে—ইজিপ্‌টলজি, আসিরিওলজি ইত্যাদি। লেয়ার্ড, রলিন্‌সন, পেত্রি (Layard, Rawlinsoh, Petrie) প্রভৃতি এই-সকস বিদ্যার হোতা।

তারপর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখা যাক্‌। জাপানে তোকিও, কোবে, কিয়োতো, প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৌষ্ঠবে ও জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বাংশে য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সেবার বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় দুই শত ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া সবাই কেমন করে ফাঁকি দিয়ে একটা বিলাতি সস্তা ডিগ্রি এনে দেশী ডিগ্রির উপর টেক্কা দিবেন সমস্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ করছিলেন। আমাদের দেশের যে-সব ছাত্র মাট্রিক বা আই-এ, আই-এসসি প্রভৃতি পাশ করে' বিলাত চলে' যায়, দেখ্‌তে পাওয়া যায় জ্ঞানান্বেষণ তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের চিন্তা, কি করে শীঘ্র একটা বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশবাসীর চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ কর্‌বার পর য়ুরোপ যান এবং সেখানে সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে' সেই বিষয়টিই শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে মাটী বেচে, কেউ বা বড়লোকের জামাতা হবার লোভে ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ

হ'য়ে বিলাত যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ ঘটে তা বল্‌ছি না। এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেই ১৮৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে ক'জন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌলিক ও নূতন, যাতে মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ ক'রে বৃদ্ধি পেয়েছে! কেহই যে কিছু দেন নি এমন কথা বল্‌ছি না। ব্যতিক্রম ত আছেই কিন্তু তাঁদের আজীবন সাধনার ভিতরের কথা কে বুঝবার চেষ্টা করে—কে তাঁদের অহেতুকী জ্ঞানতৃষ্ণার যথার্থ সম্মান কর্‌তে পারে? এখানে যে সব ছাত্রই ডিগ্রী চাচ্ছেন আর চাকরী কর্‌ছেন! কোন বিষয়ে কৃতিত্ব ত কেউ দেখাতে পার্‌লেন না। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। আপন রোজগারের প্রধান অংশ পুরাতন পার্‌সী পুঁথি ক্রয় কর্‌তে ব্যয় করেছেন, পাটনা খোদাবক্‌স্‌ লাইব্রেরীতে বৎসরের পর বৎসর ধ'রে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাই মোগলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আজ Authority বা প্রামাণ্য পণ্ডিত। তার উপর আর কেউ কথা বলতে পারেন না, এদেশেও নয়; য়ুরোপেও নয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এর পাণ্ডিত্যের কারণ নয়—এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জীবনের সাধন।

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সেই পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলেই আজ চাকরীর উমেদার। হিন্দু কলেজের ছেলেরা যারা মাইকেল-রাজনারায়ণের সমপাঠী—তাঁরা গ্রাজুয়েট হ'লেই প্রথব লর্ড হার্ডিঞ্জের গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ডেকে বড় বড় চাক্‌রী দিতেন। এই সময় থেকে মতিগতি যে চাকরীর দিকে গেল সে আর ফির্‌লো না। বাঙ্‌লার ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর সিন্ধুক বোঝাই হ'ল, আর বাঙ্‌লার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। সাধনা—ডিগ্রী, তাই সিদ্ধি—চাকরী!

এইরূপে আদর্শ খাটো হ'য়ে গেল। তাই গভীর জ্ঞান-সাধনা দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। ভাসা-ভাসা জ্ঞানেই বাঙালী যুবক থাকৃতে শিখ্‌লেন। এখন বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে ভূগোল এক প্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে; ইতিহাসও না পড়্‌লে চলে। বাস্তবিক কি লজ্জা, কি পরিতাপের কথা যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ এম্‌-এ, এম-এস্‌সিগণ অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত।

ক্যালেণ্ডারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হারভার্ডকেও ছাড়িয়ে যায়।

তাই বলি সর্ব্বনাশ হয়েছে এই ভাসা-ভাসা জ্ঞানে, আর অতি সস্তা পাশে। ফিস্‌ক্যাল-কমিশনের স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, ঘনশ্যামদাস বিরলা প্রভৃতি বস্‌বেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে এঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারে যাদের নাম জলজল কর্‌ছে সেই (Cobden Medallist) স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বাঙালী যুবক ত ঐ অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আলোচনায় আহূত হলেন না। স্যার বিঠলদাস ঠাকর্‌সে বড় বড় কলের মালিক—পরন্তু "গোল্ড মেডেলিষ্ট" নন। টাকা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করেন বলে মহামতি গোখ্‌লে বজেট-বক্তৃতা প্রস্তুতের কালে তাঁর পরামর্শ বহুমূল্য জ্ঞানে গ্রহণ কর্‌তেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে-কার্‌বার-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যাঁর মতামত বহুমূল্য বলে বিবেচিত হয় তিনি হচ্ছেন ডিগ্রীহীন সাতকড়ি ঘোষ। চিন্তামণি, কালীনাথ রায় প্রমুখ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ অনেকেই ডিগ্রীশূন্য; কিন্তু এঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে সব মূল্যবান কথা লেখেন, বড় বড় ডিগ্রীধারিগণ তা থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ কর্‌তে পারেন।

আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জাতি বলে গর্ব্ব করে' থাকি আর য়ুরোপীয়দের জড়বাদী বলে গালি দিই। কিন্তু জড়বাদী ওরাই আমাদের দেশের স্থানে স্থানে নানা কুষ্ঠালয়, হাস্‌পাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে। ভারতবর্ষে ৭২টি কুষ্ঠালয় আছে, তন্মধ্যে দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি ছাড়া আর সবই তো ওদের। ফাদার ডামিয়েন তাঁর জীবনই তো কুষ্ঠীর সেবায় তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন! আর্ত্তকে কেউ কোলে তুলে নিচ্ছে আবার কেউবা বলছে—ওকে ছুঁয়ো না। বাস্তবিক কি বৈচিত্র্য ওদের জীবনে জান্‌বার বুঝ্‌বার, পাবার কি দুর্ণিবার চেষ্টা! কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ কর্‌বার জন্যে বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা কর্‌ছেন, তার আয়োজনই বা কত; কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের কিলিমেন্‌জেরো পর্ব্বতের চিরতুহিনাচ্ছন্ন চূড়ায় কোন চিরনূতনকে দেখ্‌বার প্রয়াস কর্‌ছেন! সু-উচ্চ গিরিদেশে শ্বাসরোধ হয়ে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে—তবু দৃক্‌পাত নেই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। মেরুসন্নিহিত প্রদেশে প্রাকৃতিক অবস্থা জানবার জন্য ফ্রাঙ্কলিন, ন্যান্‌সেন শ্যাক্‌লটন প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মানুষের যা সাধ্য তা এরা কর্‌বে, আবার মানুষের যা অসাধ্য তাও এরা কর্‌বে। কি

বিপুল দুর্দ্দান্ত জীবন! উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ইংরেজ হুকার বিচিত্র লতাগুল্মের সন্ধানে সিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে বন্দী হলেন। তাই নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। যুদ্ধ-জয়ের পর তিনি মুক্ত হলেন। তাঁর Flora Indica বর্ণিত সংগ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে (Kew Garden) কত যত্নে রক্ষিত হয়েছে। আবার পশুতত্ত্ববিৎ য়ুরোপীয়ান সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদসঙ্কুল আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে বাস করে মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য গরিলা সিম্‌পাঞ্জী প্রভৃতি বনমানুষের অভ্যাস ও আচরণ জান্‌বেন; তাদের ত ভাষা নেই, তাই সঙ্কেতে তাদের ভাববিনিময় লক্ষ্য কর্‌বেন। এমন অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারেই তাঁরা সত্যের আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় টাইকো ব্রেহী কেপ্‌লার, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেলের সম্পর্ক কত নিবিড়, কত গভীর! এত গভীরতা শোণিতসম্পর্কে কোথায় পাবে! গ্যালিলিও কেপ্‌লার সমসাময়িক ছিলেন। কেপ্‌লারের অভাবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলীর আবিষ্কারের পথ সুগম হত না। কত বিনিদ্র রজনীতে উদার উন্মুক্ত অসীম আকাশের দিকে কি আনন্দে কি আশায় এঁরা চেয়ে থাক্‌তেন! কি অমূল্য রত্ন এঁরা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে দিয়ে গেছেন। এঁদের জ্ঞান-সাধনার মূলে গভীর অভিনিবেশ! একবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হ'য়ে এঁরা সাধ্য বস্তুর সন্ধান করেছিলেন, তাই সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। রেনেসাঁস যুগে প্যারিস নগরে হোমারভক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট স্কালিগার আপন ঘরে পাঠে নিমগ্ন; এদিকে বাহিরে হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেল (Massacre of St. Bertholomew); কত প্রোটেষ্টাণ্টকে খুন করা হ'ল, কিন্তু তিনি এমনই তন্ময় যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তার পরদিন জান্‌লেন। এথেন্সের সৈন্যদলভুক্ত হ'য়ে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস একটানা ২৪ ঘণ্টা নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা কর্‌তেন, তবেই তরুরহ তত্ত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। গ্রীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। প্লেতো তাঁর শিষ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্ বুদিয়স্‌এর বিবাহদিনে গির্জায় কনে এসেছেন, অন্যান্য বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বর কোথায়? বরকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বরকে পাঠগৃহে গিয়ে দেখা গেল তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন আছেন। যাঁর বিয়ে তার মনে নাই। রোমান্ সৈন্য যখন আর্কিমিসিকে খুন কর্‌তে এসেছে তখন আর্কিমিডিস বল্‌লেন—দাঁড়াও একটু, এ বৃত্তটা নষ্ট ক'রে দিও না, এ প্রমাণটা শেষ করি। বর্ব্বর সৈন্য তাঁকে খুন ক'রে জগতে মহৎ সত্য উদ্‌ঘাটনের পথ হয়ত রুদ্ধ ক'রে

দিয়ে গেল। এমনই ক'রে আপনহারা হ'য়ে সাধনা না করলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে ?

এই নিঃস্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ—স্বার্থপর ক্রোড়পতির কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন 'জনহিতায়' ব্যয় হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্য। জ্ঞানসাধকের সাধনলব্ধ যা-কিছু তা পৃথিবীর সকলেরই সম্পত্তি। তাই তাঁরা সকলেরই বড় আপনার জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রেই আমরা হ'টে গিয়ে পিছনে প'ড়ে গেছি। সর্ব্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে। ৺প্রতাপ মজুমদার বল্‌তেন "জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙ্গালী অতি বুদ্ধিমান।" সেইজন্যই বাঙালী আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব। ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, অর্থসমস্যা প্রভৃতি নানা-সমস্যায় প'ড়ে আমরা সব রকমে মাটি হ'য়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে প'ড়ে থেকে এক একটি সমস্যার মীমাংসা করতে না পার্‌লে আমাদের আর বাঁচ্‌বার আশা নেই।

আর একটা কথা। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে চেষ্টামাত্রেই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে তা কখনই নয়। সুতরাং কাজ আরম্ভ ক'রেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে চল্‌বে না! মনে রাখ্‌তে হবে, প্রয়াসসাধ্য সকল কার্য্যেই করার আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়; মৃগয়ায় যেমন অন্বেষণেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গূঢ়রহস্য যারা উদ্‌ঘাটন করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ। আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টার আনন্দে আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জর্ম্মান দার্শনিক লেসিং সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে যদি ঈশ্বর এসে তাঁকে বল্‌তেন— তুমি সত্য চাও না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন— আমি সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাব, কেমন করে পাব, এই সে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে; এই খোঁজের খেয়াল বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হ'য়ে থাকৃতে চাই। এই ত প্রাণবস্তের লক্ষণ; বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে। আর এই অন্বেষণ বা সাধনা একই কথা।

ধর্ম্মজগতে বুদ্ধ, যীশু, মোহম্মদ, চৈতন্য—এদেরসিদ্ধিলাভের ইতিবৃত্ত একই।

জনকোলাহলের বাহিরে পর্ব্বতে জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা ক'রে এঁরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ গ্রথিত হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য সিদ্ধার্থ; আমরা অতীতের গর্ব্ব করে থাকি, কিন্তু অতীতের প্রাণের লক্ষণ-গুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই না;—অতীতের সিদ্ধির উপর আমাদের লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা শুনেই আমরা আতঙ্কে মরে' যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শত-দলপদ্মের মত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু একটির পর একটি করে' এইশতদল ফুটেছে,—এর পিছনে আছে একনিষ্ঠ সাধনা। গোখলে ইস্কুলমাষ্টার ছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ছিলেন। পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫৲ টাকা মাহিনায় গোখলে ফার্গুসন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু গোখলে আজ দেশপূজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা করেছিলেন। এই দারিদ্র্যব্রতধারীর বজেট-বক্তৃতায় ব্যবস্থাপক সভায় লাট কর্জ্জন কাপ্‌তেন। আর এক প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর কথা বলে' আমার কথা শেষ করি;—তিনিও দারিদ্র্যব্রতধারী, মহাসাধক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী আজ বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু একদিনেই কি তাঁর নাম সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে? ২১ বৎসর পূর্ব্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা দেশবাসীর নিকট বিবৃত করতে আমিই প্রথম তাঁকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। গান্ধীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—কেপ কলোনিতে (Cape Colony) ভারতবাসীর অশেষ দুর্দ্দশার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা। তিনি দেশবাসীর হিতের জন্য আপনাকে একবারে নিঃশেষ করে' উৎসর্গ করে' দিয়েছিলেন। নেটাল প্রদেশে তিনি তাদের সঙ্গে তুল্য ভাবে নিগৃহীত নিপীড়িত ও অত্যাচরিত হয়েছিলেন। মাসে ৫।৬ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে' সবার ব্যথাকে বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কতবার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করেছেন। তাই তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার করতে পেরেছেন। আজ অন্ততঃ ২৭।২৮ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা—যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, সেইখানেই মহাত্মা গান্ধী; তাই আজ তাঁর নামে দলিত জনসঙ্ঘের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—আশায় উৎফুল্ল হয়। এই অনন্তপ্রতিদ্বন্দ্বী-প্রভাবের পশ্চাতে রয়েছে মহাত্মাজীর আজীবন সাধনা।

প্রবাসী—

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান।*

(চতুর্থ গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

(ছায়া)

কীর্ত্তন——একতালা।

আর, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—আমিত তাহারে পাব না।
আজি তবু তারে স্মরি', সতত শিহরি কেন আমি হতভাগিনী ;
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে, সেই এক মধুরাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান নীরব মহান্, যায় সে আকাশ ছাপিয়া ;
দেখি, শুনি' সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া ;
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে ;
কেন—রহি' এ মহীতে সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো ;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো ,
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে ;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে॥

[স্বরলিপি—শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা]

<u>আরম্ভ, ঠা, লয়ে—</u>

		০				১				২´		
মমা	II {	মঃ পাঃ	পা	।	পা	ধা	পা	I	মঃ	মাঃ	মা	।
আর্		কে ন	মি ছে			আ	শা		মি	ছে	ভা	

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি 'নারায়ণে'র প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

৩ ০ ১
। গমপা মা গা । সঃ মাঃ মা । মা গমগমা -পা I
ল•• বা সা মি ছে কে ন তা••• র্

২´ ৩ ৩
I গ গা -পা -মপা । (গা -া মমা)} । গা -া প ধা
ভাব ০ •• না • 'আর্' না • সে যে

০ ১ ২´
। { র্সাঃ র্সাঃ র্সা । -া র্সাঃ র্সাঃ I র্সাঃ সাঃ র্সা র্সা ।
সা গ রে র্ ম ণি আ কা শের্

৩ ০ ১
। নর্সার্রা -না -া । না র্সা না । ধা পা মগা I
চাঁ•• ০ দ্ আ মি ত তা হা রে০

২´ ৩ ৩
I গঃ মাঃ পধনর্সা । (-ধঃ -নাঃ প ধা)} ।-ধঃ -নাঃ মমা II
পা ব না••• • • সে যে • ০ "আর্"

০ ১ ২´
II { পঃ ধাধঃ নর্সানা । -নর্সানধপা ধধঃ ধাঃ I র্সার্সা র্সানা -ধনধনর্সা
ত বু তা রে•• ••••• স্ম রি সত ত০ •••••

৩ ০ ১
। না ধা পা । র্সাঃ র্সাঃ র্সার্সা । -র্রা সা র্সার্নধা
শি হ রি কে ন আমি • হ ত••

২´ ৩ ৩
I ধনা -ধনসা-র্সার্সা । (-া -া পপা)} । -া র্সাঃ র্সার্সাঃ ।
ভা• ••• গিনী ০ ০ আজি • কে নএ

০ ১ ২´
। { র্সাঃ র্সা -া -র্রাঃ । র্রাঃ র্রা -া -• । র্সার্সা র্রার্গার্মার্পা -র্মা ।
প্রা ণে • র্ মা ঝে • • নিশি দি••• ন্

০ ০ ১
। র্মর্মা -র্গ র্রা র্সা। র্সর্স র্সনা ধপা। মমা গা -া
বাজে • • • সেই এ০ • ক্ মধু রা • I

২ ৩ ৩
I গঃ মাঃ পধনর্সা। (-ধঃ -নাঃ র্সর্সা)}। -ধঃ -নাঃ মমা II
রা গি ণী০•• ০ • কেন এ • • "আর্"

০ ১
II মঃ পাঃ পা। পা ধা পা I
কে ন মি ছে আ শা

আরম্ভের লয়ের দ্বিতীয় দ্রুত লয়েঃ—

২ ৩ ০
I {মা পা পা। পা পা -া। মা মপা ধা
উ ঠে সে ই গা ন্ নী র০ ব

১ ২ ৩
। মা গা -মা I পা -া পা। পা পা——মা।
ম হা ন্ যা য় সে আ কা শ্

০ ১ ১
। পা ধা পধা। (-নর্সা -ধনা মমা)} I -নর্সা -ধনা পধা I
ছা পি য়া০ ০০ ০০ শুনি •• •• দেখি

২ ৩ ০
I {র্সা র্সা র্সা। সা র্সর্স র্সা। র্সা র্সা র্সর্রর্গা।
শু নি সে ই ধ্ব নি শি হ রে০•

১ ২ ৩
। র্রা র্সা না I ধা র্সা না। ধা পা মগা।
ধ র ণী তা রা কু ল্ উ ঠে০

০ ১ ১
। গা মা পধনর্সা। (-ধঃ নাঃ পধা)} I -ধঃ -নাঃ -া I
কাঁ পি য়া০•• • ০ দেখি ০ • -া I

২ ৩ ০
I -া -া । -া -া ম মা। {পঃধা ধঃ নর্সনা।
• ০ ০ • আমি চেয়ে থা কি০•

১ ২´ ৩
। -নর্সনধপধা ধা -া I র্সর্সা র্সনা -ধনধনর্সা। না ধা -পা।
০০০ঃ০০ স্থি র্ নীর ব০ ০০০০০ গ ভী র্

০ ১ ২´
। র্সঃর্স র্সঃ র্সা । -র্রা র্সা ·র্সসধা I ধনা -ধনর্সা র্সর্সা।
নির্ ম ল ০ নী ০ল০ নি০ ০০০ শীথে

৩ ৩ ০
। (-া -া পঁপা) } । -া -া র্সর্সা । {র্সঃ র্সা -র্সর্রা।
০ ০ আমি ০ ০ কেন র হি ০ ০

১ ২´ ৩
। র্রা র্রঃ র্রাঃ I র্সর্স র্রগ´র্মর্পা র্মা । র্মর্মা -গ´র্রা -র্সা।
এ মহী তে অসী ম০০০ হ। ইতে ০০ -র্সা।

০ ১ ২´
। র্সর্সা র্সনা -ধপা। মমা গা -া I গঃ মাঃ পধনর্সা।
চ.হি সে০ ০০। অসী মে ০ মি শি তে০০০

৩ ৩ ০
। (-ধঃ -নাঃ র্সর্সা)} । -ধঃ -নাঃ মমা । মঃ পাঃ মি
০ ০ কেন ০ ০ "আর"। কে ন মি

১
। পা ধা পা I
ছে আ শা

আরম্ভের লয়ের দ্বিগুণ দ্রুত লয়ে :—

২´ ৩ ০ ১
I {মা পা পা । পা . পা -া । মা মপা -ধা । মা গা -মা I
পা রি না ত হা য় ধূ লা০ য়। গ ড়া -য়

২´ ৩ ০ ১
I পা -া পা । পা -া মমা। ধা ধা পধা । (-নর্সা -ধনা মমা)} I
ত প্ ত অ ০ শ্রু বা রি গো০ ০০ -০০ আমি

১ ২´ ৩ ০
I -নর্সা -ধনা পধা I {ধা সা´ সা´ । সা´ সা´ঃ সা´ঃ । সা´ সা´। সা´রা´গা´ ।
০০ ০০ তবে কে ন হে ন যে চে হ খ ল০০

১ ২´ ৩ ০
। রা´ সা´ না I ধা সা´ না । ধা পা মগা । গা মা পধনর্সা ।
ই বে ছে কে ন না ভু লি তে০ পা রি গো০০০

১ ১ ২´ ৩
। (-ধঃ নাঃ পধা)} I -ধঃ -না -া -ঃ I -া -া -া । -া -া পপা ।
০ -০ তবে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ নানা

<u>আরম্ভের ঠা লয়ে :—</u>

০ ৩ ০ ১
। {ধঃ সাঃ সা´ । -র´গ´র´সা´ -গ´রা´ -র´রা র´রা´ । র´রা রা´ । -া -া -া I
ত বু সে ০০০০০ ইহু ০থ্ জাগি যাথা কু ০ ০ ক্

০ ১ ২ ৩
। র´ম´ম´ । ম´মা´ ম´মা´ । -গা´ -রা´ র´রা´ I র´গা´ -র´গ´ম´ -গা´ । (রা´ -া পপা)
আ০ম রণ্ মম ০ ০ স্ম র০ ০০০ ০ ৫ে ০নানা

৩ ০ ১ ২´
। রা´ -া র র´া । {র´প´পা প´পা -প´ধ´প´ধা´ । প´মা´ -া -া ম´ম´মা´ ম´মা´ -ম´প´ম´পা
ণে ০ আমি লভেছি যদি ০০০০০ এ০ ০ ০ বি র স জীব ০০০০

৩ ০ ১ ২´
। -মা -া -া । গ´মা´ গা´ রা´ । স´না ধপা -মগা I গঃ মাঃ পধনসা ।
০ ০ ন্ ল০ ভি ব সর সু০ ০০ ম র ণে০০০

৩ ৩
। (-ধঃ -নাঃ র´র´)} । -ধঃ -নাঃ মমা II II
০ ০ আমি ০ ০ আর্।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২৯

দেশের কথা*

[শ্রীবাসন্তী দেবী]

আজ আপনাদের সাদর আহ্বানে আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া সুখ দুঃখের কয়েকটি কথা বলিতে এবং শুনিতে আসিয়াছি। আমি জানি, যে আসন আপনারা আমাকে দিয়াছেন তাহার যোগ্য আমি নহি—কিন্তু বাল্য-স্মৃতি-বিজড়িত এই আসামপ্রদেশ আমার কাছে চির-মধুময়। বহুকাল পরে জীবনের মধ্যাহ্নে যখন সেই প্রদেশের ভগিনীদিগের নিকট হইতে স্নেহের ডাক আসিল তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে সন্তান চিরদিনই প্রাণের স্নেহ-রসে জীবিত থাকে। সেই প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মায়ের আশীর্ব্বাদে প্রাণের অনুভূতিতেই পাওয়া যায়। সেই প্রাণধর্ম্মের দিক হইতেই আমার ডাক আসিয়াছে। মা আমাকেও ডাকিয়াছেন আপনাদেরও ডাকিয়াছেন—মিলনের জন্য। এই প্রাণ-যজ্ঞের হোমানল-শিখায় মিলনের বাণী ও মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠুক।

ইতিহাসে জাতির প্রাণধর্ম্মের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় জানি। আজ আমরা সকলে যে প্রদেশে সমবেত হইয়াছি—কত ইতিহাস তাহার আছে, কত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কত অমানিশার কাহিনী ইহার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে! কামরূপে চিরকাল হিন্দুর জ্ঞানগরিমা উজ্জ্বল রহিয়াছে। অনার্য্য

* আসাম মহিলা সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য লিখিত অভিভাষণ। সরকারের চণ্ডনীতির কল্যাণে আমাদের কর্ম্মিগণ ধৃত হওয়ায় সভার অধিবেশন হয় নাই।

আহোম জাতি অমিতবলশালী কোচনরপতিগণকে পরাজিত করিয়া সমস্ত আসামদেশে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিল বটে, কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষের অতি পুরাতন, আবহমানকাল প্রচলিত সনাতন ধর্ম্ম ও জ্ঞান বিজেতা আহোম-জাতিকে পরাস্ত করিল—অর্থাৎ তাহারাও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক শেষ পর্য্যন্ত এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে! পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। বিজেতৃগণ বিজিতগণের ধর্ম্ম জ্ঞান আচার পদ্ধতি ও রীতি-নীতি গ্রহণ করিয়া তদ্দেশীয় লোকের সহিত মিলিত হইয়াছে, এই দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। তাই মনে হয় ভারতের ইতিহাসে আসামকে যাদুকরের দেশ বৃথা বলা হয় নাই।

কিন্তু ইতিহাস আলোচনার অবসর এখন আমাদের নাই। যে ভারতভূমি একদিন ধনধান্যে, জ্ঞানগরিমায়, শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলনীয়া ছিলেন, আজ সেই ভারতবর্ষ শ্মশান, গাঢ়তর অন্ধকার—দিবসে নিশীথপ্রায়। আজ আমাদের পেটে অন্ন নাই, কটীতে বস্ত্র নাই! একদিন যে ভারত জগতের বিলাস-সম্ভার যোগাইত আজ সেই ভারত নিজগৃহে পরান্নভোজী, চির-পরবাসী—জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে না-বাঁচা না-মরা হইয়া আছে! অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! সেই সমৃদ্ধি আমাদের আর নাই, কিন্তু স্মৃতির জ্বালা আছে। সেই স্মৃতির পুণ্য-কথা আজ আমাদিগকে আত্মস্থা করিয়া দিউক। দিন গিয়াছে—এই ভারত একদিন জ্ঞানে ধর্ম্মে কত উন্নত ছিল, এদেশের রমণীগণ কত শক্তিশালিনী ছিলেন! কবে আমাদের সব সাধনা যথার্থ মাতৃপূজায় পরিণত হইবে!

বড় দুঃসময়ে আমরা মিলিত হইতে আসিয়াছি—কিন্তু দুর্দ্দিনের মিলনই যথার্থ মিলন। আজ আমাদের প্রাণ-মন-বাক্য এই মিলনকে সার্থক করিয়া তুলুক। বুঝি আজিকার মত দুর্দ্দিন ভারতাকাশে কখনও আসে নাই—এত-কালের দীর্ঘ ইতিহাসে এত দীর্ঘশ্বাস বোধ হয় আর কখনও পড়ে নাই, এত বিপন্ন আর আমরা হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আজ এই বিশাল প্রদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহই অবসাদাচ্ছন্ন—প্রিয়জন বিরহে কাতর! আমরা রমণী—সহ্য করাই আমাদের ধর্ম্ম—সর্ব্বংসহা ধরণীর মতই ধীর থাকিতে হইবে। নিষ্ফল ক্রন্দনে কোন লাভ নাই। আজ আমাদেরও কাজ আছে। দেশের যে কাজ পুরুষগণ অসমাপ্ত রাখিয়া কারাগার বরণ করিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের নয়নের অশ্রু মুছিয়া বক্ষের বেদনা বক্ষে চাপিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেই হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায় যে দেশের পুরুষগণ প্রায় সকলেই যখন রণক্ষেত্রে গিয়াছিলেন তখন

কিরূপে পাশ্চাত্য রমণীগণ তাঁহাদের অসমাপ্ত কর্ম্মভার মাথায় তুলিয়া দীর্ঘ চারি বৎসর সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাহারাও রমণী আমরাও রমণী—তাহারাও সন্তানের জননী, পতির প্রেমময়ী পত্নী, ভ্রাতার স্নেহের ভগিনী। অথচ বৃথা ক্রন্দনে কালক্ষেপ না করিয়া যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়, বীর পুরুষদের রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন সার্থক হয়, জন্মভূমির মর্য্যাদা রক্ষা হয় তাহার জন্ত অন্তরের ব্যথা অন্তরে সংগোপন রাখিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং দেশের সেই দুর্দ্দিনে দেশের সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন।—আমাদেরও আজ সেই আদর্শ অনুকরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ আমাদের সকল প্রদেশের নেতৃগণ তরুণ যুবকগণ দেশের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়া লইয়াছেন—তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের অসমাপ্ত কার্য্য যদি আমরা মাথায় তুলিয়া না লই তবে বৃথাই তাঁহাদের এই লাঞ্ছনা। ভগিনীগণ! আমরা সকলেই সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর অংশস্বরূপা। আজ আমাদের শক্তি পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। জগতের ইতিহাসে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহীগণের শক্তির কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখা আছে। যে শক্তির প্রভাবে হাসিতে হাসিতে তাঁহারা জলন্ত চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং যে শক্তির প্রভাবে মৃত স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন, সেই শক্তির উত্তরাধিকারিণী কি আমরা হইতে পারিব না?—নিশ্চয়ই পারিব। কথিত আছে, ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা মৃত স্বামীর প্রাণের সন্ধান এই কামরূপেই পাইয়াছিলেন—এই সেই পুণ্যভূমি। আজ আমাদের দেখিতে হইবে কিরূপে আমাদের সেই শক্তির বিকাশ হয়। আজ আর কথার সময় নাই—কাজে লাগিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন—স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আমাদের একমাত্র অস্ত্র চরকা। সম্প্রতি এই অস্ত্র-চালনেই আমাদের সকল শক্তির নিয়োগ করিতে হইবে। এই চরকা অস্ত্র আজ এই সংগ্রামে আমাদের গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যেদিন ভারতের সুদিন ছিল, যে দিন বিদেশী আমাদের লজ্জানিবারণের বস্ত্র যোগাইত না, সেদিন ভারতের রমণীগণই প্রধানতঃ নিজেদের লজ্জানিবারণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন সভা সমিতি করিয়া তাহাদের এই কার্য্যভার চালাইবার উপদেশ দিতে হয় নাই। আহার বিহার যেমন দৈনন্দিন ব্যাপার, সুতা-কাটা, বস্ত্রবয়ন করও সেইরূপই ছিল—তখন আমরা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত করিয়াও জগতের বিলাসের বসন যোগাইয়াছি। সে সব কথা আজ অতীত

কাহিনী। আজ আমরা নিজেই নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়াছি—বিলাসের মোহে ডুবিয়া আমরা সেই অতীত গৌরব ভুলিয়া গিয়াছি। মহাশক্তির অংশ-স্বরূপিনী হইয়াও আমরা সেই শক্তির খর্ব্ব করিয়াছি। আজ আবার আমাদের সেই লুপ্ত শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে—তাহারই দিন আজ আসিয়াছে। এই বস্ত্র-সমস্যা মিটাইতে না পারিলে আমাদের স্বরাজ লাভ সুদূরপরাহত। বাল্য-কালের স্মৃতি আমার যতখানি আছে তাহাতে আমার মনে হয় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই আসামে জাতি নির্ব্বিশেষে প্রতি গৃহেই চরকা এবং অধিকাংশ গৃহেই তাঁত দেখিয়াছি। তাঁহারা অম্লানবদনে গৃহকার্য্যের অবসরে সূতা কাটিয়া নিজেদের পরিবারের বসনের অভাব দূর করিয়াছেন এবং নিজ হাতের প্রস্তুত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া আপনাদের গৌরবান্বিত মনে করিয়াছে। এখনও আমার আসামী ভগিনীগণ অনেকেই সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়নে সুনিপুণা। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই বিদেশী বস্ত্র আসাম হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিতে পারেন। যাহারা এই কর্ম্মে সুদক্ষা, তাহাদের কেহ কেহ অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া অন্যান্য ভগিনীগণকে যাহাতে এই কার্য্যে দীক্ষিতা করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন।

আমরা যদি এই বস্ত্রসমস্যার সমাধান নিজেরা করিয়া উঠিতে পারি, ভাবিয়া দেখুন যাঁহারা আজ কারাগৃহে বন্দী অবস্থায় আছেন তাঁহারা আনন্দে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিবেন কি না? জাতির অতীত গৌরব যদি আমরা সমবেত চেষ্টায় ফিরাইয়া আনিতে পারি, তবে কারাবাস তাঁহাদের স্বর্গ-বাসের তুল্যই হইবে। আমরা হিন্দু-রমণী স্বামীপুত্রের জন্য হাসিমুখে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। আর আজ তাহাদের ও দেশের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য এই শক্তিতে শক্তিশালিনী কি হইতে পারিব না? আসুন, আমরা এই পুণ্যক্ষেত্রে শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণপণে বিদেশীবর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দীক্ষা গ্রহণ করি—মহাশক্তি আমাদের শক্তি দিবেন।

আর একটী নিবেদন আমার ভগিনীদের নিকট আমার আছে, তাহা এই অস্পৃশ্যতার কথা। আজ ভারতের দুর্দ্দিনের আর একটি কারণ এই ভেদজ্ঞান। এই বৈষ্ণবপ্রধান আসাম প্রদেশে আমায় বুঝাইতে হইবে না—যে আচণ্ডাল সকলকে কোলে টানিয়া লওয়াই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। ত্রেতাতে ভগবান রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সহিত মিতালী পাতাইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপাশে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন; আসামের শঙ্করদেব জাতিতে কায়স্থবংশসম্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণদের

শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, অদ্যাপি এদেশের ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী আছেন। আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নারায়ণজ্ঞানে সর্ব্বজীবে সমভাব দেখাইয়াছিলেন—তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদজ্ঞান ছিল না। চরিত্র-বলই চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করিয় তুলে এবং তাহার অভাবেই ব্রাহ্মণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মার শুচিত্ব বাক্য ও মনে না রাখিলে, শুধু বাহাড়ম্বেই শুচিত্ব রক্ষা হয় না। আমার মন পবিত্র থাকিলে কোন কিছুতেই আমার পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে না, ইহা ধ্রুব। আমরা দুর্দ্দশার এমন চরমসীমায় আসিয়াছি যে মানব যে নারায়ণের অংশ, আমারই মত যাহার রক্তমাংসের শরীর, স্নেহ, প্রেম, মমতা আমারই অনুরূপ, তাহাকে নীচ জাতি বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি। যেখানে গৃহমার্জ্জারের প্রবেশাধিকার আছে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হইয়া তাহার সে অধিকার নাই। সে ঘরে আসিলে গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহাকে স্পর্শ করিলে অবগাহন করিতে হইবে। যতদিন আমাদের এই ভেদ-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন দেশের উন্নতির কোন আশা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ভগিনীগণ, এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি কিছুই নাই? আমরা মায়ের জাতি হইয়া পরমাবৈষ্ণবী ভগবতীর অংশ হইয়া এই নিষ্ঠুর আচার মানিয়া চলিব? তাহা যদি হয় তবে আমাদের মাতৃত্বে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। বহুদিন প্রচলিত এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সংগ্রাম করিতেই হইবে। নারীশক্তি ইচ্ছা করিলে এমন কাজ নাই যাহা করিতে পারেনা—ইহা ত সামান্য দেশাচার। আমরা সকলে একপ্রাণ হইলেই এই নিষ্ঠুর নির্ম্মম দেশা-চার দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আপনারা সকলেই জানেন আচার ব্যবহারে আমাদের পুরুষগণ অত কঠোর নহেন। তাঁহাদের অনেকের মধ্যে অস্পৃশ্যতার দোষজ্ঞান নাই। তাঁহারা অশনে বসনে ইহা বেশী মানিয়া চলেন না—কিন্তু আমরা রমণীগণই এই কুপ্রথাকে সাগ্নিকের অগ্নির মত আমাদের গৃহে জ্বালাইয়া রাখিয়াছি। আমরা যদি একটু উদারতা দেখাই পুরুষের সাধ্য নাই এই কুসংস্কার দেশে পোষণ করিয়া রাখিতে পারেন। এই অগ্নি আমরাই জ্বালিয়াছি—আমাদেরই নিভাইতে হইবে। জননীগণ, একবার ভাবিয়া দেখুন কি নিষ্ঠুরতার খেলা আমরা দৈনন্দিন জীবনে খেলিতেছি। এই কুসংস্কার প্রচলিত থাকিলে দেশের সর্ব্বনাশ। একদল লোককে আমরা হীন করিয়া নিজেরাই হীন হইয়া পড়িতেছি।

নীচজাতি বলিয়া তাহাদের ঘৃণা না করিয়া যদি তাহাদেরও কর্ম্মক্ষেত্রে

টানিয়া আনি, তাহাদের বুঝাইয়া দেই তাহারাও মানুষ, তাহাদেরও আমাদের সহিত একাসনে বসিবার এবং আমাদের সহিত একযোগে কাজ করিবার দাবী আছে—আমাদের সহানুভূতি যদি তাহারা পায়—কার্য্যকালে তাহাদের কাছে আমরাও বঞ্চিত হইব না। মহাত্মা গান্ধী বারে বারে আমাদের এ বিষয় বলিয়াছেন—আমার এ বিষয় অধিক বাহুল্য। দেশের কল্যাণের নিমিত্ত আজ তিনি ইংরাজের কারাগারে বন্দী। তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার এই আমাদের উপযুক্ত সময়। আশা করি তাঁহার এই আদেশ পালন করিয়া তাঁহার উপর শ্রদ্ধা দেখাইতে আমরা কৃপণতা করিব না।

দেশের অন্যান্য নায়কগণ ইতিপূর্ব্বেই বন্দী হইয়াছেন আজ মহাত্মাও কারাগারে বন্দী—কিন্তু সে জন্য ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। বাধাবিপত্তির সম্ভাবনা জানিয়াই ত আমরা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার ধ্রুব বিশ্বাস—যদি আমরা ভীত নিরুৎসাহ না হই, যদি অন্যায় পথে না চলি যদি দেশমাতার আহ্বান আমাদের অন্তরে যথার্থ ই পৌছিয়া থাকে তবে আমাদের শক্তির অভাব হইবে না যিনি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকাকে চালনা করেন বিজয়ীর ভ্রূকুটি, বিজিতের অশ্রুজল কিছুই যাহার সদাজাগ্রত চক্ষুকে এড়ায় না—এই পৃথিবীতে কত অপমানিত পদদলিত ক্ষুদ্র জাতিকে যিনি এক নিমেষে গৌরবের অত্যুজ্জ্বল শিখরে উঠাইয়াছেন আবার কত গর্ব্বী, অত্যাচারী সাম্রাজ্যকে ধূলিশয্যায় লুটাইয়া দিয়াছেন, তিনিই সম্পদ, বিপদ, সুখ, দুঃখের বন্ধুর পথ দিয়া মুক্তির দিকে আমাদিগকে চালনা করিবেন।

লতা

(শ্রীউর্ম্মিলা দেবী)

(১)

লতা আজ আর এ সংসারে নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের করুণ ইতিহাসটুকু আজ আমি সকলের নিকট উপস্থিত না করিয়া পারিলাম না। লতা অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জীবনের সহিত এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া গিয়াছিল যে, আজও তাহার কথা স্মরণ হইলে আমার বুকের খানিক অংশ শূন্য বলিয়া মনে হয়।

শিশুকাল হইতেই লতার স্বভাবটি একটু অদ্ভুত রকমের ছিল। যে বয়সে ক্ষুদ্র শিশুগণ হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া, ঝগড়া মারামারি ও দৌরাত্ম্য করিয়া পাড়া মথায় করে, সে বয়সেও লতা খেলাধূলা ছাড়িয়া নদীর পাড়ে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতেই ভালবাসিত।

ক্ষুদ্র নদীটী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারই তীরে লতাপাতা ঘেরা তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহখানি। গৃহে বৃদ্ধা বিধবা ঠাকুরমা ও বিধবা মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। লতার এক কাকা ছিলেন, তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। পর পর তিনটী মৃত সন্তান প্রসব করিবার পর লতা জন্মিয়াছিল। জীবিত সন্তানকে শুভাগমন উপলক্ষে যখন গৃহ আনন্দোৎসবে মগ্ন তখন সকল আনন্দ নিরানন্দে মগ্ন করিয়া তিন দিনের মধ্যে লতার পিতা দেহ ত্যাগ করিলেন। সেই অবধি সকলেই তাহাকে "অপয়া" অলক্ষণা নামে অভিহিত করিত, কেবল তাহার সদা বিধবা দুঃখিনী মাতা তাহাকে দ্বিগুণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেন। আহা! জন্মিয়া যে একদিনের জন্যও পিতৃস্নেহ পাইল না তাহার মত অভাগিনী জগতে কে আছে, মানুষে কোন প্রাণে তাহাকে দোষী করে! পিতার মৃত্যুর জন্য কি সে দায়ী? তাঁহার অভাবে অন্য কাহারও অপেক্ষা কি তাহার ক্ষতি কিছু কম হইয়াছে, এই সব চিন্তার পর দুঃখিনী বিধবা চক্ষের জলে ভাসিয়া লতাকে বুকে চাপিয়া ধরিতেন।

ক্ষুদ্র লতা একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুর মুখে অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। কেহ কখনও লতাকে উচ্চ হাস্য করিতে শোনে নাই, তাহার সুন্দর মুখ খানিতে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই তাহা ওষ্ঠ প্রান্তে মিলাইয়া যাইত। সে একা একা খেলিতেই ভাল বাসিত, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া তাহার সহিত খেলা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। মা যখন বলিতেন, যা না লতা ওদের সঙ্গে খেল্‌গে যা, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লতা উঠিত। সে মার কথার অবাধ্য কখনও হইত না। কিন্তু পাড়ার শিশুরা যখন দেখিত লতাকে লইলে তাহাদের খেলা মোটেই জমে না তখন তাহারা লতাকে ছাড়িয়া দিত, লতাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত।

সে প্রায়ই নদীতীরে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিত। ক্ষুদ্র নৌকাগুলি পাল তুলিয়া বাতাসের বেগে উড়িয়া যাইতেছে, দুধের মত সাদা হাঁসগুলি পালে পালে সারি সারি সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীগুলি কলরব করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে,—লতা বসিয়া

এই সকল দেখিতে ভালবাসিত। পরপারের ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া অপরিসর রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়া দলে দলে স্ত্রীলোকগণ কলসী কক্ষে জল তুলিতে ও স্নান করিতে আসিত। তাহারা জলে নামিয়া ঝাঁপা-ঝাঁপি করিত, হাসি গল্প, কলহ বিবাদ করিত, কেহ কেহ বা এ উহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া হাসি ঠাট্টা করিতেছে লতা বড় বড় চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া তাহাদের রকম সকল দেখিত। মাঝে মাঝে সে অঁাচল করিয়া ফুল তুলিয়া আনিত, জলে পা ডুবাইয়া ঘাটে বসিয়া ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথিত; গাঁথিতে গাঁথিতে অর্দ্ধ গ্রথিত মালা তাহার শিথিল হস্ত চ্যুত হইয়া কখন যে পড়িয়া যাইত তাহা সে নিজেই জানিত না।

তাহার এই সকল ভাব দেখিয়া, পাড়ার স্ত্রীলোকগণ "বোকা মেয়ে" "হাবা মেয়ে" নামে তাহাকে অভিহিত করিত। সে তাহার ঠাকুরমার কাছে বড় ঘেঁষিত না। পুত্র শোকাতুরা বৃদ্ধা এই অলক্ষণা নাতিনীটিকেই তাহার পুত্রের মৃত্যুর একমাত্র কারণ জানিয়া, প্রথম হইতেই তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না লতা যদি অন্যান্য শিশুদিগের মত হাসির লহর তুলিয়া দুষ্টামী ও নানারূপ ফন্দী করিয়া তাহার ঠাকুরমার চিত্ত জয় করিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না—কিন্তু লতারও সে বিষয়ে কোন চেষ্টা দেখা গেল না। তাহার ক্ষুদ্র শিশু প্রাণে এই নিকটতম আত্মীয়ার সম্বন্ধে একটা ভীতির ভাবই লক্ষিত হইত। তাহাকে অত্যধিক আদর যত্ন করার অপরাধে তাহার মাতার প্রতিও তাহার ঠাকুরমা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পঞ্চম স্বর সপ্তমে তুলিয়া তিনি যখন বধূর উদ্দেশে বলিতেন,—"বলি হ্যাঁগা বৌমা! মেয়ের আব্দার এত কেন তোমার কি একটু লজ্জাও নেই বাছা! যে অপয়া মেয়েটা তোমার অমন দেবতার মত সোয়ামীকে খেলে তাকেই আবার এত যত্ন আত্তি, ধন্য যা হোক! কলিকালে কতই দেখব! আমাদের কালে হ'লে অমন অলুক্ষুণে মেয়ের দিকে কেউ ফিরেও চাইত না" তখন ক্ষুদ্র শিশু ঠাকুরমার কথার অর্থগুলি না বুঝিলেও, মাতার অঞ্চলের আড়াল হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার বিরক্তি পূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। শ্বশ্রূর কর্কশ বাক্যে বধূর শোকক্লিষ্ট হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিত। সে কোন কথার উত্তর দিত না, পাছে চক্ষে অশ্রু দেখিলে শ্বশ্রূ আরও বিরক্ত হন এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি লতাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিত। হৃদয়ের বেদনা যেদিন অসহনীয় হইত সেই

দিন সে ঠাকুরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রু মোচন করিত। সজল নয়নে যুক্ত করে বলিত, "ঠাকুর! পিতৃহীনের পিতা তুমি, আমার এই পিতৃহীনা শিশুর মঙ্গল কর।"

ক্ষুদ্র লতা আর কিছু না হইলেও ইহা বুঝিত ঠাকুরমা তাহার স্নেহময়ী মাতাকে তিরস্কার করিতেছেন। তাই ঠাকুরমার প্রতি তাহার মন আরও বিরূপ হইয়া উঠিত।

লতার গাম্ভীর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিত তাহার মাতার নিকট। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর রাত্রে যখন তাহাদের ক্ষুদ্র শয্যার উপর তাহার মাতা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেন তখন লতার মনের বাঁধন খুলিয়া যাইত। মাতার বুকে মুখ লুকাইয়া সে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথাগুলি মায়ের কাছে বলিত। তারপর নানারূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিত।

(২)

এইরূপে লতা কৈশোরে পদার্পণ করিল। তাহার স্ফুটনোন্মুখ দেহে লাবণ্য উথলিয়া পড়িত নির্নিমেষ নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মাতা মনে মনে বলিতেন—"আজ তুমি কোথায় প্রভু! যে পাঁচ দিনের শিশুকে আমার কোলে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলে আজ তাহাকে দেখিলে যে তোমার হৃদয় গর্ব্বে ও আনন্দে পূর্ণ হইত।"

দ্বাদশবর্ষীয়া লতা নিঃশব্দে গৃহকার্য্য করে, ঠাকুরমার পূজার ফুল তোলে, গৃহ কর্ম্মে মাতার সহায়তা করে, গোপীনাথের পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। এখনও তাহার বদনে তেমনই গাম্ভীর্য্য,—নয়নে তেমনই উদাস দৃষ্টি! তাহার ঠাকুরমাও এখন তাহার উপর সদয়।

লতার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ প্রায়, কিন্তু বিবাহের চেষ্টা ও উদ্যোগ করে কে? তাহার খুল্লতাত বিদেশে থাকেন, দুই তিন বৎসর অন্তর বাড়ী আসেন। কনিষ্ঠ পুত্রবধূর সহিত বৃদ্ধা শ্বশ্রূর কখনও বনাবনি হইত না, সুতরাং পুত্রের কর্ম্মস্থানে তিনি কখনও যাইতেন না। পুত্রও মাসে মাসে খরচের অর্থ প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, মাতা ও বিধবা ভ্রাতৃবধূ এবং পিতৃহীনা লতাকে নিজের নিকট লইয়া যাইবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। তিনি তাঁহার মুখরা স্ত্রীটিকে একটু ভয় করিয়াই চলিতেন। আর বিশেষতঃ গৃহে বিগ্রহের সেবা তো বন্ধ করিলে চলে না। লতার মাতা ও পিতামহী তাঁহার কাছে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া কোন উত্তর না পাইয়া, হতাশ হইয়া যখন

প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন তখন বিধি সুযোগ মিলাইয়া দিলেন।

প্রসাদপুরের জমীদার হরকান্ত চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র নির্ম্মলকান্ত এক বন্ধুর সহিত শিকারে আসিয়া একদিন দৈবক্রমে লতাকে দেখিয়া গেল। সদ্যস্নাতা মুক্তকেশী লতা তখন নদীতীরে পা ছড়াইয়া দিয়া গোপীনাথের পূজার জন্ম মালা গাঁথিতেছিল।

তিন দিন পর জমীদার গৃহ হইতে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যখন লোকজন আসিল, তখন লতার মাতা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া হাতা বেড়ী ফেলিয়া দিয়া তিনি গোপীনাথের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। দুঃখিনীর একমাত্র স্নেহের অবলম্বন কি আজ সত্যই রাজরাণী হইতে চলিল, পরলোক হইতে তাঁহার দেবতা কি আজ সকলই জানিতে পারিতেছেন? তাহা না হইলে বুঝি তাঁহার সুখ সম্পূর্ণ হইবে না।

জমীদার গৃহে বিবাহের সংবাদ শুনিয়া লতার কাকা ছুটি লইয়া আসিলেন। লতার কাকীমা কত যত্ন করিয়া লতাকে সাজাইতে বসিয়া গেলেন। লতাদের পক্ষ হইতে না হইলেও, জমীদারের পক্ষ হইয়া মহাসমারোহে বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেল। জমীদার মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কন্যাপক্ষের ব্যয়-ভার স্বয়ং বহন করিলেন।

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে জামাতার হস্তে কন্যার হস্ত তুলিয়া দিয়া লতার মাতা ছল ছল চক্ষে যখন বলিলেন,—"দুঃখিনীর দুঃখের ধন তোমায় দিলাম বাবা! তাকে যত্ন কোর—আর কি বল্‌ব"—

অশ্রুজলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল নির্ম্মলকান্ত তখন কোন কথা না কহিয়া, দুই হস্তে শ্বশ্রূর পদধুলি লইয়া মস্তকে দিল। তাহার চক্ষুও তখন সিক্ত। আর লতা? লতা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে মাতার অশ্রুবিবর্ণ মুখের দিকে কাতর নেত্রে চাহিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তারপরে লতা বহু সমাদরে, ঢাক ঢোল সানাই মুখরিত, আলোকমালায় সজ্জিত প্রকাণ্ড পুরীতে, পুরনারীর শঙ্খরোলমধ্যে শ্বশুরালয়ে গৃহীত হইল।

প্রাঙ্গণে পালকী লাগিতেই, সহাস্যবদনা শ্বশ্রূমাতা অগ্রসর হইয়া, "এস —এস আমার মা লক্ষ্মী এস—আমার ঘর আলো কর্‌সে"—বলিয়া সাদরে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। স্ত্রী আচার হইয়া গেলে, জমীদার বাবু আসিয়া হীরক মণ্ডিত কণ্ঠহার দিয়া বধূমাতার মুখ দর্শন করিলেন। আনন্দ-

গদ্‌ গদ্‌ কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন,—"আজ দশ বৎসর মা হারা হয়েছি—আজ আবার মা ফিরে পেলাম। কেমন মা—এই বুড় ছেলের মা হ'তে পারবে তো" লজ্জারক্ত নব বধূ লতা অবনত মস্তক আরও অবনত করিল।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী স্ত্রীর প্রথম আলাপ হইল। ফুলশয্যার স্ত্রী আচারাদি সমাপনান্তে আত্মীয়গণ গৃহত্যাগ করিলে পর শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্টা, অবগুণ্ঠিতা লতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিয়া, নির্ম্মল তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে তাহার দিকে চাহিল। লতাও চকিতে একবার স্বামীর প্রতি চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টি অবনত করিল। হাসিয়া নির্ম্মল বলিল,—"কেমন লতা! আমাদের বাড়ীতে এসে তোমার কোন কষ্ট নেই তো?" লতা বড় বোকা মেয়ে, স্বামীকে যে লজ্জা করিতে হয় তাহা সে একেবারেই জানিত না। বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, লতা বলিল,—কষ্ট কই কষ্ট কিছু নেই তো! তবে মার জন্ত বড় মন কেমন করে—বলিতে বলিতে লতার বড় বড় চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। সাদরে তাহার অশ্রু মোচন করিয়া দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া নির্ম্মল বলিল,—

"শীগ্যিরই তো মায়ের কাছে যাবে লতা! কেঁদনা ছিঃ—লক্ষ্মীটি! তুমি কাঁদ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়।"

অষ্টমঙ্গল হইয়া গেলে, লতা পুনরায় পিত্রালয়ে গেল, নির্ম্মলও এবার সঙ্গে গেল। সেদিন লতার বড় আনন্দ! মাতার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছে—আবার সঙ্গে স্বামী! লতা এই কয়দিনেই স্বামী চিনিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালীর মেয়ে বড় শীঘ্র স্বামীর মর্ম্ম বুঝিতে শেখে। পক্ষকাল শ্বশুরালয়ে থাকিয়া, নির্ম্মল বাড়ী ফিরিল। যাত্রার পূর্ব্বে লতার নিকট বিদায় লইতে গিয়া, তাহাকে বাহুবেষ্টনে লইয়া, সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া যখন নির্ম্মল বলিল,—"তবে যাই লতা! আর শীঘ্র দেখা বোধ হয় হবে না। আমি শীগ্যিরই কলকাতায় চলে যাব। বাবার ইচ্ছা এম, এ টা পাশ করা পর্য্যন্ত আর বাড়ী না আসি। আমিও মনে করি তাই ভাল। এই মুখ খানার প্রলোভন বেশী। সে প্রলোভন আপাততঃ ত্যাগ করতে না পারলে পরীক্ষায় পাশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমায় ভুলো না লতা, চিঠি লিখো—আর আমার বাবা ও মায়ের যত্ন কোর।" তখন স্বল্পভাষিণী লতা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল। নির্ম্মল তাহার অশ্রু মোচন করিয়া দিয়া তাহার ফুল্ল কুসুমতুল্য ওষ্ঠাধরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া গৃহ ত্যাগ করিল। তার পর দুই বৎসর লতা কখনও পিত্রালয়ে

কখনও শ্বশুরালয়ে থাকিয়া একটি একটি করিয়া দিন গণিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় আশাপূর্ণ হৃদয়ে কাটাইয়া দিল।

প্রথম বৎসর নির্ম্মল নিয়মিত পত্র লিখিত, দ্বিতীয় বৎসর পত্র ব্যবহার কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। লতা বুঝিল পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই সংযম। সেও অনাবশ্যক প্রশ্ন পূর্ণ পত্র লিখিয়া স্বামীকে বিরক্ত করিল না।

(৩)

দুই বৎসর পর এম এ পাশ করিয়া নির্ম্মলকান্ত হুগলী কলেজের প্রফেসরী পাইয়া গৃহে ফিরিল। জমীদারের পুত্র হইলেও সে নিষ্কর্ম্মী বসিয়া থাকিতে একেবারেই নারাজ। যেদিন দীর্ঘ দুই বৎসর পর নির্ম্মলকান্ত গৃহে প্রত্যাগমন করিল সেদিন লতা যে কি ভাবে সময় কাটাইল তাহা সে নিজেই জানিল না।

জমীদার গৃহে বধুর গৃহ কর্ম্ম করিতে হয় না। তাস খেলিয়া গল্প করিয়াই তাহাদের সময় কাটাইবার কথা। কিন্তু গ্রাম্য বালিকা আজকালকার মেয়েদের মত সেয়ানা নয়। সে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। স্বামীর অনুরোধ "বাবা মার যত্ন কোর" সে মাথায় পাতিয়া লইয়াছিল। তাহার নিপুণ হস্তের সেবা পাইয়া বৃদ্ধ জমীদার একেবারে শিশুর মতই বধুর হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া, "মা মণি।" বলিয়া ডাকিতেন, তখন সহস্র কার্য্যে আবদ্ধ থাকিলেও লতা সব ফেলিয়া আসিয়া শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইত। তিনিও আদর করিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়া, "আজ তোমার এই লোভী ছেলেটির জন্য কি রেঁধেছ—মা?" কিম্বা "অমুক ব্যঞ্জনটা রেঁধ মা মণি! ওটা তোমার হাতে যেমন হয় তেমন আর কারও হাতে হয় না—"আজ আমার পূজোর সাজ তুমি করনি—না মা? আমি আগেই জানি। আমার মায়ের হাতে কি অমন বিশ্রী সাজ হ'তে পারে? আজ আমার ভাল করে পূজাই হয় নি। কাল থেকে সব কাজ ফেলে তুমি আমার পূজোর সাজ করবে—কেমন মা মণি?"লতা অমনি আনন্দোৎফুল্ল বদনে মৃদুস্বরে বলিত—হাঁা।

লতা দরিদ্রের গৃহে প্রতিপালিতা,—অল্প বয়সেই রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিতে শিখিয়াছিল। সে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্বশুর সকলকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইত। জমীদারের প্রকাণ্ড পুরী, নিকট ও দূর সম্পর্কীয় বহুবিধ আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ থাকিত। লতা সাধ্যমত তাঁহাদের সকলেরই পরিচর্য্যা

করিত। তাঁহারাও তাহার সেবায় প্রীত হইয়া তাহাকে "লক্ষ্মী—বৌ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

নির্ম্মলকান্ত দীর্ঘ দুই বৎসর পর বাড়ী আসিতেছে, জমীদার গৃহে আজ আনন্দোৎসব ভোর হইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাল লইয়া জেলেরা আসিয়া পুকুরে জাল ফেলিল। জমীদার মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বড় বড় কয়েকটি মাছ রাখিয়া অন্যান্য সব মাছ পুনরায় ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। জমীদার গৃহিনী স্বয়ং অদ্য রন্ধনশালায় উপস্থিত আসিয়া রন্ধনাদির তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এবং "মা-লক্ষ্মি! এটা কর" "ওটা কর" বলিয়া লতাকে উপদেশ দিতেছেন। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিয়া পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের তরঙ্গ ওঠে, তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? তিনি সকল কর্ম্মে ব্যবহৃত থাকিলেও, শকটের শব্দ শুনিবার জন্য তাঁহার কর্ণদ্বয় উদ্গ্রীব হইয়া আছে। মদন গোয়ালা জমীদার বাড়ীর বংশানুক্রমিক গোয়ালা। ফরমাইসি দই লইয়া উঠানে প্রবেশ করিয়া বলিল,—

"মা ঠাকরুণ দই এনেছি গো। এই দই খানা দাদাবাবুর জন্য ভিন্ন করে পেতেছি—তিনি মোর দই খেতে বড় ভালবাসে। আহা দুবচ্ছর দাদাবাবুর মুখ দেখিনি তিনি কখন এস্‌বে গো?"

সহাস্য বদনে গৃহিনী বলিলেন,—

"এই এল ব'লে। বেলা দশটার টেরেনে আসবার কথা—বাড়ী পৌঁছুতে বোধ হয় এগারটা হবে। তা দশটা বোধ হয় বাজে।" দূরসম্পর্কীয়া এক ভাগিনেয়বধূ বঁটি পাতিয়া আলু কুটিতেছিলেন। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গৃহিনী বলিলেন, "রাঙ্গাবৌ! দই ক খানা ভাঁড়ারে তুলে রাখ বাছা! কামিনী মদনকে খান কয়েক পুকুরের মাছ দিয়ে দাও তো মা!"

লতা ভাঁড়ার ঘরের এক কোনে বসিয়া খাশুড়ীর নির্দ্দেশ মত, ঠাকুরের বাল ভোগের, ক্ষীর ছানা মাখন ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যাদি গুছাইতে ছিল। সে ধীরে ধীরে খাশুড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল,—

"দু খানা দই নিরামিষ ঘরে দিয়ে এলে হয় না মা?"

খাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন,—

"ঠিক বলেছ মালক্ষ্মি! আমার কি সব কথা ছাই এখন মনে থাকে? যাও তো মা, রাঙ্গা বৌকে বলে এস। আর সন্দেশ বুঝি এখনও আসেনি এরা যে কি করে, সময় মত কিছুই আর এদের দিয়ে হয় না।"

মৃদুস্বরে লতা বলিল,—"আমি দেখ্‌ছি মা"! লতা সংবাদ লইয়া জানিল সন্দেশ বহুক্ষণ আসিয়াছে। সে দুই হাঁড়ি দই ও কিছু সন্দেশ নিজ হস্তে নিরামিষ ঘরে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া খাশুড়ীকে জানাইল সন্দেশ আসিয়াছে। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

লতা ও নিশ্চিন্তা হইয়া তখন তাহার নিয়মিত রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আজ স্বামী প্রথম তাহার হাতের রান্না খাইবেন,—লতা কত রকম করিয়া কত ব্যঞ্জন রাঁধিল তবু তাহার তৃপ্তি নাই। কেবলই মনে হইতেছে "এটা ভাল হয় নাই" "ওটা ভাল হয় নাই।" যত্ন করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে বড় সুখ। এ সুখের স্বাদ যে কখনও পায় নাই তাহার বড় দুঃখ। লতা রাঁধিতে রাঁধিতে এই কথাই ভাবিতে ছিল।

এমন সময় বহির্ব্বাটিতে কোলাহল উঠিল, 'ছোট বাবু এসেছে" "ছোট বাবু এসেছে।" লতার বুকের রক্ত, দ্রুত চলিতে লাগিল, সে স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্ম দেবতার উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর তার সময়টা যে কেমন করিয়া কাটিল তা, সে জানিল না। নির্ম্মলকান্ত আহারে বসিলে তাহার শ্বাশুড়ী যখন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মি! তোমার রান্না তরকারী দিয়ে যাও" তখন সহস্র চেষ্টায়ও সে উঠিতে পারিল না। তাহার পা দু খানা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। বামন ঠাকরুণ আসিয়া ব্যঞ্জণ পরিবেশন করিল। রাঙ্গাবৌ আসিয়া হাসিয়া বলিল, "তোর কি হয়েছে নতুনবৌ; উঠতে কি পারিস না; যা না ঐ ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে একটু দেখে আয় সে ঘরে এখন কেউ নেই যা জন্ম সার্থক করে আয়।" সে কোন উত্তর দিল না,—তাহার বাক্‌শক্তিও যেন কে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। রাঙ্গাবৌ তাহার হাত ধরিয়া অনেক টানাটানি করিল,—অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আহারে বসিয়া নির্ম্মলের চঞ্চল চক্ষু দুটি যেন কিসের আশায় ব্যস্ত হইয়া এদিক ও দিক করিতেছিল। কিন্তু চক্ষুর আশা পূর্ণ হইল না, নিরাশ হইয়া তাহারা আবার ভাতের থালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। ঠিক সেই সময়েই মাতা ডাকিলেন,—"মালক্ষ্মি তোমার রান্না তরকারী দিয়ে যাও।" কিন্তু হায়! "মালক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে বামুন ঠাকরুণ গেল।

আহারান্তে আচমন করিয়া নির্ম্মলকান্ত বলিল,—"আমি তবে এখন একটু

বৈঠকখানায় যাই মা! অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য বসে রয়েছে। বাবার কি খাওয়া হয়নি?"

"না– তার এখনও পুজো হয়নি। তুমি বেশীক্ষণ বাইরে থেকোনা বাবা কাল রাত্রে ঘুম হয়নি আজ দুপুরে একটু ঘুমুতে হবে।" ঈষৎ হাসিয়া নির্ম্মল বলিল,—"আচ্ছা মা।"

বাহিরে যাইবার সময়ও তাহার সোৎসুক দৃষ্টি সকল গুলি দরজার আড়ালে একবার করিয়া উঁকি মারিয়া গেল, কিন্তু যাহার সন্ধানে সে দৃষ্টি ফিরিতেছিল সে তখনও রান্না ঘরে অসাড় হইয়া বসিয়া আছে।

বামাদাসী যখন আসিয়া তাহাকে বলিল, "বলি হ্যাঁগা বৌদি, অমন করে পাথরের মত আর কতক্ষণ বসে থাকবে? মা যে তোমায় ডাকৃতে লেগেছে—কত্তাবাবুর খাওয়ার ঠাঁই হয়েছে"—তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে লজ্জিত হইয়া শশব্যস্তে উঠিল,—শ্বশুরের আহারের দ্রব্যাদি লইয়া যখন সে আহারের স্থানে উপস্থিত হইল তখনও তাহার পা দুখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। শ্বশুর আহারে বসিলে সে অভ্যাস মত পাখা হস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতে বসিল। কিন্তু আজ সে বড়ই অন্যমনস্ক, ব্যজনী থাকিয়া থাকিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল।

আহারান্তে নিত্যকার মত শাশুড়ীর পদসেবা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি বলিলেন,—"আজ আর দরকার নেই মা, আজ তুমি বরং তোমার মা'র কাছে চিঠি লেখ গিয়ে—অনেক দিন তো চিঠি লেখনি।" লজ্জায় লতার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল,—সে শাশুড়ীর কথার অর্থ বুঝিয়াছিল।

কম্পিত পদদ্বয় টানিতে টানিতে লতা তাহার শয়ন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। ঈষৎ মুক্ত দ্বারাভ্যন্তর দিয়া সে দেখিল স্বামী শয্যায় শয়ান। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিল। শয্যাপ্রান্তে নির্ম্মল নিমীলিত নেত্রে শয়ান, দেখিয়া বোধ হইল নিদ্রিত। লতা অতি সন্তর্পণে গিয়া শয্যার অপর প্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে এখন কি করিবে ঠিক বুঝিতে পারিল না,—একটু অভিমানও যে না হইল তাহা নয়। সে অঞ্চল প্রান্ত খুটিতে খুটিতে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। সহসা শয্যা ঈষৎ নড়িয়া উঠিল,—পরক্ষণেই দুখানি বিশাল বাহুর কঠিন বেষ্টনে সে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আবেশ বিহ্বল লতাকে বুকে টানিয়া লইয়া, স্বামী চুম্বনের পর চুম্বনে সেই সুন্দর মুখখানা প্লাবিত করিয়া দিলেন। আনন্দে অর্দ্ধ মূচ্ছিত প্রায় লতা নিমীলিত নেত্রে সেই আনন্দ উপভোগ করিল। ক্রমশঃ

অন্বেষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী]

১৫

কোন গোপী হ'ল পুতনার মত
কেহ বা তাহার স্তন পান রত
যশোদা দুলাল প্রায়,
কেহ বা শকট অসুর সাজিল
কাঁদি শিশু সম কেহ বা হানিল
চরণ আঘাত তায়।

১৬

কেন হ'ল বালনন্দ কুমার
কেহ গোপী তৃণাবর্ত্ত আকার
তাহারে হরণ করে,
কেহ রাম কেহ কৃষ্ণ সাজিয়া
কিঙ্কিণী রবে হামাগুড়ি দিয়া
চলে বন পথ পরে!

গোচারণ-রত রাখালের মত
হৈ-হৈ রবে চলে গোপী কত
গোষ্ঠের অভিনয়,
কেহ বক কেহ বৎস অসুর
কেহ বাল-লীলা আচরি বঁধুর
বুঝি বা জীবন লয়।

১৭

গোঠ ছাড়ি ধেনু দূরে চলে যায়
ফিরাতে তাহারে বাঁশরী বাজায়
কৃষ্ণ-ভাবিনী কেহ,
ঘিরি তারে যত ব্রজবালা আর
"সাধু-সাধু-সাধু" বলে বার বার
বেপু-পলকিত-দেহ।

কোন বিনোদিনী বঁধু-ভাবে ভোর
চলে বন পথে চথে প্রেম-ঘোর
কারো কাঁধে রাখি হাত,
চলিতে চলিতে তন্ময়-হিয়া
বলে—"আমি কালা দেখনা চাহিয়া
তেমন চরণ-পাত।"

১৮

"বরষণ ঝড়ে না করিয়ো ডর
রক্ষার ভার আমার উপর"
বলি কেহ মধুস্বরে
অম্বর নিজ তুলি শিরপর
ধরিল যতনে—যেন গিরিধর
ধরে গিরি এক করে।

কেহ চড়ি কার মাথার উপরে
আক্রমণ করি লঘুপদভরে
কহিছে ক্রুদ্ধবাণী
"রে পামর অহি! কর পলায়ন
জান না কি মোর গোকুলে জনম
শাসিতে কপট প্রাণী?"

১৯

কালীয়-দমন চলে অভিনয়,—
হেনকালে কেহ বাহু তুলি কয়
আসি সকলের আগে
"ওই চারিদিকে জ্বলে দাবানল,
রহ আঁখি মুদি, এখনি শীতল
করিব নিমেষ ভাগে।"

২০

কোন গোপী যেন মাতা যশোমতী
কহিতে লাগিল হ'য়ে রোষবতী
"আরে আরে ননী চোর!
ভাণ্ড ভাঙিয়া চুরী করি ননী
কোথা যাস্? তোরে বাঁধিব এখনি"
বলিয়া মালিকা ডোর
খুলিয়া বাঁধিল কোনো তরুণীরে
গোপী উদুখলে; আঁচলে অচিরে
ঢাকিয়া বদন সুচারু নয়ন
অমনি তরুণী শিশুর মতন
ভয়-ভান করে ঘোর।

২১

গায়িতে গায়িতে কৃষ্ণনাম
পুছিতে পুছিতে কৃষ্ণধাম
চলে গোপী বন পথ দিয়া
চরণ-কমল খিন্ন;
চলিতে চলিতে বন পথে
সহসা পড়িল আঁখি-পথে
বিস্ময়ে হৃদি চমকিয়া
বঁধুর চরণ-চিহ্ন!

একে কহে আরে—"শোনো, শোনা,
যিনি জগতের প্রাণ মন
নন্দ-ভবন আলোকিত
তারিতে ভুবন দীর্ণ,
পদ্মাঙ্ক তাঁর ওই সখি!
ধ্বজ অঙ্কুশ দেখ লখি,
এ'ত আর কোথা নাহি ছিল
তাঁহার চরণ ভিন্ন।

২২

পরাণ বঁধুর পদাঙ্ক ধরি
কৃষ্ণ-পদবী ঢুঁড়ি চলে,
কার পদরেখা পড়ে মরি! মরি!
সমুখে সহসা আঁখিতলে?
বঁধুর মধুর পদ-বিজড়িত
এ কোন্ বধূর পদ-চীন?
কারে ল'য়ে বঁধু লুকা'ল চকিত?
ভাবে সবে মুখ বিমলিন।

২৩

কহে কোনে ব্রজ বালা
"নাথের গভীর পদ রেখা মাঝে
এ কাহার লঘু পদাঙ্ক রাজে
কানন করিয়া আলা?
মনে হয় হেরি যুগ পদ আজ
করিণীরে ল'য়ে যেন গজরাজ
গেল সে নির্জ্জন বনে,
বুঝি সে কান্তা পতনের ডরে
কান্তের কাঁধে রাখি বাম করে
চলে পথ বঁধু সনে।

২৪

"ধন্য তাহার ভাগি!
ধন্য তাহার মধুরারাধনা
বঁধুরে করিল যাহার সাধনা
একান্ত অনুরাগী।
যিনি ঈশ্বর যিনি ভগবান্
যিনি গোবিন্দ জগত পরাণ
মো' সবে ফেলিয়া দূরে

সেই স্বভাগিনী নারীরে লইয়া
একাকী পশিলা রমণ মাগিয়া
নিরজন বন-পুরে।

২৫

ধন্য এ ধূলি-কণা!
এরা গোবিন্দ-চরণ-পরশ
ধরিল পুলকে পাতিয়া শিরস
পরম পুণ্যমনা।
আপনি কমলা ব্রহ্মা মহেশ
গোষ্ঠে ধরিয়া রাখালের বেশ
যে পদ-সরোজ চুম্বিত রজ
প্রেমভরে মাথে গায়,
ভাগ্যের ফলে মিলিল তা' যদি
এস, এস সখি! মাখি নিরবধি
লুণ্ঠন করি তায়।"

২৬

অপরা গোপী কহে—"বোলোনা হেন আর,
শুনিয়া তোর কথা জাগে যে মনে ব্যথা,
এই কি সমুচিত বলনা হো'ল তার?
ব্রজের গোপীগণ সঁপিল প্রাণ মন
যাহারে, সেই ধন একা সে চুরি করি
গোপনে প্রাণ ভরে' সে সুধা পান করে,
কেমন নারী সে যে বল না সহচরি?

২৭

"হের লো হের সখি!
চরণ-রেখা তার
থামিল হেথা আসি,
চোখে না পড়ে আর

বুঝি বা দূর পথ
গমনে হীন-বল
বিঁধিল তৃণ-শিখা
চরণ সুকোমল।
তাহারে পথ মাঝে
কাতরা হেরি সখি!
বাঁধিয়া বাহু পাশে
বহন করিল কি?
"তাই কি গুরু ভারে
গভীর পদ-রেখা
শুধু লো বঁধুয়ার
ভূতলে যায় দেখা।
দেখ লো দেখ চেয়ে
আবার কিছু দূরে
দোঁহার লঘু পদ
চিহ্ন এল ঘুরে।
বধূরে দিতে বুঝি
কুসুম উপহার
কুসুম-তরু তলে
নামা'ল সুখ-ভার?

২৮

"অগ্র পদ পরে
দাঁড়ায়ে বুঝি ছিল,
নিম্ন শাখা ধরি
কুসুম পেড়েছিল।
হের লো হের সখি!
তাহার পরিচয়
বঁধুর পদ-পাত
পূর্ণ হেথা নয়।

২৯

"তরুর তলা হেরি
হয় লো অনুমান
বসিয়া নটবর
বসা'রে জানু'পর
কামিনী-মুখ-মধু
করিয়া ছিল পান।

প্রিয়ার কেশ পাশে
চয়িত ফুলরাশে
বাঁধিয়া দিল চূড়া
সোহাগে শির প'রে,
"দোঁহার সুখে সুখী
দুজনে মুখোমুখী
চাহিয়া ছিল—হেথা
বসিয়া ক্ষণ তরে।

হের লো হের ধনি!
নূপুর রণ রণি
চপল পদে উঠি
যুগলে গেছে চলি।
নিভৃত নিরজন
শীতল ছায়া ঘন
কুঞ্জে বুঝি কোনো—
চিহ্ন দিল বলি।"

৩০

দেখিতে দেখিতে দেখাতে দেখাতে
এরূপে নাথের চরণ-চীন্
অনুসরি চলে সুন্দরী দলে
কাননে বাহ্য চেতনা হীন।

হেথা বহুদূরে ফেলিয়া সবারে
যারে লয়ে বঁধু গেল একাকী,
দিল বিচিত্র রমণের স্বাদ
রাখি বুকে কভু আড়ালে থাকি।

আপনার মাঝে রমণ যাহার
তিরপিতি যাঁর আপনা মানে,
আপনাতে পরি পূর্ণতা যাঁর,
কাম্য তাঁহার কোথা বিরাজে ?

কামাতীত তবু কামুক সাজিয়া
কামীর দীনতা সহিলা সুখে,
অসীম দৈন্যে অসম সাহস
উপজিল তাহে কামিনী বুকে।

৩১

গোকুল চাঁদের সকল অমিয়া
একাকিনী ধনী পাইয়া হাতে
ভাবিতে লাগিল—সবারে ছাড়িয়া
বধু বাটে সুধা তাহার সাথে।

ভাবিতে লাগিল—চাপি কাম-রথে
আইল কত না গোকুল নারী;
বঁধু শুধু তার হইলা সারথী
বৃন্দা বিপিনে সবারে ছাড়ি।

ভাবিতে ভাবিতে গরব বাড়িল,
ভাবিল—তাহার তুলনা নাই;
কহে গরবিনী—"চলিতে না পারি,
নিয়ে চল মোরে, তবেত যাই।"

৩২

ধনীর সে ধ্বনি শুনি
হাসি কহে প্রাণ-নাথ :—
"এস,—এস প্রিয়তমে!
এই ত পাতিনু কাঁধ।"

যেমনি চরণ তুলি
তরুণী চড়িতে যায়,
অমনি লুকা'ল কালা—
কাঁদে ধনী উভরায় :—

৫৩

"না-থ! না-থ!" [অ]
রমণ! রমণ! [অ]
প্রিয়তম! প্রিয়তম!
দে—হ দে—হ
দরশ দরশ
মহাভুজ পরশন।
"কোথা আছ তুমি?
এস এস এস
তোমার দাসীর পাশ,
বাঁচিব কেমনে
জড়া'য়ে কণ্ঠে
তোমার বিরহ-পাশ?"

৫৪

তখন গোপিগণ [অ]
করিছে আগমন
নন্দ-নন্দন—
চরণ অঙ্কন ধরিয়া;
হেরিলা হ'তে দুর [অ]
বিষাদ—পরিপুর
হৃদয় শত চুর
কে ধনী পথ শেষে পড়িয়া!
নিকটে আসি তার [অ]
চিনিল মুখ তার
শুনিল মুখে তার
বঁধুর সুমধুর ছলনা;

কেমনে হত-মান
মাধব দিলা মান
কেমনে অভিমান
করিল বঁধু-হারা ললনা!

৩৫

তাহার দশা স্মরি
নয়নে পড়ে ঝরি
আকুলা গোপিকার আঁখি-জল;
তুলিয়া, ধরি করে,
কানন পথ পরে
আবার চলিল রে গোপিদল।

চাঁদিনী যত দূর
উজলে বন-পুর
বঁধুরে মিলি সবে ঢুঁড়িল রে!
গহন বন-লীন
বঁধুর পদ-চীন্
যখন তমো বুকে মিশিল রে,
আসিল ফিরি তারা;
অবলা গোপিকারা
ভবন তবু নাহি ভাবিল রে!

৩৬

বঁধুতে বাঁধা মন
বঁধুর আলাপন
বঁধুর পথ'পর
নয়ন তৎপর
বঁধুতে সঁপি প্রাণ
বঁধুর করি গান
ভবন-স্মৃতি কার
জাগিল নাহি আর।

৩৭

কৃষ্ণময়ী মরি !
  কৃষ্ণ-বিভাবিনী
কৃষ্ণ-আগমন—
  কেবল কাহিনী
যমুনা তটে পুন
  মিলিয়া গোপিগণ
করিতে লাগিল রে
  কৃষ্ণ কীর্ত্তন।

নারী

(আর্থার শোপেনহাউয়ের্ হইতে

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

শিলারের 'নারী-বন্দনা' (Wirde der Franen) কবিতাটী ভাষাগৌরবে ও ভাববৈচিত্র্যে অতি সুন্দর ; কিন্তু আমার মতে জুয়ি'র (Jouy) একটী ছোট কথা নারীর যথার্থ গৌরবটী প্রকাশ করেছে—'নারী ছাড়া আমাদের জীবনের বিকাশ অসম্ভব, জীবনের মধ্যভাগে কোনই আনন্দ থাকবে না, শেষভাগে কোনই সান্ত্বনা থাকবে না।' কবি বায়রন্ 'সারডানাপেলসে'ও এই কথাটী অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন—

নারীর হৃদয় হতে জীবনের প্রথম বিকাশ
তাহারি অধর হতে আধো ভাষা পেয়েছি বিলাস।
অশ্রু মুছি, শ্বাস সহি, সর্ব্বদা পাশেতে রহি
জীবনের সন্ধ্যাকালে পাপেতাপে দিবে সে আশ্বাস।'

(প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

এই দুইটী উক্তিই নারীকে ঠিকমত বোঝবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

নারীর দেহের গঠনটা একবার ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় যে সে দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম সইবার জন্য সৃষ্ট হয়নি। কাজের দ্বারা তার

জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না,—দুঃখ সহা, সন্তানপ্রসব করা, সন্তান পালন করা ও স্বামীর অনুগামিনী হওয়া থেকেই তার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। স্বামীর সে নিত্য-সহনশীলা আনন্দদায়িনী সখী। জীবনের তীক্ষ্ণতম সুখ বা দুঃখ তার সহ্য হয়নি। কোন বিষয়েই তাকে বেশী শক্তিপ্রয়োগ করতে হয় না। তার জীবনের ধারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশী সরল, সহজ ও শান্তিময়—বেশী সুখী বা বেশী দুঃখী হবার তার প্রয়োজনই নেই।

নারীরা স্বভাবতঃই শিশুর মত খামখেয়ালী ও অদূরদর্শী বলে' তারা যে আমাদের বাল্যকালে ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরূপে কাজ করতে অধিকতর উপযুক্ত তা-ও বেশ বোঝা যায়। সারাজীবন ধরে তারা ঠিক বয়স্ক শিশুর মতই থাকে—শিশু ও পরিণত বয়স্ক লোকের মাঝামাঝি অবস্থা। দেখো—কতদিন ধরে' একজন তরুণী একটা শিশুকে নিয়ে আদর করে, তার সঙ্গে নাচে, গান করে খেলা করে—তারপর সেই স্থানে একটা পুরুষকে বসিয়ে ভেবে দেখো যে তার দৌড় কদিন পর্য্যন্ত যায়।

তরুণ বয়সের নারীদের প্রকৃতি যে দানটী দিয়েছেন, নাট্যকারের ভাষায় সেটাকে 'উজ্জ্বল দৃশ্য' বলা যেতে পারে; কয়েক বছর মাত্র তাদের মনোমোহন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য-সম্পৎ দান করে, বাকী জীবনটা প্রকৃতি তাদের একরকম খর্ব্ব করেই রাখে। এই ক'বছরের মধ্যে তারা পুরুষের মন এমন ক'রে হরণ করতে পারে যে তারা নারীদের সঙ্গে আজীবন একটা বন্ধনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়ে, অথচ এ বন্ধনের মূলে কোনও বিশেষ সঙ্গত কারণ নেই। সে জন্য অন্যান্য প্রাণীর মত অসহায়া নারীকেও জীবনসংগ্রামে যোঝ্‌বার জন্য প্রকৃতিরাণী কতকগুলি অস্ত্র দিয়েছেন। কিন্তু অন্য স্থানের মত এখানেও প্রকৃতিরাণী নিজ স্বভাবসিদ্ধ মিতব্যয়িতা দেখিয়েছেন। প্রজনন-ক্রিয়া হয়ে গেলেই স্ত্রী-মক্ষিকা যেমন তার পক্ষদুটী হারায়, কারণ আর তাদের কোনো প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ প্রসবের পক্ষে তারা অন্তরায়বিশেষ; তেমনি দু'একটী সন্তান প্রসব করা হলেই নারী সাধারণতঃই তার যৌবন-সমৃদ্ধি সেই একই কারণে হারায়।

সেইজন্য আমরা দেখি যে তরুণী নারীরা সংসারের কাজ বা যে কোনও কাজ খেলাচ্ছলেই করে থাকে—তারা যে কাজটা খুব অন্তরের সহিত মন দিয়ে করে সেটা ভালবাসা, বা পুরুষের মন জয় করা, বা ইহারই আনুষঙ্গিক কোন কাজ—যেমন সৌখীন পোষাক পরা, সঙ্গীত নৃত্য ইত্যাদি।

কোন জিনিষ গৌরবময় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে হলেই তার বিকাশে সময়

লাগে। আটাশ বছরের পূর্ব্বে পুরুষের সাধারণতঃ বিবেকবুদ্ধি ও মানসিক বৃত্তি পরিপুষ্টিলাভ করে না; নারীর কিন্তু আঠারো বছরেই এ ব্যাপারটী শেষ হয়ে যায়। এবং নারীর পক্ষে এই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ পুরুষের চেয়ে অনেক কম হয়। সেজন্য সারাজীবন ধরে' নারী শিশুই থেকে যায়; খুব কাছে যেটা আছে, বর্ত্তমানের সঙ্গে সেটা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট—এ ছাড়া তারা আর বড় বেশী কিছু দেখতে পায় না, তাই ছায়াকেই তারা কায়া বলে ভ্রম করে তুচ্ছ বিষয়কে মনে করে খুব গুরু বিষয়। পুরুষ কিন্তু এই বুদ্ধিবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির বলে ইতর পশুর মত কেবল নিকটের জিনিষই দেখে না,—সে চারিদিকে চেয়ে থাকে, তার দূরদৃষ্টি চলে যায় ভূত ও ভবিষ্যতের পানে। তাই পুরুষের চিন্তা, ভাবনা ও প্রজ্ঞার পরিণতি এত বেশী। এ সব গুণগুলি পুরুষের অনুপাতে নারীর খুবই কম। তাই যে ঘটনা আসলে ঘটেনি বা হয়ে গেছে, বা হবে—তার প্রভাব নারীর মনে একরকম নেই বললেই হয়। এই কারণে নারীরা অনেক সময় অমিতব্যয়ী; নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য তারা অনেক সময় এমন সব কাজ করে' বসে, যাতে মনে হয় যে তারা একেবারে পাগল। মনে মনে নারীরা ভাবে যে পুরুষের কাজ পয়সা উপায় করা, আর তাদের কাজ সেই পয়সা খরচ করা।—এ কাজটা স্বামীর জীবিতকালে হয়ত ভালই, নইলে স্বামীর মৃত্যুর পরে। স্বামী অর্থ উপায় করে' এনে তাদের হাতে দেয় বলেই তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায়।

এ বিষয়ে যতই মতভেদ থাক না কেন, নারীর স্বপক্ষে কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে পুরুষের চেয়ে নারী বর্ত্তমানের মোহে বেঁচে থাকতে বেশী ভালবাসে। ইহাই নারীর স্বাভাবিক প্রফুল্লতার কারণ,—এই জন্যই নারী পুরুষের আসর-বাসরে চিত্তবিনোদন করে, ও সে যখন চিন্তা ও দুঃখের ভারে অবনত হয়ে পড়ে তখন তাকে মধুর সান্ত্বনা দেয়।

বিপদের সময় রমণীর পরামর্শ লওয়া মন্দ নয়। পূর্ব্বকালে জার্ম্মানরা ইহা করত। কারণ তাদের দেখবার ভঙ্গিটী ত আমাদের মত নয়, তারা কার্য্য-সিদ্ধির জন্য যেটা সরল ও সোজা পথ সেইটেই বেছে নয়, আর যেটা চোখের কাছেই পড়ে আছে, তা'তেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করে। পক্ষান্তরে আমরা সুদূরের দিকে চেয়ে দেখি ও হাতড়ে মরি। এ বিষয়ে ঠিক সিদ্ধান্তটীতে পৌঁছিতে হলে নারীর সাহায্যই আমাদের বেশী প্রয়োজন।

একটা বস্তু বা ব্যাপারের মধ্যে যাহা প্রকৃতই বর্ত্তমান, নারী তাহাই স্পষ্ট

দেখতে পায়, আমরা কিন্তু উত্তেজিত হয়ে পড়লে কোনও বস্তু বা ব্যাপার অতিরঞ্জিত ভাবে দেখে নানা দুঃখের সৃষ্টি করি।

বিবেচনা বুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশতঃই নারী পুরুষের চেয়ে বেশী সমবেদনাপরায়ণ; অভাগা দুঃখীদের প্রতি তার বেশী করুণা। কিন্তু ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি হিসাবে সে পুরুষের চেয়ে ঢের ছোট। বিবেচনাশক্তি দুর্ব্বল বলেই বর্ত্তমানের ঘটনা সমবায় তাদের এমন করে মুগ্ধ করে রাখে; আর এই জন্যই চিংাশক্তির উন্মেষ, স্থির ব্যবহারবুদ্ধি, দৃঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ভূতভবিষ্যৎ বা অনাগত সুদূরের প্রতি অচলাদৃষ্টি—এ সব কিছুই নারীর চরিত্রে পরিস্ফুট হতে দেখা যায় না।

সুতরাং স্ত্রীচরিত্রের প্রথম ও প্রধান দোষ হচ্ছে—ন্যায়বুদ্ধির অভাব। পূর্ব্ব-প্রদর্শিত কারণ ছাড়া এর আরও একটা কারণ দেখা গিয়েছে যে প্রকৃতি তাদের দুর্ব্বল করেই সৃষ্টি করেছেন। তারা নির্ভর করে চাতুর্য্যের উপর শক্তির উপর নয়,—সেজন্যই তাদের একটা স্বভাবসিদ্ধ ছলনাবুদ্ধি আছে, যার দ্বারা তারা মিথ্যাকে সত্য বলতে একটুও ভয় পায় না। সিংহের যেমন নখদংষ্ট্রা, হস্তীও ভল্লুক যেমন তুণ্ড, ষণ্ডের সিং, কাট্‌ল্‌-মাছের ধূম্রবর্ণের লালানিস্রাব,—তেমনি প্রকৃতি নারীকে রক্ষা করবার জন্য দিয়েছেন,—ছলনাবুদ্ধি। পুরুষের দৈহিক শক্তি ও বিবেচনাবুদ্ধি নারীর মধ্যে এইরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। ছলনাবুদ্ধি নারীর সহজাত সংস্কার বিশেষ,—ইহাতে তার দুর্ব্বুদ্ধি ও চাতুর্য্য—দুই-ই ফুটে উঠেছে। পূর্ব্বোক্ত পশুরা আক্রান্ত হলে যেমন ঐ প্রহরণগুলি ব্যবহার করে নারীও সেইরূপ প্রতিবারেই তার ছলনাবুদ্ধি প্রকাশ করে। সে জন্য সম্পূর্ণ সত্যপ্রিয়া ও ছলনাহীনা নারী জগতে বড়ই বিরল। আবার একজন নারী ছলনাময়ী হলে' অন্য নারী তার সঙ্গে বেশ বুঝেই চলে। তাই গোড়ার এই দোষ থেকে নারী চরিত্রে নানা দোষের উদ্ভব হতে পারে, যেমন—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। আদালতে দেখা যায় যে নারীর দ্বারাই বেশীর ভাগ জাল-জুয়াচুরি অনুষ্ঠিত হয়। বিচারের পূর্ব্বে আদালতে নারীদের হলপ্-করানো উচিত কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে জগতে কোনও অভাব নেই অথচ অনেক নারী দোকান-ঘরের কাউণ্টারের উপর থেকে অন্যের অজ্ঞাতসারে জিনিষপত্র নিয়ে সরে পড়ে।

প্রকৃতির নিয়ম এই যে পুরুষের মধ্যে যারা তরুণ, সুন্দর ও শক্তিমান, কেবল তারাই বংশজননের পক্ষে উপযুক্ত, কারণ তাহলে আর বংশের

ধারা দোষদুষ্ট হতে পারবেনা। প্রকৃতির এই দৃঢ় উদ্দেশ্যটী নারীর আসঙ্গ লিপ্সার ভিতরে দিয়ে বেশ ভাল করেই প্রকাশিত হয়েছে। এর চেয়ে পুরাতন বা সুদৃঢ় নিয়ম আর নেই। এ নিয়মের বিরুদ্ধে কোন পুরুষ কখনো মাথা তুলতে পাবেনা। গোপনীয় ও অপ্রকাশিত হলেও যে নিয়মটী সঙ্গোপনে নারীর মনে কাজ করে যায়, তা কতকটা এই রকম—'জনন-ক্রিয়ার দাবী নিয়ে পুরুষেরা আমাদের উপেক্ষা করে, ন্যায়তঃ তাই আমরা তাদের প্রতারিত করতে বাধ্য। আমাদের দেহ থেকেই সন্তান জন্মায়,—সন্তানের জননী বলে' আমরাই তাদের মানুষ করবো।' কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মুখ্যভাবটীর বিষয়ে নারীর কোনও ধারণা নেই। আমরা যতটা মনে করি, বিবেকবুদ্ধি ততটা তাদের মন স্পর্শ করেনা। কারণ হৃদয়ের অন্তরতম নিভৃত গুহায় তারা এই মনে করে যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অবিশ্বাস ভাজন হয়েও সন্তানের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য বেশ ভাল করেই তারা সম্পন্ন করেছে।

সন্তান—প্রজননের জন্যই স্ত্রীলোক বেঁচে থাকে বলে' সন্তানের উপর তাদের যতটা টান, ব্যক্তি বিশেষের উপর ততটা নেই। এজন্য সারা-জীবন ধরেই তারা একটা বুদ্ধিহীনতা দেখিয়ে থাকে। তাদের চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্যটুকু তাদের নিজস্ব, এই কারণেই বিবাহিত জীবনে দম্পতীর মধ্যে এত কলহ হয়।

পুরুষের সাধারণ প্রকৃতি—উদাসীনতা কিন্তু নারীর মধ্যে এইটী প্রকৃত শত্রুতায় পরিণত হয়। পুরুষের ভিতর যে ব্যবসায়- ঈর্ষা ((odium figulinum) তাদের নিজ নিজ কার্য্যের সীমা অতিক্রম করেনা, নারীর ভিতর সেটা সমগ্র নারী জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও সংক্রামিত হয়ে থাকে। কারণ তাদের পেশা যে একই। রাস্তায় দেখা হলেও নারীরা পরস্পরের দিকে ইতিহাস-কথিত গুয়েল্‌ফ্‌ ও গিবেলাইনের মত ঈর্ষ্যা কটাক্ষে চেয়ে দেখে। আর একটা মজা এই—দুজন নারী পরস্পরে আলাপ হলেই বেশ সংকোচ ও ছলনার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়, এমনটা পুরুষের ভিতর হয়না। তাই দুজন পুরুষের চেয়েও দুজন নারীর ভিতর সাদর সম্ভাষণ ব্যাপারটা এত হাস্যকর। পুরুষেরা নীচু সমাজের লোকদের সঙ্গে কথা কয়বার সময় যেটুকু মান সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলে, সৌখীন রমণীরা সাধারণতঃ সেটুকু মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম রেখে কথা কয়না। তারা প্রায়ই ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাবেই কথা কয়। এরা

সোজা কারণ এই যে, তাদের চেয়ে কে ছোট কে বড়—এটা তাদের কাছে খুবই একটা বড় কথা। পুরুষের বেলায় বিবেচনা করবার অন্য শত শত বিষয় থাকে, আর নারীর বেলায় শুধু একটা - কোন্ পুরুষের সুনজরে তারা পড়তে পেরেছে। তাদের সকলের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এক বলে' সকল নারীর মধ্যেই বেশ একটা নিকট সম্বন্ধ থাকে। তাই সমাজিক পদবীর বৈষম্যের উপর তাদের বেশী করে নজর দিতে হয়।

যে পুরুষের মানসিক বুদ্ধি কামপ্রভাবে জড়ীকৃত হয়ে পড়েছে, সেই কেবল ঐ ক্ষুদ্রাকৃতি, নাতিপরিসর কণ্ঠ, বিপুল নিতম্ব, ক্ষুদ্রচরণ নারীগণকে fair sex আখ্যা দিবে। স্ত্রীলোকের সব সৌন্দর্য্যই ত ঐ মোহের সঙ্গে জড়িত! তাদের 'সুন্দর' না বলে 'সৌন্দর্য্য রস বোধ হীন' (unaesthetic) বলাই সঙ্গত। গান, কবিতা, কলাবিদ্যা—এ সব প্রাণ দিয়ে বোঝবার শক্তি তাদের একেবারে নেই—যে কলাবিদ্যার 'বড়াই' করে তারা আনন্দ দিতে যায় অন্যের প্রাণে, তাহা নিতান্তই অসার। সম্পূর্ণ বস্তুগত আনন্দ (objective interest) গ্রহণ করতে তারা একেবারেই অক্ষম। পুরুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে একনিষ্ঠতা দিয়ে একটা বিষয়ের উপর নিজের জ্ঞান প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু নারী এই জ্ঞানটা সর্ব্বদাই পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে থাকে—পুরুষের সাহায্য দিয়ে। মুখ্যতঃতার জ্ঞানলাভটা সর্ব্বদাই পুরুষের ভিতর দিয়ে হয়ে থাকে। অতএব নারীর ধর্ম্মই হচ্ছে সব জিনিষ এমনভাবে দেখা যাতে সে পুরুষকে জয় করতে পারে। এবং সে যদি আর কোন বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে ইহা ঐ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সেজন্য রুশোও বলেছেন 'সাধারণতঃ কলাশাস্ত্রে নারীদের কোনও আশক্তি নেই, দখল নেই, প্রতিভা নেই।' (Lettre 'á d' Alembert, Note XX.)

একটু তলিয়ে দেখলে সকলেই এ বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারেন। কোনও কনসার্ট, অপেরা বা নাটক অভিনয়ের সময় নারীরা যেরূপ মন দিয়ে শিশুসুলভ-সারল্য নিয়ে বড় বড় বইগুলির বিখ্যাত অংশ বিশেষ নিয়ে অনবরত বকে যায়—সেটাও অনুধাবন যোগ্য। গ্রীকেরা নারীগণকে অভিনয়াগারের বাইরে রেখে ভালই করেছিল। আমাদের কালে 'গির্জ্জায় নারীরা চুপ করে থাকবে'—ইহাই অধিকতর সঙ্গত। যবনিকার উপর ঐ কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখে দেওয়া উচিত।

যখন দেখা যায় যে নারীদের মধ্যে কেহই কলাশাস্ত্রে বিশেষ কোনও মৌলিক, গৌরবজনক ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করতে পারেনি, তখনই নারীদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না—তাও বেশ বোঝা যায়। চিত্রাঙ্কণে এই ব্যাপারটি বেশ সুপরিস্ফুট হয়েছে, কারণ ইহাতে তাদের দখলটা পুরুষেরই মত; সেজন্য চিত্রবিদ্যায় তারা বিশেষ অগ্রণী। কিন্তু তবুও তাদের ভাবসম্পৎ গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই বলে' গর্ব্বপ্রকাশ করবার মত তারা একখানি ছবিও এ পর্য্যন্ত আঁকতে পারেনি। বস্তুগত ধারণার বাইরে তাদের যাবার কোনই ক্ষমতা নেই তাই আর্টের দিকে সাধারণ নারীর কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই। কারণ প্রকৃতি চলে ঠিক ক্রমানুসারে—একেবারে লাফিয়ে চলে না (Non facit saltum.)। হুয়ার্ট (জুয়াল হুয়ার্ট, ১৫২০—১৫৯০, মাদ্রিদের ডাক্তার ছিলেন। শোপেন্‌হাউয়ের কথিত সুবিখ্যাত বইখানি নানাভাষায় তর্জ্জমা হয়ে গেছে) তাঁর Examen de ingenios para las scienzias নামক তিনশো বছরের বিখ্যাত পুস্তকে লিখেছেন যে উচ্চমনোবৃত্তি নারীদের কিছুই নেই। নারী জাতিটাকে সমগ্রভাবে এক করে দেখ্‌লে এ উক্তির আর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। স্বামীর দুষ্ট আকাঙ্ক্ষার আগুনে সর্ব্বদাই তারা ইন্ধন যুগিয়ে দেয়। সমাজ তাদের এইভাবের কোনও প্রতীকার করে না বলেই বর্ত্তমান সমাজের এত দুর্গতি। সমাজে তাদের স্থান যথার্থভাবে নির্ণয় কর্‌তে হলে 'স্ত্রীলোকের কোনও সামাজিক পদবী নেই'—নেপোলিয়নের এই কথাটি সার সত্য বলে মেনে নিতে হবে। তাদের অন্যান্য গুণের সম্বন্ধে শাঁফর (Chamfort) বলেন, 'তারা আমাদের দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার সঙ্গেই ব্যবসা চালাতে চায়, সদ্বুদ্ধির সঙ্গে নয়। পুরুষের সঙ্গে নারীর যে সহানুভূতি আছে, তাহা খুব নিবিড় নয়, আর তা আমাদের মন, ভাব বা চরিত্র স্পর্শ করে না।' তারা নিম্নতর শ্রেণীর জাত (sexus sequior)—পুরুষের চেয়ে অনেক নীচু। তাদের দুর্ব্বলতা তাই বিশেষ ক্ষমাশীল হয়েই দেখা উচিত। কিন্তু তাদের প্রতি একটা 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' ভাব দেখানো একেবারেই লজ্জাকর, কারণ তাতে করে তাদের চক্ষে আমাদের নীচু হয়ে যাবারই সম্ভাবনা! মানব জাতির উপর প্রকৃতিদেবী যে দাঁড়িটা টেনে দিয়েছেন, সেটা একেবারে ঠিক মাঝামাঝি দিয়ে যায় নি। বিভাগটা একেবারে বিভিন্ন মুখী হয়ে,—আর এই বিভাগটা শুধু গুণানুসারেই হয়নি, মাত্রানুসারেও হয়েছে।

প্রাবীণেরা ও প্রাচ্য দেশবাসীরা নারীদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই করে-

ছিলেন, তাই নারীর যথার্থ অবস্থাটার বিষয়ে তাদের ধারণা আমাদের চেয়ে ঠিক, কারণ আমাদের মাথায় নারীপ্রেম সম্বন্ধে ফ্রান্সদেশের প্রেমকৌতুক একটা উল্টো ভক্তিভাব জাগিয়েছে। আমাদের এই ধারণা নারীদের অধিকতর উদ্ধতপ্রকৃতি ও হঠকারী করে' তুলেছে। আমাদের মনে পড়ে যায়—হিন্দুদের বারাণসীধামস্থিত পবিত্র' বানরের দল, কারণ তারা পবিত্র বলে' তাদের কেউ মরিতে সাহস করেনা, আর তারা যা-ইচ্ছে তাই করে।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে নারী—বিশেষতঃ উচ্চবংশের মহিলা (lady)—একটা মিথ্যা পদ গৌরব নিয়ে আছে। প্রাচীনদের কথিত 'নিম্ন প্রকৃতির' এই মহিলারা কোন ক্রমেই আমাদের সম্মান ও গৌরব পাবার উপযুক্ত নয়, পুরুষের চেয়ে উঁচু আসন বা তার সঙ্গে সমকক্ষতার আসন পাবারও যোগ্য তারা নয়। তাদের জীবনের এই মিথ্যা গৌরবের ফলাফলটা বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। অতএব সমগ্র মানবজাতির কর্ত্তব্য…এই 'নম্বর টু'—কে য়ুরোপে তার যোগ্য আসনে স্থান দিয়ে এই মহিলা-সঙ্কটের অপনোদন করাই উচিত, কারণ ব্যাপারটা শুধু সমগ্র এশিয়া মহাদেশের পক্ষে হাস্যকর নয়—প্রাচীন গ্রীশ ও রোমদেশও মহিলাদের এই দৃশ্যে হেসে খুন হত। নারীকে তার যথাযোগ্য আসন দিলে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে যে স্বাস্থ্যকর পরিবর্ত্তন হবে, তা আমরা এখনো ভাল করে' ভাবতে পারিনি। য়ুরোপে আর Salic Law'র প্রয়োজন হবে না। য়ুরোপে এই মহিলা'র আর স্থান হবে না; সে গৃহকর্ত্রী বা আসন্ন-গৃহকর্ত্রীর পদে আসীনা হবে; তাকে আর উদ্ধত-প্রকৃতি করে' শিক্ষা দেওয়া হবে না, যাতে সে সঞ্চয়ী ও বিনয়ী—সেইমতই শিক্ষা দেওয়া হবে। তাই পাশ্চাত্য সমাজে এত দুঃখ, এত অশান্তি। লর্ড্ বায়রণ্ও বলেছেন, "প্রাচীন গ্রীকদের নারীদের সম্বন্ধে ধারণা বেশ সঙ্গতই ছিল। বর্ত্তমান ধারণা কল্পনাময় ও মধ্য যুগের বর্ব্বরতার পরিচায়ক বলে' ইহা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। খাইয়ে-পরিয়ে তাদের শুধু ঘরের কাজেই মন দিতে দেওয়া উচিত,কিন্তু সমাজে কখনো মিশতে দেওয়া উচিত নয়। ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও তাদের দখল থাকা উচিত, কিন্তু রাজনীতি বা কাব্যশাস্ত্রে তাদের কোনই অধিকার নেই। ধর্ম্মপুস্তক ও রন্ধনবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক ছাড়া আর কোন পুস্তক তারা পড়বেন না। গান, চিত্রবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা, বাগান-গড়া ও লাঙ্গল-চষাও তাদের পক্ষে বেশ সঙ্গত। এপিরস্ দেশে রাস্তা তৈরি করতে আমি তাদের খুব মজবুত দেখিচি। ঘাস-তৈরি-করা ও দুধ-দোয়া-কাজেও তারা বেশ লাগতে পারে।"

য়ুরোপীয় বিবাহ-আইনে বলে, যে নারী পুরুষেরই সমকক্ষ, কিন্তু এ যুক্তিটা ভ্রান্ত। আমাদের এক বিবাহের দেশে বিয়ে করলেই যেন আমাদের দাবীগুলা আধাআধি ও কর্ত্তব্যগুলো দ্বিগুণ হয়ে পড়ে। কিন্তু আইনে যখন নারীকে পুরুষের মত সমান দাবী দিয়েছে, তখন তাদের পুরুষোচিত শক্তি ও প্রতিভা ও থাকা চাই। কিন্তু আইন নারীকে যে প্রতিষ্ঠা ও অধিকার দিয়েছে তাহা প্রকৃতির দানের চেয়ে ঢের বেশী,—আর যে সব নারী এই প্রতিষ্ঠাও অধিকার ভোগ করতে চায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। এই এক বিবাহের রীতি থেকেই নারীর এই উদ্ভট অবস্থা হয়েছে,—তাই তারা পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা করে। যে-সব পুরুষেরা তীক্ষ্ণধী ও প্রাজ্ঞ, তারা এক বিবাহের এই কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়তে খুবই ইতস্ততঃ করে থাকে।

বহুবিবাহের দেশে প্রত্যেক নারীই একটা আশ্রয় পায়, কিন্তু একবিবাহের দেশে বিবাহিতা নারীর সংখ্যা খুবই কম। এখানে একদল নারী থাকে— যাদের আশ্রয়ও নেই, অবলম্বনও নেই; সমাজের উচ্চস্তরে থাকৃলে তারা অনাবশ্যক 'বৃদ্ধা অবিবাহিতা বালিকা' (old maids) হয়ে থাকে, নিম্নস্তরে থাকলে কঠিন পরিশ্রমে মারা যায়, কিংবা বারবিলাসিনী হয়ে (filles de joie) জীবনের আনন্দ ও গৌরব—দুই-ই হারায়। কিন্তু অবস্থাচক্রে তারা একটা 'আবশ্যক' হয়ে দাঁড়ায়; তাদের স্থান সকলেই স্বীকার করে নেয়, কারণ তারা থাকলে যে সব নারীরা বিবাহিত বা আসন্ন বিবাহিতা, তাদের উপর লোকে আর নজর দেবে না। এক লণ্ডনসহরেই ৮০,০০০ এর উপর বেশ্যা আছে। একবিবাহের আইনে পড়েই ত তারা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। শোচনীয় অবস্থাপন্না এই সব নারীরা য়ুরোপের উদ্ধতপ্রকৃতির মহিলাদেরই উণ্টা ছবি। এইজন্ত বহুবিবাহ—প্রথা সমাজে নারীর পক্ষে একটা কল্যাণ। অন্যদিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে যার স্ত্রী চিররুগ্না, বা বন্ধ্যা বা বয়োবৃদ্ধা হয়ে পড়েছে, তার দারান্তর—গ্রহণে আপত্তি কি? এই কারণেই অনেকে Mormonism—এর আশ্রয় নিয়ে থাকে।

অধিকন্তু নারীকে এই অস্বাভাবিক দাবী দেওয়ার ফলে তার স্কন্ধে কতকগুলি অস্বাভাবিক কর্ত্তব্যও এসে পড়েছে, আর এই কর্ত্তব্যসমূহ পালন না করায় সে নিজে অসুখী হয়ে পড়েছে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। খুব বড় ঘরে বিয়ে না করলে তার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার যে একটা বিপর্য্যয় ঘটবে— পুরুষে এই কথাটাই প্রায় ভেবে থাকে। সে জন্ত সে বিয়ের দায়ে ধরা না দিয়ে

একটী নারীর সঙ্গে এমন ভাবে মিলতে চায়, যাতে এই নারীর ও তার সন্তানাদির অবস্থাসম্বন্ধে সে একবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে। নারী কিন্তু এইরূপ চুক্তিতে যদি পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহলে সে তার নিজের সম্মানটী আগেই হারিয়ে বসে, কারণ বিবাহ-বন্ধনই নীতি-নিয়ন্ত্রিত সমাজের মূল। অতএব বিবাহ ছাড়া অন্য কোন চুক্তিতে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলেই নারীকে আজীবন দুঃখে কাল কাটাতে হয়, কারণ লোকের বিরুদ্ধ মতটা আমরা একেবারে ছেঁটে ফেলতে পারিনি। পক্ষান্তরে এ চুক্তিতে রাজী না হয়ে সে যদি বিবাহ করে তাহলে সে মনের মত স্বামী পায় না, হয়ত বা মনের মত স্বামী খুঁজতে খুঁজতেই সে বয়োবৃদ্ধা হয়ে পড়ে, কারণ পুরুষের মন জয় করবার জন্য নারী যে সময়টুকু পায়, তা নিতান্তই অল্পকালস্থায়ী। একবিবাহের এই দিকটা দেখে টমাসিউসের Thomasius 'উপপত্নীত্ব' de concubinatu নামক সুলিখিত গ্রন্থখানি পড়ে দেখা উচিত। এতে লেখা আছে যে সর্ব্বজাতের মধ্যে সর্ব্বকালে লুথারের ধর্ম্মসংস্কারের সময় পর্য্যন্ত উপপত্নীগ্রহণ সমাজে প্রচলিত ছিল; এমন কি আইনেও ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে ও এতে কোনওরূপ অসম্মান ছিল না। লুথারের বিরাট ধর্ম্মসংস্কারের পর থেকেই ইহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে বিবাহপ্রথা এই সময়েই প্রবর্ত্তিত হয়।

বহুবিবাহসম্বন্ধে তর্ক বাড়িয়ে কোনই লাভ নেই; প্রকৃতপক্ষে ইহা সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত আছে; এখন প্রশ্ন এই— কেমন করে একে নিয়ম-সংবদ্ধ করা যায়? সুতরাং প্রকৃত এক বিবাহগ্রন্থীদের সমাজে কোথাও দেখা যায় কি? বহুবিবাহই যখন সমাজের নিয়ম, তখন পুরুষকে দারান্তরগ্রহণে অনুমতি দিলে সমাজের লাভ ছাড়া লোকসান নেই। বহুবিবাহ সমাজে চললেই নারী তার যথার্থ পরাধীন ও স্বাভাবিক স্থানটী সমাজে আবার ফিরে পাবে। এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা ওটিউটনিক-খ্রীষ্টীয় মূর্খতার সেই বিকট রাক্ষস—'মহিলা' জগৎ থেকে তিরোহিত হবে,—থাকবে কেবল শান্তিময়ী সুখময়ী নারী!

ভারতে নারীর কোন স্বাধীন স্থান নেই, মনু-নীতি-অনুসারে পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্রের আশ্রয়ই নারীর একমাত্র অবলম্বন। (৫ম অধ্যায়, ১৪৮ শ্লোক)। মৃত স্বামীর চিতার উপরে বিধবার পুড়ে মরা অবশ্য ভয়াবহ; কিন্তু স্বামীর কষ্টার্জ্জিত অর্থ নিয়ে নারী যে অন্য পুরুষের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলবে—তাহা আরও ভয়াবহ। যারা মধ্যপথ অবলম্বন করেছে, তারাই ধন্য—medium tenuere beati

ইতরপ্রাণীর ন্যায় মাতার সন্তানাসক্তি সহজাতসংস্কারের ফল, তাই শিশুর দৈহিক অসহায় নির্ভরতা শেষ হলেই মাতার এই আসক্তিটাও ক্রমে কমে আসে। তারপর এই প্রথম আসক্তির স্থানে আর একটা আসক্তি আসে, তাহা অভ্যাস ও বিবেচনাবুদ্ধির ফল। কিন্তু মাতা যখন পিতার উপর আসক্তি হারায়, তখন সন্তানের প্রতি এই দ্বিতীয় প্রকারের আসক্তিটারও কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতার আসক্তি অন্য প্রকারের, ও প্রায়ই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কারণ পিতা সন্তানেরই ভিতর নিজেরই প্রতিচ্ছায়া দেখতে পায়—তাই বাপের ভালবাসাটা আধ্যাত্মিক।

প্রাচীন ও নবীন সমস্ত জাতির মধ্যে এমন কি হোটেন্‌টটদের মধ্যে দেখা যায় যে পুরুষ বংশধরেরাই সম্পত্তির অধিকারী হয়। (Leroy: Lettres philosophique sur l'intelligence et la perfectibilite des animaux, avec quelques letteres sur l'homme. p. 298. Paris 1802) য়ুরোপেই কেবল এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়—তা-ও উচ্চ বংশের ভিতর দেখা যায় না। দীর্ঘকালের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে পুরুষেরা যে সম্পত্তি অর্জ্জন করে গেছে, তা যে শেষে নারীর হাতে পড়ে' দুদিনে কর্পূরের মত উড়ে যাবে—ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। আইনের দ্বারা নারীর উত্তরাধিকারিত্ব সংকুচিত করে দেওয়া উচিত। বিধবা বা কন্যা জীবনস্বত্ব ছাড়া আর কিছুই পাবেনা। পুরুষেই অর্থ সঞ্চয় করে, নারীতে করে না। তাই নারীর হাতে অর্থ-পরিচালনের ভার দেওয়া নিতান্তই গর্হিত। বাড়ী, বা সঞ্চিত অর্থ যখন নারীর হাতে গিয়ে পড়বে, তখন তারা যেন ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে না পারে। তাদের উপর সর্ব্বদাই একজন 'গার্জেন' নিযুক্ত করা উচিত। সন্তান-পালনের সম্বন্ধেও ঐ কথা—যতদূর সম্ভব, সন্তান-পরিচালনের ভার তাদের কাছে না থাকাই ভাল। আত্মসৌন্দর্য্যেও আত্মগৌরবে নারী চিরকালই গর্ব্বিতা—আড়ম্বর ও চাকচিক্য তারা খুবই ভাল বাসে। কিন্তু পুরুষের গর্ব্ব হয় অন্তর্জগতের গুণ নিয়ে—যেমন প্রতিভা, বিদ্যা, সাহস ইত্যাদি।

নারীদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে স্পার্টানদের কি দশা হয়েছিল, তা আরিষ্টটল্ Poltics এ ('Bk. I. ch. 9) বুঝিয়েছেন। স্পার্টার অধঃপতনের ইহাই একমাত্র কারণ। ত্রয়োদশ লুই-এর সময় থেকে ফ্রান্সে নারীর প্রভাব বেড়ে যাবার ফলেই রাজসভায় ও রাজ্যশাসনে অনেক দুর্নীতি

প্রবেশ করেছিল, ইহারই ফলে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে দারুণ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। আমাদের সমাজ প্রথায় এই তথা—কথিত 'মহিলার'র অস্তিত্বই সকল অনিষ্টের মূল।

নারী যে স্বভাবতঃই আজ্ঞা পালন করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তাহা একটা ব্যাপার দেখলেই বেশ বোঝা যায়। নারী যখনই পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, তখনি সে কোন-কোন-না-কোন পুরুষের সহিত মিলিত হয়, তাহারি দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে সে ইচ্ছা করে। কারণ এই যে নারী সর্ব্বদাই একজন কর্ত্তা ও প্রভু চায়। যুবতী হলে এই পুরুষ তার প্রেমিক—বৃদ্ধা হলে সে তার ধর্ম্মযাজক।

গান।

(৺জীবেন্দ্র কুমার দত্ত)

যাদের তুমি ধরছ আজ
হয়েছে তারা মানুষ খাঁটি।
বুঝ্‌ছে তারা দশের দশা
চিন্‌ছে ভাল দেশের মা-টি॥
ভক্তি যত চাচ্ছ বলে,
প্রীতি ততই যাচ্ছে টলে
তুষানলে উঠ্‌ছে জ্বলে
দাবানল যে পরিপাটি।
গায়ের জোরে হৃদয় জয়
তাও কি হয়, তাও কি হয়,
প্রাণের দায়ে ঘুচ্‌ছে ভয়
রাখবো কত আগল আঁটি।
দণ্ড তব পরশ মণি—
করছে সোনা লোহার খনি
নিচ্ছে সবে ধন্য গণি—
তোমার কারা তোমার লাঠি—।

মরণ হ'ল খেলার—খেলা।
অকুল মাঝে ভাস্‌ল ভেলা
বিষাদ কিসে কিসের হেলা
ঝরছে সুধা পাষাণ ফাটি॥

পতিতার সিদ্ধি।

[শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৪১)

চারুর চিঠি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মলা মনে মনে একটি সঙ্কল্প বাঁধিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল যে কোনও উপায়েই হউক রাখুঠাকুরের হাতে শুভাকে সমর্পণ করাইবে। যদি ব্রাহ্মণ তার পত্নীর সঙ্গে তার স্বামীর এই অপবিত্র সম্বন্ধের কথা কোনও প্রকারে জানিতে পারে,—পারে কেন, তার এমন বিশ্বাস হয় সে পারিয়াছে, নয় তার পারিতে বিলম্ব নাই—তখন তার ছিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম হইতে যে অনলশ্বাস বাহিরে ছুটিবে, তাহা তার স্বামীর দেহ মন অদগ্ধ রাখিয়া শীতল হইবে না। সে মর্ম্মকে পুনঃ সংযত করিবার একমাত্র উপায় তার সম্মুখে উপস্থিত করা শুভার মত পুষ্পগুচ্ছের উপহার।

কিন্তু সে সঙ্কল্প এমন গোপনের বিষয় ছিল যে, নির্ম্মলা নিজের মনকেও দ্বিতীয়বার সে প্রশ্ন করিতে সাহসী হয় নাই। সে স্বামীর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তার বিশ্বাস ছিল স্বামীকে সে নিজের মতানুবর্ত্তী করিতে পারিবে, কিন্তু তার সৎশ্বাশুড়ী যে এত সহজে এরূপ কার্য্যে মত দিবে এটা সে কখনই মনে করিতে পারে নাই। যদি সে মত দেয়, সেটা তার একান্ত অধীনতার জন্য। তার মনের অনিচ্ছা কথার সম্মতির সঙ্গে চক্ষু জল রূপে বাহির না হইয়া থাকিতে পারিত না।

সুতরাং রাখুকে কন্যা দিতে শ্বাশুড়ীর অনিচ্ছা নাই জানিয়া নির্ম্মলার আনন্দের সীমা রহিল না। শুভার ধনীবর পাশকরা বর জুটিতে পারে। পূর্ব্বে শুধু তার শ্বাশুড়ীর নয়, তারও একান্ত ইচ্ছা ছিল শুভার যেন ওইরূপ একটি বর হয়। তার স্বামীও ওইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের কুলানুযায়ী ওইরূপ একটি পাত্রের সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু এখন নির্ম্মলা বেশ বুঝিয়াছে,

পাশ করা না হইলেও, নিতান্ত দরিদ্র হইলেও কুলে, শীলে, রূপে এ যুগে রাখুর মত সুপাত্র পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। কোনরূপে তার দারিদ্র্যের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলে শুভাকে কখন বুঝি অসুখী হইতে হইবে না।

এটী সে কি বুঝিয়া যে মনে করিয়াছে সেই জানে। মানব জীবনের কোন্ দিকটা ধরিয়া যে, সে রাখুর পাত্রত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা আমরা অনুমান সাহায্যে কতকটা বুঝিলেও, এবং আমাদের অন্তরাত্মা সে কথা বলিবার জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইলেও, বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে হিন্দুর সে চিরন্তন সাধন-তান্ত্রিকতার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে কে সাহসী হইবে? আর বলিলেই বা তার কথা কে শুনিবে?

সরির মুখে রাখুর কথা শুনিয়া নির্ম্মলা দুঃখিত না হইয়া আপনাকে আশ্বস্তই বোধ করিল। অবশ্য, শুভার আঘাত সম্বন্ধে রাখুকে শুনাইবার জন্য সে সরিকে কোনও কথা শিখাইয়া দেয় নাই। সরি আপনা হ'তেই বলিয়াছে। কিন্তু বলাটা ভাগ্যক্রমে তার পক্ষে একরূপ ওকালতীর মতই হইয়াছে—রাখুর কাছে বিবাহ প্রস্তাব তুলিবার তার সুযোগ ঘটিয়া গেল। সরি যখন তাকে রাখুর আসন ছাড়িয়া উঠার কথা শুনাইল, তখন সে রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। কথা শুনিয়াই সে মাকে ডাকিয়া তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য হেঁসেল ঘরে থাকিতে অনুরোধ করিয়া রাখুকে আটক করিতে চলিল।

চিন্তানত চোখে নিজের গতিশীল চরণ দু'টির উপরেই যেন লক্ষ্য রাখিয়া, মুখে প্রফুল্লতা মাখিবার দৃঢ়-চেষ্টায় মাঝে মাঝে আক্রমণকারী সংশয়ের ছায়া-গুলাকে মন হইতে সরাইতে সরাইতে আপনার সঙ্গে একরূপ কথা কহিতে কহিতেই নির্ম্মলা চলিতেছিল।

বারান্দায় পা দিয়া, যে ঘরে রাখু আছে সে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময় সে শুনিতে পাইল—"মা!"

নির্ম্মলা মাথা তুলিয়া দেখিল, মধু। "এখানে দাঁড়িয়ে কেন, মধু? ঠাকুরের ভোগ দেওয়াত তোমার অনেক ক্ষণ হয়ে গেছে!"

"আপনাকে একটা কথা বলব ব'লে চলে যেতে যেতে ফিরে এলুম।"

নির্ম্মলা বুঝিল মধু মিথ্যা কহিতেছে, কেননা তাহাকে কিছু বলিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইবার তার প্রয়োজন ছিলনা। বাস্তবিক মধু মিথ্যা কহিয়াছে। ভোগ সারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতে গিয়া সে রাখুকে কেমন করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল। দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিল। সে স্থির জানিত রাখু

আর সে বাড়ীতে আসিবে না সুতরাং তাহাকে দেখিয়া মধুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে রাখুকে দেখিয়াছে, কিন্তু রাখু তাহাকে দেখে নাই। রাখুর অলক্ষ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপ দেখিবার সুবিধা হইবে বুঝিয়া সে ভিতরের বারান্দায় আসিয়াছিল এবং নির্ম্মলার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যখন রাখু ঘরের একপ্রান্তে চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতেছিল, সেই সময় সে ব্যাপারটা যথাসম্ভব জানিবার জন্য পরদার ফাঁকে মুখ দিয়াছিল। ঘরের ভিতরে আসন ও তাহার সম্মুখে রক্ষিত মিষ্টান্নের থালটি মাত্র দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য যেমন সে ফিরিল, অমনি দেখিল গৃহকর্ত্রীর কাছে তার চুরি-করিয়া-দেখা ধরা পড়িয়াছে। মনের ব্যাকুলতায় সে বলিয়া উঠিল—"মা"। তখন তার বুঝিবার পর্য্যন্ত আর সময় রহিলনা রাখু ঠাকুরও তাহার কথা শুনিতে পাইবে।

নির্ম্মলা বলিল—"কি বলতে চাও, বল।"

"সন্ধ্যা বেলায় কি আমি ঠাকুরের আরতি করতে আসব?"

"কে তোমাকে আসতে নিষেধ ক'রেছে?

"কেউ করেনি, আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করছি। রাখহরি রয়েছে কি না?"

"তাতে তোমার আসবার বাধা কি?"

"তাই বলছি। যদি রাখহরি আরতি করে, তা হ'লে আর আসি না।"

"বাবু ত তোমাকে আবার নিযুক্ত করেছেন?"

"কর্ত্তা মশাই ত ওই কথা বলেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন রাখহরিকে আর ওবাড়ীতে পুজো করতে যেতে দেওয়া হবে না।"

"তবে? জেনে শুনে ন্যাকার মত জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"তা হ'লে আসব আমি মা।"

"বাবুর যখন অমত তখন তাঁকে আমরা ঠাকুরঘরে ঢুকতে দিতে পারি?"

"জিজ্ঞাসা ক'রে অন্যায় করেছি মা।"

মধুসূদন চলিয়া গেল। নির্ম্মলাও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চলিল। কিন্তু প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সে একবার পরদার বাহির হইতেই দেখিবার চেষ্টা করিল, রাখু ভিতরে কি করিতেছে। কেন না মধুর সঙ্গে সে যে সকল কথা কহিল, কহিল ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে, রাখুকে শুনাইবার জন্য। তার ভবিষ্যৎ নন্দাইএর সঙ্গে আগে হইতেই তার রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু রাখুকে সে দেখিতে পাইল না, সে ঘরে সে আছে কিনা, তাও যেন সে বুঝিতে পারিল না।

প্রবেশ করিয়া দেখিল, সত্যই ব্রাহ্মণ ঘরে নাই! "তাইত, কি করিতে কি করিলাম!" ব্যাকুলার মত নির্ম্মলা বহির্ব্বাটিতে চলিয়া গেল।

তবে বেশিদূর তাহাকে যাইতে হইল না, সদর বাড়ীতে বাহির হইতে না হইতেই সে দেখিল নালুবাবু রাখুর পথরোধ করিয়া তাহাকে মনস্তাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

"পথ ছাড় নালুবাবু!"

"পা দু'টো জড়িয়ে ধর্ নালু!"

"বাবুর কাছে আমার অপমান দেখবার জন্য কেন আমাকে ধ'রে রাখছ মা?"

"কার সাধ্য আপনার অপমান করে। যদি ক'রে তাহ'লে জানবেন এ বাড়ী প্রাণীশূন্য হয়ে গেছে।"

কথাটায় রাখু শিহরিয়া উঠিল। সহসা তার চোখ দিয়া জলস্রোত ছুটিল। "না না আমি যাচ্ছি মা!"

"আসুন। আপনাকে আজকে ছেড়ে দেবো না বলছিলুম, এখন মনে করছি একেবারেই ছেড়ে দেবোনা।"

নালুবাবু আবার তাকে ঘরে ধরিয়া আনিল।

"বাবাকেন পুরুত মশায়ের অপমান করবেন মা?"

"পুরুত মশাই তাঁর হাটের হাঁড়ী ভেঙে দিয়েছেন।" বলিয়াই নির্ম্মলা চলিয়া যাইতে পুত্রকে ইঙ্গিত করিল। শান্ত বালক আর উত্তরের অর্থ বুঝিবার অবসর লইল না।

লালুবাবু প্রস্থান করিতেই নির্ম্মলা রাখুকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলবেন ব'লে সরিকে দিয়ে আমাকে যে পাঠিয়ে দিলেন।"

"বলব ত মনে করেছিলুম—"

"ঘর থেকে আমার কথা শুনতে পেয়েছেন বুঝি?"

রাখু হেঁটমাথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

"আপনি বসুন।"

"কি খেতেদেবে দাওমা, আমি খেয়ে চলে যাই।"

নির্ম্মলা জল-খাবারের পাত্র দেখাইয়া বলিল—এই রকমত খাবেন, দু'টো অন্ন মুখে দিতে নাবিতে উঠে পড়বেন?

"কিছু খেতে আমার ইচ্ছা নেই।"

"ইচ্ছা নেই না প্রবৃত্তি নেই ?"

"তোমার মত গুণের মেয়ে আমি আর কখন দেখিনি মা !"

"তাই বুঝি তিন পহর বেলা মুখে কিছু না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন ?" রাখু লজ্জায় মাথা হেঁট করিতেছে দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল ব্যাপারটা কালকি ঘটেছিল আমাকে বলতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

"কাল একটা বড়ই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি।"

"গর্হিত কি অগর্হিত পরে বলব। যদি আপত্তি না থাকে আমাকে বলুন। বলুন আপনার ছোট বোনটি মনে করে।"

অবাক হইয়া রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

সেটা যেন লক্ষ্য না করিয়াই নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"এই সর্ব্ব প্রথম আজ আমাকে আপনার মা বলা শুনছি। আমাকে আপনার ছোট বোনটি মনে করতে হবে। বলুন—নামধরে ডাকতে চান নাম ধরে ডাকুন।—আমার নাম জানেন ত ?"

"কিন্তু আমি যে বড় গরীব !" রাখুর চোখের সঞ্চিত জলবিন্দুগুলা এক-যোগে যেন উথলিয়া উঠিল।

নির্ম্মলা এইবারে হাসিয়া বলিল—"তা কেন, আমার বাবা আমার বিয়েতে এদের মনের মত দিতে পারেননি ব'লে আমার ঠিক মর্য্যাদা আমি স্বামীর কাছে পাইনি। আপনার কাছে যে অমূল্য সম্পত্তি আছে, দয়া ক'রে আপনি যদি তার একটু অংশও আমার স্বামীকে ভিক্ষা দেন, তাহলে বোধ হয়, আর কখনও তিনি আপনার বোনটির ওপর অত্যাচার করতে পারবেন না।"

"তাইত দিদি !"

"কাপড়খানা বড় ময়লা—সেই গরদখানা আবার এনেদি' দাদা !"

"একবার দেশে যাব মনে করেছি।"

সরি এই সময়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জল-খাবারের পাত্র তুলিয়া স্থানটা পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইল।

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—"রান্না সব হয়ে গেছে।"

"ঠাকুরমা ত তাই বললেন।"

"মাকেই তাহ'লে সব নিয়ে আসতে বল। আর তুই ঠাঁই করে'ই সেই গরদখানা নিয়ে আয়—আমার ঘরের আন্‌লায় দেখতে পাবি।"

রাখু দেশে যাবার কথাটা আবার বলিল।

"হঠাৎ দেশে যাবার জন্ত ব্যাকুল হলেন কেন দাদা? ঘরে ত শুনেছি এক রাক্ষুসী মামী ছাড়া আপনার কেউ নেই। মামীর গাল খেতে আবার লোভ হয়ে গেল নাকি?"

"আপনি যখন আমার বোনই হলেন—"

"ছোট বোন কি 'আপনি' হয়? আমি দেখছি আমাকে মায়ের পেটের বোন্‌টি ভাবতে এখনও আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"এই মমতা যদি মা'র পেটের বোনের হয়, তা হ'লে দিদি, তুমিও আজ থেকে আমার তাই—আমার ভগিনী—" মুক্ত উচ্ছ্বাসে রাখু আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

"এই বারে কি বলছিলেন বলুন।" পুলকিত গণ্ডে পতিত নিবদ্ধ দুই ফোঁটা অশ্রুর পুলক—নির্ম্মলাও বুঝি নির্ম্মম জগতের ভিতর হইতে একটি মমতার ডালিধরা হারাণো সহোদরকে ছিনাইয়া আনিল। "বলনাগো দাদা, আমার যে এখনও অনেক কাজ বাকি।"

"একবার শ্বশুরের দেশে যাব।"

"কত কাল পরে?"

"প্রায় বারো বৎসর।"

"বউ নেই, সেখানে যাবার দরকার কি? তারা ত কখনো সুপুরি পাঠিয়ে আপনার খোঁজ করেনি।"

"যাবার একটা বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে।"

সরি গরদ আনিল, আর সঙ্গে করিয়া আনিল সে পুঁটিকে। নির্ম্মলার যেটুকু রাখুর মুখ হইতে শুনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল শুনিল। সে সম্বন্ধে কথা কওয়ার আর এখন তার প্রয়োজন নাই। সে পুঁটিকে কোলে লইয়া কেবল-মাত্র জিজ্ঞাসা করিল—আর তামাক খাবেন কি?" কোনও উত্তর না পাইয়া সরীকে তামাক সাজিতে বলিয়া নির্ম্মলা চলিয়া গেল।

শ্বশুর বাড়ীর কথা তুলিতে গিয়া রাখুর মাথার ভিতরে আবার প্রবেশ করিয়াছিল, তার সকল-চিন্তা-চুরি-করা চারু। নির্ম্মলার প্রশ্নে এইজন্ত সে উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু গরদ পরিবার অনুরোধে যখন তার মাথাটা স্বস্থানে আবার ফিরিয়া আসিল তখন সে যেন দেখিতে পাইল, তার দুই পার্শ্বে দুইটা মমতার ছবি তাহাকে নিজ নিজ আয়ত্তে আনিবার জন্ত পরস্পরে কলহ করিতেছে।

(৪২)

"উঠছেন যে ?"

আহারান্তে বিশ্রাম না লইয়াই রাখু চলিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। একবার মাত্র নির্ম্মলার কাছে বিদায় লইবার অপেক্ষা।

নির্ম্মলা সেটা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিল। এই জন্ত আহারে বসিতে শুভার মা'র অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাখুর অজ্ঞাতসারে তাহার একরূপ পাছু পাছুই আসিয়াছে। নারীসুলভ কৌতূহলের বশে পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনার কথা রাখুর মুখ হইতে শুনিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, রাখু যখন আহারে বসিবে, তখন তাহাকে একটি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবে। সেই জন্ত বাড়ীর ভিতরে, যেখানে ব্রজেন্দ্র নিত্য আহার করিতে বসে সেইখানে তাহার আসন নির্দ্দেশ করিয়াছিল। যদি কোনও কথা হয়, তার খাশুড়ী অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইবে। কিন্তু তার সদ্‌বুদ্ধি সে কার্য্য করিতে তাকে নিরস্ত করিয়াছিল। পরে সে বুঝিয়াছিল, সেরূপ বিষয় লইয়া একজন পুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া গৃহস্থ-কন্তার মর্য্যাদার অনুরূপ হইত না।

কিন্তু এখন কার্য্যতঃ নির্ম্মলার চারু সম্বন্ধে প্রসঙ্গ তুলিবার অবস্থা ঘটিয়া গেল। রাখু যে শ্বশুরের দেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইবে এটা নির্ম্মলা তার কথা হইতেই বুঝিয়াছিল; চারুকে দেখিয়া তাহার মনে যে প্রচণ্ড সন্দেহ জাগিয়াছে, একবার সে শ্বশুর বাড়ী যাইয়া সে সংশয়ের মীমাংসা করিতে না পারিলে কিছুতেই সে শান্তি পাইবে না।

নির্ম্মলা মনে করিল, তবে তার সংশয়টা এখান হইতেই মিটাইয়া দিলে ক্ষতি কি? সে খাশুড়ীকে আহারে বসিতে অনুরোধ করিয়া একাকী রাখুর সঙ্গে সঙ্গেই তামাকু পর্য্যন্ত সেবনের বিলম্ব সয় নাই, সে তল্পী ছাতি লইয়া উঠিতেছে।

"উঠছেন যে?"

"তোমাকে ত আগেই বলেছি।"

"মস্নাস্ত্রীর বাপের দেশে যাবার আপনার এত কি প্রয়োজন যে, তামাক পর্য্যন্ত খেতে আপনার দেরী সহিছে না? সেখানে গিয়ে আর একটা বিয়ে করবেন নাকি?

লজ্জিত রাখু তল্পী রাখিয়া বসিল।

কিঞ্চিৎ আদরের ভাবে নির্ম্মলা বলিল—"একান্তই যদি না গেলে না চলে একটু বিশ্রাম নিয়ে গেলে কি শ্বশুরের দেশ আর দেখতে পাবে না?"

"বিশ্রাম নিতে গেলে আর উঠতে পারবনা—সন্ধ্যের সময় গাড়ী!"

"কাল সারারাত আপনাকে ঘুমুতে দেয়নি বুঝি?"

রাখু বুঝিল, তার বোনটিও রাত্রির খবর জানিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সে অপ্রতিভ হইল না আজ যে নির্ম্মলা তাকে পূর্ণস্নেহের ডালি দিয়াছে, কিছুমাত্র সঙ্কোচ না দেখাইয়া সে উত্তর করিল—"না দিদি, বড় বেশী খাওয়া হয়েছে।"

নির্ম্মলা একটু হাসিয়া বলিল—"তা আমি ভাবিনি, আম মনে করেছিলুম হতভাগি বুঝি সাধুব্রাহ্মণকে অতিথি পেয়ে খুব সেবা যত্ন করেছে।"

রাখু মাথা হেট করিয়া বসিল, উত্তর দিল না। বলিলে তার বোনটিও বুঝি তার নিষ্কলঙ্কতায় বিশ্বাস করিবে না।

নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"তার বুঝি তখন কিছু পুণ্য বাকি ছিল, পাপের ভরা বুঝি তখন তার পূর্ণ হয় নি তাই সে তোমাকে আবার লাভ করেছে।"

'আবার' কথাটায় বেশ একটু জোর দিয়ে নির্ম্মলা বলিল। নির্ম্মলা বলিল বলিয়াই সে রাখুর পানে চাহিয়া নীরব রহিল। রাখু সেইরূপ নীরবে হেট মাথাতেই বসিয়া। নির্ম্মলা তার একটা শ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল না, বুঝিল বোকাদাদা কথার অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে কথা আরম্ভ করিয়াছে তাহাত আর সে ছাড়িতে পারে না। তাই নির্ম্মলা আবার বলিল—"খুব ভক্তি বুঝি দেখিয়ে সে তোমার মন টেনেছিল দাদার?"

রাখু এইবার মাথা তুলিল। দেখিল নির্ম্মলা হাসিমাখা মুখে দাঁড়াইয়া তার উত্তরের প্রীতক্ষা করিতেছে, দেখিয়াই তার হৃদয়ে আবার উচ্ছাস আসিল, একটু আত্মবিস্মৃতির মতই সে বলিয়া উঠিল—"কি করে তুই জানলিরে?" তাহাদের দেশে অতি আদরের সম্বোধন তারা এই রূপই করিয়াই থাকে। কিন্তু বলিয়াই তার সঙ্কোচ আসিল। এযে কলিকাতা আর নির্ম্মলা এখনও যে বাবু ব্রজেন্দ্রের স্ত্রী। তাহাদের এ পাতানো সম্বন্ধ তাহারা দুইজন ছাড়াত সে বাড়ীর আর কেহ জানেনা। জানিলেও কি তাহারা এ সম্বন্ধ স্বীকার করিবে? সে বাড়ী একবার ত্যাগ করিলে নির্ম্মলাকে ভগিনী সম্বোধনে অসঙ্কোচে পুনঃ প্রবেশ করিবার আর কি সে অধিকার পাইবে? এ সম্বন্ধ শুধু যে মহীয়সী দয়াময়ীর অহেতুক দান তাহাকে আশ্বস্ত করিতেই বুঝি নির্ম্মলা এই দুর্লভ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে কথা সংযত করিয়া সে আবার বলিল—"কি করে জেনেছ জানি না, তবে তুমি জেনেছ।"

আদরের সম্বোধনে নির্ম্মলা কিন্তু অতি প্রফুল্ল হইল। এখন সে বাপের একমাত্র কন্যা কিন্তু তার এক বড় ভাই ছিল। অনেককাল পূর্ব্বে সে মরিয়াছে রাখুর কথার ভিতর দিয়া অনেককাল পরে সে যেন ভাইয়ের আদরের কথা শুনিতে পাইল। সেও এক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"তুমি বলনা।"

"মিথ্যা বলব কেন তোমার কাছে আজ যে আদর যে স্নেহ পেয়েছি যদি না পেতুম, তাহলে বলতুম সেরূপ যত্নসেবা আমি জীবনে কখন পাইনি।"

"তার যত্ন সেবার মুখে আগুন।"

কি উদ্দেশ্যে এ কথা সে বলিল বুঝিতে না পারিয়া রাখু বলিল—"তাকে গাল দিয়োনা দিদি!"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল—দেবোনা?"

"এখানে সে শুনতে আসছে না, শুধু তুমি বলেই বলছি, তার ব্যবহারে আমি এক বিন্দুও দোষ দেখতে পাইনি। যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে, তা তোমার ভাইয়ের।" বলিয়া সে নির্ম্মলাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে রাত্রির ইতিহাস বলিল। সে যে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক অন্ত গৃহে স্থান দিয়াছে, রাত্রির মত বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া, বিদায় লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে; অবশেষে তার সঙ্গলোভে উপযাচক হইয়া নিজেই চারুর গৃহে সে প্রবেশ করিয়াছে, এ সমস্তই সে নির্ম্মলাকে শুনাইয়া দিল। চারুর দৃঢ়তাতেই যে তার চরম অনিষ্ট হয় নাই, এ কথাও সে নির্ম্মলাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইল না।

শুনিয়া নির্ম্মলা মুগ্ধ-গাম্ভীর্য্যে নিজেকে শুনাইতেই যেন বলিয়া উঠিল—"যাই হ'ক, তার ভাগ্য ভাল। এখন তার মরণ হ'লেও কোন হানি নাই। একদিনের গুরু সেবা'তেই সে পরকালের কাজ ক'রে নিয়েছে।"

নির্ম্মলা রাখুর কাছে রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তাহাকে বলা ভাল কিম্বা মন্দ এটা বুঝিতে না পারিলেও চারুর সঙ্গে রাখুর সম্বন্ধ প্রকাশের প্রলোভন হইতে সে আমাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছিল না। তবে আপনার কৌতূহলমাত্র তৃপ্ত করিয়া সে যে কেবল রাখুর মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিবে এটা তার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। সে বেশ বুঝিয়াছে, আত্মহত্যাই করুক, কি নিয়তিবশে জলে ডুবিয়াই মরুক, সে অভাগিনী মরিয়াছে। তবে সে যাই হউক না কেন অগাধ ধন সে উপার্জ্জন করিয়াছে। আর এই দরিদ্র পূজারি তার স্বামী ত বটে, তাহার উপর হাজার অত্যাচার করিলেও সে পাপিষ্ঠা ত বিধি-

নির্দ্দিষ্ট সংস্কার-সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে নাই! তা হইলে, তার অত বড় সম্পত্তিটা রাখু না পাইয়া পাঁচভূতে লুটিয়া খাইবে কেন? টাকা এমনি জিনিষ, সে তার স্বামীকেও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অবশ্য স্বামীর মনোভাবটা ঠিক বুঝিবার এখনও সে অবকাশ পায় নাই। তবু তার আগে রাখুকে তার অবস্থার কথা শুনাইয়া রাখিতে দোষ কি?

কিন্তু কথাটা কি করিয়া যে সে রাখুর কাছে পাড়িবে, তাহা নির্ম্মলা তখনও পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আর শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের অবস্থাটাও যে কি হইবে, এটাও সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

তথাপি তাহাকে শুনাইতেই হইবে। শুধু শুনাইলেও হইবে না, পতিতা স্ত্রীর সম্পত্তি পাওয়াইতে হইলে তাহাকে কলিকাতায়ও রাখিতে হইবে। তার শাশুড়ী এক কথায় যে তার কন্যাটি রাখুকে দিতে সম্মত হইয়াছে সেটি যে নিঃস্ব রাখুর কুলশীল দেখিয়া এটা তার মনে হয় নাই, নির্ম্মলার মুখে রাখুর ওই সম্পত্তিটি পাবার কথা শুনিয়া।

চারুর ভাগ্যও পরকালের সুনির্দ্দেশ করিয়াই সে বলিল—"তা হ'ক, আপনি যেন সেখানে আর যাবেন না।"

"আবার! আর যেতে না হয় বলতেই ত দেশে যাচ্ছি।"

"দেশেও আপনার এখন যাওয়া হবে না।"

"যাব না?

"না। শ্বশুরের দেশে ত কোনও কালেই নয়। আপনাকে বিবাহ করতে হবে।"

রাখু কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া মনের ভিতর হইতে উত্তর বাহির করিতে চক্ষু মুদিল।

নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"শ্বশুর বাড়ী যেতে কি জন্য ব্যাকুল হয়েছেন আমি বুঝেছি।"

মাথা তুলিয়াই রাখু বলিল—"না।

"যদি বলি বুঝেছি"

বিস্মিত নেত্রে রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

"যদি বলি বুঝেছি?"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া রাখু মাথা নাড়িল।

"রূপ দেখিয়ে সে আবাগী আপনাকে আকর্ষণ করেনি!"

"না দিদি।"

"তাকে দেখে আপনার স্ত্রী বলে ভ্রম হয়েছে।"

"তুমি কেমন করে বুঝলে?"

"আগে বলুন, আমি যা মনে করেছি তা ঠিক কিনা?"

"তুমি যে আমাকে আশ্চর্য্য করে দিলে!"

"আগে বলুন।"

"এমন সাদৃশ্য আমি কখন দেখিনি!"

"আপনি তাতে কি মনে করেছেন?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না।

নির্ম্মলা এবার জিজ্ঞাসা করিল—"শ্বশুর বাড়ী কি জন্য যাচ্ছিলেন; জানেন যখন আপনার স্ত্রী বহুকাল মারা গেছে যাওয়াটাকি আপনার বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছিল?"

"আর যা বল্না।" রাখুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

"তাইত দাদা, আজ ও পর্য্যন্ত তাকে আপনি ভুলতে পারেননি!"

"তাকে অনেক কাল ভুলে গিয়েছিলুম।"

"তবে এতকাল বিয়ে করেননি কেন?"

"স্থান নেই, পয়সা নেই,—বিয়ে করে কি করব।"

"অপনার কুলশীলই যথেষ্ট।"

"ঘর জামাই হতে আমার ইচ্ছা ছিলনা।"

"হতভাগা বউ বুঝি বড় যন্ত্রণা দিত?"

রাখু উত্তর দিলনা।

"তা হলে এ নিশ্বাসটা ওই আবাগীর জন্যই পড়ল নাকি দাদা?"

"তা হলে দেশেই যাই।"

"কলকেতায় থাকলে কি সেখানে আবার না গিয়ে থাকতে পারবে না?"

নির্ম্মলা দেখিল রাখু সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার ছাতি পুঁটুলি একবার তুলিল, আবার রাখিল; আবার তুলিল আবার রাখিল। নির্ম্মলার যেন মনে হইল সে তার কথা শুনিতেই পাইল না।

"আপনি বিশ্রাম করুন।"

"না আমি এখনি উঠব।"

"বাবুর ফিরে আসার অপেক্ষা করতে পারবে না?"

"বাবু কখন আসবেন তার ঠিক কি?"

"দেশে যদি যেতেই হয় একদিন অপেক্ষা করতেই বা আপনার দোষ কি?"

একথারও উত্তর না দিয়া রাখু বলিয়া উঠিল—ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে—' "হাঁ দিদি, দয়া ক'রে তুমি ভাই বলেছ।"

"অমন করে তুমি কথা বলছ কেন দাদা!"

"আমি বুঝতে পেরেছি, কি করে জেনেছ জানিনা। সেকি আমারই স্ত্রী?"

"সে কথা জানবারই বা তোমার দরকার কি?"

"বলতেই বা দোষ কি?"

"যদিই সে আপনার স্ত্রী হয়, আপনি কি তাকে নিয়ে আবার ঘর করবেন?"

নির্ম্মলার এই এক কথাতেই রাখুর মানসিক উত্তেজনার নিবৃত্তি হইয়া গেল। সত্যই ত যদিই চারু রাখী হয়, তা হইলেই বা তার হৃদয়কে আশ্বস্ত করিবার কি আছে? তার ত মাথায় তখন আসে নাই, চারুকে লইয়া আর ত ঘর করিবার উপায় নাই! সমাজ ধনী, পাণ্ডিত্যাভিমানী শত ব্রজেন্দ্রকে মাথায় তুলিয়া রাখিবে, কিন্তু হয় ত একদিনের এক সামান্য ভ্রমে পদস্খলিতা পথে নিক্ষিপ্ত একটি চারুকেও হয়ত ধরিয়া তুলিতে চাহিবে না! সে ত বুঝিতে পারে নাই, ঘরে ফিরিবার জন্য যদি এখন চারু হিন্দুর সমস্ত দেবতারও কাছে আবেদন করে, দেবতারা তাহাকে মুক্তি দিতে চাহিবে, সমাজে স্থান দিতে সাহস করিবে না। একটা হুঙ্কারে সমস্ত মানসিক বেদনা আকাশে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"তুমি আমার মায়ের পেটের বোনই বটে! কিন্তু দিদি, তাকে যেন ঘৃণা ক'র না!"

এই কথাতেই নির্ম্মলা বুঝিল, একরাত্রি সেবার ছলে সর্ব্বনাশী তার একযুগ পূর্ব্বের পায়ে-ঠেলা স্বামীর সমস্ত হৃদয়টা চুরি করিয়া লইয়াছে। সে হাসিয়া বলিল—"কাকে? চারুকে না তোমার নামে নাম সর্ব্বনাশী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতচ্ছাড়ী তাকে?" বলিয়াই বাহিরে ছুটিয়া আসা একটা তপ্তশ্বাসকে বুকের মধ্যেই নিরুদ্ধ করিয়া সে আবার বলিল—"ঘৃণা? তাকে দেখতে পেলে পায়ে পুষ্প দিয়ে আমি প্রণাম করতুম। এত ভাগ্যবতী সে—সোয়ামীর ভালবাসা এমন শক্ত পেঁটরায় পূঁরে রেখেছিল যে, এত অত্যাচার সহ্য ক'রেও স্বামী তার স্নেহের পুঁটলিটিকে পেঁটরা ভেঙে বার ক'রে নিতে পারলে না!"

নির্ম্মলার চোখে জল আসিল। রাখু বুঝিল, স্বামীর চরিত্র লক্ষ্য করিয়াই সে এই কথাগুলা বলিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিতেই যেন সে বলিল—"তার চিন্তা ছেড়ে দিলুম দিদি!"

"কতক্ষণের জন্য?"

"দেশে যাব আবার বিবাহ করব।"

"তার জন্য দেশে যেতে হবে কেন।"

"এখানে কে আমাকে মেয়ে দেবে?"

"দেবার লোক ঢের আছে দাদা!"

শুভ্রর কথাটা নির্ম্মলা এই সময় পাড়িতে যাইতেছিল। বলিতে বলিতে নিবৃত্ত হইল। ভবিষ্যতের কথা, তাহার অতি আগ্রহেও যদি এ বিবাহ না হয়।

ক্ষণেকের জন্য নীরব থাকিয়া রাখু বলিল—"কলকেতায় আমি থাকতে পারব না।"

"যদি সে মরে যায়?"

রাখু হাসিয়া নির্ম্মলার প্রশ্নের উত্তর দিল—"তাকে মেরে ফেল্‌বে নাকি দিদি?"

"দেখতে পেলে কি করতুম, কেমন ক'রে বলব!"

"আমার চেয়েও যে তোমার রাগ গো!"

"তোমার আবার রাগ কোথায়! এখনও সে পাপিষ্ঠার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেল!"

করতল দিয়া রাখু কেবল চোখ মুখ মুছিতে লাগিল।

"নাও দাদা, একটু ঘুমোও।"

এর অধিক আপাততঃ নির্ম্মলা বলিতে পারিল না। সে চলিয়া গেল।

অমন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া সুস্থদেহ চারু দরিদ্র শান্তিহীন তাহার আগে কেমন করিয়া মরিতে পারে ভাবিতে ভাবিতে রাখু যেমন একবার তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইল; অমনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ—

সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড়ী শব্দ।

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

সংস্কৃত ভাষার সাহচর্য্যে দ্রাবিড় ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষার সংস্পর্শে সংস্কৃত ভাষা যে পরিপুষ্ট হইয়াছিল সে কথার উল্লেখ একালে না করিলেই চলে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ একদিকে যেমন দ্রাবিড়ী ভাষায় বহু সংস্কৃত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ দ্রাবিড়ী ভাষার প্রভাবে সংস্কৃত ভাষাও প্রভাবান্বিত হইয়াছে। উচ্চারণ বিষয়ে মূৰ্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণ দ্রাবিড়ী হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে এবং অন্যান্য অনেক প্রকার দ্রাবিড়ী ভাষার উপকরণে সংস্কৃত ভাষার পুষ্টি ও সৌষ্ঠববৃদ্ধি হইয়াছে। দ্রাবিড়ী ভাষার বহু শব্দ ও সংস্কৃত সাহিত্য ও কোষে স্থান পাইয়াছে। কথাটা অনেকেই স্বীকার করিতে চাহিবেন না জানি। কিন্তু যাঁহারা মানিতে চাহেন না তাঁহাদের যুক্তি অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য তথা পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির প্রতি অতি ভক্তিই প্রবল। পিতৃভক্তি শ্রদ্ধেয় বটে, কিন্তু যে প্রকার পিতৃভক্তিতে সত্যের অপলাপ হয়, সে প্রকার পিতৃভক্তি শ্রদ্ধেয় নহে। মাত্রা অতিক্রম করিলে সুপ্রবৃত্তি হইতেও কুফল ফলে। নিসর্গ রাজ্যে আমরা অবিরত দেখিতে পাই যে দুইটী বস্তু নিকটবর্ত্তী হইলেই পরস্পরের উপর প্রভাববান্ হয়। তাহাদের একটী উষ্ণ থাকিলে অপরটীকেও কিঞ্চিৎ উষ্ণতা দান করে, শীতল হইলে শীতলতা দান করে; একটীতে গতি থাকিলে অন্যটীতেও কিঞ্চিৎ গতিশক্তি সংক্রমিত হয়; আমগাছে যখন ফুল হয় তখন তাহার নিকটে পুষ্পিত বেলগাছ থাকিলে আমে বেল-গন্ধ ও বেলে আম-গন্ধ হয় ইত্যাদি। মনুষ্য জাতি ও ভাষার বিষয়েও একই কথা। হিন্দু ও মুসলমান বহুকাল একত্র বাস করিলে হিন্দু যেমন সত্যপীরের সিন্নি দেয়, মুসলমানও তেমনি কালীর নিকট 'বলি' মানসিক করে; হিন্দুও মুসলমানের ভাষার অনেক শব্দ গ্রহণ করে, মুসমলমানও হিন্দুর ভাষায় কথা বলে। তাই বেদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা মীমাংসা দর্শনে জৈমিনি বৈদিক ভাষায় ম্লেচ্ছ শব্দ দেখিয়া সেই সকল শব্দের জন্য ম্লেচ্ছ দেশ প্রচলিত অর্থের গ্রহণ অনুমোদন করিয়াছেন। মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামী ও টীকাকার কুমারিল ভট্ট যে সকল ম্লেচ্ছ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন সে সমস্তই দ্রাবিড়ী ভাষার শব্দ। যাহাই হউক একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে বিষয় আলোচিত হইবে। দ্রাবিড় ভাষার পাশ্চাত্য

নির্ম্মলার চোখে জল আসিল। রাখু বুঝিল, স্বামীর চরিত্র লক্ষ্য করিয়াই সে এই কথাগুলা বলিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিতেই যেন সে বলিল—"তার চিন্তা ছেড়ে দিলুম দিদি!"

"কতক্ষণের জন্য?"

"দেশে যাব আবার বিবাহ করব।"

"তার জন্য দেশে যেতে হবে কেন।"

"এখানে কে আমাকে মেয়ে দেবে?"

"দেবার লোক ঢের আছে দাদা!"

শুভ্রর কথাটা নির্ম্মলা এই সময় পাড়িতে যাইতেছিল। বলিতে বলিতে নিবৃত্ত হইল। ভবিষ্যতের কথা, তাহার অতি আগ্রহেও যদি এ বিবাহ না হয়।

ক্ষণেকের জন্য নীরব থাকিয়া রাখু বলিল—"কলকেতায় আমি থাকতে পারব না।"

"যদি সে মরে যায়?"

রাখু হাসিয়া নির্ম্মলার প্রশ্নের উত্তর দিল—"তাকে মেরে ফেল্‌বে নাকি দিদি?"

"দেখতে পেলে কি করতুম, কেমন ক'রে বলব!"

"আমার চেয়েও যে তোমার রাগ গো!"

"তোমার আবার রাগ কোথায়! এখনও সে পাপিষ্ঠার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেল!"

করতল দিয়া রাখু কেবল চোখ মুখ মুছিতে লাগিল।

"নাও দাদা, একটু ঘুমোও।"

এর অধিক আপাততঃ নির্ম্মলা বলিতে পারিল না। সে চলিয়া গেল।

অমন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া সুস্থদেহ চারু দরিদ্র শান্তিহীন তাহার আগে কেমন করিয়া মরিতে পারে ভাবিতে ভাবিতে রাখু যেমন একবার তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইল; অমনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ—

সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড়ী শব্দ।

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

সংস্কৃত ভাষার সাহচর্য্যে দ্রাবিড় ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষার সংস্পর্শে সংস্কৃত ভাষা যে পরিপুষ্ট হইয়াছিল সে কথার উল্লেখ একালে না করিলেই চলে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ একদিকে যেমন দ্রাবিড়ী ভাষায় বহু সংস্কৃত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ দ্রাবিড়ী ভাষার প্রভাবে সংস্কৃত ভাষাও প্রভাবান্বিত হইয়াছে। উচ্চারণ বিষয়ে মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণ দ্রাবিড়ী হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে এবং অন্যান্য অনেক প্রকার দ্রাবিড়ী ভাষার উপকরণে সংস্কৃত ভাষার পুষ্টি ও সৌষ্ঠববৃদ্ধি হইয়াছে। দ্রাবিড়ী ভাষার বহু শব্দ ও সংস্কৃত সাহিত্য ও কোষে স্থান পাইয়াছে। কথাটা অনেকেই স্বীকার করিতে চাহিবেন না জানি। কিন্তু যাঁহারা মানিতে চাহেন না তাঁহাদের যুক্তি অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য তথা পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির প্রতি অতি ভক্তিই প্রবল। পিতৃভক্তি শ্রদ্ধেয় বটে, কিন্তু যে প্রকার পিতৃভক্তিতে সত্যের অপলাপ হয়, সে প্রকার পিতৃভক্তি শ্রদ্ধেয় নহে। মাত্রা অতিক্রম করিলে সুপ্রবৃত্তি হইতেও কুফল ফলে। নিসর্গ রাজ্যে আমরা অবিরত দেখিতে পাই যে দুইটী বস্তু নিকটবর্ত্তী হইলেই পরস্পরের উপর প্রভাববান্ হয়। তাহাদের একটী উষ্ণ থাকিলে অপরটীকেও কিঞ্চিৎ উষ্ণতা দান করে, শীতল হইলে শীতলতা দান করে; একটীতে গতি থাকিলে অন্যটীতেও কিঞ্চিৎ গতিশক্তি সংক্রমিত হয়; আমগাছে যখন ফুল হয় তখন তাহার নিকটে পুষ্পিত বেলগাছ থাকিলে আমে বেল-গন্ধ ও বেলে আম-গন্ধ হয় ইত্যাদি। মনুষ্য জাতি ও ভাষার বিষয়েও একই কথা। হিন্দু ও মুসলমান বহুকাল একত্র বাস করিলে হিন্দু যেমন সত্যপীরের সিন্নি দেয়, মুসলমানও তেমনি কালীর নিকট 'বলি' মানসিক করে; হিন্দুও মুসলমানের ভাষার অনেক শব্দ গ্রহণ করে, মুসমলমানও হিন্দুর ভাষায় কথা বলে। তাই বেদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা মীমাংসা দর্শনে জৈমিনি বৈদিক ভাষায় ম্লেচ্ছ শব্দ দেখিয়া সেই সকল শব্দের জন্য ম্লেচ্ছ দেশ প্রচলিত অর্থের গ্রহণ অনুমোদন করিয়াছেন। মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামী ও টীকাকার কুমারিল ভট্ট যে সকল ম্লেচ্ছ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন সে সমস্তই দ্রাবিড়ী ভাষার শব্দ। যাহাই হউক একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে বিষয় আলোচিত হইবে। দ্রাবিড় ভাষার পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় যে সকল দ্রাবিড়ী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল শব্দের আলোচনা করিব। এ সকল শব্দকে দ্রাবিড়ী শব্দ বলিবার প্রধান হেতু এই যে সংস্কৃত ধাতু হইতে এসকল শব্দ নিষ্পন্ন হয় না, অথবা সংস্কৃতে সংস্কৃত কোষাদির নিরুক্তি কষ্ট কল্পিত; অথবা অনেক শব্দ সংস্কৃতে প্রায় অপ্রচলিত কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় তাহাদের বহুল প্রয়োগ; অথবা অনেক শব্দ কেবল মাত্র সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ী ভাষায় আছে, কিন্তু অন্য কোনও আর্য্য ভাষায় নাই; অথবা অনেক শব্দ এমন আছে যে তাহাদের সমার্থক অন্য প্রতিশব্দ সংস্কৃতে আছে, কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় নাই; অথবা অনেক শব্দ দ্রাবিড়ী ভাষায় ধাতু প্রত্যয় জাত মূল অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় তাহার মৌলিক অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তামিল ও তেলেগু পণ্ডিতগণ তাঁহাদের কোষগ্রন্থে সংস্কৃত শব্দকে সংস্কৃত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, যে সকল শব্দ তাঁহারা সংস্কৃত বলিয়া লিখেন নাই তাহা খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী।

দ্রাবিড়ী ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ লেখক বিসপ কল্‌ডোএল্ (Bishop Caldwell) যে সকল শব্দ সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেটী এই :—

(১) কল্‌ডোএলের তালিকা।

অক্কা—এই শব্দটী দ্রাবিড়গণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বে যখন তুর্কী মোঙ্গোলীয় অন্যান্য শক জাতির সহিত বাস করিত তখনকার, এবং শক ভাষাসমূহে ইহারও প্রয়োগ আছে। নানাদেশের শক ভাষা হইতে অন্যান্য নানা ভাষায় শব্দটী সংক্রমিত হইয়াছে এবং ভাষান্তর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে নানারূপ অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার কোনও ধাতু হইতে ইহার নিরুক্তি হয় না। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অর্থ মাতা; কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় ইহার অর্থ 'জ্যেষ্ঠা ভগিনী'। তামিল্—অক্কেই, অক্কা, অক্কাল্। তেলেগু—কানারিজ—'অক্ক'। মরাঠি 'অকা'। তুঙ্গুসীয়—'ওকি', 'অকিন্'। মোঙ্গোলীয়—'অচন্'। তিব্বতী —'অচ্চে'। তুর্কী প্রাদেশিক—'এগে'। মর্ড্‌বীয়—'অক্য'। উগ্রীয়— "ইগ্‌গেন্'। লাপীয় ভাষায় (lappish) 'অক্কে' শব্দের অর্থ 'স্ত্রী' এবং 'মাতামহী' বা 'পিতামহী'। মোঙ্গোলীয় 'অক', তুঙ্গুসীয় 'অকি', ও উইগুরীয় 'অচ' শব্দের অর্থ 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা'। ওষ্টিয়াক 'ইকি"—বৃদ্ধ, ফিনলণ্ডী—উক্কো=বৃদ্ধ, হাঙ্গারী—'অগ্‌গ'=বৃদ্ধ। দ্রাবিড়ী কু ভাষায় 'অক্কে'=পিতামহ।

এই সকল শব্দের মূল ধাতু সম্ভবতঃ 'অক্,=বৃদ্ধ। তুর্কী ভাষার ওস্মান্লী শাখার 'অক্ক' = কনিষ্ঠা ভগিনী। এখানে অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই সম্পর্কে একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে দ্রাবিড়ী ভাষায় বয়োনির্বিশেষে জ্ঞাতিত্বের বাচক শব্দ নাই। জ্ঞাতিত্ব বাচক শব্দের মধ্যে বয়সের অর্থ থাকা চাই। 'ভ্রাতা' বা 'ভগিনী' শব্দ দ্রাবিড়ীতে নাই, কিন্তু বয়োধিক ভ্রাতা, বয়োন্যুন ভ্রাতা, বয়োধিকা ভগিনী, বয়োন্যুনা ভগিনী। যেমন বাঙ্গালা দাদা, দিদি, ভাই বোন।

এই শব্দের যুক্তবর্ণ 'ক্ক' সংস্কৃত ভাষায় অতি-বিরল, কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় অতি সাধারণ। তামিল ভাষায় প্রাচীন পদ্যে সংস্কৃতের ন্যায় 'মাতৃ' অর্থে অক্কা শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহাকে সংস্কৃত প্রভাব বলিবার পক্ষে বাধা এই যে তামিল ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব অতি অল্প বা নাই বলিলেও চলে। 'অক্কা' পাওয়া' কোন্ ভাষার কথা?

Monier Williamsএর সংস্কৃত অভিধানে আছে—'Apparently a foreign word." Comp. Acca Larentia, Latin, "Mother of the Lares."

(২) অত্তা, অত্তি—মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। শক-ভাষাসমূহে এই শব্দের বহুল প্রয়োগ ও বিবিধ অর্থ। সংস্কৃত ভাষায় অত্তি শব্দ নাটকে 'বয়ো-জ্যেষ্ঠা ভগিনী' অর্থে প্রযুক্ত হয়। মালয়ালম্ ভাষায়—অচ্চন্, কানারিজ—অজ্জ, তামিল অত্তন্। হিন্দী 'আজা' (= পিতামহ) সম্ভবতঃ এই শব্দ, অথবা ইহার জ্ঞাতি। তামিল-অত্তন্, পিতা; অত্তেই, মাতা; আত্তন্, বয়োজ্যেষ্ঠ, আত্তাল্, মাতা। মালয়ালম্ 'অচ্চ', 'অচ্চি', মাতা। তেলুগু 'অত্ত' ও কানারিজ 'অত্তে', শব্দের অর্থ 'শ্বশ্রূ', 'স্ত্রীর ভগিনী', 'পিতৃষসা' প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সিংহলী ভাষায় অত্তা = মাতামহী। এ সকল অর্থ সংস্কৃতে নাই। দক্ষিণ মালয়ালম্—'আচ্চি' = মাতা, ভদ্রমহিলা, matron.

ফিন্‌লণ্ডের ভাষায় মাতৃ অর্থে 'অইতি', পিতৃ অর্থে 'আত্ত'। পিতৃ অর্থে—তুর্কী অত, হঙ্গারীয় 'অত্য', চেরিমিস্ 'আত্যা', মর্ডবীয় 'অতই', ওষ্টিয়াক্ 'অত'। লাপলণ্ডে—'অইজ' (= পিতা), 'অত্তুজে'ও হয়। গথিক্ ভাষাতেও এক শব্দ আছে—'অত্তন্' (= পিতা),: 'অইথেইন্' (= মাতা)। গ্রীক ও লাটিন 'অত্ত' (atta) পিতৃতুল্য পূজ্য ব্যক্তির প্রতি 'নমস্কার' অর্থে প্রযুক্ত। এ-শব্দের ধাতু বোধ হয় তামিল 'অত্তু'—মিলিত হওয়া, আশ্রয় করা।

Monier Williamsএর সংস্কৃত অভিধানে—"probably a word borrowed from the Deccan.

(৩) অটবি অটবী (= অরণ্য)। সংস্কৃতে 'অট্ গতৌ'ধাতু হইতে ইহার নিরুক্তি হইয়াছে। বনে মনুষ্য বা জীব জন্তু ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া বনের নাম 'অটবী'। অর্থটা কষ্ট কল্পিত। দ্রাবিড়ী 'অড়্' ধাতুর অর্থ 'নৈকট্য' 'ঘনভাব' (Thickness)।এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন তামিল 'অড়র্' 'ভিড় করা' 'বনের মত ঘনভাবে একত্র হওয়া'। 'বি' (পি) প্রত্যয়টীও দ্রাবিড়ী প্রত্যয়। 'কেল্‌বি' (তামিল, শ্রবণ); 'কেল্' ধাতুর অর্থ শুনা। তামিল ও তেলুগু ভাষায় এই শব্দ 'অড়বি'। দ্রাবিড়ী ভাষার উচ্চারণে অনাদি অযুক্ত শ্বাস বর্ণ নাই।

(৪) অণি, আণি (= শকটের অক্ষ দণ্ড, যে দণ্ডে চাকা ঘুরে)—'অণ্' (শব্দ করা) ধাতু হইতে শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তামিল 'আণি, (= নাভি, যে কোন প্রকার পিন বা দণ্ড)। তামিল ভাষায় এ অর্থে জ্ঞাতিত্ব-বিশিষ্ট অনেকগুলি ধাতু আছে—'অণৈই' (= আলিঙ্গন করা, বাঁধা), 'অণি' (= পরিধান করা), 'অণবু' (= লাগিয়া থাকা, 'অণু' (= স্পর্শ করা)। বুলর্ (Buhler) 'অর্' ধাতু হইতে সংস্কৃত 'অণি' নিষ্পন্ন করিতে চাহেন। এইরূপে তিনি 'পর্ণি' হইতে 'পাণি' (= হাত) নিষ্পন্ন করিয়াছেন। 'অর্' শব্দ তাঁহার মতে 'অণি' শব্দের জ্ঞাতি। খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী শব্দই সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে।

(৫) অম্বা, অম্ব—(= পিতা, মাতা)। সম্বোধনে 'অম্বে', 'অম্ব'। বহু আর্য্য ও শক ভাষায় এই শব্দ আছে। তামিল 'অম্মৈই', 'অম্মৈই' = মাতা, বা বয়োধিকা ভগিনী। ফিনলণ্ডী ও হঙ্গারী—অম্ম' = মাতা। মড্‌বীয় 'অনই', ওষ্টিয়াক্—'অনে', তুর্কী (প্রাদেশিক)—'অন্ন', 'অন'। হিন্দী 'অন্না' 'ধাত্রী'। ইউরোপের কোনও কোনও আর্য্য ভাষাতেও এ শব্দ সংক্রমিত হইয়াছে। Old Higherman, & Oscan amma, Icelandic amma grandmother.German amme, nurse.দ্রাবিড়ী ভাষায় ইহারবহু প্রয়োগ।

(৬) 'আলি'—(= স্ত্রীসখী)। তেলুগু 'আলি' (= স্ত্রী, পত্নী); 'আলু' একটী স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয়। গোন্দ 'আলি', পত্নী।

(৭) কটুক কটু—(= তীক্ষ্ণ, তীব্র, ঝাল, ভয়ঙ্কর)। সংস্কৃতে গত্যর্থক 'কট' ধাতু হইতে শব্দটী নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। তামিল 'কড়ু'

(পালি-প্রাকৃতেও অভিন্নরূপ); ইহার ধাতু-গত অর্থ 'অত্যধিক'। Buhler 'কৃৎ' ধাতু হইতে 'কট' নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এবং বলেন 'কতু' হইতে 'কটু' হইয়াছে। 'কটু' শব্দটীর সংস্কৃত ভাষায় বহুল প্রয়োগ আছে, এবং অতি প্রাচীন শব্দ। কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় ইহার জ্ঞাতি-বন্ধু অসংখ্য থাকায় Caldwell ইহাকে দ্রাবিড়-কুলোদ্ভূত বলিতে চাহেন। তামিল 'কড়ু' ধাতুর অর্থ 'তীব্র হওয়া'। এই ধাতু নিষ্পন্ন কয়েকটী তামিল শব্দ—'কড়ুগু', তাড়াতাড়ি করা, 'কড়ি', কাটা, তিরস্কার করা; 'কড়ি' দংশন করা; 'কর্ত্তি', তরবারি; 'কড়ু-কড়ু', ক্রুদ্ধভাব প্রদর্শন করা; 'কাড়ু', 'কড়ম্', 'কড়রু', = অরণ্য। তামিল 'কড়ুগু' (= সর্ষপ) হইতে সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'কটুক'। হিন্দি 'কড়ুআ তেল'। '-কু' (অনাদি-গু) প্রত্যয়যোগে ক্রিয়া হইতে বিশেষ্য পদের রচনা তামিল ভাষায় সুপ্রচলিত।

(৮) কলা —(= বিদ্যা, ৬৪ কলা, শিল্প)। 'কল্' (শব্দ করা) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে, দ্রাবিড়ী 'কল্' ধাতুর অর্থ 'শিক্ষা করা'। তামিল 'কলেই' (সংস্কৃত 'কলা' শব্দের তামিল উচ্চারণ) শব্দের অর্থ, যে কোনও প্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান বা বিদ্যা। 'কল্‌বি' = শিক্ষা, বিদ্যা।

(৯) কাবেরি, কাবের (= হরিদ্রা, Saffron। 'কাবেরী' নদী (হরিদ্রাবর্ণ মৃণ্ময় জল হইতে)। Caldwell মনে করেন শব্দটী সংস্কৃত মৌলিক হইতে পারে। গ্রীক ভাষায় নদীটার নাম 'খাব্রোস্' (Xabros) কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষার উপাদানেও শব্দটী রচিত হইয়া থাকিতে পারে। 'কাবি' (= গোরোচনা), 'কা' (বা 'কাবু') = কুঞ্জবন; তেলুগু 'এরু'; 'তামিল 'এরি' = নদী, বা জলস্রোত। এই নদীতীরে 'তিরু বালেই ক্ কা' (শ্রীবান কুঞ্জ) একটী সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নাম। অর্থ 'গজ নিকুঞ্জ'।

(১০) কুটি (= গৃহ), কুটির, কুটীর, কুটের; কুটুম্ব (= জ্ঞাতি)। কুট (বক্র হওয়া) ধাতু। 'জল পাত্র' অর্থে 'কুটম্' কুট ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু অন্য শব্দগুলি দ্রাবিড়ী। তামিল 'কুড়ি' (= গৃহ, বাসস্থান), কুড়্ (একত্র হওয়া) ধাতু, কুড়্ ধাতু = নিকটে আসা। 'কুড়িল্' 'কুড়িশেই' (= কুটীর)। তেলুগু 'গুড়ি' (= মন্দির)। Teutonic cot, cote, etc, derived from the Scythian or Finnish source. ফিনলণ্ডী কোট (kota), চেরিমিস কুদ, মড্‌বীয় কুদো, ওষ্টিয়াক্ চোৎ এই সমস্ত শব্দের একই অর্থ—'গৃহ'।

(১১) কুণি, কূণি (=বক্র বাহু, বক্রতা; বাঙ্গালায় 'নখকুণি')। দ্রাবিড়ী 'কূন্' (=কুঁজ); 'কুন্ (নুইয়ে পড়া) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

(১২) কূল, [কূলা।] (সরিৎ, সরোবর, নদীতীর)। কূল (আচরণ করা) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। তামিল—মালয়ালম্ 'কু.লম্', তেলুগু 'কো.লনু' (=সরোবর, সরিৎ)। তামিল কুলি ধাতু=স্নানকরা; 'কু.লু' ধাতু =শীতল হওয়া।

(১৩) কোট্ট, কোট, (=দুর্গ, গড়, প্রাকার বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থান)। সংস্কৃতে কুট (বক্র হওয়া) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। তেলুগু 'কোট', কানারিজ 'কোটে', তামিল 'কোট্টেই' সমার্থক শব্দ। তামিল ভাষায় আর একটী প্রাচীন শব্দ আছে 'অরণ' (=দুর্গ)। সুতরাং মনে হইতে পারে 'কোট্টেই' শব্দ সংস্কৃত হইতে গৃহীত। কিন্তু সংস্কৃতে শব্দটী আসিল কোথায় হইতে? সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী উপাদান হইতে। তামিল—মালয়ালম্ 'কোড়ু' (=রেখ', নক্সা, চতুর্দ্দিকে প্রাকার বেষ্টনের রেখা)। মালয়ালম্ ভাষার এই শব্দের অর্থ 'প্রাকার বেষ্টিত নগর' বা 'দুর্গ'—উদাহরণ 'কোলি কোড়ু' (Calicut)। কোড়ু (বক্র হওয়া) ধাতু হইতে 'কোড়ু' বিশেষ্যপদ। 'কোড়ুন্ দমির্'=খারাপ তামিল, আক্ষরিক অনুবাদ কুটিল তামিল। বিশেষণ হইলে 'কোড়ু' শব্দের উচ্চারণ হয় 'কোট্ট'।

(১৪) খট্টা, খট্ব (=খাট)। সংস্কৃতে 'পরদা' বাচক 'খট্ট' হইতে নিষ্পন্ন। তামিল-মালয়ালম্ 'কট্টিল্'—'কট্টু,' (বন্ধন করা) হইতে। 'কট্টু' শব্দ দ্রাবিড়ী ভাষায় মৌলিক এবং ইহার বহু জ্ঞাতি বন্ধু আছে। তামিল প্রভৃতি ভাষায় 'খ' অক্ষর বা তাহার উচ্চারণ নাই।

(১৫ নানা (বহু, বহুবিধ)। সংস্কৃতে ইহার ব্যুৎপত্তি হয় না। Bopp 'ইহা' ও 'উহা' বাচক কতিপয় অপ্রচলিত সর্ব্বনাম হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। দ্রাবিড়ী 'নালু' প্রাচীন তামিল 'নাঙ্' (=চারি) হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি হয় না? দ্রাবিড়ী ভাষায় 'চারি' সংখ্যার 'বহু' অর্থে ভূয়োভূয়ঃ ব্যবহার আছে। এইরূপ 'দশ' সংখ্যা দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট উচ্চসংখ্যা ব্যক্ত হয়। তামিল ভাষায় "চারিজনে আমাকে বলিয়াছেন"—অনেকে আমাকে বলিয়াছেন; "দশজনে যাহা বলিবেন তাহা করিতেই হইবে"—সমস্ত পৃথিবীর লোকে যাহা বলিবেন তাহা করিতেই হইবে। আমাদের বঙ্গভাষায়ও 'দশজনের' অসীম ক্ষমতা, দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ; দশের লাঠি একের

'ঈর্' ও ব্রাহুই ভাষায় দীর্' হইয়াছে। কেবলমাত্র মালয়ালম্ ভাষায় জল বাচক আর একটী শব্দ আছে 'বেল্লম্' (প্রকৃত অর্থ 'স্রোত' বা 'প্রবাহ')। তামিল ভাষায় ইহার অর্থ 'ধানের ক্ষেতের উপর প্রবাহ' বা 'কাড়ান্', এবং তাহা হইতে সম্ভবতঃ মালয়ালম্ ভাষায় কেবল মাত্র 'জল' অর্থ আসিয়াছে। সে ভাষায়ও 'নীর' আছে। তামিল ভাষায় 'তন্' (= শীতল) শব্দের সহিত 'নীর্' শব্দের সমাসে 'তন্নীর্' (= জল) হয়। এই শব্দেরই সমধিক প্রচলন। তামিল ভাষায় সন্তরণার্থক 'নীন্দু' (মূল 'নী') ধাতুর 'নীর্ শব্দের সহিত নিকট জ্ঞাতিত্ব। তাহা হইলে গ্রীক্ neo, লাটিন no, nato, এবং সংস্কৃত 'নৌ' (নৌকা) শব্দের সহিত ইহার তুলনা করা যায়। গ্রীক neros ও naros (= আর্দ্র, সিক্ত) শব্দের সহিত 'নীর্' শব্দের জ্ঞাতিত্ব থাকিতেও পারে। এ শব্দের গ্রীক মূল কিন্তু nao, to flow,

(১৭) পত্তন, পট্টন, পট্ট, (= নগর, প্রাকার বেষ্টিত নগর, গ্রাম)। (অট্) 'পট্' (গতৌ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। Beames 'পত্র' হইতে শব্দটী নিষ্পন্ন করেন। দ্রাবিড়ী 'পট্টনম্' শব্দ সম্ভবতঃ সংস্কৃত হইতে। কিন্তু 'কোট' শব্দের ন্যায় ইহার ও মূল দ্রাবিড়ী হইতে গৃহীত। Wilson ও Williams মনে করেন সংস্কৃত 'পট্ট' ও দ্রাবিড়ী পেত্তহ্' একই শব্দ! কিন্তু Caldwell বলেন 'পট্টি' (= পশু আটকাইবার খোঁয়াড়, পশুশালা গ্রাম) হইতে এ শব্দ সমুদ্ভূত। অনেক সহরের নামের শেষে শব্দটীর ব্যবহার আছে—যেমন 'কোবিল্—পট্টি' (= মন্দির গ্রাম)। কানারিজ 'হট্টি' শব্দেরও এই প্রকার ব্যবহার—Dim hutty. এ শব্দের মূল বোধ হয় 'পড়' (= বসবাস করা,' ডুবিয়া যাওয়া)। সংস্কৃতে 'পুর' শব্দ থাকা সত্ত্বে ও বোধ হয় 'পট্টি' শব্দ গৃহীত হইয়াছে। 'পট্ট' ও 'পট্টন' পট্টি হইতে জাত হইয়াছে। Wil on ও Williams কর্ত্তৃক উল্লিখিত 'পেত্তহ্' (তামিল 'পেট্টৈ', সহরতলী) সম্ভবতঃ 'পট্টি হইতেই জাত; কিন্তু 'পেত্তহ্' হইতে 'পট্টম্' নহে। তামিল 'পেড়ু' হইতে 'পেটৈহ' 'পাড়ু,' 'পাড়ি,' 'পড়ু,' 'পেড়ু' সমার্থক এবং গ্রামের নামের শেষে সকল গুলিরই ব্যবহার হয়।

(১৮) 'পন্নো' (প্রাকৃত = স্বর্ণ)। Ellis সংস্কৃত 'সুবর্ণ' হইতে এই শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তামিল 'পোন্' তেলুগু 'পোন্নু' (= স্বর্ণ) হইতে প্রাকৃত শব্দটী আসিয়া থাকিতে পারে না ?

(১৯) পল্লী (= নগর) গ্রাম, (কৃষি প্রধান গ্রাম)। দ্রাবিড়ী 'পল্লি' শব্দ

অভিন্ন। বহু নগরের নামের সহিত এই শব্দ ব্যবহার আছে—Trichinopoly বা তিরি শিরাপ্ পল্লি (=ত্রিশিরা অসুরের সহর)। এ শব্দটী সাধারণতঃ দ্রাবিড়ী ভাষার সীমার মধ্যে অবস্থিত সহর সমূহেই প্রযুক্ত হয়। তামিল দেশের কৃষিজীবী 'পল্ল' দিগের নাম বোধ হয় এই শব্দের জ্ঞাতি।

(২০) √ ভজ্=ভাগকরা।

(২১) ভাগ (=অংশ)। তামিল 'পগু' (অংশ করা) হইতে এ শব্দ নিষ্পন্ন হইবে, কি তদপেক্ষা প্রাচীন কোনও সাধারণ মৌলিক ভাষা হইতে নিষ্পন্ন হইবে? কল্ ডোএল্ বলেন তামিল 'পগু' হইতে। তামিল-মালয়ালম্ 'পগু' মূলধাতু। ইহা হইতে জাত কয়েকটী শব্দ—'পঙ্গু' (=অংশ), 'পাগির্' (ভাগ করা) পগল্ (খণ্ড, বিভাগ, দিবালোক), পাল (অংশ), পাদ্দি, পগুদি (অর্দ্ধ, অর্দ্ধাংশ), সংস্কৃতে 'পঙ্গু' শব্দ আছে; কিন্তু অর্থ অত্যন্ত বিভিন্ন।

(২২) 'মীন' (=মৎস্য)। 'মী' (অনিষ্ট করা, আঘাত করা) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; মীনাতি এনমিতি মীনঃ। দ্রাবিড়ী ভাষায় মৎস্য বাচক একমাত্র শব্দ 'মীন্' এবং এ শব্দ সকল ভাষাতেই আছে। রাজমহলেও 'মীন্'; গোন্দে 'মীন্দ'। মালাবার ও কোরোমণ্ডল প্রদেশের উপকূলবাসিগণ তাঁহাদের উত্তর-পশ্চিমে ব্যবসায়ের প্রধান সামগ্রী 'মৎস্যে'র নাম যে সংস্কৃত হইতে পাইয়াছেন তাহা স্বীকার করা কঠিন। তাঁহাদের ভাষায় মৎস্য বাচক শব্দ না থাকা হইতে পারে না। এ শব্দের সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি যেমন কষ্টকল্পিত, তামিল ব্যুৎপত্তি সেইরূপ সরল ও সুন্দর। 'মিন্' ধাতুর অর্থ চক্ চক্ করা'। তিন (খাওয়া) ধাতু হইতে স্বর দীর্ঘতা দ্বারা যেমন 'তীন্' (খাদ্য) নিষ্পন্ন হয়, 'মিন্' হইতে 'মীন্' সেইরূপ, এই শব্দে তামিল পদ্যে আকাশের 'তারা'ও বুঝায়—'বান্-মীন্'=তারা (কথায় কথায় 'আকাশস্থ দীপ্তিশীল বস্তু'), 'অরু-মীন্'= Pleia, des' (কথায় কথায় 'ছয়টী তারা')। উপকূল হইতে সমুদ্রের মাছের খেলা যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিবে মীন শব্দের তামিল ব্যুৎপত্তি কি সুন্দর!

(২৩) বলক্ষ (=শুভ্র) শব্দ সংস্কৃতে =গমনার্থক 'বল' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু ব্যুৎপত্তিটী নিতান্তই কষ্ট কল্পিত। দ্রাবিড়ী 'বেল' =শুভ্র বেলি=ফাঁকা জায়গা, খোলা বাতাস; 'বেল্লি' =রজত; বেলিচ্চম্ = আলোক। হঙ্গারী বিলাগ'=আলোক। Slavonian veli white কি শক ভাষা হইতে গৃহীত? এ শব্দ আর্য্য ও শক উভয় ভাষার পূর্ব্বে কোনও সাধারণ ভাষায় ছিল?

(ক্রমশঃ)

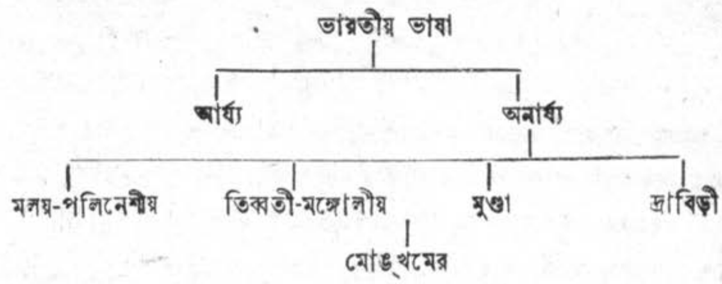
বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার]

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতের ভাষাসমূহ।

ভারতবর্ষে ছোট বড় ১৪৭টি ভাষা আছে। তার মধ্যে মাত্র কতকগুলির লিখিত সাহিত্য আছে। ভারতীয় ভাষাগুলির শ্রেণী বিভাগ নিম্নলিখিতভাবে করা যাইতে পারে :—



আর্য্য ভাষাসমূহের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। আপাততঃ অনার্য্য ভাষাগুলির নাম, কথনের স্থান এবং ভাষীর সংখ্যা দেওয়া গেল।

অনার্য্য ভাষাসমূহ।

১। মলয়-পলিনেশীয়—নিকোবর, সেলন (?) প্রভৃতি স্থানে কথিত হয়

ভাষীর সংখ্যা—১০,০০০

২। তিব্বতী-মঙ্গোলীয়—ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে কথিত হয়। গ্রিয়ারসন্ ইহাকে ইন্দো-চীন ভাষা বলিয়াছেন।

ভাষীর সংখ্যা—১১ ০০০,০০০

(ক) মোঙ্‌খমর—(Mon-khmer) পেগু প্রদেশের "মোঙ্‌ এবং কাম্বোডিয়ার "খেমর", কোচিন-চীনের "আনামী", মধ্য আসামের "খাসি" ভাষা ইহার অন্তর্গত

ভাষীর সংখ্যা—৪২৭,০০০

৩। মুণ্ডা—সাঁওতালী, ওরাঁও, কোল প্রভৃতি ভাষা

ভাষীর সংখ্যা—৩,১৭৯,০০০

৪। দ্রাবিড়ী—দক্ষিণভারতের তামিল, তেলেগু,—মলয়ালম্ ও কানারী ভাষা ভাষীর সংখ্যা—৫৬,৫১৪,০০০

এই সকল সংখ্যাগুলি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস্ হইতে লওয়া হইয়াছে। এতদিনে সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে।

মুণ্ডা ও দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহের সঙ্গে বাঙলার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মুণ্ডা হইতে এখন মাত্র কয়েকটি কথার অস্তিত্ব বাঙলা ভাষায় নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। কিন্তু কাঠামোর দিক হইতে দ্রাবিড়ীর সহিত বাঙলার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এমন কি অনেক দ্রাবিড়ী কথাও আমরা এখনও প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে একারণে দ্রাবিড়ীর সবিশেষ আলোচনা হইবে।

দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহ।

দ্রাবিড়ী ভাষার সহিত বাংলার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। জাতি হিসাবে বাংলাকে আদিতে দ্রাবিড়ী ভাষার আত্মীয় বলা যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহ কথিত হয়। বেলুচিস্তানে একটি স্থানে ব্রাহুই (Brahui) নামক দ্রাবিড়ী ভাষা কথিত হয়। ইহা যেন একটি ভাষা-দ্বীপ (Linguistic Island)। তামিল, তেলগু, মলয়ালম্ ও কানারী এই চারিটিই বর্ত্তমানে প্রধান দ্রাবিড়ী ভাষা। দ্রাবিড়ী ভাষার সাহিত্য অতি সমৃদ্ধ এবং বহু পুরাতন। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব দ্রাবিড়ীর উপর বেশী পড়িয়াছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ এখন এই সকল ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। আবার অনেক দ্রাবিড়ী শব্দও রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে। বাংলাতে এখনও বহু দ্রাবিড়ী শব্দ চলিত রহিয়াছে।

দ্রাবিড়ী ভাষার বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতির সহিত বাংলার বেশ মিল আছে। উভয় ভাষাতেই ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, য প্রভৃতি মূর্দ্ধণ্য ধ্বনির প্রাদুর্ভাব আছে। শব্দসম্পদে উভয়েই সংস্কৃতের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। উচ্চারণের বিশেষত্ব ভাঙা-ভাঙা (Stress accent), টানা নয়, (ptich)। দ্রাবিড়ী ভাষা-সমূহের নিয়লিখিত বিশিষ্টতা আছে :—

অনেকগুলি শব্দাংশ লইয়া কথাগুলি তৈয়ারী (polysyllabic) এবং বিভক্তি, প্রত্যয় প্রভৃতি শব্দাংশ-রূপে কথার আগে বা পিছে গ্রথিত হয় (agglutinative) (সংযোগধর্ম্মী)—বিভক্তি প্রত্যয়াদি স্বাধীনভাবে প্রত্যয়

হয় অর্থাৎ শব্দ হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে—একবারে শব্দের সহিত মিলাইয়া যায় নাই।—প্রাণহীন পদার্থ এবং বিচারহীন প্রাণীসমূহ ক্লীবলিঙ্গের দ্বারা কথিত হয়।—লিঙ্গের বিভিন্নতা পৃথক পৃথক শব্দের সংযোগে বাচিত হয়, এই সকল শব্দ যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক। কয়েক স্থানে ইহার ব্যতিক্রম আছে।—বিশেষ্য শব্দসমূহের কারক পরিবর্ত্তনের জন্য শেষে শব্দাংশসমূহ প্রযুক্ত হয়, বিভক্তির দ্বারা কারক নির্ণয় হয় না (nouns inflected not by case terminations but suffixed post-positions and separable particles)—ক্লীবলিঙ্গের বিশেষ্যসমূহ কদাচিত বহুবচনে প্রযুক্ত হয়।

—চতুর্থী বিভক্তিতে প্রযুক্ত 'কু' 'কি' অথবা 'গে'—সংস্কৃত এমন কি অন্য কোনও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতেও দেখা যায় না। বাংলাতে 'কে' বিভক্তি ইহা হইতে আসিয়াছে। উড়িয়ার 'কু'—'ঘরকু গেলা' (ঘরে গেল) ঐ একই স্থান হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়।

—উপসর্গগুলি শব্দের শেষে প্রযুক্ত হয় (post positions used instead of prepositions)—বিশেষণ সমূহের লিঙ্গাদির পরিবর্ত্তন হয় না (Adjectives incapable of declension)।

—ক্রিয়া সমূহের relative participles সম্ভবপর হইলে বিশেষণের স্থানে প্রযুক্ত হয়।

—উত্তম পুরুষের (First person) বাচক দুইটি সর্ব্বনাম (pronoun) আছে—একটিতে যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, তাহাকেও বুঝায়; আর একটিতে শুধুই যে ব্যক্তি বলে তাহাকে বুঝায়।

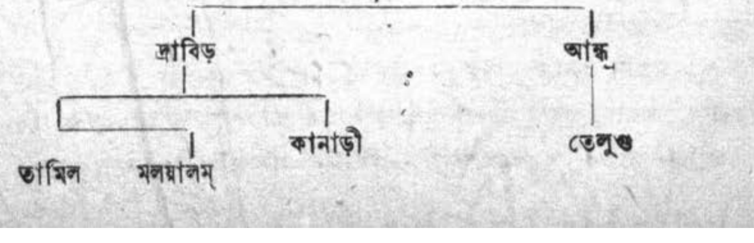
—কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায় না (no passive voice)।

—Conjuuctions এর বদলে continuative participles এর অধিক ব্যবহার হয়।

—'হাঁ' 'না' দুই বাচ্যের প্রয়োগ আছে (possess a negative as well as affirmative voice)

—Relative pronouns দিয়া বাক্যাংশ প্রয়োগ না করিয়া, relative participial nouns ব্যবহার করা হয়।

(E.g. the person who came = the who-came)



দ্রাবিড়ী ভাষাভাষী—৫৬,০০০,০০০

তামিল—১৬,০০০,০০০

মলয়ালম্—৬,০০০,০০০

তেলুগু—২০,০০০,০০০

কানাড়ী—১০,০০০,০০০

মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তর পূর্ব্বদেশে তেলুগু কথিত হয়, আর দক্ষিণ অংশে তামিল প্রভৃতি ভাষার চলন।

মধ্য প্রদেশের (central province) গণ্ড্ (gond) ভাষা দ্রাবিড় এবং আন্ধ্র ভাষার মধ্যবর্ত্তী—প্রায় ১,০০০,০০০ দশ লক্ষ লোক এই ভাষা বলে। পুর্ব্বোল্লিখিত ব্রাহুই (Barhui) ভাষা আদি দ্রাবিড়ী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ভাষীর সংখ্যা ৪৮,০০০ আটচল্লিশ হাজার হইবে।

ইন্দো-আর্য্যভাষা সমূহ

ইন্দো-আর্য্যভাষা

- বৈদিক (কথিত ভাষা)
- সংস্কৃত (মৃতভাষা)

(মধ্য-ভাষা)
(Middle Indian)

- লিখিত
  - পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি
    - মহারাষ্ট্রী
    - মাগধী
    - অর্দ্ধ-মাগধী
    - শৌরসেনী
- কথিত (অপভ্রংশ)
  - আসামী
  - বাঙ্গলা
  - ওড়িয়া
  - মৈথিলী
  - মারাঠী
  - গুজরাতী
  - পাঞ্জাবী
  - হিন্দী

অনেকের ধারণা আছে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। বাংলায় অনেক সংস্কৃত শব্দ আসিয়াছে বলিয়া এই ভুল ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। পারস্ত ভাষার অনেক শব্দ আরবী হইতে আসিয়াছে—তাই বলিয়া পার্শিকে আরবীর বংশধর বলা চলে না। আরবী সেমেতিক ভাষা—পার্শি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা, দুইয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তেমনি বাংলার সহিত জাতি হিসাবে সংস্কৃতের সম্বন্ধ নাই। সংস্কৃত ভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকায় সাধারণের এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে।

ইন্দো-আর্য্য ভাষা হইতে পারস্ত দেশের আদি ভাষা অবেস্তা এবং আমাদের বৈদিক ভাষা আসিয়াছে। বৈদিক জীবিত ভাষা ছিল। এই ভাষার ব্যাকরণ, ছন্দ প্রভৃতি হইতে ইহার কথনের ধরণ বুঝা যায়। এই বৈদিক ভাষার একটি উপভাষাকে ভিত্তি করিয়া সংস্কৃত নামে কতকটা কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হয়। 'সংস্কার' বাচক 'সংস্কৃত' শব্দ হইতেই ইহার পরিচয়। পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের জন্ত এবং সাহিত্যের একটা সাধারণ ভাষা রক্ষার জন্ত সংস্কৃতের সৃষ্টি! খৃঃ পূঃ দু এক শতাব্দী হইতেই এই ভাষার চলন হয়, এবং পরে কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের হাতে ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই 'সংস্কৃত' ভাষার বংশধর নাই! প্রয়োজনের খাতিরে এই ভাষা লৌকিক ও বৈদেশিক ভাষা হইতে অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছে; আবার পক্ষান্তরে লৌকিক ভাষাগুলিকে নিজের শব্দসম্পদে ধনী করিয়াছে।

বৈদিক ভাষারও একটা লেখার উপযোগী সাধু আকার ছিল। কিন্তু এই ভাষার কথিত বিভিন্ন শাখা হইতে বর্ত্তমান চলিত ভাষাগুলির সৃষ্টি। কথিত বৈদিক উপভাষাহইতে মধ্যস্থানীয় কতকগুলি ভারতীয় ভাষার সৃষ্টি হয় (Middle Indian Languages) এই রূপান্তরের কোনও লিখিত নজির নাই। তবে এইরূপ অনুমান খুবই সঙ্গতভাবে করা যাইতে পারে।

এই মধ্য ভাষার আবার লিখিত এবং কথিত দুইরূপ হয়। লিখিত ভাষাগুলি সাহিত্যের পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। ইহা হইতে আবার পরবর্ত্তী সাহিত্যের মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্দ্ধ মাগধী, শৌরসেনী প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হয়। মধ্য ভাষার কথিত রূপকে তথা-কথিত অপভ্রংশ আখ্যা দেওয়া হয়। এখন যেমন বাংলা লিখিত এবং কথিতের তফাৎ করা হয়। এই অপভ্রংশ কথিত ভাষা হইতে আসামী, বাংলা, উড়িয়া, মৈথিলি, মারাঠী, গুজরাতী,

পাঞ্জাবী, হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি আসিয়াছে। পূর্ব্বপ্রদত্ত চার্টখানি দেখিলেই বংশধারা উপলব্ধি হইবে।

আমাদের চলিত ভাষাগুলি বৈদিক কথিত ভাষা হইতে আগত মধ্যভাষার বংশধর অপভ্রংশ হইতে বর্ত্তমান আকারে পৌছিয়াছে। শব্দ এবং বাক্য-বিন্যাসরীতির সাক্ষ্য এখনও এ বিষয়ে যথেষ্ট রহিয়াছে।

বৈদিক (কথিত)
|
মধ্যভারতীয় (কথিত)
|
অপভ্রংশ (কথিত)
|
বাংলা, আসামী, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি

বাংলা
|
আদি-বাংলা
|
ব্রজবুলি (কৃত্রিমভাষা) — কথিত বাংলা — সাধুবাংলা

আদি-বাংলাভাষার আকার অপভ্রংশের সমতুল্য। বোধ হয় বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা হইতে ইহার নমুনা পাওয়া যায়। এই ভাষা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। 'ব্রজবুলি' সংস্কৃতের মত এক প্রকার কবিতা-সাহিত্যের কৃত্রিম ভাষা ছিল। বিদ্যাপতি প্রভৃতি হইতে আধুনিক বৈষ্ণব কবিগণের ভাষা ব্রজবুলির নমুনা দেখায়। কৃষ্ণ রাধা এবং ব্রজধামের কথা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম ব্রজবুলি হইয়াছে। ব্রজদেশের অর্থাৎ বৃন্দাবনের স্থানীয় ভাষার প্রভাবও বোধ হয় এই কৃত্রিম ভাষায় অনেকটা আছে।

কথিত বাংলার বিভিন্ন রূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কথিত ভাষার আকার খুবই তফাৎ। ইহার মধ্যে মধ্য বঙ্গের কথিত ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া সাহিত্যের জন্য একটা তথাকথিত সাধু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। কথিত বাংলার পুরাতন রূপ এখন পাওয়া যায় না—খনার বচন, ডাকের বচন প্রভৃতিতে যে নিদর্শন আছে লোকমুখে তাহা ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই 'সাধু' এবং 'অসাধু' ভাষা সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ

প্রলয়োল্লাস

(কাজী নজরুল ইস্‌লাম)

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে
ধূম্র ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাস্‌ছে ভয়ঙ্কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

ঝামর্‌ তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্ব্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ-ঝোলে
দোদুল দোলে!
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায় !
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে !
বিশ্বমায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর প'র—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর !"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে !
এবার মহানিশার শেষে
আস্‌বে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !
দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু চাঁদের কর—
আলো তার ভর্‌বে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ-চাবুক হানে,
রণিয়ে উঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড় তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে—
গগন-তলের নীল খিলানে !
অন্ধকারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে !
এই ত রে তোর আসার সময় ঐ-রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন-সৃজন-বেদন!
আস্‌ছে নবীন, জীবন হারা অসুন্দরে কর্‌তে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আস্‌ছে হেসে—
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
ঐ ভাঙা গড়া খেলা যে তার কিসে তবে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর!
ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আস্‌ছে সুন্দর!—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

প্রবাসী—

ভারতবর্ষের সঙ্গীত

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গাইবার সময় সম্বন্ধে কড়াকর নিয়ম করিয়া শেষে বলা হইয়াছে যে রাজাজ্ঞায় কাল বিচার করিবেনা যথা—

"রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া নতু কালং বিচারয়েৎ"

সঙ্গীত দর্পণম্‌

কারণ রাজেচ্ছা নিরঙ্কুশ। অন্যত্র বলা হইয়াছে যে সময় উল্লঙ্ঘন করিয়া গান গাওয়া সর্ব্বনাশকর কিন্তু বহুজন সমক্ষে নৃপাজ্ঞায় এবং রঙ্গ ভূমিতে উহা দোষের নহে। যথা—

"সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্ব্বনাশকরং ধ্রুবম্‌।
শ্রেণিবদ্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদম্‌॥"

সঙ্গীত দর্পণম্‌

আবার ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও আছে। অসময়ে রাগ রাগিণী গাইয়া পরে গুর্জ্জরী রাগিণী গাইলে সকল দোষ খণ্ডে। যথা

"লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিদ্‌গায়ন্তিচ বিরাগতঃ।
সুরসা গুর্জ্জরীতস্য দোষং হন্তীতি কথ্যতে॥"

স্বরবর্ণ বিভূষিত জনচিত্তরঞ্জক ধ্বনি বিশেষই রাগ। যথা—

"যোঽয়ং ধ্বনি বিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥

এখানে স্বর = মধুর ধ্বনি।
বর্ণ = সপ্ত স্বর। স্বরবর্ণ বিভূষিত ধ্বনি" অর্থাৎ বিচিত্র ভাবে বিন্যস্ত সাতটি ছয়টি, বা পাঁচটি স্বরের মধুর উচ্চারণ যুক্ত ধ্বনি।
আরও বলা হইয়াছে।

"যস্য চেতাংসি রজ্যন্তে জগত্ত্রিতয়বর্ত্তিনাম্।
তেরাগা ইতি কথ্যন্তে মুনির্ভিরতাদিভিঃ॥"
"যস্য শ্রবণমাত্রেণ রজ্যন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বানুরঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥"

এই রাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা। ঔড়ব, ষাড়ব (খাড়ব), এবং সম্পূর্ণ।

"ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্গেয় এবং রাগ স্ত্রিধামতঃ॥"

ঔড়ব পাঁচস্বরের, ষাড়ব (খাড়ব) ছয় স্বরের এবং সম্পূর্ণ সাতস্বরের রাগ বা রাগিণী।

এই সকল রাগ রাগিণী ও আবার শুদ্ধ, ছায়ালগ বা সালঙ্ক এবং সঙ্কীর্ণ ভেদে তিনপ্রকার যথা—

"শুদ্ধাশ্ছায়লগাঃ প্রোক্তঃ সঙ্কীর্ণাশ্চতথৈবচ॥"

সঙ্গীত দর্পণম্।

শুদ্ধ যে রাগে অন্য রাগের মিশ্রণ নাই। ছায়ালগ বা সালঙ্ক—যে রাগ দুইটি রাগের মিশ্রনে উৎপন্ন।

স্বরের মধুর কম্পনকে গমক কহে যথা—

"স্বরস্য কম্পোগমকঃ শ্রোতৃচিত্তসুখাবহঃ।"

রাগ রাগিণী গাইবার সময় সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যুগে অনেকে বীতশ্রদ্ধ। তাঁহারা বলেন "ও কিছু নয়, এক সময়ে গাইলেই হইল।" কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা

করিয়া দেখেন না যে ঋষিগণ কিরূপে সুক্ষ্মানুভূতির সহিত প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রাখিয়া এই সব নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

শেষ রাত্রির রাগিণীগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৮টা পর্য্যন্ত রাগিণী-গুলিতে আস্তে আস্তে কোমল সুর ব্যবহার করিয়া কোমল হইতে গম্ভীর এবং গম্ভীর হইতেই কোমলে ঠিক প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মিল রাখিয়া কেমন মনোরম ভাবে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

পুনরায় ক্রমে প্রকৃত সুরের ব্যবহার করিয়া আবার ধীরে ধীরে ভাটি বেলায় কোমল সুর প্রয়োগ করিয়া সন্ধ্যায় গিয়া পৌছান হইয়াছে। আবার সন্ধ্যার পর হইতে ক্রমে শেষ রাত্রির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুঝিয়া প্রকৃত ও কোমল সুরের ব্যবহার। প্রত্যেক সময়েই নিসর্গের সঙ্গে সুর বাঁধা। যাঁরা এসব করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদের মাখামাখি ছিল, তাঁহারা যেমন প্রকৃতিকে তাঁহাদের কাব্যে, গানে ও জীবনে একীভুত করিয়া লিখিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ করে নাই। রাগরাগিণী গাওয়ার সময় সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা আশ্চর্য্য প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের ফল, উহা না বুঝিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। জাতীয় ক্ষতি হইবে। রাগ রাগিণী অসময়ে গাইলে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা হয় না বটে, কিন্তু সঙ্গীতের মাধুর্য্য হানি হয়।

রাগরাগিণী গাওয়ার সময় সম্বন্ধে দি ইণ্ডিয়ান্ আর্ট একাডেমী (The Indian Art Accademy) নামক উৎকৃষ্ট পত্রিকায় শ্রীযুক্তলালা কান্নুমল এম, এ, জজ মহোদয় তদীয় ইণ্ডিয়ান মিউজিক নামক উপাদেয় প্রবন্ধের এক স্থানে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"The peculiarity about these Ragas and Raginis is this that they are recommended to be sung only in their prescribed season and time, for each there is a particular season and particular hour of the day or in night when it ought to be sung.

In the light of a scientific examination this rule would appear to be fully justified. It is based upon the knowledge of sound vibrations, which require suitable environments for their harmonious expression in the outside world—the effects of the varying degrees of light, and darkness upon certain combinations of sound vibrations are different. For different combinations of sound vibrations there must be different hours

of the night or the day, which are most suitable for their outward expression—the subject is most interesting and awaits research at the hands of our modern scientists."—Indian Music, page 66, the Indian Accademy of Art, October, 1920.

"রাগ রাগিণীগুলি সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে ওগুলিকে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ ঋতুতে এবং সময়ে গাইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটির জন্য একটি বিশেষ ঋতু এবং দিবা বা রাত্রির কোন বিশেষ সময় (প্রহর) নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ঐ সময়েই ওগুলি গাওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আলোকেও এই নিয়ম সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ইহা ধ্বনি-স্পন্দনের জ্ঞানের উপরেই অবস্থিত, এই ধ্বনিস্পন্দন আবার ইহার সুসঙ্গত অভিব্যক্তির জন্য উপযুক্ত আবেষ্টনীর অপেক্ষা করে। আলো ও অন্ধকারের অল্পাধিক্যের দ্বারা বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-স্পন্দন বিভিন্নরূপে প্রভাবান্বিত হয়। অতএব বিভিন্ন ধ্বনিস্পন্দনের উপযুক্ত অভিব্যক্তির জন্য দিবারাত্রির বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। বিষয়টী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার অপেক্ষা রাখে।"

আমরা আশাকরি আমাদের ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নির্দ্দিষ্ট এই বিষয়ে গবেষণার আলোক প্রেরণ করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইবেন না।

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর নাম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। মতঙ্গমুনির মতানুযায়ী নামগুলি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; আরও চারিপ্রকারের মত যাহা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম।

নারদ সংহিতার মতে—

রাগ—	রাগিণী—	রাগ—	রাগিণী—
১। মালব—(১)	ধানসী।	২। মল্লার—(১)	বেলাবলী।
(২)	মালসী।	(২)	পূরবী।
(৩)	রামকিরী।	(৩)	কাণড়া।
(৪)	সিন্ধুড়া।	(৪)	মাধবী।
(৫)	আশাবরী।	(৫)	কোড়া।
(৬)	ভৈরবী।	(৬)	কেদারিকা।
৩। শ্রীরাগ—(১)	গান্ধারী।	৪। বসন্তক—(১)	তুড়ী।
(২)	সুভগা।	(২)	পঞ্চমী।

	(৩) গৌরী।		(৩) ললিতা।
	(৪) কৌমারিকা।		(৪) পটমঞ্জরী।
	(৫) বল্লারী।		(৫) গুর্জ্জরী।
	(৬) বৈরাগী।		(৬) বিভাষা।
৫। হিন্দোল—	(১) মালবী—	৬। কর্ণাট—	(১) নাটিকা।
	(২) দীপিকা—		(২) ভূপালী
	(৩) দেশকারী		(৩) রামকেলী
	(৪) পাহিড়া		(৪) গড়া
	(৫) বরাড়ী		(৫) কামোদী
	(৬) মারহাটী		(৬) কল্যাণী

হনুমন্মতে এক একটী রাগের ৫টি করিয়া রাগিণী—

রাগ—	রাগিণী—	রাগ—	রাগিণী—
১। ভৈরব—	(১) মধ্যমাদী।	২। কৌশিক—	(১) তোড়ী।
	(২) ভৈরবী।		(২) খাম্বাবতী।
	(৩) বাঙ্গালী।		(৩ গৌরী।
	(৪) বরাটিকা।		(৪) গুণ-ক্রী।
	(৫) সৈন্ধবী।		(৫) ককুভা।
৩। হিন্দোল—	(১) বেলাবলী—	৪। দীপক—	(১) কেদারী।
	(২) রামকিরী।		কাণড়া।
	(৩) দেশাখ্যা।		দেশী।
	(৪) পটমঞ্জরী।		কামোদী।
	(৫) ললিতা।		নটিকা।
৫। শ্রীরাগ—	(১) বাসন্তী।		
	(২) মালবী।		
	(৩) মালশ্রী।		
	(৪) ধনাসিকা।		
	(৫) আশাবরী।		
৬। মেঘ—	(১) মল্লারী।		
	(২) দেশকারী।		

(৩) ভূপালী
(৪) গুর্জ্জরী।
(৫) টঙ্কা।

রাগার্ণব মতে একটি ও রাগের পাঁচটি করিয়া আশ্রিত রাগ—

রাগ— রাগিণী—

১। ভৈরব —(১) বাঙ্গালী। (২) গুণকিরী।
(৩) মধ্যমাদী। (৪) বসন্তক।
(৫) ধানশ্রী।

২। পঞ্চম— (১) ললিতা। (২) গুর্জ্জরী।
(৩) দেশী। (৪) বরাড়ী।
(৫) রামকৃৎ।

৩। নাট— (১) নট্টনারায়ণ। (২) গান্ধার।
(৩) সালগ। (৪) কেদার।
(৫) কর্ণাট।

৪। মল্লার— (১) মেঘ। (২) মল্লারিকা।: (৩) মাল কৌশিক।
(৪) পঠমঞ্জরী। (৫) আশাবরী।

৫। গৌড়মালব— (১) হিন্দোল। (২) ত্রিবনা। (৩) আন্ধারী
(৪) গৌরী। (৫) পঠহংসিকা।

৬। দেশাখ্য— (১) ভূপালী। (২) কুড়ায়ী। (৩) কামোদী
(৪) নটিকা। (৫) বেলাবলী।

৺সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিধানের মত—

রাগ— রাগিণী।

১। শ্রী— (১) মালশ্রী। (২) ত্রিবণা। (৩) গৌরী।
(৪) ভূপালী। (৫) বরাটী। (৬) কল্যাণী।

২। কান্ত। (১) হিন্দোলী (২) গুর্জ্জরী। (৩) মালবী
(৪) পঠমঞ্জরী। (৫) সাবেরী (৬) কৌশিকী।

৩। ভৈরবী— (১) ভৈরবী (২) তোড়ী (৩) রামকিরী
(৪) গুণকিরী (৫) বাঙ্গালী (৬) সৈন্ধবী।

৪। পঞ্চম— (১) দেবকিরী (২) ললিতা (৩) কর্ণাটী
(৪) বড়হংসিকা। (৫) আভিরী।

৫। মেঘ— (১) মধুমাধবী (২) মল্লারী (৩) সৌরাটী
(৪) গান্ধারী (৫) হরশৃঙ্গারা (৬) সারঙ্গী।
৬। নট্টনারায়ণ— (১) পাহাড়ী (২) দেশী (৩) কেদারী
(৪) কামোদী (৫) নাটিকা (৬) হাম্বিরী।

নামগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ নামই দেশের নামানুযায়ী রাখা হইয়াছে। গৌরী ও বাঙ্গালী নামে আমাদের বঙ্গদেশ ও যে হিন্দু আমলে সঙ্গীত চর্চ্চায় পশ্চাৎপদ ছিল না তাহা প্রমাণিত হয়। গৌরী সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও বাঙ্গালী যে বঙ্গদেশের তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মতঙ্গমতে হনুমন্মতে, রাগার্ণবমতে এবং সুবল বাবুর অভিধান মতে বাঙ্গালী রাগিণী ভৈরব রাগের স্ত্রী বলিয়াই কথিত হইয়াছে। মতঙ্গ বাঙ্গালীর রূপ কল্পনা করিয়া তাহার ধ্যান ও রচনা করিয়াছেন। কেবল মাত্র নারদ সংহিতায় ভৈরব রাগ বা বাঙ্গালীর নাম নাই। কথিত আছে যে ছয় রাগের আবার ছয়টি করিয়া পুত্র (উপরাগ) সেই পুত্রদের আবার প্রত্যেক ছয়টী করিয়া বধূ এবং বধূদের আবার প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া সখী আছে।

তবেই উঁহাদের সংখ্যা হইল—

রাগ—	৬— ৬
রাগিনী—	৬×৬= ৩৬
পুত্র (উপরাগ)	৬×৬= ৩৬
পুত্র বধূ—	= ৩৬
সখী—	= ৩৬
মোট—	১৫০ দেড়শত।

ক্রমশঃ

বন্দী-জীবন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(শ্রীশচীন্দ্র নাথ সান্যাল)

যতীন বাবুর বিশেষ অনুরোধ ছিল যেন এই বিপ্লবের দিন এমন ভাবে পিছাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে তাঁহারা বাঙ্গলাদেশে গিয়া অন্ততঃ মাস দুই সময় পান এবং ইতিমধ্যে কিছু টাকাও সংগ্রহ করিতে পারেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলেন যে হাতে যথেষ্ট অর্থ না লইয়া এ কার্য্যে নামা উচিত নহে, কিন্তু এই যথেষ্টর ধারণা তাঁহার অসম্ভব রূপের ছিল এবং তাহা অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করাও একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার ছিল, অবশ্য যতীনবাবুও তাহা শেষে স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি এদিকের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতে ছিলেন না। পাঞ্জাবের-সিপাহীরা সে সময় নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া :পড়ে, আর এই অসহিষ্ণুতার একটি প্রবল কারণ ছিল কবে যে তাহাদিগকে একদিন হঠাৎ পশ্চিমের রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিলনা; এবং ভারতেও বিভিন্ন সৈনিকদলদিগকে ক্রমাগত একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে পাঠান হইতেছিল। সেই জন্ত পাঞ্জাবের অনুকুল অবস্থায় না থাকিতে পাইয়া যদি সেই সকল সৈনিকদিগকে দক্ষিণ দেশের কোনও প্রান্তে গিয়া পড়িতে হয় তাহা হইলেও তাহাদের সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। এইরূপে নানা কারণে পাঞ্জাবের সিপাহিদিগকে শান্ত করিয়া রাখাও যেমন দুরুহ ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়া ছিল, আবার ঐরূপ বিপ্লবের জন্ত প্রস্তুত এমন সৈনিকদিগকে পাছে অন্ত কোথাও পাঠাইয়া দেওয়া হয় এই ভয়ও আমাদের তেমনি প্রবল ছিল। এই সকল কারণে যতীন বাবুর অনুরোধ আমরা রাখিতে পারি নাই। আমরাও বরং একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম যাহাতে এইরূপ সুযোগ কোনও কারণে মাটি হইয়া না যায়। তাই আমরা একদিকে যেমন সিপাহিদিগকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম, অন্তদিকে আবার তেমনই সারা দেশ জুড়িয়া যাহাতে একযোগে কিছু করিতে পারা যায় তাহারও আয়োজন করা হইতেছিল এবং এইরূপে সকল দিক ভাবিয়া যাহাতে কালবিলম্ব না হয় সে বিষয়ও যথেষ্ট সচেষ্ট থাকা

গিয়াছিল। যতীন বাবুকেও এই সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলা হয় এবং অগত্যা তাঁহাদিগকেও আমাদের সাথে সাথেই সমানেই পা ফেলিতে হয়।

চিরকাল আমাদের এই ধারণা ছিল যে অশিক্ষিত জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া তোলা তেমন কিছু শক্ত কাজ নহে, কিন্তু এই জনসাধারণকে কেবলমাত্র ক্ষেপাইয়া তুলিলেই যে আমাদের বিশেষ কিছু কার্য্যসিদ্ধি হইবে সে ধারণা আমাদের কোন কালেই ছিলনা, তাই আমরা সেদিকে তেমন কিছু মনোযোগ দি নাই। আমরা মনে করিতাম যে যদি প্রথমে দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে লইয়া দেশব্যাপী এক বিরাট সংঘ গড়িয়া তোলা যায় এবং পরে যদি দেশীয় সৈনিকদিগকে আমাদের ভাবে দীক্ষিত করিতে পারা যায় তাহা হইলেই বিপ্লবের গোড়া পত্তন করা হইবে, কিন্তু এই আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দিগের সহিত আমরা কোনও যোগাযোগ রাখি নাই, আমাদের বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলে এই গলদই সর্ব্বাপেক্ষা বড় গলদ দিল। এমনকি কতবার কত সময় ইহাও আলোচিত হইয়াছে যে এই আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক ভাবে অস্ত্র শস্ত্রের আমদানির বন্দোবস্ত হওয়া উচিত কিন্তু নেতৃবৃন্দেরা এদিকে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন এখনও সময় আসে নাই। কিন্তু সময় যখন আসিল তখন আর এ বন্দোবস্ত করিবার অবকাশ অথবা সুযোগ কিছুই ছিল না। সমগ্র দেশ জুড়িয়া না হইলেও বাঙ্গলায় এবং পাঞ্জাবে যুবকবৃন্দকে লইয়া যে সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার ব্যাপকতা বড় কম ছিলনা কিন্তু এই সংঘের বিকাশ এবং পরিণতি বাঙ্গলায় যেমন হইয়াছিল এমন আর কোথাও হয় নাই। এই সংঘশক্তি ব্যক্তির অন্তরের গঠনে ও পরস্পরের কিছু কালব্যাপি সাহচর্য্যের ফলে যেমন পরিস্ফুট হইয়া ওঠে এমন আর কিছুতে হয়না। তাই প্রকৃত সংঘশক্তি বাঙ্গলাতে ঠিক গড়িয়া উঠিয়াছিল, কারণ পাঞ্জাবের এই বিপ্লবায়োজন প্রধানতঃ বিদেশাগত শিখদিগের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। দেশের সহিত এই বিদেশাগত শিখদলের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিলনা, অথচ বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের কিছুকালব্যাপি সাহায্যের ফলেও এই দল গড়িয়া ওঠে নাই। দেশবাসীও ইহাদের প্রতি কতকটা উদাসীনই ছিল, বাঙ্গলায় কিন্তু দেশবাসীর এতটা উদাসীনতা ছিল না। তাছাড়া যাহাদের লইয়া এই সংঘ গঠিত হইবে তাহাদের মনে প্রাণে আদর্শের প্রেরণা যত গভীর হইবে ও সেই আদর্শ যত উচু সুরে বাঁধা হইবে সেই সংঘ সেই পরিমাণে শক্তিশালী হইবে। এই কারণেও বাঙ্গলায় সংঘশক্তির তুলনায়

বাঙ্গলার বাহিরের কোনও সংঘই তেমন শক্তিশালী ছিলনা ;—বাঙ্গলায় বিভিন্ন আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতের ক্রীড়া যেমন অভিনবরূপে দেখা দিয়াছে, বাঙ্গলার বাহিরে কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না। আমাদের এই বিপ্লবপ্রচেষ্টার সহিত ভারতের জাতীয় জাগরণের বিভিন্নদিকের কি সম্বন্ধ ছিল এবং বিপ্লববাদীদের ব্যক্তিগত জীবনে কিরূপে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছিল সে আলোচনা বাঙ্গলার কথায় প্রসঙ্গে করিব ; তার প্রধান কারণ, এই আদর্শের দ্বন্দ্ব বাঙ্গলায় যেমন অনুভব করিয়াছি বাঙ্গলার বাহিরে সেরূপ করি নাই, আর এখন আমি প্রধানতঃ বাঙ্গলার বাহিরের আন্দোলনের কথাই বলিতেছি। বাঙ্গলার বাহিরে আমরা প্রধাণতঃ বিপ্লব প্রচেষ্টার খুঁটিনাটি লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু বাঙ্গলায় যেন ভারতের জাতীয় জাগরণের একেবারে মর্ম্মের সহিতই আমরা অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলাম।

বাঙ্গলায় যদি বাঙ্গালীদের সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইবার অন্যান্য প্রদেশের মত তেমন সুযোগ থাকিত তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই বাঙ্গলায় বিপ্লব হইয়া যাইত কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাঞ্জাবে বিপ্লবের কার্য্য যেমন দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে আমার কেবলই মনে হইতেছিল বাঙ্গলা নাজানি এ সময়ে কিরূপে এ বিপ্লবে যোগ দিবে। বাঙ্গলায় অতীত যুগের কলঙ্কের কথা স্মরণ হইলে আমার বড়ই কষ্ট হইত, সেই জন্য বরাবরই আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল বাঙ্গলায় গিয়া কাজ করি। তাই যতীনবাবুরা যখন বাঙ্গলাদেশে ফিরিয়া গেলেন তখন আমিও বাঙ্গলায় যাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পড়ি, কিন্তু দাদা কোন মতেই তাহাতে মত দেন নাই। দাদা বলেন যে তিনি স্বয়ং পাঞ্জাবে যাইবেন এবং আমার বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মধ্যপ্রদেশে থাকিয়া এই দুই প্রান্তের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত রাখিতে হইবে। কাজে কাজেই আমাকে মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে কাশীতেই থাকিতে হইল।

ঠিক এই সময় হইতে বাঙ্গলায় মোটর ডাকাতি আরম্ভ হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি ডাকাতি হইয়া অনেক টাকা সংগ্রহ হয়। এই সকল ঘটনারই অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে রডা কোম্পানীর ৫০টি মশার পিস্তল ও প্রায় ৫০ হাজার টোটা চুরি যায়। এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় বিপ্লবের কর্ম্ম-ধারা মাত্র দুই একটি দলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যতীনবাবুও খুবই কর্ম্মকুশলী ছিলেন কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তিনিও কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চেষ্ট থাকায় অন্যান্যদলে তেমন কাজকর্ম্ম কিছু হইতে ছিলনা, এইবার যতীনবাবু পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যে

লাগার ফলে বাঙ্গলায় অদ্ভুত কর্ম্মপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের সেই অভিনব আত্মপ্রকাশে আমরা সকলেই চমকিত হই।

এদিকে রাসবিহারীও পাঞ্জাবে রওয়ানা হইলেন। তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য তখন ৭৫০০৲ সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত ছিল। রাসবিহারীকে ধরিতে না পারায় সরকার পক্ষের কার্য্যকুশলতার নিন্দা হইতেছিল অথচ তাঁহাকে ধরিবার জন্য ভারত সরকারের কোন্ শক্তিইনা অব্যয়িত ছিল! একদিকে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বৃটিশ রাজশক্তি, অর্থবলের ও লোকবলের যাহার তুলনা নাই, এতবড় সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্যের যাহারা চালক, সারা দেশজোড়া যাহাদের অদ্ভুত ব্যবস্থা (organisation), যাহাদের গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতার তুলনা এক রুষ ছাড়া এশিয়ার মধ্যে আর কাহারও সহিত হইতে পারে না, আর একদিকে দরিদ্র ভারতীয় বিপ্লবদল—এত দরিদ্র যে একদিন রাসবিহারী নিজেকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাদিগকে ৭৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে বলেন,—আর যাহাদিগকে দেশের লোকেরা তাহাদের সহানুভূতি থাকা সত্বেও ভয়ে কোনরূপে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক ছিল. এবং যাহাদের নেতারা সমাজে নিতান্তই অপরিচিত ছিলেন, এক কথায় যাহারা একান্তই নিঃসহায়, যাহাদের বল ও ভরসা ছিল কেবলমাত্র নিজেদের অন্তরের অসীম বিশ্বাস ও চিত্তের অদ্ভুত দৃঢ়তা, যাহারা স্বীয় বাসভূমেই স্বদেশ-বাসীর দ্বারা উপেক্ষিত—এইরূপ দুই দলের অসমদ্বন্দ্বে কিন্তু বিপ্লবদল বহুদিন যাবৎ নিজেদের কেবল যে আত্মরক্ষাই করিয়াছিল তাহা নহে ইংরাজ সরকারকেও কম ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে নাই; আর এইরূপ প্রবল ইংরাজশক্তিও যে রাসবিহারীকে ধরিতে সমর্থ হয় নাই তাহার প্রধান কারণ ছিল আমাদের সংঘের ব্যাপকতা ও সুবন্দোবস্ত। উপযুক্ত শক্তিশালীও সুনিয়ন্ত্রিত সংঘ না থাকিলে রাসবিহারীকেও বাঁচান কখনই সম্ভব হইত না, অবশ্য ইহারও উপরে ছিল রাসবিহারীর কার্য্যকুশলতাও তাঁহার ভাগ্য। কেবল যে রাসবিহারী এইরূপ আত্মগোপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা নহে, আরও বহু যুবক এই সময় হইতে আর ইহার পরেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সকল শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া তিন চারি বৎসর যাবৎ এবং কেহ কেহ ইহারও অধিককাল পর্য্যন্ত আত্মগোপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

রাসবিহারী রাত্রের গাড়ীতে দিল্লী হইয়া পাঞ্জাব রওয়ানা হইলেন। এই সময় হইতে প্রায় সকল সময়েই আমাদের কেহ না কেহ রাসবিহারীর সঙ্গে

সঙ্গে থাকিতই। দিল্লী যাওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটে নাই, গাড়ী যখন দিল্লী ষ্টেসন ছাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল তখন অকস্মাৎ রাসবিহারী দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাদেরই ছোট কামরাটীতে তাঁহারই পরিচিত এক গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা বসিয়া আছেন। তাঁহার সে সময়কার মনের অবস্থা কেবল কল্পনার সাহায্যেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মাথার টুপির গুণে সে রাত্রে রাসবিহারী নিষ্কৃতি পাইলেন এবং পরবর্ত্তী ষ্টেসনে সে কামরাটি পরিত্যাগ করিয়া আর একটি কামরায় গিয়া বসিলেন। এইরূপে শান্তসমাহিতচিত্তে কিন্তু দৃঢ়পদে রাসবিহারী সব জানিয়া শুনিয়াই তীব্র অনলরাশির মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রাসবিহারী অমৃতসরে গিয়া পৌছিলেন।

এদিকে যুক্তপ্রদেশের, বিহারের ও বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন সেনা নিবাসে আমাদের লোকদের যাওয়া আসা চলিতে থাকিল। অল্প কএকদিনের মধ্যেই পাঞ্জাব হইতে কার্ত্তারসিং ও আরও কএকজন শিখ পাঞ্জাবের সংবাদ লইয়া কাশীতে আসিলেন। উত্তর ভারতের সব সেনানিবাসের তথ্যই আমরা তখন সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি। সকল স্থানের সংবাদ লইয়া বুঝিয়াছিলাম যে সে সময়ে সারা ভারতে ইংরাজ সৈন্য নিতান্তই অল্প ছিল এবং যাহা ছিল তাও সব একেবারে raw recruits। Territorial force এর বালক এবং তালপাতার সিপাহির মত যুবকদিগকে দেখিয়া আমাদের বড় লোভ হইত যেন শীঘ্র একবার শক্তিপরীক্ষার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সময় সারা উত্তর ভারতে দুই তিনটি বড় বড় cantonment এবং কাবুলের সীমান্তদেশ ছাড়া কোন স্থানেই ৩০০ শতের বেশী ইংরাজ সৈন্য ছিল না। বড় বড় cantonmentএ ও এক হাজার হইতে দুই হাজারের মধ্যেই সৈন্যসংখ্যা ছিল। বিভিন্ন cantonmentএ যা অস্ত্র শস্ত্র ছিল তাহাতে অন্তত বৎসরখানেক বেশ ভালরূপেই দ্বন্দ্ব চলিতে পারিত। কোন্ রেজিমেণ্টে কত বাক্স রাইফেল আছে, কয় বাক্স টোটা আছে, ম্যাগাজিন কাহাদের প্রহরায় থাকে, ও সেই প্রহরার প্রণালী কিরূপ ইত্যাদি যত সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল তাহা আমরা করিয়াছিলাম। দেশী সৈন্যের মানসিক অবস্থা তখন বড়ই খারাপ ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা মনে করিতেছিল বুঝি এখনইবা ইয়ুরোপ যাইবার আদেশ জারী হয়। দিন যায় কি ক্ষণ যায় এইরূপে তাহাদের সময় কাটিতেছিল। আমাদের যুবকেরা তাহাদের সেনানিবাসে যাইলেই অতি

সমাদরের সহিত সিপাহিরা তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিত এবং অতি আগ্রহভরে তাহাদের কাথাবার্ত্তা শুনিত। একবার একটি যুবক একটি রেজিমেণ্টে যাইলে সেইদিন রাত্রেই তাহারা একটি বৈঠক করে। সেই বৈঠকে একেবারে খুব উচ্চপদস্থ সিপাহিরা ছাড়া আর সকলেই আসিয়াছিল। অতি আগ্রহভরে সেই বিদেশাগত যুবকের কথা তাহারা সকলে শুনিল। পরিশেষে বলিল এই বিপ্লবে তাহারা অগ্রণী হইবে না, তবে তারা বিশেষ সতর্ক রহিল যাহাতে বিপ্লবের দিনে ম্যাগাজিন তাহাদের হাত ছাড়া না হইয়া যায়। এই বিপ্লব সত্যই আরম্ভ হইলে তাহারও নিশ্চয়ই বিপ্লবে যোগ দিবে।

কাশীর রেজিমেণ্টে আমরা আরও কয়েকবার গিয়াছিলাম। দৌল্লাসিং ছাড়া এ রেজিমেণ্টের আর সকলে খুব ভাল লোকছিল, তাহারা সকলে যথার্থই দেশের জন্য বিপ্লবে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল। দৌল্লাসিং একদিন আমাদের জিজ্ঞাসা করে "বাবু দেশ স্বাধীন হইলে আমাদের কিছু জায়গীর ইত্যাদি মিলিবে।" একদিন গানকটন্ লইয়া গিয়া তাহাদিগকে আমাদের কেরামতি দেখাই এবং বলি যে দেখ ইহা সাধারণ তুলা নহে, ইহাতে আগুন দিবামাত্র কেমন দপ্ করিয়া সমস্তটা জ্বলিয়া যায়, এবং ভস্মাবশেষ কিছুই থাকে না; তাহারা এই সব দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইত। এইরূপ নানাভাবে আমরা দৌল্লাসিং ও তাহাদের অনুচরদিগকে আমাদের মতে আনিতে চেষ্টা করিতাম। এই রেজিমেণ্টের কয়েকজনের সহিত পরে আমার দেখা হয়। তাহারা কত ভক্তিভরে নতমস্তকে আমার সহিত আলাপ করিয়াছে, একজন, প্রায় ৫০সের উপর তাহার বয়স হইবে, আমাকে বলে বাবু আমার সময় কার পরিচিত কোন লোকই আর ইহজগতে নাই কেবল আমিই বাঁচিয়া আছি, আমারও মরণের বয়স হইয়াছে, এখন বাবু মৃত্যুকে আমার ভয় নাই, আর বাবু তুমিই আমার গুরু তুমিই আমার মন সংসার হইতে টানিয়া ভগবানের দিকে লাগাইয়া দিয়াছ।

অনেক রেজিমেণ্ট আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া আবার অল্পদিনের মধ্যেই অন্য স্থানে বদলি হইয়া গিয়াছে; এইরূপে কিন্তু অনেক সময় আমাদের প্রচার দূর দেশান্তর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছে।

রেজিমেণ্টে প্রচার ছাড়া এই সময় আমরা গ্রামের জনসাধারণদিগের মধ্যেও প্রবেশ করিবার চেষ্টা করি। যুক্ত প্রদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে সেখানে কেবল ক্ষত্রিয় দিগের নিবাস। এইরূপ নানা কেন্দ্র হইতে ইংরাজের রেজিমেণ্টের জন্যও সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। যুক্ত প্রদেশের ও পাঞ্জাবের অশিক্ষিত জন

সাধারণ বাঙ্গলার জনসাধারণের মত নহে। একেত তাহারা বাঙ্গালীদের চাহিতে যথেষ্ট বলিষ্ঠ তা ছাড়া ইহাদের মধ্যে অতীতের গর্ব্বস্মৃতি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। ইহারা অশিক্ষিত বটে কিন্তু ইহাদের রাজনৈতিক সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। ইহাদের নিজেদের ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ ও মোহ বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চাইতেও অত্যন্ত প্রখর। উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীনতায় পরিচালিত হইলে এই সকল অশিক্ষিত লোকেরা অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারিবেন।

এই সকল লোকেদের মধ্যেও আমাদের যাতায়াত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্য হইতেও যে সাড়া আমরা পাইয়াছিলাম তাহাও নেহাৎ কম আশাপ্রদ ছিল না।

ওদিকে রাসবিহারীও পাঞ্জাবের সৈনিকদিগের সহিত দেখাশুনা করিতে থাকেন। দাদা যে বাড়ীতে থাকিতেন সেখানে কাহারও সহিত দেখা শুনা করিতেন না। দেখা শুনা করিবার জন্য দুই তিনটি পৃথক বাটি নির্দ্দিষ্ট ছিল। সিপাহিদের সহিত তিনি এইরূপ একটী বাটিতেই দেখাশুনা করিতেন। লাহোরের দুইটি সিপাহির বিষয় যাহা শুনিয়াছি তাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার মত। একটির নাম লছমনসিং আর একটি মুসলমান তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। ইহারা দুইজনেই হাবিলদার ছিলেন; সিপাহী দিগের উপর লছমনসিংএর খুবই প্রভাব ছিল। এই রেজিমেণ্টের কএকজন সিপাহীর সহিত আন্দামানে আমার আলাপ হইয়াছে। তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি: যে লছমন সিং বহু কাল হইতে নিজের রেজিমেণ্টে একটি ছোট খাট দল তৈয়ারি করে। তাহারা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই একত্র হইত এবং শিখধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও নানা বিষয় লইয়া আলোচনা ইত্যাদি করিত। অনেকসময় রেজিমেণ্টের ইংরাজ কর্ত্তারা ঐ ব্যাপার শুনিয়া তাহা বন্ধ করিবার আদেশ দেন। এইরূপ মাঝে বন্ধ হইয়াও সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর কার্য্য কএক বৎসর ধরিয়া বরাবর চলিয়া আসিতে-ছিল। রেজিমেণ্টের সকলেই লছমন সিংকে খুব ধার্ম্মিক ও উন্নতচরিত্রের লোক বলিয়া জানিত। যখন লছমন সিংএর ফাঁসির পর সেই মুসলমান হাবিল-দারটিকে জীবনদানের প্রলোভন দেখাইয়া কিছু গোপন কথা আদায় করিবার চেষ্টা করা হয় ও বলা হয় সেকি এক কাফেরের সহিত একত্র ফাঁসি যাওয়া পছন্দ করিবে? উত্তরে সেই মুসলমান হাবিলদারটি বলে "যদি আমি লছমন সিংএর সহিত একত্রে ফাঁসি যাইত আমার স্বর্গবাস হইবে।" সেই মুসলমান টিরও ফাঁসি হয়।

বিপ্লবের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই আমাদের ভয় হইতে লাগিল "পারিব কি! পারিব কি এমন গুরুভার বহন করিতে?" সত্যই বিপ্লবের যত আয়োজন আমাদের বুদ্ধিতে যোগাইয়াছিল তা আমরা করিতে কিছুই ত্রুটি করি নাই, কিন্তু তবুও সেই আগতপ্রায় দিনের কথা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠিত। দাদাও পাঞ্জাবে যাইবার পূর্ব্বে কতবার এইরূপ বলিয়াছিলেন।

আমাদের আসলে মৎলব ছিল যে একদিন সহসাই সকলের অজ্ঞাতে উত্তর ভারতের সেনানিবাসগুলির যত ইংরেজ সৈনিকপুরুষ থাকিবে তাহাদের সকলকেই একই দিনে আক্রমণ করা হইবে এবং সেই সংঘর্ষে যাহারা আমাদের নিকট আত্ম সমর্পণ করিবে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইবে। বিপ্লব রাত্রে আরম্ভ করা হইবে এবং সেই রাত্রেই সহরের তার ইত্যাদি ছিন্ন করিয়া ইংরাজ ভলান্টিয়ার ও সমর্থ পুরুষদিগকে আটক করিয়া খাজনা লুট করিয়া জেল খালাস করিয়া সেই সহরের ব্যবস্থার ভার নিজেদের নির্ব্বাচিত কাহারও উপর ন্যস্ত করিয়া পাঞ্জাবে গিয়া সকল বিপ্লবদল একত্র হইব। এবং বিপ্লব আরম্ভ হইলে শেষ পর্য্যন্ত যে আমরা ইংরাজের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে জয়ী হইব তা আমরা মনে করিতাম না। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাদের ধারণানুযায়ী একবার বিপ্লব আরম্ভ হইলে আন্তর্জাতিক এমন এক বিচিত্র অবস্থা দাঁড়াইবে যে যদি বৎসর খানেকও আমরা উপযুক্তরূপে এই দ্বন্দ্ব চালাইতে পারি ত বিদেশের বিভিন্ন জাতির পরস্পরের বিদ্বেষের ফলে ও ইংরাজের শক্তির সহায়তায় দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হইলেও অসম্ভব হইবে না।

একদিন পাঞ্জাব হইতে এই সংবাদ লইয়া কয়টি লোক আসিলেন যে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দিন স্থির হইয়াছে। অবশ্য বিপ্লব রাত্রেই আরম্ভ হইবে। সেদিন রবিবার। মুহূর্ত্তের মধ্যে এক তীব্র আবেগে সারা দেহ মন কেমন এক-রূপ ভাবে শিহরিয়া উঠিল, সে ঠিক আনন্দও নহে, সে এক অননুভূত বিচিত্র ভাব। বিপ্লবের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি আছে। বিপ্লবের তারিখ অন্যান্য দিকেও পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ক্রমশঃ

ডালি।

স্বাধীনতার ভিত্তি।

(টেরেন্স ম্যাকস্উনি)

(১)

স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিব কেন ? এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বা উহার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি ? বহু শতাব্দী ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছি, আজও বিরোধী দল এই সমরে নিরত রহিয়াছে, কিন্তু এই সমরের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, উহার যথার্থ উদ্দেশ্য বা কি কাহারও আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহার ফল বিচিত্র হইলেও ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে। সাধারণতঃ যাহাদিগকে একদল ভুক্ত বলা হয়, তাহাদের আদর্শের ও কর্ম্মপন্থার গভীর ও বিস্তর প্রভেদ রহিয়াছে, অপর পক্ষে যাহারা ভিন্নপন্থী বলিয়া পরিচিত তাহাদের মধ্যে আমাদের বুদ্ধিশক্তির অতীত গূঢ় অর্থে অনেক মিল রহিয়াছে।

(২)

এই প্রশ্নের আলোচনাই করিব। আয়ারল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র এই নীতিই প্রচলিত দেখিতে পাইবে—মহৎ উদ্দেশ্যের সাধনে যে উপায় অবলম্বন করা যাউক না কেন—তাহা দোষাবহ নহে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে অসৎ উপায় অবলম্বন করার জন্য নিন্দা করে কিন্তু ঐ সকল নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করিতে স্বয়ং কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না যদি তদ্দ্বারা অযশস্কর জয়লাভ সম্ভবপর হয়। সুতরাং স্পষ্ট কথা বলা প্রয়োজন হইয়াছে। অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত জয় পরাজয় অপেক্ষা লজ্জাজনক। এই কথা এইস্থানে তুলিলাম কারণ আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে চাই আর কারণ এইরূপ আলোচনাও আমাদের কানে পৌছিয়াছে যে যদি সম্ভব হয় ইংরাজ শক্তি নিহত করিবার জন্য আমাদের বিদেশীর সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য। আমাদের বৈদেশিক মিত্রপুঞ্জ অপরাপর স্থানে স্বাধীনতা দলন করিতে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও এমন কথা উঠে বলিয়াই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। অপর জাতির দলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করিয়া যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে হয় তবে বহু যুগ ধরিয়া ব্যথিত আয়ারল্যাণ্ডের হৃদয় হইতে স্বেচ্ছাচারী কঠিন শাসনের মস্তকে যে

অভিসম্পাত পতিত হইয়াছে, আয়ারল্যাণ্ড সেই অভিসম্পাতই অর্জ্জন করিবে। আমি বুঝিতে পারিতেছি ঘৃণিত উপায়ে আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবপর। সেই জন্যই আত্মপক্ষ ঘোষণা করা ও কোন্ পথে চলিতেছি জানা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমার এই বিশ্বাস যে কোন দৈহিক জয়ই আত্মসমর্পণের তুল্য নহে। যে পক্ষ ইহা স্বীকার করে না, সে পক্ষে আমি নাই। তবে আমাদের স্বাধীনতা দাবীর মূল কারণ কি? ইহার পর্য্যালোচন করিবার দুইটি দিক আছে। প্রথমতঃ যখন আমরা সবে মাত্র বিদ্যালয় হইতে বাহির হই, তখনও অপরিণতবুদ্ধি, সকল বিষয় আক্রমণ করিতে তৎপর, বড় বড় কথা বলিতে আনন্দ পাই, স্বাধীনতা বিষয়ে নির্ভয়ে অনেক কথা বলিয়া ফেলি কিন্তু কথাগুলি কানে বীরোচিত শুনাইলেই সন্তুষ্ট—বাস্। পরে অপর দিক হইতে দেখি—তখন আর আমরা বালক নই। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচন করিবার ক্ষমতা হইয়াছে, জীবনে নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছি, অনেক বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি; সংগ্রামের পর সংগ্রাম করিয়াছি, বিরক্তি জন্মে নাই, গতি সংযত হইয়াছে; গভীর বিষয়ে ব্যস্ত থাকিতে হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করি; আজ ইহাই কেবল পর্য্যাপ্ত নয় যে যাহা বলিয়াছি নির্ভীকের মত শুনা গিয়াছে পরন্তু সেগুলি সত্য হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যালয়ের বালকের যে স্বপ্ন সে রোমবাসীদের জয়ের মত—সৈন্য দলন, জয়ধ্বনি, পতাকা সঞ্চালন—কোনটাই মন্দ নয়। কিন্তু মানুষের যে সাধনা তাহা এই আড়ম্বরের পশ্চাতে এক বস্তুর জন্য। যদি তাহা না হইত, ত্যাগের দাবী ইহা করিতে পারিত না।

(৩)

আমাদের স্বাধীনতার প্রধান প্রয়োজন হইতেছে—মানসিক উৎকর্ষসাধন। পার্থিব দিকটা কেবল গৌণ কারণ মাত্র। প্রাণময় ব্যক্তি আত্মা ও শরীরের কতকগুলি শক্তি লাভ করিয়াছে। এই সকল শক্তির পুষ্টিসাধন করিতে সম্যক অবসরপ্রাপ্তি ব্যক্তির ও সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন; যাহাতে মানুষ আপনাকে গৌরবপূর্ণ করিতে পারে। স্বাধীনরাজ্যে পূর্ণ আত্মবিকাশের অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ অবস্থান করে। অধীন রাজ্যে ঠিক ইহার বিপরীত—পার্থিব দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, লুণ্ঠনের গ্রাসে পড়িয়া নৈতিক অবনতি ঘটে—বৃহত্তর জাতি আপনার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে দূষিত প্রভাব বিস্তার করে, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া। এই নৈতিক অবনতি

পাপের পুষ্টিসাধন করিতেছে, এই জ্ঞানে জাতীয় অধীনতার প্রতিবন্ধকতা সাধন করিতে হইবে। পাপকে যখন পাপ বলিয়া জানি, তাহার সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত আমাদের মতান্তর থাকে না; ইহার সম্বন্ধেও তাহাই। ইহার সহিত সন্ধি সর্ত্ত চলে না। ন্যায্য শাসনের কর্ত্তব্য প্রজার উৎকৃষ্ট গুণনিচয়ের পুষ্টিসাধন করা। স্বেচ্ছাচারী বলপূর্ব্বক দখলকারী শাসকের স্বভাব নীচবৃত্তির বিকাশ সাধন করা।

ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের শাসকসম্প্রদায় যখন আয়ারল্যাণ্ডে পদার্পণ করেন, তাহাদের শাসনের সমর্থনকারীদিগের উপর অনুগ্রহবর্ষণ ও খেতাপ অর্পণ করেন। কিন্তু দেখা যায় শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ বা বড় খেতাব তাহাদের ক্ষমতা সাধুতার সহিত সমর্থনের জন্য দেওয়া হয় না, পরন্তু তাঁহাকে দেওয়া হয় যিনি জাতীয় পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এই সমুদয় লোক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিত কিন্তু ঘৃণিত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। এই অধঃপতিত রাজনীতিবিশারদের প্রকৃতি পূর্ব্বে নিশ্চয়ই উন্নত ছিল। স্বাধীন রাজ্যে এই প্রকৃতি উৎসাহ পাইয়া বিকাশ লাভ করিত। স্বাধীনতা অপহারকেরা তাহার নীচবৃত্তির ব্যবহারের জন্য তাহাকে খেতাব দিয়াছে। এইরূপ প্রলোভনই নৈতিক অবনতির কারণ। আমরা কেহই দেবতা নই, অনুকূল অবস্থাতেও উচিত কর্ম্ম করা আমাদের নিকট দুরূহ বোধ হয়। অসৎ কর্ম্ম করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রলোভিত হইয়াই নীচাশয় হইয়া পড়ি। সুখের বিষয় আমাদের মধ্যে অনেকেই এই কুপ্রভাবের বশবর্ত্তী হইবে না কিন্তু এইরূপে আমরা আদর্শে আস্থা হারাই। আমরা উদাসীন। আমাদের শক্তি আছে কিন্তু তাহার উৎকর্ষ সাধন করি না। মহৎ ও সুন্দর কর্ম্ম করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠা প্রয়োজন।

সর্ব্বত্র রুদ্ধ ও অপচিত ভূমিতে ঐরূপ আশা করা যায় না। এই অন্তর্শক্তির অপচয়েই স্বাধীনতার দাবীর গভীরতর প্রয়োজনীয়তা নিহিত রহিয়াছে।

(৪)

এই মানসিক উন্নতির অনুবোধই মুখ্যভাবে আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। এই সুন্দর আদর্শ প্রণোদিত হইয়াই কর্ম্ম করিতেছি। কার্য্যকারী উদ্দেশ্য এইরূপ সুন্দর ও সত্য হওয়া প্রয়োজন। স্বদেশপ্রীতিই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে, শত্রুর প্রতি ঘৃণা বা অতীতের জন্য প্রতিহিংসা

বৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা নয়। ক্ষণকাল চিন্তা কর। আমাদিগের উদ্দেশ্যের ঘৃণাজনক অর্থ প্রদান করিয়া আমরা সময়ে সময়ে হিংসাবৃত্তির উদ্রেক করিতেছি আর এই উদ্দেশ্যকে এত হীনবল করিতেছি, যে ইহা দ্বারা প্রতিবন্ধক হইতে অব্যাহতি পাইতে চাই পরন্তু প্রতিবন্ধককে জয় করিতে চাই না। নির্মল প্রীতি সকল আকারেই বীর্য্যশালী, প্রাণময় ও উষ্ণ-শোণিতপূর্ণ। মূর্খ ব্যক্তি পবিত্র বিষয়কে উপহাস করিলে আমাদের অন্ততঃ জ্ঞানী হওয়া কর্ত্তব্য। পবিত্র দ্রব্যের সার্থকতা রক্ষা করিয়া মানুষ জগতের কল্যাণ সাধন করে। বাঁচিতে হইলেই সুস্থ মনেরও সুন্দর দ্রব্যের প্রয়োজন আছে—গানের ভাবঘোর, প্রবহমান তড়াগের গম্ভীর সঙ্গীত সূর্য্যোদয়ের শোভা ও স্বপ্ন আর প্রভাতের গভীরতর কল্পনা। স্বদেশপ্রীতিই অধুনা ক্ষীণ ও পাণ্ডুর দেশমাতাকে রক্তিম ও সুন্দর করিয়া তুলিতে উৎসাহিত করিবে।

(৫)

অতীতের জন্য পূর্ণপ্রতিহিংসা গ্রহণই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে এক্ষণে যেরূপ আছি, সেইরূপ থাকিলেই সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইব; যেহেতু আয়ারল্যাণ্ড ইংলণ্ডের ভীতির কারণ হইয়াছে। আমাদের ইহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বারবার যে সকল নির্ব্বোধ উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে তদ্দ্বারা ইংলণ্ডই ইহা স্বীকার করিতেছে। নিরাপদ হইলে ইংলণ্ড কি আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিত না! অপর পক্ষে আমরা যদি ইংলণ্ড হইতে পৃথক হইবার চেষ্টায় সফলতা লাভ করি, তবে আমাদের পর ইংলণ্ডই লাভবান্ হইবে! আমাদের ইহা আশ্চর্য্য ঠেকিতে পারে, কিন্তু ইহা সত্য, ইংলণ্ড এক্ষণে না বুঝিলেও ইহা সত্য। আয়ারল্যাণ্ডের রক্ষার্থে সৈন্যসমাবেশ কেবল অনর্থক দৃশ্য। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডই উহা সত্য করিতে পারে। আয়ারল্যাণ্ডের দিক দিয়া আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। আমার বিশ্বাস এত মূর্খ কেহই নাই যে মনে করে স্বাধীন হইলে আমরা অন্যের বিবাদেও নিযুক্ত হইব। আমাদের কোন পক্ষ অবলম্বন না করা কর্ত্তব্য। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি তাহাই নির্দ্দেশ করে, আমাদের স্বাধীন বুদ্ধি তাহাই আদেশ করে। স্বাধীনতা লাভ করিলে, জাতির এই দায়িত্ব আছে যে সে অন্য জাতির স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করিবে না। সকলের স্বাধীনতায় সকলেই নিরাপদ। কঠোর শাসনে বিকল হইয়া উঠিলেও সখ্য স্থাপন করিয়া আত্মকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে সকল জাতি বাধ্য। ইহাও আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে

ইংলণ্ড হইতে পৃথক হইলেই ইংলণ্ডের সহিত চির-মিত্রতা স্থাপিত হইবে। কারণ এত অবিবেচক কেহই নাই, যিনি ইংলণ্ডের সহিত সতত সমরে নিরত থাকিতে ইচ্ছা করেন। ইহা অচিন্তানীয়। ইহাই স্বাধীনতার সুমহান্‌ উদ্দেশ্য। আমাদের স্বাধীনতা শত্রুর অপকার করিবে না, উপকারে আসিবে। যদি শত্রুর অপকার করি, তবে আজ যেরূপ তাহার ভয়ের কারণ হইয়া আছি, সেইরূপই থাকিব। অবসর আসিবে, কিন্তু আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব না। ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি মানবজাতির কল্যাণের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতা কেবল কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি করিবে না, জগতে সখ্যস্থাপন ও জাতির মধ্যে মিলন সাধন করিবে।

(৬)

আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছি—পৃথিবীতে আত্মগর্ব্ব সমর্থন করিতে নয়, আত্মগর্ব্ব প্রচার করিতে নয়, আমাদের প্রতিবেশীর ন্যায় অনাচারী বা বড় হইতে নয়। মানবপ্রকৃতির গভীরতর প্রদেশ হইতে এ প্রেরণা আসিতেছে। আমাদের ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্বকে বিকাশ করিতে চাই। অগ্রসর না হইলে অধঃগতি হইবে। ইহা জীবনমরণের কথা—আত্মার মুক্তির জন্য স্বাধীনতা, সমস্ত জাতি এভাবে ভাবিত হইলে আমাদিগের কথা সেদিন জয়গৌরবে ভূষিত হইবে। যদি অল্প সংখ্যক লোক ইহা বিশ্বাস করে, তবে তাহাদের আরও দৃঢ় হওয়া কর্ত্তব্য কারণ তাহারা সংখ্যায় অল্প। আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী করিতেছি। অধিক সংখ্যক ব্যক্তির ইহার ধ্বংস করিবার অধিকার নাই। স্বেচ্ছাচারী শাসক আমাদিগকে নির্য্যাতন করিতে পারে, বধ করিতে পারে, তাড়না করিতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অধ্বংসী।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না; বা ইহার গৌরব কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির দরকার হয় না। যদিও কবিকুল ইহার জয়গান গাহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি কালে ইহার দাবী স্বীকার করিয়াছে। একের দ্বারাই ইহার সত্যতা প্রতিপালিত হইয়াছে, এবং সে এক কখনও অকৃতকার্য্য হয় না বলিয়া ইহার মৃত্যু নাই। স্বাধীনতার সংগ্রাম, আত্মার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সুন্দর ও উন্নত আদর্শের প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা লাভোপযোগী কর্ত্তব্যপরায়ণতা—এই সকলেরই গূঢ়তত্ত্ব মনুষ্যজাতির ভ্রাতৃত্বস্থাপন; অধিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রত্যেককে সত্যাশ্রয়ী থাকিতে বাধ্য করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। অধিকের বিরুদ্ধে যাহার সংগ্রাম করিতে

হয় তাহার দায়িত্ব কত বেশী। আদর্শের জন্য লোকচক্ষুর বাহিরে তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, কত নিম্নস্থানে অবিচলিতভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে, কত উচ্চস্থানের সুবিধা গ্রহণ করিয়া, কখন পরাস্ত ক্লান্ত বা নিরাশ না হইয়া ভবিষ্যতের আশায় সঙ্গীবর্গকে উৎসাহিত করিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে। এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি হইলেও তাহাদের আদর্শের মহত্ব শেষ মুহূর্ত্তে প্রমাণিত হইবে। তাহাদের পরাজয়ের সহিত দেশ জাগিবে এবং যাহারা তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও সহায়তা করে তাহারা ধন্য। সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে যেএকবার একাকী দাঁড়ায় তাহার কার্য্য সমর্থনযোগ্য। সে পরাজিত হইয়া সমস্ত জাতির মুক্তি বিধানকরে ।

নারায়ণের নিকষমণি

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা—প্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি ভাগবতাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এবং কলিকাতা ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন নিবাসী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। এই গ্রন্থে ভগবানের গোলকলীলা থেকে রাসলীলা পর্য্যন্ত চৌদ্দলীলার সারার্থ গোস্বামীজীর স্বরচিত সংস্কৃত ও বাঙ্গভাষায় বর্ণিত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম উদয়ে রাসলীলা সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকের একটা বিকৃত ধারণা ছিল, সুখের বিষয় সে ধারণা এখন লোপ পেয়েছে। বইখানার ভাষা বেশ মনোহর, বর্ণনা চিত্তগ্রাহী। যাঁরা ভগবানের রাসলীলাটা ভাল করে উপভোগ করতে চান, তাঁরা এ বই পড়ে বেশ তৃপ্তি পাবেন। আমরা এ বই খানার খুব প্রচার কামনা করি।

ব্যাথার দান—লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের লেখা, দাম দেড় টাকা। কলেজস্কয়ার ইষ্ট, কলিকাতা, মোস্‌লেম পবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা সৈনিক কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ, তাঁরা এই বইখানা পড়ে দেখবেন কবির-গল্প লেখা কেমন মনমাতান। এ বই খানা ছটি গল্পের সমষ্টি, শুধু গল্প না বলে কাব্য-গল্প' বললেই ঠিক বলা হবে। কারণ এ গল্পগুলির মধ্যে কাব্যের মত মানুষের মনস্তত্বের বিশ্লেষণ এমন সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে যে বইখানা পড়বার পর পাঠকের মনে একটা আবেশময় ঝঙ্কার

রেখে যায়। 'হেনা' ও 'বাদল বরিষণে' এ দুটো গল্প চমৎকার, এ দুটোর মধ্যে যে একটা ব্যথা ও করুণার সুর ফুটেছে, তার ঝঙ্কারে মনকে বিহ্বল করে ফেলে, সে সুরের মূর্চ্ছনা থেমেছে "রাজ বন্দীর চিঠি" এই গল্পে। বইখানা যিনিই পড়বেন, তিনি এর লেখবার ভঙ্গীতে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারবেন না। সমালোচনা করে এর মাধুর্য্য বোঝান যায় না, সুতরাং দেড় টাকা খরচ করে নিজেকে পড়তেই হবে।

দেওনা রাণী—শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৷৹ মাত্র। এ বইখানি একটি রোমান্টিক উপন্যাস। বাল্য-প্রণয় সফল না হওয়ায় নায়িকা আজীবন অবিবাহিতা থেকে তার বাল্যের প্রণয়াস্পদকেই সেবা করবার চেষ্টা পেয়েছেন এবং তাতে শেষ পর্য্যন্ত সুযোগ পেয়েছেন। বইখানি মোটের উপর উপভোগ্য হয়েছে, ভাষা ও বর্ণনা-কৌশল সুন্দর। নায়ক "পরেশ' ও নায়িকা 'রাণী"র চরিত্রটা বেশ ফুটেছে। বইখানি পড়ে পাঠক বেশ তৃপ্তি পাবেন।

সেবা ও সাধনা—একখানি নতুন মাসিকপত্র গত বৈশাখ থেকে বের হতে আরম্ভ হয়েছে। সম্পাদক শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-সাংখ্যতীর্থ বি, এ ও শ্রীইন্দুনিভা দাস। ২১ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। "সেবা ও সাধনার" উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক বলেছেন—"ইহাতে আছে পাপীতাপীর সঙ্গে, দীনদরিদ্রের সঙ্গে, রুগ্ন ও আতুরের সঙ্গে, পুরুষ ও নারীর সঙ্গে, সন্ন্যাসী ও সংসারীর সঙ্গে, চিন্ময় ও জ্ঞানময়ের সঙ্গে অগাধ অসীম অচ্ছেদ্য ও আন্তরিক সহানুভূতি।" ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই কাগজ খানার মারফতে ঐ সাধু উদ্দেশ্য সফল হ'ক। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ টাকা মাত্র।

আলমগীর—বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। যে নাটকখানি যখন প্রায় মাস খানেক ধরে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল, তখন প্রতিদিন দর্শকের অসম্ভব ভিড়ে অনেক লোক ফিরে আসতে বাধ্য হত, তবু বারে বারে দেখেও লোকের অবসাদ জাগেনি, সে বইয়ের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ক্ষীরোদ বাবুর নাটকের প্রশংসা করা আর সূর্য্যকে প্রদীপ ধরে দেখান একই রকম বাতুলতার পরিচায়ক।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] শ্রাবণ, ১৩২৯

দেশের অবস্থা

[শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পাঞ্জাব অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেড়েক পূর্ব্বে একদিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশ জোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয় জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিগে প্রচার করে বলেছিলাম স্বরাজ চাইই চাই। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোনদিন প্রতিবিধান করতে পারব না। কথাটা যে মূলতঃ সত্য, এ বোধ করি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতবর্ষীদের হাতেই থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে কেউ তাদের বঞ্চিত রাখে, সেই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও ত একটা কথা আছে, যাকে স্বীকার না কোরে পথ নাই,—সে হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য। Right এবং Duty এই দুটো অনুপূরক শব্দ ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে পারে না, এতো অবিসম্বাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্ব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতায় যদি আমাদের জন্ম-স্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্ত্তব্যের দায়ী হয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ

হয়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাব :এত বড় অন্যায়-অসঙ্গত দাবী, এতবড় পাগলামী আরত কিছু হতেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় হয়ে জন্মেছি বলেই ভারতের স্বাধীনতা আমাদের :চাই, এ কথাও কোনমতেই সত্য হতে পারে না! এবং এ প্রার্থনা ইংরাজ কেন, স্বয়ং বিধাতা পুরুষও বোধ করি মঞ্জুর করতে পারেন না! এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই চির-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার দিন আমাদের এসেছে। একে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার শুধু আমরা কেন, পৃথিবীতে কেউ 'কখনো পায়নি, পায়না এবং .আমার বিশ্বাস কোনদিন কখনো কেউ পেতেও পারে না। কর্ত্তব্যহীন অধিকারও অনধিকারের সমান। অথচ, এই যদি আমাদের ঈপ্সিত বস্তু হয়, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারা যদি আমরা সত্যই গ্রহণ করে থাকি, তা'হলে নিশ্চয় বলছি আমি, কেবলমাত্র সমস্বরে বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না। কাজ কোরব না, মূল্য দেব না, অথচ জিনিষ পাওয়া চাই, এ হলে হয়ত সুবিধে হয়, কিন্তু সংসারে তা' হয় না, এবং আমার বিশ্বাস, হলে মানুষের .কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বাড়ে। অথচ মূল্যহীন এ ভিক্ষায় চাওয়াকেই আমরা সার করেছি। বছর দেড়েক ঘুরে ঘুরে নিজের চোখেই আমাকে অনেক দেখ্‌তে হয়েছে এবং একটুখানি অবিনয়ের অপবাদ নিয়েও বলতে হচ্ছে, বুড়ো হলেও চিরদিনের অভ্যাসে এ চোখের দৃষ্টি আমার আজও একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়নি। যা' যা' দেখেছি (অন্ততঃ এই হাবড়া জেলায় যা' দেখেছি) তা' নিছক এই ভিক্ষার চাওয়া, দাম না দিয়ে চাওয়া, ফাঁকি দিয়ে চাওয়া। মানুষের :কাজকর্ম্ম, লোকলৌকিকতা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, সর্ব্বপ্রকারের সুখ সুবিধের কোথাও যেন কোন ত্রুটী না ঘটে, পান থেকে একবিন্দু চুণ পর্য্যন্ত যেন না খসতে পায়,—তার পরে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ করে দিয়ে আসা পর্য্যন্ত বল, যা' হয় তা' হোক, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু ইংরাজের আছে। শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের এই হাস্যাস্পদ চাওয়াটাকে সে যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে ভারতবাসী স্বরাজ চায় না,—সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা বলে? যে ইংরাজ পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব বিস্তার করেছে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে যে এক নিমেষ দ্বিধা করে না, যে স্বাধীনতার স্বরূপ জানে, এবং পরাধীনতার লোহার

শিকল মজবুত করে তৈরী করবার কৌশল যার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না,—তাকে কি কেবল ফাঁকি দিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে, গলায় এবং কলমে গালি-গালাজ করে, তার ত্রুটী ও বিচ্যুতির অজস্র প্রমাণ ছাপার অক্ষরে সংগ্রহ করে, তাকে লজ্জা দিয়েই এত বড় বস্তু :পাওয়া যাবে,—এ প্রশ্ন ত সকল দ্বন্দ্বের অতীত করে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এই লজ্জাকর বাক্যের সাধনায় কেবল লজ্জাই বেড়ে উঠবে, সিদ্ধিলাভ কদাচ ঘট্‌বে না।

আত্মবঞ্চনা অনেক করা গেছে, আর তাতে উদ্যম নেই। জড়ের মত নিশ্চল হয়ে জন্মগত অধিকারের দাবী জানাতেও আর যেমন আমার স্বর ফোটে না, পরের মুখেও তত্ত্ব কথা শোনবার ধৈর্য্যও আর আমার নেই। আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, ত সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপ-শিখার, দীপের নয়; নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া অনর্থক নয়, অপরাধ,—সকল দাবী দাওয়া উত্থাপনের আগে এ কথা ভুলে গেলে কেবল ইংরাজ নয়, পৃথিবী শুদ্ধ লোক আমোদ অনুভব করবে।

মহাত্মাজী আজ কারাগারে। তাঁর কারাবাসের প্রথম দিনে মারামারি কাটা-কাটি বেধে গেল না, সমস্ত ভারতবর্ষ শুদ্ধ হয়ে রইল। দেশের লোকে সগর্ব্বে বল্লে, এ শুধু মহাত্মাজীর শিক্ষার ফল, Anglo Indian কাগজ ওয়ালারা হেসে জবাব দিলে এ শুধু নিছক্ indifference! আমার কিন্তু এ বিবাদে কোন পক্ষকেই প্রতিবাদ করতে মন সরে না। মনে হয় যদি হয়ে ও থাকে ত দেশের লোকের এতে গর্ব্বের বস্তু কি আছে? Organised violence করবার আমাদের শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই, সুযোগ নেই। আর হঠাৎ violence? সে তো কেবল একটা আকস্মিকতার ফল। এই যে আমরা এতগুলি ভদ্রব্যক্তি একত্র হয়েছি, উপদ্রব করা আমাদের কারও ব্যবসা নয়, ইচ্ছা ও নয়, অথচ একথাও ত কেউ জোর করে বল্‌তে পারিনে আমাদের বাড়ী ফেরবার পথটুকুর মাঝেই হঠাৎ কিছু একটা বাধিয়ে দিতে না পারি। সঙ্গে সঙ্গে মস্ত ফ্যাসাদ বেধে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বাধেনি সে ভালই এবং আমিও একে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে চাইনে, কিন্তু এ নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়ানোরও হেতু নাই। একেই মস্ত কৃতিত্ব বলে সান্ত্বনা লাভ করতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা, আর Indifference? এ কথায় যদি :তারা ইঙ্গিত করে থাকে যে, দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজেনি ত, তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না।

ব্যথা আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়েই বেজেছে; কিন্তু তাকে নিঃশব্দে সহ্য করাই আমাদের স্বভাব, প্রতিকারের কল্পনা আমাদের মনেই আসে না।

প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ত্ত মন যেমন উপায়হীন বেদনায় কাঁদতে থাকে, অথচ, যা' অবশ্যম্ভাবী, তার বিরুদ্ধে হাত নেই, এই বলে মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া পড়া, আমোদ-আহ্লাদ, হাসি তামাসা, কাজকর্ম্ম যথারীতি পূর্ব্বের মতই চল্‌তে থাকে, মহাত্মাজীর সম্বন্ধেও দেশের লোকের মনোভাব প্রায় তেমনি। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজ সাহেবের উপর। কেউ বল্‌লে তার প্রশংসা বাক্য শুধু ভণ্ডামি, কেউ বল্‌লে তার ছ'বছর জেল দেওয়া উচিত ছিল, কেউ বল্‌লে বড় জোর তিন বছর, কেউ বল্‌লে, না চার বছর; কিন্তু ছ'বছর জেল যখন হল' তখন আর উপায় কি? এখন গবর্ণমেণ্ট যদি দয়া করে কিছু আগে ছাড়েন তবেই হয়। কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি। তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল হোক না জেল ছ'বছর, হোক না জেল দশ বছর,—তাঁকে মুক্ত করা ত তাঁর দেশের লোকেরই হাতে। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশী কেউ তাঁকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা' সে গবর্ণমেণ্ট যতই কেন না শক্তিশালী হোন্। কিন্তু যে আশা তার একার ছিল, সমস্ত দেশের লোকের সে ভরসা কর্‌বার সাহস হোলো না। তাদের অর্থোপার্জ্জন থেকে সুরু করে আহার নিদ্রা অব্যাহত চল্‌তে লাগ্‌ল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হোলোনা, শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্ম্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচ্‌তে লাগলেন। প্রতিবিধান কর্‌বে কি, এতবড় হীনতায় লজ্জাবোধ কর্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত যেন এদের চলে গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে Non-violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধীজির movement কি practical? তাইত আমরা—কিন্তু কে এদের বুঝিয়ে দেবে, কোন movement কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে Co-operation, Non-co-operation (violence, non-violence) এর যে কোন একটাই স্বাধীনতা দিতে পারে; শুধু যে ভীরু, যে দুর্ব্বল, যে মৃত, তার কাছে ভিক্ষে ছাড়া আর কোন পথই উন্মুক্ত নেই। সুতরাং এ কথা কিছুতেই সত্য নয়, Non-co-opration পন্থা দেশে অচল,—মুক্তির পথ সে দিকে যায়নি। অন্ততঃ এমনো একদল লোক আছে, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক, যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে, এরা কারা

জানেন? একদিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল, উকীল তার ওকালতী ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে চারিদিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাঁদের অধিকাংশই আজ কারাগারে,—এঁরা তাঁদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে, আমার কল্যাণে, সমস্ত নরনারীর কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাঁদের কি দাঁড় করিয়েছে জানেন? আজ তাঁরা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত, ভিক্ষুকের দল। দেশের চোখে আজ তাঁরা হতভাগ্য, লক্ষ্মীছাড়ার দল। তাদের মলিন বাস, তারা গৃহহীন, তারা মুষ্টিভিক্ষায় জীবনযাপন করে যৎসামান্য তেল-নুণের পয়সার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে বাধ্য হয় অথচ স্বেচ্ছায় যে সমস্ত ত্যাগ করে এসেছে, কতটুকুতে তার প্রয়োজন,সে প্রয়োজন সমস্ত দেশের কাছে কতই না অকিঞ্চিৎ-কর। এইটুকু সে সম্মানে সংগ্রহ করতে পারে না, মাত্র এইটুকুর জন্য তাঁর অসুবিধের অন্ত নাই; অথচ এরাই আজও অন্তরে স্বরাজের আসন এবং দেশের বাহিরে সমস্ত ভারতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পতাকা বহন করে বেড়াচ্ছে। আশার প্রদীপ—তা সে যতই ক্ষীণ হোক, আজও এদেরই হাতে। এদের নির্য্যাতনের কাহিনী সংবাদ পত্রে পাতায় পাতায়, কিন্তু সে কতটুকু—,যে অব্যক্ত লাঞ্ছনা এদের দেশের লোকের কাছেই সহ্য করতে হয়? মহাত্মাজীর আন্দোলন থাক্ বা যাক, এদের অশ্রদ্ধেয় করে আনবার, দীনহীন ব্যর্থ করে তোলবার, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত, দেশের লোককে এক দিন করতেই হবে, যদি ন্যায় ও সত্যকার বিধি বিধান কোথাও কোন খানে থাকে।

হাবড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি অন্ততঃ এ জেলার লোকে স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও একথা সত্য, কেউ কিছু কোরব না, কোন সুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না—আমার বাঁধাধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় একতিল বাহিরে যেতে পারব না,—আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ীর উপর বাড়ী, গাড়ীর উপর গাড়ী, আমার দোতালার উপর তেতালা এবং তার উপর চৌতালা অবারিত এবং অব্যাহত উঠ্‌তে থাক—কেবল এই গোটা কতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়ে না দেয়ে খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে ত দিক, তখন না হয় তাকে ধীরে সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবানো যাবে। কিন্তু

এমন কাণ্ড কোথাও হয় না। আসল কথা এরা বিশ্বাস কর্‌তেই পারে না, স্বরাজ না কি আবার কখনও হতে পারে। তার জন্য আবার না কি চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হবে তাঁতে, কি হবে চরকায়, কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চ্চায়! নিভানো দীপশিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে মুছে গেছে, একমাত্র হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে আর কিছুতে! একটা নমুনা দিই—

সেদিন নারীকর্ম্মমন্দির থেকে জন দুই মহিলা ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মশায়কে নিয়ে দুর্য্যোগের মধ্যেই আম্‌তা অঞ্চলে বেরিয়ে পড়েছিলাম, ভাবলাম ঋষিতুল্য সর্ব্বদেশপূজ্য ব্যক্তিটাকে সঙ্গে নেওয়ায় এ যাত্রা আমার সুযাত্রা হবে। হয়েও ছিল; বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার ও তাঁর নিজের প্রবল জয়ধ্বনির কোন অভাব ঘটেনি এবং ওই রোগা মনুষ্যটীকে স্থানীয় রায় বাহাদুরের ভাঙ্গা তাঞ্জামের মধ্যে সবলে প্রবেশ করানোরও আন্তরিক ও একান্ত উদ্যম হয়েছিল। কিন্তু তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ—আমাদের যাতায়াতের ব্যয় হল টাকা পঞ্চাশ, ঝড়ে, জলে আমাদের তত্ত্বাবধান করে বেড়াতে পুলিশেরও খরচা হয়ে গেল বোধ হয় এম্‌নি একটা কিছু। বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, উকীল মোক্তার ও বহু ধনশালী ব্যক্তির বাস, অতএব স্থানীয় তাঁত ও চরকার উন্নতির কল্পে চাঁদা প্রতিশ্রুত হল তিন টাকা পাঁচ আনা। আর রায় মহাশয় বহু অনুসন্ধানে আবিষ্কার কর্‌লেন জন দুই উকীল বিলিতি কাপড় কেনেন না, এবং একজন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন, ভবিষ্যতে তিনি আর কিন্‌বেন না। ফেরবার পথে প্রফুল্লচন্দ্র প্রফুল্ল হয়ে আমার কাণে কাণে বল্‌লেন, হাঁ, জিলাটা উন্নতিশীল বটে! আর একটু লেগে থাকুন, Civil disobedience বোধ হয় আপনারাই declare কর্‌তে পার্‌বেন!

আর জনসাধারণ? সে তো সর্ব্বথা ভদ্রলোকেরই অনুগমন করে।

এচিত্র দুঃখের চিত্র, বেদনার ইতিহাস, অন্ধকারের ছবি! কিন্তু এই কি শেষ কথা? এই অবস্থাই কি এ জেলার লোক নীরবে শিরোধার্য্য করে নেবে? কারও কোন কথা, কোন প্রতিষ্ঠা, কোন কর্ত্তব্যই কি দেখা দেবে না? যারা দেশের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছে, যারা কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই স্বীকার করতে চায় না, যারা Governmentএর কাছেও পরাভব স্বীকার করেনি তারা কি শেষে দেশের লোকের কাছেই হার মেনে ফিরে যাবে? আপনারা কি কোন সংবাদই নেবেন না?

আমার এক আশা, সংসারে সমস্ত শক্তিই তরঙ্গগতিতে অগ্রসর হয়। তাই

তার উত্থান-পতন আছে, চলার বেগে যে আজ নীচে পড়চে, কাল সেই আবার উপরে উঠবে, নইলে চলা তার সম্পূর্ণ হবে না। পাহাড় গতিহীন, নিশ্চল, তাই তার শিখর-দেশ এক স্থানে উচু হইয়েই থাকে, তাকে নামতে হয় না। কিন্তু বায়ুতাড়িত সমুদ্রের তরঙ্গের সে ব্যবস্থা নয়—তার উঠা পড়া আছে; সে তার লজ্জার হেতু নয়, সেই তার গতির চিহ্ন, তার শক্তির ধারা। সে কেবল উচু হয়েই থাকতে চায়। যখন জমে, বরফ হয়ে উঠে। তেমনি আমাদের এও যদি একটা movement হয়, পরাধীন দেশে একটা অভিনব গতিবেগ হয়; তা' হলে উঠানামার আইন একেও মেনে নিতে হবে, নইলে চল্‌তেই পারবেনা।

চির-শিশু

[কাজী নজরুল ইসলাম]

নাম-হারা তুই পথিক-শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন্ নামের আজ পর্‌লি কাঁকন বাঁধন-হারার কোন্ কারাএ॥
আবার মনের নতন করে'
কোন্ নামে বল্ ডাক্‌ব তোরে?
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে বারে বারে নাম হারায়ে॥
ওরে যাদু, ওরে মাণিক, আঁধার-ঘরের রতন-মণি!
ক্ষুধিত ঘর ভরলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী।
আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না-সাগর উথ্‌লে বুকে,
নূতন নামে ডাক্‌তে তোকে
ওরে ওকে কণ্ঠ রুখে, উঠ্‌ছে কেন মন ভারায়ে?
অস্ত হ'তে এলে পথিক উদয়-পানে পা বারায়ে॥

প্রলয়-বিষাণ

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

কোথায় ওরে প্রলয়-বিষাণ,
পিণাকপাণির হাতে আবার
তোলো ভাঙার গান ;
তোমার ঐ ভীম আরাবে বাজো তুমি বাজো,
কাঁপায়ে এই বিশ্ব-চক্র অসীম ব্যোমে রাজো ;
জমাট—বাঁধা বিপুলছন্দে করো খান খান
আধ-মরা এই ভারতবাসীর মরচে-পড়া প্রাণ।
সত্যকে যে হেলা করে' মিথ্যা বরে আজো
ঝঙ্কারে তার প্রাণের সেতার দুমড়ে দিয়ে বাজো,
সেই ভাঙা তারে ভীম ঝঙ্কারে
তুলি ধ্বংশ-তান
বাজো ওরে প্রলয় বিষাণ !

কোথায় ওরে প্রলয়—বিষাণ,
জাগাও তোমার অট্টহাসে
প্রাণ-কাঁপান তান ;
রণিয়ে উঠুক হ্রেষাধ্বনি দিগম্বর কোলে,
বজ্র-নাদে তুফান-তালে উল্কা যেন দোলে,
মরার আগে মরে যারা তাদের মেরে রাখো,
মহাকালের রথে চড়ে বিশ্ব জুড়ে থাকো ;
প্রলয় দিয়ে নূতন সৃষ্টি বরণ করে আনো,
ভাঙ্গাগড়ার খেলা এবার নূতন করে জানো ;
ধ্বংশনেমির ভীষণ রবে
কাঁপায়ে দুর বিমান
বাজো ওরে প্রলয়-বিষাণ !

লতা

[শ্রীউর্ম্মিলা দেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লতাকে যখন আমি প্রথম দেখি, তখন সে স্বামীর সহিত হুগলীতে আসিয়াছে পুত্রের অযত্ন হইবে বলিয়া জমীদার ও তাঁহার গৃহিণী বধূকে পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার স্বামী হুগলীতে ওকালতি করিতেন। নির্ম্মলকান্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি বি, এ পাশ করিয়া বি, এল পড়েন ও নির্ম্মলকান্ত এম, এ পাশ করিয়া প্রফেসর হন। ইহাদের এই বন্ধুত্বের সূত্রে লতার সহিত আমার পরিচয় হয়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের আশৈশব সকল কথা আমি কতক লতার নিজমুখে এবং কতক লতার মাতার মুখে শুনিয়াছিলাম।

প্রথম পরিচয়েই আমি লতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাকে দেখিলে মনে হইত সে যেন এ পৃথিবীর কেহ নয়,—তাহার সুন্দর মুখখানিতে এমনই একটি পবিত্র ভাব ছিল। তাহার মধ্যেও এমন একটা অটল গাম্ভীর্য্য ছিল, যে নিতান্ত লঘু প্রকৃতির মানুষও তাহার নিকট নত মস্তক হইত। অন্ত দিকে তাহার প্রকৃতি শিশুর মত সরল ছিল। আমার স্বামী মাঝে মাঝে বলিতেন,—"নির্ম্মলের স্ত্রী যেখান দিয়ে হেঁটে যায় সেখানটা যেন পবিত্র হয়ে যায়।" সত্যই তাহাকে দেখিলে ঐরূপ মনে হইত।

শিশুকাল হইতেই আমার দৃষ্টি সকল বিষয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। আমি ক্রমে লতার অন্তরের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। তাহার সমগ্র সদ্‌গুণের মধ্যে একটা গুণের অভাব দেখিয়া আমি প্রাণে বড় আঘাত পাইতাম। সেটি কি? সেটি মানুষের সকল প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ দুর্ব্বলতার প্রতি ক্ষমার অভাব। তাহার কোমল হৃদয় সেখানে পাষাণের ন্যায় কঠিন হইত। সে সেখানে বিচার যুক্তি তর্ক কিছুই মানিত না। তাহার সহিত মাঝে মাঝে এই বিষয় লইয়া বাক বিতণ্ডা হইত। আমি বলিতাম—

"লতা! ক্ষমা জিনিষটা বড় সুন্দর, সে জিনিষটা আমাদের প্রাণকে বড় সুন্দর বড় উচ্চ করে। মানুষের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা ক'রতে চেষ্টা করাই উচিত।"

লতা বলিত,—

"কেন দিদি, ভগবান সকলকেই বিবেক বলে একটা জিনিষ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যে বিপথে যাবে তাকে কেন ক্ষমা করব ?"

আমি বলিলাম,—

"লতা, মানুষ কি অবস্থায় কি অভাবে কোন পথে যায় তা আমরা কি করে জান্‌ব। মানুষের জীবনে কত প্রতিকূল অবস্থা আসে, কত প্রলোভন আসে, বন্ধুরূপে কত শত্রু আসে। অত্যন্ত সবলচিত্ত মানুষ না হ'লে সে সকল উপেক্ষা ক'রতে পারে না। ভেবে দেখ সে সময়ে যদি একজন মানুষকে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই ত্যাগ করে তবে কি সে ক্রমেই নরকের পথেই অগ্রসর হয় না! আমার মনে হয় সে সময়ে তাকে তার দুর্ব্বলতা থেকে অতি সহজে তুলে নেওয়া যায়।"

লতা বলিত,—

"তুমি যা বলছ তা বুঝতে পারি কিন্তু পাপকে যদি কেবল ক্ষমাই ক'রব তবে পাপের সংহার কোথায় ?"

আমি হাসিয়া বলিতাম,—

"লতা! আমি একথা বলছি না যে পাপের সংসর্গ মানুষ ত্যাগ ক'রবে না কিম্বা পাপকে ঘৃণা কর'বে না। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচার না ক'রে মানুষকে বিচার করা উচিত নয়। লতা! আমার বাবা অত্যন্ত নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন,—তাঁহার শিশুর মত সরলতা দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে তাঁর যে উদারতা ছিল,—তা আর কারো মধ্যে বড় দেখতে পাই না। তিনি বলতেন,—"মানুষের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা ক'রে তাকে বুকে তুলে নিতে পারলে তাকে নরক থেকে উদ্ধার করা যায় কিন্তু তাকে ঘৃণা করে দূরে সরে থাকলে সে আরও নীচে নেমে যায়। একথা কখনও ভুলো না রমা!" তাঁর সে সব অমূল্য উপদেশ কতটুকুই বা গ্রহণ কর'তে পেরেছি। তবু যে দু একটা কথা বলি সে তাঁরই সেই জ্ঞান সাগরের দু একটি বুদ্বুদ মাত্র।"

লতা আমার কথা বুঝিয়াও বুঝিত না। তার ঐ এক কথা ছিল,—"ওসব মুখের কথা দিদি! কাজে কি কেউ তা পারে? কাল যদি তুমি শোন তোমার স্বামী একটা অত্যন্ত নীচ কার্য্য করেছেন তুমি কি তাকে এক কথায়ই ক্ষমা ক'রতে পারবে? তাহলে আর আত্ম সম্মান বলে জিনিষ এ সংসারে কোথায় রইল দিদি ?"

লতার এইভাবে আমি বড় ব্যথিত হইতাম। এবং এই জন্ম সে জীবনে বহুতর অশান্তি ভোগ করিবে এ বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। হায়! তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কি ভীষণভাবে সফল হইবে।

৫।—

দুই বৎসর পরের কথা। আমার মাতার প্রাণসংশয় পীড়ার কথা শুনিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম। আমার ক্রোড়ে তখন ছয় মাসের একটি ক্ষুদ্র শিশু। মা আমার প্রায় আট মাস রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বর্গারোহন করিলেন। ইহার মধ্যে আর মাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি নাই। হুগলী হইতে স্বামীর নিয়মিত পত্রে সকলের সংবাদ পাইতাম। লতাও মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত। পত্রগুলির প্রতিপংক্তিতে তাহার পরিপূর্ণ সুখের আভাষ ফুটিয়া উঠিত। আমি পত্রগুলি পড়িয়া বড়ই সুখী হইতাম। সত্য কথা বলিতে কি লতাকে আমি ছোট ভগিনীর মতই ভাল বাসিতাম। আমার হুগলী ত্যাগের দুই মাস পর লতার পত্রে একটি শুভ সংবাদ পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম!

মা'র শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সুদীর্ঘ নয় মাস পরে গৃহে ফিরিলাম। শুনিলাম লতাকে লইতে তাহার পিত্রালয় হইতে লোক আসিয়াছে। আগামী পরশ্ব ভাল দিন সে সেই দিনে রওনা হইবে। বৈকালে লতাকে দেখিতে গেলাম। লতার মুখে এবার নূতন সৌন্দর্য্য দেখিলাম। তাহার অবস্থানুযায়ী ম্লান ও পাণ্ডুর মুখে একটি নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মাতৃত্বের প্রথম নিদর্শন! আমাকে দেখিয়া লতা হাত ধরিয়া শয়ন গৃহে লইয়া গেল। আমার পাশে বসিয়া, আমার গলা ধরিয়া সে কিছুক্ষণ নীরব রহিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"বাপের বাড়ী যাচ্ছিস নাকি?"

মৃদু হাসিয়া লতা বলিল,—

"হ্যাঁ দিদি, মা নিতে লোক পাঠিয়েছেন। উনি প্রথমে দিতে চাননি,—কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীও যেতে লিখেছেন। ওঁর একা একা বড় কষ্ট হবে। তোমাদের ওপর নির্ভর করেই যাচ্ছি, তোমরা খোঁজ খবর নিও। আমারও যেতে মন সর্‌ছে না দিদি"——বলিয়া লতা হাসিয়া ফেলিল।

আমিও হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—

"তাকি আর জানি না ভাই! তোরা আবার একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকবি। তুই গেলে নির্ম্মল বাবুকে কি ক'রে সামলাব জানি না। লোকটা পাগল হয়ে না গেলে বাঁচি।"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লতা বলিল,—

"যাও দিদি, তুমি বড় দুষ্টু!"

রাত্রে গৃহে ফিরিলাম। লতা যাওয়ার পূর্ব্বে আর একবার তাহাকে দেখা দিবার জন্ত বার বার অনুরোধ করিল। খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিল। আমি তাহার পরদিন আবার যাইব বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিলাম।

পর দিন সন্ধ্যার সময় অন্যান্য গৃহ কার্য্য শেষ করিয়া শ্বশ্রূমাতার জলযোগের সমস্ত গুছাইলাম। তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক হইলে তাঁহাকে জলযোগ করাইয়া লতার নিকট যাইব স্থির করিয়াছিলাম। তাহা হইলে একটু বেশীক্ষণ লতার নিকট বসিতে পারিব বলিয়াই ঐ বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। এমন সময়ে লতাদের বেয়ারা ভজু দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—"আপনি শীগ্যির আসুন মাজী বড় বেমার।" আমি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কি হইয়াছে ভজুকে ভাল করিয়া প্রশ্ন করিবার কথাও মনে হইল না,—শ্বশ্রূমাতার অনুমতি লইয়া তখনই লতাদের বাড়ী গেলাম ভজু আমাকে একেবারে লতার শয়ন গৃহে লইয়া গেল। গিয়া দেখি লতার সংজ্ঞাহীন দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার নিকট শুনিলাম প্রভাত হইতে লতা শুইয়া ছিল,—আহারাদি করে নাই। বৈকালেও ঝি আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিল। ঝি গৃহকার্য্য করিতে লাগিল,—কিছুক্ষণ পর নির্ম্মল-কুমারকে গৃহ প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর সে কোন গুরু দ্রব্য পতনের শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। বারান্দা দিয়া আসিতে আসিতে দেখিল নির্ম্মল সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। লতার গৃহে আসিয়া দেখিল অজ্ঞানাবস্থায় ভূতলে পতিত। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে কৃতকার্য্য না হইয়া আমাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিল। ঝির কথায়ও বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আমার স্বামীকে সংবাদ দিবার জন্ত ভজুকে পাঠাইয়া দিয়া, লতার ভূলুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

৬।

দীর্ঘকাল শুশ্রূষার পর লতা চক্ষুরুন্মিলন করিল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর দুই বাহু দ্বারা আমার গলদেশ আকর্ষণ করিয়া আমার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া,—"দিদি!" বলিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলাম "কি হয়েছে লতা? অমন করছ কেন বোন?"

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লতা বলিল,—"দিদি! উনি আমায় ত্যাগ করেছেন—না—না দেবতার নামে মিথ্যা বল্‌ব না। আমি হতভাগিনী ক্ষণিক মোহের বশে অন্ধ হয়ে পাগল হয়ে তাঁকে হারিয়েছি।"

একি শুনিলাম! আমার আশঙ্কা কি এত শীঘ্র এই ভাবে সত্যে পরিণত হইল? না—না অসম্ভব! এ যে একেবারেই অসম্ভব! আমি কি শুনিতে কি শুনিয়াছি। অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিলাম,—

"লতা, সব কথা বুঝিয়ে বল বোন, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

লতা উঠিয়া বসিল, দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। লতা ধীরে ধীরে আমাকে সকল কথা বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে কখনও শূন্য নয়নে সে আমার প্রতি চাহিল,—কখনও অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতে সে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় বলিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে বলিয়া লতা সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতেছিল। নির্ম্মলকান্তের আলমারী ঝাড়িয়া মুছিয়া তাহার কাপড় চোপড় গুলিও গুছাইয়া রাখিয়া যাইবে মনস্থ করিয়া আলমারী খুলিল। কাপড়গুলি নাড়িতে চাড়িতে একখানা অর্দ্ধ ছিন্ন পুরাতন পত্র তাহার হস্তগত হইল। পত্রখানি নির্ম্মলকুমারের নিকট একটি স্ত্রীলোকের লেখা। পত্রখানা পরে আমি সচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—

"নির্ম্মল বাবু!

তুমি আর এস না কেন? কাল সন্ধ্যার সময় আস্‌বে বলে গেলে আর এলে না। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে ছিলুম। তুমি আমায় ত্যাগ ক'রলে কেন? তোমার পায়ে পড়ি দেখা দিয়ে যেও। ইতি তোমার হত ভাগিনী

বিনোদ"

পত্রখানির তারিখ লতার বিবাহের ঠিক এক বৎসর পরের।—

পত্রখানি পড়িয়া লতার আপাদ মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। এ কি! সে যে তাহার স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে! তবে এ কি? লতা যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পত্রখানা হাতে লইয়া সে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে হাসিতে হাসিতে নির্ম্মল গৃহ প্রবেশ করিল। লতাকে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল,—"একি গো! অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? তোমার সব গোছান হোল?"

লতা কোন কথা না বলিয়া, পত্রখানা নির্ম্মলের পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া, পাশ কাটাইয়া, দ্রুত পদে আপনার শয়ন গৃহে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর নির্ম্মল গৃহ প্রবেশ করিল,—লতা তখন শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। নির্ম্মল শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল,—

"লতা আমার একটা কথা শোন, আমার দিকে চাও। সব কথা শুনলে তুমি বুঝবে এতে তোমার রাগ ক'রবার কিছু নেই।",

লতা ফিরিল, কিন্তু স্বামীর বাহু পাশে কিছুতেই নিজেকে ধরা দিল না। বিশাল চক্ষু দুটি নির্ম্মলের চক্ষুর প্রতি স্থাপিত করিয়া বলিল,—"কি বলবে? বলবার কিছু আছে কি? ব'লবার কিছু থাকলে অনেক আগে নিজেই বল্‌তে।" নির্ম্মল বলিল,—

"অনেক কথা বল্‌বার আছে। ধীরেন্দ্র নামে আমার সহপাঠী বন্ধুর নাম হয়তো আমার মুখে শুনেছ। ধীরেন্দ্র অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের একমাত্র ভরসা স্থল ছিল, লেখা পড়ায়ও সে খুব ভাল ছিল। হঠাৎ সে এই বিনোদিনীর কুহকে পড়ে অধঃপাতের পথ পরিষ্কার ক'রতে আরম্ভ করে। এমন কি তাকে বিয়ে ক'রবে বলেও নাকি স্থির করে। আমি দেখলাম এক ধীরেন্দ্রর সঙ্গে সমস্ত পরিবারটি যায়,—আমি আর স্থির থাকৃতে পারলাম না। আমি তখন বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলাম।"

লতার দিকে চাহিয়া নির্ম্মল দেখিল লতা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিল। নির্ম্মল বলিতে লাগিল—"প্রথমে সে আমাকে বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দিল। আমি তবুও হাল ছাড়লাম না। ধীরেণের অজ্ঞাত-সারে মধ্যে মধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে যেতাম। কিছু দিন পর দেখলাম বিনোদিনীর মন একটু একটু নরম হ'য়েছে। তারপর সে ধীরেণকে ত্যাগ ক'রতে সম্মত হোল; আমি তাকে কিছু অর্থ দিতে গেলে সে তাহা প্রত্যাখ্যান ক'রলে দেখে বড় আশ্চর্য্য

হ'লাম। আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হোল—আমি সে দিন থেকে আর তার কাছে যাই নি। তারপর সে ঐ চিঠিখানা লিখেছিল বটে কিন্তু লতা তোমায় সত্যি বল্‌ছি আমি সে চিঠির কোন উত্তর দিই নি বা তার কাছে যাইনি এখন সব বুঝ্‌লে তো।"

শুষ্ককণ্ঠে লতা বলিল,—"না একটা কথা এখনও বুঝি নি। কি সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে তুমি আর যাও নি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নির্ম্মল বলিল,—

"বিনোদিনী আমাকে একটু একটু ভালবাস্‌তে আরম্ভ করেছে বলে সন্দেহ হয়েছিল।"

শিহরিয়া উঠিয়া দুই হস্তে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া লতা বলিল,—

"ছিঃ ছিঃ একথা আমার কাছে বল্‌তে তোমার একটু লজ্জা হোলনা, একটা পতিতা স্ত্রীলোক তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে সাহস পেয়েছে। আর তুমি সেই চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছ! ধিক তোমাকে।"

বিস্মিত হইয়া নির্ম্মল বলিল,—"পত্র যত্ন করে রেখেছি কে বল্‌লে? আমার তো ও পত্রের অস্তিত্বও মনে ছিল না। কি ক'রে কাপড় চোপড়ের সঙ্গে আলমারীতে স্থান পেয়েছিল তাও আমি জানি না।"

লতা আপন কথাই বলিয়া যাইতে লাগিল,—

'আমি যখন আমার প্রাণের সমস্ত প্রেম সঞ্চিত করে তোমার জন্ম অর্ঘ্য সাজিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম, তুমি তখন একটা পতিতা স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রেমের খেলা খেল্‌ছিলে? ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি ঘৃণা! এ আঘাত পাবার আগে আমার মরণ হোল না কেন?"

কাতর কণ্ঠে নির্ম্মল বলিল,—"তুমি এ কি বল্‌ছ? লতা—লতা, আমিতো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্ম তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ক'রতে হোত তা নইলে সে আমার কে?"

কঠিন কণ্ঠে পাষানী লতা বলিল,—"কে তা আমি জানি না—তবে এটুকু জানি সে তোমার কেউ না হ'লে এ ঘটনা তুমি আমার কাছে গোপন ক'র্‌তে না। নিজেই বল্‌তে, জিজ্ঞাসা ও ক'র্‌তে হোত না।"

নির্ম্মল বলিল,—"এই সব ঘটনার পর ধীরেন আমায় হাতে ধরে অনুরোধ করেছিল একথা যেন প্রকাশ না পায়। বন্ধুর কাছে কি ক'রে বিশ্বাস ঘাতক হ'ব লতা! তাই ইচ্ছা সত্বেও তোমার কাছে বল্‌তে পারি নি। এ যে আমার

নিজের কথা নয়,—পরের কথা বল্‌বার যে আমার কোন অধিকার নেই। তুমি বুঝতে পারছ না লতা ?"

দৃঢ় স্বরে লতা বলিল,—"না—আমি আর কিছু বুঝতে চাইনা,—যা বুঝেছি তাই আমাব পক্ষে যথেষ্ট !"

ব্যথিত স্বরে নির্ম্মল বলিল,—"লতা ! তুমি কি সেই লতা ! এত্‌ কঠিন তুমি ! উঃ ভাবিতেও পারি না। লতা, একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা কর, না হলে আমাদের সুখ সূর্য্য অস্ত যেতে বেশী দেরী হবে না। কি আর বল্‌ব ?"

৭

লতা বলিলে লাগিল,—

"উনি চলে গেলেন। আমি শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবতে চেষ্টা ক'রলাম কিন্তু কিছুতেই মন টাকে যেন স্থির ক'রতে পারলাম না। যতই ভাবি ততই যেন চিঠিখানা আমার চোখের সাম্‌নে আমায় বিদ্রূপ ক'রে নাচতে লাগল। আর উঠতে ইচ্ছা হোল না, খেতে ইচ্ছে হোল না। উনি আজকার দিনটা আগেই ছুটি নিয়েছিলেন, স্নানাহার করে—ভগবান জানেন কি খেলেন-উনি এই পাশের ঘরে গেলেন। মাঝে মাঝে পায়চারী ক'রে বেড়াতে লাগলেন—শব্দ কাণে গেল। আমি বিছানায় পড়ে রইলাম। বিকালে উনি আবার এলেন,—বিছানার পাশে এসে ডাকলেন, "লতা !" আমি চুপ ক'রে রইলাম। দিদি ? আমি পাগল হয়েছিলাম না হ'লে কি সেই আদরের ডাক উপেক্ষা ক'রতে পা'রতাম ? কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন,—"এখনও রাগ ক'রে থাকবে ? সেই অটল বিশ্বাস এক মুহূর্ত্তে এই ভীষণ অবিশ্বাসে কি ক'রে পরিণত হোল ! এত কঠিন কি ক'রে হ'লে ! লতা ! একবার বুকে এস—একবার বল সব ভুলে গেছ। সব অন্ধকার ঘুচে যাক।" দিদি, পাষাণী আমি, নিষ্ঠুর আমি, নারী নামের অযোগ্যা আমি, তবু চুপ ক'রে র'ইলাম। তিনি বাহু প্রসারিত ক'রে আমায় বুকে টেনে নিতে এলেন,—আমি স'রে গেলাম। মানুষের আর কত সয় ? আর একটা তুচ্ছ নারীর জন্য কেনই বা সহ্য ক'রবেন, দরিদ্রের কুটীর থেকে তুলে নিয়ে মাথার মণি ক'রেছিলেন,—আদর দিয়ে মাথায় তুলে ছিলেন। সব কথা ভুলে গেলাম।

লতা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—

উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"এত ঘৃণা ! এত ক'রে বোঝালাম তবু বিশ্বাস হোল না ? এত প্রেম এক মুহূর্ত্তে ঘৃণায় পরিণত হোল একটা

কল্পনা প্রসূত কথা নিয়ে! তবে তাই হোক, আমি চল্লাম। আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে কি না জানি না। যদি ভগবান রক্ষা করেন ও তোমার ভুল তুমি বুঝতে পার তবেই দেখা হবে, নচেৎ নয়।" এই বলে তিনি টল্তে টল্তে দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'লেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। একি হ'ল! একি করিলাম! আমি কি পাগল হইয়াছি? সামান্ত সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া দেবতার মত স্বামীকে অপমান করিলাম! এমনটা হইবে তাহা তো ভাবিতে পারি নাই। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম, কাতর কণ্ঠে ডাকিলাম,—"ওগো, ফিরে এস! আমি সব ভুলে গেছি।" কিন্তু হায়, শূন্ত ঘরে কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া আমারই কানে ফিরিয়া আসিল। তিনি তৎপূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ভাবিলাম তাঁর ঘরে গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আনি, কিন্তু পা চলিল কই? অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় আপাদ মস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবী চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল,—পরক্ষণেই সংজ্ঞাশূন্ত হইয়া পড়িয়া গেলাল। দিদি! দিদি! তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন না? একবার তাঁকে ডাক না দিদি, পায় ধরিয়া ক্ষমা চাই।"

আমি তাহাকে সাধ্যমত আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম,—"নির্ম্মলবাবু এখন একটু বাইরে গেছেন বোন, তিনি এলেই তোমার কাছে আস্বেন। তোমায় ক্ষমা ক'রবেন বৈকি! তোমায় কত ভালবাসেন তাকি জান না?"

"জানি, দিদি, জানি—তাইতো এত সাহস পেয়েছি।" লতার অশ্রু জলে ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল। আমার স্বামী আসিলেন। তাঁহাকে নির্ম্মলের সংবাদ লইবার জন্ত পাঠাইয়া লতার নিকট আসিয়া বসিলাম। অনেক কষ্টে তাহাকে একটু দুগ্ধ পান করাইলাম, সমস্ত দিন অনাহারে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—দুগ্ধ পান করিবার অল্প পরে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি তাহার নিকট বসিয়া তাহার অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

শ্রাবণ মাস,—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, মাঝে মাঝে সেই বিরাট অন্ধকার ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ হাসিতেছিল। আমি আমার হৃদয়ে বিরাট অন্ধকার লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর লতা জাগিল, চক্ষুরুন্মিলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি কি এসেছেন দিদি?"

আমি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম,—"না, এখনও আসেন নি, এই এলেন ব'লে।"

লতা একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—তাহার সেই নিশ্বাসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! সরলা বালিকার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে? আমার স্বামী ফিরিয়া আসিলেন,—তিতি প্রথমেই ষ্টেশনে নির্ম্মলের সংবাদ করিবার জন্ম গিয়াছিলেন, সেখানে শুনিলেন নির্ম্মল এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়া পাঞ্জাব মেলে চাপিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিলাম, আমার স্বামী বলিলেন, "কিছু ব্যস্ত হোয়ো না আমি কাল নিজে এলাহাবাদ গিয়ে তাকে ফিরিয়া নিয়ে আস্‌ব।"

লতাকে আর কিছু জানাইলাম না,—বিপদের উপর বিপদ লতা তখন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি আর তাহার নাই। আমি আর গৃহে ফিরিতে পারিলাম না। খোকাকে রাত্রে একটু দেখিবার কথা স্বামীকে বলিয়া দিয়া লতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম। চিকিৎসক ও ধাত্রীর জন্য লোক পাঠাইলাম।

সমস্ত রাত্রি ক্লেশভোগের পর, উষার তরুণ আলোক যখন সবে মাত্র আকাশ প্রান্তে উঁকি দিয়াছে, সেই সময়ে লতা, অসময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। লতার পুত্র ঠিক যেই মুহূর্ত্তে এই পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রথম স্থাপন করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি মালগাড়ীর সহিত উর্দ্ধগামী পাঞ্জাব মেলের ভীষণ সংঘর্ষণ হইয়া বহু যাত্রী প্রাণ হারাইল। পরদিন সংবাদ পত্রে মৃতের তালিকায় সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মলকান্ত রায়ের নাম প্রকাশিত হইল। লতার সব ফুরাইল। দুঃসম্বাদ পাইয়া লতার মাতা ছুটিয়া আসিলেন। শোকার্ত্ত জমীদার দম্পতির স্থানত্যাগের শক্তি লোপ পাইয়াছিল। লোক পাঠাইয়া তাঁহার বধূর তত্ত্বাবধান করিলেন। লতা ছিন্ন লতিকার মতই দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

তারপর একদিন একমাসের ক্ষুদ্র শিশুটিকে মায় কোলে তুলিয়া দিয়া, উদ্দেশ্যে শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করিয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন লতা পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে মহাযাত্রা করিল।

বিদায়

[শ্রীশ্রীধর শ্যামল]

ওগো পান্থ! রাখ বীণা কণ্ঠ হোক্ গীত-হীনা
অন্ধ তমসায়;
এবার বিদায়!
ফেণ-শুভ্র নদীতীরে অন্ধকার নামে ধীরে
যাত্রা হল শেষ,
উদাস-গগনভাগে মদিরার রাগে জাগে
আধ তন্দ্রাবেশ,
পথশ্রান্ত বধূ ওকে চলেছে চপল চোখে
শঙ্কিত চরণ?
মৌনদিন ম্লান হেসে কোন্ মন্ত্রময় দেশে
লভিল শরণ;
দূরে ক্লান্ত তরী খানি ধীরে স্বপ্নাঞ্চল টানি
নিঃশব্দে ঘুমায়,
বল পান্থ! বল তবে, বল শ্রান্ত গীতরবে
বলগো বিদায়!
সুরে সুর মিলাইয়া ধ্বনিয়া তুলেছে হিয়া
মোহমুগ্ধ বীণ—
তব সাথে বড় সুখে কাটায়েছি হাসি মুখে
সারা দীর্ঘদিন;
গগন পবন মাঝে এবার শোন গো বাজে
শোন ওকি সুর,
শুধু যাওয়া [illegible] — ক্ষণিকের ভালবাসা,
ক্ষণিক মধুর;
[illegible] বল তবে, বল শ্রান্ত গীতরবে,
বল তবে হায়।
বিদায়! বিদায়!

বুকে যদি জাগে ব্যথা— ভাঙ্গি মূক নীরবতা
কয়োনাক ভাই ;
চোখে যদি জাগে বারি— স্মৃতিদ্বার অপসারি
সুখে রেখো তাই ;
এজগতে যত হাসি, যত ভাল বাসা বাসি
যতেক ক্রন্দন
বিদায়ের আঁখিধারে গড়ে হৃদয়ের তারে
মধুর বন্ধন ;
বল পান্থ ! বল তবে— বল শ্রান্ত গীতরবে
বল তবে হায় !
বলগো বিদায় ।
নিশাশেষে ম্লান শশী নীলিমায় যাবে মিশি
ছিঁড়ি মায়াজাল ;
নবীন অরুণ ধীরে আসিবে গগন তীরে
তুলি স্বর্ণপাল ,
তখন হবে কি দেখা ? ওগো পান্থ ! ওগো সখা !
এই কিনারায় ?
এবার বিদায় !

কথাবার্ত্তা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম, এ]

(আইভান টুর্গেনিভ হইতে)

আল্‌পসের উচ্চতম দুটী চূড়া—ইয়ংফ্রাও ও ফিনসটেয়ুরেয়ারহর্ণ • • • • • এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো খাড়া পাহাড়ের যেন লম্বা একটা • • • একেবারে পর্ব্বতের অন্তরতম দেশ ।

পর্ব্বতের উপর ম্লান সবুজ মূক গগনতল। চারিদিকে • নো নিষ্ঠুর করকাপাত; কঠোর উজ্জ্বল বরফের স্তূপ—তারই মাঝ • ধ্যান-প্রশান্ত তুষারমণ্ডিত পবনপ্রতিহত দুটী চূড়া মাথা উঁচু করে আছে

দুটো প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, দিক্‌চক্রবালে যেন দুটো রাক্ষস!

ইয়ংফ্রাউ প্রতিবেশীকে বললে, 'নূতন খবর আছে কিছু? তুমিত আমার চেয়ে দেখতে পাও বেশী। নীচে ওটা কি?'

হাজার বছর কেটে গেল, তাদের সেটা এক মুহূর্ত্ত। ফিন্‌স্‌ তখন বজ্রনির্ঘোষে উত্তর দিলে, 'পৃথিবীর উপরে একটা ঘন মেঘের পর্দ্দা দুলছে একটু স'সো।'

আবার হাজার বছর কেটে গেল, তাদের এক মুহূর্ত্ত।

ইয়ংফ্রাউ সুধায়, 'এখন কি খবর?'

'ব্যাপার ত দেখছি একই রকম। নীল সলিলের রাশ, কালো জঙ্গল, আর পাঁশুটে রংএর পাথরের চাঁই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দুপেয়ে পতঙ্গগুলো গোলমাল করে বেড়াচ্চে;—এপর্য্যন্ত তারা তোমায় বা আমায় স্পর্শের দ্বারা কলঙ্কিত করতে পারেনি।'

'মানুষ?'

'হাঁ, মানুষ।'

আবার হাজার বছর যায়, তাদের এক মুহূর্ত্ত।

ইয়ংফ্রাউ সুধায়, 'এখন কি খবর, বন্ধু?'

ফিন্‌স্‌ মেঘমন্দ্রে উত্তর দিলে, 'এখন যেন পোকাগুলো একটু কম; নীচেটাও একটু বেশী পরিস্কার দেখাচ্ছে, জল শুকিয়ে এসেছে, জঙ্গল কমে এসেছে।'

আবার হাজার বছর কেটে গেল, তাদের এক মুহূর্ত্ত।

ইয়ংফ্রাউ সুধায়, 'এখন কি দেখছ, ভাই?'

ফিন্‌স্‌ জবাব দিলে, 'আমাদের কাছটা বেশ পরিস্কার, কিন্তু ঢালু জমি কোলে অনেকদূরে বেশ যায়গাগুলি, কি যেন গড়চে সেথায়।'

আবার হাজার বছর যায়—তাদের এক মুহূর্ত্ত।

তখন ইয়ংফ্রাউ সুধায়, 'এখন কি খবর?'

ফিন্‌স্‌ জবাব করলে, 'ভাল খবর———এখন সব পরিস্কার, যেদিকে চাই—সব সাদা • • • আমাদের মত চারিদিকেই তুষার-অবিচ্ছিন্ন তুষারের রাশ। সব জমে গেছে। এখন সব ঠাণ্ডা, সব শান্ত।'

ইয়ংফ্রাউ বললে, 'বেশ, বন্ধু, অনেক গল্প হলো আমাদের, এইবার এসো আমরা ঘুমুই।'

'হাঁ, ভাই, এসো ঘুমোনো যাক্।'

বিরাট্ পর্ব্বত ঘুমিয়ে পড়ল; পরিষ্কার সবুজ গগনতলও সেই অনন্ত স্তব্ধতার দেশের উপর ঘুমিয়ে পড়লো।

জাতীয় উন্নতির ভিত্তি

(শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন)

আজ আমাদের চোখের সামনে যাহাই আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই আমরা মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতেছি। আমাদের একটি বারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই যে আমরা কি লইতেছি আর কি ফেলিয়া দিতেছি! কি মহারত্ন আমাদের জননীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিল আর কি নগণ্য পদার্থ আজ সেই রত্নভাণ্ডারের ভাস্বর শ্রী নষ্ট করিতে বসিয়াছে! আগাছায় ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে হতশ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ উক্তির "লক্ষ্য কি বা কে?" এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে। কিন্তু উত্তরেরও অনুসন্ধানে বহুদূরে যাইতে হইবে না। উত্তর নিজেরই গৃহে উত্তর নিজেরই হৃদয়ে। আমার কি আছে আর কি নাই "তা আমি ভাল রকমেই জানিতে পারি, যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে; "আমার কি ছিল আর আজ কি হারাইয়াছি" ইহার অনুসন্ধান জন্য একটা বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় কেবল একটা প্রবৃত্তির, একটা আকাঙ্ক্ষার। সেই প্রবৃত্তিকে সেই আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু সে প্রবৃত্তি হয় কৈ? আকাঙ্ক্ষা জাগে কৈ? আকাঙ্ক্ষাজাগরণের একটা উত্তেজক কারণ চাই। সে কারণটা কি? ধরিত্রীর কোন্ অংশে আমাদের জন্ম? কোন্ অংশ ঋগ্বেদাদি মহার্ঘ শাস্ত্র নিচয়ের উজ্জ্বল-বিভায় অরুণোদয়সমুদ্ভাসিত পূর্ব্বাকাশের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল? কোথায় ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, দর্শন বিজ্ঞানের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য সম্ভারে বাণীর চরণকমল অর্চ্চিত হইয়াছিল।

একবার সেই অতীতের গৌরবময়ী স্মৃতিকে মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া মৈত্রীকরুণার পূত ধারায় সিক্ত তপোবনগুলির দিকে ফিরিয়া তাকাইতে হইবে। একবার বর্ত্তমান-যুগ-মোহের আবরণ ভেদ করিয়া নির্ম্মল দৃষ্টিতে

নিজের স্বরূপটিকে দেখিতে হইবে। তবেই অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে, তবেই অতীতের স্নিগ্ধ মাধুরীটি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে। তখনই উত্তর মিলিবে, তখনই এই দারুণ সমস্যার একটা সমীচীন মীমাংসা হইয়া যাইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে অবসর আমাদের নাই, সে চেষ্টাও আমাদের নাই। অনুসন্ধিৎসাকে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের সকল অনুষ্ঠানের পথে, সকল করণীয়ের মাঝখানে একটা "জিজ্ঞাসাকে" খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে। যাহা লইতেছি, যাহার মোহে ভুলিতেছি সেটা কি? তাহার উপযোগিতা কি? তাহার ভিত্তি কোথায়?

"পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা" বড়ই ঘৃণিত। ভাল হইলেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, মন্দ হইলেও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। "পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি" হইয়া ভালমন্দ কোন মতকেই নিজের করিয়া লওয়া ভুল এবং সেই মতকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ঘোষণা করা আরও ভুল, তাহাতে ধ্বংসের পথটাই বিস্তৃত হয় মাত্র উন্নতির আশা আদৌ থাকে না; একটা জাতির সৌভাগ্যময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলা যায় না।

ঐ "পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিতা" আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির একটা-বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা রোগের মত জাতির বুকের মধ্যে আসন পাতিয়া বসিয়াছে।

সেই রোগটির সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। যে "জিজ্ঞাসা" প্রাচীন আর্য্যগণের মজ্জাগত ছিল, তাঁদের জাতীয় জীবনের একটা মুখ্য লক্ষণ ছিল, সেই জিজ্ঞাসাকে সকল কাজের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে হইবে।

আমি কোন মতকেই নিন্দা করিতেছি না, হেয় বা অনুপাদেয় বলিয়া কোন মতকেই উড়াইয়া দিতেছি না। আমি বলিতেছি বিচার করিয়া দেখিতে; স্বয়ং তার সত্যতা, তার উপাদেয় নির্ণয় করিতে।

আমাদের যা ছিল বা এখনও যা আছে তা আমরা ত্যাগ করি কেন? প্রাচীন আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ যা ছিল তা না দেখিয়া, না বিচার করিয়া ছুড়িয়া ফেলি কেন? তার হেয়ত্ব বা অনুপাদেয়ত্ব প্রমাণ করিয়া ত্যাগ করিলে ভাল হয় না কি?

একদিন যাহা সুখের ছিল, একদিন যাহা ভারতবক্ষে স্নেহের, ধর্ম্মের, ও পবিত্রতার পুণ্য প্রস্রবণ ছুটাইয়া দিয়াছিল; একদিন যাহা মানব-সমাজে সুখ, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি বহন করিয়া আনিয়াছিল; আজ তাহার উপাদেয়ত্ব

গেল কোথায়? আজ তাহা একটা বিকট অনভ্যর্থিতের মূর্ত্তি লইয়া আমাদের ভীতি উৎপাদন করিতেছে কেন? কেনই বা তাহাকে অবজ্ঞা করি? কেনই বা সেই প্রাচীন কথায় একটা তীব্র বিদ্রূপের হাসি চোখে মুখে ভরিয়া রাখি? একি কম পরিতাপের বিষয়!

বিনা কারণে একটা বস্তুকে দোষান্বিত বলিয়া ত্যাগ করা, অথবা পূর্ণ ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইয়া তাহার স্পর্শ হইতে আপনাকে সরাইয়া দেওয়া কি যুক্তিসিদ্ধ।

একদিন আর্য্যগণ উন্নতির দুরারোহ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন; সেটা বোধ হয়,আলোচনা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে আমাদের ঔদাসীন্যের মর্য্যাদার উপর হাত পড়িবে না; আমাদের "অবজ্ঞা ব্রত" ভঙ্গ হইবে না।

আজ হয়ত আমরা অবজ্ঞা পূর্ব্বক উড়াইয়া দিব, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণের জীবনে এমন একদিন গিয়াছে যখন তাঁহারা পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মত যা দেখিয়াছেন তাহাতেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারই কারণ অনু-সন্ধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া অতি বিজ্ঞের মত হাসি থামাইয়া রাখিতে পারি না।

কিন্তু একদিন তাঁহারা কালো গরুর বাট হইতে সাদা দুধ ক্ষরিত হইতে দেখিয়া বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে ধেনুর কত স্তুতিই না করিয়া ছিলেন। এবং এই ব্যাপারে একটা তাঁহারা দৈবলীলার অস্তিত্বের অনুমান করিয়াছিলেন।

অমুকদিন অমুক সময়ে (রাত্রি ৯৷৷০ কি ১০ টার সময়) পূর্ব্বাকাশে একটি নক্ষত্রের উদয় হইবে আমরা এইরূপ গণনা করিয়া বলিয়া থাকি। সূর্য্যের উদয় অস্তের মধ্যে আমরা বিস্ময়ের কোন কারণই দেখিতে পাই না,—"ইহা ত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি?" কিন্তু সেই দূর অতীত যুগের মানুষগুলি এই সমস্ত ব্যাপারকে একটা দৈনন্দিন সামান্য ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে তাঁহারা একটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন। "কি ইহা? কোথা হইতে আসিতেছে কোথায় বা যাইতেছে?" এইরূপ "জিজ্ঞাসার" একটা সুসঙ্গত উত্তরের জন্য তাঁহাদের চিন্তার স্রোত ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। আজও সেই প্রশ্নের ধ্বনি আমরা যন্ত্ররাশির মধ্যে শুনিতে পাই।

শত শত নদীর উচ্ছলিত জলরাশি সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে তবুও সমুদ্র পূর্ণ হইতেছে না! কিন্তু ইহা শিশুর স্বভাব সুলভ বিস্ময় নয়, এই বিস্ময়ের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল একটা অমানুষিক পর্য্যবেক্ষণ প্রযত্ন। সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার একটা অলৌকিক আত্মচেষ্টা! প্রতিক্রিয়া বা গতির অন্তরালে লুক্কায়িত একটি অদৃশ্য হস্তসঞ্চালন, একটি চেতন-প্রেরকের দুরনুমেয় অস্তিত্ব তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। জীবন সত্ত্বের মধ্যে একটা পরিস্ফুট গতি বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, সেই দর্শনই তাঁহাদিগকে কল্পনার রাজ্যে একটা সিদ্ধান্তপ্রাপ্তির পথে পরিচালিত করিয়াছিল এবং সেই পরিচালনা বা প্রেরণার ফলে তাঁহারা প্রতি নৈসর্গিক ঘটনার অন্তরালে দ্যৌ বরুণ, সূর্য্য, সবিতা পূষণ প্রভৃতি দেবতার অদৃশ্য পরিচালনাশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ক্রিয়ার মাঝখানে তাঁরা একটা শক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, এই গবেষণা তাঁহাদিগকে বহুদূরে লইয়া গিয়াছিল, বহু অদ্ভুত সত্যের, বহু অত্যদ্ভুত তত্ত্বের নির্ণয়ে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা বৈজ্ঞানিক যুগের লোক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা অতীত ও বর্ত্তমান উভয়কে লইয়া হইতে পারে নাকি? সেই বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডে অতীতের অভ্যুদয়ের গুরুত্ব নির্ণয় কি পণ্ডশ্রম হইবে? অতীতের প্রতি অন্ধ হইয়া কেবল বর্ত্তমানের প্রতি চক্ষুষ্মান হইলে লাভ কি?

উদ্দেশ্য আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি বিধান করা; একটা নূতন কিছু করা নয়! ভাল মন্দ বিচার না করিয়া নূতনকে বরণ করিয়া লইয়া পুরাতনকে ত্যাগ করা নয়! বিচারপূর্ব্বক ভালটিকে লওয়াই আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহা "পুরাতন" হইতেই হউক আর "নূতন" হইতেই হউক। নূতনকে ভাল বা মন্দ বলিবার আগে পুরাতনকে চোখের সামনে আনিয়া ধরিতে হইবে, তার প্রত্যেক বিষয়টি নিরপেক্ষ ভাবে ও শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, নূতনের সহিত তার তুলনা করিতে হইবে; তার পর তাহার হেয়ত্ব দেখিলে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, উপাদেয়ত্ব দেখিলে তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। প্রতি পদে, প্রতি চিন্তায় প্রত্যেক বিচারে মনে রাখিতে হইবে সমাজের "উন্নতিই" আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য হারাইলেই বিচার যুক্তি তর্ক সব নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে "উন্নতি কি ? যে জাতীয় জীবন আদর্শস্থানীয় হইবে তাহার স্বরূপট কেমন হইবে ? কেমন রূপ লইয়া তাহা আমাদের চোখের সামনে লক্ষ্যরূপে অবস্থান করিবে ?" তাহাও আমরা জানি না। সেই লক্ষ্যটিকে আমরা কোন্ ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাও ত একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। আমাদের লক্ষ্যটিকে পুরাতন ছাঁচে ঢালিব না নূতন ছাঁচে ঢালিব ?" ইহাই প্রথম সমস্যা, এবং ইহার সমাধানও উভয়ের তুলনার উপর নির্ভর করিতেছে। জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে কোনটা 'হিত' আর কোনটা 'অহিত' ইহা স্থির করা সহজসাধ্য নয়। কারণ একটা জাতির মঙ্গল কিসে বা কোথায় নিহিত রহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বহু অভিজ্ঞতা বহু সাধনা ও বহু তুলনার প্রয়োজন হয়। এখনই—এখনই ঝাঁ করিয়া একটা মন্তব্য প্রকাশ করিলেই হয় না।

আমাদের দেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখনকার ভাব (idea) ভাষা সভ্যতা সবই অন্যরূপ হইয়াছে। আছে কেবল সেই দেশটি কিন্তু সে মানুষ আর নাই, যেন বৈদেশিকের মত আসিয়া এই আর্য্য ক্ষেত্রে আমাদের বসতি স্থাপন করিয়াছি।

শিক্ষা, দীক্ষা সংস্কার, ধর্ম্ম সকলেরই ক্রমবিকাশ হইয়াছে ও হইতেছে। এই যে ক্রমবিকাশ ইহা স্বাভাবিক, ইহার গতিও দুর্ব্বার। বৈদিক যুগের পর হইতে এই ক্রমবিকাশের মূর্ত্তি কত রূপই না ধারণ করিল। পৃথিবীর মধ্যে কোন কিছুই নিশ্চেষ্ট নয়; কোন কিছুই জড়ের ন্যায় মৃতবৎ একই ভাবে যুগ যুগান্তর পড়িয়া থাকে না। সকলের মধ্যেই একটা গতি, একটা ক্রিয়া সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। তাই এই ভাবান্তর। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই ভাবান্তর পরিগ্রহের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রহিয়াছে। ইহা একেবারেই ন্যায়ের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া হয় না, হইতে পারেও না।

দেশ, কাল, পাত্র ও বৈদেশিক বা বাহ্য প্রভাব বশতঃ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে নূতনত্ব দেখা যায়; এই পরিবর্ত্তন ধারার চিরন্তনী গতির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উন্নতিশীল জাতি এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে না, বিচারপূর্ব্বক আপনার কার্য্যপ্রণালীকে পরিচালিত করিবার শক্তি হারায় না। সে আপনার আপনত্বটুকু (individuality) বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করে তারই ফলে এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই নিজস্বটুকু আরও পরিস্ফুট, সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন হইতে থাকে। কিন্তু

নিজেকে একবার হারাইয়া ফেলিলে আর তাহা সম্ভবপর হয় না। আমরা সেই 'নিজস্বটি' হারাই ফেলিয়াছি; সেই প্রাচীন আদর্শ হইতে নিজকে অনেক দূরে টানিয়া আনিয়াছি। মূল ভিত্তি বা আশ্রয়টির মধুময় আলিঙ্গন হইতে নিজেকে সবলে বিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। সেই মূলটিকে অক্ষত রাখিয়া জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির দিকে স্থির লক্ষ্য সংস্থাপিত করিয়া পুষ্টির পথে অগ্রসর হইলে বোধহয় এমনটা হইত না। বোধ হয় এখন শোচনীয় রূপান্তরে পরিণমিত হইতাম না।

আমরা গোড়ায় গলদ করিয়া ফেলিয়াছি, নিজেকে বাদ দিয়া নিজের জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির পথে অগ্রসর হইয়াছি; তাই আজ চিনিতে পারিতেছি না "আমরা কে? আমার কি ছিল আর আজ আমরা কি হারাইয়াছি।" আমরাই আমাদের আদর্শ বা লক্ষ্য হারাইয়া আমাদের উন্নতির পথ চিরকালের মত কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছি। আমরা নিজেকেই ভুলি । গিয়াছি।

তাই বলিতেছি আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে প্রাচীনের দিকে তাকাইতে হইবে, সেই প্রাচীনকে লইয়া নবীনের সহিত তুলনা করিতে হইবে এবং তাহাকে ত্যাগ না করিয়া, তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া যা কিছু ভাল যাকিছু উপাদেয় তাই দিয়া জাতীয় জীবনকে পুণ্যশ্রী মণ্ডিত করিতে হইবে। প্রাচীনের প্রতি এই প্রীতিটুকু শ্রদ্ধা ও অনুরাগটুকু আমাদের দেখাইতে হইবে।

যে জাতির জীবনের প্রতিষ্ঠানের মূলে ধর্ম্ম পূর্ণ অবলম্বন রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই জাতিই উন্নত হয়। পরকল্যাণবুদ্ধি যে জাতির জীবিত-স্পন্দন, সমদর্শন যে জাতির মজ্জাগত, পরের জন্য আর্ত্ত পতিতের জন্য যে জাতির জীবনের "উৎসর্গ" সেই জাতি উন্নতিশীল, সেই জাতির অন্তর্বাহ্য অক্ষয় কবচে সুরক্ষিত।

পতিতার সিদ্ধি।

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৪২)

রাখুর প্রতি সমবেদনায় অতি আগ্রহে নির্ম্মলা কতকগুলা ভুল করিয়াছে। বুদ্ধিমতী হইয়াও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছে।

প্রথম ভুল রাখুকে ধরিয়া আনিতে শুভাকে বহির্ব্বাটিতে পাঠানো। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রজেন্দ্রের বাটিতে আব্রুর অভিমানটা বড় বেশি ছিল। সে সময়ের বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই শুভার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছিল যদিও ঝড়ের জন্য তখন বাহিরে কোনও লোক ছিল না, তথাপি শুভার মাকে তুষ্ট করিতে নির্ম্মলাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। রাখুর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ, যেটা সে কাহারও কাছে বলিবেনা স্থির করিয়াছিল, আদ্যোপান্ত শুভার মাকে শুনাইতে হইয়াছে।

সে শুনানোটা হইল তার দ্বিতীয় ভুল। শুভার মা সে কথা গোপন রাখিতে পারে নাই। আপাততঃ সে কথা সরি শুনিয়াছে। আর তখন পাড়ার লোকের সে কথা শুনিতে বড় বিলম্ব হইবে না।

চারুর মৃত্যুতে রাখুর অগাধ সম্পত্তি প্রাপ্তির কথা তুলিয়া শুভার মাকে প্রলুব্ধ করাও তার মস্ত ভুল। সে যে মরিয়াছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা তার উচিত ছিল না। আর মরিলেও, রাখুই যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইবে, এটাও মনে করা তার নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল।

আর একটা বড় ভুল হইয়াছে। শাশুড়ীর কাছে শুভার সঙ্গে এই দরিদ্র পূজারির বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা। সেটা করিবার আগে স্বামীর মতামত জানা নির্ম্মলার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্যছিল। তার বুঝা উচিত ছিল, ব্রজেন্দ্র যদি এ বিবাহে অমত করে, তা হইলে তার কিম্বা তার শাশুড়ীর সম্পূর্ণ মতেও এ বিবাহ হইবে না। তবে একটুকু মন্দের ভাল, রাখুর কাছে সে প্রস্তাব তুলিতে তুলিতে তার তোলা হয় নাই।

কিন্তু সবার চেয়ে বেশি ভুল করিয়াছে সে, সকলের অজ্ঞাতসারে রাখুর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ পাতাইয়া। সেই জন্য বহুবার সে তাহার কাছে যাতায়াত

করিয়াছে, বহুবার নির্জ্জনে আলাপ করিয়াছে। অথচ এ সম্বন্ধের কথা সাহস করিয়া, কাহারও কাছে সে প্রকাশ করে নাই। খাশুড়ী কিম্বা ঝিকে তারই মত সরল মনে করা তার বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই। এই আলাপের জন্য সে নিজের পুত্র কন্তার যত্ন লইতে ভুলিয়াছে। শুভার আঘাতেও তার যত-টুকু দেখা শুনা উচিত ছিল, তার কিছুই এক রকম করিতে পারে নাই।

এই ভুল গুলা নির্ম্মলার অগোচরে অনেক গোলমালের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

বেলা প্রায় পাঁচটা। পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রা-আহারান্তে নির্ম্মলা কন্তাকে লইয়া একটু বিশ্রাম লইতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত তার ঘুম ভাঙে নাই। রাখুও ঘুমাইতেছিল।

সরি ইহার মধ্যে একবার পাড়ায় ঘুরিয়া আসিল। তখনও কলিকাতায় দুই দশ ঘর বহুকালের প্রতিবেশী লইয়া এক একটি পল্লী ছিল। এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। পরস্পরে একরূপ সংলগ্ন দুই খানি বাড়ীর লোক এখন অনেক সময়েই কেহ কাহাকেও চিনে না।

বেড়াইতে গিয়া সরি দুই একটি প্রতিবেশিনীর কাছে :কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। কিন্তু প্রত্যেকেই অপরের কাছে একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল। ঘরে ফিরিয়া দেখিল, ঠাকুর মা উপরের বারান্দার এক পার্শ্বে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। সে একটু আগে শুভার নাক পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিয়াছে তার জ্বর হইয়াছে, নাকও একটু ফুলিয়াছে।

তার বিমর্ষতা দেখিয়াও না দেখিয়া সরি বলিল—"তাগা না নিয়ে, ঠাকুর মা, ছাড়বো না কিন্তু।"

"নে বাপু, আর জ্বালাস নি।"

"সে কিগো! ঠাকুর মশাইকে জামাই করা কি তোমার ইচ্ছা নয়?"

"আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় আসে যায় কি সরি!"

"তা ব'লে তোমার অমতে কি এরা বিয়ে দিতে পারে?"

"দিলে আমি কি করতে পারি।"

সরি ক্ষণেক নীরব রহিল। বুঝিল তার অনুপস্থিতি সময়ের মধ্যে কিছু না কিছু একটা গোল বাধিয়াছে।

শুভার মাও ক্ষণেক নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে বলিল—

"মেয়ের কপালে পোড়া বিধাতা যে কি লিখেছে তা বুঝতে পারছি না।" এই কথাতেই একটু আশ্বাস পাইয়া, এদিক ওদিক একবার চাহিয়া সরি বলিল—

"তা যদি বললে ঠাকুর মা, তা হ'লে বলি, যদি অনেক বিষয় সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা না থাকতো—"

"তুই যেমন ক্ষেপি, বিষয়কি পাব বললেই পাওয়া হ'ল। এখন আমার মেয়ে বাঁচলে বাঁচি। হতভাগা বামুন কি ক'রে যে মেয়েটার নাকে মারলে!"

তার কথায় সরি একটু সাহস পাইয়া বলিল—"তা হ'লে বলি ঠাকুর মা, ও বাড়ীর শ্যাম বাবুর মা একথা শুনে বললে, তার চেয়ে তোদের বাবু মেয়েটার গলায় একটা কলসী বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিক্ না।"

"তাকে এখন একথা বলতে গেলি কেন?"

"তোমাদের মেয়ে দেওয়া ঠিক হয়ে গেল, বলতেই আমার যত দোষ!"

"ঠিক হয়ে গেল তোকে বললে কে?"

"এইত দেখছি ঠাকুর মা!"

পুঁটি কোলে এই সময় নির্ম্মলাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া উভয়েই চুপ করিল। শুভার মা কেবল একবার অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া লইল—"ব্রজেন্দ্র আসুক, এখন কোথায় কি।"

সরি তার ঠাকুরমা'র মত মধু ঠাকুরের পক্ষপাতী ছিল। মধুসূদনের একটু মেয়েলি স্বভাব মেয়েদের মাঝখানে একবার বসিতে পারিলে গল্প গুজব হাস্য-পরিহাসে এমন সে মগ্ন হইত যে, সে জন্য অনেক সময় সব কর্ত্তব্যই সে ভুলিয়া যাইত। নির্ম্মলার মত মেয়ের কাছে সেটা ভাল বোধ না হইলেও সরি কিম্বা শুভার মা তাহাতে কোনও দোষ দেখিত না।

রাখুর স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। গম্ভীর না হইলেও নিতান্ত অল্পভাষী, সে শুধু আপনার কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়া যাইত। রাখুর বিরুদ্ধে কাহারও কোনও কথা কহিবার না থাকিলেও, প্রগল্‌ভতা দোষের জন্য মধুকে ছাড়াইয়া দেওয়ায় সরি ও শুভার মা উভয়েই নির্ম্মলার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

তবে যে শুভার মা রাখুকে কন্যা দিতে অমত করে নাই, সেটা কতক সহসা-জাগ্রত অর্থের প্রলোভনেও বটে, কতকটা নির্ম্মলার কথার প্রতিবাদে সাহসের অভাবেও বটে। সে ছিল বাল-বিধবা; এদিকে সে নির্ম্মলার একরূপ সমবয়সী, বড় জোর তিন চারি বৎসরের বড়—সর্ব্বপ্রকারেই ইহাদের উপর তার নির্ভর। অল্প বয়সের বিধবা বলিয়া নির্ম্মলা সর্ব্বদাই তাহাকে চোখে চোখে রাখিত। ব্রজেন্দ্রর কাছে মায়ের সমস্ত মর্য্যাদা লাভ করিলেও, নির্ম্মলাও তাহাতে শাশুড়ীর যোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইলেও নিজের বয়সও অবস্থায় সর্ব্বদাই

সে অনেকটা সঙ্কুচিত থাকিত। বিশেষতঃ তার বৃদ্ধ স্বামী মৃত্যুকালে তাঁহাকে এমন কিছু অর্থ অথবা সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যায় নাই, যাহাতে সে ব্রজেন্দ্র কিম্বা নির্ম্মলার সঙ্গে আপনাকে সমান অবস্থাপন্ন মনে করিতে পারে। স্বামী তাহাকে ব্রজেন্দ্রের মহত্ত্বের উপর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নির্ম্মলাকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—"যা সরি, এরা যদি জলেই মেয়েটাকে ফেলে দেয় আমি কি করতে পারি।"

"সরি!" নির্ম্মলা দূর হইতেই ডাকিল। "ঠাকুর মশাই উঠেছেন কি না একবার দেখে আয়।"

"দেখে এসেছি, ওঠেন নি।"

শুভার মা বলিল—"কাল রাত্রে ঠাকুর বোধ হয় চোখের পাতা ফেলবার অবকাশ পায়নি।"

সরি একটু হাসিয়া বলিল—"এইমাত্র নাকডাকা শুনে আসছি মা।"

"হাত-মুখ-ধোওয়া জল, তামাক সব ঠিক ক'রে রাখ।"

সরি চলিয়া গেল।

এইবারে শাশুড়ীর কাছে আসিয়া নির্ম্মলা বলিল—"নালু কোথায় গেল মা?"

মনে মনে শুভার মা'র রাগ হইল। বউ বামুনের খবর লইল, ছেলের খবর লইল, কিন্তু শুভার খবর লইল না। অথচ নিজেই সে মেয়েটার দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে। সে বলিল—"কোথায় সে আমি জানি না। আমিও তাকে খুঁজছি।"

"কেন মা?"

"তাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাতুম। শুভার নাক ফুলেছে, একটু জ্বরও হয়েছে।"

কোন উত্তর না দিয়া নির্ম্মলা শুভাকে দেখিতে গেল। তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে বুঝিয়া সে মনে মনে একটু লজ্জিত হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মলা দেখিল, শুভা বিছানার উপর বসিয়া আছে। মুখ তার ছিল উপর দিকে।

"হতভাগা মেয়ে তোমাকে উঠতে বললে কে? ডাক্তার না তোকে নড়তে চড়তে বারণ করে গেছে?" বলিয়াই পুঁটিকে শয্যায় রাখিয়া নির্ম্মলা শুভার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। বুঝিল গা তার সামান্য গরম হইয়াছে বটে। নাক ও অল্প ফুলিয়াছে। কিন্তু মন তার সে জন্য কিছুমাত্র ভীত হইল না। তাহার মন বলিল, হাতই লাগুক কিম্বা কনুইই লাগুক অন্যমনস্ক ব্রাহ্মণের আঘাত কখনই

এমন গুরু হইতে পারে না, যে জন্য শুভার সত্য সত্যই বাঁশির মত নাকটি জন্মের মত বিকৃত হইয়া যাইবে। তথাপি সে পিসির সঙ্গলাভে উৎসুক তাহার কন্যাকে আবার কোলে উঠাইয়া বলিল—"ডাক্তার বাবু হয়ত এখনি আবার আসবে। তাঁর না আসা পর্য্যন্ত যেন উঠিস্‌নি।"

শুভা উত্তর না করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু শুইয়াও সে একটু অস্থিরতার ভাব দেখাইল।

"তোর কি যন্ত্রণা হচ্ছে শুভা?"

"মুখ না ফিরাইয়াই শুভা উত্তর করিল—"না।"

"তবে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিস্‌ কেন?"

পুঁটি এই সময় বলিয়া উঠিল—"আমি পিসির কাছে শোব।"

"না তোর পিসির অসুখ করেছে।—তবে ছট্‌ফট্‌ করছিস্‌ কেন শুভা?"

মুখ ফিরাইয়া শুভা বলিল—"ওকে আমার কাছে দাও বৌদি!"

"আগে বল্‌, নইলে দেবো না।"

শুভা কিছু বলিল না, বালিশে মুখ ঢাকিয়া চোখ মুদিল। পরক্ষণেই আবার চোখ মেলিয়া মুখটা তুলিয়া বৌদি'র মুখের পানে চাহিল।

"তোর কি গরম বোধ হচ্ছে—বাতাস করব?"

"না।"

"তবে কি হচ্ছে খুলে বল্‌।"

"বৌদি,' দাদা আমাকে বক্‌বেন।"

"বাইরে গিছলি বলে? ভয় নেই, তোকে বক্‌তে দেব কেন—বক্‌তে হয় আমাকে বক্‌বে।" বলিয়া নির্ম্মলা শুভার মুখের দিকে আর না চাহিয়া একখানা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। দুপুরের পর হইতেই ঝড়ের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে। প্রকৃতির নিস্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যৈষ্ঠ আবার তাহার প্রভাব বিস্তারের সূচনা করিয়াছে।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া শুভা নির্ম্মলাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল—"হাঁ বৌদি!"—

"কি?—বৌদি ব'লেই চুপ করলি কেন? কি বলতে যাচ্ছিলি? বেশ, চুপ করেই থাক্‌, ডাক্তার আজ তোকে কথা কইতেও নিষেধ ক'রে গেছে।"

"দাদা কি পুরুত মশাইকে"—শুভা আবার চুপ করিল।

"বল্‌তে ইচ্ছা হয়েছে, একেবারে বলে শেষ করে নে!"

তবুও শুভাকে নীরব দেখিয়া নির্ম্মলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"মন খুলে বল্। আমাকে বল্‌তে তোর লজ্জা কি? তুই যে আমার ননদ রে!"

"দাদা কি পুরুত মশাইকে আর পূজো করতে দেবেন না?"

"এই কথা বল্‌তে সাতটা ঢোক গিললি! আমি মনে করেছিলুম না জানি কি সুভদ্রা হরণেরই পালা বলবি।"

এ কথার গভীর অর্থ শুভা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিবে না তা নির্ম্মলাও জানিত। তবে শুভা ননদ হইলেও সে ত-তাকে কন্যা পুঁটু রাণীরই মতন দেখিয়া থাকে। একটু চুপ করিয়া সে শুভাকে জিজ্ঞাসা করিল "একথা তোকে বললে কে?"

"মধু ঠাকুর যে পূজো করে গেল বৌদি!"

"সেই ত আগে পূজো করত। পুরুত মশাই দু'দিন এসেছেন বইত নয়।"

"দাদা যে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

"দাদা ছাড়ালে কি হবে, বামুনঠাকুরের পূজো তোর মার পছন্দ হয় না। মধুঠাকুর বিড় বিড় করে যা তা মন্তর বলে ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপায়, তাই তার ভাল লাগে।"

"মায়ের বুদ্ধি নেই বৌদি।"

"পুরুত মশাই কি তোকে কিছু বলেছে?—বল্।"

"বলছিলেন।"

"এর মধ্যে কখন তোকে তিনি বললেন!"

"সরিকে ডাকছিলেন। সরি ছিল না, মা ছিল না, তুমি ঘুমুচ্ছিলে। তার পিপাসা পেয়েছিল।"

"কি বললেন?"

"বললেন, কলকেতা ছেড়ে চললুম শুভা দিদি! আর বোধ হয় এ দেশে আসব না। আমি বললুম, কেন যাবেন? বললেন, কাজ কর্ম্ম কিছু রইল না, এখানে থেকে খাব কি?"

"তুই তাতে কি উত্তর দিলি?"

"আমি বললুম বৌদি'কে আমি বলব।"

"যাতে তোমাকে আর কলকেতা ছেড়ে না যেতে হয়, তার ব্যবস্থা করতে?"

শুভা হাসিল। "আমি আর কিছু বলিনি বৌদি!"

"না বলেছিস্ ভালই করেছিস্। কিন্তু ঠাকুর দেশে গিয়েই বা খাবে কি?"

"কেন বৌদি? দেশে কি পুরুত মশাইয়ের খাবার নেই।"

"থাকলে কলকেতায় চাকরি করতে আসবে কেন? দেশে এক মামী আছে, সে ঠাকুরকে খেতে দেয় না।"

"আর কেউ নেই বৌদি?"

এ 'আর কেউ' এর অর্থ নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। সে হাসিয়া বলিল—"পুরুত ঠাকুরের বউ আছে কি না জিজ্ঞাসা করছিস?"

শুভা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণেক উত্তরের অপেক্ষা করিয়া নির্ম্মলা বলিল—"না শুভা, পৃথিবীতে তার আপনার জন কেউ নেই।"

"দাদা তাঁকে কি জন্য ছাড়িয়ে দিলেন বৌদি!"

"এ বলা বড় শক্ত কথা শুভা, তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিস্।"

রাখু ঠাকুরের উপর শুভার অহেতুক মমতা দেখিয়া নির্ম্মলা মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইল। তবে সে বালিকা, আর নির্ম্মলা তার এই ছোট ননদিনীটিকে চিরকাল কন্যারই মত দেখিয়া আসিতেছে আজিও পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে রহস্যের কথা কয় নাই। আর অধিক বলা উচিত নয় বুঝিয়া নির্ম্মলা বলিল—"নে ঘুমো, এর পর আর কারও সঙ্গে কথা কস্নি। দেখি তোর পুরুত মশায়ের কলকেতায় রাখবার কোনও উপায় করতে পারা যায় কি না।"

"আমার গরম করছে না বৌদি!"

"তাহলে আমি যাব?"

"পুঁটিকে আমার কাছে রেখে যাও, আমি একলা থাকতে পারি না।"

"আবার উঠবি না ত?"

"না।"

পুঁটিকে বিছানায় রাখিয়া, পাখাখানা শুভার হাতে দিতে দিতে ঈষৎ হাসিয়া একটু রহস্যের ছলে নির্ম্মলা বলিল—"শুয়ে পড়ে পুরুত মশায়ের ভাবনায় ছট্ ফট্ করবি নাত?"

"যাও" বলিয়া শুভা পুঁটিকে কোলে জড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

(৪৩)

বারান্দার যে স্থানটিতে সে শাশুড়ীকে বসিতে দেখিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া

নির্ম্মলা দেখিল সেখানে কেহ নাই। তাহার আর অনুসন্ধান না করিয়া সে কাপড় কাচিতে চলিল।

কলতলার নিকটে উপস্থিত হইতেই সে শুনিতে পাইল, "দিদি কেলো?" একটু চিন্তান্বিতার মত বাড়ীর কোনও স্থানে কিছু লক্ষ্য না করিয়াই সে চলিয়াছিল। কথাটা শুনিতেই সে তন্দ্রা ভাঙার মত চমকিয়া উঠিল। সে কথা কাহাকে উপলক্ষ করিয়া কে বলিতেছে তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকাল হইতে এই অপরাহ্ন পর্য্যন্ত রাখুর প্রতি তাহার ব্যবহার সমস্ত স্মরণ করিয়া সে বুঝিল, কাজটা তার অনেকটা বোকারই মত হইয়াছে।

পাছে খাশুড়ী কিম্বা সরি তাহাকে দেখিতে পায় তাহাদের অলক্ষ্যে সে অনেক দূর সরিয়া আসিল। প্রথমে তার খাশুড়ীর উপর রাগ হইল। এতক্ষণ তার সকল কথাতেই সায় দিয়া তবেত খাশুড়ী তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। কিন্তু ক্ষণেক দাঁড়াইয়া যখন সে মনে মনে নিজের কাজগুলার সমালোচনা করিল তখন নিজেকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে দোষী করিতে পারিল না। শুভার উপর মমতা মায়ের অপেক্ষা বেশী দেখিয়া তার খাশুড়ী যদি তার কাজগুলা অন্যভাবে দেখিয়া থাকে তা হইলে তাহাকে দোষী দেখিতে নির্ম্মলার অধিকার কি?

মনে মনে নির্ম্মলা বলিল—"আমি এ বাড়ীর বউ বইত নয়, ননদের ভাগ্যে প্রতিষ্ঠা দেখিতে আমার এত ব্যাকুল হওয়া, কাজটা একেবারেই অন্যায় হইয়াছে। তার মা আছে, ভাই আছে। উপর পড়া হইয়া শুভার কল্যাণ আমাকেই বা দেখিতে হইবে কেন? দেখিলে কল্যাণই যে হইবে একথাই বা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? যদি ফল বিপরীত হয়?"

এক মুহূর্ত্তেই নির্ম্মলার মনের গতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আর কোনও অপ্রীতিকর কথা পাছে শুনিতে পায়, তাই সন্তর্পণে দূরে সরিয়া গেল। আসিয়া দাঁড়াইল যেখানে, সেখানে উপস্থিত দেখিলে তার খাশুড়ী কিম্বা সরির মনে কোনও সংশয় জাগিবে না।

সেখান হইতে যে ঘরে রাখু আছে, অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় তথাপি নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কের মত, সেদিকে চাহিল। চাহিতেই দেখিল কারা যেন সেই ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া কি যেন লুকাইয়া দেখিতেছে।

তাহাদের কার্য্যটি দূর হইতে নির্ম্মলা ভালরূপ বুঝিতে পারিল। বুঝিবার জন্য আর একটু চলিতেই বুঝিতে পারিল পাড়া সম্পর্কের খুড়ী শ্যামের মা ও দুই জন প্রতিবেশিনী বাহির হইতে উঁকি দিয়া রাখু ঠাকুরকেই দেখিতেছে।

নির্ম্মলার ইচ্ছাকৃত কাসির শব্দেই তাহারা তার অস্তিত্ব বুঝিল, একটু অপ্রতিভের মত নিকটে আসিল।

"কি দেখছিলে খুড়ী মা ?"

প্রশ্ন অনুচ্চস্বরে, উত্তর ও হইল সেইরূপ অনুচ্চস্বরে "শুভার কেমন বর হবে এদের দেখাচ্ছিলুম!"

দ্বিতীয়া বলিল—"দেখতে ত দিব্যটি!"

তৃতীয়া বলিল—"বয়স বেশি নয়।"

শুনিবা মাত্রই নির্ম্মলা বুঝিল, সরির দোষেই হ'ক কি শাশুড়ীরই দোষেই হ'ক, রাখু সংক্রান্ত কথা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, শুধু এই বিবাহের কথা নয় হয়ত আরও অনেক। মনের গতির সঙ্গে নির্ম্মলার কথার গতি, কার্য্যের গতি সব ফিরিয়া গেল।

সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"বয়সও বেশি নয়, দেখতেও দিব্যি, প্রকৃতিটিও যতদিন ধ'রে দেখছি ভাল বলেই বোধ হচ্ছে— ছেলেটি আমাদের ঘরও বটে, কিন্তু হ'লে হবে কি খুড়ীমা, কিছু নেই। সামান্য পুজারিগিরি চাকরি, লেখা পড়াও বিশেষ কিছু জানে না—অমন পাত্রকে ভগিনী দিতে কি বাবুর সাহস হবে!"

শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়া প্রথমার পানে চাহিয়া নির্ম্মলাকে বলিল— "আমিও তাই ভাবছিলাম মা, শুধু দেখতে সুন্দর হ'লে কি হবে, ঘর নেই, দোর নেই, কোন দেশে বাড়ী তার ঠিক নেই, এমন লোককে তোমাদের বাবু কি করে ভগিনী দেবেন।"

নির্ম্মলা এবারে একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"তার উপর মায়ের সে একটিমাত্র মেয়ে, আর বাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক সমস্তই ত তুমি জান খুড়ীমা, ভালই হ'ক, মন্দই হ'ক, আমার পুঁটিকে দিলে তত দোষের হ'ত না।"

এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করিয়া খুড়ীমা আসে নাই। সে একটু অপ্রতিভের মত বলিল—"তবে যে শুনলুম ঠাকুরের অনেক টাকা হচ্ছে।" আরও কিছু তাহার মুখ হইতে শুনিবার জন্য নির্ম্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া গুছাইয়া সে-গুলার সে উত্তর দিবে।

শ্যামের মা বলিতে লাগিল—"বাড়ী, ঘর, গহনা গাঁটি নগতে শুনলুম প্রায় লাখোটাকার সম্পত্তি।"

নির্ম্মলার উত্তর শুনিবার জন্য শ্যামের মা'র দুজন সঙ্গিনীও নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলা আবার হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি যখন জেনেছ খুড়ীমা, তখন তোমাকে গোপন করব কেন, আমিও তাই প্রথমে মনে করেছিলুম। মনে করে ঠাকুরকে আটকে রেখেছিলুম। ভাবলুম কুলীনের ছেলে ত বটে, টাকার মালিক হ'লে তাকে মেয়ে দিতে আপত্তি কি।"

"তার পর?"

"কোথায় কি!"

"সব ভুয়ো?"

"সব না হ'ক, প্রায় বটে।"

"সে মেয়েটা—"

"মরেছে তুমি বিশ্বাস কর?"

তৃতীয়া একটু ব্যঙ্গভাবে প্রথমাকে শুনাইয়া বলিল—"এই! শুনলে মেজো গিন্নী?"

নির্ম্মলা বলিল—"আর সে আবাগী মলেই বা ঠাকুরের কি।"

শ্যামের মা একটু হতাশের ভাবে বলিল—"শুনলুম—"

"তোমাকে শুনতে হবে কেন খুড়ী মা, আমি বলছি। তুমি যা শুনেছ, আমিও তাই শুনেছিলুম। নষ্টদুষ্ট মেয়েদের কথা—তুমি নিতান্ত ভাল মানুষ—তোমাকে কি বলব। আর বললেই কি তুমি বুঝবে?"

"সে মাগি তাহ'লে—"

"ও ঠাকুরের কেউ নয় কি কেউ এত হঠাৎ জানবার উপায় নেই।"

দ্বিতীয়া এইবারে মুখ খুলিল—"হ'লত শ্যামের মা, এইবারে চল।" বলিয়া সে নিজেই প্রস্থানোদ্যত হইল।

"তোমার নির্ব্বোধ ভাসুরপোকে ঠকাবার এও হয় ত একটা কৌশল।"

তৃতীয় দ্বিতীয়ার অনুসরণ করিল।

"আমিও ত তাই ভাবলুম, বৌমাকি আমার এতই নির্ব্বোধ হবে।"

তখন শ্যামের মা'র সঙ্গিনীদ্বয় অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা এই বারে অনুচ্চকণ্ঠে তাহাকে শুনাইয়া বলিল—"এইবারে তোমাকে বলি। এখন ও ঠিক কিছু বুঝতে পারিনি খুড়ীমা! সত্যি যে না হ'তে পারে, এমন কথা বলতে পারি না। খুব সম্ভব—সম্পর্ক মিছে মরা মিছে—সমস্তই নষ্ট মেয়ের ছলনা। তবু যদিই সত্যি হয় আর ঠাকুরের ধন পাওনা থাকে, তখন ঠাকুরের সঙ্গে শুভার বিয়ে দিলে কি দোষের হবে?"

"কিছু না বৌমা, কিছুনা।"

মুহূর্ত্তের জন্ত আর শ্যামের মা দাঁড়াইল না।

নির্ম্মলা ও তার চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া ঈষৎ দ্রুতপদে বরাবর উপরে একবারে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ঘর প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলাতি ধরণে সজ্জিত হইলেও, তার এক প্রান্তে একটি গঙ্গাজলের কলসী ছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া মাথায় দিয়াই সে তাহার দেরাজ খুলিল। বাহির করিল তার ভিতর হইতে দুই তাড়া নোট ও এক মুঠ টাকা।

টাকা অঞ্চলে লইয়া, দেরাজ বন্ধ করিয়া, কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া বরাবর সে রাখুর ঘরে চলিয়া গেল।

রাখু তখন কলিকাটি মেঝেয় রাখিয়া হুকাটিকে দেয়ালে ঠেসিয়া রাখিতে-ছিল।

পিছন হইতে নির্ম্মলা বলিল—"আপনার ঘুম হয়েছিল দাদা?"

'একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

নির্ম্মলা এইবারে কি ভাবে কথাটা পাড়িবে ভাবিতে গেল। রাখুকে বিদায় দিবার কথা মুখ হইতে বাহির হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"নালু কি আপনার কাছে ছিল না?"

"ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখিনি।"

"ছেলেটা কোথায় গেল। তাকে একটা কাজে পাঠাবার বিশেষ দরকার পড়েছে।"

বিশেষ কথাটায় একটু জোর দেওয়ায় রাখু একটু চিন্তিতের মত বলিল।

"তাকে খুঁজে আনবো কি?"

"সে কোথায় গেছে আপনি তাকে কেমন ক'রে খুঁজে পাবেন।"

"শুভাদির কি—"

"না, না দাদা, সে দিক দিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

"বাবু এসেছেন কি?'

"না, তিনি এখনও কইত এলেন না। কোনও খবর পর্য্যন্ত তাঁর পেলুম না। আজ আসবেন কিনা তাও বুঝতে পারছি না।'

নির্ম্মলা এইবারে কথা পাড়িবার অবকাশ পাইল। রাখু ঠাকুর কথায় যখন কোনও কথা কহিল না, তখন আবার সে বলিল—'আপনার কথা শুয়ে শুয়ে একটু ভাবলুম দাদা—"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল। নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"ভাবলুম। আপনার মনটা যখন বড়ই চঞ্চল হয়েছে—"

"বড়ই চঞ্চল দিদি।"

"তা আমি বুঝেছি।"

"তুমি এই স্নেহ বন্ধনে না বাঁধলে এতক্ষণ উধাও হয়ে চলে যেতুম। এরকম বন্ধনের ভিতর থাকা কোনও কালে আমার অভ্যাস নেই।"

"না আপনাকে আটকে রাখা আমার এখন অন্যায় মনে হচ্ছে।"

"কলকেতার বাতাস আবার একবারেই সহ্য হচ্ছে না। তোমাকে গোপন করব কেন দিদি, এই তিন মাসেই এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।"

"দেশ থেকে একবার আসুন।"

রাখু আর উত্তর না দিয়া ছাতি হাতে করিল।

"কথা শেষ করতে না করতেই বুচ্‌কি হাতে করলেন যে!"

"বেলা বেলি হাওড়ায় চলে যাই।"

"দেশে গিয়ে কি করবেন?"

"প্রথম দু'চার দিন মামীর গাল খাব। তার পর যাত্রার দলে একটা চাকরি নেব। একটা পেট যেমন ক'রে হক চলে যাবে দিদি।"

"যাত্রার দলে কি করবেন?"

"আমি একটু বাজাতে জানি।"

"ছিছি, যাত্রার দলে আপনি ঢুকবেন কেন?"

"হীন কাজ বলে এতদিন ঢুকিনি, দু তিন জন যাত্রাদলের অধিকারী আমাকে সেধেছিল।"

"নানা তা করবেন না।"

"তবে কি করব—বিদ্যেও নেই, পয়সাও নেই। অকর্ম্মণ্য পরপ্রত্যাশী হওয়ার চেয়ে সে কাজ কি ভাল নয়?"

"পয়সা কিছু হাতে হলে ব্যবসা করতে পারেন?"

রাখু আবার বিস্মিত নেত্রে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

নির্ম্মলা নোট ও টাকাগুলি রাখুর পায়ের কাছে ধরিয়া বলিল—"এইনিন্।"

"না না।"

"এদের টাকা নয় দাদা, তোমার ভগিনীর—মৃত্যুকালে আমার বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন।"

তথাপি রাখু হাত নামাইয়া টাকা তুলিতে পারিল না।"

"যদি না নাও—"

"নেবো দিদি—মাথাটা ঠিক রাখতে পারছি না।"

তার চক্ষু হতে জল ধারা পড়িতে লাগিল।

"নিয়ে যে ব্যবসা ভাল বুঝবেন করবেন।"

তথাপি রাখু দাঁড়াইয়া রহিল। আবেগ ঈষৎ দমিত করিয়া বলিল—"টাকা তুলে নাও। যতদিন আমি বাঁচব আমার ভগিনীপতির দোরে মাথা দিয়ে পড়ে থাকব দিদি!"

"মাথা দিলেত আর ভগ্নীপোতের কল্যাণ হবে না। যখন ইচ্ছা এরপর এ বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে আসবেন, আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করবেন। টাকা তুলে নিন্। নালুকে দিয়ে একজোড়া কাপড় আনাবো মনে করেছিলুম। ওই টাকা দিয়ে কিনে নেবেন।" বলিয়া নির্ম্মলা ভূমিষ্ঠ হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল। তারপর দাঁড়াইয়া বলিল—"বরাবর দেশেই যাবেন?"

"আর কোথাও যাবনা দিদি দেশেই যাব।"

"পুঁটি বুঝি কাঁদছে।"

"তুমি এসো" বলিয়া রাখু টাকা তুলিয়া লইল।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

বৈদিক, পালি, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত।

সাধারণের যেরূপ ধারণা যে বৈদিক গাথাগুলি "এক আদিম জাতির গোচারণ সঙ্গীত" ("pastoral songs of a primitive people") বাস্তবিকপক্ষে তাহা নয়। ভাষার পরিণতির এবং ছন্দোবন্ধের জটিলতা হইতে বেশ বুঝা যায় যে বৈদিক ভাষা কতখানি উন্নত হইয়াছিল। এমন কি ঋগ্বেদের মধ্যেই বিভিন্ন উপভাষার (dialects) নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকগুলি উপভাষার মধ্যে একটি উপভাষা রাজনৈতিক কারণে প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার ভিত্তি স্থানীয় হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান কালে মধ্যবঙ্গের

ভাষার সহিত বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে চলিত ভাষার যে সম্বন্ধ এই ভাষারও কতকটা সেই ধরণের সম্বন্ধ ছিল।

বর্ত্তমান ভারতীয় চলিত আর্য্য ভাষাগুলি (Aryan Vernaculars of India) এই সকল বৈদিক উপভাষার একটি বা অপরটি হইতে আসিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে সাধারণের ধারণা সংস্কৃত ভারতীয় বর্ত্তমান চলিত ভাষাগুলির মাতৃস্থানীয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই সকল ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য হেতুই এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। এই সকল সংস্কৃত শব্দ বহুদিন ধরিয়া ভাষার মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করিয়াছে এবং সংখ্যায় অনেক হইয়াছে। বিশেষত ব্রিটিশ জাতি এদেশে আসার পর যখন বর্ত্তমান গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের হাতে পড়িয়া বাংলা এবং অন্যান্য ভাষা সংস্কৃতবহুল এক রকমের কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হয়।

যে ভাষায় কালিদাস হইতে জয়দেব পর্য্যন্ত কবিগণ লিখিয়াছেন সেই সংস্কৃত ভাষা (classical Sanskrit) কদাচ কথিত ভাষা ছিল না। শিক্ষিত পণ্ডিতলোকের ভাবের আদান প্রদানের উপায়স্বরূপ ইহা হয় তো প্রচলিত ছিল; এখন যেমন অনেক পণ্ডিত ইহাকে উক্তউদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষা মৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছিল—কারণ বুদ্ধ লৌকিক ভাষায় নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের ভাষা যে সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন ছিল—তাহা তাঁহার নিজের কথা হইতেই বুঝা যায়, কেন না বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকের কথা। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অশোকের সময় লৌকিকভাষা কত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহা অনুশাসন গুলি হইতেই দেখা যায়। অবশ্য পাণিনি যখন তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করেন তখন সংস্কৃত কথিত ভাষা ছিল। কিন্তু পাণিনিকে আমরা স্যর আর, জি, ভাণ্ডারকরের মতানুসারে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ফেলিতে চাই (খৃঃ পূঃ ৮ম শতক)। এইস্থানে কথিত সংস্কৃত ভাষা বলিতে যাহা নির্দ্দেশ করা হইতেছে—সেটি বৈদিক ভাষারই একটি উপভাষা যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কালক্রমে সংস্কৃত নামক কৃত্রিম ভাষা সৃষ্ট হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই ভাষা যুগোপযোগী ভাবে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এই ভাষা হইতে অন্য কোন ভাষা জন্মগ্রহণ করে নাই।

বৈদিক ভাষার অনেক বিশেষত্ব পালি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান চলিত আর্য্য ভাষাগুলির ভিতর নিখুঁতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। শব্দসম্পদ ও বাক্যবিন্যাসরীতি উভয়ের মধ্য হইতেই ইহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পালি নামটি সম্বন্ধে একটু সাবধান হইতে হইবে। পালিও একপ্রকারের প্রাকৃত ভাষা—কেবল মাত্র ইহার পূর্ব্বতর আকার। কালক্রমে সংস্কৃতের ন্যায় পালিও কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণগণের নিকট যেমন সংস্কৃত, বৌদ্ধগণের নিকট সেইরূপ পালি শাস্ত্র ও সাহিত্যের পবিত্র সাধু ভাষা হইয়া উঠে।

সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত ভাষাও কালক্রমে সাহিত্যের কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হয়। প্রাকৃত লোকমুখে নিজের ধারায় চলিতে থাকে। এই কথিত প্রাকৃতকে আমরা অপভ্রংশ বলিব। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই কথিত প্রাকৃত লোকমুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া কালে বর্ত্তমান ভারতীয় আর্য্য কথিত ভাষাগুলির আকার ধারণ করে। বৈয়াকরণিকদিগের তথাকথিত অপভ্রংশের কোনও নির্দ্দিষ্ট ধরণ নাই। সমস্ত সংজ্ঞা আলোচনা করিলে অপভ্রংশ বলিতে কি বুঝায় তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। বাংলাদেশের বর্ত্তমান কথিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার অপভ্রংশ বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ প্রাকৃতকে সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়াছেন। "অথ প্রাকৃতম্॥ প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্।"—হেমচন্দ্র ৮, ১, ১,। "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং মতং"—প্রাকৃত চন্দ্রিকা। "প্রাকৃতস্য তু সর্ব্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ"—প্রাকৃত সঞ্জীবনী। প্রকৃতি অর্থাৎ মূল সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে বলিয়া এই ভাষার নাম প্রাকৃত হইয়াছে।

রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের ভাষ্য মধ্যে কিন্তু নমিসাধু (১১২৫ বিক্রমাব্দ=১০৬৯ খৃষ্টাব্দ) প্রাকৃতকে লৌকিকভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "সকল জগজ্জন্তুনাম্ ব্যাকরণাদিভিরনাহিতসংস্কারঃ সহজো বাগ্‌ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ, তত্রভবং, সৈব বা প্রাকৃতম্।" (Commentary on the Kavaylankara of Rudrata by Namisadhu, Edition Nirnaysagar Press, Bombay, 2.12) অর্থাৎ—"জগতের সাধারণ লোকের সহজভাষা ব্যাকরণের নিয়মে পরিশুদ্ধ নয় তাহাই প্রকৃতি; প্রকৃতি হইতে জাত কিম্বা প্রকৃতিই যাহার নানা স্বরূপ তাহাই প্রাকৃত।" (পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন ১৩২৭; পৃঃ ৩৫৫)

যে কোন দেশের "সাধু" ভাষা কতকটা কৃত্রিমতাপূর্ণ হইবেই; কেননা ইহার সাহায্যে লেখার মধ্য দিয়া ভাবের আদান প্রদান করা হয়। এই ভাষায় কেহ কথা বলে না। সকল কথিত উপভাষার সারাংশের উপর নানা কৃত্রিম আকার যোগ করিয়া এই ভাষা হয়। ইহাকেই "সাধু" ভাষা বলা হয়। তাহার অর্থ এমন নয় যে আমাদের কথিত ভাষা "অসাধু"। ইহার ভিতর কোনও নৈতিক উচ্চ-নীচতা (moral reproach) নাই, High German, Low German বলিতে high = উচ্চ, আর, low = নীচ এই দুই কথার ভিতর ভালমন্দের বিচার আসে না। কেবল নামকরণের সুবিধার জন্ম এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইহাতে লজ্জা, ঘৃণা বা অশুদ্ধতার কোনও কথা নাই। "অসাধু" বলিয়া ভাষার জাতি যায় না।

আমাদের চলিত আর্য্যভাষাগুলির প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শনের এবং বৈদেশিক ভাষার মধ্যে একটী স্তর হারাইয়া যায়। এই হারানো ভাষা হইতে সেই সকল কথিত ভাষার উৎপত্তি যাহাদের লিখিত আকারে পালি প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই প্রত্যক্ষ নিদর্শনহীন ভাষাকে আমরা ভারতীয় মধ্যভাষা (middle Indian) বলিয়াছি। বৈদিক কথিত ভাষা হইতে আমরা এই মধ্যভাষায় আসি, তথা হইতে কথিত ভাষার ভিতর দিয়া অপভ্রংশে পৌছাই এবং এই অপভ্রংশ সমূহ হইতে বর্ত্তমানে চলিত আর্য্যভাষাগুলি পাই।

ভারতীয় চলিত আর্য্য ভাষাসমূহের বহির্গোষ্ঠী এবং অন্তর্গোষ্ঠী।

(The so-called outer-group and Inner-group of Indo-Aryan Vernaculars)

গ্রিয়ারসন সাহেব ভারতীয় চলিত আর্য্যভাষাগুলিকে কতকগুলি সাদৃশ্য হেতু এই উভয় ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদিকযুগের পূর্ব্বে চরণশীল এক আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; তাহাদেরই কথিত ভাষা হইতে মারাঠী, উড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি ভাষার জন্ম সম্ভাবনা হয় (derived from the patris of some pastoral Aryan tribes coming before the Vedic period)। এই সকল ভাষাকে গ্রিয়ারসন বহির্গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী প্রভৃতি বৈদিক লিখিত ভাষা

যে উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই কথিত উপভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল ভাষাকে অন্তর্গোষ্ঠীভুক্ত করা হইয়াছে।

হর্ণলে সাহেবের নিকট হইতে গ্রিয়ারসন সাহেব এই মতবাদের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষার ইতিহাস নামক ইংরাজী পুস্তকে গ্রিয়ারসনের এই অদ্ভুত মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রিয়ারসন নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—

ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ে ঃ—

(১) অন্তর্গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলিতে sibilants শক্ত হয়

(২) বহির্গোষ্ঠীতে sibilants নরম হয়

কারকবিষয়ে ঃ—

(১) অন্তর্গোষ্ঠীতে বিভক্তি দ্বারা কারক নিরূপণ না হইয়া স্বাধীন শব্দযোগে নিরূপিত হয়।

(২) বহির্গোষ্ঠীতে প্রথমে বিভক্তির প্রয়োগ পরে শব্দসংযোগে, তারপর সেই শব্দ রূপান্তরিত বিভক্তির মত কাজ করিতেছে।

ক্রিয়াবিষয়ে ঃ—

(১) প্রথমটিতে participle এর দ্বারা ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ হয়।

(২) দ্বিতীয়টিতে কর্ম্মবাচ্যের দ্বারা ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ হয়।

(১) অন্তর্গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাসমূহে 'ল' প্রত্যয় যোগে অতীতকাল নির্দ্দেশ হয় না।

(২) বহির্গোষ্ঠীতে past participle এর চিহ্ন 'ল' যোগে অতীত কাল নির্দ্দেশ হয়।

এই কল্পনাজাত মতবাদের কোনও ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। এইরূপ সাদৃশ্য যে কোনও দুই ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিতে পারে। বাংলা-ভাষার সহিত যেমন সুদূর ইতালির ইট্রাস্কান (Etruscan) ভাষার কিছু কিছু দৈবাৎ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এইরূপ সাক্ষ্যের উপর কোনও মতবাদ গঠন করা চলে না।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জানিয়াছি গ্রিয়ারসন এখন এই মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে ততটা জোর দেন না। এই সকল ভাষার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি অসাদৃশ্যও আছে—ইহার কোনও হেতু নির্দ্দেশ করা চলে না। হয়তো ইহার ঐতিহাসিক কিম্বা প্রাকৃতিক কারণ কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা কোনও থিওরি দিয়া করা উচিত নয়, বিশেষ যে থিওরির ঐতিহাসিক কিম্বা বৈজ্ঞানিক সুস্পষ্ট ভিত্তি নাই।

রুদ্র-আহ্বান

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

এস রুদ্র এস হে ভয়াল
এস ভীম প্রভঞ্জন উড়াইয়া আঁধির জঞ্জাল
হুঙ্কারিয়া এস তুমি,
এই মর্ত্ত্য ভূমি
তোমার প্রবল দাপে থর থরি উঠুক কাঁপিয়া!
রয়েছে চাপিয়া
যে নিষ্ঠুর শিলাস্তূপ সংজ্ঞাহীন বুকে
তোমার সম্মুখে
মুহূর্ত্তে সরিয়া যাবে, পাষাণে উঠিবে জাগি প্রাণ
মরণের হ'বে অবসান!
ঘনঘোর মেঘ জালে ঢেকে ফেলে দিগ্ দিগন্তর
বিমুখ অন্তর
অকস্মাৎ অন্ধকারে কি যেন কি হারাইয়া ফেলি'
বাধাবন্ধ ঠেলি
অবহেলি মুহুর্মুহু মেঘের গর্জ্জন
শিরে রাখি বৃষ্টিধারা অবিরাম করকা বর্ষণ
আঁধার দুর্য্যোগ মাঝে সে এক দুর্জ্জয় অভিযানে
কোথা যাবে কিছু নাহি জানে!

বিদ্যুৎ কটাক্ষ হানি' সচকিয়া মোহমুগ্ধ প্রাণ
কর তব অমোঘ সন্ধান,
জ্বালো জ্বালো প্রলয় আগুন
পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে উদগ্র সে ভীষণ দারুণ,
ছুটাইয়া দিকে দিকে
লেলিহান বহ্নিশিখা; অন্ধ আজ চা'ক নির্নিমিখে,
আচম্বিতে
তোমার ভৈরব রব বধিরের কর্ণ হ'তে চিতে
উঠুক ধ্বনিয়া,
চলিবে রনিয়া
শিরা উপশিরা ব্যাপি' উষ্ণ রক্ত ধারা
আত্মহারা
আবেগে চঞ্চল,
নব জন্ম অনুরাগে শিহরিবে ধরার অঞ্চল!
ভূধর শিখর ভাঙ্গি এস তুমি ধ্বংশ অবতার
ভীষণ দুর্ব্বার
অনন্ত সাগর মাঝে তুমি ঢেউ পর্ব্বত-প্রমাণ
এস মহাপ্রাণ
আপনারে বিস্তারিয়া উৎসারিয়া লক্ষ কোটি স্রোতে
সংসারের বেলাভূমি হ'তে
ভাসাইয়া বিমলিন জরাজীর্ণ যত আবর্জ্জনা
করহে মার্জ্জনা—
কূল নাই, সীমা নাই, ভেসে যাও দৃষ্টিপরপারে
শুধু আপনারে
রেখে যাও ভগ্ন ধ্বংশ শেষ রেখাময়
অমর অক্ষয়!
নাচায়ে ধমনি
হে পিনাকি কর তূর্য্য ধ্বনি
মোহমুগ্ধ দুর্গদ্বারে পদাঘাতে বিচূর্ণিয়া আজ
এস মহারাজ

তোমার পরশ পেয়ে শৃঙ্খলের বজ্রগ্রন্থিগুলি
উঠিবে আকুলি'
বন্ধন ব্যথায় রাঙা বিকশিত লক্ষ শতদলে ;
তব পদতলে
বন্দী মনে একান্ত নির্ভয়
তব:মুখপানে চাহি' সমস্বরে গা'বে তব জয় !

"দেশেযাব কর্ত্তা"

[শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

দীননাথ রায়ের ছেলে রঘুনাথ রায় ডাক্তারী পাশ করিয়া যখন আর কোনও কিছু করিতে পারিল না তখন কিছু একটা করিবার জন্যই বোধ হয় আসামের এক চা বাগানে চাকুরী লইল। আর বৎসরের পর বৎসর সেই একই বাগানে কাজ করিয়া নির্ব্বিবাদে কাল কাটাইতে লাগিল—তাহার অর্থাগমের পরিমাণ আর :স্বাস্থ্যের কুশল কিন্তু পল্লীবাসী পিতার নিকট একেবারেই অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

বৃদ্ধদীননাথ রায়ের অবশ্য আথিক অবস্থা একেবারেই খারাপ ছিল না এবং পুত্রের নিকট সাহায্য না পাইলেও পল্লীগ্রামে তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া যাইত তাহার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইত না। কিন্তু অকৃতজ্ঞ পুত্রের এই আচরণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার মর্ম্মে যে আঘাত দিত তাহাতেই তাঁহার গৃহের স্বাচ্ছন্দ্যও সময়ে সময়ে সর্ব্বপ্রকার অশান্তিতে ভরিয়া উঠিত। সেদিন তিনি গৃহিণীর অশ্রু আর পুরাতন ভৃত্য রাঘবের খোকা বাবুকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অনুশোচনার কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিতেন না।

রঘুনাথ যেদিন চাকুরী লইয়া দেশত্যাগ করিতে চাহিল সেদিন তাহার জননী অত্যন্ত আপত্তি করিলেও তাহার পিতা উন্নতিকামী পুত্রের ইচ্ছায় বিশেষ বাধা দিতে পারেন নাই। কারণ এই বিবাহিত পুত্র যে দৃষ্টির বাহিরে গিয়াই পিতা-মাতার সঙ্গেই তাহার বিবাহিতা পত্নীকে ভুলিয়া থাকিবে, অভ্যস্ত নহেন বলিয়া বোধ, হয় তিনি এতটা কল্পনা করিতে পারেন নাই। কোন্ পিতা আশা করেন যে পুত্র দূরে গিয়াই তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে।

কিন্তু পিতা যাহা আশা করেন নাই পুত্র যখন তাহাই করিয়া বসিল তখন তিনি শুধু নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না, নিজের দূরদৃষ্টিহীনতার জন্যও যথেষ্ট অনুতপ্ত হইলেন। আর তাহাদের যাহাই হউক হতভাগিনী বধূটার জন্য তাহার দুঃখ ও বেদনার অন্ত রহিল না।

হায়রে নিজের সর্ব্ববিধ দীনতা ও হীনতার মধ্যে থাকিয়াও পুত্রকে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়া মানুষ করিয়া, মানুষ যদি তাহাকে হীন ও বিদ্রোহী ভাবিতেই পারিত, তাহা হইলে পুত্রের হস্তে পিতার নির্য্যাতন বারংবার ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিতে পারিত না। আর বৃদ্ধ দীননাথ রায়ও পুত্রের মুখাপেক্ষী না হইয়া তাহার আচরণে ব্যথিত হইতেন না।

কিন্তু পুত্রকে বিদেশে পাঠাইবার সময় গৃহিনী যথেষ্ট আপত্তি করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই বরং রঘুনাথের গমনকালে প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষে তাহার সাহায্যই করিয়াছিলেন—আর করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজ পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ক্রমশঃ বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন—এমন কি সময়ে অসময়ে সেই হতভাগা মেয়েটার মুখের দিকে চাহিতেও তাঁহার কুণ্ঠার অবধি রহিত না।

কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাও পুত্রবধূর কল্যাণের জন্যই। অদৃষ্ট যদি তাঁহার সমস্ত শুভেচ্ছাকেই বিপথে টানিয়া লইয়া যায় এবং সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত পুত্রও যদি পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য একখানা পত্র দিয়াও না করে, তাহা হইলে মানুষের শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া তিনি কি করিতে পারেন, অথচ ইহার মধ্যে যতটুকু করিবার তাহা তিনি না করিলে, আর কেহই যে করিবার নাই—তাহাও তিনি সুস্পষ্টই দেখিতেছিলেন, আর চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইতেছিলেন।

তাঁহার এই সমস্ত দুশ্চিন্তার অংশ লইত কেবল রাঘব। রাঘব তাঁহার ভৃত্য, সখা, মন্ত্রী; নীচ হইতে উচ্চ সকল কার্য্যই এই চাষার ছেলে অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে করিয়া আসিয়াছে। কারণ ত্রিশবৎসর কাল এই একই সংসারে কাজ করিয়া সংসারে সে এমন স্থান অধিকার করিয়াছে যে, সেখান হইতে তাহাকে সরাইতে গেলে সংসারই সরিয়া যাইবে, তবু রাঘবকে স্থানভ্রষ্ট করা যাইবে না—এগৃহ, গৃহকর্ত্তার সঙ্গে রাঘবের এতই আয়ত্ত হইয়াছিল।

যৌবনে এই রাঘবের সঙ্গে দেখা। সে এক পরম দুর্য্যোগময়ী-রাত্রিতে গৃহকর্ত্তার পরম-দুর্দ্দিনে। দুর্দ্দিনে সাক্ষাৎ বলিয়া, বিপদের সহায় বলিয়া এই

রাঘবকে শুধু স্নেহই করিতেন না, চাষার ছেলে হইলেও এই রাঘবকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।

সে একদিনকার অপরাহ্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে আবৃত হইবার পূর্ব্বেই আকাশে যে ঝটিকা-বৃষ্টির সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছিল—তাহাই রুদ্র হইতে রুদ্রতর মূর্ত্তি লইয়া যখন ধরাতলে নামিয়া আসিল আর তাহাদের তাণ্ডবনর্ত্তনে, ঘর্ষণে, বর্ষণে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেবাসুরের সংগ্রাম বাধাইয়াই তুলিল কি শোকোন্মত্ত শূলীর সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া নৃত্যটার পুনরভিনয় করিয়া মানুষকে চোখের উপর দেখাইয়া দিতে লাগিল, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই দীননাথ রায়ের পীড়িতা জননী ভয়েই হউক কি ভাবনাতেই হউক ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। আর তাঁহার পুত্র সদ্য মাতৃহারা হইয়া সংসারকে শুধু অন্ধকারই দেখিতে লাগিলেন না এই ঝড় ও ঝঞ্ঝার রাত্রিতে মৃতা জননীর শবদেহ কিরূপে তীরস্থ করিবেন তাহাই ভাবিয়া তাঁহার ভয় ও ভাবনার আদি অন্ত রহিল না। কারণ এই বিভীষিকাময়ী রাত্রিতে কেহ যে তাঁহার মাতার মৃতদেহ বহন করিতে চাহিবে না শুধু তাহা নয় কাহাকে বলাও সঙ্গত হইবে না, অথচ এই মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া সারারাত্রি বসিয়া থাকা যে গৃহস্থের পক্ষে কিরূপ সম্ভব হইবে তাহাও তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, শুধু বিষাদে বিপদে শঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিতে ছিলেন।

কিন্তু বিপদেরও একাকী পথ চলিতে বিপদের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় সেও সঙ্গী না লইয়া পথ চলে না—তাহাতে মানুষের বিপদ যতই অপার হউক এবং তাহার জীবনপথ যতই দুরতিক্রম্য হউক। নহিলে মৃতা জননীর শবদেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিতে ছিলেন না বলিয়া ভয়ে যিনি বিপদের সমুদ্র দেখিতে ছিলেন পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার পূর্ণগর্ভা স্ত্রীর প্রসব বেদনা ধরিয়াছে শুনিয়া তিনি বিপদের মহাসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবেন কেন? অন্ধকার রাত্রি—আকাশে অন্ধকার মেঘ—জীমূতমন্দ্রে ধরিণীকে বারংবার প্রকম্পিত করিতেছে—বিদ্যুৎ আকাশের বক্ষে সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া আকাশকেই মথিত করিতেছে কি ধরণীর অন্ধকারময়ী মূর্ত্তিকে উপহাস করিতেছে আর তাহারই মাঝখানে এক আত্মার স্বর্গে গমন আর এক আত্মার মর্ত্ত্যে অবতরণ এই নিরীহ ব্রাহ্মণের অন্তরে বাহিরে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়াই বোধ হয় দীননাথ বাবু দীননাথকেই ডাকিতে লাগিলেন। কারণ মানুষ

তাঁহার ক্ষুদ্র দম্ভ লইয়া স্রষ্টার অস্তিত্বকে যতই উপেক্ষা করুক, জীবনে এমন দিন সবারই আসে, যে দিন মানবের সমস্ত বিজ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও সাহস দিয়া দেবতার অমোঘ বিক্রমকে আর কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না—তাহা সম্পদের দিনে যাহাই হউক বিপদে পড়িয়া দীননাথ বাবু ভুল করিতে পারিলেন না।

কিন্তু এই সময়েই একবার বিদ্যুৎ বিকাশ হইলেই তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন যে তাঁহার উঠানের মাঝখানে একেবারে তাঁহার অত্যন্ত নিকটে তিন চারিজন লোক দাঁড়াইয়া আছে—আর তাহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই একজন বলিয়া উঠিল "ভয় কি কর্ত্তা, আমরা তোমার মায়ের সৎকার কর্ব্ব।" বলিয়াই যে অগ্রসর হইয়া আসিল—সে রাঘব—রাঘব সেদিনকার এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু দলপতি।

ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এমনই এক বিপদে পড়িয়া রাঘবও হাবুডুবু খাইয়াছিল—এমনই এক অন্ধকারময়ী রাত্রিতে মাতার মৃতদেহ কোলে করিয়া সেও মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল। আর সে দিন তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—আজিকার এই বিপন্ন ব্রাহ্মণ দীননাথ রায়। দীননাথবাবু স্বয়ং সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অনঙ্গর চাষার ছেলে রাঘব ভোলে নাই। কারণ সে ভুলিলে যে দীননাথ বাবুর নাম স্মরণ করা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

কিন্তু সত্যকার আত্মনিবেদন যে ব্যর্থ হয় না নহিলে মানুষ যাহাকে বিপদে সাহায্য করিলনা—এমন কি মানুষের চরম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিল—তাহাকে সাহায্য করিতে আসিল কি না এক দস্যু। এমন ঘোরান্ধকারময়ী রাত্রিতে রক্তপাতের সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিয়া সে আসিল এই ব্রাহ্মণের কুটীরে বিপদে ত্রাণ করিতে আর মানুষ যাহারা—যাহারা রক্তপাত করিতে জানেনা এমন কি রক্ত দেখিলেও শ্রীহরি স্মরণ করিয়া স্থান ত্যাগ করে—তাহারা রহিল নিজেদের গৃহে বসিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে কাল কাটাইতে—তাহাদেরই মত একজন মানুষ যখন বিপদের কুলকিনারা দেখিতে পাইতেছিল না।

হায়রে! অন্ধমানুষ! তাহারা কি করিয়া বুঝিবে যে, তাহারা পরের বিপন্নকে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেও অন্তর্যামী নিশ্চিন্ত নহেন। তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে যে তাঁহার সদাজাগ্রত চক্ষু সূচীভেদ্যতিমিরেও দৃষ্টিহীন

হয় না। নহিলে এই রাঘবও ত তাহাদেরই মত একদিন পুরা মানুষ ছিল—মানুষেরই মত সংসারীর ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়া দিন যাপন করিত। সে যে আজ মানুষের হত্যাকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই মানুষের অত্যাচারেই।

মানুষ যেদিন তাহার আজীবন ধর্ম্মাশ্রিতা বিগতযৌবনা বিধবা জননীর নামে কলঙ্ক রটাইয়া দিল এবং এই অপবাদের মধ্যে মূল সত্য কিছু আছে কি না তাহার কোন তত্ত্ব না লইয়াই তাহাদের মাতা পুত্রকে একঘরে করিয়া দিল। আর সেই জননী যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইল তখন তাহার মৃতদেহটা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চাহিল না এমন কি যে হারু ঘোষালের সঙ্গে তাহার এই কলঙ্ক রটাইয়াছিল সে পর্য্যন্ত এই মৃতা রমণীর একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিতে রাজী হইল না, সে দিন মানুষের উপর তাহার ক্রোধও ঘৃণার বোধ হয় অন্ত ছিল না।

কিন্তু ক্রোধ বা ঘৃণা তাহার যতই হউক জননীর মৃত দেহ কোলে করিয়া সহায়সম্পত্তিহীন প্রাণীমাত্র পরিত্যক্ত একাকী রাঘব কি করিতে পারে তাই ক্রোধ তাহার যতই হইতেছিল সে ততই উষ্ণ অশ্রুতেই পরিণত হইতেছিল। কিন্তু এই সময়েই দীননাথ রায় তাহার বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি এই দরিদ্রকে বিপন্ন দেখিয়া অনশ্চিত ভাবেই গিয়া মৃতের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিলেন আর রাঘব প্রাণীমাত্রের সাহায্য না লইয়া জননীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া গভীর নিশীথে একাকী দাহ করিতে চলিয়া গেল।

কিন্তু দাহ করিয়া সে যখন প্রেতভূমি শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিল তখন সে সত্যই প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, কারণ সেই দিন হইতে সে যে সংহার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই এই কয় বৎসরে তাহাকে প্রসিদ্ধ দস্যু সর্দ্দার করিয়া তুলিয়াছিল—কারণ ও অঞ্চলে তখন রাঘবের মত প্রসিদ্ধ শক্তিশালী দস্যু দলপতি আর ছিল না।

কিন্তু এই প্রসিদ্ধ দস্যু অসংখ্য নরহত্যা করিয়াও দীননাথ রায়ের সেই এক দিনকার উপকার বিস্মৃত হয় নাই তাই এই গ্রামে আজ ঢুকিয়াই সে যখন এই ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনিল, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না—দুই চারিজন অনুচর লইয়া একেবারে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া অসঙ্কোচেই বলিল, "ভয় কি কর্ত্তা, আমরা তোমার মায়ের সৎকার করব।"

আর দীননাথ বাবু সেই ঘোরান্ধকারময়ী রজনীতেও হাতে প্রায় আকাশের চাঁদ পাইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা কে বাবা কোথা থেকে এলে?"

"পরিচয়ে দরকার কি কর্ত্তা খরচের টাকা দিয়ে দাও আমরা লাস তুলে নিয়ে যাই দেরি কর্ত্তে পাচ্ছিনা।" বলিয়াই রাঘব তাহার একজন অনুচরকে জোগাড় করিবার হুকুম দিল—আর প্রতিবাসীরা আসিয়া এই ব্রাহ্মণের বিপদে দুটা মৌখিক সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার মাতার চিরস্থায়ী স্বর্গ বাসের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বেই দেবদূতের মত রাঘব তাঁহার মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু মৃতদেহের সৎকার করিয়া রাঘব যখন ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এই ব্রাহ্মণকে সংবাদ দিতে আসিল এবং দীননাথ বাবুর চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিল তখন দীননাথ বাবু আনন্দে উৎসাহে, উপকারের ঋণ স্মরণে এই দস্যুকে আলিঙ্গন করিলেন আর সেই মুহূর্ত্তেই রাঘবের ভিতরকার পশু প্রবৃত্তি সহসা দেবত্বে পরিণত হইল। এই ব্রাহ্মণের আলিঙ্গনবদ্ধ বাহুর পবিত্র কেমন স্পর্শ সে সহ্য করিতে পারিল না—সেই মুহূর্ত্তেই তাহার দস্যুপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া দাসত্ব গ্রহণ করিল।

সেই দিন হইতে এই ব্রাহ্মণের গৃহতলে বসিয়া বৈষ্ণবনীতির যে শান্তিময় শিক্ষা সে পাইয়াছিল তাহাই এই ত্রিশবৎসর ব্যাপী সাধনার সমুদ্রগর্ভে প্রবাল-দ্বীপের মত তাহার ভিতর এক শান্তিপ্রিয় মানুষের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে মানুষ বাহিরে অনক্ষর হইলেও অন্তরে এতই মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল যে সে দিন বোধ হয় আর গুরুশিষ্যে কোন প্রভেদই ছিল না।

এই রাঘব যেদিন হইতে দীননাথ বাবুর গৃহে চাকুরী লইল সেই দিন হইতেই সদ্য প্রসূত খোকা বাবুর পালনের ভার তাহার উপর পড়িয়াছিল। সে তাহার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া রঘুনাথকে মানুষ করিয়াছিল। তাই তাহাকে বিদেশে পাঠাইবার সময় রাঘবের আপত্তির অন্ত ছিল না। সে কতবার কর্ত্তাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিয়াছিল "কর্ত্তা, অমন কাজটি কর্ব্বেন না এই ছেলেকে এখন ছেড়ে দিলে তা'কে ফিরিয়ে পাওয়া শক্ত হবে।" কিন্তু কর্ত্তা তখন সে কথা কিছুতেই শোনেন নাই এখন তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইতেছিলেন বটে কিন্তু পিতার দেহ ও মন লইয়া তিনি পুত্রের উন্নতির পথে কি করিয়া বাধা দিতে পারিতেন তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

অথচ এই ত্রিশবৎসর কাল সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা প্রভু-ভৃত্যে জীবনের যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাকে সন্ধ্যার প্রাক্কাল বলিলেও হয় কি নিশি প্রভাতের পূর্ব্বসূচনা বলিলেও হয়। তাই তাঁহাদের পরস্পরের দুঃখে সমবেদনা যতখানিই থাক্ দুঃখ দূর করিবার শক্তি কুলাইয়া

উঠিতেছিল না—অথচ সঙ্গিহীনতার দৌর্ব্বল্য প্রতি মুহূর্ত্তেই যে বেদনার স্মৃতি অন্তরে জাগাইয়া দিতেছিল—তাহাও আর ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছিল না।

কিন্তু ঠিক এই ভাবে বৃথা কালক্ষেপ করিলে যে চলিবে না এমন কি খোকা বাবুকে আর ফিরাইয়া পাওয়াও শক্ত হইবে, তাহা বুঝিয়াই রাঘব এক দিন প্রস্তাব করিয়া বসিল যে, সে খোকা বাবুর সন্ধানে যাইবে এবং তাহাকে না ফিরাইয়া আর গৃহ প্রবেশ করিবে না, কর্ত্তা ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিন। কিন্তু কর্ত্তা কিছুতেই এই প্রভুভক্ত ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না—কারণ সে মূর্খ মানুষ কোথায় গিয়া হয়ত' এমন বিপদে পড়িবে যে তাহাকে উদ্ধার করিতেই আবার তাঁহার নিজেরই প্রাণান্ত হইবে। এই রাঘব যদি ত্রিশবৎসর আগেকার রাঘব হইত তাহা হইলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে তাহাকে অসঙ্কোচে পাঠানো যাইতে পারিত কিন্তু ত্রিশবৎসর কাল ধরিয়া তিনি এই রাঘবকে যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন—আর ত্রিশবৎসর কাল তাহাকে এতই সহিষ্ণু শক্তিহীন করিয়া দিয়াছে যে, এখন তাহাকে কোন সাহসের কাজ করিতে বলা হিমাচলকে সমভূমি হইতে বলার মতই বাতুলতা।

কিন্তু এই সময়েই রঘুনাথ অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল, আর রাঘব কাহারও কোন আপত্তি কর্ণে না তুলিয়াই লাঠী ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল—খোকা বাবুকে ফিরাইয়া আনিতে। যাইবার সময় সে খোকা বাবুর প্রার্থিত অর্থও লইতে ভুলিল না।

কিন্তু সে যখন খোকাবাবুর বাংলোর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। সুদূরপ্রসারী অনুচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের বক্ষে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চায়ের বাগান তাহাদের ঘন বিন্যস্ত ঘনশ্যাম বর্ণে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মাঝে মাঝে শুভ্র সরুপথ সেদিনকার মেঘান্তরিত রৌদ্রে সুন্দরীর কবরী ঘেরিয়া পুষ্পমালিকার মতই শোভাসম্পন্ন বোধ হইতেছিল; পাহাড়-পাহাড়-যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু পর্ব্বতের শ্রেণী বৃহৎ শৃঙ্গ অভ্রভেদী শির তুলিয়া যেন আকাশকেই ভয় দেখাতেইছিল কিম্বা মেঘকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত্রীর সঙ্গে উচ্চাকাশের নিবিড় সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছিল আর রাঘব সেই বিরাট বিশাল সুগম্ভীর সৌন্দর্য্যের অসামঞ্জে এতই মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, সে খোকাবাবুর বাংলো ছাড়িয়া যে বরাবর চলিয়া যাইতেছিল, তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না। কিন্তু সহসা একটা ইতর শ্রেণীর যুবতী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল—সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে

পাইল যে অসংখ্য কুলী রমণীদের মধ্যে বসিয়া যে লোকটা পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করিতেছে সে আর কেহই নহে তাহারই বহুযত্নে পালিত খোকাবাবু স্বয়ং।

রাঘবের বিস্ময় বোধ হয় সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়াই চলিয়া গিয়াছিল, সে যে কি বলিবে বা কি করিবে কিছুই ধারণা করিতে পারিল না—শুধু নির্ব্বাক হইয়া এই মদমত্ত নরনারীদের পানে চাহিয়া রহিল। সে তখন বোধ হয় ভাবিতেছিল যে এই পুত্রের জন্যই তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা তাঁহাদের মুখের অন্ন তৃপ্তি করিয়া খাইতে পারেন না, এই স্বামীর জন্যই তাহার ধর্ম্মপত্নী রাত্রে নিদ্রা যায় না আর এই নরপশুর জন্যই সে তাহার দেশভুঁই ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়াছে তাহার কল্পিত রোগশয্যায় শুশ্রূষা করিতে।

কিন্তু তাহার এই বিস্ময়স্তব্ধ ভাব দেখিয়াই বোধ হয় মাতালের দল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল আর তাহাদের সেই পৈশাচিক হাসির শব্দ পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেই রাঘবের আচ্ছন্ন বিবেক সহসা আত্মস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও সেই কুলীরমণীটা তাহার হাত ধরিয়া আছে দেখিয়া ক্রোধে সে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার ভিতরে আবার সেই ত্রিশবৎসর আগেকার দস্যুর প্রাণ জাগিয়া উঠিল। সে একটা ঝাপটা দিয়া সেই মেয়েটাকে ফেলিয়া দিয়া একেবারে রঘুনাথের সম্মুখে আসিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিল "রঘুনাথ"!

সে স্বর শুনিয়া শুধু রঘুনাথই নয় তাহার পার্শ্বস্থ অনেক রঘুনাথেরই লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল আর রঘুনাথ স্বয়ং এত অসম্ভাবিতরূপে রাঘবকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ও তাহার কণ্ঠের এই বজ্রস্বর শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া গেল। কিন্তু এই সমস্ত রমণীগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার পিতার ভৃত্য যে তাহাকে শাসন করিবে ইহা তাহার মোটেই সহ্য হইল না। সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত রুক্ষস্বরে বলিল "রাঘব, তুমি আমার চাকর সে কথাটা মনে রেখ'। দেশ থেকে এসেছ বাড়ী যাও" বলিয়া বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। আর রাঘব—তাহার সমস্ত স্পর্দ্ধা, ক্রোধ, রক্তবর্ণ আঁখি এক মুহূর্ত্তে মাথা নত করিল। হায়রে রাঘব আজ চাকর—চাকর মাত্র, যে চাকর প্রভুর সমস্ত অত্যাচার অবিচার নীরবে সহিয়া যাইবে, প্রভুর কোন আচরণেই দ্বিরুক্তি করিবে না, প্রভুর কার্য্যের সমালোচনা করিবে না কারণ একেবারে সে চাকর। ইহা যে সত্য তাহাতে আর সংশয় ছিল না কিন্তু হায়রে এযে অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য-রাঘব ইচ্ছা করিয়াই তাহার স্বাধীন জীবন বিসর্জ্জন করিয়া এই সত্যকেই আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছে—আজ তাহাতে আর বিরোধ চলে না। সে যে

ত্রিশবৎসর ধরিয়া এই দাসত্বকেই আলিঙ্গন করিয়া আছে। এই ত্রিশবৎসরের মধ্যে একদিনও বুঝিতে পারে নাই যে এসংসারের সে চাকর মাত্র। এসংসারে সে স্নেহের, ভক্তির, শ্রদ্ধার, সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল আর তাহার সেই স্নেহ প্রভুকে কোনদিন প্রভুত্ব করিতে দেয় নাই। নিজেকে কোনদিন ভৃত্যের হীনতা অনুভব করিতে দেয় নাই। এসংসারকে সে আত্মীয়জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিল আর এ সংসারও তাহাকে তাহার প্রতিদান দিয়াছিল। এমন কি যৌবনেই যখন তাহার স্ত্রী মারা যায় তখন দীননাথ বাবু তাহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু রাঘব এই খোকাবাবুকেই দেখিয়া বলিয়াছিল "আবার আমার বিয়ে কি কর্ত্তা, এই যে আমার সোণার সংসার এখানে রয়েছে, খোকাবাবুর বিয়ে দিন না—দিনকতক ছেলে বউ কাঁধে করে নেচে বেড়াই।" আর এতদিন পরে খোকাবাবুর মুখ হইতে যে কথাটা বাহির হইল তাহা শুধু তাহার স্বপ্নের অগোচরই ছিলনা সে কথাটা সেই একটী মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত চিত্তকে ছিঁড়িয়া দলিয়া পিশিয়া দিয়া গেল। দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া খোকাবাবুর অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট পাথে চলিয়া গেল।

রাঘবের মর্ম্মে আঘাতটা কিছু বেশী লাগিয়াছিল, সে দীননাথ বাবুর দেওয়া প্রত্যেক পয়সাটা পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া রঘুনাথের হাতে দিয়া দিল আর নিজে নিতান্ত ভৃত্যের মতঃ প্রভুপুত্রের আদেশ পালন করিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রভুপুত্রের আশের পাশের অনুচরেরা যে তাহার মতপরিবর্ত্তন দেখিয়া আড়ালে হাসিতে লাগিল তাহাও সে বুঝিতে পারিল, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিলনা। নিজের দুঃখে বেদনায় ঔদাসীন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল। কিন্তু দীননাথ বাবুকে সে অনেক ভরসা দিয়া অসিয়াছিল তাই খোকা বাবুর হালচাল একবার না দেখিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিল না।

রাঘবের আসিবার পর সপ্তাহমাত্র অতিক্রম করিয়াছে এমনই সময়ে একদিন অপরাহ্নে আকাশে অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টির লক্ষণ দেখা গেল। শরীরও মন অত্যন্ত অবসন্ন ছিল বলিয়া রাঘব সেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়াও বাড়ী ছাড়িয়া একটু দূরে একটা ঝোপের কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। খোকাবাবুর আচরণ তাহার মর্ম্মকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছিল বলিয়াই হউক কি তাহার অতীত জীবনের অবাধ স্বাধীনতা কিরূপ হীনদাস্যে পরিণত হইয়াছে তাহারই একটা সমালোচনা করিবার জন্যই হউক সে যখন সে স্থানটায় আসিয়া বসিল তখন সন্ধ্যা সবেমাত্র ধরণীতে প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। উপরে আকাশ

ভ্রুকুটী করিতেছিল, নিম্নে বায়ু প্রবল প্রবাহে তাহার অঙ্গে মুখে আসিয়া প্রহত হইতেছিল। কিন্তু সেদিকে তাহার দৃকপাত ছিল না, সে শুধু নিজের জীবনটাকে লইয়া তোলপাড় করিতেছিল। এমনই সময়ে সহসা সেই নিবিড় বনান্তরাল হইতে এক উত্তেজিত নারীকণ্ঠ কর্ণে প্রবেশ করিল ও সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষেরও পরুষকণ্ঠ তাহার উত্তর দিল বলিয়া মনে হইল। বায়ু মাতালের মত ছুটিয়া ছুটিয়া বৃক্ষপত্রে শাখার চূড়ায় প্রতিহত হইতেছিল—শব্দ শুনিলেও রাঘব তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না অথচ প্রকৃতির এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ কালে নিবিড় গহনে নরনারী পরস্পর যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—তাহাও জানিবার আগ্রহ তাহার কম হইতেছিল না। শব্দ অনুসরণ করিয়া রাঘব প্রকাণ্ড এক শালবৃক্ষের পশ্চাতে দাঁড়াইতেই সে বিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে এক আসামী যুবতীর সহিত অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে যিনি কথা কহিতেছেন তিনি আর কেহই নহেন তাহারই প্রভুপুত্র রঘুনাথবাবু।

রাঘবের বিস্ময় যতটাই হইয়া থাক্ এই নিবিড় গহনে মেঘও সন্ধ্যার সম্মিলিত অন্ধকারে রঘুনাথ এই যুবতীর সহিত কি কথা কহিতেছে আর তাহাতে এত উত্তেজনাই বা কেন তাহা জানিতে তাহার আগ্রহের অন্ত রহিল না। কিন্তু সে ইচ্ছা তাহার পূর্ণ হইবার আগেই রঘুনাথ অত্যন্ত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল "আমার কাছে এখন টাকা নাই রুমেলা বিবি, আমি তোমায় কিছুই দিতে পার্ব্বনা, তুমি যা ইচ্ছা করগে।" বলিয়াই চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু ঠিক এই সময়ে রুমেলা তাহার বক্ষোবাস হইতে এক প্রকাণ্ড ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল আর খোকা বাবু 'মার্লেরে' বলিতেই রাঘব তীর বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যস্থলে পড়িল—কিন্তু সে রুমেলার হাত ধরিবার আগেই সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা আসিয়া রাঘবের স্কন্ধে পড়িল আর রঘুনাথ রুমেলা বা রাঘব কাহাকেও ধরিবার আগেই রাঘব চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল—রুমেলাও পলাইল।

কিছু দূর তাহার অনুসরণ করিয়া রঘুনাথ যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাঘব তাহার ক্ষতস্থানটা চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু ক্ষতস্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিতপাত হইয়া সমস্ত স্থানটাই রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নিকটে আসিয়া রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল "তাই ত কি করি রাঘব ?" "কি করবে খোকা বাবু? দেশে ফিরে যাও, এ মায়ার দেশ—এখানে আর থেক না তোমাকে যে বাঁচাতে পেরেছি এই যথেষ্ট" বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু

উঠিতে পারিল না—উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল—আর ক্ষতস্থান হইতে শোণিত ধারা প্রবলতর বেগে বহিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়াই সে আবার বলিল "রাঘব তার ডাকাতের প্রাণ নিয়ে ম'র্ব্বে না খোকাবাবু—কিন্তু আজ তোমাকে এই আসামের জঙ্গলে রেখে গিয়ে তোমার বাপকে কি বলতুম বলত ?"

রঘুনাথ বলিল "বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি রাঘব ?"

কষ্টে হাসিয়া রাঘব উত্তর করিল "কষ্ট ? মেয়ে মানুষের ছুরীতে রাঘবের কষ্ট হয় না খোকাবাবু—তবে আজ বড় বুড়ো হ'য়েছি—এত বুড়ো আমি বোধ হয় হ'তাম না খোকা বাবু—শুধু তোমার বাপই আমার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।" বলিয়া সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া বলিল "আমার হাতটা ধরত' খোকা বাবু।"

খোকাবাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিতেই রাঘব খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অবলম্বন না পাইলে চলিতে পারিবে না বুঝিয়া পথপার্শ্ব হইতে একটা দণ্ড কুড়াইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

কিন্তু এই খানেই ইহার পরিসমাপ্তি হইল না। বাড়ী যাইবার পথে রাঘব একটু বৃষ্টিতে ভিজিল, তাহার ক্ষতস্থানে বেশ ঠাণ্ডাও লাগিল। বাড়ী আসিয়া সে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিল—আর রাত্রি শেষে তাহার প্রবল জ্বর হইল এবং সেই সঙ্গে বিকারের লক্ষণ ও দেখা গেল। বিকারের ঘোরে সে প্রলাপ বকিতে লাগিল "আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও খোকাবাবু—ঐ ঐ আবার মার্ত্তে আস্‌ছে—আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও আমি দেশে যাব খোকা বাবু।"

কিন্তু খোকা বাবু তাহাকে দেশে পাঠাইবেন কি ? রাঘবের এই মুমূর্ষু অবস্থায়—তাহাকে দেশে পাঠানো যেমন সম্ভবও ছিল না—নিজের এই হীনতার কথা পিতার কর্ণগোচর করিতে তাহার লজ্জা কুণ্ঠারও তেমনই অবধি ছিল না। এমন কি তাহার ত্রাণকর্ত্তার মৃত্যুর কামনাও যে ভৃত্যবৎসল প্রভুর মনের কোণেও উদয় হয় নাই এ কথাও নিঃসংশয় বলিতে পারা যায় না।

কিন্তু প্রভুর কামনা যাহাই হউক—রাঘবের একমাত্র কামনা ও প্রার্থনা হইল—"দেশে যাব খোকাবাবু—আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও।"

একদিন রঘুনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল "দেশে যাবি—দেশে তোর কি আছে ?"

সেদিন রাঘবের জ্বরটা একটু কম ছিল—সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দেশে

আমার কি নাই কর্ত্তা! দেশে আমার শাগের ক্ষেত র'য়েছে—আমার পুকুর-ঘাট—আমার বড় গাছের তলা র'য়েছে, সেই গাছের তলায় শুয়ে আমি যে কতদিন ঘুমিয়ে পড়ি? আমার কি নাই? আর নাই বা থাকুল—তবু সে যে আমার দেশ—কর্ত্তা—আমার নিজের দেশ—আমার আপনার দেশ" বলিতে বলিতে রাঘবের চক্ষে জল আসিল—সে পুনরায় বলিতে লাগিল "এখানকার এই পাহাড়ে ম'লে আমার যে গতি হবে না ছোট বাবু—আমার দেশে মর্ত্তে পার্লে আমি যে গঙ্গা পাব—স্বর্গ পাব।"

"কিন্তু এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তো, তুমি যে পথেই স্বর্গ পাবে—তা ভেবে দেখেছ কি?"

'পাই পাব, তুমি আমায় নিয়ে চল'ত? তোমার সেখানে কি নাই বলত? তোমার মা, বাপ—পরিবার দেশভূঁই সব র'য়েছে—আর তাদের সব ছেড়ে কি নিয়ে এখানে প'ড়ে আছ বল দিকি?"

কিন্তু রঘুনাথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়াই বাটীর বাহির হইয়া গেল—আর একদিনকার মহাশক্তিশালী দস্যু তাহার আবেদন এমনই ভাবে উপেক্ষিত দেখিয়া অসহায় বালকের মত দুঃখ ভয়ের অভিসংঘাতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অবশেষে রাঘব একদিন রঘুনাথেরই এক বাঙ্গালী বন্ধুর অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া খোকাবাবুর নামে একপত্র লিখিয়া লইল তাহাতে লিখিয়া দিল "কর্ত্তা, আমি আর থাক্‌ব'না, ছোটবাবু ভাল আছেন তিনি আমাকে কিছুতেই দেশে যেতে দেবেনা, আমি দেশে না গেলে কিছুতেই বাঁচবনা' তুমি একবার কৃপা করে চরণ ধুলি দিও।"

কিন্তু কর্ত্তার চরণধুলি দিবার আগেই রাঘবের অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সে রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল - বেচারীর এ যাত্রায় স্বর্গ প্রাপ্তির দীশা একেবারেই অন্তহিত হইল।

কিন্তু সে যেখানে তাহার নিবেদন জানাইয়াছিল—সেখান হইতে তাহার নিরাশা হইবার কোন আশঙ্কাই ছিল না—তাই তাহার পত্র পাইয়াই দীননাথ বাবু বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—আর তিনি যখন আসিয়া রাঘবের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন তখন রাঘব একেবারে আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিল। কিন্তু দীননাথ বাবু যখন তাহার মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হ'য়েছে রাঘব?" তখন সে যেন স্বপ্নোথিতের মত জাগিয়া উঠিল—উঠিয়াই সম্মুখে দীননাথ বাবুকে

দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি দেশে যাব' কর্ত্তা– দেশে যাব।" বলিয়াই আবার অচেতন হইয়া পড়িল।

দেশে আসা হইল বটে, কিন্তু রাঘব বাঁচিল না। পাহাড়ী মেয়ের ছুরিকার আঘাত তাহার স্কন্ধে যতটা ক্ষত করিয়াছিল—বাহিরের ঠাণ্ডা তাহাকে আর ও বিষাক্ত করিয়া তুলিল – জ্বর তাহার ছাড়িল না। দেশে আসিয়া ও সে ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ বকিতে লাগিল—'দেশে যাব' কর্ত্তা, দেশে যাব।'

তার পর একদিন সেই দেশেরই মাটীর উপর শুইয়া রাঘব তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে চলিয়া গেল। আর তাহারই কিছুদিন পরে রুমেলার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া রঘুনাথও দেশে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু সে হতভাগ্যের স্বদেশ প্রত্যাগমনে—তাহার মাতা পিতা এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত সুখী হইতে পারিলেন না। কারণ তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে যে মহৎ প্রাণ বলিদানের প্রয়োজন হইল—তাহার তুলনায় রঘুনাথের প্রত্যাবর্ত্তন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। সেই দিন হইতে দীননাথ বাবু পুত্রের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেই পারিতেন না—সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কর্ণে রাঘবের সেই করুণ আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইত "আমি দেশে যাব কর্ত্তা—দেশে যাব।"

বিবর্ত্তন ও আবর্ত্তন।

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

অভাব ও আকাংক্ষা সকল দেশের মানুষেরই আছে। এদের পূরণের চেষ্টার নামই জীবন-যাত্রা। এই যাত্রায় অযোগ্য পিছিয়ে পড়ে ও বিনষ্ট হয়, যোগ্যতম অগ্রসর হয় ও উদ্বৃত্ত হয়। প্রকৃতি সেই জন্য সকলকে যোগ্যতম হবার প্রেরণা দেয়। এই প্রেরণা দ্বারা উদ্বর্ত্তনের পথে গিয়ে মানুষ আপনার অভাব অনুভব করে এবং সেই অভাবই তার হৃদয়ে অধিকতর নূতন শক্তি সঞ্চয়ের আকাংক্ষা জাগিয়ে দেয়। সেই জন্য অভাব ও আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রকৃতিজ তাদের পূরণের চেষ্টাও তেমনি স্বাভাবিক।

পরাধীন দেশে এই অভাব ও আকাঙ্ক্ষাকে শাসন-কর্ত্তারা দু ভাবে বিভক্ত করেন—প্রথম, বৈধ বা legitimate, দ্বিতীয়, তার বিপরীত অর্থাৎ অবৈধ বা illegitimate; এই বিভাগ অবশ্য বিভাগকর্ত্তার স্বেচ্ছাকৃত, কোন সর্ব্ববাদি

সম্মত নিয়মের অনুবর্ত্তী নয়। বৈধ বা legitimateএর মূলে আছে বিধি বা lex। সেটা প্রাকৃতিক বিধি, lex, নয়, মানুষের কল্পিত। কিন্তু অভাব ও আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক। সেই জন্য প্রাকৃতিক গুণের মানুষ কল্পিত শ্রেণীবিভাগে যে মত-ভেদ থাকা সম্ভব তা এতেও আছে। শাসক যাকে দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত করেন, শাসিত তাকে প্রথম তালিকায় স্থান দিতে চান। এই নিয়ে যে বাদানুবাদ হয়, তা যতক্ষণ তর্ক সভার বাদানুবাদের মত কথার গণ্ডীর মধ্যে থাকে তত-ক্ষণ শাসকবর্গ তাতে বড় কর্ণপাত করেন না, কিন্তু কথার গণ্ডী ছাড়িয়ে যখন তা কাযের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে তখনই শাসকবর্গ তার মধ্যে ভয়ের কারণ দেখেন।

অভাব ও আকাংক্ষার এই শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আর একটা বিবাদহেতু আছে। সেটা হচ্ছে সময়। আমাদের যে আকাংক্ষাগুলি বৈধ বলে শাসন কর্ত্তারা স্বীকার করেন, তারও পরিপূরণ হয় না, শাসন কর্ত্তাদের মতে, সময় হয়নি বলে। আমরা বলি সময় হয়েছে। এখানেও সেই মতভেদ ও মতভেদজনিত বাদানুবাদ। এই বাদানুবাদ এখন কথার তারল্য ত্যাগ করে কাযের কাঠিন্যে পরিণত হবার উপক্রম হচ্ছে। এতে লোকের মন অশান্ত হয়েছে। তাই শাসকবর্গের শীর্ষস্থানীয়েরা ব্যবস্থাপক সভা, ভোজসভা প্রভৃতি সকল স্থান থেকেই বলছেন, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। তোমরা সহিষ্ণু হয়ে থাক। শান্তিময় বিবর্ত্তনই (peaceful evolution) তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়। বিপজ্জনক আবর্ত্তন (dangerous revolution) তোমাদের আকাংক্ষা পূর্ণ করতে পারবে না।

এই উপদেশের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কেই এখন বিবর্ত্তনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে। বিবর্ত্তন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, এর একটা পদ্ধতি আছে, নিয়ম আছে। সেই নিয়ম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চক্ষুর অগোচর পরমাণু থেকে বিশাল বিশ্ব ও বিশ্বমধ্যস্থ প্রাণিজগতের উন্নতি অবনতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই নিয়মেরই অন্তর্গত। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অর্থ কতক গুলির নির্ব্বাচন আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলির বিবর্জ্জন। বিবর্জ্জন না থাকলে নির্ব্বাচন নিরর্থক। আর নির্ব্বাচন ও বিবর্জ্জন একত্র থাকলেই বুঝতে হবে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সংঘর্ষ আছে সংগ্রাম আছে—এই নির্ব্বাচন—অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষের মধ্যে ও চলেছে। যে যোগ্যতম সেই উদ্বৃত্ত হয়। অযোগ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শারীরিক বা মানসিক বা উভয়বিধ সর্ব্বাঙ্গীন

শ্রেষ্ঠতা থাকলেই যে যোগ্যতম হয় তা নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিশেষে প্রতিকূল কারণগুলিকে অতিক্রম করতে যে সমর্থ, তাকেই সেই অবস্থার যোগ্যতম বলা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উত্তেজনাকে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে শক্তিসঞ্চয় হয়। একই প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বহুকাল থাকলেই মানুষ সেই অবস্থার উপযোগী হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন আর তাকে উত্তেজনা দিতে পারে না। উত্তেজনার অভাবে আর তার নূতন শক্তির সঞ্চার হয় না। শক্তির অভাবে উৎকর্ষ হয় না, বরং অপকর্ষ হয়। এই অবস্থায় অন্য কোন অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বা জাতি সেখানে ক্রমে সংঘর্ষ উপস্থিত করলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এবং জাতির ক্রমশঃ ক্ষয় এবং শেষে বিনাশ ধ্রুব। ভূতত্ত্ববিদ্‌ পৃথিবীর নিম্নস্তর থেকে এর অনেক উৎকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। প্রত্নতত্ত্বও এর অনেক অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করেছে। এই সকল প্রমাণ থেকে, প্রতিবাদের আশঙ্কা না করে বলা যেতে পারে যে বিবর্ত্তন মানে অনবচ্ছেদ উন্নতি নয়। এতে সমান অবস্থায় অবস্থিতি, ক্রমে ক্রমে অবনতি ও ধ্বংসও ঘটে। Joseph Mc Cabe বলেন "there has been a good deal of evolution in nature from what we call higher to lower levels" (১)। তিনি উদাহরণ স্বরূপ কোন কোন প্রাণীর উন্নতির পর অবনতি ও বিনাশের উল্লেখ করে বলেন "During millions of years they advance in organization, then the advance seems to be arrested or disturbed and finally they are annihilated. The popular idea of 'race decay' and 'dying convulsions' is not in accordance with the facts. They are killed by changes in the environments or the rise of better-adapted opponents, as were the giant reptiles and so many inferior races of men and families of animals being annihilated to-day. Their disappearances are in the complete accord with the theory of evolution, and indeed strongly confirm it." (২) মানব-সভ্যতার ইতিহাসও এই কথাই সপ্রমাণ করে। Joseph Mc Cabe বলেন –

---

(১) Principles of Evolution, page 54

(২) Do Do page 56

"The history of civilization has proceeded in entire accordance with the principles of biological evolution. A Species fitted to its environments has remained unchanged, a Species altering its environment, or experiencing a change in its environments, has tended to change or die out (১)

বিবর্ত্তনের নিয়ম এইরূপ। এ প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ কৃত নিয়মের মত বিধি নিষেধ নাই। "কুর্য্যাৎ," "ন কুর্য্যাৎ" নাই। আছে ঘটনার ও অবস্থার বিকৃতি। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায়, নির্দ্দিষ্ট ঘটনায় অবস্থিত হলে মানুষ (ব্যষ্টি ও সমষ্টি) একটা নির্দ্দিষ্ট রূপে কায করে এবং তার একটা নির্দ্দিষ্ট ফল হয়। আমরা তাকে ভাল বা মন্দ বলি, কিন্তু প্রকৃতির কাছে তা ভাল ও নয়, মন্দও নয়। এ নিয়মের অর্থ এও না যে এদ্বারা মানুষ নিশ্চয়ই উচ্চ স্তরে উঠবে। একই অবস্থায় সমভাবে বহুযুগ থাকতে পারে এবং থাকে—সেও এই নিয়মের অনুবর্ত্তিতা, ব্যতিক্রম নয়। সিংহলের বন্য বেদ্দা, তাসমানিয়ান, বুষমান, ফিউজিয়ান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আয়েতা প্রভৃতি জাতিরা বহুযুগ ধরে স্বতন্ত্রভাবে এক অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে আবার চীন দেশের লোক, প্রাচীন পারসিক এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করে। মিশর, মেসোপোটেমিয়া, বাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি প্রাচীন দেশেও সভ্যতার আরম্ভ এই রূপ হয়। এই সকল দেশ থেকে ক্রমে পশ্চিমগামী হয়ে সভ্যতা সিরিয়া, এসিয়া মাইনর, গ্রীক-দ্বীপপুঞ্জ, গ্রীক এবং রোমে প্রবেশ করে। প্রতিবেশী অসভ্য জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই এরা জীবন সংগ্রামে যোগ্যতা লাভ করেছিল এবং দেশ দেশান্তরে বহুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন-করতে অসমর্থ হয়েছিল। এই সাম্রাজ্য সংস্থাপন প্রচেষ্টার মধ্যেও দেখা যায় সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। যুদ্ধ বিগ্রহেই রোম-সাম্রাজ্যের ভিত্তি, যুদ্ধ বিগ্রহেই এর পুষ্টি ও সমৃদ্ধি। রোম-নাগরিকের উচ্চতম আকাংক্ষা যোদ্ধারূপে সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করা। রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালীও সেই ব্যবস্থা করত যাতে নাগরিকের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তার পর যখন প্রত্যন্ত দেশের অধিবাসীরা প্রবল হয়ে উঠল তখন সাম্রাজ্য বৃদ্ধি আর তত সহজ থাকল না, জীবন সংগ্রাম কঠিন হল। যে প্রকৃতি

(১) Principles of Evolution. page 201

এত দিন রোমানদেকে শ্রেষ্ঠত্বে নির্ব্বাচন করে আসছিলেন তিনি এখন সেই প্রত্যন্তবাসী অসভ্যদেকে নির্ব্বাচন করে রোমানদেকে বিবর্জ্জন করতে লাগলেন। রোমানরা বহুকাল বিজেতার সুখ ও বিলাস ভোগ করে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। এখন অসভ্য জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় তারা বিজিত হল, ক্রমে বিনষ্ট হল। এও সেই বিবর্ত্তনের অ বর্ত্তিতা। আর সেই বিবর্ত্তনের অনুবর্ত্তী হয়েই বিজেতা অসভ্য জাতি রোমের ধ্বংসের উপর নূতন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করলে। আংগ্লো স্যাকসন (Anglo Saxon) জাতীয়েরা তাদের স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশ যাত্রা আরম্ভ করলে। ক্রমে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া নিউ জীলাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি নূতন নূতন দেশে স্বজাতির প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। অসভ্য দেশে সভ্য জাতির প্রতিষ্ঠার অর্থ অসভ্য দেশবাসীর বিনাশ। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জীলাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা তখন অসভ্য। কাযেই এই সকল দেশের অধিবাসীরা সভ্যতর আংগ্লো স্যাকসন জাতির সংঘর্ষে ক্রমে ক্রমে জাতীয় অস্তিত্বই বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হল। অষ্ট্রেলিয়াতে নবাগত সভ্যেরা অসভ্য আদিম অধিবাসীদেকে বনবাসী করে তাদের দেশ অধিকৃত করে নিয়ে পশুপালনক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করলেন। নিউ জীলাণ্ড দেশের আদিম অধিবাসীরা সংখ্যায় ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে—১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাদের সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০ এক লক্ষ, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হয় ৮০,০০০ আশী হাজার, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে হয় ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার (১)। যুদ্ধ বিগ্রহ করে যে এদেকে নিহত করে নির্বংশ করা হচ্ছে, তা নয়। Mr. F. W. Pennefather, Jouprinal of the Anthropological Institute—পত্রে বলেন যে এই লোকসংখ্যাহ্রাসের কারণ পানদোষ ব্যাধি, ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, শান্তি ও ধন-সম্পত্তি (drink disease, European clothing, peace and wealth). ঐ পত্রেই J. Bonwick অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদের সম্বন্ধে বলেন "Only a few remnants of the powerful tribes linger on * * * All the Tasmanians are gone, and the Maoris will soon be following. The Pacific Islanders are departing childless. The Australian natives as surely are descending to the grave, Old races everywhere give place to the new", অর্থাৎ আদিম নিবাসীদের শক্তিশালী জাতির মধ্যে অতি অল্পই আর অবশিষ্ট আছে। তাসমানিয়ানরা

গিয়েছে, মেওরিরাও তাদের অনুগামী হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ নিবাসীরাও নির্বংশ হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ার দেশীয় লোকেরা কবরস্থানে চলেছে। সর্ব্বত্র পুরাতন জাতি নূতনকে স্থান দিয়ে অপসৃত হচ্ছে। F. Galton বলেন এখন পৃথিবীতে অতি অল্প স্থান আছে যা সম্পূর্ণ বিদেশী বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত নয়।

উত্তর আমেরিকাতেও এই ব্যাপার। দু শ-বৎসরব্যাপী সংঘর্ষের ফলে সেখানকার আদিম নিবাসী সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে পরাভূত হয়ে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ পরাভব যুদ্ধে নয়, অস্ত্র শস্ত্রে নিহত হওয়া নয়। এতে সভ্যতার নিরস্ত্র প্রভাব তার পক্ষে যুদ্ধের সশস্ত্র প্রভাবের সঙ্গে সমান ফলদায়ক হয়েছে। এইরূপে দেশ লোকশূন্য হওয়াতে ইউরোপীয়দের কৃষিবাণিজ্যের জন্য আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ধরে এনে পশুর মত ব্যবহার করা হল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন এই নিগ্রো দাসত্বমুক্ত হল তখন প্রবলের সঙ্গে দুর্ব্বলের—যোগ্যতরের সঙ্গে অযোগ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর এক নূতন ভাবে দেখা গেল। দাসত্বমুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো আইনের চক্ষে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়ের সঙ্গে সমান হল, রাষ্ট্রীয় কার্য্যে সমান অধিকার পেল। এর পরে নিগ্রো শিক্ষিত হয়েছে, ধনীও হয়েছে কিন্তু শ্বেতাঙ্গের কাছে এখনও সে সকল বিষয়ে হীন হয়ে আছে। M. Laird Clowes বলেন দাসত্বের দিনে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের উপর যেমন প্রভুত্ব করত, এখনও তেমনি প্রভুত্ব করছে। রাষ্ট্রীয় বিধি তাকে যে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়েছে শ্বেতাঙ্গ তাও তাকে পরিচালন করতে দেয় না। কোন রাষ্ট্রীয় বিষয় আলোচনার জন্য উপস্থিত হলে শ্বেতাঙ্গ তাকে কোন কথাই বলতে দেয় না। যে সকল ষ্টেটে কৃষ্ণাঙ্গই সংখ্যায় অধিক সেখানকারও এই অবস্থা। কৃষ্ণাঙ্গকে এক পাশে সরিয়ে রেখে দেওয়া হয়, বলা হয় এসকল বিষয় শ্বেতাঙ্গসম্বন্ধীয় কৃষ্ণাঙ্গের এতে বলবার কিছু নাই। ফলে কৃষ্ণাঙ্গ ভয়ে মরে যায়। (১) যে দেশের শাসন-প্রণালী প্রজাতান্ত্রিক, যে দেশে সভ্যতা ও স্বাধীনতা পূর্ণ লাভ করেছে বলে

(১) He (any impartial observer) finds, on the contrary, that the white man rules as supremely as he did in the days of slavery. The black man is permitted to have little or nothing to say upon the point, he is simply thrust on one side. At every political crisis the cry of the minority is "this is a white man's question", and the cry is generally uttered in such a tone as to effectually warn off the black man from medling with the matter—Black America by Laird Clowes, page 8

দেশবাসীরা গর্ব্ব করে, সেইদেশে শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে এখনও এই বিরোধ! কৃষ্ণাঙ্গ বলতে যে প্রকৃতই তাকে কৃষ্ণবর্ণ হতে হবে তার কোন অর্থ নাই। শরীরে রক্তে চার আনা, দু আনা কি এক আনাও যদি নিগ্রো-রক্ত থাকে, তা হলেই শ্বেতাঙ্গ সমাজে তার আর স্থান নাই। এই এক রক্ত-দোষেই শ্বেতাঙ্গ সমাজ তার উপর খড়্গহস্ত। শ্বেতাঙ্গ মূর্খ, পাপাত্মা, দরিদ্র হলেও সমাজে তার প্রবেশাধিকার অবারিত, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হলেও তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই দুই সমাজের মধ্যে একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে সেই সীমা অতিক্রম করবে, সেই দণ্ডনীয়, নিগ্রো এ অপরাধ করলে তার দণ্ড নানাপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার যার শেষ প্রাণবধ পর্য্যন্ত হতে পারে। শ্বেতাঙ্গ এ অপরাধ করলে সমাজচ্যুতিই তার প্রধান দণ্ড (১)।

শতকরা ৯৯ জন শ্বেতাঙ্গের রাজনীতিক ধর্ম্ম এই যে যা হয় হক যা ঘটে ঘটুক শ্বেতাঙ্গ অবশ্যই কর্ত্তৃত্ব করবে। শ্বেতাঙ্গের কর্ত্তৃত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুল্ক, স্বদেশী শিল্পের রক্ষা, অবাধ বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তই শাসিত হয়।

---

(১) To incur this condemnation, he (the black man) need not be by any means black. A quarter, an eith, nay, a sixteenth of African blood is sufficient to deprive him of all chances of Social equality with the white man. For the being with the hated taint there is positively no social mercy. A white man may be ignorant, vicious and poor. For him, inspite of all the door is even kept open. But the black or colored man, no matter what his personal merits may be, is ruthlessly shut out. The white absolutely declines to associate with him on equal terms. A line has been drawn, and he who from either side dares to cross, cruelty and violence chase him back again or kill him for his temerity. If he be the white, ostracism is the recognised penalty—Back America by Laird Clowes. page 87.

---

(১) Report of the Registrar General of New Zealand on the condition of the country in 1889 Quoted in Nature 24 October 1889.

যে শ্বেতাঙ্গ এই নীতিতে শ্রদ্ধাবান্ নন তিনি বিশ্বাসঘাতক, স্বজাতিবহির্ভূত। যিনি এতে শ্রদ্ধাবান্ তিনি আদরণীয়, যিনি অশ্রদ্ধাবান্—তিনি হেয়, অস্পৃশ্য উন্মাদগ্রস্ত (১)

Benjamin Kidd তাঁর Social Evolution গ্রন্থে বলেন এই যে জাতিবিরোধ, দুর্ব্বলের পরাভব, হীনতরের পরাধীনতা ও ধ্বংস, এ কেবল যে প্রাচীন ইতিহাসের বৃত্তান্ত, তা নয় এ আজও আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘটছে—বিশেষতঃ আংগ্লো-স্যাক্সন সভ্যতার সীমার মধ্যে যে সভ্যতার আদর্শ স্বাধীনতা, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালী নিয়ে সেই সভ্য জাতিরা এত গর্ব্ব করেন (১)।

দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকার এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। যে সকল ভারতবাসী ও অন্ত অন্ত জাতি সেখানকার কৃষিক্ষেত্রে ও খনিতে পরিশ্রম করে সে দেশের সমৃদ্ধি সম্পাদন করেছে, তারা এখন দেশে স্থান পাবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ সেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে কর্ত্তৃত্ব

---

(১) The cardinal principle of the political creed of 99 percent of the Southern whites is that the white man must rule at all costs and at all hazards. In comparison with the principle every other article of political faith dwindles into ridiculous insignificance. White domination dwarfs tariff reforms, protection, free trade and the very pales of party. The white, who does not believe in it above all else, is regarded as a traitor and an out-caste. The race-question is, in the south, the sole question of burning interest. If you are sound on that question you are one of the elect, if you are unsound, you take your rank as a pariah or as a lunatic.—Black America. p. 15.

(১) All this, the conflct of races before referred to, the worsting of the weaker, nontheless effective ever when it is silent and painless, the subordination or else the slow extinction of the inferior, is not a page from the past or the distant, it is taking place today beneath our eyes in different parts of the world, and more particularly and characteristically within the pale of that vigorous Anglo-Saxon civilization of which we are so proud, and which to many of us is associated with all the most worthy ideals of liberty, religion and government that the race has evolved.—Social Evolution, page 52.

করবেন, অন্য কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিধিব্যবস্থা করেছেন যে কৃষ্ণাঙ্গ সেখানে নাগরিকের অধিকার (right of citizenship) পাবে না। আইনের চক্ষে কৃষ্ণাঙ্গ সেখানে অনধিকার-প্রবেশী। একই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী হয়ে ভারতবর্ষবাসী সেখানে স্থান পাচ্ছে না। অথচ সাম্রাজ্যের অন্য সকল দেশের লোক অবাধে ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের ধন আহরণ করে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, আছে কেবল যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন।

এই ত গেল অন্য দেশের বিবর্ত্তনের ইতিহাস। ভারতবর্ষেও এর অন্যথা হয়নি। আর্য্যবিজয়ের ইতিহাসও এইরূপ। আর্য্যেরা শ্বেতাঙ্গ, কোন সুদূর উত্তর পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষে আসেন এবং সুজলা নদীসেবিত উর্ব্বর ভূমিতে বাস করেন। এ দেশের যারা আদিম নিবাসী তাঁদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। তাঁদেকে আর্য্যেরা বললেন দস্যু এবং ক্রমে ক্রমে তাঁদেকে যুদ্ধে পরাজিত করে, বশীভূত করে কতকগুলিকে করলেন দাস আর কতকগুলি দেশ ত্যাগ করে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। সমস্ত দেশ আর্য্যদের অধিকারে এল। তার পর আর্য্যেরা "বর্ণ"ভেদ করলেন, আদিমনিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ হলেন শূদ্র। দেশশাসনের জন্য যথারীতি বিধি ব্যবস্থা হল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন যাজন, প্রজারক্ষণ, যজ্ঞ, পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ভাল কাযগুলি থাকল শ্বেতাঙ্গ দ্বিজাতীয়ের জন্য আর কৃষ্ণাঙ্গ শূদ্রের জন্য ব্যবস্থা হল—

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া।

(মনু ১।১১)

অর্থাৎ রাগদ্বেষ না করে উচ্চ বর্ণের সেবা করা। বাসস্থান সম্বন্ধেও বিচারটা এইরূপই হয়েছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি দেশ, মধ্যদেশ ও আর্য্যাবর্ত্ত—এই সকল দেশে দ্বিজাতীয়েরা প্রযত্ন করে সংশ্রয় করবেন, অর্থাৎ দেশবাসীদেকে উচ্ছেদ করে আধিপত্য করবেন। আর

শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্ বৃত্তিকর্ষিতঃ।

শূদ্র যেখানে সেখানে বৃত্তিকর্ষিত হয়ে অর্থাৎ দাসত্ব করতে গিয়ে বাস করবে। দাসত্বের জন্যই যে তার সৃষ্টি সে কথাও স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—

শূদ্রস্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥

(মনু ৮।৪১৩)

শূদ্র ক্রীত হ'ক আর অক্রীত হ'ক তাদ্বারা দাস্য করিয়ে নেবে, কারণ দাস্যের জন্যই ব্রহ্মা তাকে সৃষ্টি করেছেন। প্রভু যদি তাকে ত্যাগ করেন তথাপি তার মুক্তি নাই—

> ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্ বিমুচ্যতে।
> নিসর্গজং হি তৎতস্য ক স্তস্মাৎ তদপোহতি॥

মনু ৮।৪১৪

দাসের নিজস্ব কিছু থাকতে পারে না, সুতরাং ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে দাসের ধন আত্মসাৎ করতে পারেন।

> —বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদন মাচরেৎ।
> নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎস্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥

(মনু ৮।৪১৭)

আজকাল দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফরিকায় শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি যে ব্যবহার করছেন, একে তারই বৈদিক অবস্থা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

এইরূপে আর্য্যেরা সকল বিষয়ে সুবিধা করে নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশে আধিপত্য করতে লাগলেন। আর্য্যেরা তখন নানা দলে, অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। এক এক গোষ্ঠী এক এক প্রদেশ অধিকার করে রাজত্ব করতে লাগলেন। গোষ্ঠীপতিরাই রাজা হলেন। আদিম নিবাসীরা সকল প্রদেশেই কতক বিতাড়িত হয়ে বনবাসী হল, কতক বিজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে দাস হল। এই রূপে আদিম নিবাসীদের সঙ্গে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকল না। প্রকৃতি এইরূপে তাঁদেকে নির্ব্বাচিত করে নিয়ে, নিজের ধনসম্পদের অধিকারী করে দিয়ে তাঁদেকে সকল বিষয়ে সমৃদ্ধিশালী করলেন। তাঁরা কৃষি, শিল্পে, বাণিজ্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করলেন। এই অনুকূল অবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের বংশবৃদ্ধিও যথেষ্ট হল। বংশবিস্তার হলেই রাজ্যবিস্তারের আবশ্যক হয়। ক্ষুদ্র রাজ্যের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আর বিস্তারশীল লোকসংখ্যার সমাবেশ হয় না। এইরূপে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয় এবং এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় প্রকৃতি আবার যোগ্যতমকে নির্ব্বাচন করেন। এইরূপে সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রাদুর্ভাব হয়। আর আর্য্যদের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হয়ে যারা বনে পর্ব্বতে প্রস্থান করেছিল তাদের আর বিবর্ত্তন হল না। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হয়ে গেল

তারা কোল, ভিল, সাঁওতাল উরাও রূপে সেই অবস্থায়ই আছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন (peaceful evolution) এদেকে বনবাস ত্যাগ করে, গ্রাম-নগরের জীবন-সংগ্রামে আত্ম-প্রকাশ আরম্ভ করলে। আর্য্যেরা বহুযুগ একই পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে উপস্থিত হ'য়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়-প্রতিযোগিতা-হীন হয়ে পড়লেন। কিন্তু তার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ ও অধিবাসীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিদেশে আপনার খ্যাতি বিস্তার করেছিল। বৈদেশিক বিদ্যার্থী, বৈদেশিক পরিব্রাজক, বৈদেশিক বণিক যেমন ভারতীয় সভ্যতার ফল সংগ্রহ করতে এদেশে এলেন তেমনি বৈদেশিক প্রবল দলপতিরাও সদল-বলে রাজ্য স্থাপন করতে ভারতবর্ষে এলেন। এঁদের মধ্যে মুসলমানেরাই প্রধান।

অতীত কীর্ত্তি জাতীয় চরিত্রের সহায়ক। সেই জন্য বিজেতা জাতি বিজিত দেশে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেই দেশের অতীত কীর্ত্তি লোপ করবার চেষ্টা করে। মুসলমানবিজয়ের পর এদেশে সে চেষ্টার ক্রটি হয় নি। প্রাচীন মন্দিরাদি অনেক নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সে কালের মন্দিরগুলিই পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যের ভাণ্ডার ছিল। সেই জন্য মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বহুমূল্য গ্রন্থাদিও নষ্ট হয়ে গেল। দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের কত গ্রন্থ যে এইরূপে নষ্ট হল তার গণনা নাই। মুসলমান বিজয়ের আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল বিজিত জাতির মধ্যে অতি উৎসাহের সহিত তাঁরা তাঁদের ধর্ম্ম প্রচার করতেন। আবশ্যক হলে তার জন্য বলপ্রয়োগ করতেও তারা কুণ্ঠিত হতেন না। আচারে, বিচারে, প্রজার সহিত ব্যবহারে, বিধি ব্যবস্থার প্রণয়নে সর্ব্বত্রই এই উদ্দেশ্যের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার পক্ষে এর ফল বিষময় হল। মুসমানদের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই আর্য্য-নীতির বিপরীতগামী। কাযেই এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আর্য্য-সভ্যতার বিবর্ত্তনজনিত উন্নতি না হয়ে অবনতি হল। মুসলমানেরা তখন নূতন তেজে তেজস্বী, নূতন বলে বলীয়ান। তারা প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। লোকে বলতে লাগল "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" কিন্তু এই প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও তাঁদের শাসন কার্য্যে আর্য্যদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ দেখতে পাওয়া যায় না। শ্বেতাঙ্গ আর্য্যেরা যেমন কৃষ্ণাঙ্গ আদিম নিবাসীর প্রতি বর্ণ ভেদের জন্য ঘৃণা প্রদর্শন করতেন, মুসলমানেরা তা করতেন না। কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি ঘৃণা শ্বেতাঙ্গেরই স্বভাবজ, মুসলমানেরা শ্বেতাঙ্গ নয় বলেই বোধ হয়

তাঁদের স্বভাবে এটার অভাব ছিল। মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করলেই সকল বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের সমকক্ষ হতেন। মুরশিদ কুলী খাঁ, "কালা পাহাড়" প্রভৃতি হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হয়েছিলেন; হিন্দুদের মধ্যে আবার শূদ্রেরা, বিশেষতঃ "অস্পৃশ্যেরা" অনেকে এই জন্য মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে রাজার জাতির সঙ্গে সমতা লাভ করলে।

তার পর যত সময় যেতে লাগল মুসলমানেরা ক্রমে এদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী হয়ে উঠতে লাগলেন। বাহ্য উত্তেজনার নূতন কারণের অভাবে আভ্যন্তর শক্তিরও হ্রাস হতে লাগল। জীবন সংগ্রামে জয়লাভের জন্য যে সতর্ক কর্ম্মিষ্ঠতার আবশ্যক, ভোগবিলাসপরায়ণতা তাকে তিরোহিত করে দিল। দক্ষিণে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি, উত্তরে শিখশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল। ইউরোপ থেকে ইংরেজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও এই সময়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এদেশে আবির্ভূত হলেন। প্রকৃতি আবার নির্ব্বাচন কার্য্য আরম্ভ করলেন। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হল, অনেক জয় পরাজয় হল। এর মধ্যে যোগ্যতম বলে ইংরেজের উদ্বর্ত্তন হল। ইংরেজ মুসলমানের হাত থেকে রাজ্যভার নিলেন। তাঁরা মুসলমান আচার বিচার ও শাসন-পদ্ধতিই দেখলেন। ভারতবর্ষের আদিম আচার বিচার ও শাসন-পদ্ধতি আর্য্যেরাই বিনষ্ট করেছিলেন, আর্য্যদের আচার ব্যবহার মুসলমান প্রভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল, যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, ইংরেজ শাসন তার মূলে মারাত্মক আঘাত করলে। সকল দেশেই রাজা ও রাজ্য-স্থাপনের আগে সামাজিক আচার বিচার থাকে। সেই আচার বিচারই রাজার অনুমোদন ও সমর্থন পেয়ে বিধিব্যবস্থায় পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ অবস্থা অনুসারে বিবর্ত্তিত হয়। ভারতীয় আর্য্য আচারের মধ্যে প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় যে বিধি ব্যবস্থা সকল রাজকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নয়। রাজার শাসন পরিষৎ ছিল, বিচার সভা ছিল কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ছিল না (১)। ব্যবস্থা

---

(১) শাসন সভা—

অনাহিতাগ্নয়ো যেঽন্যে বেদবেদাঙ্গ- পারগাঃ।
পঞ্চত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ পরাশর ৮।১৯
... ... তেষাঞ্চৈব স্বসম্ভবে।
স্ববৃত্তি পরিতুষ্টা যে পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ পরাশর ৮।২১

বিচার সভা—

যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ ॥ মনু ৮।১১
কর্ষক বণিক্ পশুপাল কুসীদিকারবঃ স্বে স্বে বর্গে।
গৌতমীয় গৃহ্যসূত্রম্ ১১।২১

প্রণীত হত ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা। তার মধ্যে সজাতীয়ের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা যতই থাক, সে ব্যবস্থা রাজা প্রজা উভয়ের প্রতিই সমান প্রযুজ্য। যেখানে রাজা বা রাজনিযুক্ত ব্যবস্থাপক ব্যবস্থার প্রণেতা সেখানে রাজার বা রাজনিযুক্ত ব্যবস্থাপকের আদেশেই ব্যবস্থার খণ্ডন এবং পরিবর্তন হয়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকারেরা রাজাদেশে সংহিতা প্রণয়ন করেন নি। তাঁরা নিজের তপোবনে সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন. দেশের অবস্থা অনুসারে যখন পরিবর্তন আবশ্যক হল তখন পরবর্তী সংহিতাকারেরাও তাই করলেন। কুল্লুক ভট্ট, জীমূতবাহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি আধুনিক ভাষ্যকারেরাও তাই করেছেন। তার পর এই সকল সংহিতা ও ভাষ্য পণ্ডিত সমাজে আলোচিত হত। বাদ প্রতিবাদ, তর্ক বিতর্ক এসম্বন্ধে অনেক হত। তার পর অধিকাংশ পণ্ডিত সমাজ যাকে গ্রহণ করতেন তাই দেশের সকল সমাজে চলত। রাজাও তাই গ্রহণ করতেন। এইরূপে যে বিধিব্যবস্থা প্রণীত ও গৃহীত হত ব্যবহারে তার প্রয়োগ হত পঞ্চ সমিতির (পঞ্চায়ৎ) দ্বারা। এই পঞ্চায়তের দ্বারা বিচার আর্য্যসভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষকের ভূম্যাধিকারিত্ব আর একটি বৈশিষ্ট্য! "স্থাণুচ্ছেদস্য কেদার মাহুঃ শল্যবতো মৃগম্" (মনু ৯।৪৪) যে ব্যক্তি বন কেটে পতিত জমি উদ্ধার করেছে, জমি তারই। ইংরেজ শাসনের আরম্ভেই এই সকল উঠে গেল। ইংরেজ বণিক্ রূপে এদেশে এসেছিলেন। বাণিজ্যেই তাঁদের দক্ষতা, রাজকার্য্যে তাঁরা অনভিজ্ঞ, অথচ অবস্থাচক্রে রাজকার্য্য তাঁদের করতে হল। সুতরাং রাজ কার্য্যের মধ্যে তাঁদের বণিক্ সুলভ ব্যবসায়বুদ্ধিরই প্রাধান্য হল। তাঁরা প্রজার হিতের চেয়ে নিজের লাভের দিকেই দৃষ্টি রাখলেন বেশী। হিন্দুদের আচার ব্যবহার দেখলেন না, বিচার-প্রণালীর সংবাদই নিলেন না, পঞ্চায়তি প্রথার অস্তিত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেল, ভূমি সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থার কোন অনুসন্ধানই করলেন না। অথচ এই সকলই সমাজের স্থিতি ও উন্নতির মূল। ইংরেজ বিধি ব্যবস্থার প্রণয়নের ভার নিজের হাতে নিলেন, রেগুলেশন চালালেন, বিচার কার্য্য নিজেই করতে লাগলেন, পঞ্চায়তি প্রথা উঠিয়ে দিলেন, জমির খাজনা—আদায়ের ঠিকা দিলেন, কৃষককে সেই ঠিকাদারের (revenue farmer) হাতে বিনা সর্ত্তে (unconditionally) সমর্পণ করে দিলেন। আর্য্য-সভ্যতার মূল ছিন্ন হয়ে গেল। বিলিতী শিল্প বাণিজ্যের আমদানী হল, দেশী শিল্প বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় পরাভূত হতে লাগল। কোম্পানীর স্বার্থসিদ্ধির

আর কোন বিঘ্ন থাকল না। দেশের ধন বাণিজ্যের স্রোতে বিদেশে যেতে লাগল, দেশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে লাগল।

সম্পূর্ণ ব্যবসায় বুদ্ধিতে রাজ্য চলে না, রাজত্বও চলে না! কোম্পানীর রাজত্বে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটতে লাগল। ইংলণ্ডেশ্বরী কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। এইরূপে ভারত-শাসন-যন্ত্রের চালকের পরিবর্ত্তন হল, কিন্তু যন্ত্রের পরিবর্ত্তন হল না। এক সম্প্রদায় ইংরেজ ভারত-নাট্যশালা থেকে নিক্রান্ত হলেন, আর এক সম্প্রদায় ইংরেজ তাতে প্রবেশ করলেন। ভারতবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিযোগিতায় অপর পক্ষ সেই ইংরেজই থাকলেন। অধিকন্তু তাঁদের রাজ্যের ভিত্তি এখন দৃঢ়তর, বলবীর্য্য প্রভূত-তর হল। ইংলণ্ডেশ্বরী ঘোষণা করলেন যে তাঁর ভারতরাজ্যে বর্ণবৈষম্য থাকবে না, জাতিবৈষম্য থাকবে না, তাঁর যোগ্যতার মাপ-কাঠীতে ইংরেজ ও ভারতবাসী সমান হলেই রাষ্ট্রীয় সকল কাযেই ভারতবাসীর প্রবেশ অবারিত হবে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গের যে জাতীয় চরিত্রগত বিদ্বেষ আছে রাজকীয় ঘোষণা তাকে বিদূরিত করতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণাঙ্গ ভারত-বাসীর হীনতা সামাজিকতায় এবং রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থায় থেকে গেল। যে সকল হিন্দু আচারবিধিব্যবস্থা প্রণয়নপ্রণালী, পঞ্চায়তি বিচার প্রথা, কৃষকের ভূম্যাধিকারিত্ব প্রভৃতি উচ্ছিন্ন করে ছিলেন, তার আর পুনঃপ্রবর্ত্তন হল না। বিলিতি শিল্প বানিজ্যের সঙ্গে বিলিতি শিক্ষার আমদানী হল, অবাধ-বাণিজ্য নীতি বৈদেশিক ব্যবসায়কে শোষণ করতে লাগল, সৈনিক বলবৃদ্ধি করা হল, দেশের দারিদ্র্য মোচনের কোন ব্যবস্থা হল না।

ইংরেজ শাসনের দোষগুণ বিচার করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এই রাজত্বের প্রধান গৌরবের বিষয় যে প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, প্রজার শিক্ষা বিধান করা সে সম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। ধন প্রাণ রক্ষা শাসন প্রণালীর চৌকীদারী ধর্ম্মমাত্র, কিন্তু এর চেয়েও শাসন কার্য্যের গুরুতর ও উচ্চতর ধর্ম্ম আছে এবং সেই ধর্ম্ম সাধনের উপর শাসনের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। সেই ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম যা প্রজার পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বিধান করে। সেই উপায় সম্বন্ধে সে দিন বঙ্গেশ্বর বলেছেন—যে তা দু রকমের—এক রকম শান্তিময় বিবর্ত্তন ("peaceful evolution) আর এক রকম বিপজ্জনক আবর্ত্তন (dangerous re-volution) বিষয়টা তিনি যে ভাবে বলেছেন তাতে বোধ হয় যে তিনি ঐ

শব্দটা বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহার করেন নি বিবর্ত্তন-বৈজ্ঞানের মতে (Science of evolution) প্রথমেই বিবর্ত্তনের একটা বিষয় থাকা চাই,তারপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যার অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার উপর বিবর্ত্তনের গতি বৃদ্ধি এবং ক্ষয় নির্ভর করে। বিবর্ত্তন-বিজ্ঞান বলে যে বিবর্ত্তনের নিয়ম কেবল এই নয় যে কোন বিষয় অনবচ্ছেদে অবিরামগতিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠবে বিবর্ত্তনের নিয়মে যেমন গতি ও বৃদ্ধি আছে তেমনি সমানাবস্থায় অবস্থিতি, ক্ষয় ও বিনাশও আছে। সেই জন্যই সমস্ত বিশ্বটা বিবর্ত্তনের নিয়মাধীন হলেও জড় জগতে ও প্রাণিজগতে নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্য্যন্ত সকল-অবস্থা-গত: পদার্থ বিদ্যমান আছে। সকলেই উচ্চতম স্তরে উঠতে পারে নি। আণ্ডামান দ্বীপের অত্যন্ত অসভ্য আদিমনিবাসী থেকে আমেরিকার সভ্যতম মানুষ পর্য্যন্ত এখনও পৃথিবীতে বাস করছে। আবার প্রাণিজগতের কত উচ্চতর জীবের সঙ্গে কত উচ্চতর মানুষও নির্ব্বংশ হয়ে গিয়েছে। আর অসংখ্য ইতর প্রাণীও মানুষ আবহমান একই অবস্থায় জীবিত আছে। Joseph Mc. Cabe তাঁর

Principles of Evolution গ্রন্থে বলেন "I have already said that evolution is not a law of 'progress" in the moral sense of the word, and also that the general fact of evolution is consistent with prolonged stagnation and even degeneration,in particular cáses. * * * * *

It must, therefore, not be imagined that because there is a 'law of evolution' civilization is bound to advance from height to height. (১),

তার পর দেখতে হবে বিবর্ত্তনটা হবে কিসের? ভারতের প্রধান সম্পদ কৃষি। প্রাচীন আর্য্য বিধান অনুসারে জমি ছিল কৃষকের, নব্য ইংরেজী বিধান অনুসারে কৃষক জমির স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন (peaceful evolution) কি তাকে আবার তার জমিতে স্বত্বাধিকারবান্ করে দেবে? সে কালে বিবাদ-মীমাংসা, বিচার, স্থানীয় পূর্ত্তকার্য্য পঞ্চায়তের দ্বারা হত। এই পঞ্চায়তের দ্বারা স্থানীয় আত্মশাসন সকল পার্লামেন্টের বীজ স্বরূপ আর ভারতবর্ষের এইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তা সমূলে উৎসন্ন হয়ে গিয়েছে। তার স্থানে সেই নামীয় যে পদার্থ টাকে স্থাপন করা হয়েছে সেটা দেশজ নয়।

(1) Principles of Evolution, page 229.

বিলিতি county council এর কলম অথবা তার তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ। সরকারী যত্নবাহুল্যে জীবিত আছে কিন্তু দেশের মাটির রস পায় নি; লোকে আপন করে নিতে পারেনি। তার উপর তার শোচনীয় দারিদ্র্য সকল কর্ম্মেই তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। বিবর্ত্তনেরদ্বারা উন্নতি হবে কবে? সেই খাঁটি ভারতবর্ষীয় পঞ্চ সমিতির না এই নকল আত্মশাসনের? ভারতের শিল্পবাণিজ্য অসম প্রতিযোগিতায় পরাভূত হয়ে বৈদেশিক শিল্প বাণিজ্যের দাস হয়েছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন ত ভারতায় আদি শিল্পবাণিজ্যের এই পরিণতি ঘটিয়েছে!

ভারতীয় শিক্ষার বিকাশের ক্রমভঙ্গ হয় প্রথম মুসলমান দ্বারা, তার পর ইংরেজ দ্বারা। এই ক্রমভঙ্গের জন্য সে শিক্ষা আর বিকশিত হতে পেলে না। তার পরিবর্ত্তে যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়েছে, তার উচ্চতা যতই হক, বিস্তৃতি অতি সামান্য। উচ্চতাও বিলিতি শিক্ষার পাদদেশ পর্য্যন্ত। এখনও দেশের একশ জন লোকের মধ্যে সাত জনের বেশী লেখাপড়া জানে না। তার পর যারা তথাকথিত উচ্চশিক্ষা পেয়েছে তারা ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে দেশীয় সাহিত্যে সঞ্চিত ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজাতীয় ভাবে চিন্তায় ও কার্য্যে একটা নূতন আভিজাত্যের সৃষ্টি করে জনসাধারণ থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। দেড় শ বছরের উপর অপেক্ষা করে শিক্ষা এই সিদ্ধি লাভ করেছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন আর কত দিন অপেক্ষা করতে বলে?

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যত অল্প বলা যায় ততই ভাল। দেশের অধিবাসীদের রাষ্ট্রও নাই তার নীতিও নাই। তত্ত্বতঃ বা কার্য্যতঃ তার শিক্ষাও দেওয়া হয় না। অব্যবহারে দেশের লোকের সে মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শান্তিময় বিবর্ত্তন কি তাকে পুনর্জীবিত করতে পারবে?

স্বদেশরক্ষার জন্য ক্ষাত্র ধর্ম্মের অনুশীলন সকল দেশেই প্রথম স্থানীয় বলে গণ্য। ইংরেজ দ্রোনাচার্য্য শূদ্র ভারতবাসীকে সে শিক্ষার অনধিকারী মনে করেন। বিনষ্ট প্রাচীন সামরিক বৃত্তিও কি বিবর্ত্তনের ফলে পুনর্জ্জন্ম লাভ করবে?

যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকারই করা যায় যে বিবর্ত্তন আমাদের এই সকল অভাব-পূরণ করে দেবে তা হলেও জিজ্ঞাসা করতে হয় তার জন্য আমাদের আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে? বিবর্ত্তন-বিজ্ঞানের (Science of evolution) পণ্ডিতেরা ভূ-তত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্ব বিস্তার প্রমাণ দিয়ে আমাদেরকে

বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে লক্ষ লক্ষ বৎসর বিবর্ত্তনের পথে ভ্রমণ করে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তার বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে। মানুষেরও এই বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হতে কত সহস্র বৎসর লেগেছে। তাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় শান্তিময় বিবর্ত্তনের ফলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হতে আমাদের কত দিন লাগবে?

এর উত্তরের জন্ম উদাহরণ স্বরূপ দুটি দেশের কথা বিবেচনা করা যাক্। একটি আমেরিকার যুক্তরাজ্য, আর একটি আয়ারলাণ্ড। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এখন সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরূঢ়। এই বিরাট সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতার যুদ্ধে। আর ভারতের মুসলমান-রাজত্বের পতন ও ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুত্থানের আরম্ভ হয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙলা বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী লাভে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। এই দুই ঘটনায়, কবির ভাষায়, মনে হয়——————

তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ ব্যসনোদয়াভ্যাম্
লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু।

দুটি ঘটনাই প্রায় সমকালীন, কিন্তু কালের গতি দুই দেশে দুই বিপরীত ফল প্রসব করেছে। বৃটিশ-সাম্রাজ্য-নাট্যশালা থেকে আমেরিকার নিক্রমণ, ভারতের বন্দীভাবে তাতে প্রবেশ ও আজ পর্য্যন্ত সেই খানে সেই ভাবেই অবস্থিতি। সময় তার বিবর্ত্তন ঘটাতে পারে নি।

আয়ারলাণ্ড সাত শ বৎসর পরাধীন থেকে আজ বোধ হয় মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সাত শত বৎসর ব্যাপী অধীনতার অভিনয়ে আয়ার-ল্যাণ্ড কি কেবল নিশ্চেষ্ট দর্শকের মত পটপরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় বসে ছিল? আয়ারলাণ্ড বৈধ আন্দোলন করেছে আর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাকে অবৈধ আন্দোলন বলেন, তাও করেছে। স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে, আইরিশ সাধারণ তান্ত্রিক সৈন্যদল গঠিত করেছে, রাজ সৈন্য এবং পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। রাজা তার স্বাধীনতার শক্তি সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তার অভীষ্ট বর দিচ্ছেন। ভারত এবিষয়ে অতুলনীয়, ভারতীয় আন্দোলন রক্তপাত বিহীন, উপদ্রবশূন্য, অহিংস এই বৈষ্ণবী সাধনায় কি রাজা প্রসন্ন হবেন না? অপর পক্ষ বলবেন এই দুটি দেশে—আমেরিকায় ও আয়ারলাণ্ডে—যা ঘটেছে তা বিবর্ত্তন নয়, আবর্ত্তন, Evolution নয়, Revolution; যদি তাই হয় তার ফলটা যে হয়েছে অন্য দেশের পক্ষে লোভনীয়। তাতে যে এক রকম স্বীকার করা হচ্ছে যে বিবর্ত্তনের চেয়ে আবর্ত্তন ভাল। কিন্তু বিবর্ত্তন বিজ্ঞান আবর্ত্তনের

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অন্য লোক যাকে আবর্ত্তন বলে, বিবর্ত্তনবাদী তাকেও বিবর্ত্তন বলেন। বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে আবর্ত্তন চলছে। মানুষ সাধারণতঃ স্থূলদৃষ্টি। প্রতি মুহূর্ত্তের আবর্ত্তন লক্ষ্য করে না। কিন্তু সেই আবর্ত্তনের ফল পুঞ্জীভূত হয়ে যখন একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন ঘটায় এবং বলপূর্ব্বক মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, মানুষ তখন সেই অলক্ষিত মুহূর্ত্তগুলির সমষ্টিকে যুগান্তর বলে, আর যে বৃহৎ পরিবর্ত্তনটা ঘটে তাকে বলে আবর্ত্তন (revolution) মানব সভ্যতার সকল বিভাগেই এই আবর্ত্তন হয়। এইরূপে আমরা বলি শিক্ষার আবর্ত্তন (revolution in education) শিল্পের আবর্ত্তন (revolution in arts and manufacture), বাণিজ্যের আবর্ত্তন (revolution in trade and commerce) ইত্যাদি। তখন আবর্ত্তন শব্দটি দোষবাচক না হয়ে গুণবাচক হয়। কিন্তু শাসন প্রণালী সম্বন্ধে 'আবর্ত্তন' শব্দটি ব্যবহার করলে অর্থাৎ revolution in government বললেই আবর্ত্তনের অর্থ হয় বিদ্রোহ, revolution মানে হয় revolt ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তা নয়। বিবর্ত্তন তার স্বভাবিক অতি মন্থর গতি ত্যাগ করে ক্ষিপ্ত গতিতে উপস্থিত হলেই তার নাম হয় আবর্ত্তন।

ডালি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছেদ

[টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনি]

(১)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছেদ আমাদের দেশের পূর্ণ পরিণতি লাভের একমাত্র উপায় এবং কেবল ইহাতেই ইংলণ্ডের সহিত আমাদের শান্তি স্থাপন হইতে পারে——এই বিষয় যখন আমরা আলোচনা করিতে অগ্রসর হই, তখন আমাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে নানা ভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করি কিন্তু একটি ভাবের সম্পূর্ণ অভাব————এই প্রশ্নটি সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া যদি সম্ভব হয় ইহাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা। কেহ হয়ত এই প্রশ্ন উঠিলেই উত্তেজিত হইয়া পড়িবেন, আর কেহ হয় ত ইহাকে ভাসা ভাসা আলোচনা করিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া দার্শনিকসুলভ বিজ্ঞতার সহিত উড়াইয়া দিবেন। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় কেবল জনসাধারণের মতে মত দিয়াই চলেন, সুতরাং তাঁহাদের

জন্ম নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। একদিন কোনও মহৎ কর্ম্মে বা কোনও মহান্ ত্যাগে জাতির প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে,এবং জনসাধারণ তাহাদের আলস্য ও কুসংস্কার হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় স্বাধীনতার ধ্বনি তুলিয়া অগ্রসর হইবে। আমরা সেই মুহূর্ত্তকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করিয়া যাইব এবং আপনাদিগকে প্রস্তুত করিব। তারপর আমার দার্শনিক প্রতিপক্ষের কথা —আমার আশা আছে যে তিনি আমার যুক্তিগুলি শুনিবেন। আমার যখন বলা শেষ হইবে, তিনি হয়ত তখন আমার সহিত অনেক বিষয়ে একমত না হইতে পারেন, কোনও বিষয়ে হয় ত মতের ঐক্য না হইতে পারে, তথাপি যদি আমার যুক্তিগুলি শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি একটি কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে তিনি তখন স্বীকার করিবেন এ বিষয়টি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নহে।

(২)

আমাদের প্রতিপক্ষের মনোগত ভাব কতকটা এইরূপভাবে বুঝান যাইতে পারে এই বিচ্ছেদের দাবী যে ন্যায়সঙ্গত ও বিচারসহ ইহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করি নাই। ইহাকে আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়াছি, ইহার জন্য সংগ্রাম করিয়াছি, ইহার সাধনোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও ইহাকে লাভ করিতে হইবে, কিন্তু জীবনের দর্শন শাস্ত্রে ইহার একটা বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করি নাই। আমাদের উহাকে প্রকৃত পক্ষে ও যথার্থরূপে দার্শনিক ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। দর্শন ও বিজ্ঞানের ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ নীতি যে এই জগৎ একটি অখণ্ড সত্তা, এবং জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এমন নিয়মাবলী আবিষ্কৃত হইবে যাহাতে প্রমাণ হইবে এই বিশ্বের ধারা ও সত্তা অভিন্ন ও অখণ্ড। সুতরাং বিচ্ছেদপন্থীরূপে আমাদের দাবী যথার্থ বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে আমাদের জাতীয় জীবন বিকশিত হইয়া একত্র গ্রথিত হইয়া পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবে, ইহাতে আমাদিগকে বিশ্বের জাতি সমূহের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান দিবে, এবং আমাদের জাতীয় ভাগ্যগঠন করিতে সহায়তা করিবে; আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সকল সংগ্রামের মাঝে এই জাতীয় ভাগ্য তাহার সমস্ত মহত্ত্ব লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমরা যদি এ বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ করিতে চাই, তাহা হইলে একথাটি আমাদিগকে মানিয়া

লইতেই হইবে। যে মহৎ নীতি আমাদের জীবন পরিচালিত করিতেছে, যাহা আমাদের জন্য একটা বাঁধা ধরা কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, যাহাতে আত্মোৎসর্গ, কঠোর পরিশ্রম, বহুবর্ষ ধরিয়া কষ্টসহিষ্ণুতা এবং হয় ত লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুকেও বরণ করা আবশ্যক হইবে, সেই মহৎ-নীতির সত্যতা অবশ্যই প্রমাণিত হইবে এমন সব নিয়মের দ্বারা যাহা উহাকে যথার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে ইহার নিকট আমরা বশ্যতা স্বীকার করিব কেন? ইহাকে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিব সে পরীক্ষা কত আত্মোন্নতি সাধক ও গভীর ভাবদ্যোতক। ইহাতে আমাদিগকে কতকগুলি দৃঢ়বদ্ধ কুসংস্কার বর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; তাহাতে যদি আমরা সম্মত না হই, তাহা হইলে আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। কিন্তু আমরা সম্মুখপথে অগ্রসর হইবার নির্ভীকতা লাভ করিব, এবং অবশেষে জয়ী হইব, কেবল এই কথা আমাদিগকে সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও স্বস্তি উপলব্ধি করা, সমস্ত পৃথিবীকে—ইহার একটু সীমাবদ্ধ স্থানবিশেষকে নয়—মানবের সুন্দরতর আবাসে পরিণত করা।

এই দিক হইতে প্রশ্নটির সমাধান করিতে চেষ্টা করিলে, ইহা সমস্ত চিন্তা-শীল ব্যক্তির নিকট মহৎ ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া গণিত হইবে। আমাদের যে প্রতিপক্ষ পূর্ব্বে এ প্রশ্নটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এখন ইহার আলোচনা করিতে অগ্রসর হইবেন। হয়ত এখনও তিনি ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিতে পারেন, তিনি পতিত ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তির সহিত উহার দৌর্ব্বল্য তুলনা করিয়া বলিতে পারেন—"তোমার দর্শন অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা স্বপ্নমাত্র।" কিন্তু তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন, ইহাই একটা মস্ত-লাভ; এইরূপে আমরা তাঁহাকে ক্রমশঃ একটু একটু অগ্রসর হইতে প্রণোদিত করিব এবং অবশেষে আমরা যে নীতির জন্য সংগ্রাম করিতেছি, তিনিতাহাই গ্রহণ করিবেন।

(৩)

মানুষের কাজ করিবার পক্ষে এখন প্রধান বাধা সেই সাধারণ ভ্রান্তি যে মানুষের দেশের কাজ এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইবে যেন উহা তাহার

জীবদ্দশায়ই ফলপ্রদ হইতে পারে। ইহা কিন্তু একেবারেই ভ্রান্ত, কারণ মানুষের জীবন মাত্র কয়েক বর্ষব্যাপী, কিন্তু একটা জাতির জীবন বহু শতাব্দী ধরিয়া, এবং যে হেতু একটা জাতির কার্য্যপ্রণালী উহাকে ভবিষ্যতে পূর্ণ-বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই হেতু মানুষকে এমন একটা লক্ষ্য ধরিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে, যাহা কেবল ভবিষ্যৎ বংশে সফলতা লাভ করিতে পারে। মানুষ তাহার নিজের জীবনে কি প্রণালী ধরিয়া কার্য্য করে তাহাই দেখা যাউক। তাহার বাল্যকালও কৈশোর এমন ভাবে যাপিত হয় যাহাতে তাহার পূর্ণ বয়সের কাল ও যৌবন জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশে পরিণত হইতে পারে, শরীর দৃঢ় সম্বদ্ধ, মন সুপ্রতিষ্ঠিত, দৃষ্টি সূক্ষ্ম, উদ্দেশ্য মহান্, আশা উচ্চ—এই সমস্তই কোনও বিশেষ কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। মানুষের শৈশব ও কৈশোর যেমন সুনিয়োজিত ও সুব্যয়িত হইবে, তাহার যৌবন সেইরূপ মহৎ হইবে। শৈশবে জমী প্রস্তুত হয় এবং পূর্ণ পরিণতির সময়ে চমৎকার ফলোৎপাদনের জন্য বাজ উপ্ত হয়। জাতির পক্ষেও ঠিক এইরূপ। আমরা জমী প্রস্তুত করিয়া ভবিষ্যতে পূর্ণ পরিণত হইয়া ফলপ্রদ হইবার জন্য বীজ বপন করিয়া যাইব; মনে রাখিতে হইবে যে একটা জাতির পূর্ণবিকাশ এক পুরুষে হয় না, পুরুষপরম্পরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; এই জ্ঞান লইয়া আমাদের কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে আমরা যে এখন কার্য্য করিতেছি তাহার ফল ভবিষ্যতে আমাদের অনেক পুরুষ পরের বংশধরেরা উপভোগ করিবে। ইহার এই অর্থ নয় যে আমরা নির্জ্জনে একাকী কার্য্য করিয়া যাইব, ঈপ্সিত লক্ষ্যের চিহ্নও দেখিতে পাইব না; এমন হইতে পারে যে আমরা আমাদের জীবিত কালেই সেই লক্ষ্যে পোঁছিতেও পারি, হয়ত ইহার যে সমস্ত চমকপ্রদ দৃশ্য ভবিষ্যতে যুগযুগ ধরিয়া আনন্দ প্রদান করিবে সে সমস্তের আবিষ্কার না করিতে পারি। যে জয়গৌরব আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে, তাহা অভিনন্দিত করিবার জন্য হয়ত অনেকেই জীবিত থাকিবেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পরিশ্রমের ও পুরস্কার আছে; কারণ ভবিষ্যৎ জয়ের কল্পনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নিকট দেখা দিবে, সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন এই জ্ঞানে তাঁহাদের আত্মা সমুদ্ধতর হইয়া উঠিবে এবং একবার তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইলে কোনও অত্যাচার যে উহা ধ্বংশ করিতে পারিবে না, আমাদের দেশের ভাগ্য যে গঠিত হইয়া যাইবে, এবং তাহার চিরস্থায়িত্বে আর কোনও সন্দেহই থাকিবে না—এই ধারণায় তাঁহাদের অসীম আত্মতৃপ্তি লাভ হইবে। এই

স্বাধীনতার অগ্রগামী সৈনিকদিগের মধ্যে কাহারও বিরুদ্ধে কোনও কথা উঠিলে তিনি ইহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া লয়েন, তাহাতে তিনি অজেয় হইয়া উঠেন এবং পরিশেষে তিনিই জ্ঞানী বলিয়া বিবেচিত হয়েন। তিনি অতীতকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লয়েন এবং সেই অতীতের কঠিন আবরণের মধ্য দিয়া তিনি বর্ত্তমানের সত্য উপলব্ধি করিয়া জীবনের বিশাল অভিজ্ঞতা অনুসারে কার্য্যের পন্থা নির্দ্দিষ্ট করেন এবং তাহাতেই তিনি সফলতা লাভ করেন; কারণ পরিণামে তিনি কার্য্যের প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারেন, তখন তাহার কার্য্য পরিণতি লাভ করিয়া শতগুণ ফলপ্রদ হয়। ইহা একদিনে না হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যু আসিয়া তাঁহার হস্তকে যখন অসার করিয়া দিবে,তখন তাঁহার গৌরব অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কারণ তিনি মহৎ জীবন যাপন করিয়াছেন, কার্য্য করিবার জন্ত সুন্দর ক্ষেত্র রাখিয়া গিয়াছেন, চিরদিন ধরিয়া দেশের সেবা করিবার জন্ত উপযুক্ত সময়ে আত্মবলিদান দিয়াছেন; এবং মরিয়া তিনি মহৎব্যক্তিগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, সেথায় তিনি শাশ্বত অমরত্ব লাভ করিবেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে কাজের লোক আর ঐ যে আত্মম্ভরী ব্যক্তি যে আপনাকে কাজের লোক স্থির করিয়া এই সকল কার্য্যকে মূর্খতার পরিচায়ক মনে করে, এবং সময় বুঝিয়া সুযোগের জন্ত চীৎকার করিতে থাকে, সে কি কখন তাহার মতানুযায়ী কার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিয়াছে? না, কারণ এই পৃথিবীতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য। তাহার নিজেকে উপযুক্ত বিচার করিতে হইলে সকল যুগের সুযোগ-অন্বেষণকারীদিগের ব্যর্থ চেষ্টার বিষয় সে চিন্তা করুক এবং ইতিহাসের মরুভূমির মাঝে বিক্ষিপ্ত নিষ্ফল কল্পনার কথা সে স্মরণ করুক।

(৪)

তথাপি হয় ত কেহ কঠোর বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাময়িক মোহমুগ্ধ হইয়া বলিবে—"এই দেখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তি আর আমাদের পতিত দুর্ব্বল অবস্থা, তোমাদের বৃথা আশা।" তিনি যেন এই স্পষ্ট সত্য মনে রাখেন—জাতি বাঁচিয়া থাকে, সাম্রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। অতীতের সেই বিশাল সাম্রাজ্য সমুহ এখন কোথায়? বর্ত্তমানের সাম্রাজ্যগুলির মধ্যেও ধ্বংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে। যে সকল জাতি অতীত সাম্রাজ্যের উত্থান ও শাসনশক্তি দেখিয়াছিলেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা জীবিত রহিয়াছে; যে অত্যাচার

তাঁহাদের নয়ন সম্মুখে বিভীষিকা আনয়ন করিত, তাহা একণে বিনষ্ট হইয়া সমাপ্ত হইয়াছে। সে জাতিসকল এখনও বাঁচিয়া আছে, কিন্তু সে সাম্রাজ্যগুলি লুপ্ত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমান কালের পৃথিবীর জাতি সমূহের বংশধরেরা তখনও বাঁচিয়া থাকিবে, যখন এই প্রভুত্বের জন্য বিবদমান সাম্রাজ্যগুলি ধুলায় মিশিয়া যাইবে যেমন সব অতীত, যেমন সব অন্যায় ধুলিসাৎ হয়। আমরাও ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিব, এবং আমাদের এখনকার এই বিশ্বাসের পরিমাণ আমাদের কার্য্যের পরিমাণ ও ভবিষ্যতে আমাদের মহত্বের পরিমাণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

নারায়ণের নিকষমণি

কর্ম্ম মন্দির—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত উপন্যাস, বৃহৎ পুস্তক সুন্দর বাঁধা, মূল্য ২৲ টাকা। প্রাপ্তি স্থান—বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৮ নং গুলুওস্তাগরের লেন, দরজিপাড়া, কলিকাতা। এই উপন্যাসখানি একটু নতুন ধরণের; এই যে দেশের নতুন ভাবের ঢেউ এসেছে, তাতে দেশের নরনারীর মনে অশিক্ষিত অলস ভিক্ষাজীবী দরিদ্রদের গড়ে তুলবার যে চেষ্টা চলেছে, এ বইখানি তারি একটা চিত্র। বইখানার ভাষায় ও বর্ণনা ভঙ্গীতে কাঁচা হাতের ছাপ থাকলেও বলতে আমরা বাধ্য গ্রন্থকার উপন্যাসের মধ্যে অনেক নতুন কর্ম্মপন্থার পরিচয় দিয়েছেন, যেগুলি দেশসেবকেরা গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারবেন। নায়ক 'পরেশের' চরিত্রটা বেশ ফুটেছে এবং মেয়ে চরিত্রের মধ্যে "মৃণালিনীর" পরিচয়টা বেশ উপভোগ্য, প্রকৃত শিক্ষিতা মেয়ের চালচলন, ব্যবহার কেমন হয় তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। পাঠকেরা বইখানি পড়ে তৃপ্তি পাবেন।

উনপঞ্চাশী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ১২ নং রামরতন বসুর লেন, শ্যামবাজার থেকে প্রকাশিত; মূল্য এক টাকা। 'যুগান্তর' সারথি উপেন্দ্রনাথের উনপঞ্চাশীর নতুন করে পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যখন এই বইখানায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এক এক করে "বিজলী"তে বের হত, তখন লোকের সপ্তাহের পর সপ্তাহ সেগুলি পড়বার জন্য উৎসুক হয়ে বসে থাকত। এমন সরসভঙ্গীতে গুরুগম্ভীর বিষয়গুলির পরিচয় দেওয়া বোধহয়

এক উপেন্দ্রবাবুরই পক্ষে সম্ভব। কিন্তু এই সঙ্গে এখানে একটু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে অনেক স্থলে ব্যক্তিবিশেষকে তিনি অযথা হুল ফুটিয়েছেন। তা ছাড়া বইখানি চমৎকার উপভোগ্য।

বন্দীর ডায়েরী—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত, ইণ্ডিয়ান বুকক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে প্রকাশিত মূল্য ১৲ টাকা। অসহযোগ আন্দোলনে ছ'মাস জেলে থেকে হেমন্ত বাবু যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন. তাই এই বইখানিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর সরস লিখন ভঙ্গীতে বইখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

আঁধি—লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ২৷৷৹ টাকা। এই উপন্যাস খানিতে সৌরীণ বাবুর পূর্ব্বের যশ অক্ষুণ্ণ ত রয়েছেই আমাদের বোধ হয় এই বইখানিতে বরং সে যশ অনেকটা বেড়েছে। এতে শিশুর মনস্তত্ব বিশ্লেষণের যে অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে, তা বাংলার উপন্যাস সাহিত্যে বিরল। "নিখিলের" মধ্যে প্রকৃতির যে লীলা তাকে ভিতরের অতি-স্নেহের কারা থেকে বাহিরের মুক্ত বাতাসে বের করতে বারবার চেষ্টা পেয়েছে, "সুষমার" মধ্যে মাতৃ স্নেহের যে রসধারা উচ্ছল হয়ে উঠেছে, "অভয়শঙ্করের" মধ্যে যে অতি স্নেহের কাঠিন্য ফুটে উঠেছে, এ সবের পরিচয় বাংলা সাহিত্যে অভিনব ও অতুলনীয়। এই বইয়ের শিশু চরিত্রের বিশ্লেষণ পড়বার সময় Marie. Corelli,র The Mighty Atom গ্রন্থখানির অন্তর্গত মুক্তির আনন্দের জন্য ব্যাকুল শিশুর কথা মনে পড়ে। এ বইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা অসামঞ্জস্য আমাদের চোখে পড়ে—সেটা হচ্ছে "সুষমার" সন্তান হওয়া ও সেই সন্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যু। অভয়শঙ্করের সঙ্গে সুষমার যে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ তাতে সুষমার সন্তান হওয়াটা অস্বাভাবিক এবং অভয়শঙ্করের মনের সংস্কারের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। যা হ'ক এই উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যে অভিনব ও নূতন ধরণের হয়েছে। পাঠকেরা এই বইখানি পড়ে নিশ্চয়ই খুব তৃপ্তি পাবেন।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা]　　　　[ভাদ্র, ১৩২৯

নাম কীর্ত্তনীয়া

[দরবেশ]

যাহার বয়ানে তোমার নামের
　　ধ্বনি ধরে অনুখন,
হোক্‌না সেজন চণ্ডাল জাতি,
　　সেই মোর ব্রাহ্মণ।
যাহার বদনে তোমার নামের
　　ধ্বনি শুনি অনুদিন,
হোক্‌না সেজন পতিত জারজ,
　　মোর কাছে সে কুলীন।
সার্থক যার রসনায় হয়
　　নামের উচ্চারণ,
যথার্থ বেদ-অর্থ বুঝিতে
　　সমর্থ সেই জন।
তব শাশ্বত নামটি যাহার
　　প্রতি নিশ্বাসে সাধা,
লইয়া সিদ্ধি যত তপস্যা
　　তাহার দুয়ারে বাঁধা।
কুণ্ঠাবিহীন কণ্ঠে যাহার
　　তব নাম ধ্বনি ধরে,

নিত্য হোমের মঙ্গল ধূম
তাহারে বরণ করে।
অবিরাম তব মধু নাম পানে
বিশ্রাম যার নাই,
ভৃত্যের মত সকল তীর্থ
কৃপা মাগে তার ঠাঁই।
আচার লইয়া করে না বিচার,
হিয়ায় নামের ছবি,
সেই তো দিব্য সদাচারী সাধু,
আর্য্য কুলের রবি।
হে ঠাকুর, তব নামের নিশানা
যেজন বহিয়া ফিরে,
অবিচারে তার চরণের রজ
বহিবারে দাও শিরে।

শিক্ষার সাফল্য

[শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা]

বাংলার শ্যামল বনবক্ষ হইতে স্নিগ্ধ শ্যামসঙ্গীত বাজিয়া :উঠিল "মলাম ভুতের ব্যাগার খেটে।" যে শুনিল সেই যেন চমকিত হইয়া উঠিল। সমুখে কাজ ফেলিয়া যে ঘুমাইয়া পড়ে, সে যেমন আবেশকে সরাইয়া ফেলিয়া জাগরিত হয়, শ্রোতা মাত্রেই তেমনি আগ্রহে তেমনি মোহের লজ্জায় চেতনা পাইল। বিষয়ী বিষয়ের মধ্যে নিমজ্জিত, হয়ত প্রজাকে আশ্রিতকে দুর্ব্বলকে অনিষ্ট করিয়া আরও বিত্ত বিভব বাড়াইবার উপায় খুঁজিতেছে, শুনিল একটী সত্য সকাতর আত্মার-আর্ত্তনাদ "মলাম ভুতের ব্যাগার খেটে।" বুঝিল এযে তাহারই ক্লান্ত প্রাণের কাতর বিলাপ! রত্নের উজ্জ্বলতা ঐশ্বর্য্যের দৃপ্ত আড়ম্বর সবই বাড়িতেছে বটে, কিন্তু প্রাণের দৈন্ত ত ঘুচে নাই। সকল পাইয়াও যেন শান্তি নাই, বুকটা যেন মরুভূমির মতই শুখাইয়া আছে এ "ভূতের ব্যাগার খাটা" নয় ত কি?

তাহার চৈতন্ত ফিরিল। যে বোঝে জানে "ভূতের ব্যাগার খাটিবনা" সংসারে সে সরল পথেই চলিতে চেষ্টা করে।

ইহাই শিক্ষার সাফল্য।

জীবনের কাজে লাগিবে ইহার জন্তই সকল বিষয়ের প্রয়োজন। জড় ও আধ্যাত্মিক যে সকল বিষয়ে জীবনীশক্তি দিয়াছে তাই মানুষ সাদরে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছে। স্বর্ণ অথবা স্বর্গ অমৃত অথবা জ্ঞান কোন কিছুরই মূল্য নাই যদি না তাহা প্রাণরক্ষার ওজঃরস দিতে পারে!

মানুষ এক সময় অপ্রয়োজনীয়কেও এমন কি হলাহলকেও আদরে ব্যবহার করে যখন সে মোহপ্রাপ্ত হয়। এই বিমূঢ়তাকে চলিত কথায় নেশা বলে! নেশার মত্ততায় বিনাশও বিলাসের বিষয় হয়।

জড় দেহের রক্ষার জন্ত খাদ্য বস্তুর যেমন প্রয়োজন চিত্তের পুষ্টির জন্ত তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যকতা। আহার্য্যে পোষণ না হইলে শরীরের ধ্বংস, জ্ঞানে মনের শক্তি না বাড়িলে তেমনি জীবনের বিনাশ!

শিক্ষা জ্ঞানের শরণী!

যদি বলা যায় আজ জ্ঞানে মানুষের মনের পরিপোষণ হইতেছেনা তবে তাহা মিথ্যা বলা হইবে না। মানুষ শিক্ষার জন্ত শক্তি অর্থ ব্যয় করিতেছে তার আয়োজনকে আরও আড়ম্বরপূর্ণ করিতেছে অথচ সমাজের ভিতর ও বাহিরে ব্যষ্টিমানবের অন্তরে ও আচরণে যে জ্ঞানের সঞ্জীবন সুধা পরিপাক পাইয়াছে, তাহা কোন লক্ষনেই বুঝিবার উপায় নাই!

তবু শিক্ষার সংস্কার নাই, তাহার পরিবর্ত্তন নাই বরং ইহাতেই তৃপ্তি এবং সাফল্যের গর্ব্ব। ইহা কি নেশা নয়? নেশাতেই মানুষ "ভূতের ব্যাগার" খাটিয়া মরে।

যাহা নাই তাহাই সংগ্রহ করিতে হয় অভাবের পূর্ত্তির জন্ত। বালকের মত তুচ্ছ ধূলা কাদা লইয়া আমোদ মানবজাতির আনন্দ নয়। সংসারে জাগ্রত জগতে শিশুসম্ভোগের স্থান নাই, এখানে একটা বস্তুহীন মিষ্ট আবেশে চলিবে না স্বপ্নের স্বর্গ ও সুধা এখানে মৃত্যুর কাছেই পৌছাইয়া দিবে। মানুষের সাধনায় সকলই সত্য চাই!

মন অপরিণত এবং দুর্ব্বল। বিশ্বের বাধা বিপত্তিতে সদাই জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে, মনের বলাধানের জন্ত তাই শিক্ষার সাধনা। জ্ঞান অন্তরকে দ্রঢিষ্ট করিয়া সমস্ত বিঘ্ন হইতে মুক্ত করিয়া জীবনকে সাফল্যের সুধায় স্নিগ্ধ করিবে।

ইহা জ্ঞানের অংশমাত্র। তাহা হইলেও ব্যষ্টিচরিত্রও নিতান্ত অবহেলার নয়। ব্যক্তিত্ব যখন পূর্ণ হইতে চায় তখন তার কাছে ব্যষ্টি সমষ্টির সম্বন্ধতত্বও অজ্ঞাত থাকে না। ব্যক্তি যখন আপনাকে শান্তিতে স্বাচ্ছন্দ্যে অমৃতত্বে ভরিয়া তুলিবার জন্য সদাই আকুল হয়, তখন তাহার কাছে বিশ্ব মোহন মূর্ত্তিতে আসিয়া প্রকাশিত হয়। মানবের জৈব স্বভাবটী দৈব প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হয়।

পেশীর সবলতা, দেহের লাবণ্য, পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং নীরোগ অবস্থা সুপরিপাক ক্রিয়ার সাক্ষ্য দেয়! জ্ঞান সিদ্ধির প্রমাণের কি কিছুই নাই? আচারে অনুষ্ঠানে ভাবে চিন্তায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কি বলিয়া দিবে না চিত্ত শক্তিমান্ সুগঠিত?

ঘর ও বাহির লইয়া মানুষের লীলা ক্ষেত্র। সে যতই ঘরের নিগুঢ় কোনে নিমজ্জিত হ'ক তাহার বাহিরকে এড়াইবার উপায় নাই। কেহ যদি বলে আমার অন্তরাত্মার তৃপ্তির পরিচয় অন্তর্যামীই জানেন সাধারণকে তাহার কি পরিচয় দিব। তাহা হইলে বক্তাকে ভণ্ড কপট বলিলে মিথ্যা গাল দেওয়া হইবে না।

নিখিল নিলয় জুড়িয়া একটি মানুষ যদি সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বর হইয়া থাকিত, তবে তাহার পাপ পুণ্যের ন্যায় অন্যায় কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের দেবত্ব পশুত্বের প্রভেদ থাকিত না। তাহার সমস্ত আচার আচরণ তাহাতেই পর্য্যবসিত থাকিত বাহিরের জগৎকে তার ফলভোগী হইতে হইত না। একের বাসনা অবাধ, তার সহিত আর কাহারও দ্বন্দ্ব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে স্বৈরিণী প্রবৃত্তিতে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত যাহা খুসি তাহাই ভাবিতে পারিত, এবং তাহা যদি নির্ব্বিঘ্নে অনাহত হইয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে তার কাছে মন্দ বলিয়া কোন কিছুর বাধাই থাকিত না, দশের মুখ চাহিয়া স্বার্থসঙ্কোচে কামনাকে পীড়িত করিতে হইত না।

কলুষ কামনার দুর্ভাগ্য যে ধরণী অনন্ত জীবের জননী। স্বেচ্ছাচার এখানে চলেনা, আঘাত দিলে প্রতিঘাত আসে, বাহিরের সহিত প্রতিকূলতা না করিলেও বাহিরের জঞ্জাল আসিয়া মনকে মলিন করিয়া দেয়, এবং বিশ্বের সহিত এমন অজ্ঞাত মিলনশৃঙ্খল আছে যে সমগ্রের সহিতই তাহার সুখ দুঃখ নিবিড় ভাবে জড়িত। ব্যষ্টির অন্তর্যামী যে বিশ্ব-আত্মার অংশ বিশেষ।

কোন দিক না তাকাইয়া সর্ব্বকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র স্বার্থকে সম্পূর্ণভাবে চাহিলেও পরার্থও ছায়ার মত তার নিকটে প্রতিবিম্বিত হইবে। যে

আপনাকে সুনিবিড়ভাবে চাহিয়াছে তার কাছে অন্যের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষণীয় হইতেই পারে না।

শিক্ষার সংকীর্ণ অংশটা আত্মরক্ষা। এই রক্ষা জড় ও আধ্যাত্মিক দুই দিকেই। স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্যের জ্বালা অসন্তোষের উৎপীড়ন, ক্রোধের উষ্ণতা, বিবিধ মানসিক বৈকল্যের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ ইহাও ব্যক্তিত্বের সাধনা। মানুষ না হয় জগতের প্রতি নাই তাকাইল। নিজেকে সুখী করিতে হইলেও ত ঐ সমস্ত মানসিক দৌর্ব্বল্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে? লোভে ক্রোধে অন্যের যে পরিমাণে ব্যথা লাগে নিজেরও সেই পরিমাণে অশান্তি আসে। সম্পূর্ণ স্বার্থপর অনিচ্ছায় কিম্বা অজ্ঞাতেও পরার্থপর। যার কাছে আত্মা বড় আদরের তার কাছে অপরও অবজ্ঞার নহে।

মানুষের জীবনে যখন এই স্বার্থের সিদ্ধান্তও পরিণতি লাভ করে, তখন মানুষ লোভ হইতে বিমুখ হয়, হিংসাকে ঘৃণা করে, হৃদয়হীনতার দিক মাড়াইয়াও চলে না, আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া বিশ্বকেও সে রক্ষা করে।

বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি মনুষ্যত্বের আদর্শগুলি ছাড়িয়া দিলেও প্রতি পদক্ষেপে ছোট ছোট কাজে প্রতিদিনকার ব্যবহারেও শিক্ষার সফলতার পরিচয় দিবে।

শিক্ষার মোটামুটি দিক সুখ সম্ভোগ, নিজের গায়ে একটু তাপ লাগিবে না। একটী ছোট কাঁটার বেদনায় ও ব্যথিত করিবে না। সুখ পিপাসুকে এই জন্য সর্ব্বদাই সাবধানে সতর্ক হইয়া সকল বিঘ্নের বিষয়কে দূরে রাখিয়া থাকিতে হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক আঘাতের হাত হইতে একেবারে নিস্তারের উপায় নাই, কিন্তু কতকগুলা অপ্রাকৃতিক পীড়া যাহার স্রষ্টা মানুষ নিজেই তার উপদ্রব হইতে মুক্ত থাকা মানবের আপনারই অধিকারে আছে। প্রথমে অত্যাচারী প্রপীড়িত করিলেও অত্যাচারীও শান্তি পায় না। আঘাত ও প্রতিঘাত নৈসর্গিক নিয়ম। কোন না কোন দিক দিয়াও ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইবেই। যে অন্যায়ের ফলে অপরের যন্ত্রণা তাহাতে অনুষ্ঠাতারও ক্লেশ। জোড় করিয়া ভয় দেখাইয়া এ বিশ্ববিধানকে পরাজিত করা যায় না।

শিক্ষা পাইয়াও যদি মানুষের মধ্যে নৈতিক অনাচারগুলি থাকিয়া যায়, প্রতি পদেই যদি সংসারের সহিত তার বিরোধ বাধে তবে শিক্ষা যে সফল হইয়াছে কি করিয়া ইহা বলা যাইবে? যুক্তি তর্ক কিম্বা অধ্যয়নের আধিক্য অথবা বুদ্ধির সূক্ষ্মতা দেখাইয়া শিক্ষার সার্থকতা প্রমাণ করা নিতান্ত মূঢ়তা! বৃক্ষের জননী বীজ, বৃক্ষত্বের আভাষ বীজে থাকিলেও উহা সম্পূর্ণ তরু নয়; ফল

এবং ছায়া কিছুই তাহার কাছে পাওয়া যায় না। ভাবের বাস্তবতা কর্ম্মের প্রকাশে, চৈতন্তের জাগরণে বস্তুর অস্তিত্ব। ভাব যখন কর্ম্মরূপে প্রতিবিম্বিত হইবে তখনই তাহার সত্তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাহা অঙ্কুরিত হয় না ও বৃক্ষে পরিণত হয় না তাহা বীজ নহে; ভাব আছে অথচ তাহার জাগরণ নাই তাহা অভাব, অলীক বস্তু! জগতের সমস্ত লোকগুলি যদি বর্ণজ্ঞানহীন হইত তবে বিপুল পুস্তকালয়ে রাশি রাশি বই থাকিলেও যাহা হইত না থাকিলেও তাহাই হইত। নির্গুণে বস্তুর নাস্তিত্ব, গুণপ্রকাশেই তাহার সত্তা। গুণ কখনও অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। প্রকাশশীলতাই গুণের স্বধর্ম্ম। খাদ্য সুপরিপাক হইলে রক্তরূপে দেহের লাবণ্যে শক্তিতে প্রকাশিত হইবেই, আহার্য্য যাহার শরীরে শোণিতরূপে পরিণত হইয়াছে সে কখন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে পারে না।

শিক্ষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ ইহা পরস্পর বিরোধী। শিক্ষিতের সাধারণ লক্ষণ অন্ততঃ সে সুশীল সদাচারী হইবেই। শিক্ষা পাইয়াও যাহার লোভ, অন্যায় ক্রোধ, হিংসার দমন হয় নাই, তাহাকে কেবল অশিক্ষিত বর্ব্বর বলিয়া দোষী করিলেই হইবে না, বুঝিতে হইবে বিদ্যাদানের পদ্ধতিতেও ত্রুটি আছে। শিক্ষায় যদি স্বার্থপরায়ণও করিতে না পারিল তবে তাহার জন্য আরাধনা শুধু "ভূতের ব্যাগার খাটা।" ইহাতে দুইদিক দিয়া লোকসান; অজ্ঞানের জন্য যে যাতনা তাহাত আছেই, বাড়ার ভাগ বিদ্যালাভের জন্য পরিশ্রম প্রভৃতির আয়াস।

নীতিজ্ঞানটা শিক্ষার সর্ব্বোত্তম আদর্শ নয়। উহা কেবল অতি নিম্নস্তরের জীবপ্রকৃতির সংস্কার। যে সামঞ্জস্য বোধে ব্যক্তির স্বার্থের দিকটা সুরক্ষিত হয় তাহাই নীতি শিক্ষা। উহাতেও সেই জৈবস্বভাব পূর্ণ প্রকটিত। তবে একটা মার্জ্জিত অপরটা অমার্জ্জিত নিতান্তই অপ্রবুদ্ধ। একটা আপনাকে চাহে বটে তবে সে জানে কিসে স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে কিসেই বা মঙ্গল কিসেই বা অমঙ্গল। অপরটাও আত্মলিপ্সু, তবে তাহার কামনা নিতান্ত মলিন, তাহার কেবল তৃষ্ণা আছে, অথচ তাহার ফল নিজের পক্ষে মৃত্যুর কি কল্যাণের তাহার কিছু মাত্র ধারণা নাই।

মানবের উন্নতি হৃদয়ের প্রসারণে, সর্ব্ব শেষ পরিণতি বিশ্বপ্রীতির বিকাশে মানুষ স্বার্থকে ছাড়াইয়া পরার্থে ছড়াইয়া পড়িবে, তাহার সুখ আপনাকে ভরাইয়া নহে অপরকে সুখী করিয়া। শিক্ষা দীক্ষা সাধনার ইহাই চরম লক্ষ্য। যখন

জীবনে জীবনে এই বিশ্বপ্রীতি প্রস্ফুরিত হইবে মুকুলিত লইবে পুষ্পের মত সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ডের দিগ্ দিগন্তরে উজ্জ্বল আবেগে বিকীর্ণ হইবে তখনই জ্ঞানের সত্য জন্ম, শিক্ষা সাফল্যের শুভ বাসর।

যাহা ত্যাগ তাহাই পরম ভোগ, যেখানে স্বার্থের লালসা লালায়িত নহে সেই খানেই আত্মা বিপুল বিস্তৃত। সুখ যেথায় ভিক্ষার সামগ্রী তথায়ই তাহার অভাব। যথায় পুরুষের সুখের জন্য ব্যগ্রতা নাই সেইখানেই প্রচুর অনাবিল শোভন সুখের উদ্বেল প্রবাহ!

প্রীতি-প্রণোদিত ত্যাগই শুদ্ধ সুখের জনক। প্রীতি বিলাইয়া সেবা করিয়া তুষ্ট করিয়া যে আনন্দ তাহা অসীম অগাধ শাশ্বত। এ শ্রেষ্ঠ ভোগ অথচ ক্লান্তি অরুচি প্রতিক্রিয়া নাই, ইহার নৈরাশ্যের মধ্যেও আশা, দুঃখের মধ্যেও দীপ্তি, শ্রান্তির অন্তরেরও শান্তি। যে স্বর্গ চির অগোচর, এই ত্যাগে তাহাকে সত্য করিয়া তোলে, যুগে যুগে যে অমৃত কেবল মাত্র কল্পনার সামগ্রী হইয়াই আছে তাহাকে জীবনের প্রতিপলকের অনুভূতিতে জাগাইয়া তোলে।

স্বার্থের সম্পূরণে জীবনের স্বার্থকতা হয় না। সমস্ত আত্মসেবার মধ্যে বিফলতার বেদনা নৈরাশ্যের দহন বিমিশ্রিত। মানুষ যদি সত্য শান্তীকামী হয় তবে তাহার শিক্ষায় বিশ্বপ্রীতির দীক্ষা দিয়া উহার সিদ্ধির জন্য সাধনা করিবে।

যে দিক দিয়াই যাওয়া যাক প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে তার সমাজকে অমৃত বিতরণ করিয়াই চলে। কোন দিকেই ব্যষ্টি চিত্তেও সমষ্টি চরিত্রে অশান্তির একটু কণিকাও রাখিবে না।

আজ যে শিক্ষার সাধনা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চারি দিকের দৃশ্য, প্রতিপলের অজস্র ঘটনা, মর্ম্মন্তুদ হাহাকারের কোলাহল, বুভুক্ষুর ম্লান মুখচ্ছবি, অনাথের দল বৃদ্ধি, বিলাসের বিবৃদ্ধি। সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ের আতিশয্য।

নগরের রাজপথে জীর্ণচিরধারী অজস্র দীন রোগাতুর, অথচ দুইধারে গগনচুম্বী হর্ম্মচূড়া চারিধারে ঐশ্বর্য্যের বিপুল আড়ম্বর; কেহ রোগ যন্ত্রনায় ছট ফট করিতেছে, অথচ তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। প্রতিদিন অজস্র লোক গৃহহীন পথের ভিখারী হইতেছে কেবল অর্থোপার্জ্জনের অক্ষমতার জন্য নহে, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত শোষনে ও পীড়নে। কাহারও সমুদ্রের জলোচ্ছাসের মত ঐশ্বর্য্য, কেহ এক মুষ্টি অন্ন মাত্র মুখে দিতে পায় না। তাহার পর শিক্ষিতের বিচারালয়ে অশিক্ষিত অমার্জ্জিতদের একেবারে বাদ দিয়াও

যে সমস্ত মোকর্দ্দমা হয় তাহা সমস্তই পাশবিকতার লীলাক্ষেত্র। মামলা মানেই তাহা কোন প্রকার পাপের ফল।

এই সব সত্ত্বেও যে শিক্ষা সফল হইতেছে তাহা বলিলে একটা অতি প্রকাণ্ড মিথ্যাই বলা হইবে। ঐ সব শিক্ষার বাহিরের দিক সমস্ত অশিক্ষার কুশিক্ষার সমষ্টিগত প্রকাশ।

একি সুধু আরামের অপরাধ না মানুষের শিক্ষার দোষ? জগৎ যাহা পারিল তাহা দিল, সমুদ্রের তলদেশের মুক্তা হইতে বুকের হীরক টুকু পর্য্যন্ত, প্রকৃতি শস্য দিল, জল দিল, আর বিদ্যুৎ বাষ্প আপনাকে পর্য্যন্ত, মানবের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছে, বিশ্ব উজাড় করিয়া তাহার সুধারস তাহাকে দান করিতেছে তবু মানুষের মুখে হাসি ফুটিল না ইহাত বাহিরের ত্রুটী নহে মানবের নিজেরই মনের দৈন্য, দুর্ব্বলতা অর্থাৎ শিক্ষার অভাব। অনর্থক বাসনা বাড়াইয়া লোভী হইয়া, হিংস্র হইয়া পাশব প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া অপ্রীতির বিষ পান করিয়া মানব আত্মা যে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় মানুষের নিজের নিকটে।

অশিক্ষার বা কুশিক্ষার আর একদিক্ দিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ বিপ্লবে এবং ব্যক্তিগত দুর্নীতিক আচরণে। একটী জাতির মধ্যে বা সমাজের মধ্যে ঐ সমস্ত অনাচার ও জানাইয়া দেয় যে শিক্ষায় সুফল হইতেছে না। সূর্য্য যেমন ভাস্বর দীপ্তিতে সমস্ত জগতকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তেমনি শিক্ষাও একদিকেও সত্য হইলে তাহা সমগ্রকে লইয়া পরিণতির পথে চলে।

প্রাকৃতিক উপদ্রব ব্যতীত শিক্ষিতের সমাজে ব্যথিতের বাহুল্য থাকিবে না, অনাথ আখ্যাটী অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে, ভিক্ষুকের সংখ্যা বিরল হইবে, দুর্নীতি নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, আর কমিয়া আসিবে জাতিগত রাষ্ট্রগত বিদ্বেষ বিপ্লব, দানবের মত হানাহানি ও শ্বাপদের মত শোণিত শোষণ।

মানবেরও আত্মা কাঁদিতেছে "মলাম ভুতের ব্যাগার খেটে।" তাই আজ মানুষের এত অসন্তোষ অশান্তি! ঐশ্বর্য্যে রত্নে বিলাসে আরামে মানে সম্ভ্রমে সমস্ত সুখ সুবিধায় তাহার প্রাণটার কিছুতেই স্বস্তি আসিতেছে না।

ইহাই শিক্ষার বৈকল্য।

আজ সংসার সমাজ জাতি জগৎ দেখিয়া কেবলই বেদনা জাগে, মনে হয়—

"এমন মানব জমি রইল পড়ে
আবাদ কল্লে ফলত সোনা।"

হারা-মাণিক

[শ্রীবিরজা সুন্দরী দেবী]

কে রে! কে তুই? পথিক শিশু তুই কোত্থেকে এলি! ওরে, কে তুই এমন ক'রে মা ব'লে আমায় অধীর করলি! মা ডাকত অনেক শুনেছি; দিন রাত ভিকিরি, মুটে, পথিক, ফেরি-ওয়ালার মুখে তো কত মা ডাকই শুনেছি, পরের ছেলের মা ডাকও অনেক শুন্‌লেম, পেটের ছেলের মা ডাকও শুনি। এমন ডাক যেন আর কোন দিন শুনিনি। এতো ডাক নয়, এ যেন একখানা বিদ্যুতের ছুরি, এ যেন সাপের বিষ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণের গভীর গোপনতম প্রদেশের শেষ সীমায় ঘা হেনে আমার মন প্রাণ দেহ বিষের ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেল্লে। আর, সেখানে ঘা মারা কি সোজা কথা? যেখানে স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্যের রস, শোক, দুঃখ দারিদ্র্যের উত্তাপে শুকিয়ে স্তরে স্তরে দানা বেঁধে পাষাণ স্তূপে পরিণত হ'য়েছে, শুধু একটী আঁখরের শব্দ ঝঙ্কারে সেই পাষাণ বক্ষ ভেদ ক'রে রসের ধারা বাইরে আনা, সে কি সোজা কথা? তোর এ নিরস্ত্র গোপন অস্ত্রাঘাত যে আমি সইতে পারছিনে বাপ!

শুনেছি, নিতাইএর মুখের আনন্দ-বিগলিত মধুর হরিনাম যে শুনত, সেই প্রেমানন্দে পাগল হয়ে যেত, কিন্তু সে যে শোনা কথা, তা'তো বাস্তব জীবনে কখনও ভোগ ক'রে জানিনি, কেবল শুনি, কেবল জীবন ভ'রে শুনেই আস্‌ছি কিন্তু আজ যেন তা একটু অনুভব করতে পাচ্ছি।

তুই আমার কে? তুই না পথিক? তুই না অতিথি? তবে তুই কি অধিকারে এমন ক'রে আমার কোলে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লি? আমিত তোকে কিছুই ইচ্ছা ক'রে দিই নাই! তুই কেন ডাকাতি ক'রে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলি! সত্যি কি তুই ডাকাত? হাঁরে চঞ্চল শিশু! আবার সমস্ত কেড়ে নিয়ে তুই আবার পালাবি না কি? না, না বাপ, আর পালাতে পারবি নে, যে আপনা হ'তে ধরা দেয় সে ডাকাত হ'তে পারে, পালাতে পারে না। যে বাঁধন-হারাকে সারা বিশ্ব কেউ বাঁধতে পারে নি সে আমার খাঁচার শিকল সাধ করে আনন্দ ক'রে আপনি পায় পড়েছে।

হাঁরে বাছা! তুই যে এলি, তোকে এখানে পাঠালে কে? কোন্ শক্তির প্রেরণায় এ কাঙালের কুটীর দ্বারে স্নেহের কাঙালী সেজে "আমায় একটু

কোলে নেমা" ব'লে এসে দাঁড়ালি! এখানে তো তোর আসবার কারণ কিছুই ছিল না। তবে কে পাঠালে তোকে! কেন এলি তুই?

তুই যদি আমার কেউ ন'স, তবে তোর ঐ স্বরটা চির পরিচিত চেনা-স্বরের মত লাগ্‌ছে কেন? এ স্বর যেন আরো অনেক শুনেছি, যেন কোন্ হারা-দেশে আজ এই স্বরের সুরটা যেন আধ-ভোলা স্বপনের স্মৃতি, আবছায়ার মত আমার কানে, প্রাণে কেবলি বেজে উঠ্‌ছে, এ স্বর যেন আমারি কোন্ হারা-কণ্ঠের।

তবে কি তুই আমার ছিলি? নিশ্চয় আমার ছিলি, তাই আজ কত জন্মের সাধনার পর, কত জন্মের খুঁজে বেড়ানোর পর, আবার সেই হারা-ধন হারা-মাণিক কোলে পেয়েছি। হায়! আমারি অসাবধানে, অনাদরে, অযত্নে আমার কোলের শোভা, বক্ষের গৌরব, কণ্ঠের মালা, চোখের মণি, অন্ধের যষ্টি, হারিয়ে ফেলেছিলুম, যখন বুঝ্‌তে পেরেছি তখন থেকেই কেঁদে বেড়াচ্ছি। কত বনে বনে, জঙ্গলে জঙ্গলে, গাছের আড়ালে, পর্ব্বত কন্দরে, ঝরণার ধারে, সমুদ্র সৈকতে, নদীর তরঙ্গে, জোছ্‌না ভরা আকাশে, গৃহস্থের ঘরে খুঁজে বেড়িয়েও আর তোকে পাইনি।

এতদিনে ভগবানের বুকে ঘা লেগেছে আর কত কাঁদাবেন আমাকে তাই আজ এ কাঙ্গালীর ধন কাঙ্গালিনীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার তোর সকল মলিনতা ধুয়ে মুছে উজ্জ্বলতর ক'রে পাঠিয়েছেন, তোর ঐ উজ্জ্বলতা দিয়ে এ আঁধার ঘর আঁধার হৃদয়কে উজ্জ্বল ক'রে দিতে। এ ঘরের প্রত্যেকটীর প্রাণের ব্যথা মুছিয়ে সকলের উদাস প্রাণে ঘরের মায়া ঘনিয়ে দিতে। আমি যে কত কেঁদেছি তাঁর কাছে, এ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য পীড়িত ঘনতিমিরাচ্ছন্ন ঘরখানাতে একটু শান্তির স্নিগ্ধ আলো দিতে, কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাইনি যখন, তখন শান্তিহারা বেদনাক্লিষ্ট বুকে চেয়েছি দুঃখ যাতনা সইবার মত শক্তি। দুঃখে যেন নুয়ে না পড়ি, ভেঙ্গে না পড়ি, দুঃখেও যেন মাথা উঁচু করেই সইতে পারি প্রভু! দুঃখ কষ্টকেও তোমার দান ব'লে যেন গ্রহণ কর্ত্তে পারি। কৈ! তিনি সইবার মত শক্তি দিলেন কৈ! তাঁর কাছ থেকে শক্তি পেলে প্রাণে প্রাণে অভাবটা এত অনুভব করতেম না। ভিতরে ভিতরে দিনরাত এত হাহাকার থাকৃত না। আমার ভিতর চেয়ে যখন আমি দেখ্‌তে পেয়েছি। আমার দুঃখটা যদিও সব সময় সাড়া দিচ্ছে না, তবু যেন কেমন জমাট বেঁধে রয়েছে, আর সেই জমাট দুঃখটার ভিতর থেকে একটা উত্তপ্ত ধোঁয়া উঠে সর্ব্বদা আমায় মলিন ক'রে রেখেছে। তখনি বুঝেছি তিনি আমায় সইবার শক্তি দেন নি।

এতদিন পর আজ তোর মুখ দিয়ে তিনি তাঁর অভয়বাণী পাঠায়েছেন ; সত্যি তুই তাঁর দক্ষিণ হস্তের শ্রেষ্ঠ দান, তাই এত সুন্দর, এত মধুর, শিশুর মত সরল, পবিত্র। সামান্য সাধনায় তাঁর হাতের দান মিলে না ; তিনি দীন-বন্ধু হলেও আমরা দুঃখে যখন বড় অধীর হই তখন তাঁকে বড় কঠিন ব'লে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তিনি কঠিন নন্ তাঁর অসীম দয়া, তিনি সর্ব্বদা মানুষের মন দেখেন, তাই এতদিন পর যদি বা আমার ধন আমার কোলে দিলেন, আমায় পরীক্ষা করবার জন্য বাঁকা পথ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছেন। আচ্ছা, তাতে ভয় কি ? দুর্গম ব'লে ন্যায়ের পথ থেকে আমি সরে দাঁড়াব, আর তিনি হাস্‌বেন! তা হবে না, আমি তাঁর সোহাগের দণ্ড, গৌরবের দান বলে মাথায় ক'রে নেব। মানুষকে কাঁদিয়ে, ঠকিয়ে বঞ্চিত ক'রে, তাঁর যে আনন্দ আজ তাঁকে বঞ্চিত করবো সে আনন্দ থেকে। আর ফাঁকি দিতে পারবে না আমায়। আমি কাঞ্চন চিনেছি আর কাচের চাকচিক্যে ভুল্‌ব না। আজ আপন ঘরেই আমি সব পেয়েছি আর পরের ঘরে যাব না।

মানুষের আশা আকাজ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, সে যত পায় ততই চায়। আজ যে এত পেলুম তবু আবার প্রার্থনা কচ্ছি, ওগো দয়াল ঠাকুর! আমি তোমার দান আর অবহেলা করবো না, তুমিও বারবার আর এমন করে আমার বুকের ধনগুলি কেড়ে নিয়ে আমায় কাঁদিয়ো না। তুমিত আমায় দান করতে কখনও কার্পণ্য করনি, এমন, সেরাধন দিয়েছ যা দেখে মানুষ আমায় হিংসা করেছে আবার জানি না কি অপরাধ পেয়েছ আর অমনি তোমার জিনিস তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমার বুকে অনেক দাগা দিয়েছ, আর দিওনা প্রভু! এবার বুকের দাগগুলি ঢেকে দিতে যে আবরণ ও আভরণ দিয়েছ তা আর কেড়ে নিয়ে উন্মাদ করে দিয়ো না আমায়—দীর্ঘ অতি দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর অপূর্ব্ব মিলনানন্দ নিয়ে বুকের ধন বুকে রেখেই যেন যেতে পারি।

ওরে দুষ্টু চপল! তুই অভিমান করে মাকে কষ্ট দিবি বলে সেই যে পালিয়েছিলি, কিন্তু তুই কি কম কষ্ট পেয়েছিস্ আমার জন্য! কত দেশ বিদেশেই না ঘুরে বেড়িয়েছিস, কত দাগা, কত ব্যথাই না পেয়েছিস্ প্রাণে, এই ঘর এই হারা মা মাসীমা, ভাই বোনদেরে পেতে। আজ কি সে পথ খোঁজা শেষ হয়েছে আহা! বড় যাতনা বড় ব্যথা পেয়েছিস বাপ্, বড় পরিশ্রান্ত হয়েছিস্, আয় বাছা আমার তোকে বুকে জড়িয়ে ধরি আজ দুটী পোড়া

বুকে বুক মিশিয়ে "বিযে বিযে অমৃত" করে দিই। আঃ, তোকে বুকে নিয়ে বুকটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাপ! তোর এ স্নিগ্ধ পরশের আনন্দ স্পন্দনে আমার বুকটা যে কেবলি কাঁপছে আর ভয় হচ্ছে আবার যদি তোকে হারাতে হয়, আবার যদি তুই পালিয়ে যাস্! না না আর পালাস্‌নে বাপ, পালাস্‌নে! ওরে পলাতক শিশু তুই যে কেবল পালানোর চেষ্টাতেই আছিস্। তুই যে ভাগ্যবতী বা দুর্ভাগ্যবতীর গর্ভে জন্মেছিলি তিনি যে তোর "দৈবকী" মা, কেবল পেটে ধরে দুঃখ ক'রেই গেলেন, তিনি যে এমন জিনিস পেয়ে তা হারালেন, তার কারণ তিনি বুঝি আর জন্মে তোর কৈকেয়ী মা ছিলেন রে! সেবার তিনি তোকে বনে না পাঠালে আজ এই হারানো বনবাসী ছেলের ভাগ্যবতী যশোদা মা হ'য়ে আমি তোকে কোলে পেতুম না। আজ কি আনন্দে কি গৌরবে যে আমার বুক ভ'রে উঠেছে তা আমিই জানি। আজ যে জগতের সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী রাজরাজেশ্বরী মা তোর আমি।

বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

গুজরাতী, আরাবী, উড়িয়া, বাংলা, আসামী, মৈথিলী এবং হিন্দীভাষা সমূহ।

সুদূর গুজরাত এবং মারাঠা দেশের ভাষার সঙ্গে বাংলার কোনও কোনও বিষয়ে চমৎকার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ইহার কোনও ঐতিহাসিক কারণ আছে কি না—সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসুর পথে এমন একটি সুন্দর বিষয় আর নাই।

উড়িয়া, আসামী ও মৈথিলীর প্রাচীন আকার আদি বাংলা ভাষার প্রায় সমতুল্য। মৈথিলীর সহিত হিন্দীর যতটা অসাদৃশ্য, তদপেক্ষা বাংলার সহিত সাদৃশ্য অনেক বেশী। বিহারের ভাষা হিন্দী নয়, কিন্তু হিন্দী-প্রচারিণী সভার প্রভাবে বিহারীরা হিন্দীর দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন। বিদ্যাপতি, মৈথিলী ভাষায় কাব্য রচনা করিলেও, তাঁহাকে বাঙালীরা নিজেদের কবি বলিয়া পূজা করে।

হিন্দী ভাষার ধরণ-ধারণ বাংলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বাক্যবিন্যাসরীতি এবং উচ্চারণপদ্ধতি এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ দেয়।

উর্দ্দু হিন্দী হইতে বিভিন্ন ভাষা নয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে আসামী-ভাষা আদিতে বাংলার একটি উপভাষা ছিল। যদি দুই ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তবুও এ সম্বন্ধে আরও নিশ্চয় প্রমাণ আবশ্যক। আসামী লিপিমালা বাংলারই মত।

এই সকল ভাষার মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক বলে—ইহা লইয়া একটু বিবাদ আছে। অনেকে বলেন হিন্দীই প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু হিন্দী বলিতে তাঁহারা যে সমস্ত স্থানের ভাষাকে ধরেন—তৎসম্বন্ধে একটু বিচার আবশ্যক। বিহারে কথিত হিন্দী এবং দিল্লীতে কথিত হিন্দীর মধ্যে যে তফাৎ আছে, তাহা বাংলা এবং উড়িয়াতেও নাই। এই পূরবী হিন্দী ও পশ্চিমী হিন্দীকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিলেই চলে। একটি বিহারের লোককে দিল্লীর লোকের ভাষা বুঝিতে বেগ পাইতে হয়। এ ভাবে বিচার করিলে হিন্দীর চেয়ে বাংলা ভাষাই অধিকসংখ্যক লোক বলে।

কত লোক কোন ভাষা বলে, কোথায় কোন্ ভাষা কথিত হয় এবং প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন কি আছে—তাহার পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল :—

(১) বাংলা :—(i) ৪৫,০০০,০০০

(ii) বঙ্গদেশ (দার্জ্জিলিঙ্ ব্যতীত), শ্রীহট্ট, মানভূম, সিংহভূম।

(iii) চণ্ডীদাসের কবিতা, খৃঃ ১৫ শতক।

(২) হিন্দী :—(i) পূরবী—২২,০০০,০০০; পশ্চিমী—৪০,০০০,০০০

(ii) অযোধ্যা, আগ্রা, বান্দেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, ছোট নাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশ। হিমালয় হইতে যমুনা উপত্যকা, পাঞ্জাব হইতে এলাহাবাদ।

(iii) মালিক মহম্মদের "পদ্মাবতী" ১৫৪০ খৃঃ
তুলসীদাস "রামায়ণ"—১৬০০ খৃঃ
সাহিত্য খৃষ্টীয়-ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ—

(৩) মারাঠী—(i) ১৮,০০০,০০০

(ii) দাক্ষিণাত্য উপত্যকার উত্তরভাগ, পশ্চিমঘাট গিরিমালা ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, বেরার, নিজামের রাজ্যের কিয়দংশ, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগ।

(iii) নামদেব এবং জ্ঞানোবা (Dnyanoba) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ—

(৪) উড়িয়া—(i) ১০,০০০,০০০

(ii) উড়িষ্যা, সম্বলপুর, মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের কিয়দংশ, গঞ্জাম এবং ভিজাগাপটম্।

(iii) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একখানি অনুশাসন সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

(৫) আসামী—(i) ১,০০০,০০০

(ii) আসাম

(iii) ঐতিহাসিক রেকর্ড প্রায় ছয়শত বৎসরের পুরাতন হইবে।

শ্রীশঙ্করদেবের কবিতা ৪৫০ বৎসর আগেকার।

(৬) মৈথিলী—(i) ৩৫,০০০,০০০
(বিহারী) (প্রকৃত মৈথিলীভাষী—১০,০০০,০০০

(ii) বিহার, যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বভাগ, ছোটনাগপুরের কতক অংশ।

(iii) বিদ্যাপতি, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী—

(৭) গুজরাতী—(i) ১০,০০০,০০০

(ii) গুজরাত

(iii) নরসিংহ মেহ্‌তা-খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী—

বাঙালী জাতি

বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন এবং আধুনিক বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যের আলোচনা দরকার। নৃতত্ত্ব (Anthropology), জাতিতত্ত্ব (Ethnology) এবং প্রাগৈতিহাসিক

ইতিহাসের (Pre-historic History) সাক্ষ্য প্রমাণ এই সম্পর্কে উপস্থাপিত করা উচিত।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি জাতি অনুসারে ভাষার একতা হইতেই হইবে, এমন নয়। কিন্তু জাতির বৈশিষ্ট্য:ধারা (racial genius) ভাষার বাক্য-বিন্যাস রীতির (Syntax) মধ্যে থাকিয়া যায়। আমেরিকার নিগ্রোয়া ইংরেজী বলে বটে, কিন্তু প্রতি বাক্যের ভিতর নিগ্রো জাতির চিন্তার ধরণ সহজেই ধরা যায়। বাঙালী জাতি সম্বন্ধেও তাই। বাঙালীরাও আর্য্যভাষা বলে, কিন্তু ভাষার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে তাহাদের অনার্য্য-সম্ভবতার পরিচয় দেয়। একটি আর্য্যভাষা মূলত এক অনার্য্য জাতির মুখে পড়িয়া যে পরিণতি লাভ করে বাংলা ভাষার পরিণতির ইতিহাস তাই।

বাংলার তথা-কথিত উচ্চজাতি সমূহ সমগ্র লোক সংখ্যার অনুপাতে নগণ্য বলিলেই হয়; যদিও ইহাঁরাই দেশের মস্তিস্ক স্বরূপ (intelligentia) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থের সংখ্যা শত করা ১৩ জন মাত্র। ইহার মধ্যে কায়স্থদের বিষয়ে একটু গোলমাল আছে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ কতকটা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন হইলেই নীচুকায়স্থের দলে মিশিয়া যায়। "অস্পৃশ্য' জাতি (untouchables) যাহাদিগকে বলা হয়, তাহারাই লোক সংখ্যায় অধিকাংশ। শতকরা ৫৬ জন এই দলে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ ব্যতীত আর কেহই আর্য্য বংশজাত বলিয়া দাবী করে না। অর্থাৎ শতকরা ৮৭ জন নিজেদের আর্য্য বলে না, কিম্বা বলিলেও তাহাদের আর্য্যত্ব স্বীকৃত হয় না। কায়স্থদিগকে তো এখনও সৎশূদ্র বলা হয়। প্রাচীনকালে উচ্চ জাতিগণের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ খুবই চলিয়াছিল এখনও বৈদ্য এবং কায়স্থের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে বিবাহ প্রথা চলিত আছে। নিম্নশ্রেণীর সহিত অবৈধ রক্ত সংমিশ্রণ এখনও সমাজে যথেষ্ট চলিয়া থাকে। আর্য্য বংশের ধুরন্ধর বাংলার ব্রাহ্মণকেও খাঁটি ব্রাহ্মণ বলিয়া অন্যদেশের ব্রাহ্মণেরা মানেন না।

বাংলার মুসলমান অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ হইতে শেষ অবস্থায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর্য্যবংশ সম্ভূত মুসলমান কিছু কিছু পরবর্ত্তীকালে এদেশে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু মোটামুটি ধরিলে বাংলাদেশে আর্য্য-সভ্যতার ধারা আসিলেও আর্য্যরক্তসম্ভূত বিশেষ কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। ভাষাতত্ত্বের সাক্ষ্য হইতেও বাংলীর অনার্য্য-সম্ভবতা প্রমাণ হয়। বাংলা-বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতি অনার্য্য-ভাষার অনুযায়ী নয়। দ্রাবিড়, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং অন্যান্য

অনার্য্য-ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় রহিয়াছে। সাধারণ অশিক্ষিত লোকের ভাষা এই সমস্ত শব্দে পূর্ণ।

বহির্ভারত (farther India), দক্ষিণভারত এবং সিংহল দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপন এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেই সব দেশের সভ্যতার নিদর্শন হইতে বাঙ্গালীর ইতিহাস উদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে। শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বঙ্গ-ভাষার ইতিহাস নামক ইংরেজী পুস্তকে এ সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। জাতিতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের সাক্ষ্য হইতেও বাঙালীর অনার্য্যত্বের প্রমাণ মিলে। বাংলার ধর্ম্ম-সাধনা, দৈনন্দিন রীতিনীতি এবং জাতীয় অনুষ্ঠানাদির ভিতর দ্রাবিড় মঙ্গোলীয় সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়।

বাঙ্গলা ভাষা

আদিম ইন্দো-আর্য্যভাষা যুগযুগান্তরের রূপান্তরের মধ্য দিয়া আমাদিগের আর্য্য-চলিত ভাষাগুলিকে দান করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা শুধু বাঙ্‌লা ভাষা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বিশিষ্টভাবে আলোচনা করিব।

ভাষাতত্ত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইন্দো-আর্য্য-ভাষা অবাধ-সহজ পরিণতিতে যে আকার ধারণ করিত, বাংলার সে আকার নয়। পরিণতির মুখে এমন কিছু প্রভাব কার্য্য করিয়াছে যাহাতে ইহার বিকাশ-ধারা ভিন্ন পথে গমন করিয়াছে এবং ইহাকে অন্যরূপ দিয়াছে। মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বাঙালীজাতির অনার্য্যত্ব যে ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাহা বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজী আর্য্যভাষা হইয়াও অনার্য্য আমেরিকান নিগ্রোর মুখে কিরূপ আকার পাইয়াছে। বাংলাও সেইরূপ ইন্দো-আর্য্যভাষা হইলেও মূলতঃ অনার্য্য এক জাতির মুখে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

এই দিক হইতে বিচার করিলে বাংলাভাষা মোটেই আধুনিক নয়। ইহার কতকগুলি বাক্যগঠন-প্রণালী (constructions) এবং আটপৌরে শব্দ সুদূর অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে। পালি, প্রাকৃতের মধ্যেও অনুরূপ প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল ভাষা হইতে আবার অনেক শব্দ কালক্রমে সংস্কৃত আকার ধারণ করিয়াছে।

সংস্কৃত অথবা নাটকে ব্যবহৃত কৃত্রিমতাপূর্ণ প্রাকৃত ভাষাসমূহ হইতে বাংলা

ভাষার উৎপত্তি খুঁজিলে হইবে না। পানিণি যেমন সংস্কৃত ভাষাকে ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধিয়া তাহাকে আকারের স্থিরতা প্রদান করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সেইরূপ প্রাকৃত ভাষাগুলিকে করিয়াছিলেন। শিশিতে ইস্পিরিটের ভিতর একটি সুন্দর প্রাণীকে রক্ষা করিলে যে অবস্থা হয়, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল—দেহটা সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল।

বাংলাভাষার কতকগুলি আকার প্রকারের সহিত সাদৃশ্য প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মসমূহ হইতে আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু এগুলি প্রায়ই দৈবঘটনামূলক। উচ্চারণ-পদ্ধতি হইতেই কেবল আদি-যোগাযোগ প্রমাণ হয়। বাক্যবিন্যাস-রীতি (Syntax), শব্দসমূহ (Vocabulary), উচ্চারণ-পদ্ধতি (Accent), ছন্দোবন্ধ (Metre)—সমস্তগুলি একসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কোনও কৃত্রিম প্রাকৃতের সহিত হয়তো কতকগুলি বাংলা অক্ষরের উচ্চারণ সাদৃশ্য থাকিতে পারে—কিন্তু শুধু এইটুকু হইলেই হইবে না। অন্যান্য বিভাগেও প্রমাণ আবশ্যক। অপভ্রংশ ভাষার ভিতর অনুসন্ধান করিলে অনেক তথ্য মিলিতে পারে—কারণ অপভ্রংশের মধ্যে তৎকালের কথিত ভাষার নিদর্শন অনেক রহিয়া গিয়াছে এবং এই কথিত ভাষা হইতেই বাংলার মূল সুরু হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত নাটক সমূহের কৃত্রিম অপভ্রংশের কথা এ স্থলে লক্ষ্য করা হইতেছে না—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

যে কথিত অপভ্রংশের বংশধর বাংলা সেই ভাষার লিখিত নিদর্শন খুব কমই আছে। সেই ভাষার স্বরূপ সংগ্রহ করিতে হইলে যে সমস্ত source আছে তাহা হইতে খুব বিচারপুর্ব্বক উপাদান গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীনতম অবস্থার আলোচনা করিলে আদিরূপ সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক প্রভৃতি ভাষা হইতে যেমন মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আকার নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইতেছে—সেই লাইনে আমাদের অনুসন্ধানও চলিতে পারে।

পতিতার সিদ্ধি।

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৪৪)

শুভার মা কলতলায় কাপড় কাচিতেছিল, সরি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাখুর পরিচর্য্যা করিয়া সে সেখানে আসিয়াছে। আসিয়াছে 'ঠাকুর মা' সেখানে আছে জানিয়া, তার মায়ের অন্বেষণ করিতে। 'ঠাকুরমা'কে সে রাখুর সঙ্গে মা'য়ের অভিনব সম্বন্ধের কথা শুনাইবে। উভয়েই তাহারা মধু-ঠাকুরের পক্ষপাতী ছিল। তার ছিল একটু মেয়েলি স্বভাব। মেয়েদের মাঝখানে একবার বসিতে পাইলে গল্পগুজবে এমন মগ্ন হইত যে কর্ত্তব্যের কথা একরূপ তার মনেই থাকিত না। সরি, শুভার মার সে সব গল্প বড় ভাল লাগিত। এমন কি সময়ে সময়ে উভয়েই তার মিথ্যা গল্প স্রোতে ভাসিয়া যাইত। তাহারাও আপন আপন কর্ত্তব্য ভুলিত। এই দোষের জন্য নির্ম্মলা ব্রজেন্দ্রকে বলিয়া মধুঠাকুরকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

মুখচোরা রাখু শুধু নিজের কর্ত্তব্যটি করিয়া যাইত, কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে দুই একটা হাঁ হুঁ ছাড়া অনেক সময়েই বেশী কোনও উত্তর পাইত না।

আজ তাহারা উভয়েই রাখুকে নির্ম্মলার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিতে দেখিয়াছে। রাখুর বিরুদ্ধে পূর্ব্বে তাহাদের বলিবার কিছু না থাকিলেও চিত্তের দুর্ব্বলতায় মধু ঠাকুরের কর্ম্মচ্যুতিতে নির্ম্মলার উপর তাহারা সন্তুষ্ট ছিল না। উভয়েই, বিশেষতঃ সরি রাখুর একটু আধটু দোষ দেখিতে পাইলেই যেন গোটা দুই নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

আজ যেন সে দোষ দেখিতে পাইবার মত হইয়াছে। তবে নির্ম্মলার নির্জ্জনালাপ শুভার ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত বুঝিয়া, শুভার মা ও সরি অনেকক্ষণ যে যার কাছে মন খুলিয়া কথা বলিবার সুবিধা পায় নাই।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক কথাতেই সরি শুভার মার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, বুঝিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সঙ্কীর্ণ মন রাখুর সঙ্গে নির্ম্মলার এই 'বাড়াবাড়ি রকমের' আত্মীয়তা প্রদর্শন শুধু যে শুভারই কল্যাণের জন্য, এটা তাহাদের বুঝিতে দিল না।

ইহার পূর্ব্বে সরি দুই একবার ঠারে ঠোরে শুভার মাকে দুই এক কথা শুনাইয়াছে। এখন বলিবার মত কথা পাইয়া বলিবার জন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে।

শুভার মা নির্ম্মলার কার্য্যগুলা প্রথমে কুভাবে গ্রহণ করে নাই, পরে কুভাবে গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু অল্পবুদ্ধি, শুভার নাকের চিন্তায় মস্তিক চাঞ্চল্যে সরির কথার কৌশলে অল্পে অল্পে সন্দেহগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

কলতলায় প্রবেশ করিয়াই সরি চলিয়া যাইবার ভান দেখাইল।

"কিরে সরি?"

"এমন কিছু নয় ঠাকুর মা!"

"তবে হম্‌কো ধম্‌কো হয়ে এলিই বা কেন, আবার ব্যস্ত হয়ে চলবিই বা কেন?"

"আমি জানতুম, এতক্ষণ তুমি কাপড় কাচা সেরে ঘরে চলে গেছ?"

"কাকে খুঁজছিস্?"

"পুরুত ঠাকুরের দিদিকে।" বলিয়াই সরি মুচকিয়া হাসিল।

"দিদি কেলো?" শুভার মাও হাসিল।

এই কথাটি শুনিয়াই নির্ম্মলা চলিয়া গিয়াছে; পাছে কোন অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয়।

সরি বলিল—"কেন, মা।"

"তোর মা আবার ও বামুনের দিদি হল কবে?"

"তা কেমন করে বলব ঠাকুর মা! তামাক জল দিতে গিয়েছিলুম। ঠাকুর বললে সরো, একবার দিদিকে ডেকে দাও। শুভাদিদি মনে করে বললুম, তার অসুখ। শুনে ঠাকুর বললে, সে নয়, গিন্নী।"

শুভার মা মুখে অসম্ভব গম্ভীরতা মাখিয়া সরির মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"ব্যাপার কি ঠাকুর মা!"

এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল সে সব প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, সে কথা স্বকর্ণে শুনিলে নির্ম্মলা মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারিত না। তাহাতে তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ ছিল। আর শুভার সঙ্গে রাখুর বিবাহের কথাটা একবারেই যে শুভার কল্যাণের জন্য নয় এটা, কিছুক্ষণের কথাবার্ত্তার পরেই শুভার মা, সরি উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল।

রাখুকে বিদায় দিয়াও যখন নির্ম্মলা দেখিল ইহাদের গোপন কথোপকথনের নিবৃত্তি হয় নাই, তখন তাহাদের চমক ভাঙাইতে নীচের বারান্দা হইতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল —"নালু।"

ইহাদের চমক ভাঙিল। দুইজনকে একত্র দেখিতে পাইবার ভয়ে সরি বাহিরের দিকে চলিয়া গেল, শুভার মা চলিল, যেখান হইতে নির্ম্মলা নালুকে ডাকিয়াছে।

নিকটে আসিতেই নির্ম্মলা খাশুড়ীর মুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল— "নালু কি এখনও বাড়ী আসে নি মা।"

"এসেছিল, আমি তাকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি।"

"বেশ করেছ মা, শুভার একটু জর হয়েছে, নাকও একটু ফুলেছে। তবে আমার মনে কোনও ভয় হচ্ছে না। সাধু ব্রাহ্মণ, মনটা অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়েছে, অন্যমনস্কের আঘাত, শুভার অকল্যাণ হ'তেই পারে না।"

"তাই বল মা, আইবড় মেয়ে আমি ভয়েই মরছি।"

"কতক্ষণ নালু গেছে?"

"অনেকক্ষণ ত পাঠিয়েছি। এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।"

"বোধহয় ডাক্তারবাবুকে দেখতে পায়নি।"

ঠিক এমনি সময়ে নালু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—"কইরে নালু, ডাক্তারবাবু?"

নালু দূর হইতে শুধু মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে ডাক্তারের না আসা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। পূর্ব্বে তার মা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, ডাক্তার আনার কথা পুরুত মশাই কিছুতেই যেন জানিতে না পারে। সে জানে পুরুত মশাই তার পড়িবার ঘরে এখনও অবস্থিতি করিতেছে।

নির্ম্মলা সেটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—"অমন ভূতের মত ঘাড় নাড়তে হবে না, কি হয়েছে চেঁচিয়ে বল্।"

"ডাক্তার বাবু বললেন, আজ আর আসবার দরকার নেই, কাল সকালে যাব?"

শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"জরের কথা বলেছিলি ভাই?"

"বলেছিলুম।"

নির্ম্মলা বলিল —"নাক ফোলার কথা?"

"সব বলেছি। তিনি বল্লেন, আমি ভাল ক'রে এক্জামিন ক'রে দেখেছি,

কোনও ভয় নেই। ওই অষুধ আর বার পাঁচ সাত লাগিয়ে দাও, জরও যাবে, ফোলাও থাকবে না। যদি কাল সকালে পর্য্যন্ত জর থাকে, আমাকে খবর দিয়ো?"

"ওপরে খাবার রেখেছি, খেয়ে পড়তে বস নালুবাবু! সারাদিন পড়া শুনা হয়নি বাবু এসে যদি শোনেন রাগ করবেন।"

পড়িবার ব্যস্ততায় না হউক, ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যস্ততায় নালুবাবু উপরে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা এই বারে খাশুড়ীকে বলিল—"তুমি মা শুভার কাছে খানিক-ক্ষণ থাক, পুঁটিকে তার কাছে রেখে এসেছি, কিছুতেই এলো না সে, তাকে জালাতন না করে।"

এমনি সময়ে সরি সেখানে উপস্থিত হইল। দূর হইতে দেখিল যে দুইজনে কথা কহিতেছে। তখন, কাজে যেন কতই ব্যস্ত, নিকটে আসিয়া উভয়কেই যেন লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আজ রাত্রে কি আমাদের আর কারও খাওয়া দাওয়া নেই গা।"

"তাই ত বৌমা, হতভাগা মেয়েটার ভাবনায় ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুত মশাই রয়েছেন, রাঁধুনি ত আজ আর এলো না, রাত্রে তাঁর খাবার ব্যবস্থা কি করব?"

"তিনি ত চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন!"

বিস্মিতা সরি বলিয়া উঠিল—"এই ত একটু আগে তোমাকে ডেকে দিতে বল্লেন দেখা করেই চলে গেছেন!"

শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গেলেন?"

"দেশে।"

"রইলেন না?"

"কই রইলেন—রাখ্‌বার চেষ্টা করেছিলুম! তোমরা জাননা, শুভার সম্বন্ধ উপলক্ষ ক'রে, তাঁকে মায়ের পেটের ভাই ব'লে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ পাতিয়েছিলুম—কিছুতেই রাখতে পারলুম না।"

পুঁটি উপরে কাঁদিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে শুভার ক্ষীণকণ্ঠ সকলের কাণে গেল—"বৌদি, পুঁটী থাকছে না।"

"তুমি ওপরে যাও মা।" বলিয়া নির্ম্মলা কাপড় কাচিতে চলিয়া গেল।

শুভার মা ও সরি যে যার মুখের পানে কিছুক্ষণ প্রাণহীনের মত চাহিয়া রহিল।

"ধিক্ তোরে সরি !"

"তুমিও ত কম বলনি ঠাকুরমা।"

(৪৫)

ইহার মধ্যে হেমচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া কখন যে রাখুকে ঘরের মধ্যে দেখিয়া গিয়াছে, তাহা বাড়ীর ভিতরের একটি প্রাণীও জানিতে পারে নাই। হেমা শুধু রাখুকে দেখিল না, দেখিল সে সেই সঙ্গে তার প্রভুপত্নীকে। দু'জনে নির্জ্জনে, সকলকে লুকাইয়া কি যেন রহস্যালাপ করিতেছে। তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অসদ্‌বুদ্ধি চাকর উভয়ের এ নির্জন মিলনের সদুদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে পারিল না। পূর্ব্ব হইতেই রাখুর উপর এ হতভাগ্যের কেমন করিয়া একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। এই বিদ্বেষ-বশেই, উভয়কে একঘরে দেখিবামাত্র, সে যেন তাহাদের নির্জনালাপের কথাগুলা শুনিতে পাইল। তাহাদের হাসিও তাহার কাণ দুটাকে ফাঁকি দিয়া ঘরের বাতাসে মিলাইতে পারিল না।

সে আসিয়াছিল, প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, প্রভুপত্নীকে দুই এক কথা বলিতে। বলিতে চারুর তখনও পর্য্যন্ত ঘরে না ফিরিয়া আসার কথা। সুতরাং বাবুর যদি আসিতে বিলম্ব হয়, অথবা রাত্রে না আসা হয়, নির্ম্মলা যেন তার জন্য চিন্তা অথবা আহারাদির অপেক্ষা না করে।

হেমার আর নির্ম্মলার সঙ্গে সাক্ষাতের ধৈর্য্য রহিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া এমন সন্তর্পণে সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল যে, কাকপক্ষীটি পর্য্যন্ত তার আসার কথা জানিতে পারিল না।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সদর রাস্তায় পা দিয়াই সে একরূপ ছুটিল। চারুর বাড়ীর দোরের কাছে যখন সে উপস্থিত হইল, তখন ব্রজেন্দ্র, চারু আর ফিরিবে না বুঝিয়া, তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যাহা করিতে হয় করিয়া, ভবিষ্যতে যাহা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে দরজার বাহিরে সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছে। সম্মুখে গাড়ী, উঠিবে এমন সময় সে হেমাকে দেখিতে পাইল।

হেমার মুখের ভাব ও ব্যস্ততা এবং শীঘ্র তার ফিরিয়া আসা—দেখার সঙ্গে ব্রজেন্দ্রের মনটা সহসা সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বুদ্ধিমান সে—পাছে হেমা পথের মাঝে সকলের সম্মুখেই এমন কোনও কথা বলিয়া ফেলে, যাহা সে ছাড়া আর কাহারও কর্ণগোচর হওয়া উচিত নয়, তাই একটা জিনিস ভুলিয়া আসার অছিলা করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে আবার প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বাড়ী হইতে তাহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাহিরের

কেহ চারু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিতে পারে। জানিতে পারিলে সেই অভাগিনীর পল্লীতে হঠাৎ এমন একটা গোলোযোগ উপস্থিত হইবে, যে জন্ম তাহার অনেকটা বিব্রত হইবার সম্ভাবনা।

উপরে ঝি নীচে বিশু—ব্রজেন্দ্র সিড়ির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তার মনে হইল, আর কিছু নয়, হেমা যা করিয়াই হউক চারুর কোনও খবর পাইয়াছে।

সে সর্ব্বনিম্ন সোপানে যেমন পা দিয়াছে, অম্‌নি ব্রজেন্দ্র ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল খবর কি ?

হেমাও প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্য, ইঙ্গিতে উত্তর দিল, উপরে ঘরে চলুন।

চারুর অদর্শনে ঝি সারাদিনটা ছটফট করিয়া কাটাইয়াছে। বেলা শেষে তার প্রত্যাগমনে হতাশ হইয়া মাসীর ঘরের দরজার সম্মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। বাবু তাহাকে বাড়ীর বাহির হইয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। বলিয়া ছিল বলিলে তাহাকে ও বিশুকে খুনের দায়ে পড়িতে হইবে।

সে দেখিল বাবু হেমাকে সঙ্গে লইয়া আবার চারুর ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এ পুনঃপ্রবেশের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অর্দ্ধনিরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"বাবু!"

তাহার দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া শুধু বামহস্ত প্রসারণে ব্রজেন্দ্র তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিল।

সুতরাং ঝি আর কোনও কথা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু তার কৌতূহল তাহাকে সেই শূন্য ঘরের দোর জুড়িয়া বসিয়া থাকিতে দিল না।

সে উঠিল এবং বাবু ও হেমা দেখিতে না পায় এমন স্থানে দাঁড়াইয়া আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিল। কথা সে শুনিতে পাইল না, তবে জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া দেখিতে পাইল, হাত, পা, মুখ নাড়িয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া হেমা বাবুকে কি বলিতেছে, আর বাবুর মুখটা দফে দফে রাঙা হইয়া উঠিতেছে। একবার দেখিল, বাবু মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফরাসের উপর আঘাত করিল। যেমনি দুজনে বাহিরে আসিবার লক্ষণ দেখাইল অমনি ঝি পলাইবার অন্য কোনও পথ না পাইয়া সিঁড়ির নীচে নামিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র তাহাকে ডাকিল। প্রথম ডাকে সে উত্তর দিল না। সে আর

একটা সম্বোধনের অপেক্ষা করিল এবং বাবুর সন্দেহের যতটা বাহিরে পারিল আপনাকে লইয়া গেল—লইয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল।

যা প্রত্যাশা করিতেছিল, আবার সে উপর হইতে বাবুর আহ্বান শুনিতে পাইল।

"ওরে বিশে, বাবু আমাকে ডাকে কেন শুনে আয় না।"

বিশুও নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত তার দোরটিতে হুঁকা হাতে বসিয়াছিল। সে সেই প্রাতঃকাল হইতে, যেখানে যেখানে চারুর সন্ধান পাইবার কথা, খুঁজিয়া হতাশায় নিরস্ত হইয়াছে। বাবুর আসার পর হইতে সেও আর বাড়ীর বাহির হইতে পায় নাই। বাবু ভয় দেখাইয়াছে, সেই ভোর হইতে চারুর নিরুদ্দেশের কথা যদি প্রতিবেশিনীগুলো শুনিতে পায় তাহা হইলে ঝির ও তার বিপদে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঝি ইহার মধ্যে তার সঙ্গে অনেকবার গোপনে পরামর্শ করিয়াছে। তার চেয়ে ঝিয়ের বুদ্ধি অনেক বেশী, চারু না ফিরিলে তাহারা উভয়ে যে একটা বিপদে পড়িতে পারে, একথাও সে বিশুকে শুনাইতে ভুলে নাই।

বাবুর ক্রোধরঞ্জিত মুখ হইতে কি কথা বাহির হইবে শুনিতে সাহস না করিয়া সে বিশুকেই ব্রজেন্দ্রের কাছে পাঠাইল এবং প্রয়োজনের একটা অছিলা করিয়া, যেখান হইতে তার কথা শুনিতে না পাওয়া সম্ভব, সেইখানে চলিয়া গেল।

যখন সে অন্তদিক দিয়া উপরে উঠিল, তখন বিশু আবার নীচে চলিয়া গিয়াছে।

"আমাকে কি ডাকছিলে বাবু?"

"ডাকছিলুম—বলতে, সন্ধ্যের পর তোর দিদিমণি যদি না ফেরে, আমাকে পুলিসকে খবর দিতে হবে।"

ঝি শুধু মুখে ভীতির চিহ্ন দেখাইল, উত্তর দিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার ভীতি লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল "আমার মর্য্যাদা রাখতে হ'লে আর খবর না দিয়ে পারব না। পুলিশ এসে খুনের ভিতর তোরাও আছিস্ বলে তোদের সন্দেহ করবে।"

ঝিয়ের মুখ শাকবর্ণ হইল।

"বাবু! আমরা কি অপরাধ করেছি?"

"অপরাধ খুবই করেছিস্, যখনি সে বদমাইস বামুন এখানে ঢুকেছিল,

আমাকে খবর দেওয়া তোদের উচিত ছিল। যাক্, যা ক'রেছিস, করেছিস্। এখন যদি বাঁচতে চাস, পুলিশকে যা বল্‌তে হবে, আমি বাড়ী থেকে ফিরে এসে শিখিয়ে দেব।"

"আমাদের বাঁচাও বাবু!"

"বাঁচাতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব। তবে এজেহারে গোল ক'রে তোমরা যদি নিজের গলায় ফাঁসি দাও, আমাকে দোষী কর্‌তে পারবে না। বিশেকে আমি বলেছি, সে বল্‌বে—তুমিও বল্‌বার জন্য প্রস্তুত থাক।" বলিয়াই ব্রজেন্দ্র নামিতে গেল। এক সিঁড়ি নামিয়াই, মুখ ফিরাইয়া তখনও পর্য্যন্ত ভীতিগ্রস্ত ঝিকে একটু দৃঢ়তার ভাষায় শুনাইয়া বলিল—"যদি ধর্ম্ম দেখাতে যাও, মরবে।"

"বাবু কি ঠাকুর মশায়ের সন্ধান পেয়েছেন?"

বজেন্দ্র একথা শুনিয়াও শুনিল না, মুখে বিরক্তির ভাব মাখিয়া ত্বরিত পদে নামিয়া গেল।

হেমা বিশুর সঙ্গে আগেই উপর হইতে চলিয়া গিয়াছে। প্রথমটা ভয়, তারপর চিন্তা, তারপর আশঙ্কা। ঝি বুঝিল ধর্ম্ম দেখাইতে গেলে সত্যই উভয়ে বিপদে পড়িবে, পুলিশ তাহাদের টানাটানি না করিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু যদি ধর্ম্ম না রাখে, তা হইলে? প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুই একটা কথাতেই সে তার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছে। সে বেশ্যার আবর্জনাময় গৃহে একটা সুগন্ধ কুসুম দেখিতে পাইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সে সেরূপ মূর্ত্তি দেখে নাই! যদি ধর্ম্ম দেখাতে যাই, আমি মরিব। ধর্ম্মের মাথা ত অনেক কালই খাইয়াছি, একটু নামমাত্র মাথার যা অবশেষ আছে, সেটুকু পেটে পূরিলে, আমি বাঁচিয়া যাইব, কিন্তু ফাঁসি কাঠে ঝুলিবে"—

মনেও ঝি ব্রাহ্মণকে নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। সে শিহরিয়া উঠিল

"বিশে!"

বাবুর প্রস্থানের সঙ্গেই দরজা বন্ধ করিয়া বিশু উপরেই আসিয়াছিল।

"বাবু কি তোকে কিছু বলে গেল?"

বিশু বলিল—"হাঁ।"

ঝির দ্বিতীয় প্রশ্নে বাবু কি বলিয়াছে বিশু সমস্তই ঝিকে শুনাইয়া দিল।—মাতাল চারুকে সঙ্গে লইয়া এক বামুন রাত্রির সেই ঘন দুর্য্যোগে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। আরও দু'চারদিন এ বাড়ীতে সে তাহাকে আসিতে দেখিয়াছে।

"এই তাহা মিথ্যেটা তুই বল্‌বি?"

"কি কোরবো, হামাকেত বাঁচতে হোবে।"

ঝি বুঝিল, বাঁচিতে হইলে তাহাকেও ওইরূপ একটা মিথ্যা কথা কহিতে হইবে।
হঠাৎ একটা জ্বালা তার সর্ব্বশরীরকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

"বিশু! দোর বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ একলা বসে থাকতে পারবি?"

"তুমি কোথা যাবে।"

"আমি আর একবার খুঁজে আসি। পেটের দায়ে আমাদের চাকরি করতে আসা।"

"তাতো ঠিক কথা।"

"তোর মা যদি না ফেরে আমাদের এখানকার চাকরি হয়ে গেল।"

বিশু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

"আর যদি ফেরে, ফিরে শোনে বামুনকে ফাঁসাতে বাবুর কথায় পুলিসের কাছে আমরা মিথ্যা বলেছি, তাহলে শুধু এখানকার চাকরি যাবেনা, এরকম বাড়ীতে আমাদের আর কেউ ঠাঁই দেবে না।"

এই কথাতেই বিশু বুঝি ভবিষ্যতের চাকরির অবস্থা একবারে বুঝিয়া ফেলিল। এরূপ উপরি রোজকারের চাকরি আর সে কোথায় পাইবে? সে বলিল – "যা ঝিমা, খুজে আয়।"

কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, তার মস্তিষ্ক যাতনার উষ্ণতায় ক্ষণমাত্রের জন্যও তাহাকে ভাবিতে অবসর দিল না। ঝি বাহিরে চলিয়া গেল; বিশু দ্বার বন্ধ করিল কিনা, সে ফিরিয়াও দেখিল না।

(৪৬)

যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে দেখিল নালুর পড়িবার ঘরে আলো জলিতেছে। সে ঘরে যে কেহ আছে, দূর হইতে বুঝিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, রাখুকে দেখিলেই এমন দুই চারিটি তীব্র ভাষায় আপ্যায়িত করিবে যে তাহার অসভ্য গুষ্ঠীতে দেশেও রাখু জীবনে কখন সেরূপ ভাষার আপ্যায়ন লাভ করে নাই।

কিন্তু যেই দেখা করিবার সময় আসিল অমনি তার সমস্ত সাহস সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কল্পনা রচিত মূর্ত্তির সম্মুখ হইতেও যেন অপসৃত হইয়া গেল। হেমা

সঙ্গে ছিল। সেও তীব্রদৃষ্টিতে ঘরের পানে চাহিল। বুঝিতে পারিল না ঘরে কে আছে, তবে দেখিতে পাইল ঘরের দেয়ালে একটা ছায়া যেন চলা ফেরা করিতেছে।

"বামুন ঘরে পায়চারি করছে বাবু!"

"দেখে আয়। সাবধান, সন্দেহ জাগে এমন কোনও কথা যেন তাকে ক'স্‌নি। সন্দেহ করলেই পালাবে।"

হেমা ঘরের দ্বারের কাছে যাইয়াই ফিরিল।

"আছে সে হেমা?"

"দেখতে ত পেলুম না বাবু, শুধু নালু বাবু রয়েছেন।"

সে দিক দিয়া যাইতে ব্রজেন্দ্রের আর কোনও এখন আপত্তি রহিল না। হেমাকে সঙ্গের জিনিষপত্রগুলা তার কাজের ঘরে লইতে আদেশ করিয়া সে নালুর ঘরের মধ্য দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিল।

সত্যই নালু বাবু তখন একখানা বই হাতে ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছিল। ব্রজেন্দ্র যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তার মুখ ছিল অন্যদিকে।

"ওখানে হুঁকো কেন নালু বাবু?"

পিতার আহ্বানে চমকিতের মত বালক মুখ ফিরাইল। একবার সে হুঁকার পানে চাহিল মাত্র—উত্তর দিতে পারিল না।

"মাষ্টার কি তামাক খায়?"

"না।"

"ও হুঁকো তবে কার?—আরে গেল, চুপ ক'রে রইলি কেন?"

"মাষ্টার মশাই আসেন নি।"

"তা হ'লে কে এ ঘরে ছিল?"

"পুজুরি ঠাকুর।"

"কে এ ঘরে তাকে ঢুকতে দিলে?"

নালু উত্তর দিতে পারিল না। রাগের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল। নালু উত্তর দিল না।

"কখন সে এসেছিল?"

"সকালে।"

"সমস্ত দিন ছিল!"

"মা তাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

"তোমার তাহ'লে আজ পড়াশুনা হয় নি ?"

"উপরে বসে পড়েছি।"

'বামুন গেল কোথা ?"

নালু বলিতে পারিল না।

"আবার আসবে সে ?"

নালু বলিতে পারিল না।

অনেক কষ্টে পুঁটিকে ঘুম পাড়াইয়া নির্ম্মলা সবেমাত্র রান্নাঘরের চৌকাটে পা দিয়াছে। দিনমানে স্বামীর আহারের সে যে সকল উদ্যোগ করিয়াছিল, যদি স্বামী রাত্রিতে বাড়ী আসে সে সকল সামগ্রী আর তার মুখের কাছে ধরা চলিবে না। রাঁধুনি আসে নাই, তাই শাশুড়ীকে শুভার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া নিজেই সে রাঁধিতে আসিয়াছে।

দোরে পা দিতেই সে শুনিতে পাইল, স্বামীর কথা। একবার সে কান পাতিয়া দাঁড়াইল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখুঠাকুর সম্বন্ধে স্বামীর চিত্তের অবস্থা সে বুঝিয়া লইল। পাছে ব্রজেন্দ্র দেখিতে পায়, তার আর কোনও কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্র কিন্তু শঙ্কিত নিরীহ পুত্রকে আর প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিপদগ্রস্ত করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিল না। "বুঝতে পারছি সারাদিন তুমি পড়ার নাম পর্য্যন্ত করতে পারনি নালুবাবু। সাবধান, এরকম পড়ায় অবহেলা আর কখন না আমাকে শুনতে হয়। মনোযোগ দিয়ে পড়, এক মাষ্টার ছাড়া অন্য যে কেউ এ ঘরে ঢুকতে আসবে, নিষেধ করবে।" বলিয়াই ব্রজেন্দ্র আবার বাহিরের সিঁড়ির পথ ধরিয়াই উপরে চলিয়া গেল।

"পুঁটি!"

ঠাকুর ঘরে শুভার মা, শুভার ঘরে সরি—উভয়েই বুঝিলেন ব্রজেন্দ্র আসিয়াছে। আসিয়াই কন্যার নামের সাহায্যে গৃহিণীকে অন্বেষণ করিতেছে।

তখন মধুঠাকুরের আসিবার সময় হইয়াছিল। সেইজন্য সে আবার সরিকে শুভার কাছে রাখিয়া আরতির আয়োজন করিতে ঠাকুর ঘরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার প্রতীক্ষার অছিলায় শুভার মা বসিয়া রহিল। চারু সম্বন্ধে ব্যাপার জানিতে যদিও তাহার বিশেষ কৌতূহল হইয়াছিল, তবুও সপত্নী পুত্রবধূর কাছে কেমন যেন একটা অপরাধ করিয়াছে বুঝিয়া হঠাৎ উঠিয়া আসিতে সে সাহস করিল না।

সরিও আসিতে আসিতে কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শুভার তন্দ্রা আসিয়াছিল। পুঁটির নামে তার চটকা ভাঙিল তীতবৎ শয্যায় বসিতে গিয়া সে সরিকে দেখিল।

"দাদা কথা কইলেন না ঝি ?"

"শুভা !"—শুভার প্রশ্নে সরির আর উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল না।

"বৌদি কি ঘরে নেই ?"

"থাকলে কি তোমার দাদা অত পুঁটি, শুভা করে !"

"তবে তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, যা।"

"ডাকছে তোমাকে, আমি গিয়ে কি করব !"

"মা !—আরে গেল, এরা বাড়ীতে কেউ নাই নাকি !"

শুনিয়া শুভা মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে শুইয়া পড়িল।

"সরি !"

অগত্যা সরিকে যাইতে হইল।

নির্ম্মলাও রান্নাঘর হইতে ব্রজেন্দ্রের কথা শুনিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, পুঁটি, শুভার নাম লইয়া স্বামী কাহাকে ডাকিতেছে।

কিন্তু সে উপরে গেল না। স্বামী এখন আর নীচে আসিতেছে না বুঝিয়া সে একবার নালুর কাছে গেল।

মাকে দেখিয়াই নালু বলিল—"মা! বাবা এসেছেন।"

"আমি জেনেছি। তিনি তোমাকে বক্‌ছিলেন কেন নালু? ভট্টচাজ্জি মসাই এ ঘরে ছিলেন বলে? তা বোকা ছেলে, চুপ ক'রে বকুনি খেলে, আমার নাম করলে না কেন? ছি নালুবাবু, লেখাপড়া মিছে শিখেছ, সত্য কইতে তোমার এত ভয় !"

"বাবা বড় রেগে কথা কইছিলেন মা !"

"সত্যিই তোমার আজ পড়া হয়নি। ব'সে মন দিয়ে পড় নালুবাবু !"

প্রতাপের অন্তিম।

[শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা]

এখনো সূর্য্য দীপ্ত আকাশে, রক্ত গরিমা ফুটিয়া বয়,
এখনো আমি যে জাগিয়া জগতে এখনো স্বাধীন এখনো জয়।
মেবার-গিরির শিখরে শিখরে স্বাধীন সূর্য্য ফুটিয়া ওই।
আমি যে প্রতাপ আমি যে মুক্ত এখনো আমি যে বাঁচিয়া রই।
দেখতো বন্ধু চাহিয়া দেখতো আঁধার আভাষ এসেছে কিনা,
প্রাণ দিও তবু আসিতে দিওনা একটী পদও সমর বিনা।
মেবার মেবার জননী আমার এখনো তোমার জীবন বয়।
মেবার-গিরির শিখরের মত মেবার শীর্ষ গরিমাময়।
দেখা যায় ঐ জনপদগুলি ঐ যে নগর ঐ যে গ্রাম।
কল-মুখরিত হাস্য-উজল মর্ত্ত্যের মাঝে স্বরগ ধাম।
ছিল যেথা চির উৎসব দিন শুভ সমারোহে সুখের ধারা।
সেথানে এখন বিজন কানন সে দেশ এখন শ্মশান পারা।
বাজিত যেথানে নিশিদিন ধরে' আশার রাগিণী ললিত গান,
এখন সেথানে ধ্বনিছে দিবায় শতেক শিবার বিকট তান।
আমি কি করেছি জননী আমার তোমায় এমন রিক্ত দীন
যেন ম্রিয়মাণ এমন শ্মশান মরুর মত সুষমা-হীন।
জানি আমি মাগো আমারি কারণে গিয়াছে মরিয়া দেশের বীর।
সমর-অনলে দগ্ধ মেবার দিয়াছে আহুতি সকল শ্রীর।
মরেছে মেবার, মরু একেবারে রেখেছি তবুও গরিমা মা'র,
স্বাধীন মেবার মুক্ত মেবার রেখেছি মহিমা এখনো তার।
সম্পদহীন হয়েছে মেবার বিগত বিভব সে সুখহীন।
তবুও মেবার স্বাধীন জগতে হয়নিক হীন অধীন দীন।
দেখো দেখো চেয়ে রক্তিমরাগে কি মহা মহিমা শিখরে ঝলে;
কি মহা গরিমা প্রবাহিত হয় মেবারের এই গিরির তলে।
যাবেনা সূর্য্য যাবেনা ডুবিয়া রহিবে উচ্চে মেবার গিরি,
রক্তিম রাগে অমনি দীপ্ত তেমনি হীনতা তামস চিরি।

বন্ধু আমার, চলে যাই আমি এ বুঝি আমার এসেছে শেষ ;
রহিল মেবার স্বর্গ আমার আমার ইষ্ট আমার দেশ।
এ দেব-ভূমির রাখিও শুচিতা রাখিও গর্ব্ব রাখিও মান,
মায়ের পূজায় সঁপিও অর্ঘ্য সকল সিদ্ধি সকল প্রাণ।
দিয়াছি সকলি যা কিছু কাম্য যাহা কিছু প্রিয় প্রাণের মত।
বিপদের মত বনবাসী আজি তবুও বারেক হইনি নত।
ইহজনমের স্বরগ আমার, আমার গর্ব্ব, আমার সুখ।
পুড়িতে দেখেছি পলকে পলকে বাজের আঘাতে ভেঙ্গেছে বুক।
যেখানে পূর্ব্ব পিতামহগণ রচিয়াছিলেন সুখের নীড়।
আশার আবাস পূজামন্দির আশ্রয় যত বিভবশ্রীর।
সে ভূমি এখন ত্যক্ত বিজন যায় নাকি ভেঙে আমারো হৃদি ?
দেয় নাকি ব্যথা আমারো পরাণে উৎসবময় সে সুধাস্মৃতি ?
পরাণ পুতলি কুমার কন্যা কত না দিবস ক্ষুধায় জ্বলে
কত অনশনে কত যে ক্লিষ্ট ভেসে যায় বুক অশ্রুজলে।
তবুও বন্ধু সন্ধি মাগিনি রেখেছি অটুট মুক্তি ধন।
শুখায়ে যদিও মরিত তাহারা তবুও অটুট রহিত পণ।
কত যে দিয়াছ বন্ধু তোমরা প্রার্থনা আজি আমার শেষ,
মেবার গরিমা রাখিও রাখিও স্বাধীন রাখিও এ দেব-দেশ।
কত ব্যথা বুকে সহেছি নিয়ত হাসিতে হাসিতে বিলাস মত,
কেবল অসহ এই সে বেদনা মেবার পরের চরণে নত।
ঈশ্বর ছাড়া কারেতো জানিনা কাহারে প্রণতি করিতে আর।
কাহারে মেবার লুটাবে না শির হউক ধ্বংস সকল তার।
সকল দুঃখ বেদনা-পঙ্কে কমল শোভায় একটী সুখ,
ফুটিয়া রয়েছে জীবনে আমার স্নিগ্ধ করিয়া এ পোড়া বুক।
স্বাধীন মেবার এ মম শান্তি ভেঙ্গোনা ভেঙ্গোনা ভেঙ্গোনা ভাই।
রহিল আমার পরম ইষ্ট যাই তবে আমি আজিকে যাই।
সন্ধি করিব কিসের সন্ধি এদেশ আমার আমারি মা।
দস্যু করিবে সে দেশ দলিত কিসের শান্তি চাহিব বা!
শান্তি মাগিয়া শৃঙ্খল পরা মৃত্যু তা চেয়ে পরম সুখ,
অত্যাচারীর অবিচার সহা তার বাড়া আর কি আছে দুখ।

রক্ত চক্ষু দেখায়ে করিবে সত্যেরে নত পাপের পায় ?—
এইতো সন্ধি ? এ চেয়ে মেবার অতলে যেন সে ডুবিয়া যায় ।—
আমারি এদেশ আমারি জননী অধিকার কিছু নাহিক কার ।
স্বপ্নেও যেন সন্ধি মাগিয়া গরিমা তুচ্ছ করোনা মা'র ।
বিদায়ের কালে কি যেন নিরাশা মরমের মাঝে ঘনায়ে আসে ।
দেখা যায় যেন দূর নভো গায় কি যেন একটী কালিমা ভাসে ।
দেখিতেছি যেন এ শুচি শুদ্ধ আত্ম মহিমা ব্রতের শেষ,
মঙ্গলময় অমৃত ছাড়ি বিলাস মদিরা মোহিত দেশ,
সাধনার পূত হোমানল নিভে জলেছে সেখানে সুখের বাতি,
মন্দির ভাঙ্গি উঠেছে প্রাসাদ দিবার অন্তে এসেছে রাতি ।
ভিক্ষা মাগিয়া লয়েছে মেবার বিনিময়ে তার মুক্তিধন ।
একটু আরাম একটু আয়াস তুচ্ছ ভোগের আকিঞ্চন ।
মেবার গর্ব্ব ধুলায় লুটায় করিছে শত্রু অট্টহাস ।
বিলাস কলুষ পঙ্কে মগ্ন অধঃ পতিত ঘৃণিত দাস ।
দগ্ধ করিও চূর্ণ করিও ভস্ম করিও সে মহাপাপ ।
হে মহামহেশ প্রার্থনা করি দিওনা মেবারে এ অভিশাপ ।
যাই তবে আমি যাই চলে যাই বিদায় বন্ধু বিদায় দাও ।
একবার শুধু মিলিত কণ্ঠে উচ্চে মেবার মহিমা গাও ।
স্বাধীন মেবার মুক্ত মেবার দৃপ্ত বিজয়ী মেবার বীর ।
মেবার গিরির শিখরের মত মেবার গরিমা উচ্চশির ।

ঘৃণাহতা

[শ্রীভক্তেন্দ্রনাথ রক্ষিত]

প্রথম পর্ব্ব।

অরুণের কথা—

তাকে আমি কখনও ভালবাসি নি। সে ছিল আমার চোখে ঝুলের মত কাল, কাকের মত কর্কশ-কণ্ঠী, আর গলিত শবের মত ঘৃণিতা ও অস্পৃশ্যা। সে দিন হঠাৎ বাবা আমার হাত ধ'রে মুখুর্জ্জেদের বরশূন্য বিবাহ-সভায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন "মুখুর্জ্জে মশায়, আপনার জাত রক্ষার জন্য অরুণকে এনে দিলুম, যদি আপত্তি—" বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দুঃখের সঙ্গে আনন্দ, হাসির সঙ্গে কান্না মিশায়ে তিনি এক অদ্ভুত স্বরে ব'ল্লেন, "সে কি দাদা! আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ অরুণের মত সৎপাত্রে নিরুকে অর্পণ কর্ত্তে পাল্লুম।" আমার দিকে ফিরে ব'ল্লেন, "আমার কিছু নেই বাবা; আজ যে তুমি আমার জাত রক্ষা কর্‌লে এর বিনিময়ে শুধু আমি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি "তুমি সুখী হও—রাজা হও বাবা।" কিন্তু বৃদ্ধের সে আশীর্ব্বাদ ফলে নি;—আমি জীবনে কখনও সুখী হ'তে পারি নি।

প্রথমে আমিও বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব ক'রেছিলাম এই ভেবে যে—কলেজে গিয়ে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ কত্তে পার্‌বো; আর নিজেকে আদর্শ খাড়া করে সহাধ্যায়ী ছাত্রদের কাছে মূর্ত্তিমান্ উপদেশ হয়ে দাঁড়াতে পার্‌বো—কেমন ক'রে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যাকে তা'র চিরজীবনের সঞ্চিত অন্ধকার থেকে তা'কে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর দিকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যখন শুভ-দৃষ্টির সময় তা'র মুখ দেখ্‌লুম, তখন লজ্জায় ঘৃণায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে এলো! বিষের জ্বালায় প্রাণ জ্বলে উঠ্‌লো। মনে হ'তে লাগ্‌লো বাজ পড়ে যদি রাণীগঞ্জের ওই কয়লার স্তূপটাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে যায়—তা' হ'লেও বোধ হয় একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি। কিন্তু তা' তো হবার নয়—ঐ ঝুলের বোঝা যে আমার চিরজীবন মাথায় ক'রে নিয়ে ফিরতে হবে! ওগো তোমরা কি কেউ বল্‌তে পার এটা মরণের হাত ছাউনি, না বাঁচবার মলয় বাতাস। এ জীবন-মরণের মিলন,—না বিচ্ছেদ? আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি নে; এ যে স্বপ্নের চেয়ে অদ্ভুত, মরণের চেয়ে নির্ম্মম, অগ্নিশিখার চেয়ে নিষ্ঠুর।

সুখের বিনিময়ে এ যে দুঃখের বোঝা—জীবনের বিনিময়ে এ যে নিবিড় মরণ। তার পর শুন্‌বে তোমরা আমার এ দুঃখের কাহিনী? এক এক ক'রে চার বছর চলে গেল। কত আলো এসে আঁধার ছেয়ে ফেল্লে, হাসির ছটায় জগতে নূতন যুগের উদয় হ'ল; কিন্তু আমার সেই মর্ম্ম-বেদনা র'য়ে গেল, বুঝি ম'র্লেও যাবে না।

এর মধ্যে আমাদের কথাবার্ত্তা ঠিক অপরিচিত পথিকের মত হ'য়েছিল মাত্র। অথচ সে এই চার বছর ধ'রে নব বসন্তের মত ছুটে আস্‌তো আমায় আঁকড়ে ধর্ত্তে—আর আমি শুধু তা'কে বাসি ফুলের বোঝার মত দু পা দিয়ে দ'লে শান্তির জন্ত উল্কার মত ছুটে চলে যেতুম—কিন্তু কোথায় শান্তি? জগতে তো শান্তি নেই—আনন্দ নেই—উৎসাহ নেই! এ জগতটা যে পিশাচের মত নিষ্ঠুর, কমলে কণ্টকের মত অপ্রীতিকর। এখানে আছে হাসির বদলে অশ্রু, দেবতার পরিবর্ত্তে পিশাচ, আর বসন্তের পরিবর্ত্তে আছে গ্রীষ্ম আর দুরন্ত হেমন্ত!

আজ অনেক দিনের কথা! বিয়ের প্রায় দু'বছর পরে নিরুকে নিয়ে যাওয়ার জন্তে তার এক দাদা এসেছিল। রাত্রে নিরু আমায় জিজ্ঞাসা কর্ল্লে যে সে যাবে কি না? আমি উত্তরে কর্কশ-কণ্ঠে বল্লুম—"যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।" এমন সুরে কথাটা আমি তাকে বলে ছিলুম যে তার মানে হয় যেন এ বাড়ীর সে কেউ নয়। যদি এ বাড়ীর একটা বেড়ালও মরে তা' হ'লেও লোকে 'আহা' বল্‌বে—কিন্তু সে ম'র্লে নয়। অসহায়া মাতৃহারা শিশুটীর মত জল-ভারাবনত চোখ দুটি তা'র নিমেষের জন্তই আমার মুখের উপর রেখেছিল। তার পর চাবির তোড়ার শব্দ করে' সে চোখে কাপড় দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় কাঁদতে। নিমেষের সেই একটুখানি চাউনিতে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলুম। জীবনে অনেক সুন্দরী দেখেছি অনেক পদ্ম-আঁখির অর্থপূর্ণ চাউনি চোখে আমার বুলিয়ে গেছে; কিন্তু অমন চাউনি আমি কোথাও দেখি নি। নিজের সামান্ত পুঁজিটুকু বিলিয়ে দিয়ে আশ্রয়ের জন্ত আকুল আবেদনের মত সে দৃষ্টি—সে যে কত মধুর—কত সুন্দর—কত করুণ, তা' তো' তোমরা কেউ বুঝতেও পার্ব্বে না।

রাত্রি তখন ১২টা কি ১টা হবে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ চাহিতেই যা' দেখলুম—লজ্জায়, ঘৃণায়, আমার মাটীতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'লো, আমার বুকের উপর একরাশ কাল চুলের বোঝা সমেত মাথাটা রেখে—দুহাত:

দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধ'রে —মাতৃক্রোড়ে ঘুমন্ত শিশুর মত নির্ব্বিঘ্নে শুয়ে আছে নিরু। তা'র গায়ের রঙের সঙ্গে একরাশ মাথার চুলের রং মিশিয়ে দেখাচ্ছিল —যেন একরাশ শুভ্র ফুলের উপর আকাশ থেকে কে প্রকাণ্ড একটা ঝুলের চাপ ফেলে দিয়েছে। হারিকেনের সাদা চিমনির ভেতর অনেকখানি কালী জমে যেমন বিশ্রী দেখায়, তেমনি তা'কে আমার বুকের উপর দেখাচ্ছিল। •আমার আর সহ্য হ'ল না। "মরবার আর জায়গা পাওনি" বলে' এমনি এক ঠেলা দিয়েছিলুম যে সে খাট থেকে প'ড়ে গেল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, "মা-গো!" কি করুণ স্বর! কত বেদনা—কত যাতনা—কত কাতরতা মাখা। প্রাণের কতটা জালা সে ওই এক "মা-গো"র মধ্যে প্রকাশ ক'ল্লে? হেনার পাগল করা গন্ধ নাচতে নাচতে এসে বলে' গেল "মা-গো"। আমি চম্‌কে উঠলুম। আমিও যে মাতৃহারা। মা যখন মারা যান তখন আমিও যে ওই রকম বেদনা জড়িত কাতর-কণ্ঠে ডেকেছিলাম "মা-গো"। এতদিন যে চাপা কান্না আমার বুকের ভেতর জমে ছিল; আজ তা' নদীর স্রোতের মত চোখ ফেটে বেরুতে লাগলো। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। নীচে যে একজন একবার কাতর শব্দ করেই চুপ কর্‌লো—সে বাঁচলো কি ম'র্লো দেখবার সময় হলো না—বুঝি দরকার বলেও মনে করি নি।

নিরুপমার কথা

মাগো মা—এ যন্ত্রণার অবসান ক'বে হবে আমার। আর যে সইতে পারি নে। নিষ্ঠুরের মত তিল তিল ক'রে আমায় মের না—একবারে মেরে ফেল। আমি মর্ব্ব—ওগো মৃত্যুর দেবতা—আমায় মরণ দাও প্রভু। তোমরা হাসছো, বলছো "গরীবের মেয়ে ছিলে খেতে পেতিস্‌নে এখন রাজ সুখে আছিস্ পর্‌তে পেতিস নে, এখন হু'বেলায় চার খানা ঢাকাই শাড়ী পচ্ছিস্—তবু মর্ত্তে চাস্, কি বোকা"। সত্যিই আমি বোকা নইলে এমন দেবতার মত শ্বশুর ছেড়ে মর্ত্তে চাচ্ছি? বাবা আমায় কত বোঝাতেন, কত উপদেশ দিতেন, কিন্তু পোড়া মন আমার বুঝ্‌তোনা। যদি কখন 'তিনি' একবার নিরু বলে ডাক্‌তেন—তা'হ'লে বুঝি আজ এমন করে' মরণকে ডাকতুম না। ভগবান কেন আমায় সে অমৃতের অধিকারিণী ক'রে পাঠাওনি—যা'তে স্বামীর তৃপ্তি দিতে পারি?

একদিন কথায় কথায় বাবাকে বলে ফেলেছিলুম—"মেয়ে মানুষের রূপ না থাকলে তা'র কোন কদরই থাকে না।" বাবা একটু বিষাদের হাসি হেসে বল্লেন "জানি মা! আমার একটু অসাবধানতার ফলে তোমাদের জীবন যে কতটা অশান্তিময় হ'য়ে উঠেছে তা' বুঝতে পাচ্ছি—কিন্তু কি কর্ব্বো মা, আর তো উপায় নেই। এমন সোনার প্রতিমাকে যে কেউ অনাদর কর্ত্তে পারে এটা তখন ভেবে দেখিনি। তখন ভেবেছিলাম নারীর রূপ অরুণ বাইরের চামড়ায় খুঁজবে না—খুঁজ্‌বে হৃদয়ে।" তার পর এমন সব কথা বলতে আরম্ভ কল্লেন যে আমার বড় লজ্জা কর্ত্তে লাগ্‌লো। যেন তিনি আমার কাছে কত অপরাধী শেষে আর তাঁকে থামাতে না পেরে বল্লুম—"আপনি আমায় প্রায়ই পড়তে বলেন আজ থেকে পড়'ব।" সেদিন থেকে নূতন উৎসাহে আমি আবার পড়তে আরম্ভ করেছি—আর তারই ফলে আমার এই ছেঁড়া "ডাইরির" পাতা ক'খানা থেকে তোমরা আজ আমার দুঃখের কাহিনী জান্‌তে পাচ্ছো। হয় তো তোমরা বলবে হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর বৌ, তা'র আবার "ডায়রি" কি। এবাতিক কেন? স্বামী সোহাগে গরবিনী সৌভাগ্যবতী তোমরা তোমাদের না থাকতে পারে—কিন্তু আমার আছে। তোমাদের সঙ্গী আছে; কিন্তু আমার সঙ্গী কে জান? এক বৃদ্ধ শ্বশুর আর এই প্রাণের সাথী মরণের সাথী আমার "ডায়রি।" এব্যথা তো শ্বশুরকে জানাবার নয়—তাই আমার এই ছোট সঙ্গীটাকে চুমুর উপর চুমু দিয়ে প্রাণের ব্যথা জানাই।

• • • • •

সেদিন ছিল শনিবার শুনলুম স্বামীর কোথায় নিমন্ত্রণ আছে আস্‌তে দেরি হ'বে। আমায় কিছু না বল্লেও যখন তিনি বড়জাকে ডেকে বল্লেন—"বৌদি, আজ আস্‌তে দেরি হ'বে নিমন্ত্রণ আছে। দয়া করে কেউ দরজাটা খুলে দিও।" তখনি বুঝলুম আজ আবার এই খোঁড়া পা নিয়ে সেই একতলায় নাবতে হ'বে দরজা খুলতে। আমার দু'চোখ ফেটে জল এলো। এই যে কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে কি ক'রে পড়েছি জানি না। পড়ে কপাল ফেটেছি পা ভেঙেছি —কেউ কি খবর নিয়েছে? যখন জ্ঞান হ'লো তখন দেখলুম বাবা নিজে বাতাস কচ্ছেন। মহেশ ডাক্তার চেয়ারের উপর ব'সে। তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিতে যা'বো—সবাই বারণ কল্লেন। একটু পরে ডাক্তারের সঙ্গে বাবা চলে গেলেন—একটা পরিস্কার বিছানায় মায়ের মত যত্ন করে শুইয়ে রেখে। স্বামী কতবার ঘরে এসেছেন কিন্তু একবারো জিজ্ঞাসা করেন নি আমার কি

হ'য়েছে। এসব কথা মনে করে 'আমি কাঁদ্‌চি এমন সময় বাবা এসে পড়লেন —বল্লেন—' কাঁদছো কেন মা ? বড় যন্ত্রণা হচ্ছে কি ?" আমি ছোট মেয়েটীর মত কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সব কথা তাঁকে বল্লুম। বাবা বল্লেন "তা'র জন্তে কান্না কেন মা ? কেউ দরজা না খুলে দেয় আমি দেবো। আজ তোমায় রামায়ণ শোনাব—অরু এ'লে আমি দরজা খুলে দেবো।"

* * * * * *

সে দিন রাত্রে কে তাকে দরজা খুলে দিয়েছে জানি না। যখন তিনি ঘরে এলেন তখনও বাবা সুর ক'রে রামায়ণ পড়ছেন—আর আমি বেশ লেপ মুড়ি দিয়ে শুনছি। ঘরে এসেই বাবাকে বল্লেন, "এত রাত পর্য্যন্ত হিম লাগাচ্ছেন কেন ?" বাবা বল্লেন "বৌমা একা, তাই একটু রামায়ণ শোনাচ্ছিলুম কটা বেজেছে ?" ঘড়ি দেখে তিনি বল্লেন "১২টা বেজেছে।" বাবা বল্লেন "আজ এই পর্য্যন্ত থাক মা, কাল আফিস থেকে এসে আবার শোনাবো।" এখানে ব'লে রাখি এ বাড়ীর কেউ চাকরি করে না, হাটখোলায় আমাদের পাটের আফিস আছে বাবা সেটারই দেখা শোনা করেন। বাবা চলে যেতেই স্বামী আমার উপর কটূক্তি বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। এই শীতের রাত্রে বুড়ো শ্বশুরকে হিমে বসিয়ে রেখে নিজে দিব্বি লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি তার পর আজ না কি আমি বড় জাকে যাচ্ছে তাই অপমান করেছি—দাদা দেশে নইলে আজই নাকি বড়জা বাপের বাড়ী চলে যেতেন। আমি আর থাকতে না পেরে বল্লুম "আজ সমস্ত দিন ত বড়দির সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি।"

আগুনে ঘি পড়লে যেমন হয় তেমনি চীৎকার করে তিনি বল্লেন "তুমি বলতে চাও বড় বৌদি মিথ্যে কথা বলেছেন—এত আস্পর্দ্ধা তোমার।" বলে গোলার মত ছুটে এসে আমার বুকে সজোরে লাথি মেরে বল্লেন—"জান কে আমায় পাঁচ বছর বয়েস থেকে মানুষ করেছে—খবরদার যদি কখন আর তাঁকে অপমান কর্ত্তে শুনি তো মনে থাকে যেন এই লাথির কথা।" বলে আবার আর এক ঘা। ওগো দোহাই তোমাদের—আমার মাথা খাও—কেউ তাঁকে কিছু বলোনা। তিনি যে তোমাদের অনেকের স্বামীর চেয়ে লেখা পড়া বেশী জানেন। তিনি যে এম্‌, এ পাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। সুতরাং ওগো কিছু ব'লো না—কিছু ব'লো না।

* * * *

অরুণের কথা

কাল ছিল শনিবার দিব্বি ফুর্ত্তি ক'রে বাড়ী ফিরলুম—রাত্রি তখন ১২টা। এসেই শুনলুম বৌদির মুখে নিরু নাকি তাঁকে যাচ্ছে তাই অপমান ক'রেছে। রাগে আমার মাথার চুলগুলো সব খাড়া হ'য়ে উঠলো। এই বৌদিটী আমায় ছেলের মত ভালবাসতেন। যখন আমি পাঁচ বছরের তখন মা মারা যান; আর সেই থেকে এই স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া আমায় কখন মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। বৌদিদি যখন কাঁদতে কাঁদতে এসে বল্লেন "অরু তোর বৌ আজ আমায় অপমান কল্লে এতদিন ধরে তোকে মানুষ কল্লুম তা'র এই প্রতিফল।" তখনি ঘরে এসে কি কাণ্ডই না আমি করেছি। পশুতে যে কাজ কর্ত্তে লজ্জা বোধ করে আমি তা অনায়াসে সম্পন্ন করেছি। সতী-সাধ্বীর বুকে পিশাচের মত লাথি মেরেছি—নিরু একটী কথা বলে ও প্রতিবাদ কর্ব্বার চেষ্টা ক'রেনি। বরং যখন বৌদি এসে তা'কে ধল্লেন, তখন সে আমার ব্যবহারে একটু লজ্জিত হয়েছিল। দেবী! আজ তুমি স্বর্গে, কিন্তু তোমায় তো কোনদিন চিন্তে পারি নি—চেনবার চেষ্টাও করি নি। ভাবতুম তুমি কুৎসিতা—তখন কেন বোঝাও নি তুমি সুন্দরী ছিলে—তখন কেন বোঝাওনি তুমি সতী কুলরাণী ছিলে অভিমান ক'রে তুমি চলে গেছ—যখন আর তোমায় দেখবার সম্ভাবনা নেই, ক্ষমা চাইবার অবসর নেই, তখনই বুঝতে পারলুম তুমি কি ছিলে। এটা বুঝি মানুষের সনাতন নিয়মের মধ্যে নইলে বিচ্ছেদেই মানুষকে ভাল করে বোঝা যায় কেন?

সেই দু'ঘা লাথিতেই তা'র ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌তে লাগ্‌লো। হয়তো তোমরা অনেকে আমায় হতভাগ্য বলে মনে কর্ব্বে—কারণ নিজের লজ্জাকর কাহিনী নিজেকেই লিপিবদ্ধ কর্ত্তে হচ্ছে! কিন্তু আমি তা' মনে করিনে, কেন না আমি জানি পাপই হোক, আর পুণ্যই হোক যখন সে কাজটা ক'রে ফেলেছি তখন তা'র ফলাফল সম্বন্ধে জগৎকে জানিয়ে গেলে জগতের অনেক উপকার ত' হবেই তা ছাড়া মানুষের সত্য পরিচয়টাও দেওয়া হ'বে—থা'ক সে কথা।—রক্ত দেখে বৌদি ভয় পেয়ে ডাক্তার ডাকবার কথা বল্লেন। নিরু কিন্তু বাধা দিলে, সে বল্লে "না বাবাকে এখন বিরক্ত ক'রে কাজ নেই। এখনি একটা মিছিমিছি হৈচৈ বাধাবেন। সে একটু জল চেয়ে নিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলে জোর ক'রে মুখ চেপে রইল। আসন্ন বিপদ কেটে গেল দেখে আমি একটু স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। পাছে আমার অপমান হয়, এইভয়ে নিরু ডাক্তর ডাকৃতে বারণ ক'রে দিলে। এখন সেটা বেশ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু তখন পারিনি, একেই বুঝি বলে অদৃষ্ট।

হঠাৎ কাজটা করে আমার বড় লজ্জা হ'ল—তাই একটু লৌকিকতা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম—"তোমার কি বড় লেগেছে?" একটু হেসে নিরু তা'র বড় বড় চোখ দুটো আমার মুখের উপর রেখে মুখখানাকে সহজ ক'রে জোর করে বল্লে "না"। বল্লে বটে "না" কিন্তু তা'র ওই "না" শব্দটা আমার বুকে শেলের মত বিঁধলো। আর তার চোখ দুটো বল্লে "এ লাগাটা তত বেশী লাগা নয় যত লেগেছে তোমার নির্ম্মম ব্যবহারে।" হায়, তখন এ কথাটা কেন বুঝিনি? তখন যদি বুঝতুম তা'হ'লে কান্নার পালা আমার অনেকদিন ফুরুতো কিন্তু তাতো হবার নয়। যখন মানুষ নিজেকে ত্যাখে—যখন যৌবনের মদগর্ব্বে স্ফীত হয়—যখন তা'র নিজের মস্তকে বড় কর্ত্তার, পূজনীয় কর্ত্তার চেষ্টা থাকে—তখন কা'রো কথা সে বুঝতে পারে না—চেষ্টাও করে না। আমিও একদিন মদগর্ব্বে উৎফুল্ল হ'য়ে সতীরাণীর সে নীরব চাউনির অর্থ বুঝতে পারিনি—আর আজ সেইজন্যেই না এত অনুশোচনা!!

• • •

নিরুপমার কথা।

সেই সেদিনের পর থেকে আমার রোগ আর সারতে চাইছে না। ডাক্তার নাকি বলেছে আমার "যক্ষা" হ'বার লক্ষণ সব দেখা দিয়েছে। ভাল কথা, অবশ্য বাবা কোনদিন এ সংবাদটা দেন নি, দিয়েছিলেন কষ্ট ক'রে আমার স্নেহময়ী বড়জা! আমিও বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে আমার জীবনী শক্তি কমে আসছে। বড়জার মুখে কথাটা শুনে একটু আহ্লাদ হ'ল আবার একটু দুঃখও হ'ল। আনন্দ হ'ল এইজন্যে যে এতদিনের চাওয়া মরণ এইবার বুঝি সত্যসত্যই পেলুম। সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু এইবার বুঝি সত্যই আমায় শান্তি এনে দেবে। আর দুঃখ হ'চ্ছে এইজন্য যে প্রাণভরে বাবার সেবা কর্ত্তে পার্ব্বো না বলে'; কিন্তু এও বলি সারা জীবনটা এমন ক'রে স্বামীর উপেক্ষা সহ্য করে' বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ সহস্র গুণে ভাল। তাই দুঃখের চেয়ে আনন্দ হয়েছিল বেশী। ডাক্তার বাইরে যাওয়ার কথা বল্লে।' 'ডায়মণ্ডহারবারের' গঙ্গার ধার নাকি আজকাল "থায়শিস্" রোগীর পক্ষে ভাল

জায়গা হয়েছে—পুরীর চে'য়ে। বাবা সেইখানে যাওয়ার মত কল্লেন, কারণ সে জায়গাটা নাকি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। আমাদের সঙ্গী হ'ল দুজন দরোয়ান, একজন ঝি, আর একজন বামুনের মেয়ে। এদের নিয়ে আমি আর বাবা হাওয়া খেতে চল্লুম। বড়জা যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বাবা জান্‌তেন আমার উপর বড়জা কত সদয়, তাই তিনি আপত্তি কল্লেন—বড়জার যাওয়া হ'ল না।

প্রথম প্রথম ভারি আমোদ হ'তো। দিনে বাবার কাছে বই পড়া গল্প করা আর সকাল সন্ধ্যে গঙ্গার ধারে বেড়ান। একা থাকতে কখন বাবা আমায় দিতেন না। রাত্রে যতক্ষণ না আমার ঘুম আসতো ততক্ষণ আমাদের বামন দিদিটী হাসিয়ে হাসিয়ে পেটে ব্যাথা ধরিয়ে দিতেন। যত রাজ্যের হাসির গান—কবিতা—গল্পও তাঁর মুখস্থ ছিল।

এমনি ক'রেই আমাদের গোণা সুখের দিন কটা ফুরিয়ে এল। মাস-খানেক পরে একদিন রাত্রে জ্বর হ'ল, সেটা না কমে বাড়তেই লাগলো। ভাসুরকে বাবা ডাক্তার নিয়ে আসতে লিখে দিলেন, ডাক্তার এসে কিছু কর্ত্তে পার্‌লে না। বাবা বিরক্ত হ'য়ে অন্য ডাক্তার ডাকৃতে বল্লেন—ভাসুর এবার কলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তার নিয়ে এলেন।

অরুণের কথা—

ভাদ্রের ভরা গঙ্গার উদ্দাম গতি কেউ রোধ কর্‌তে পারে না; আমিও পারি নি। সে যখন উল্কার মত গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস ক'রে সাগরের বুকে শান্তি পাবার জন্মে ছোটে—তখন কে তার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারে? যে অসীম সাহসী পুরুষসিংহ তার সামনে এসে দাঁড়ায় সে সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যায়। যৌবনের উদ্দামগতি—রূপের এ অনন্ত পিপাসা মেটাতে না পেরে—আমার কলঙ্কহীন চরিত্র আমি হারিয়েছিলাম। আর তার ফলে যে আমি কত পাপ করেছি তার সংখ্যা হয় না; কিন্তু তা'র জন্যে আক্ষেপ কর্ব্ব না। নীরের মত তার ফলভোগ কর্ত্তেই আমি চাই। আর এই চাওয়াটাই আমার এখন সব চেয়ে বড় চাওয়া। একদিন আমার সুদিন ছিল—যেদিন আমার আচার ব্যবহার অনুকরণ কর্ব্বার জন্য গ্রাম্য যুবকেরা ব্যাকুল হ'য়ে উঠতো। আমার চরিত্র দেখিয়ে ছেলের মা ছেলেকে উপদেশ দিত। আর আজ আমি তা'দের চোখে চরিত্রহীন—নারীহন্তা পিশাচ মাত্র। কিন্তু আমার এই পতনের মূলে নিরুর সাহায্য কি নেই? সে যদি রূপসী হ'তো, তা' হ'লে ত আজ

আমাকে এমন করে পাপের ফল ভোগ কত্তে হ'তো না। সে যদি ধনীর কন্যা হ'তো তা' হ'লেও হয়তো আজ আমার এত অধঃপতন হ'তো না। ধনীর প্রসাদ ভোজীর কন্যাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা কর্ত্ত। সবচেয়ে বেশী ঘৃণা হ'ত তার কদাকার চেহারার কথা মনে হ'লে। বাবার চোখে কিন্তু নিরু ছিল দুর্গার মত নিখুঁত। ভাল করে মুখ না দেখলেও যা দেখেছি তাতে মনে হয় কাফ্রি মেয়েদের গায়ের রং এর চেয়ে অনেক ভাল।

তারিখটা ঠিক মনে নেই, সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর ক্লান্ত মেঘগুলি তখন একটু বিশ্রাম-সুখ অনুভব কচ্ছিল। সহরেও সেদিন অনেক জায়গায় জল দাঁড়িয়েছিল। এমন দিনে ঘরের বার কেউ হয় না—এক কেরাণীজীবী বাঙ্গালী ভিন্ন। বাঙ্গালী হলেও আমি কেরাণী নই। কাজেই জানালার ধারে বসে তখন বর্ষণক্লান্ত মেঘের জলভরা চোখের শোকার্ত্ত চাউনি দেখছি, এমন সময় অলক্ষ্যে বৌদি কখন এসেছেন জানি না। বৌদি বোধ হয় একটু হেসে বল্লেন "কি গো কবি—অমন সাদা মেঘখানার ভেতর কা'কে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।" সুষুপ্তিময় নির্জ্জন কুটীরে হঠাৎ বাজ পড়লে মায়ের বুকে কাপড় ঢাকা শিশু যেমন চম্‌কে উঠে, তেমনি আমিও চম্‌কে উঠে হঠাৎ বলে ফেল্লুম 'আচ্ছা বৌদি, তোমার সে বোনের বিয়ে হয়েছে ?" বলেই লজ্জায় মাথা আমার হেঁট হয়ে গেল ; এত দিনের পর আজ আবার একি কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুল ? বৌদি কিন্তু বেশ হেসে বল্লেন "কেন তাকে বিয়ে করবার সাধ গেল নাকি ?" আমি বল্লুম "ছি! বৌদি।" বৌদি বল্লেন, "তাতে হয়েছে কি ? ছোট বৌয়ের অসুখ আবার যেমন বাড়াবাড়ী শুনছি তাতে সে যে বেশীদিন বাঁচবে বলে আমার মনে হয় না। এর পরে—" আমি বাধা দিয়ে বল্লুম "তা' বলে একজনের মরণ কামনা করাটা ভাল নয়" "নয় কেন ? যার মরাই উচিত তার মরণ কামনা করায় অনুচিতটা দেখলে কোথায় শুনি ?" কথাটা বলে' আমায় নীরব দেখে হাসিমুখে বৌদি অর্থপূর্ণ পদধ্বনি করে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা জ্বালাময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ঘরের এ কোণ থেকে ওকোণে প্রতিধ্বনি ক'রে বেরিয়ে গেল।

তার পরের দিন বেড়িয়ে এসে দেখি বৌদির বোন মলিনা তার কাছে বসে আছে। সদ্য বিবাহিতা-নব-বধূর মত বুকখানা আমার কেঁপে উঠলো। বৌদি বল্লেন "মলিনা, ঠাকুরপোকে নমস্কার কর।" ছবির মত মেয়েটী যখন তা'র ফুলের বোঝার মত হাতটা দিয়ে পায়ের ধুলা নিতে এলো তখন আমার

সমস্ত শরীর বজ্রাহত পথিকের মত আড়ষ্ট হ'য়ে আস্‌ছিল। কোন গতিকে উপরে এসে ছোট খাট খানায় শুয়ে পড়্‌লুম। সারা ঘরটা একটা মর্ম্মপীড়িতা বালিকার কথা মনে ক'রে দিলে। কয়লার মত কালো কাকের মত কর্কশ কণ্ঠী একটা বালিকা যেন এসে বল্লে "এই কি শেষ?" আমার বুকখানা কেঁপে উঠলো। শীতের রাতে পথের ধারের নিঃস্ব পথিকের মত নিরু ছিল নারীর ঐশ্বর্য্যে রিক্তা কিন্তু পবিত্রতায় সে ছিল জাহ্নবীর মত নির্ম্মলা। মলিনা রূপসী নারী কিন্তু উভয়ের হৃদয়ে কত প্রভেদ—শেষে বুঝেছিলুম আগে পারি নি। তখন ভেবে দেখিনি যে গিরি পথ নিঃসৃতা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে পয়ঃ প্রণালী নির্গত জলধারার তুলনা হয় না। তখন ভেবে দেখিনি পদ্মে ও কিংশুকে, স্বর্গে ও নরকে কত প্রভেদ অবসন্ন চোখ দুটো আমার আস্তে আস্তে বুঁজে এল।

• • • • •

• • • হঠাৎ কাণে গেল "ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্।" বুঝলুম বৌউদি শিকারের সন্ধানে কা'কে পাঠাচ্ছেন। তখনি উঠে চেয়ারে বসে পড়লুম—তার পর আলমারি থেকে "নৌকাড়ুবি" খানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ কল্লুম। মলিনা ঘরে এসে খাবারের রেকাবি খানা রেখে বল্লে "দিদি আপনার খাবার পাঠিয়েছেন!" নেহাৎ অভদ্রতা হয় দেখে কোন গতিকে বল্লুম "থাক।" ধীরে, ধীরে মলিনা বেরিয়ে গেল। শুনতে পেলুম বৌদি বলছেন "কোন বুদ্ধি নেই একেবারে হাবা।" মনে মনে বল্লুম "বুদ্ধি থাকবে কোথা থেকে বৌউদি তোমারই তো বোন?" একটু পরে বৌউদি ঘরে এসে বল্লেন "খাবার পড়ে রহিল যে খেলে না?" মুখভার ক'রে উত্তর দিলুম "ক্ষিধে নেই।" বৌউদি আমায় চিন্তেন, দ্বিরুক্তি না ক'রে চলে গেলেন।

সেই থেকে আমায় প্রত্যেক কাজে বৌউদির উপদেশে মলিনা তা'র চাঁপা ফুলের মত দেহখানি নিয়ে চলে বেড়াত। মলিনার সঙ্গ আমার ভাল লাগতো না—আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলুম। এক খাবার সময়, আর মাঝে মাঝে রাত্রে ভিন্ন আমি বাড়ী বড় থাকতুম না। বল্‌বার কেউ নেই দাদা তখন নিরুর বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে ডাক্তার নিয়ে 'ডায়মণ্ডহারবারে' গেছেন। বল্‌বার মধ্যে এক বৌউদি তা কৈ তিনি তো কিছু বল্‌তেন না। মনুষ্যত্বের শেষ সীমানায় আমি যখন নেবে গেছি যখন আমার চরিত্র হীনতায় পূর্ণ অভিনয় হ'চ্ছে তখন হঠাৎ দাদার তার পেলুম "শীঘ্র এস, বৌমার অবস্থা খারাপ।" জানি না হঠাৎ কেন আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস

বুকে ভেঙ্গে বেরবার চেষ্টা কচ্ছে—হঠাৎ বাধাপেয়ে সেটা বুকের ভেতর আঠকে গেল। বৌউদি বল্লেন "কি, খবর?" আমি শুষ্ক মুখে বল্লুম নিরুর অবস্থা খারাপ, আমায় যে'তে দাদা তার করেছেন।

• • • • •

বৌউদির জেদই বাজায় রইল আমায় নিয়ে যে'তে বাধ্য ক'রলেন। গাড়ীতে উঠবার সময় দেখি শুধু বৌউদি নয়—সঙ্গে আবার তাঁর তীক্ষ্ণ অস্ত্র মলিনা! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আমার জলে উঠলো, ভাবলুম দুচার কথা শুনিয়ে দেবো—কিন্তু তখন ট্রেনের সময় হ'য়ে এসেছে আমার মত চরিত্র হীনেরও এমন বয়স্থা কুমারীর সঙ্গে ভাল লাগে না, কিন্তু আশ্চর্য্য বৌউদির ধৈর্য্য!

যখন আমরা বাসায় এসে উঠলুম তখন চাঁদের আলোয় আকাশ বাতাস ভ'রে গে'ছে। প্রকৃতির ঘন তরুকুন্তলের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের মধুর হাসি—দূর বনান্তরালে জুঁই ফুলের মত দেখাচ্ছিল। নব বধুর লাজ নত আঁখির মত দু'একটী জোনাকি মাঝে মাঝে দেখাদিচ্ছিল। বাইরের নিস্তব্ধতা ভেতর পর্য্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে—যেন বাড়ীটায় কেউ নেই। কড়ানাড়াতে দরজা খুলে দি'য়ে চাকর আমাদের উপরে নিয়ে গেল। দেখলুম কয়লার মত সেই কালো মেয়েটীর মুখখানি আরো কালো ক'রে মৃত্যুর দুত এসে শিবিরে বসেছে। মরণ পথের যাত্রী এই কিশোরীটী কে দেখে কেন জানি না আমার প্রাণটা দুর্ভিক্ষ পীড়িত শিশুর মত কেঁদে উঠলো। বিছানার উপর আমি ব'সে পড়লুম। ঘরের সবাই বেরিয়ে গেল; বামুনদি বোধ হয় দরজাটা দিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে তা'র হাত দুখানি কোলের উপর তুলে নিয়ে, ডাকলুম "নিরু।" ঊষার প্রথম উন্মেষের মত আস্তে আস্তে তা'র চোখের পাতা দু'টো খুলে গেল, একটা অস্বস্তির নিশ্বাস তা'র বুকের ভেতর জমেছিল সেটা যেন বেরিয়ে গেল। আমায় দেখে একটা স্নিগ্ধ হাসি ঠোট দু'খানা ছাপিয়ে মুখখানিকে তা'র উদ্ভাসিত ক'রে নিমেষের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। এই হাসি আর একদিন, দেখবার সৌভাগ্য হ'য়ে ছিল, যেদিন প্রথম নিরু আমায় আশ্রয় ক'রে সংসারে দাড়ায়—কিন্তু তখন বুঝিনি এ হাসি কত মূল্যবান্।

নিরু তা'র চোখ দু'টো আমার মুখের উপর রেখে কি বলতে গেল—কিন্তু পাল্লে না। কাতরস্বরে আমি বল্লুম "আমায় ক্ষমা ক'র নিরু? তোমায় আমি এতদিনে চিনতে পারি নি" মুখখানি তার একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—জল

ভাবে ছিন্ন মেঘের ফাঁকে তরুণ অরুণ স্বর্ণাভ কিরণের মত। আমার সেই "ঘৃণিতা" মর্ম্ম পীড়িতা', সতীরাণী, নিরু স্বর্গে চলে গেল।

ক্রমশঃ

ইয়ং 'বেঙ্গল'ও বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্য।

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।]

গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক গতি ও প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার ধারা ইংরাজী ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় ভাবকে লোকে তখন ঘৃনার চক্ষে দেখিত। বিদেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলেই দেশীয় সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বিজেতা রোমান্‌-গণ বিজিত গ্রীকদের পুরাণ, সাহিত্য ও দর্শন গ্রহণ করে; অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে গ্যালিফ বা ফ্রেঞ্চ প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়। ইংরাজী সাহিত্যের বিপুল শক্তি, বিরাট প্রতিভা ও উচ্চ আদর্শ বঙ্গের চিন্তাও ভাবের ধারা এবং আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় চার্লস্‌ রাজা হইবার পর যেমন সমগ্র দেশটা ফরাসী-তন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যায়, তেমনি সহজ ভাবে ইংরাজীর ভাগীরথী প্রবাহে বঙ্গের তদানীন্তন অনেক ভাবুক শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের ঐরাবতের মতই ভাসিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে নব্য তন্ত্রের যুবকগণকে ব্যাঙ্গচ্ছলে 'নবীন বাঙ্গালী' (young Bengal)—আখ্যা প্রদান করা হইল। ইংরাজীতে অর্দ্ধ শিক্ষিত কলিকাতার বাবু,—গর্ব্বে হিমাচলের মত, ফ্যাশানে কেতাদুরস্ত, খানাপিনায় আহেলে বিলাতী, কথাবার্ত্তায় শেক্‌স্‌পীয়র্‌ মিলটনের রচনা উদ্ধৃতকারী—উভচর জীবটীর নামই 'ইয়ং বেঙ্গল'।*

---

* The Citizen, Tuesday july 8,851) ইংরাজী কবি বায়রনের সময়ে এইরূপ একদল সমাজদ্রোহী যুবক সভ্য ইংরাজ সমাজে বিরোধের জয়ধ্বজা নিখাত করিয়াছিল। "লোকরহস্যে" বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যাত "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"—মন্ত্রে তাহারা দীক্ষিত,—তাহাদের আত্মপর ভেদ ছিলনা, পরের জিনিষকে নিজের বলিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতনা, শবমুণ্ডাস্থি-নির্ম্মিত পানপাত্রে তাহারা মদ্যপান করিত, পরের নিকট ধার-করা রুমাল বা জামা আর কখনো তাহারা প্রত্যর্পণ করা উচিত মনে করিত না।

নব্যতন্ত্রের এই যুবকেরা দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও পরোক্ষভাবে বঙ্গীয় সমাজের তাহারা যে উপকার করিয়াছে, তাহা ভুলিবার নহে। মন্দ জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের উচ্চ আদর্শও বঙ্গীয় সাহিত্যে আসিয়াছে,—আবর্জ্জনাময় বর্ষার নদীধারা অপেয় হইলেও যেমন বিপুল বন্যায় দুই কূল উর্ব্বর করিয়া চলে, তেমনি এই বিদেশী সাহিত্যের প্রবাহ ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিকর হইলেও সমষ্টিরূপে জাতির কল্যাণই সাধন করিয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তার প্রণালী ও কর্ম্মজীবনের আদর্শ এইরূপে মিলনের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। সে যুগের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি দুইটী দেশের মধ্যে তন্ত্রধারকের কাজ করিয়াছিলেন। পেয়ারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জজ্ দ্বারকানাথ মিত্র, 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র তেজস্বী সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'রেইস্ এণ্ড্ রায়টের ধীমান্ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাহাদের বলিবার ও লিখিবার ভঙ্গী তদানীন্তন বিখ্যাত বিলাতী বক্তা ও লেখকগণের আদর্শ হইতে কোনো ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে। যুগধর্ম্মানুসারে একযুগের আদর্শ পরবর্ত্তী যুগের আদর্শানুযায়ী হইতে পারে না; সেজন্য কোনো যুগের আদর্শই নির্জ্জলা স্তুতি বা নিন্দাপ্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারে না। আলোচ্য যুগের ইংরাজি শিক্ষায় বহু দোষ থাকিলেও ইহার গুণ সমূহ উপেক্ষনীয় নহে। দেশী ও বিদেশী শিক্ষার সংঘাতের ফলে শেক্স্পীয়রের নাটকাবলিও নূতন প্রণালীতে পঠিত হইতে লাগিল। হিন্দুকলেজের অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ ডি'রোজিও এবং কাপ্টেন্ ডি, এল রিচার্ড্সন্ ছাত্রগণের মধ্যে নূতন ভাবের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিলেন। বাঙ্গালীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শের হিরণ্যকশিপু লর্ড মেকলেও তাহাদের সেকস্পীয়র-আবৃত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। নাট্যকলার উৎকর্ষসাধন, সঙ্ঘগঠনের প্রচেষ্টা, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রীতিস্থাপন, নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা, উন্নত রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প, ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে উদারনীতির প্রয়োগ, স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা ও আন্তর্জাতিক সখ্য প্রভৃতি নানা ভাবের উন্মেষ এই 'ইয়ং বেঙ্গলে"র দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিদেশীয় নাট্যসাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বতন সংস্কৃত নাটকসমূহের দিকে লোকের শ্রদ্ধা কম হয় নাই। দেশীয় নাটকের অভাবে এ সময় বহু ব্যয়ে অনেক ধনী সাহিত্যানুরাগীর গৃহে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা সকলের পক্ষে বোধগম্য নহে বলিয়া এই অভিনয়

যথাযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্যই অনুবাদগ্রন্থের প্রয়োজন হইল। সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক্ ও জার্ম্মাণ সাহিত্য হইতে বহু শিক্ষিত লোক অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব এ যুগে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। এই অনুবাদ-সাহিত্যের ফলে বাঙ্গলা ভাষা নানা বিষয়ে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। যে সমস্ত বিষয় পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনার অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত এখন তাহা বাঙ্গালায় লেখা সহজসাধ্য হইয়াছে। এই যুগে সেক্স্‌পীয়ারের কয়েকখানি সর্ব্বোত্তম নাটক বাঙ্গলা ভাষায় অনূদিত হয়। ইহারও বহুপূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহী অনেক ইংরাজ বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে যত্নশীল হইয়াছিল। একশত ত্রিশ বছরের পুরাতন একটী বর্ণ ও চিহ্নপ্রকরণবর্জ্জিত বিজ্ঞাপনে আমরা ইহার নিদর্শন পাই :—

"ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের সিখিবার কারণ এক বহি অতি সিগ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবেক সাহেব লোকে বাঙ্গালা কথা সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএব সকল লোকের কেফাএত কারণ এই বহি তৈয়ার করা জাইতেছে জে ২ লোকে চাহে তাহারা মেং আবজান [Mr. Upjohn] সাহেবের ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী তারিখ ১৯ মার্চ্চ সন ১১৯৮ বাঙ্গলা তারিখ ৯ চৈত্র।"*

এই দৈনিক সংবাদপত্রখানি মি এ আপজন ৮ নম্বর লালবাজার হইতে প্রকাশিত করিতেন। পুস্তক-বিক্রয়-ব্যবসায়ে তিনি সেকালের 'গুরুদাস চাটুয্যে' ছিলেন। উদ্ধৃতাংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষার নমুনামাত্র নহে, ইহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষার আদান প্রদান করিবার আন্তরিক চেষ্টা অনুবাদ কার্য্য ভালরূপে চলিবার জন্য তৎকালে Vernacular Literature Committee-নামক একটী সংসৎ স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, ডক্ল্ সিটন-কার, রেঃ, জে, লঙ প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন এবং সকলেই বাঙ্গালা ভাষার দ্রুত উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। অনুবাদকার্য্য কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা সাহিত্যিক-গণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃত 'কলম্বসের জীবন-চরিত", রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "শিবাজীর জীবনী" লঙ সাহেবের

* Calcutta Chronicle, Tuesday, march 20, 1792.

"Selections from the Native press" এই সভা হইতে প্রকাশিত হয়। Annual Register নামক বাৎসরিক পঞ্জী এই সভার মুখপত্র ছিল।

(Vide The Citizen, Monday, July 12, 1852.)

ইহার ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে "কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী" স্থাপিত হয়। ইহার কাজ ছিল—"The preparation,publication of cheap or gratuitious supply of works (English as well as Asiatic) useful in schools and seminaries of learning." ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন পুস্তক এই পরিষদের দ্বারা প্রকাশিত হইত না। ইহার চতুর্থ বৎসরে (১৮২১ খৃঃ অঃ) গভর্ণমেণ্ট ইহার কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করেন ও এককালীন ৭০০০৲ ও মাসিক ৫০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। এই পরিষৎ কর্ত্তৃক সর্ব্বসমেত ১০৪,১৮২ সংখ্যক গ্রন্থ নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল—সংস্কৃত ৩৪০, বাঙ্গালা ৬৩,৩৪৭ ও হিন্দুস্থানী ৭৬২২। (The Asiatic Journal, March, 1826, in an article called, Progress of Education in British India, p 325

অন্যান্ত অনুবাদগ্রন্থ নিম্নে উল্লিখিত হইল—

১। সোলন্ ও পাবলিকোলার জীবনচরিত (Bioi Parallegoi) সোমনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গ্রীক হইতে অনূদিত।

(Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum, by J. F. Blumhardt, London, 1886, p, 102)

২। টমকাকার কুটীর—তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনূদিত, কলিকাতা, ১৮৬৩। *

৩। মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্ট্, ১৮৬৯, কলিকাতা। †

৪। হান্স্ খ্রীষ্টিয়ান্ আণ্ডারসনের গল্প—মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮৫৭ ও ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে অনূদিত - চীনদেশীয় বুলবুল, কুৎসিত হংস-শাবক, মরমেত (Mermaid), পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা, বিচার অর্থাৎ বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের দোষপরীক্ষা।

---

* Op. cit., p. 103)

† "The work is described on the title-page as Bose's works, Pt. I. No clue has been found to the full name of the author"—Op. Cit., p. 66.

৫। ব্যনিয়ানের "যাত্রীকের গতি" (Pilgrim's progress) কলিকাতা ১৮৫২। *

৬। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক (কৃষ্ণমিশ্র)—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন,—রামকিঙ্কর শিরোমণি কর্ত্তৃক অনূদিত। ১৮৫৫।

৭। মালতীমাধব—কালিপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ (১৮৫৯)।

৮। উত্তর রামচরিচত্ত নাটক—তারাকুমার কবিরত্ন (১৮৭১)।

৯। মৈথিলীমিলন নাটক (ভবভূতি বিরচিত 'উত্তররামচরিত' হইতে)।

১০। রোমিও ও জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান গুরুদাস হাজরার অনুবাদ, ১৮৪৮। †

১১। মহানাটক—(মধুসূদন মিত্রের পাঠ) রামগতি ভট্টাচার্য্য কবিরত্নের অনুবাদ, ১৮৭৮। ‡

১২। চারুমুখচিত্তহরা নাটক—শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষ কৃত (১৮৬৪)

১৩। শকুন্তলার অনুবাদ—

(ক) শকুন্তলা—বিদ্যাসাগর কৃত (১৮৫৪)

---

* Supplementary Catalogue of Bengali Books by Blumhardt, 1910. P. 43.

† ইয়োরোপীয় বিয়োগান্ত নাটকের ইহাই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ। ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনও নাটকের বঙ্গানুবাদ আমি দেখি নাই। সেকালে সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকের চক্ষে এই কাহিনীটি অপূর্ব্ব ও বিচিত্র বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

‡ ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা কালীকৃষ্ণের অনুবাদ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হয়। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে এই গ্রন্থ রাজা উৎসর্গ করেন। উপহার পৃষ্ঠা এইরূপ—"শ্রীমন্মহানাটকঃ। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নৃপতি রামচন্দ্রচরিত। শ্রীমদ্ধনুমতা বিরচিতগ্রন্থঃ। ইদানীন্ত মূলসংস্কৃতাদুদ্ধৃত তদর্থেঙ্গলণ্ডীয়ভাষয়া। শোভাবাজারস্থ শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরেণ। অনুবাদিতঃ নগরবর কলিকাতান্তর্গত। সারসংগ্রহযন্ত্রে শ্রীনবকৃষ্ণ সরকারেণ মুদ্রাঙ্কিতঃ। শকাব্দ ১৭৬২।

প্রধান [তম ?] ব্রীটন আইরলণ্ডমহারাজাধ্যয়াধিকারিণী কৃপাপ্রকাশিনী। পরমারাধিনী বিবিধযশস্বিনী প্রতাপশালিনী মহারাজ্ঞী। শ্রীমতী বিক্‌টারিয়া। সাম্রাজ্যবর্দ্ধিনী বিজয়িনী লোকপ্রতিপালিনী নানানীতিশাস্ত্রবিনোদিনী। গুণিগণগ্রাহিনী সম্মত্যানুসারতঃ সংস্কৃত প্রচলিত। শ্রীমন্মহানাটকগ্রন্থস্য। ইংলণ্ডীয় ভাষয়ানুবাদঃ। সেনকরাজক শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃকঃ। তন্মহাভিধানোদ্দেশতঃ। কৃতোপায়নঃ।"

(খ) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা—নন্দকুমার রায় কৃত সর্ব্ব প্রথম পদ্যানুবাদ (সময় ?)

(গ) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ও জগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত (১৮৬৯)

১৪। মুদ্রারাক্ষস—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কৃত (১৮৭১)

১৫। রত্নাবলী নাটক—রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত (১৮৫৭)

১৬। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের অনুবাদ (১৮৫৮)

১৭। (ক) বিক্রমোর্ব্বশী- দ্বারকানাথ গুপ্তের অনুবাদ (১৮৬২)

(খ) বিক্রমোর্ব্বশী—রামসদয় ভট্টাচার্য্যকৃত (১৮৫৯) *

১৮। (ক) মালতীমাধব—ভবভূতির নাটকের গল্পাংশ—কালীপ্রসন্ন ঘোষাল (১৮৫৮)

(খ) মালতীমাধব—লোহারাম শিরোরত্ন (১৮৬০)

১৯। মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্ম্মানুরূপ লেম্বস্ টেলের কতিপয় আখ্যায়িকা etc. E. Roer কৃত বঙ্গানুবাদ—"Bengali Family Library Series" (১৮৫৩)

২০। টম্ জোন্স্ নামক রহস্য নাটক (Fielding হইতে) মহেশচন্দ্র দাস দে ও গোপালচন্দ্র নাথ কৃত (১৮৬৩)।

২১। বেণীসংহার নাটক। ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের অনুবাদ, কেদারনাথ তর্করত্ন কৃত (১৮৭০)।

২২। রত্নাবলী নাটিকা নীলমণি পাল কৃত ও চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংশোধিত (১৮৪৯)

২৩। সুরলতা নাটক—পেয়ারীলাল মুখোপাধ্যায় কৃত শেক্স্পীয়রের Merchant of Venice অবলম্বনে (১৮৭১)

২৪। অনুতাপিনী নবকামিনী (Nicholas Rowe's Fair Penitent) শ্যামাচরণ দাসদত্ত কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত (১৮৫৬)

২৫। বসন্তসেনা। মধুসূদন বাচস্পতি কৃত সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অনুবাদ (১৮৬৬)

২৬। বাসবদত্তা—মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ (১৮৩৬)

---

* Catalogue of Books in the Library of the Board of Examiners, 1903, Cal.

(হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কৃত "বঙ্গভাষার লেখক," প্রথম খণ্ড, ২৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

২৭। ভানুমতীচিত্তবিলাস—হরচন্দ্র ঘোষ কৃত শেক্স্‌পীয়রের Merchant of Venice অবলম্বনে। (?)

২৮। চন্দ্রবতী—নিমাইচাঁদশীল কৃত (Reynold's Loves of the Harem)

২৯। টেলিমেকস্—রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দুইখণ্ডে সমাপ্ত (১৮৫৮-৬০)।

নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যকে ইংরাজী সাহিত্যের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে এই সমস্ত সুবিখ্যাত অনুবাদ-গ্রন্থ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। গল্প, কথাসাহিত্য, নাটক, পৌরাণিক কাহিনী, জীবনচরিত, উপাখ্যান, হাস্য-রসপূর্ণ কথোপকথন, প্রহসন, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার রচনার বাঙ্গালায় আবির্ভাব হইল। খৃঃ পূঃ ১৮০০ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত ইংরাজীর অনুকরণে বাঙ্গালায় এই সব পুস্তকগুলি অনূদিত হয়। সংস্কৃত ও ইংরাজী হইতে অনুবাদিত পূর্ব্বোক্ত নাটকগুলির মধ্যে কয়েকখানিমাত্র এমেচার থিয়েটার দল কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। ভাবাতিশয্যই এই যুগের ভাষার একমাত্র লক্ষণ। কোনও বর্ণনা করিতে হইলে সংস্কৃত সমাসঘটিত যতিবিহীন সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর প্রয়োগ তখন রুচিসঙ্গত ছিল। সাধারণ পাঠকের নাটক সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা ছিল না। তাহারা কবির গানের সহিত হাফ্ আখড়াই, পাঁচালীর সহিত তর্জ্জার গোল করিত। তাহারা মনে করিত একটা গল্পকে কথোপকথনের ভঙ্গীতে বলিতে পারিলেই তাহাকে 'নাটক' বলা যায়। এই অস্পষ্ট ও অদ্ভুত ধারণার নিরসন হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। "ইয়ং বেঙ্গল" যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে এখনো শেষ আহুতি পড়ে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই নানাদিকপ্রসারী প্রতিভা সঞ্চয় করিতে বাঙ্গালা দেশকে অনেক স্বার্থ বলি দিতে হইয়াছিল। মাইকেল দত্ত খৃষ্টান্ হইয়াছিলেন; শম্ভুচন্দ্র, রামগোপাল প্রভৃতি ইংরাজীতত্ত্বে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, অন্যান্য অনেককে ইংরাজীর মায়ায় চিরমুগ্ধ হইতে হইয়াছিল! কিন্তু সর্ব্বত্রই একটা ধারা বহিয়াছে সকলেরই হৃদয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশীয় উন্নতির প্রচেষ্টা হবিস্পুত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়াছিল।*

---

* লেখক-প্রণীত ইংরাজি-গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের মর্ম্মানুবাদ।

বর্ষা বিভ্রাট।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

বলাকা বিজলী বিলাসী জলদ
সাজায়েছে নিজ কান্তি দিয়া,
গিরি শিরশায়ী নীল মণ্ডপে
দ্বিগুণ সুষমা বিস্তারিয়া!
একি মেঘ সখি! এমন নীলিমা,
নয়নে কখনো দেখিনি আর,
দাঁড়া দেখি আজ দেখি ভাল করে'
দেখিবনা বুঝি পুনর্ব্বার!
মেঘ নয় এত! বিজলী নয়রে!
কণ্ঠে দোদুল গুঞ্জা হার,
পরিধানে পীত বসন; একেগো
অচল উজল হাসিতে যা'র!
নয়ন পথের পথিক হ'য়েছে
এ অতুল শোভা অনেক বার,
হেন ভঙ্গিমা, মধুরিমা আমি
দেখিনিত আগে দেখিনি আর!
এক অঙ্গের শোভা নিরখিতে
নিমীলিত হ'য়ে আসে যে আঁখি
এই লাবণ্য সিন্ধু হেরিব,
কোন্ লহরীরে না দেখে রাখি?
এক বিন্দুর শোভা বর্ণিতে
রসনা আমার আবেশে মুক,
শুধু দেখি সখি, দেখার পুলকে,
থর থর করে' কাঁপে যে বুক!

বন্দী-জীবন।

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল)

সেই আসন্ন বিপ্লবের সকল আয়োজনের মধ্যে আমাদের অনেকের মনেই কেমন এক অনির্দ্দেশ্য ভয় ও সন্দেহের ভাব বিদ্যমান ছিল, আমরা যেন নিঃসংশয় রূপে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে সত্যই বিপ্লব আরম্ভ হইবে। শত সহস্র বৎসরের দীনতা ও হীনতায়, পরবশতায় সহস্র গণ্ডীর আবেষ্টনে আমরা এমনি আত্মশক্তিতে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে স্বাধীনতার পূর্ণ আদর্শ কল্পনা করিতে পারিলেও এবং সেই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও আমরা যেন আমাদের শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে বিপ্লব সত্যই আরম্ভ হইবে। জন্মদুঃখী যেমন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে কোনও দিন আবার তাহারও ভাগ্যে সুখোদয় হইবে,—চির উপেক্ষিত, চির বঞ্চিত যেমন আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিলেও কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে কোনও দিন আবার সেও কাহারও প্রেমাস্পদ হইতে পারে, আমরাও যেন ঠিক তেমন ভাবেই ভারতের ভাগ্যোদয়ে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

এইরূপ মনের ভাব লইয়াই বিপ্লবের আয়োজন চলিতে লাগিল। বাঙ্গলায় বিভিন্ন কেন্দ্রে বিপ্লবকারিদিগের জন্য হাফপ্যাণ্ট তৈয়ারি হইল। পাঞ্জাবে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈয়ারি হইল। সেই পতাকার বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে শিখেরা নিজেদের বিশিষ্ট চিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও ভারতের অন্যান্য জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ ভারতের জাতীয় পতাকা চতুর্ব্বর্ণান্বিত হইল। কোথাও রসদের বন্দোবস্ত হইল, কোথাও কোথাও বা স্থানীয় মোটর, লরি, প্রভৃতি বিভিন্ন যানের তালিকা প্রস্তুত হইল। সারা উত্তর ভারতের বিপ্লবপন্থীরা কত উদ্বেগের সহিতই না পাঞ্জাবের দিকে তাকাইয়া দিন গণিতে লাগিলেন, পাঞ্জাবের সঙ্কেত হেলনেই যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে আগ্নেয় গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাৎ আরম্ভ হইয়া যাইবে। শোনা গিয়াছিল শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু নাকি বলিয়াছিলেন ১২ বৎসরের তপস্যার পর তিনি যেদিন স্বীয় গুহা হইতে বাহির হইবেন সে দিন হইতেই ভারতের স্বাধীনতার যুগ আরম্ভ হইবে। তিনিও এই ১৯১৫ সালের বোধহয় ফেব্রুয়ারি মাসেই স্বীয় গুহা হইতে বাহির

হন। অবশ্য এই বিপ্লবের আয়োজনের বিষয় তিনি ঘুনাক্ষরেও কিছু জানিতেন না। কিন্তু বাহির হইয়া তিনি ইঙ্গিতে বলেন এখনও কিছু বিলম্ব আছে এবং এই বলিয়া পুনরায় তিনি স্বীয় গুহায় প্রবেশ করেন। ভগবানের অভিপ্রায় সকল সময় ঠিক বোঝা যায় না। সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের সকল পুরুষার্থ যেমন বারে বারে ব্যর্থ হইয়াছে, এবারেও তেমনি সারা উত্তর ভারত জোড়া এত বড় বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইল। কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই যেন তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া দেবতার পূজায় অর্ঘ্য প্রদান করা হইল। কেমন করিয়া এমন হইল তাহাই বলিতেছি।

পাঞ্জাবের গোয়েন্দা বিভাগে একটি মুসলমান ডেপুটি সুপারেন্টেডেন্ট কৃপাল সিং নামে জনৈক শিখকে নিজের চর রূপে এই বিপ্লবদলে ঢুকাইয়া দেন। কৃপাল সিংএর কোনও সম্পর্কের একটি ভাই ইংরাজ সৈনিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং তিনি এই বিপ্লব দলেও যোগ দেন। প্রধানত এই সৈনিকের সাহায্যেই কৃপাল সিং সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে এই দলে প্রবেশ লাভ করেন। ইঁহার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কিন্তু কৃপাল সিংএর গতিবিধির প্রতি অনেকের সন্দেহ আকৃষ্ট হয়। তখন কয়েকটি নেতার পরামর্শে ইঁহাকে সর্ব্বদা চ'খে চ'খে রাখা ঠিক হয় এবং ইহার ফলে দুই চারিদিনের মধ্যেই প্রকাশ পায় যে ইনি পুলিশের কর্ত্তাদের নিকট নিত্য নিয়মিত যাওয়া আসা করেন। এদিকে বিপ্লব আরম্ভ হইবার আর দিন কয়েক মাত্র বিলম্ব আছে। এইরূপ অবস্থায় যদি ইঁহাকে এ দুনিয়া হইতে সরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে এমন বিষম একটা গোলযোগ আরম্ভ হইতে পারে যাহাতে আমাদের শেষ মনোরথ সিদ্ধির পথে হয়ত বিষম বাধা উপস্থিত হইবে। এইরূপ আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়াই তখন তাঁহাকে একেবারে সরাইয়া ফেলিবার কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গলার লোকেরা তাঁহাকে বাঁচিবার দায় হইতে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি দিতেন। যাহা হউক ক্রমে জানিতে পারা গেল যে বিপ্লবের জন্ম যে দিন ধার্য্য করা হইয়াছিল তাহাও পুলিশ জানিতে পারিয়াছে, কারণ কৃপাল সিং সে তারিখ জানিত। অগত্যা ঠিক করা হইল যে কৃপাল সিংকে আর বাটির বাহির হইতে দেওয়া হইবে না এবং বিপ্লবের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারি করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভাগ্য দোষেই হউক অথবা ভাগ্যক্রমেই হউক বিপ্লবের এই নূতন তারিখের সংবাদ সেনানিবাসে দিয়া আসিবার ভার যাহার উপর পড়িয়াছিল তিনি যখন সেনা নিবাসে সেই খবর দিয়া আসিয়া রাস-

বিহারীর নিকট বলিলেন "সেনানিবাসে ১৯শে ফেব্রুয়ারির কথা বলিয়া আসিলাম" ঠিক সেই সময় কৃপাল সিংও সেই খানেই বসিয়া। কৃপাল সিংএর কথা সকলে ত জানিত না। এই ঘটনা বোধ হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইল। সেই দিনই দুপুর বেলায় যখন সকলে আহার করিতে এদিক ওদিক গিয়াছে তখন কৃপাল সিংও বাটির বাহির হইবার উপক্রম করিল। কৃপাল সিংএর নিকট যিনি ছিলেন তিনি তাঁর হাত ধরিয়া আর টানটানি না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকটেই রহিলেন। কৃপাল সিং বাটির বাহির হইতেই দেখিতে পাইল গোয়েন্দা বিভাগের একটি লোক সাইকেল করিয়া তাহার দিকেই আসিতেছে। তাহার সহিত দেখা হইবামাত্র ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের সংবাদ পুলিশে চলিয়া গেল এবং তার অল্প কয়েক ঘণ্টার পরেই ধর পাকড় আরম্ভ হইয়া গেল। কৃপাল সিং যে বাটিতে ছিলেন সেই বাটিতে ৭।৮ জন গ্রেপ্তার হইলেন আর তাঁহাদের মধ্যে নেতৃ স্থানীয় কয়েকজন ছিলেন। রাসবিহারী যে বাটীতে থাকিতেন সেবাটি দুই একজন নেতা ভিন্ন আর কেহ জানিতেন না, কারণ তিনি যাহাদের সহিত দেখা শুনা করিবার প্রয়োজন হইত, সব অন্যান্য বাটিতে করিতেন। ওদিকে সৈনিক-দিগের হস্ত হইতে ম্যাগাজিনের ভার ইংরাজ সৈনিকদিগের হাতে চলিয়া গেল। সহরের সকল ইংরাজ ভলান্টিয়ারদিগকে সমর সজ্জায় সজ্জিত করা হইল। সকলকেই ক্যাম্প করিয়া থাকিতে হইল। যুদ্ধের সময় যেরূপ সতর্ক হইয়া থাকিবার প্রণালীকে পিকেট করা বলে, ইংরাজ সৈনিক ও ভলান্টিয়ারেরাও সেইরূপ পিকেট করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্বেত সৈনিকেরা কুচকাওয়াজ করিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। লাহোর, দিল্লী, ফেরোজপুর, সর্ব্বত্রই এইরূপ; সকলে মনে করিল হয়ত বা ইহার সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধেরই কোনও সম্পর্ক আছে। দেশী সিপাহীরা কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণিল (অবশ্য যাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল)। এদিকে বিপ্লবের তারিখ আগাইয়া দেওয়াতে গ্রামের সকল লোক সকল দিকে একত্র হইতে পারে নাই। কার্ত্তার সিং মাত্র ৭০।৮০ জন লোক লইয়া ফিরোজপুরের সেনানিবাসে পূর্ব্বেকার কথা মত গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানকার অবস্থাও ঠিক লাহোরের মত,—দেশী সৈন্যের হাত হইতে ম্যাগাজিন ইংরাজ সৈনিকের হাতে চলিয়া গিয়াছে, ইংরাজ সৈনিক অত্যন্ত সতর্কভাবে পিকেট করিতেছে। কার্ত্তার সিং কিন্তু লাহোরের কোন সংবাদই জানেন না।

ব্যারাকে ঐরূপ সতর্কতা থাকা সত্বেও কর্ত্তারসিং দেশী সৈন্যের হাবিলদারদের

সহিত গিয়া দেখা করিলেন। হাবিলদারেরা বলিলেন আরও দিন কয়েক অপেক্ষা না করিলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না কারণ এরূপ অবস্থায় কিছু করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। কার্ত্তার সিং বুঝিলেন এ যাত্রা আর কিছু হইবে না কারণ দু'চারদিন পরের অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে তাঁর আর কোনও সংশয় রহিল না। তিনি কতরূপ সৈনিকদিগকে বৃথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে আজ তখনই কিছু না করিলে ভবিষ্যতে আর কিছু করা সম্ভব হইবে না। সিপাহিরা প্রত্যুত্তরে ইংরাজ পিকেটদিগের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বুঝাইয়া দিল যে এ সময় কিছু করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে! তাহারা সব জানিয়া শুনিয়া ত আর অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে পা বাড়াইতে পারে না। সেদিন যদি ভারতবাসীর হাতে উপযুক্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র থাকিত তাহা হইলে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও ভারতের বিপ্লব কেহ রোধ করিতে পারিত না। অথবা যদি পূর্ব্বহইতেই শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোক বিপ্লবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সৈনিক শ্রেণীতে গিয়া যোগ দিতেন তাহা হইলেও সেদিনের বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইত না। সেদিন অগত্যা কার্ত্তার সিংকে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। গ্রামের লোকেরা গ্রামে ফিরিয়া গেল। কার্ত্তারসিং লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। পাঞ্জাবময় তখন ধরপাকরের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। যাহারা ধরা পড়িতেছে তাহাদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ আবার স্বীকারোক্তি করিয়া আরও পাঁচজনার নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিতেছে। এইরূপে কখন কখন গ্রামকে গ্রাম ইংসৈনিকদিগের দ্বারা ঘেরাও হওয়ায় বহুলোক একত্র গ্রেপ্তার হইতেছে। দেশীয় সৈনিকদিগের মনে কেমন এক সন্ত্রাসের ভাব দেখা দিয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডির এক দেশীপল্টনকে সৈনিকশ্রেণী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। লাহোরে এখানে সেখানে ক্রমাগত খানাতল্লাসি ও গ্রেপ্তার হইতেছে। শিখ দেখিয়া একটু সন্দেহ হইলেই সোজা থানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। এইরূপে ধরিতে যাইয়া কখনও কখনও দুইদিকেই গুলি চলিতেছে। এই অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই এইরূপ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল দলের পরস্পরকে বিশ্বাস করা ভয়ের কারণ হইয়া পড়িল।—কার্ত্তার সিং বুদ্ধিমান যুবক ছিলেন। লাহোরে আসিয়া অন্য কোথাও না গিয়া সোজা রাসবিহারীর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসবিহারী তখন বিষাদগ্রস্ত মনে একটি খাটের উপর নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিলেন। কার্ত্তারসিংও শান্তভাবে তাঁর পার্শ্বের আর একটি খাটের উপর গিয়া তাঁহার ক্লান্তিভরা অবসন্ন দেহ

খানিকে এলাইয়া দিলেন। উভয়ই নীরব। তাঁহাদের সেই ম্লানমৌনতার মধ্য হইতে কতবড় নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার কথাই ব্যক্ত হইতে লাগিল। জীবনে এতবড় আঘাত পাওয়া আমাদের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে; যাঁর যত বড় কল্পনা ভাবের নিবিড়ত্ব ও গভীরতা যাঁর যত বেশি জীবনে আঘাত পাওয়ার গুরুত্বও তাঁর সেই পরিমাণ অধিক। তাঁহাদের কত বড় আশা শতধা ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের বিরাট আয়োজন যে নিমিষে কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল! এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত মনেই কত ভাব বিপর্য্যয় ঘটে, তাই সৈনিকদের মধ্যেও যে বিষম আতঙ্কের ভাব আসিয়া তাহাদের মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! এতবড় যুদ্ধের অবকাশেও বিপ্লবদল এত আয়োজন করিয়াও কিছু করিতে পারিল না! পুনরায় যে কবে আবার এইরূপ সুযোগ আসিবে তা যেন কল্পনার অতীত!—কিন্তু তা সত্বেও এত বড় আঘাতের পরেও আবার তাঁরা কোমর বাঁধিয়া কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। তাঁদের বুকে যেন অফুরন্ত আশা, হৃদয়ের বল যেন নিঃশেষ হইতে চায় না। তাই আবার তারা নবীন উদ্যমে সেই নিবিড় তমসাছন্ন ভারত-আকাশের নিভৃত এক কোণে তাহাদের চক্ষের দীপ শিখাকেই সম্বল করিয়া সেই হতাশাছন্ন জীবনপথে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন। মানসিক আঘাত তাহারা খুবই পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তাহারা অভিভূত হইলেন না। এত বড় মানসিক বলের মর্য্যাদা আমরা কয়জন ভারতবাসি বুঝি! বীরই বীরের মর্য্যাদা বোঝে তাই ভারতীয় বিপ্লবদলকে ইংরাজ যে চক্ষে দেখিতেন বা দেখেন, কয়জন ভারতবাসী তাঁহাদিগকে সে চক্ষে দেখিতে পারেন? ভারতের বিপ্লবদল ভারতবাসীর নিকট চির উপেক্ষিত হইয়াছে। এই উপেক্ষা ভারতীয় বিপ্লবদলের বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথরের মত নিরন্তর নিষ্ঠুর ভাবে নিষ্পেশণ করিত, এত অবজ্ঞা তাঁহারা আর কাহারও নিকট পান নাই। যাঁহাদের নিকট এই বিপ্লবদল সকলের চাইতে বেশী সহানুভূতির আশা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এই বিপ্লবদল কেবলমাত্র টিটকারিই শুনিয়াছেন, কিন্তু তাতেও ইঁহারা ভগ্নোদ্দম হন নাই। ইঁহাদের প্রাণ যেন কোন স্বপ্নলোকের কল্পনায় ভরপুর ছিল; নিজেদের প্রাণের সম্বলটুকু ছাড়া যেন ইঁহারা আর কিছুরই ভরসা রাখিতেন না —এই বিপ্লবচেষ্টা পণ্ড হইয়াছিল বটে, কিন্তু সফলতা নিষ্ফলতার দিক হইতে কোনও আন্দোলনকে বিচার করা উচিত নহে। এই আন্দোলনের পশ্চাতে কত বড় আদর্শের কল্পনা ছিল এবং এই আদর্শকে উপলব্ধি করিবার জন্য কয়েকজন কতখানি ত্যাগ

স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন এই সব ধরিয়াই এই আন্দোলনের বিচার হওয়া উচিত। যাহা হউক কোন আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের যুবক বৃন্দেরা জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা করিতে পারিয়াছিলেন সে আলোচনা অন্য পরিচ্ছেদে করিবার ইচ্ছা আছে। ক্রমশঃ

'অস্পৃশ্য-নারায়ণ।'

[স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ]

জগদ্বরেণ্য কবি যেন দিব্য চক্ষে জন্মভূমির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার গূঢ় কারণ দেখিতে পাইয়া আবেগময় কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"হে মোর দুর্ভাগাদেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

ভগবান কাঙ্গাল সাজিয়া তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মূঢ় তুমি যেদিন অবজ্ঞাভরে তাঁহার পূজা হইতে বিরত হইলে তিনিও সেইদিন সহাস্য বদনে গৃহের সকল শান্তি, সকল কল্যাণ হরণ করিয়া তোমার আঙ্গিনা হইতে বিদায় লইলেন! আজ বহুদিন তাঁহার মন্দিরে আর ধূপ দীপ জ্বলে না, ধূনার গন্ধ মানব মনকে আর তেমন আকুল করিয়া তুলে না, আরতির শঙ্খ ঘণ্টাও বহুদিন হইল থামিয়া গিয়াছে, ভারতবাসি, তুমি এখনও তোমার আতুর নারায়ণকে চিনিতে পারিয়া রুধিরধারে তাহাকে অভিষেক করিতে পার নাই তাই বিধাতার অভিশাপে অপমান ভার এখনও তোমায় দীনহীন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী এখনও এক বেলা উদর পুরিয়া আহার পায় না, শিক্ষাহীন হইয়া পশুর মত জীবন যাপন করে হৃদয়ের বেদনা মুখ ফুটিয়া বলিলেও কেহ শুনিতে পায় না, ভারতের উচ্চবর্ণ নীচ জাতিকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক এখনও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারে না, অন্ন জলের অভাবে সারা ভারতে আজ ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে কিন্তু ভারতের

বিলাস স্রোত তবুও খরতর বেগে প্রবহমান। যে দেশে পতিতের এত অনাদর, বলত, পতিতের ভগবান্ সে দেশের উপর মুখ তুলিয়া চাহিবেন কেন? যে দেশের মানুষ কুকুরকে স্পর্শ করিতে পারে কিন্তু মানুষকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হয়, পতিত ভাইদের ধর্ম্ম দান করা দূরে থাক্, ধর্ম্মের ত্রিসীমানায় যাহারা কখনও আসিতে পায় না, কঠোর পরিশ্রমের ন্যায্য প্রাপ্যের বিনিময়ে যাহারা পায় কেবল ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও কশাঘাত, যাহাদের দেশে মানুষের এত অবমানন', বলত, নর-নারায়ণ সেই দেশের উপর করুণার চক্ষে চাহিবেন কেন? ভারতের মরাগাঙ্গে জোয়ার আসিয়াছে সত্য, যে দেশে মৃত্যু নাই সেই দেশের একজনার অঙ্গুলিস্পর্শে তাহার শব দেহে সত্যই জীবনী সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু কই, সেত ভৈরব হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিতেছে না, তাহার চরণের শৃঙ্খল ত আজও খসিয়া পড়িতেছে না? ঐ যে শত সহস্র কুটীরবাসী লক্ষ লক্ষ নরনারী, যাহাদের উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বসন নাই, যাহাদের মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও বাহুতে শক্তি নাই, যাহারা প্রতিবৎসর পশুর মতই লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষিত সন্তান সন্ততির জনম দান করিয়া তাহাদের জীবন সংগ্রামকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিতেছে,ভারতের প্রাণপক্ষী ঐখানে উহাদেরই ধূলি ধূসরিত দেহপিঞ্জরে লুক্কায়িত আছে, তাহাকে সতেজ করিয়া না তুলিলে ভারত জাগিবে না, বিনাশের হস্ত হইতে তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। অল্প সংখ্যক ধনী ব্যবসায়ী বা মোটা মাহিনার চাকুরি,করিয়া যাঁহারা বৈদ্যুতিক পাখার নীচে মহার্ঘ 'সিগার' ফুকিতে ফুকিতে দেশের কল্যাণ চিন্তা করেন, লাট সাহেবের দরবারে ছুটো ছন্দোবদ্ধ কথার ফাঁকা আওয়াজ করিয়া নিজেই নিজকে একজন মহা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া ভাবেন, কিন্তু দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবার প্রকৃত সময় আসিলে যাঁহারা পুত্র কন্যা পরিবার সহ দেশান্তরিত হন তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদের কি হইবে? যদি ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষক, হাড়ি, ডোম, বাউরি, নমঃশূদ্র—যাহারা প্রাণপাত পরিশ্রমে আমাদের অন্ন ও জীবন ধারণোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী নিত্য জোগাইতেছে—রাস্তা ঘাট, পয়ঃ প্রণালী, বাস ভবন, পুষ্করিণী ও বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছে, এক কথায় যাহারা আমাদের সমস্ত সুখ, সৌন্দর্য্যের আকর স্বরূপ, তাহারা প্রতি বৎসর শত সহস্র অযত্নে মরিয়া যায়? যাহারা মধুকরের মত দিবা রজনী আমাদের রত্ন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছে, যাহাদের বিপুল উদ্যমে নির্ম্মিত হইতেছে—গগনস্পর্শী শিখরসমন্বিত আমাদের সৌধভবন, বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদ ও যান বাহনাদি, স্বার্থপর আমরা—আবার তাহাদিগকেই অস্পৃশ্য বলিয়া

ঘৃণা করি, সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখি, নির্দ্দোষ তাহাদিগকে পিশাচের মত বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করি। ভারতবাসি, যতদিন না তুমি তোমার দেশের আত্মাকে ভালবাসিতেছ, পূজা করিতেছ, স্বার্থ ত্যাগরূপ তপস্তানুষ্ঠানে সেই নিদ্রিত নারায়ণকে জাগ্রত করিতেছ, ততদিন তোমার সুখ নাই, শান্তি নাই, কল্যাণ নাই, স্বামী বিবেকানন্দের বজ্র নির্ঘোষে তোমার প্রাণে কথঞ্চিৎ সাড়া আসিয়াছে—পতিত ভগবানকে তুমি কতকটা চিনিয়াছ, কিন্তু চিনিবার এখনও অনেক বাকি, পূজোপচারের এখনও অনেক অভাব। সেই চেনাকে বোধ হয় পূর্ণ করিবার জন্ত আসিয়াছেন আর এক মহাত্মা—হৃদয়ে ভালবাসা ও সহানুভূতির হোমানল জ্বালিয়া, যিনি পূত অঙ্গুলিনির্দ্দেশে স্বদেশের প্রত্যেক কল্যাণকামীর দৃষ্টি আজ সেই পতিত নারায়ণেরদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিঞ্চিদধিক পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ব্বে মানব-প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"যেদেশে কোটী কোটী মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশলাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ গরীবদের রক্তচুষে খায়, —সে কি দেশ না নরক, সে ধর্ম্ম না পৈশাচিক নৃত্য। * * * ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে, জ্ঞানমার্গ, ভক্তি মার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন করেছেন, এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই এখন ভাতের হাঁড়িতে। * * * * যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায় তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য?" উহার পঞ্চবিংশ বর্ষপরে মহাত্মা গান্ধিজী আজ পুনরায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন— "So long as the Hindus wilfully regard untouchability as part of this religion, so long as the maass of Hindus consider it a sin to touch a section of their brethren, Swaraj is impossible of attainment. Yudhisthira expected to obtain swaraj without the untouchables? What crime for which we condemn the government as Satanic, have not we been guilty towards our untouchable brethren?" ইংরাজ রাজপুরুষগণ নিরীহ ভারত বাসীকে বেত্রাঘাত করে, নাকে খত

দেওয়ায়, একাসনে বসিতে দেয় না, তজ্জন্য আমরা আজ কাল তাহাদিগকে 'সয়তান' নামে অভিহিত করি, কিন্তু আমরা আমাদের দুর্ব্বল অস্পৃশ্য ভাইদের একাসনে বসিতে দিই না, এমন কি তাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করি না, ভদ্র পল্লীর মধ্যে তাহারা বাস করিবার অধিকার পায় না, সকল প্রকার সুবিধা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখি, লঘু পাপে তাহাদের গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করি সুতরাং আমরাও কেন না 'সয়তান' নামে অভিহিত হইব? হয় ত বর্ত্তমান শাসননীতির ভয়ে—আমরা তাহাদের উপর অভীপ্সিত অত্যাচার করিতে পারি না কিন্তু ভবিষ্যতে রাজ্যভার স্বহস্তে আসিলে স্বার্থান্ধ হইয়া আমরা তাহাদের উপর যে অধিকতর অত্যাচার করিব না তাহার নিশ্চয়তা কি? অতএব, স্বরাজকামেচ্ছু ভারতবাসী, আজ তোমাদের কার্য্যে দেখাইবার প্রকৃত সময় আসিয়াছে তোমরা দেশকে কতখানি ভালবাস, জাতিকে কতখানি শ্রদ্ধা কর, স্বদেশের আপামর সাধারণের উপর তোমাদের প্রেম কতখানি গভীর ও বিস্তৃত। অজ্ঞান শিশু, নিজের ভালমন্দ কিছুই বুঝে না—সকল বিষয়ে সে জনক জননীরই মুখাপেক্ষী, জনকজননীই তাহাকে সাধ্যমত ভরণ পোষণ শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা মানুষ করিয়া তুলেন তাহা না করিলে তাঁহাদের পাপগ্রস্ত হইতে হয়। সমাজের শিশুতুল্য নিম্নজাতি সমূহও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির আশ্রয় ও রক্ষনাবেক্ষণেই জীবন যাপন করে, তাঁহারা উহাদিগকে যেরূপ রাখেন সেই রূপই থাকে, যাহা শিক্ষা দেন তাহাই শিখে, যাহা বলান তাহাই বলে, এক কথায় নিম্নবর্ণ শিশু সন্তানের ন্যায় সকল বিষয়ে উচ্চ বর্ণের উপরই নির্ভর করিয়া তাহাদের সেবাতেই জীবন নিয়মিত করে, উচ্চ বর্ণের কর্ত্তব্য স্বীয় সন্তানসন্ততির ন্যায় তাঁহাদের আশ্রিত জনকে ও সর্ব্বাতোভাবে রক্ষা করা এবং তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তোলা, তাহা না করিয়া কেবল উহাদের দ্বারা স্বার্থ সাধন করিয়া লইলে ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আজ এই যুগ সন্ধিক্ষণে স্বদেশ প্রেমিক ভারতবাসীকে জিজ্ঞাসা করি—তাহাদের মধ্যে কয়জন, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধির মত মন মুখ এক করিয়া বলিতে পারেন—"আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব—'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ এই আমার ধর্ম্ম"—অথবা "I do not want to attain Moksha, I donot want to be re-born. But if I have to be re-born, I should be born an untouchable. So that I may share their sorrows, sufferings and the affronts levelled at them, in order that I

may endeavour to free myself and them from that miserable condition. I therefore pray that if I should be born again, I should do so not as a Bramhin, Kshatriya, Vaisha or Sudra but as an Ati sudra" * যে কোন অধঃপতিত জাতির পক্ষে অল্প কয়েকটী এইরূপ নিঃস্বার্থ হৃদয়ই সেই জাতিকে তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ নাই।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

[শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী]

বন্ধু,

আঁধার ঘরে
স্পর্শ দিয়ে
যাহার পরিচয়,
গোপন সে যে
সরম-নত
কোমল অতিশয়।
হিয়ার সাথে
হিয়ার কথা,
কেউ না বুঝে আর,
স্বপ্ন মাঝে
জন্ম লভে
স্বর্গ-কুজনার!
আলোর পথে,
হৈম রথে
বাহির হলে যবে,
ফুলের মালা
তোমার গলে
পরিয়ে দিল সবে।

---

* Young India, may 4th 1921.

সবার সাথে
যোগ দিব যে—
 সাধ্য হেন নাই,
বিভল মনে
ঘরের কোণে
 রহিনু একলাই!
ফিরলে যবে
দীপ্ত ভালে,
 মৌন হাসি-মুখে,
সকল আশা
মিটল মম
 নীরব বুকে-বুকে!
সবাই বলে,
আজকে তুমি
 চির-আঁধার-ঘরে।
কেউ পাবে না
দেখা তোমার
 এক দিনেরো তরে।
বিচ্ছেদেরি
তপ্ত-শেলে
 দীর্ণ হিয়া কত
অশ্রুজলে
বিলাপ করি
 ফিরছে অবিরত।
মোর কি হল,
বন্ধু, বল,
 নাই যে আঁখি-ধার!
মৃত্যু কিগো
বিফল হল
 হানতে অসি তার?

আলোর হাটে
পাইনি দেখা,—
তাই কি বঁধু তাই,
আমা-তোমার
মিলন-মাঝে
ভেদের রেখা নাই!
যেমন ছিল,
তেমনি তর
চলছে আলাপন,
ক্ষণের আয়ু
ফুরায় শুধু
জাগে চিরন্তন!

ডেলি-পেসেঞ্জারের ডাইরী

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

আমার পৈতৃক বসবাস বারুইপুর গ্রামে। বেলেঘাটা ষ্টেসন হইতে ট্রেণে প্রায় সোয়া ঘণ্টার পথ ২৪ পরগণার মধ্যে উহা একটি গণ্ডগ্রাম। এক সময় ইহার বিস্তৃত ধানের ক্ষেত ও ফলফলারির বাগিচা শুধু যে পেটের ক্ষুধা দূর করিত এমন নয়, নয়নের ও তৃপ্তি সাধন করিত। এখন কিন্তু ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর প্রতাপে উহার লক্ষ্মী-শ্রী অনেকটা অন্তর্হিত হইয়াছে। সবুজ ধানের উপর ঢেউ খেলে যাওয়া স্নিগ্ধ বাতাস এখন পথিকের ক্লান্তি দূর করিবার সময় একটা আতঙ্ক জাগাইয়া দেয়, পাছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ম্যালেরিয়ার বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। এ রকমে বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত পল্লীই আজ জনশূন্য, শৃগাল কুকুরের বাসস্থান হইয়া আসিতেছে। তাই আজ সারা বাঙ্গলাময় হাহাকার স্বাস্থ্যহীন নিরন্ন দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ। আমাদের যে পল্লীসমাজ সভ্যতা সাধনার কেন্দ্র ছিল, সেই কেন্দ্র যখন এমনিভাবে ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে তখন সমস্ত জাতিটা যে নিস্তেজ ও অক্ষম হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে। এ শ্মশান কবে আবার মনুষ্যের বাসভূমি

হইবে কে জানে! যাক্ সে কথা, আমাদের গ্রামখানি ম্যালেরিয়ায় এমনি ভাবে নষ্ট হইলেও কতকটা বাঁচিয়া আছে। আমার পিতৃপুরুষরা ক পুরুষ ধরিয়া এখানে বাস করিতেছেন, তা আমি ঠিক জানি না, তবে পাড়ার বৃদ্ধদের কাছে শুনিতে পাই আমারা-ই নাকি এখানকার আদিম অধিবাসী। আমাদের যে এক সময় বিশেষ বনিয়াদী ঘর ছিল, তার প্রমাণ অনেক আছে। প্রথম ত এখানকার মধ্যে আমাদের বাড়ীটিই সব চেয়ে বড় পাকা দালান, কিন্তু সে দালান এখন সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হইতে বসিয়াছে। জমিজমার এখন বড় কিছুই নাই। তবে পাড়ার ঠানদিদির কাছে শুনি আমার প্রপিতামহের আমলে আমাদের জোতজমা ক্ষেত খামার খুব বেশীই ছিল, তার আয় থেকে দোল পার্ব্বণ দুর্গোৎসব সবই হইত। আমার ঠাকুরদাদা ও চাষবাস দেখিয়া শুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী ছিল। আয় যে তাঁহার কম ছিল তা নয়, তবে তাঁহার হৃদয়টা ছিল বড় মহৎ, কাহারও অর্থকষ্ট দেখিলে তিনি দুহাতে দান করিয়া ফেলিতেন, ফিরিয়া আর তাহা চাহিতেন না। তা ছাড়া তাঁহার অতিথিসেবা ও খুব বেশী ছিল, বারুইপুর গ্রামে গোলকচন্দ্রের অতিথিসেবা এখন কিংবদন্তীর মধ্যে পরিণত হইয়াছে। মোট কথা ঠাকুরদা গোলকচন্দ্রের আমলে বংশের জমিজমার কতকটা বিক্রী হইয়া যায়। তার উপর তিনি আমার পিতাঠাকুরকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্ত অনেক খরচ করিয়াছিলেন, তবে আমার পিতাঠাকুর চিররুগ্ন থাকায় খুব বেশী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনিও চাষ বাস দেখিয়াই জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহার যে এটা আদৌ ভাল লাগিত না তা তাঁহার কাজ কর্ম্মে কথাবার্ত্তায় বোঝা যাইত। তিনি বাড়ীতে মৃত্যু পর্য্যন্ত লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখিয়াছিলেন এবং আমার শিক্ষার জন্ত সর্ব্বস্ব ব্যয় ও করিয়াছিলেন। ফলে যখন আমি ইউনিভার্সিটির বি এ উপাধির ছাপ লইয়া বাহির হইলাম, তখন দেখিলাম এই শিক্ষাটা ছাড়া আমার মূলধনের মধ্যে আছে একখানি জীর্ণ দালান এবং এক টুকুরা ধেনো জমি। আমার পাশের সঙ্গে সঙ্গে মা আমার জেদাজেদি করিয়া একটি আধুনিক শিক্ষিতা পুত্রবধূ ঘরে লইয়া আসিলেন। লেখাপড়াটা মাকে ও এত পাইয়া বসিয়াছিল যে তিনি অনেক সুন্দরী কন্তাকে তুচ্ছ করিয়াও একটি মাঝারি রকমের দেখিতে শিক্ষিতা মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসিলেন। আমার যিনি গৃহিণী হইয়া আসিলেন, তাঁর বর্ণটি উত্তম শ্যামের কিছু উপর, গড়ন মন্দ নয় এবং লেখাপড়ায় তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত

পড়িয়াছেন। যাক্, বিয়ের মাস পাঁচ ছয় পর আমার পিতৃদেব আমাদের মায়া কাটাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন, সুতরাং আমি তাঁর একমাত্র পুত্র আমার উপরই সংসারের সমস্ত ভার পড়িল। অনেক চেষ্টাচরিত্র উমেদারির পর এক সাহেবের পাটের আফিসে একটি মাঝারি রকমের চাকরি জোগাড় করিয়া লইলাম। এই চাকরির ব্যাপারে হাঁটাহাটি করিতে করিতে অনেক সময়ে লেখাপড়ার উপর ধিক্কার জন্মিত, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতাম লেখাপড়ার ত দোষ নাই, লেখা পড়ায় যে চাকরীর সন্ধান করিয়া দিবে এমন ত কথা নাই, ইহাতে যে আমার মনের প্রসার অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। পেটের ক্ষুধা ভাল করিয়া দূর করিতে পারুক আর নাই পারুক, মনের ক্ষুধা যে অনেকটা মিটাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং এটাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও সব চেয়ে বেশী লাভ। যাক্, আফিসে আমার হাজির দিতে হইত দশটার সময় এবং আমি ছিলাম বারুইপুর থেকে কলিকাতার ডেলিপেসেঞ্জার। সুতরাং রোজ সাড়ে আটটার ট্রেণে নাকে মুখে কিছু গুজিয়া রওনা হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। আফিসের বড় সাহেব বেশ লোক ভাল ছিলেন, তবে আমার কাজের হিসাব রাখিতেন যে সাহেবটি তাঁর বিদ্যাটা যেমন অল্প ছিল, তাঁর মেজাজটাও ঠিক তেমনি চড়া ছিল, সেটি এমনি উচু পর্দ্দায় বাঁধা থাকিত যে কখন উহাতে গম্ভীর ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিবে তাহা কেহই বলিতে পারিত না। মাঝে মাঝে ট্রেণের বিলম্বের দরুণ আফিসে যাইতে দেরী হইয়া গেলে তিনি আমার উপর তার ভৈরবীর সুরটি ভাজিয়া লইতেন। তখন বড় দুঃখ হইত, মনে হইত এত লেখা পড়া শিখিয়াও গোলামী ছাড়া যখন আমাদের উপায় নাই, তখন আমাদে মূর্খ থাকিয়া আত্মসম্মান জাগিবার পূর্ব্বে সাহেবদের উপাসক হইয়া পড়াই ভাল। হায়রে পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী, গোলামের আবার বিদ্যা!

* * * *

রোজ আটটার মধ্যে স্নান টান সারিয়া লইয়া আহারাদি করিয়া ট্রেণের সন্ধানে বাহির হই। আমার গৃহিণী প্রতিদিন ভোর না হইতে পাখীর গানে জাগিয়া উঠিয়া স্নান সারিয়া রান্নার জোগার করিতে থাকেন। মুখে শব্দ নাই, হাসি মুখে আটটার মধ্যে আমার রান্না করা, দুপুরে খাবার জন্য আমার টিফিন তৈয়ারী করা, পান সাজা, জামা কাপড় ঠিক করা প্রভৃতি সব কাজই এমনি গুছাইয়া করেন যে তাতে বড় ভুলচুক হয় না। কিন্তু রোজ ডেলি পেসেঞ্জারি

করিয়া আর শ্বেতচরণের উপাসনা করিয়া গোলামী মগজে এতটা উত্তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, যে মাঝে মাঝে তাহা ছোটখাট আগ্নেয়গিরির মত ধূম উদ্গীরণ করিতে ছাড়িত না, অবশ্য সেটা বেচারা স্ত্রীর উপরই উদ্গীর্ণ হইত। কারণ আমাদের পুরুষ জাতটার প্রতাপ ত সব কিছু ঐ খানে! বাহিরে যে অপমান লাঞ্ছনা আফিসের সাহেব কিংবা বড়বাবুর নিকট আমাদের সহিতে হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া হয় গৃহে গৃহিণীর উপর। আশ্চর্য্যের বিষয় গোলামী করিয়া করিয়া মনটা এতটাই বিকৃত হইয়া যায় যে ইহাতে কাহারও মনে অনুশোচনাও আসে না। আমারও মাঝে মাঝে স্ত্রীর উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়াও পরে কোনও রূপ অনুতাপ আসিত না। কিন্তু স্ত্রী-বেচারী তাহাতে কোন ও রূপ সাড়া শব্দ না দিয়া অধোবদনে কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইত। অথচ বাস্তবিক আমি স্ত্রীকে যথেষ্ট ভাল বাসিতাম, তবে যে মাঝে মাঝে পান হইতে চুন খসিলে মেজাজ সপ্তমে চড়িত তাহার কারণ স্ত্রীর প্রতি বিরাগ নহে, তাহা দাসত্ব কলঙ্কিত মনের বিকার। ইহা ত আদৌ অদ্ভুত নহে কারণ গোলামের জাত পুরুষ আমরা স্ত্রীকে ত আর সহধর্ম্মিণী বা সহকর্ম্মিণী ভাবিতে পারি না, তাকে শুধু ভাবি গৃহকর্ম্মের দাসী আর বিলাসের শয্যাসঙ্গিনী।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আফিস হইতে গৃহে ফিরিবার পথে চারিদিকের শ্যামল শোভা দেখিয়া মনটা অল্পক্ষণের জন্য বেশ প্রফুল্ল হইত। পল্লীর মধ্য দিয়া যখন রেলগাড়ীটি নাতিদ্রুতগতিতে পথ বাহিয়া যাইত, তখন তাহার জ্যোৎস্না ধৌত শ্যামলশ্রী বাস্তবিকই নয়ন ও মনকে তৃপ্তি দান করিত। কোথায় ও দেখিতাম গ্রাম্য পুষ্করিণী হইতে কোনও পল্লীবধূ কলসী করিয়া জল তুলিয়া লইতেছে, পুষ্করিণীর একপার্শ্বে একটি মাছরাঙ্গা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। ক্রমে ক্রমে পল্লীগৃহের আঙ্গিনায় প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, তুলসী তলায় পল্লী-বধূ আসিয়া প্রণাম করিল। কোথাও দাওয়ায় বসিয়া পল্লীশিশুরা কোনও পল্লী বৃদ্ধার নিকট গল্প শুনিতে বসিয়াছে। তার পর যখন উন্মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়া রেলগাড়ীটি ছুটিয়া চলিত, তখন জ্যোৎস্নাপক্ষের চাঁদ উঠিলে মনটা কেন যে খামকা নৃত্য করিতে থাকিত, ঐ শ্বেত কিরণের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া কোন্ অজানা লোকে ছুটিয়া যাইতে চাহিত। বাস্তবিক তখন এই গোলামী মগজে কবিত্বের উদয় হইত। ক্রমে চোখ যখন ক্লান্ত হইয়া আসিত, তখন বাহির হইতে ভিতরে মনটাকে লইয়া আসিতাম, সেখানে তখন নানা রকমের গল্প গুজব গান টপ্পা চলিত। হয়ত আমার পাশ হইতে একটি যুবক গাহিয়া উঠিল—

"হেসে নাও দুদিন বৈত নয়।" বাস্তবিক তার অঙ্গভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিত। হয়ত বা কোনও হতাশ প্রেমিক এক পাশ হইতে বলিয়া ফেলিলেন —"না জীবনটা কিছু না, একটা ইঃ, একটা উঃ, একটা আঃ।" আবার কোনও স্থানে একদল ছোকরা বসিয়া গল্প করিতেছে। দুই একদিন আগে তাহাদের মধ্যে একজন থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছে, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কাল মনোমোহনে যে সাজাহান প্লে দেখলাম, একবারে চমৎকার, দানীবাবুর আরঙ্জেব পার্টটা একটা তাজ্জব ব্যাপার।" কোনওখানে বা আমার মত কোন কেরাণী নিজের জীবনে বিরক্ত হইয়া হয়ত গাহিয়া উঠিলেন—

"সারাদিন খেটে খেটে প্রাণপাখী যায় খাঁচা ছেড়ে
কেরাণী জীবন ফেলে লোটা আর কম্বল নেড়ে।"

এমনিধারা কত লোকের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে, কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া কখনও বা তাদের সহানুভূতি করিয়া আফিস হইতে গৃহে ফিরিতাম।

* * * *

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে যেমন চারিদিকের গভীর অন্ধকারের মধ্যে আকাশের গায়ের ধ্রুবতারাটি মাঝি মোল্লাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, তেমনি আমার এই অবসাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়কে সংসার পথে চালাইয়া লইয়া যাইত আমার জীবনের ধ্রুবতারা আমার জীবনসঙ্গিনী। কেরাণী জীবনে তাপ দগ্ধ মনের উপর যদি এই কোমল প্রলেপ না থাকিত, তবে সেই পোড়া মন কবে যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত কে জানে। অফিস হইতে গৃহে ফিরিতে না ফিরিতেই মধুর হাসিটি হাসিয়া প্রত্যহ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ানই তাহার নিয়ম ছিল। তারপর বস্ত্রপরিবর্ত্তন করা হইলে কিছু জলযোগ দিয়া পাখা খানি লইয়া সে যখন আমায় ব্যজন করিতে থাকিত, তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না তাহার হাতের পাখার হাওয়াটা অধিক স্নিগ্ধ না তাহার হাস্য বিকশিত পুষ্পিত দেহ লতাখানি অধিক মনোজ্ঞ। জীবনের গুরুভার লঘু করিবার এই যে একটা অবকাশ, ইহাই যে জীর্ণ মনের সঞ্জীবনী এ কথা শুধু তখনই বোধ হইত যখন অল্পক্ষণ মাত্রের আলাপে সারাদিনের অবসাদ কোথায় পলাইত কে জানে। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, মাতার সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া শেষ হইয়া আসিলে আমরা দুইজনে মায়ের কাছে বসিয়া গল্প করিতাম, ইহাতে মায়ের অনুমতি শুধু নয়, আগ্রহ ও ছিল। কোনও কোনও দিন মায়ের অনুরোধে আমার স্ত্রী দুই একটি কীর্ত্তন গান গাহিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। বলিতে ভুলিয়াছিলাম আমার স্ত্রী

গীতবাদ্যেও বিশেষ দক্ষা ছিলেন। তারপর আহারাদি করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিতাম, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও আসিত; কিন্তু তখন অধিক্ষণ বসিত না। বরাবরই স্ত্রীলোকের লেখাপড়ায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং আমার স্ত্রী যদিও কিছুদূর শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে আরও উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্ম আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সকল বিষয়ে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইলেও লেখা পড়া শেখা বিষয়ে সে আমার কথা কাণে তুলিত না। বোধ হয় এ শিক্ষার উপর তাহার আদৌ আসক্তি ছিল না। এক একদিন আমি জেদ করিয়া বসিতাম, আজ তাহাকে পড়িতেই হইবে। অমনি সে আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইত। আমি অভিমান করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিতাম, অল্পদূর গিয়া সে আমার গম্ভীর মূর্ত্তির পানে চাহিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিত, হাসিয়াই বলিত—"দেখ, মা ডেকেছেন মার কাছে যাই, রাগ করো না, কাল পড়বো, বুঝলে।" ঐ শেষের "বুঝলে" শব্দটি এমন প্রেম মিশ্রিত সুরে বলিত যে আমার সকল অভিমান দূর হইয়া যাইত, আমি তখনি যাইতে অনুমতি দিয়া বলিতাম—"আচ্ছা যাও, কাল পড়ো।" তারপর শয্যায় শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ না নিদ্রা আসিত তাহার ঐ "বুঝলে" কথাটি প্রাণে যে কি সুধারস ঢালিতে থাকিত,তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। কোনও কোনও দিন যখন অধিক রাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত, দেখিতাম আমার পায়ের উপর একরাশ চুল সমেত মাথাটা রাখিয়া বেশ স্বচ্ছন্দ মনে সে নিদ্রা যাইতেছে। তখন ভাবিতাম রাজারাও কি আমার চেয়ে সুখী। সুখ ঐশ্বর্য্যে আছে কি না জানি না, ক্ষমতায় আছে কি না জানি না, পদ মর্য্যাদায় আছে কি না জানি না, তবে সুখ যদি মনের বিমল আনন্দ হয় তবে বলিব তাহা বিশ্বের এই প্রেমরাজ্যে, তাহা নিশ্চয়ই এইখানে।

* * * *

হঠাৎ একদিন অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতময় জাগিয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী বলিলেন,"দাসত্ব করিয়া করিয়া বিলাস স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় যাও, ফিরিয়া চাও।" মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতবাসী দৈববাণী শোনার মত থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার মানুষ হইবার জন্ম একটা উদ্দাম ব্যাকুলতা সকলের মনে জাগিল। আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে রেলগাড়ীতে প্রায়ই যুবকদের মুখে এই গানটি শুনিতাম—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তু'লে নে রে ভাই,

দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দে'খ্‌তে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।”

এই গানটি শুনিয়া মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিত, মনে হইত সত্যই আমরা কোন্‌ অপথে বিপথে চলিয়াছি, ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই। মনের মধ্যেই আবার তখন কে বলিত, আছেই ত, “আবার তোরা মানুষ হ'।” ভারাক্রান্ত মনে বাটীতে ফিরিয়া আসিতাম, আসিয়া দেখিতাম আমার মা ও আমার স্ত্রী দুজনেই এ বিষয় আলোচনা করিতেছেন। দেখিয়া বাস্তবিকই আমার আনন্দ হইত ; যাহাদের প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা যায় তারা ও যদি আমার চিন্তার ভার গ্রহণ করেন, তবে সেটা কি অল্প আনন্দের কথা। তারপর আহারাদি শেষ হইলে আমরা তিনজনে দেশের সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতাম, কি করিব তখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই, তবে গোলামী যে ভাল নয়, তাহাতে যে মানুষ আর মানুষ থাকে না, ইহা আমরা তিনজনেই ঠিক করিলাম এবং উহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহাও স্থির করিলাম।

একদিন আফিস হইতে বাটী আসিয়া দেখি আমার মাতা ও আমার গৃহিনী দুই জনে দুইটি ঘরে দুইটি চরকা লইয়া সুতা কাটিতে বসিয়াছেন। মায়ের ঘর হইতে স্ত্রীর ঘরে আসিতেই সে আমার দিকে তাকাইয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর সুতা কাটিতে কাটিতে হাসিয়া গান ধরিল—

“চরকা আমার ভাতার পুত চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি।”

আমি হাসিয়া বলিলাম “বেশ ত, বেশ কাজ পেয়েছ, বুঝলাম দেশের কাজ কর্চ্ছ, কিন্তু আমার স্থান যে ও অধিকার করবে, ইহাই আমার অসহ্য।” আমার কথা শুনিয়া গৃহিণী হাসিতে হাসিতে আবার ঐ গান ধরিল, তারপর অনেকক্ষণ তাহারা কেমন করিয়া চরকায় সুতা কাটিতে শিখিয়াছে, কেমন করিয়া পাড়ার ছুতার মিস্ত্রীকে দিয়া পুরাণ ধরণের দুইটা চরকা তৈয়ারী করাইয়াছে, তাহার ইতিহাস আমার কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। আমিও বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

* * *

ইতিমধ্যে আমার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, মা তাহাকে কোলে লইয়া সারাদিন চরকায় সুতা কাটিতেন। একদিন সুতা কাটিতে কাটিতে হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমি তখন আফিসে, আমার স্ত্রী জল দিয়া বাতাস করিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল, আর কিছু ঔষধপত্র দিতে পারে নাই। আমি আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মায়ের খুব জ্বর, বিকারের লক্ষণ, ডাক্তার ডাকিলাম, তিনিও ভরসা দিতে পারিলেন না, কেবল বলিলেন খারাপ রকমের জ্বর, কি হয় বলা যায় না। তারপর দিন আফিস গিয়া এক সপ্তাহের ছুটি চাহিলাম, বড় সাহেব রাজী থাকিলেও ছোট সাহেবের প্ররোচনায় আমার ছুটি মঞ্জুর হইল না। ছোট সাহেব বলিলেন বুড়া মায়ের অসুখ তাহাতে আবার ছুটি কেন, হাসপাতালে দাও। হায় রে, এই ত পাশ্চাত্য শিক্ষা, ইহার জন্য আমরাও লালায়িত। যে শিক্ষায় পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ঈশ্বর ভক্তি শিখায় না, তাহা নিশ্চয়ই শিক্ষা নয় শিক্ষার প্রেত মাত্র। ব্যথিত হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম মায়ের বিকারের ঘোর সম্পূর্ণ দেখা দিয়াছে। ডাক্তার ডাকিলাম, ডাক্তার ঔষধ দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করি! যাক্, পরের দিনও আফিস গেলাম, মনটা খুবই খারাপ লাগিতে লাগিল, বাম চক্ষু বারে বারে নাচিতে লাগিল, মনে হইতে ছিল কি যেন অশুভ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিতেই স্ত্রীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম সব শেষ হইয়া গিয়াছে, এতদিনে মাতৃহারা হইলাম। যাহা হউক মায়ের সৎকারাদি করিয়া বাটী ফিরিলাম। এ চাকরী আর করিব না স্থির করিলাম, যাহাতে শেষ মুহূর্ত্তে মাতাকে সেবা করিবার সুযোগ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিল, সে গোলামী ত্যাগ করিবই। পরে কি করিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

মাতার মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে খোকার অসুখ করিল, তাহার লক্ষণ ও ভাল বোধ হইল না। ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ দিয়া খোকার শিয়রে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম "ভগবান্, এ আবার কি পরীক্ষা, এমন কি পাপ করিয়াছি যাহার জন্য এত আঘাত।" ভাবিতে ভাবিতে বেলা হইয়া গেল, কখন আটটা বাজিয়া গেল লক্ষ্য করি নাই, স্ত্রী আসিয়া তাড়া দিয়া বলিল, "আফিস যাবে না শীঘ্র খেতে এস"। উঠিয়া আহার করিতে গেলাম,

গোলামের যে পুত্রের অসুখেও ভাবিবার সময় নাই একথাটা ভুলিয়া যাওয়াই যে মস্ত অপরাধ। মনের দিকে তাকাইয়া একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিলাম। পোষাক পরিয়া আফিস যাইবার পূর্ব্বে আবার খোকাকে দেখিতে আসিলাম, আমাকে দেখিয়া খোকা ভাঙা ভাঙা কথায় বেদানা চাহিল। আমি বলিলাম আসিবার সময় লইয়া আসিব। ট্রেণ ধরিতে রওয়ানা দিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ ঠিক সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। ছুটিয়া ষ্টেশনে আসিলাম, ঠিক তখনই যেন আমাকে উপহাস করিয়া খলখল পৈশাচিক হাসি হাসিয়া ট্রেণটা চলিয়া গেল। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে আর ট্রেণ নাই, আজ না জানি ছোট সাহেবের কাছে কি লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইবে। বেলায় আফিসে আসিলাম, আসিবামাত্রই ছোট সাহেব অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গালি দিতে লাগিল। আমার মনটাও সেদিন বিরূপ ছিল, আমি ও দুটা কড়া কথা শুনাইয়া বলিলাম, "আমি তোমার চাকরী ছাড়িয়া দিলাম।" সাহেব বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"ও, তুমি non-co-operator হবে, বেশ, শুনে সুখী হলাম, তবে একমাস থাক, আমরা লোক দেখে নি।" আফিসে বসিয়া বসিয়া গুমরাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেদিন তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। গভীর ঘনঘটা করিয়া ভীষণ বর্ষণ আরম্ভ হইল, মাঝে মাঝে বিজলী চমকাইতে লাগিল, মনে হইল সৃষ্টি বুঝি এইবার ধ্বংসের পথে চলিল। জানালার ধারে বসিয়া সেই মেঘ ও বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে আমার অদৃষ্টের সঙ্গে তাহার তুলনা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ ছোট সাহেবের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম, সংবাদ লইয়া জানিলাম এক দরিদ্র ভিখারী ঝড় বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাকেই বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিতে গিয়া ছোট সাহেব গর্জ্জন করিতেছিলেন। ভাবিতে লাগিলাম, এরা মানুষ না পশু; অথবা এই গোলামের জাতিটাকেই উঁহারা পশুর মত মনে করেন। এখন বুঝিলাম কেন মহাত্মা ইহাদের সকল সংশ্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ হইয়া না বাঁচিতে পারিলে এ রকম গোলামী করিয়া যে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ বাচাকে ধিক্কার দেওয়া এ বোধটা আমার চক্ষে সে দিন স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। অনেক ক্ষণ পরে প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলে, ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভারাক্রান্ত মনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই মনে পড়িয়া গেল, খোকার জন্য ত বেদানা লওয়া হইল না। পোড়া মন স্নেহের দাবিটা ও

যে ভুলিয়া গেল ইহাই ত বারে বারে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। গাড়ীতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। জানিনা এখনও কত দুঃখ আমার জন্য সঞ্চিত আছে। চাকরী ত ছাড়িয়া দিলাম, এখন কি করিয়া আহারের সংস্থান হইবে ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ ট্রেণের এক কোণে একটি যুবক গাহিয়া উঠিল—

"তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত;
মায়ের ঘরে ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষায় চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান;
মোটা হোক্, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান।"

মনের মাঝখান হইতে কে বলিয়া উঠিল, এই ত পথ, এই ত আমাদের অধিকার, তবে কেন ভাবনা। ভাবিয়া ত আর কুলকিনারা পাওয়া যায় না, যিনি সব ভাবনার মালিক, তিনিই আমাদের জন্য ভাবিতেছেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিনীকে সব কথা বলিয়া ভবিষ্যতে চাষবাস করিয়া খাইব এই কথাও তাহাকে জানাইলাম। আমার ভয় ছিল পাছে সে স্বীকৃতা না হয়, কিন্তু তখন আমার বড়ই অহ্লাদ হইল এবং আপনাকে এত দুঃখের মধ্যে ও ভাগ্যবান বলিয়া মনে হইল যখন অতিশয় উৎসাহের সহিত গৃহিণী এই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

খোকার জ্বর কিন্তু ছাড়িতে চাহিল না। ভুগিয়া ভুগিয়া দশদিনের দিন সে আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। উপরি উপরি দুইটা শোকে একেবারে মনটা অবসন্ন হইয়া পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কান্নাকে শেষ করিতে পারিতেছিলাম না। আমার গৃহিণী আমার অবস্থা দেখিয়া অতি আশ্চার্য্য রকমের ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি অত কষ্ট করছ কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছায় খোকা তার ঠাকুমার কাছে চলে গেছে, এস আমরা এখন বন্ধন হীন হয়ে দেশের কাজ করি।" স্ত্রীর কথায় কতটা শান্তি লাভ করিয়া আমাদের ভবিষ্যতের কার্য্যের পন্থা আলোচনা করিতে লাগিলাম দুই একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসে বুঝিতে পারিতেছিলাম কত বড় ব্যথা সে বুকে চাপিয়া রাখিয়া সহজ ভাবে আমার সঙ্গে কথা কহিতে ছিল। এই ত ত্যাগ! এই ত নিষ্ঠা!

আফিসে আজ শেষ দিন গিয়া কাজ বুঝাইয়া চলিয়া আসিবার কথা। সমস্ত দিন পরিচিত সহকর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা

বলিয়া, দেশের সেবা করিবার ইচ্ছা জানাইয়া সকলের উপদেশ, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। ফিরিয়াই দেখি বিনা মেঘে বজ্রপাত। আমার নয়নের মণি, আমার ভবার্ণবের কর্ণধার আমার স্নেহময়ী গৃহিণী গ্রাম্য কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। তখনি ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পরদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমার গৃহ অন্ধকার করিয়া আমার আনন্দের দীপটা নির্ব্বাপিত হইল। এত নিদারুণ ব্যথায় কান্না পর্য্যন্ত বাহির হইল না, প্রচণ্ড ব্যথার জালায় চোখের জলের উৎস ও যেন শুকাইয়া গিয়াছে। যেমন ভীষণ আঘাত লাগিলে একটা কাল শিরা দাগ পড়িয়া সে স্থানটাকে অবশ করিয়া দেয়, রক্ত ও পড়ে না, বেদনার অনুভূতিও থাকে না; সেইরূপ এই বিরাট বেদনা আমার হৃদয়কে যেন অসাড় করিয়া দিয়া গেল। দূরে দুই একটি তারা উঠিয়া বলিয়া দিয়া গেল—আমরা শুধু শাশ্বত, আর সবই ভঙ্গুর, আমরা শুধু হাসিয়া ভাসিয়া যাই, তোমাদের শুধু কর্ত্তব্য, তোমাদের হাসিবার, গর্ব্ব করিবার, আনন্দ করিবার কিছুই নাই। অনতিদূরে একটি শিবমন্দিরের ভাঙ্গা অঙ্গনে একটু সাধু তখন গাহিতেছিল—

"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব্ব করিতে চূর।"

হঠাৎ আমি চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলাম, প্রভু তাই হ'ক, আজ সংসারের সঙ্গে ও আমার non-co-operation। এখন শুধু দেশ আর আমি।

ডালি

একখানি খোলা চিঠি।

[এই পত্রখানি আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত টেরেন্স ম্যাকসুইনির ভগ্নী মিস্ ম্যাক্‌সুইনি কর্ত্তৃক লিখিত। গত ১৫ই জুলাই তারিখের 'নেশন্' ও 'এথেনিয়ম্' পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয়।]

গ্রেটব্রিটেনবাসী নরনারী বৃন্দ,

অধিক দিনের কথা নহে তোমরা একটি মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ। গণতন্ত্র সমূহকে নিরাপদ করিবার জন্য, ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং ন্যায় ও সভ্যতার মূল নীতিগুলির রক্ষাকল্পে ঐ যুদ্ধের আয়োজন করা

হইয়াছিল, তোমাদিগকে এইরূপই বুঝান হইয়াছে এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ উহা বিশ্বাসও করিয়াছে।

আয়র্লণ্ড উক্তবিধ মূলনীতিগুলির জন্যই নিজে ক্ষুদ্র হইয়াও জাতিগত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে কিন্তু তোমরা আয়র্লণ্ডবাসীর উপর নৃশংসতা ও পাশবিকতার এরূপ এক বিকট দানবকে প্রেরণ করিয়াছ যে তাহার ফলে সমগ্র সভ্যজাতি তোমাদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রকৃত ভদ্র ইংরাজের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

বাহুবলে আমাদিগকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া তোমাদের কর্ত্তারা বৈঠক আহবান করিয়া, গলাবাজিও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা, আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক নিজদেশের ন্যায্য অধিকার ত্যাগের সম্মতি পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তাদের কার্য্যের জন্য তোমরাই দায়ী। আসন্ন ভীষণ যুদ্ধের ভয় প্রদর্শন করাতে আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিগণ দেশবাসীর বিনা অনুমোদনে শ্রেষ্ঠ অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তোমাদের শেষ প্রস্তাব এবং তাহাতে অসম্মত হইলে যাহা ঘটিবে তাহা আপন দেশের কর্ত্তৃপক্ষ ও সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবার সুযোগও প্রতিনিধিগণকে দেওয়া হয় নাই।

এক্ষণে তোমাদের কর্ত্তারা দেখিতেছেন যে তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ভীতি প্রদর্শন সত্বেও আয়র্লণ্ডের আত্মসমর্পণে বাধা দিবার যথেষ্ট লোক বর্ত্তমান আছে। আইরিশের জাতীয় অধিকার চিরদিনের মত ত্যাগ করিতে কোনও আয়র্লণ্ডবাসীই চাহে না, তাই আমাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার ভয় দেখান হইতেছে।

আমরা তোমাদের সহিত শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছি; তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পক্ষে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইলেও তাহাতে আমরা সম্মত আছি কিন্তু এই তথাকথিত সন্ধিপত্র অনুসারে নহে। তোমরা জলপথে বিপদের আশঙ্কা কর তাহা আমরা জানি, সে পথে তোমাদের কোনও বিপদ ঘটিবে না এবিষয়ে অঙ্গীকারও করিতে পারি, কিন্তু তোমাদের রাজাকে আমরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিব ইহা তিনি আশা করিতে পারেন না এবং আমরা তাহা স্বীকারও করিব না। তোমাদের অপেক্ষা বহু প্রাচীন একটি জাতিকে যে তোমরা উপনিবেশ শ্রেণীতে স্থান দিবে তাহা আমরা সহ্য করিব না, আর সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং যাহারা সীমা নির্দ্দেশ

করিয়া দিয়াছেন সে দেশকে তোমরা যে ইচ্ছানুযায়ী বিভাগে বিভক্ত করিবে ইহাও হইতে দিব না।

তোমরা শুনিয়াছ আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোক তোমাদের সন্ধি সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু একথা সত্য নহে।

আয়র্লণ্ডের অধিবাসীবৃন্দকে স্বাধীন অভিমত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিতে দিলে তাহারা যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিবে এবিষয়ে, অনিচ্ছায় হইলেও, তোমাদের লয়েড্ জর্জ্জ সাক্ষ্যদিতে পারেন। বর্ত্তমানে স্বাধীনমত প্রকাশের স্বাধীনতা তাহাদের নাই। নির্য্যাতিত, যুদ্ধশ্রান্ত আইরিশ জাতি যে তোমাদের "সভ্যতার উপকরণের নমুনা দেখিতে অসম্মত হইয়া আসন্ন ভীষণ যুদ্ধ এবং তোমাদের প্রদত্ত সন্ধিসর্ত্ত এ উভয়ের মধ্যে সন্ধিসর্ত্তটিই গ্রহণ করিয়াছে ইহাতে বুঝিতে হইবে পরিণামে তোমাদের এই 'সন্ধি' তোমাদেরই সর্ব্বনাশ সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে।

বার্ক বলিয়া গিয়াছেন "অত্যাচারীর কথার ভঙ্গি সর্ব্বত্রই এক—'স্বাধীন ভাবে থাকিতে চাহিলে তোমরা নিরাপদ থাকিবে না" আজ অর্থবল ও সৈন্য-বলের সাহায্যে আমাদিগকে এই সন্ধি স্বীকার করাইতে চাওয়ার প্রতিফল তোমরা পাইবেই। বলাধিক্য বশতঃ তোমরা হয়ত আমাদিগকে পরাজিত করিতে পার কিন্তু সে পরাজয় তোমাদের সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করিবে। আয়র্লণ্ডের জয় পরাজয় উভয়ই যে সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের সহায়ক হইবে এ বিষয়ে বহু সংবাদ পত্রই একমত।

আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোকই তোমাদের সন্ধিসর্ত্ত পালনে এবং 'ফ্রিষ্টেটের' গঠনে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আয়র্লণ্ডের কতকগুলি লোক যে তোমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়াই থাকিবে একথা ধ্রুবসত্য। ইংলণ্ড যখনই কোন অসুবিধায় পড়িবে তখনই এই শ্রেণীর লোকগুলি তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিবে। তোমরা যখন আবার যুদ্ধে বিব্রত থাকিবে তখন আয়র্লণ্ডে ১৯১৬ সালের পুনরভিনয়—ঘটিবে এবং তাহার ফল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভীষণ হইবে। তোমরা হয়ত আশা কর যে এরূপ ঘটিলে আর্থার গ্রিফিথ্ * বা মাইকেল কলিন্স জন্ স্মাট্সের ন্যায় আচরণ করিবেন কিন্তু মনে

* এই পত্র প্রকাশিত হইয়া তিন সপ্তাহের মধ্যেই অর্থার গ্রিফিথের মৃত্যু হইয়াছে। মাইকেল কলিন্স অল্পদিন হইল গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

রাখিও সেরূপ করিতে চাহিলে ১৯১৬ সালের জন্ রেডমণ্ডের যে দশা ঘটিয়াছিল তাঁহাদেরও সেইরূপ ঘটিবে।

আয়র্ল্যণ্ডকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বশীভূত রাজ্য বলিয়া গণ্য করিতে চাহিলে বা বলপূর্ব্বক আইরিশবাসীর নিকট হইতে রাজভক্তি আদায় করিতে গেলে যতটুকু পরাধীনতার ভাব মনে জাগে, ততটুকু বর্ত্তমান থাকিতে আমাদের উভয়জাতির মধ্যে শান্তিস্থাপন সম্ভব নহে। আমরা যাহা দিতে পারি না তাহা চাহিও না, তাহা হইলেই আমাদের স্বাধীনতা লাভে তোমাদের ভয়ের কোনও কারণই থাকিবে না।

তোমাদের কবলে পতিত একজন লিখিয়াছে "প্রতিবেশী হিসাবে আমরা উত্তম বটে কিন্তু শত্রুহিসাবে আমরা অতি ভীষণ।" আমাদের শত্রুতার ভীষণতার পরিচয় তোমরা ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছ, আমাদের ন্যায্য অধিকার লাভ না করা পর্য্যন্ত আমরা সেইরূপই থাকিব এবং তদনুরূপ আচরণও করিব। স্বাধীনতা আমাদের চাই-ই, যতপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতেই হউক না কেন, স্বাধীনতালাভ করিতেই হইবে। আমাদিগকে অধিকতর কষ্ট দিবার ক্ষমতা তোমাদের আছে তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু পরিণামে কাহাদের জয় ঘটে? যাহারা সর্ব্ববিধনির্য্যাতন সহ্য করে তাহাদের, যাহারা উহা প্রয়োগ করে তাহাদের নহে।

তোমাদের কর্ত্তারা যে আমাদের দেশকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলি। তোমাদের এ কার্য্য আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। বেলজিয়ম্ আয়র্লণ্ডের তুলনায় নূতন দেশ, সেখানকার অধিবাসীরও এতদূর একতাসূত্রে গ্রথিত নহে কিন্তু তোমরাই স্বীকার কর যে সেখানে এরূপ চলিতে পারে না। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যুক্তরাজ্যও এরূপ ব্যবহার সহ্য করে নাই। আয়র্লণ্ড-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আয়র্লণ্ডের আপত্তিই লিঙ্কলন্ যুদ্ধের হেতু, বিদেশীর কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া ইংলণ্ডের নিকট আয়র্লণ্ড অপরাধী হইয়াছিল বলিয়া সে যুদ্ধ ঘটে নাই।

তোমরা যাহাকে Six Couuty Area আখ্যা দাও সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী অন্য আইরিশগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইবে তোমাদের এ আশঙ্কা অমূলক। তোমাদের কর্ত্তারা তাহাদিগকে চিন্তা প্রণালী ও কার্য্য প্রণালী উভয় বিষয়েই পৃথক্ রাখিয়া প্রাচীন ভেদনীতি অবলম্বন দ্বারা আমাদিগকে জয় করিতে চাহেন। ঐ সব দারিদ্র্য পীড়িত লোকগুলির গোঁড়ামি সত্ত্বেও তাহারা

নিতান্তই সৎস্বভাবাপন্ন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের মনের ভাব এখনও অত্যাচার পীড়িত সপ্তদশ শতাব্দীর ন্যায়। কিন্তু লর্ড বার্কেন হেড, কার্সন প্রমুখ ইংরাজ রাষ্ট্রনায়কগণ তাহাদের এই সবল নিষ্ঠার সুযোগ পাইয়া আপনাদের উদ্দেশ্যসাধন করিয়াছেন, পর পর কয়েকটি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাই আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনার্থ বেলফাষ্ট ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিকে আয়র্লণ্ডের রাজনৈতিক দেহের ক্ষতে পরিণত করিয়া রক্ষা করিতেছেন।

বেল্‌ফাষ্টের বর্ত্তমান অবস্থারদিকে দৃষ্টিপাত কর। যাহাতে 'দুর্ব্বৃত্ত' আইরিশগণকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত সৈন্য এদেশে প্রেরণ করিবার উপলক্ষ পাওয়া যায়—সেই উদ্দেশ্যেই তোমাদের কর্ত্তারা বেলফাষ্টের এই অবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাদের নৃশংসতা সভ্যতার ইতিহাসের কলঙ্ক সেই সব 'স্পেশাল' সেনানীদের পোষণার্থ তোমাদের অর্থব্যয়িত হইতেছে। যখন এই সব নরপশু স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে হত্যা করে তখন তোমাদের পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ সেই সব দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখে আর তাহাদের কবলে পতিত সেই মানুষগুলি যদি 'মরিয়া' হইয়া কখনও প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে তখন ঐ সব নৃশংস নরপশুর আদেশে তোমাদের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ "সভ্যতার উপকরণের" সহায়তায় তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হয়।

ইংলণ্ডের গণতন্ত্র কি নীরব থাকিবে? একটি জাতি ন্যায্য স্বাধীনতা লাভে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার উচ্ছেদ সাধনে প্রচেষ্টাপরায়ণ পাশবিকতার বিরুদ্ধে কি আত্মসম্মানবোধবিশিষ্ট ইংরাজ সন্তানের কণ্ঠ ধ্বনিত হইবে না? তোমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছ কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। এখন শান্তির প্রকৃষ্ট পন্থা ন্যায়ের পথ ধর, তাহা হইলে বহু শত বৎসরের শত্রুতার তিরোহিত হইবে। তোমাদের কর্ত্তারা কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত না করিলে আয়র্লণ্ড তোমাদের প্রনষ্ট গৌরবের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করিবেই। তাহারা দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র তোমাদের শত্রুদিগকে সাহায্য করিবে এবং তোমাদের সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিবে। তোমাদের অপর্য্যাপ্ত সৈন্যসম্ভার সত্ত্বেও আয়র্লণ্ড আপন অভীষ্ট লাভ করিবেই। রোম ও কার্থেজের সৈন্যবল আজ কোথায়? কিন্তু যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তাহারা বিনাশ করিতে চাহিয়াছিল তাহা আজিও জীবিত থাকিয়া নবীন জাতিগুলিকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

নারায়ণের নিকষমণি

হিন্দী শব্দ ও অনুবাদমালা—শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত শাস্ত্রী ও শ্রীনরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, কলিকাতা ৩০নং গোবিন্দ ঘোষালের লেন্, ভবানীপুর 'হিন্দী প্রচার কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৷৷০ আনা। ইহা "সরল হিন্দী শিক্ষার" সঙ্গে সঙ্গে পড়িবার জন্য প্রথম হি [illegible] শিক্ষার্থীর জন্য রচিত। ইহাতে প্রথমে হিন্দী পরে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রচারিত হইয়াছে ; ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই হিন্দী শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গলায় লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে হিন্দী শিখিবার এমন সহজ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক আর নাই।

প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা—শ্রীসন্তোষ নাথ শেঠ সাহিত্য রত্ন প্রণীত, চন্দনগর হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২৷৷০ টাকা এই পুস্তকখানি স্কুল, কলেজ ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের ব্যবসা শিক্ষার জন্য এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এমন সরলভাবে ব্যবসার, কথা লিখিয়া গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আশা করি বঙ্গের প্রতি স্কুল ও জাতীয় বিদ্যালয়ে এই পুস্তকখানি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইবে।

পথস্মৃতিই—শ্রীসুধীরকুমার ভাদুরী প্রণীত ও ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা। পুস্তক খানতে কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের এতটা ধোঁয়া জমিয়া আছে যে তাহা হইতে উহার আসল রূপের পরিচয় পাইলাম না।

সুবলসখার কাণ্ড—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত ও রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৷৵০। দীনেশবাবু বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা গল্পচ্ছলে লিখিয়া বাঙ্গালী মাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। লিখন ভঙ্গী চমৎকার, ভাষা সরল, এবং গল্পাংশ মনোরম। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা] [আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৯

অন্তর্ধান

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী]

শুক

শারদ রজনী যবে পরি মল্লীফুলহার
পড়িল নয়ন-পথে, স্মৃতিপটে বার বার
জাগিল অতীত চিত্র। ব্রজ-বধূ সহ মরি
বিপিনে রমণ লাগি আকুল হইলা হরি।
আপ্ত-কাম ভগবান্, তবু তাঁর চিত্ত মাঝে
আবরিয়া অভিমান প্রেম যোগমায়া রাজে

২

রমণ-বাসনা জাগিল যেমতি
অমনি উদিল তারাদল-পতি
অম্বর আলোকিয়া;
বহুদিন পরে বঁধুর সদন
বঁধুয়ার মত করি আগমন
অরুণিম করে পূরব আশার
ধরিয়া মুখানি দিল বার বার
কুঙ্কুমে বিলেপিয়া।
পরশন-সুখে পুলক-বিবশা
হ'ল দিগ্বধূ, দরশে সরসা
ধরার তপ্ত হিয়া।

৩

কুমুদ্বিকাশী কুঙ্কুম-রুচি
নেহারি পূর্ণ চন্দ্রমা শুচি
রমানন-আভাময়,
হেরিয়া চাঁদের কোমল কিরণে
রঞ্জিত বন, মাধবের মনে
স্মৃতির লহর বয়।
সুলোচনা যত গোপীর পরাণ
করিতে হরণ কি মধুর গান
মুরলীতে ফুকরয়।

৪

কৃষ্ণ-চরণ-চর্চ্চিত-মনা
গোকুলের যত কুল-অঙ্গনা
আছিল ভবন মাঝে,
মদন-দীপন শুনি বেণু-গান
ধায় দ্রুতপদে পাগল পরাণ
ভেটিবারে নটরাজে।

কে গেল কখন কেহ না লখিল
আকুল-পরাণে সকলি ছুটিল
কান্ত যেখানে রাজে ;
গমনের বেগে চল-চঞ্চল
কুন্তল কাণে করে ঝলমল
কঙ্কণ করে বাজে।

৫

যেমতি বাঁশীর গান পশিল গোপীর কাণে
অমনি ছুটিল গোপী গৃহ-কাজ নাহি মানে,
যে ছিল দোহন-রতা দোহন ছাড়িয়া ধায়
দুগ্ধ-আবর্ত্তন-রতা নাহি রহে প্রতীক্ষায়।
কেহ বা রন্ধন ফেলি ধাইল কানন-পথে
পতি-সেবা ছাড়ি কেহ চলে চাপি মনোরথে।
কেহ বা শিশুর মুখে দিতেছিল স্তন-সুধা
অমনি ছুটিল বালা ভুলিয়া শিশুর ক্ষুধা।
কেহ বা করিতেছিল গোপগণে পরিবেশ
ফেলিয়া হাতের থালা ধায় আলুথালু বেশ।
কোন গোপী অন্তঃপুরে বদনে তুলিতে গ্রাস
বেণু-রবে আত্মহারা চলিল বঁধুর পাশ।

৬

চন্দনে লেপিতেছিল কেহ চারুঅঙ্গ তার
মার্জ্জনা করিতেছিল কেহ তনু-লতিকার
কেহ দিতেছিল তার লোচনে কাজল-রেখা
বাঁশী শুনে উন্মাদিনী ধায় বন-পথে একা।
মুরলীর সুর-মোহ মরমে রচিল ভুল
কটীর মেখলা গিয়া চুমিল হৃদয়-মূল।

৭

গোবিন্দ গোপীর আত্মা হরণ করিল বলে
কে আর বাঁধিবে তারে গৃহ-কোণে কোন্ ছলে ?

বিমোহিত বেণু-স্বরে বালা বন-পথে ধায়
ভাই বন্ধু পিতা পতি ফিরাতে না পারে তায়।

৮

ঘরের বাহির হ'তে পথ না পাইল যারা
প্রাণের ভিতরে পশি হায় অভাগিনী তারা
ভুলি গৃহ-অবরোধ স্মরি কৃষ্ণ অভিসার
বঁধুরে ধেয়ায় মনে মুদিয়া নয়ন-তার।

৯। ১০

যিনি পরমাত্মা যিনি কোটী ব্রহ্মাণ্ডের পতি
গৃহ-বদ্ধা গোপীগণ পুষি হৃদে জার-মতি
বাহ্যজ্ঞান ভুলি সবে ধেয়ায় তাঁহার মুখ,
জলন্ত বিরহানলে ভস্মীভূত সুখ দুখ,
শুভাশুভ দ্বন্দ্ব টুটে ; নিগূঢ় সে চিন্তমাঝে
অচ্যুতের আলিঙ্গনে কি সান্দ্র আনন্দ রাজে!
বঁধুর মূরতি-ধ্যানে বন্ধন খসিয়া যায়
পঞ্চভূতময় দেহ বাঁধিতে না পারে তায়।

১১

পরীক্ষিত

বুঝিতে নারিনু মুনি! তোমার মরম আমি ;
যিনি ব্রহ্ম জগদাত্মা তত্ত্ব নাহি তার জানি
কান্তবোধে সেই কৃষ্ণে আসঙ্গের বাসনায়
যে ব্রজরমণীকুল ধেয়াইল নিরালায়
কেমনে তাদের চিতে ব্রহ্মানন্দ বিভাসিল?
কেমনে গুণের ধ্যানে গুণ-স্রোত বিরামিল?

১২

শুক

বিস্ময়ের কিবা হেতু? কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল
বলেছি তোমারে বৎস বিস্তারি বিদ্বেষ-জাল

বাঁধিল সে হৃষীকেশে। তবে কেন ব্রজবালা
নিশিদিন কৃষ্ণ-প্রেম চিত্ত যার করে আলা
না বাঁধিবে তাঁরে যিনি ইন্দ্রিয়-বন্ধন-হীন,
ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে রসরূপে সমাসীন ?

১৩

অব্যয় হইয়া তিনি করিবারে আত্ম-দান
অসীম হইয়া তিনি ল'য়ে সীমা-পরিমাণ
নিগুর্ণ হইয়া গুণ করিবারে প্রবর্ত্তন
সাধিতে জীবের শুভ অবতীর্ণ নারায়ণ।

১৪

নর-দেহী নিত্য যদি হৃদয়ের সর্ব্বকাম
সর্ব্ব রোষ সর্ব্ব ভয় সর্ব্ব স্নেহ অবিরাম
সর্ব্ব ঐক্য মৈত্রীমাঝে একমাত্র ভাব ধরি
হরি-চিন্তা করে সার, তাহার অন্তর ভরি
আত্মালোকে, আত্মারাম আপনি উদিত হন,
তন্ময় হইলে ঘটে চিন্ময়ের দরশন।

১৫

যিনি অ-জ ভগবান্, যোগেশ্বর ভজে যাঁয়,
স্থাবর জঙ্গম লভে মুক্তি যাঁর করুণায়,
চিন্তামণি-চিন্তা-রত জীবের বন্ধন আর
মোচন করিতে বৎস লাগিবে কি ভয় তাঁর ?

১৬

শুন এবে নৃপ ! কাহিনী আমার ;
মধু হ'তে মধু বচন যাঁহার
রসরূপী ভগবান্
ব্রজগোপীগণে নেহারিয়া পাশে
বিমোহিয়া সবে সুচতুর ভাষে
কহিতে লাগিলা কান।

সেই

কৃষ্ণ

১৭

এস এস বরজের সুভাষিনীগণ!
কহ মোরে কি করিব?
কেন আগমন?
বদনে ভয়ের ছায়া কেন সবাকার?
ব্রজের কুশল কিনা? কহ সমাচার।

১৮

কি হেতু নীরব রহ, মুখে মৃদু হাস?
রজনী বিপদ-ঘোরা; নিশাচর-বাস
এ ঘোর কানন নহে অবলার ঠাঁই;
ফিরে যাও ব্রজধামে আমার দোহাই।

১৯

পিতা মাতা পতি পুত্র ভাই বন্ধুজন
তোমাদের অদর্শনে চিন্তাকুল-মন।
ফিরে যাও ব্রজবালা ব্রজের মাঝার,
নাহি কি লো লাজভয়
প্রাণে সবাকার?

২০।২১

হে ব্রজ-সুন্দরীগণ! ফিরায়ে নয়ন
কি দেখিছ? হেরিছ কি
কেমনে কানন
হাসিতেছে পূর্ণিমার জোছনার ফুলে,
কুসুমিত তরুলতা উঠিতেছে দুলে
যমুনা-শীকর-সিক্ত মৃদুল পবনে?
এসেছিলে বুঝি বনশোভা দরশনে
এ ফুল্ল চাঁদিনী রাতে? ফিরে যাও তবে
ঘোষ-পল্লীমাঝে ওগো পল্লী-সতী সবে,
দ্রুতপদে—যেথা তব সেবা অপেক্ষায়
আছে পতি পথ চাহি আকুল হিয়ায়,
যেথা গাভী চঞ্চলিছে দোহন-কারণ,
হাম্বালিছে বৎস, শিশু করিছে ক্রন্দন।

২২

ক্ষুব্ধ কি বচনে মম? ক্রোধ কর দূর;
বুঝিনু—আমার প্রতি স্নেহ সুমধুর
যন্ত্রসম তোমা সবে করি আকর্ষণ
কাননে আনিল আজি।
কি দোষ তাহার?
কে হেন জগতে যে লো
নাহি মোরে চায়?

২৩

সত্য বটে। কিন্তু শোন হে কল্যাণীগণ!
অকপটে পতি-সেবা সন্তান-পালন
নারীর পরম ধর্ম্ম। করে যদি আশ
কুল-বধূ মৃত্যু-পারে পতিলোকে বাস,
হোক্ পতি অনাচারী ব্যাধি-জরজর
ভাগ্যহীন ধনহীন বৃদ্ধ কিংবা জড়,
তবু না ছাড়িবে নারী জীবনে তাহার
স্বামী-সঙ্গ যদি পতি নহে পাপাচার।

২৪

কিন্তু যেই কুলনারী ছাড়ি নিজ পতি
এ জগতে ভোগ-সুখে ভজে উপপতি,
সেই তার অতি তুচ্ছ নিন্দিত আচার
পদে পদে কণ্টকিয়া জীবন তাহার
ভুবন অযশে ভরে, মরণের পর
রুদ্ধ করে স্বর্গ-পথ,—কিবা ভয়ঙ্কর!

২৫

আর শুন—যদি পুন গাঢ় অনুরাগ
আনিল সবারে টানি মম পুরোভাগ

এ নিশায়, এই মাত্র মম নিবেদন ;
অচিরায় গৃহ মাঝে করহ গমন।
জান নাকি দূর হতে শ্রবণ দর্শন
অন্তরের অনুধ্যান গুণানুকীর্ত্তন
উৎকণ্ঠায় করে যেই ভাবের সঞ্চার,
মিলন না দিতে পারে কণা মাত্র তার ?

শুক।

গোবিন্দের কর্ণশূল বচন নিচয়
বিদ্ধিল গোপীর প্রাণ, ভাঙ্গিল হৃদয়
কৃষ্ণ-অঙ্গ-সঙ্গ-সুখ-আশা-অবসান,
ভাবিতে লাগিল সবে বিষণ্ণ-পরাণ।

২৬

আহা গোপী যত গুরু দুখ ভরে ঘন ঘন ফেলে শ্বাস,
শুকাইল চারু বিম্ব-অধর, মুখানি মলিন পাশ।
অবনত করি বদন কমল
চরণাঙ্গুলে লিখে ক্ষিতিতল,
কজ্জল-ধোয়া অশ্রুলহর
কুচতট পরে ঝরি ঝর ঝর
কুঙ্কুম-রাগ করিছে তরল, আননে না সরে ভাষ,
সহসা ক্ষোদিত পাষাণ-মূরতি বনে যেন পরকাশ !

২৭

বঁধুর লাগিয়া হৃদয়ে তাদের পিরীতির নাহি ওর,
বঁধুরে সঁপিল সকল কামনা ছিন্ন করিয়া ডোর।
সেই সে বঁধুয়া পরাণের পিয়া
নিঠুর বচনে পীড়িল রে হিয়া,
স্মরণে দারুণ আসি অভিমান
অশ্রু লহরে পূরিল নয়ান,
মুছিয়া রোদন অন্ধ লোচন সম্বোধি প্রাণ-চোর
কহিল ঈষদ প্রণয়ের কোপে গদ গদ করযোড়।

২৮

গোপী।

ওগো গোপিকার প্রাণ-বল্লভ ! এমন নিঠুর বাণী
ঘাতকের মত কেমনে হানিলে বধিতে অবলা প্রাণী ?

সব তেয়াগিয়া আইনু আমরা তোমার চরণতলে
চাতকী যেমতি ধায় মেঘ পাশে পিয়াসা মিটাতে জলে।
আমরা তোমার চরণের দাসী শরণ লইনু পায়,
বিষ বরষিয়া শ্যাম জলধর! বধিয়োনা অবলায়।
শুনেছি পুরাণে পরম পুরুষ ভকতে না ছাড়ে তার
তুমিলো মোদের পরাণ পুরুষ, গ্রহণ তোমার ভার।

২৯

ধরম মরম জানিয়ে আপনে মো সবে কহিলে বঁধু!
'ধরম নারীর পতি সুতাদির অনুরতি সেবা শুধু।'
জানিয়াছি সার তুমি ত সবার পরাণ-বন্ধু হও
জগতের যত জীব-দেহ মাঝে আত্মা রূপে যে রও।
তোমারে সেবিলে পতি সুত আদি সকলের সেবা হয়
তরুমূলে যথা সলিল-সেচনে শাখাদি সরস রয়।
তোমার মাঝারে মোদের জগৎ, জগত মাঝারে তুমি,
না ঠেল চরণে, তুমি যে তোমার নিজ উপদেশ-ভূমি।

৩০

জগতে যাহারা করম-কুশল, জানি তোমা নিতি-প্রিয়
আত্মা-রূপী হে! তোমাতে তাহারা রমে চির রমণীয়।
কণ্টকরূপী পতি সুত আদি বিঁধে সদা পায় পায়,
তোমারে ছাড়িয়া তাদের ভজিতে পরাণ নাহিক চায়।
তুমি ত সবার বাসনা পুরাও, বাসনা জাগায়ে প্রাণে
নিঠুরের মত চরণে দলিয়া ফিরাতে চাহিছ ক্যানে?
চিরদিন ধরি যে আশালতিকা বাড়িল হৃদয়ে মোর
কুসুমিত কালে কমল-লোচন! ছিঁড়োনা তাহার ডোর।

৩১

বঁধু হে! তোমারে কই?

যে মন আছিল ঘরের ভিতর আমার সে মন কই?
কি বাঁশী বাজালে ভবন ভুলালে পরাণ করিলে চুরি,
পুতলীর মত কাননে আইনু যেমনি টানিলে ডুরী।

গৃহ-কাজে মন আর না ফিরিবে
গৃহ-কাজে কর আর না উঠিবে
ঘরের বাহির করিয়া সবারে চরণে জড়ালে ফাঁসী,
তব পদ-মূল ছাড়িয়া চরণ
এক পদ আর না করে গমন,
অকূলে ভাসিয়া গোকুলে এখন কেমনে ফিরিবে দাসী ?
কি করিয়ে আরি অধীনা তোমার কহ লো মরম-বাসী !

৩২

পরাণ বঁধু হে ! শুন !
তোমার মধুর হাসিটি হাসিয়া
তোমার মধুর চাহনি চাহিয়া
তোমার মধুর বাঁশীটি বাজিয়া
হিয়ার মাঝারে দিলরে জালিয়া
সুপ্ত হুদয়াগুণ [অ] ।
বরষি তোমার অধর অমিয়া
নিভাও,—নহিলে তাহে যোগ দিয়া
বিরহ-অনল যাবে দগধিয়া
এ দেহ, তোমাতে রহিবে লাগিয়া
নারী-বধ-দোষ পুন ।
তোমারি কারণ ত্যজি এ জীবন
তোমারি ধেয়ানে তরিয়া মরণ
আবার ভিড়িব তোমার সদন,
জীবন মরণ মালার মতন
জড়াবে চরণারুণ [অ] ।

৩৩

বৃন্দাবন-রমণ তুমি, তোমার পদতল
(যাহার রেণু রমারো বুকে হরষ করে দান)
ছুঁয়েছি যবে, পরশমণি-পরশে নিরমল
লোহার দেহ হয়েছে সোনা অম্বু-জ-নয়ান !

চরণ তব যাহারে দিল পুলক-শিহরণ,
সঙ্গ তব যাহারে নিল সুখের পরিসীমা,
কেমনে সেই অঙ্গ মম অপর-পরশন
সহিবে কহ অবলা মোরে সহজে বোধ-হীনা ?

৩৪

তোমার চরণ সরোজ-রজ
তুলনা নাহিক তার
তুলসী বসিয়া চরণ-তলে
মাথে গায় বার বার।

সুর-বাঞ্ছিতা আপনি কমলা
বক্ষে তোমার বসিয়া নিরলা।
তুলসীর মত চাহে অনুখণ
তব অনুচর-সেবিত-চরণ
রেণুতে লোটাতে শির ;

আমরা তোমার চরণের দাসী
কেবল চরণ-ধূলির প্রয়াসী
সিঞ্চিব দিয়া নয়নের নীর [অ],
বঞ্চিত তাহে করিয়োনা চির-
বাঞ্ছিত রমণীর।

৩৫

(ওগো) অন্তর-তাপ-হারী !
তোমারে ভজিব বড় আশা করি
ছাড়ি ব্রজ-বাস এসু ত্বরাত্বরি
তোমার চরণ-মূলে মোরা হরি !
যতেক ব্রজের নারী।

ওগো গোপিকার অঙ্গ-ভূষণ !
নীলমণিময় পুরুষ-রতন ;
হাসিমাখা তব লোচন নিপাতে
জ্বালিলে হৃদয়ে এ শারদ রাতে
তীব্র কামনানল ;

সে আগুনে জ্বলে সারা তনু মন,
লইসু শরণ শীতল চরণ,
দাসী ক'রে রাখ শ্রীপদে তোমার,
চরণ-সেবার দেহ অধিকার
গোপীর কাম্য ফল।

৩৬

বঁধুয়া ! তোমার ভুবন মাঝার রূপের নাহিক ওর !
কেনা নারী চায় দাসী হ'তে পায় ও রূপে হইয়া ভোর ?

তোমার মধুর মোহন সুহাস
অমিয়া নিছনি দিঠির বিলাস
ত্রিভঙ্গ ঠাম লাবণি-বিকাশ
মরমে পশিয়া
সিঁদ-কাটি দিয়া
হরিল হৃদয় মোর।

কুণ্ডল কানে করে ঝলমল
গণ্ডে তুলিছে নৃত্য চপল
সুধার অধর রসে টলমল
অলক-আবৃত
ও চাঁদ-বয়ান
জাগায় পিয়াসা ঘোর।

ওই ভুজ যুগ শঙ্কা-হরণ,
বক্ষ-রমার রমণ-সদন,
মুগ্ধ করিয়া মম তনু মন
লুব্ধ করিছে
কিঙ্করী হ'য়ে
লুটাতে চরণে তোর।

৩৭

এমন নারী কে বা আছে গো ত্রিভুবনে
বঁধু হে!
দীরঘ-মূরছনা-মধুর-পদ-যুত
পিয়ি যে তব বেণু-বদন-বিগলিত
মধু হে,
ভুবন-মনোহর নেহারি রূপরাশি,
ধরম নাহি ছাড়ে যায় না সোতে ভাসি
অকূলে?
বিশ্ব-বিমোহন ও রূপে বিমোহিত
বিহগ ধেনু দ্রুম কুরগ পুলকিত,
চপল কেন তবে হবে না গোপী-চিত
গোকুলে?

৩৮

তুমি লো আদি পুরুষ বর
চতুর্ভুজ সুর-নগর
তারিতে তনু ধরিলে কত বার;

এবার ব্রজ-আর্ত্তি-হর
দ্বিভুজ তুমি মুরলীধর
জনম নিলে নন্দ-পরিবার।
আর্ত্ত জন বন্ধু তুমি,
মিনতি করি ভূতল চুমি
চরণে শুন দাসীর নিবেদন ;
দেহ গো মম মাথার পরে
তপ্ত মম এ পয়োধরে
শীতল তব করের পরশন।

৩৯

শুক।

যোগেশ্বর যিনি
আত্ম-রমণ যিনি
আপনে আপনি পরিপূর্ণ,
ব্রজবধূগণ মুখে
শুনি বিহ্বল বাণী
হৃদয় হইল শত চূর্ণ।

মরম করুণা-ভরা
অধর মধুর হাসি
তুষিল গোপীর মন তূর্ণ,
আপনা করিয়া দান
রাখিল গোপীর মান
তুলিল রমণ রস-ঘূর্ণ।

৪০

রমণ-কলা-কুশল মরি
চ্যুতি-রহিত চপল হরি
মিলিল আসি মিলনাতুরা রমণীগণ মাঝ ;
মধুর হাস শুভ্রশুচি
কুন্দ জিনি দন্ত-রুচি
অমিয় ঝরে লোচন হ'তে রমণরসরাজ।
বঁধুর পানে ব্রজাঙ্গনা
চাহে দরশ-ফুল্লাননা
পলক-হীন নয়ন-তারা বদনে বাঁধা রয় ;
যেন রে পূর্ণিমার চাঁদে
তারকাবলী দিঠির ফাঁদে
জড়িয়ে রাখে গগন মাঝে কিরণে মধুময় !

বণিতা শত যুথের মাঝে যেন রে যুথ-পতি
করিছে বিহরণ,
গায়িছে কভু আপনি হরি, মুগ্ধ ঘন-রতি
কখনো গোপীগণ !
যমুনা-তটে পশিলে কালা
দিল বৈজয়ন্তী মালা
দুলায়ে বঁধু-গলে
হিম-বালুকা-তট-শালিনী
তপন-সুতা বন-তোষিণী
লুটাল পদ তলে।
দূর কুমুদ-গন্ধ-বহ
যমুনা-জল-কণিকা সহ
মন্দ সমীরণ
তুষিল ব্রজ-নাথের হিয়া
শীতল তার পরশ দিয়া
অঙ্গ-বিনোদন।

৪১

কখনো বঁধু পসারি বাহু
উরসে দিল আলিঙ্গন,
কখনো করে বাঁধিয়া কর
বিহরে চারু কুঞ্জবন।

অলক কভু এলায়ে দিয়া
শিথিলি নীবীবন্ধ,
নিঠুর নখে নিষ্পীড়িয়া
গোপীর হৃৎ-পদ্ম,

অ'লখে গুরু উরুর পর
কখনো রাখি কমল কর,
কখনো হানি' কটাখ-বান
হাসিতে হরি চিত্ত-মন,

রমণ-রসে মর্ম্ম ভরি
রমণী-যুথ সহিত মরি
মর্ম্ম কেলি করিল হরি
উলসি' মধু বৃন্দাবন।

৪২

সকলের আত্মা যিনি
রস-রূপী ভগবান্
সেই কৃষ্ণ হ'তে লভি
এইরূপে বহুমান
গোপীদের চিত্ত মাঝে
অভিমান সঞ্চারিল,
সবা হ'তে সুভাগিনী
আপনারে বিভাবিল।

৪৩

গোপীর গরব মান
সে গর্ব্ব করিতে চূর,
প্রসাদ বাঁটিয়া দিতে,
লুকাইলা অকস্মাৎ

অন্তরে বুঝিয়া হরি
সে মানে হৃদয় ভরি
জ্যোতির্ম্ময় তনু তাঁর
নেত্র করি' অন্ধকার।

অপরাধ তত্ত্ব

[শ্রীশান্তিকাম]

১ম দৃশ্য—বাজার।

সুবোধ। ম'শায়, বিলিতী কাপড় কিনবেন না।

সুধীর। ঐ যে, ঐ দোকানে দেশী কাপড় আছে, তাই কিনুন না ?

মঙ্গল রাম মারওয়াড়ী। তুম লোগ কোন হ্যায় ? ইঁহাসে চলা যাও।

বালকদ্বয়। আচ্ছা, যাচ্ছি। (একটু সরে গিয়ে) বিলিতী কাপড় কেউ কিনবেন না।

বালক দুটির অল্প বয়স ও সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখে এবং মিষ্ট কথা শুনে পাঁচ সাতজন জমে গেল। একটু দূরে একজন কনষ্টবল দাঁড়িয়ে ছিল, সেও সেখানে এসে উপস্থিত হল। একটু পরে আরও দুজন কনষ্টেবল এল। সে দিন থানায় চৌকিদারদের হাজরি ছিল, পাঁচ সাতজন চৌকিদারও এল। তামাসা দেখতে বাজারের নিষ্কর্ম্মা লোকও দু'চার জন এল। সংবাদটা পরিবর্ত্তিত ও

পরিবর্দ্ধিত হয়ে টাউন আউট-পোষ্ট জমাদারের কাছে পৌছল। জমাদার কাল বিলম্ব না করে; দু'জন কনষ্টেবল নিয়ে সেখানে গেলেন এবং বালক দুটিকে ধরে নিয়ে প্রথমে আউট-পোষ্টে তারপর থানায় গেলেন।

২য় দৃশ্য—সবডিভিসনাল অফিসারের বাড়ীর বৈঠকখানা।

মিঃ এন, এল, ঘোষ ওরফে শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ সবডিভিসনাল অফিসার। দেশের রীতি অনুসারে তিনি একাধারে শাসক ও বিচারক হলেও বিচার কার্য্যের চেয়ে শাসন কার্য্যে তাঁর প্রতিপত্তি বেশী। সে দিনEmpire Day কাছারী বন্ধ। সবডিভিসনাল অফিসার বাড়ীতেই আছেন। বিভীষন সিং ও মহাবীর সিং, দুই কনষ্টেবল আড়াই ইঞ্চ মোটা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে এবং এক এক সের ওজনের এক এক জোড়া হাতকড়ি হাতে লাগিয়ে, সুবোধ ও সুধীরকে সবডিভিসনাল অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত করে একখানা কাগজ তাঁর হাতে দিল। তাঁর একটি ছোট মেয়ে সেইখানে বসে ছিল, ছেলে দুটিকে দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে "বাবা, এরা কি চোর?" সবডিভিসনাল অফিসার বললেন "না, এরা চোর টোর নয়। কিন্তু তুমি বাড়ীর ভেতর যাও, তোমাদের এ সব কথা শোনবার দরকার নেই।" তারপর তিনি একজন কনষ্টেবলকে বললেন "কোর্ট বাবুকো বোলাও।" একজন কোর্ট বাবুকে ডাকিতে গেল, আর একজন বালক দুটিকে নিয়ে একটু দূরে বসল। এর মধ্যে সবডিভিসনাল অফিসারের মেয়েটি তার দাদাকে আর ছোট বোনকে ডেকে নিয়ে ছেলে দুটির দিকে যাচ্ছিল। সবডিভিসনাল অফিসারের ছেলেটি বলছিল "আমি ওদেরকে চিনি। যে দিন ওদের সঙ্গে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নে না, ভাই' গাইতে গিয়েছিলাম।" সবডিবিসনাল অফিসারের কাণে এই কথা পৌছুতেই, তিনি ধমকে বললেন "আচ্ছা, তোমার আর ওদের চিনতে হবে না, এখন বাড়ী যাও।" ছেলে মেয়েরা বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

একটু পরে কোর্টবাবু এলে সবডিভিসনাল অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন "এরা অপরাধটা করেছে কি?"

কোর্টবাবু। আজ্ঞে, ঐ রিপোর্টেই ত লেখা আছে, ছেলে দুটো বাজারে মঙ্গলরাম মারওয়াড়ীর দোকানের সামনে পিকেটিং করছিল।

সবডিভিসনাল অফিসার। সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাতে কোন্ আইনের কোন ধারার অপরাধ হয়, সেটা রিপোর্টে নেই।

কোর্টবাবু রিপোর্টটা হাতে নিয়ে বললেন "আমি থানা থেকে ওগুলো ঠিক করে লিখিয়ে এনে দিচ্ছি।"

থানায় গিয়ে কোর্টবাবু দেখলেন সেখানে ইনস্পেক্টর বাবু, সবইনস্পেকটার বাবু, সহকারী সব ইনস্পেকটার বাবু ও টাউন জমাদার একত্র বসে বসে ঐ বিষয়েরই আলোচনা করছেন। সব ইনস্পেকটার বাবুকে রিপোর্টটা দেখিয়ে কোর্টবাবু বললেন "এটা যে অসম্পূর্ণ রয়েছে, আইনের ধারাটা লিখে দেন।" শুনে জমাদার বললেন "বাবু, কলকাত্তামে কেতনা এই রকম মোকর্দ্দমা হচ্ছে, খবরকা কাগজমে লিখছে, আর আপলোগ কানুনের দফাটা জানছেন না?" সুযোগ্য সহকারী সব ইনস্পেকটার বললেন "ওরা ত ভলান্টিয়ার, বে-আইন জনতার লোক।" ইনস্পেকটার বললেন "নিশ্চয় জান ওরা ভলান্টিয়ার? কত জন ওরা ছিল?" সব ইনস্পেকটার বললেন "বোধ হয় ভলান্টিয়ার ওরা নয়। ওরা নেহাত ছেলে মানুষ ভলান্টিয়ার হবার বয়স হয় নি এখনও। আর মোটে দুজন বলেই ত শুনেছি।"

জমাদার। পঁচাশ যাট আদমী ছিল, বাবু। আর ওদের দলের ভি আউর ছোকরা লোগ ইধার উধারমে ছিল। হামি তাদেকে দেখেনি, লেকিন ছিল জরুর।

জমাদার বলী সিং অনেক দিন বাঙলা দেশে থেকে বাঙলা ভাষাটা এক রকম দখল করে নিয়েছিলেন।

সহকারী সব ইনস্পেকটার। যা হক একটা ধারা লাগিয়ে দেন, ওরা নিশ্চয়ই অসহযোগী, সাক্ষীদের জেরাও করবে না, সাফাইও দেবে না। সম্ভবতঃ কোন কথাই বলবে না।

এই রকম অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হল, সাধারণ লোকের যাতায়াতের পথ বন্ধ করার ধারাটা লাগিয়ে দেওয়া হক। তাই হল, যদিও যে স্থানটায় ব্যাপারটা ঘটেছিল সেটা ঠিক পথ নয়, বাজার অর্থাৎ চারিদিকে কতকগুলি দোকান আর মাঝখানে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে হাটের দিন হাট বসে, লোকজন যাতায়াতও করে।

কোর্টবাবু সংশোধিত রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এলেন। সবডিভিসনাল অফিসার হুকুম দিলেন আসামীরা প্রত্যেকে ৫০০৲ টাকার জামিন দেবে, না দিলে হাজত। আসামীরা জামিন না দিয়ে হাজতে গেল।

৩য় দৃশ্য—প্রবোধবাবু উকীলের বাড়ী।

প্রবোধবাবু। চুপচাপ বসে থাকুন। ও তে করবার কিছু নেই। হাকিমরা দেখেন আইনের মাহাত্ম্য আর শান্তি কিসে রক্ষা করা যায়। ঘটনার বৃত্তান্তে আইনের প্রয়োগ করতে কথার মার পেঁচ আর চুলচেরা তর্ক শোনবার অবসর হাকিমদের নেই। কাজেই আমাদেরও বলবার ওতে কিছু নেই। আপনার ছেলেকে বলে দেবেন হাকিমের কাছে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করে।

প্রবোধ বাবু যাকে এই উপদেশ দিলেন তিনি সুধীরের বাপ, তিনকড়ি দত্ত। তিনি কলকাতার কোন আপিষে চাকরী করেন। বাড়ী থেকেই রোজ আপিষে যাতায়াত করেন। খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে, স্নান আহার তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে আধ ক্রোশ রাস্তা দৌড়ে গিয়ে ন'টার ট্রেণ ধরতে হয়; আবার আসবার সময় আপিষের কাজকর্ম্ম সেরে, বাজার করে, ক্রোশখানেক রাস্তা হেঁটে ষ্টেশনে এসে ছ'টার আগের কোন ট্রেণ ধরতে পারেন না। কাজেই সূর্য্যোদয়ের ঘন্টাখানেক আগে থেকে, সূর্য্যাস্তের ঘণ্টা দুই পরে পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীর কোন কাজকর্ম্মও দেখতে পারেন না। রবিবারে এবং ছুটির দিনে বাড়ীতে না থাকলে তাঁর ছেলে মেয়েরা বা পাড়ার লোক তাঁকে চিনতে পারত কি না সন্দেহ। সেদিন অপিষ থেকে এসেই সুধীরের কাণ্ডটা শুনে প্রথমটা চমকে গেলেন। তারপর একটু দুঃখিত হলেন, ক্রমে মনে বড় ভয় হল। ভয়টা ছেলেটার কি হবে তা ভেবে তত নয়, যত নিজের চাকরীটার অনিষ্ট আশঙ্কা করে। আশঙ্কাটা এই যে ছেলেটার এই কুকাণ্ডের কথা খবরের কাগজে বের হবে, আর আপিষ থেকে নোটিস আসবে যে তাঁর ছেলেকে যদি তিনি সামলাতে না পারেন ত তাঁর চাকরী থাকবে না। এই রকম ভয়ে ও ভাবনায় তিনকড়ি বাবু অতি ব্যস্ত হয়ে প্রবোধ বাবুর কাছে গিয়ে উপদেশ নিয়ে এলেন। প্রবোধ বাবু দয়া করে উপদেশের জন্ম ফি টা আর নেন নি।

৪র্থ দৃশ্য—ধর্ম্মাধিকরণ।

ধর্ম্মাবতার নন্দলাল ঘোষ আসীন। বিচারের জন্ম সুবোধ সুধীরকে যথারীতি উপস্থিত করে টাউন আউট পোষ্টের জমাদার সাক্ষ্য দিলেন—বালক আসামী দুটি ভয় দেখিয়ে বিলিতী কাপড় কিনতে বারণ করছিল, এবং যাট সত্তর জন লোকের সঙ্গে মিলে বে-আইনি জনতা করে লোকের যাতায়াতের পথ বন্ধ করেছিল। সুধীর বলে উঠ্‌ল "মিথ্যে কথা, মোটে চোদ্দ পনর জন লোক

ছিল, তার মধ্যে ওঁরাই ছিলেন সাত আট জন। আর বাকী পাঁচ সাত জন তামাসা দেখতে এসেছিল।" সুধীর আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল হাকিম রুষ্ট হয়ে বললেন "ইচ্ছে করলে জেরায় এ সকল কথা তুমি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করতে পার। এখন চুপ কর, আমি যখন জিজ্ঞাসা করবো তখন ব'লো।" সুধীর কার্য্যবিধি-আইন বা প্রমাণ-আইন জানে না, তাই ওই কথাগুলো ব'লে ফেলেছিল, হাকিমের রাগ দেখে চুপ ক'রে গেল, আর কিছু বললে না। হাকিম কোর্টসবইন্‌স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন "যে লোকটাকে এরা বারণ ক'রেছিল সে এসেছে ত? আর মঙ্গলরাম মারওয়াড়ীও বোধ হয় এসেছে?" কোর্ট-সবইন্‌স্পেক্‌টার জানালেন যাকে এরা বারণ ক'রেছিল তাকে পাওয়াই যায় নি, আর মারওয়াড়াটাও ভয়ে সাক্ষ্য দিতে অনিচ্ছুক। টাউন-জমাদার বললেন "হুজুর এদের ভয়ে কেউ কিছুই বলতে চায় না।" কোর্ট-সব-ইন্‌স্পেক্‌টার একটা কনষ্টেবলের সাক্ষ্য দেওয়ালেন এবং বললেন আরও দুজন কনষ্টেবল-সাক্ষী উপস্থিত আছে। আবশ্যক হলে তিনি তাদের সাক্ষ্য দেওয়াতে পারেন, কিন্তু তিনি মনে করেন যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। হাকিম ও বোধ হয় যেন তাই মনে করলেন। বিচার অভিনয়ের বাকী অংশটা মামুলীধরণের। আসামীরা জেরাও করলে না, কোন কথাও বললে না, এবং শিখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা প্রার্থনা করলে না। তাদের অবশ্য সাজা হল, কি সাজা হল সে কথাটা এমন বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। সেটা না শুনলেও চলে।

৩য় দৃশ্য—প্রবোধবাবুর বৈঠকখানা।

সেদিন সহরে সর্ব্বত্রই এই কথার আলোচনা। সহরটি ছোট, কাজেই বিষয়টা গুরুতর হ'ক, আর লঘুতর হ'ক, তাতেই পূর্ণ হ'য়ে গেল। প্রবোধ বাবুর বৈঠকখানায় অনেকগুলি লোক বসেছিলেন। একজন বললেন "প্রবল-প্রতাপ ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে এই অপোগণ্ড শিশুরা বিদ্রোহ ক'রবে! এদের জেলে না দিয়ে পাগলাগারদে দেওয়াই উচিত।" আর একদল বললেন "শিশুগুটি ত নিমিত্তমাত্র। যাঁরা এদের চালক তাদের শিক্ষার জন্যেই এদেকে দণ্ড দিতে হয়।" তৃতীয় ব্যক্তি ব'ললেন "নেতাদের সম্বন্ধে অন্য যা কিছু বলা যাক্, তাঁরা যে মেঘের আড়াল থেকে বাণ ছুড়ছেন, সে কথা আর বলা যায় না, অন্ততঃ এই অসহযোগের ব্যাপারে। বড় বড় নেতারাই আগে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দণ্ড নিয়েছেন।" একজন বললেন "দুঃখের বিষয় এই সকল বিষয়ে

হাকিমদের বিচার-স্বাধীনতা বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। চারুবাবু বললেন Executive আর Judicial function ছুটো ছুঠাই হ'লে হাকিমদের স্বাধীনতা একটু বাড়তে পারে; আর তা হ'লে বোধ হয় বিচারটা একটু ভাল হ'তে পারে, আইনের মাহাত্ম্য বজায় রাখবার জন্যে বে-আইনী কিছু করতে হয় না।

প্রবোধ বাবু। কিন্তু autocratic Government নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ও ছুটো কাযকে একাধারেই রাখতে চায়, পৃথক করলেই autocracyর জায়গায় democracy এসে পড়ে অথবা democracy না হলে ও ছুটো পৃথক করা যায় না। সেই জন্যে autocratic Government এর মাজিষ্ট্রেটদের আইনের স্বরূপ জানা তত আবশ্যক নয়, যত আবশ্যক তার মহিমা রক্ষার উপায় জানা। মাজিষ্ট্রেটদের অবশ্য শেখান হয় যে অপরাধীর সংস্কার আর অপরাধের নিবারণ করাই দণ্ড বিধানের মূল তত্ব। কিন্তু এই ছুটী বুঝে কাজ করতে হলেই হাকিমকে অপরাধীতে অপরাধীতে এবং অপরাধে অপরাধে বিশেষ করতে হয় এবং তার জন্যে অপরাধ তত্বের সঙ্গে মনস্তত্ব শিখতে হয়। কিন্তু এ ছুটী বিষয়ে সাধারণ হাকিমগণ যে বিশেষজ্ঞ এমন ছুর্ণাম তাঁদের শক্ররাও দিতে পারেন না। কাজেই দণ্ডের পাত্র এবং মাত্রা উপযুক্ত হয় না, বাঞ্ছিত ফল লাভও হয় না। এই উপযুক্ততার জ্ঞান প্রত্যেক হাকিমের নিজস্ব-একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই। সেই জন্যে অর্থদণ্ডের মধ্যে একটাকা থেকে একহাজার টাকা, আর কারাদণ্ডের মধ্যে আদালত বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত বসে থাকা থেকে ছ' বছরের জেল, সব রকমই আছে। এই সে দিন ছুজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছুই সংবাদপত্র সম্পাদকের নামে মানহানির মোকদ্দমা করেছিলেন; এক সম্পাদকের দণ্ড হল ৫০০৲ জরিমানা, আর এক সম্পাদকের হল ১০০৲ টাকা জরিমানা। এথেকে যদি কিছু বোঝা যায় তা এই যে এই ছুটি হাকিমের অপরাধমানযন্ত্র এক জাতীয় নয়। পরীক্ষামূলক মনস্তত্বশিক্ষালয়ে একবার এঁদেকে পাঠিয়ে দিয়ে এঁদের মনস্তত্ব-রহস্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা উচিত। এই ত গেল দণ্ডের মাত্রার উপযুক্ততা। পাত্রের উপযুক্ততার জ্ঞান আরও চমৎকার! এই অসহযোগ-সম্বন্ধীয় অপরাধীরা কেউই আপনাকে অপরাধী বলে জানেন নি, বিশ্বাসও করেন নি। বরং তাঁরা জেনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন যে তাঁরা নিরপরাধ। যেখানে তথাকথিত অপরাধীর মানসিক অবস্থা এইরূপ সেখানে তার ওপর দণ্ডের প্রভাব কিরূপ হবে? এইরূপ পাত্রে নানা মাত্রায় যে দণ্ডের প্রয়োগ

করা হচ্ছে, তাতে কি অপরাধীর সংস্কার হবে? অপরাধের নিবারণ হবে? যেরূপভাবে এই অপরাধীরা আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র না করে নির্ব্বিকার চিত্তে কারাবরণ করে নিচ্ছেন তা থেকে ত এইমাত্র অনুমান হয় যে দণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

মানুষের সভ্যতার আদিম কালে দণ্ডের মূলে ছিল প্রতিহিংসা, তখন দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়া হত। একশ বছর আগে ইংলণ্ডে কিরূপ দণ্ড দেওয়া হত তার একটা নমুনা দিই। Old Baileyর বিচারালয়ের কাগজ পত্রের মধ্যে এই বৃত্তান্তটি পাওয়া গিয়েছে এবং লণ্ডনের টাইমস্ পত্রে উদ্ধৃত হয়েছে—

"ওল্ড বেলী, বৃহস্পতিবার, মে ৩০, ১৮২২। বালকের দুর্নীতি পরায়ণতা। জন ম্যালোনি নামক একটি ১৪ বছরের বালক টমাস মলি নামক একজনের পকেট থেকে একখানা রুমাল চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। চুরির বিচারে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আদালতের দণ্ড হল তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।"

এ রকম দণ্ড তখনকার সমাজ বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করত। এখন একে বলে বিচারের নৃশংসতা—Judicial ferocity. কিন্তু এর মূলে আছে এইরূপ দুর্নীতিপরায়ণতা থেকে সমাজকে রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এবং উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য যতই প্রশংসনীয় হ'ক, উপায়টা যে গর্হিত তাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষের মত সমাজেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে বটে, এবং সে অধিকার পরিচালন করতে, আবশ্যক হ'লে হত্যাও অবৈধ নয়। কিন্তু তাতে কি ব্যক্তি বা সমাজ সংরক্ষিত হয়েছে? খুন, ডাকাতি, চুরি, দাঙ্গা হাঙ্গামা কি কমেছে? বছর বছর দেশের শাসন-বিবরণী এবং পুলিসের কার্য্য বিবরণী থেকে দেখতে পাওয়া যায়, সামান্য কম বেশী হ'য়ে অপরাধের সংখ্যা প্রায় সমান সমানই থাকে। এই সামান্য কম বেশীর একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ারও রীতি আছে। কিন্তু কৈফিয়ৎ অপরাধীর সংস্কারক নয়, অপরাধেরও নিবারক নয়। আর যাঁরা আইনের পরিচালনদ্বারা শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁদের সময়ও নেই এবং প্রবৃত্তিও নেই যে অন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সময় এবং প্রবৃত্তি না থাকলেও দেশে হৃদয়বান্ চিন্তাশীল মনস্বীর অভাব নেই। তাঁরা মনস্তত্ত্বের মত অপরাধতত্ত্বকেও বিজ্ঞানের আসন দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন আগে ধর্ম্ম (religion) দুর্নীতি-পরায়ণতার নিবারণের চেষ্টা করে

কৃতকার্য্য হ'তে পারে নি; এখন বিজ্ঞান তার হেতুর আবিষ্কার করে, ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে তার যথোচিত প্রতিকার করবে! কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক, শাসক এবং বিচারক, কারোরই সে কথা ভাববার মত মনের অবস্থা হয় নি। কাযেই তাঁরা অপরাধীর নৈতিক এবং মানসিক অবস্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, যার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছে তার সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে দণ্ড বিধান করে যাচ্ছেন। ফলে দণ্ড-বিধানের যা উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। দেশের হাজার হাজার বালক, যুবক, প্রৌঢ় যে দণ্ডের ভয়ে ভীত না হয়ে নিরপরাধের শান্ত সমাহিত চিত্ত নিয়ে পুনঃ পুনঃ কারাবরণ করে নিচ্ছেন। শাসকবর্গ এখন অপরাধতত্ত্বের আলোতে তার নতুন করে অনুসন্ধান করুন; নতুন দণ্ডের বিধান করুন যাতে দণ্ডিতের মনে অনুতাপ হয়; তবে ত অপরাধীর সংস্কার এবং অপরাধের নিবারণ হবে, রাজবিধি মহিমান্বিত হবে এবং তার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রচলিত বিধিব্যবস্থার কথার রদ বদল করলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। বিধি ব্যবস্থার কথার মধ্যে আত্মার আবির্ভাব চাই।

চারুবাবু বললেন "ও তর্কে ধরে নেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যা করেছে সেটা অপরাধ বটে। কিন্তু সেইটাই ইংরেজী লজিকের ভাষায় begging the question. যে কাযটা অভিযোগের বিষয় সেটা প্রকৃত অপরাধ কি না প্রথমে তারই বিচার করা কর্ত্তব্য, তারপরে দণ্ডের কথা। কিন্তু সেইটাই হয় না, অভিযুক্তকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না, যে তার কাযট অপরাধ। অভিযুক্ত মনে করে সে যা করেছে তা অপরাধ ত নয়ই, বরং তা দেশের পক্ষে হিতকর, না করলে প্রত্যবায় আছে। কাযেই এইরকম লোকের যখন দণ্ড হয় তখন সে এবং তার মত অসংখ্য লোক মনে করে নিরপরাধের দণ্ড হল। কাযেই সে দণ্ড দণ্ডিতকে লাঞ্ছিত না করে, গৌরবান্বিত করে আর বিচার প্রণালী লোক চক্ষুতে নিন্দিত হয়।"

আইন কানুনের ধার ধারে না এমন একটি লোক বলে উঠল "আজ্ঞে' রাজদণ্ডই সে কাযটি করে দেয়। যাদের মস্তিষ্কের আবরণটা একটু স্থূল, কাণ্ড জ্ঞান তা ভেদ করে সহজে প্রবেশ করতে পারে না, রাজদণ্ড তাদেরই হিতের জন্য প্রযুক্ত হয়, আর প্রয়োগ মাত্রেই ফললাভ হয়, মস্তিষ্কের আবরণটাকে সচ্ছিদ্র করে কাণ্ড জ্ঞান অবাধে প্রবেশ লাভ করে—অন্ততঃ প্রয়োগ কর্ত্তারা এইরূপ মনে করে।"

ওরে তোর গানের আসর তোল্!
কাণে মোর পশবে না সে গোল্
কাণে মোর পশবে না সে গোল্!
হয়ত তবু অকারণেই
জয়ের দোলন আস্‌বে বুকে থেমে,
গলার স্বরে লাগবে কাঁপন লাগবে রে মোর
এ দুই আঁখে খেল্‌বে তড়িৎ আস্‌বে বাদল নেমে!
হায় রে যারা বাজিয়ে যাবে সঙ্গে :আমার
পার্ব্বে না আর
কাটবে কেবল সুরের তালমান!
তবু আজ গাইব রে সেই গান
আমি আজ গাইব রে সেই ঘুম-ভাঙ্গানো গান!
সবাই এসে বল্‌বে এটা পাগল এলো কোন্!
অসম্ভবের খেয়াল কেন জুড়লে রে ওর মন
ওরে আজ জুড়লে পাগল মন!
তবু হায় রইব অচেতন
আমি তায় রইব অচেতন!
সবাই তখন উঠবে ক্ষেপে
থামিয়ে দিতে চাইবে আমার গীতে,
সকল পীড়ন ঢাল্‌বে রে মোর ঢাল্‌বে শিরে
কর্ব্বে আঘাত বেদন হানি হাতের বীণাটিতে
থাম্‌বে না গান,—হিংসা মাখা জোর অসহন
কাঁদ্‌বে তাদের
কর্ব্বেরে মোর হাজার অপমান!
তবু আজ গাইব রে সেই গান
আমি আজ গাইব রে সেই ঘুম-ভাঙ্গানো গান!
শিরায় শেষে বন্ধ হবে রক্ত চলাচল!
কণ্ঠ দিয়ে ঝর্‌বে ঝলক ঝর্‌বে গলগল্
সে শোণিত ঝর্‌বে গলগল্!
তবু মোর কম্‌বে নাকো বল্

তবু মোর কম্‌বে নাকো বল্‌!
হয়ত হৃদের তন্ত্রীগুলো
প্রবল টানে হঠাৎ যাবে ছিঁড়ে,
এই দেহটায় আস্‌বে অবশ আস্‌বে রে মোর
কল্‌জে যাবে চিঁরে এবুক ভাস্‌বে নয়ন-নীরে!
হায়রে তখন স্তব্ধ বিরাট্‌ শূন্ত মাঝে
ধীরে ধীরে
বেরিয়ে যাবে এই অভাগার প্রাণ!
তবু আজ গাইব রে সেই গান
আমি আজ গাইব রে সেই ঘুম-ভাঙ্গানো গান!
থাম্‌বে রে গান! ঝঙ্কার তার তুলবে হাহাকার!
বিশ্বজুড়ে উন্মাদনায় ঘুরবে সকল ধার
অচলে খুঁড়বে পারাবার!
অসীমের শক্তি প্রাণে তার!
অসীমের শক্তি প্রাণে তার!
তখন তোদের ভাঙবে রে ঘুম
তখন তোরা দেখবি নয়ন চেয়ে,
হাহা স্বরে কাঁদ্‌বি তখন কাঁদ্‌বি রে ভাই
কাহার তরে ফিরবি বেগে ছুটবি তরী বেয়ে!
হায়রে আমি উঠব তখন অট্টহেসে
বল্‌ব এ যে
মরণ-মাখা ব্যর্থ তারি দান!
ওরে ভাই গাইব আমি গান,
আমি আজ গাইব রে সেই ঘুম-ভাঙ্গানো গান!

—•—

ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।

[শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়]

উপন্যাস পড়িতে গিয়া যে প্রশ্নটি বহুবার উঠিয়াছে ও যাহা লইয়া আজিও বাক্ বিতণ্ডার শেষ হইল না তাহারই একটু আলোচনা করিবার জন্য এই অবতারণা। ঔপন্যাসিককে নিজের কথায় লক্ষ্য প্রচার করিতে কচিৎ দেখা যায়, আর যদিও বা করিয়া থাকেন সেই সব উক্তির মধ্যেও যথেষ্ট মতের অমিল দেখা যায়। সেই জন্যই ঔপন্যাসিকের কি যে বাস্তবিক উদ্দেশ্য তাহা বোঝা হয় না, আরও দশজন আসিয়া সেই বোঝাটাকে আরও ঘোলাটে করিয়া তোলেন মাত্র।

এই অবস্থায় ঔপন্যাসিক টীকাটিপ্পনীতে একটা বেশ উত্তর দিয়া পাঠক-বর্গকে তৃপ্ত না হোক নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন চিত্র রচনা করাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং যদি আমার বিচার করিতে হয় চিত্রের সুসঙ্গতি, স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতি দেখিয়া সেই বিচার কর, "এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুবিধা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়"। ঔপন্যাসিকের যাহা উদ্দেশ্য তাহার রচনার শিল্পত্বেই পর্য্যবসিত, অন্য কোনও বাহ্য উদ্দেশ্যের সার্থকতা তাহার চক্ষে মূল্যহীন।

এক কথায় আসল কথাটাকে বিপর্য্যস্ত করিতে হইলে এইরূপ উত্তর বেশ ভালই মানায় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্নের তাহাতে কোন কিনারা হয় না। ফলকে জন্ম দেওয়াই গাছের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিলেই যদি ফলের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে বলা হইত তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু এ কথা জানা আছে ভোক্তার সহিত ফলের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটি যদি না থাকিত, তাহা হইলে ফলের অনেকখানি অস্তিত্বই ব্যর্থ হইয়া যাইত। এই জন্যই ফলটিকে সৃষ্টি করার মধ্যেই গাছের পরিপূর্ণ সার্থকতা হইয়া যাইতেছে বলিলে অনেকখানি কথাই বাকী থাকিয়া যায়। এইজন্যই আংশিক ভাবে উপন্যাসের উপরোক্ত উদ্দেশ্য কতকটা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, কথাটা শেষ হইয়া গেল বলিয়া চোক বুজিয়া আরাম উপভোগ করিবার ও উপায় নাই। স্বীকার করি ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য, জীবনের কোনও বিশেষ অবস্থার আনুকূল্যেও বিশেষ ঘটনার

সজ্জাতে মানবপ্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দেখান, মানবচরিত্রের একটা বিশেষ বিকাশ ও পরিণতি প্রস্ফুট করিয়া তোলা, কিন্তু ইহা ত উপায় মাত্র। এই চিত্র রচনার সার্থকতা কোথায়। এ প্রশ্নের উত্তর ঔপন্যাসিক না দিতে পারেন, তথাপি ইহার উত্তর যে পাইতে হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া একজন শিল্পী ডাকিয়া বলিলেন, এই সহস্রধাস্ফুরিত বিচিত্র মানবজীবনের প্রকাশটি আমার নিকট একটি অপূর্ব্ব বিস্ময়ের বস্তু। আমি দেখিতেছি জীবন একটা পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি ইহা কখনও সামঞ্জস্যে সম্পূর্ণ হইয়া একটি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও শতধা বিখণ্ডিত হইয়া প্রলয়ের উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, ভালো মন্দের রেশমীসুতার সংমিশ্রণে একটি অপরূপ চিত্র প্রকট হইতেছে, ইহার এক অধ্যায়ে দেখিতেছি ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা, অপর অধ্যায়ে তেমনই স্পষ্ট দেখিতেছি পাপের প্রবলতা ও বিজয়-আস্ফালন। স্রষ্টার দৃষ্টিতে এই ভাঙ্গাগড়া উভয়ই আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে ভাল বলিয়া কোথাও স্রষ্টার তুলিকায় উজ্জ্বলতর বর্ণপাত যেমন দেখিনা মন্দ বলিয়া তাহাতে আবার তেমনি বর্ণপাতের কার্পণ্যও দেখিতে পাইনা। এইজন্য স্রষ্টারই মত ভালমন্দ নিরপেক্ষ হইয়া সুখদুঃখকে দুপাশে সরাইয়া দিয়া কেবলমাত্র সৃষ্টিরই পরম আনন্দকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়া আমি এই মানব জীবনের যথাযথ চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করাকেই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি এবং পাঠকও যাহাতে এমনি নিরপেক্ষ হইয়া এই বিস্ময়কর সৃষ্টির অপূর্ব্ব আনন্দকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন আমি তাহার চেষ্টা করি।

উত্তর দিতে না দিতেই কিন্তু সমাজধর্ম্মী নৈতিক মানবটির নাসিকা অনেকটাই কুঞ্চিত হইয়া আসিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"মানুষ যে কেবল দ্রষ্টাও নয়, স্রষ্টাও নয় এই কথাটা কেন আমরা যে ভুলিয়া যাই তা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মানুষ যে কেবলমাত্র দেখিবার অনন্ত স্বাধীনতা লইয়া আসে নাই তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে। মানুষ যে পথিক মাত্র তাহার পথ চলা যে কত বাধা-বিঘ্নে কণ্টকিত, এই পথ চলিতে গেলে যে তাহার কতখানি সংযম শিক্ষার প্রয়োজন তাহাও কি সন্দেহের বিষয়। যাহা কিছু ভাল লাগে তাহার চর্চ্চা করিতে গেলেই যে তাহার সমূহ বিপদ এ কথা আমাদের ভুলিলে ত চলিবে না। এইজন্যই যাহা কিছু সৃষ্টি করিবার দেখাইবার ও দেখিবার অধিকার কাহারও নাই। মানুষ যেরূপ দেখে সেরূপ ভাবিতে বাধ্য হয় এবং সেইভাবে ভাবিত

হইলে সেইরূপ ভাবানুযায়ী কর্ম্ম ও করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার স্বাধীনতা বিধাতা তাহাকে দেন নাই ইহা যখন সত্য তখন যাহা ইচ্ছা ভাবিবার ও দেখিবার ও স্বাধীনতা দেন নাই ইহাও সত্য স্বীকার করিতে হইবে। অতি সতর্ক পদ ফেলে একখণ্ড দড়ির উপর ভর দিয়া তাহাকে খর স্রোতা পার হইয়া কৈলাসের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এ অবস্থায় যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার প্রেরণা আসিলে ও করিলে ত তাহার সর্ব্বনাশ। এই ভাল লাগা যে মানবকে কত বড় গভীর বিপন্নতার মধ্যে লইয়া যায় তাহা ত কাহারও অবিদিত নাই। এই জন্যই বলিতেছি যে মানুষকে নৈতিক হইতে হইবে, যাহা সৎ, যাহা মঙ্গল, তাহার সাধনা তাহাকে নিবিষ্ট মনে করিতে হইবে। সাধনার যাহা অনুকূল, জীবনের পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহাই যে বরণীয় আর তা-ছাড়া সবই যে বিষবৎ পরিত্যজ্য, শত মোহনতা মধুরতা আসিলেও যে তাহা তাহার প্রাণনাশক তাহাতে কি আর সংশয় থাকিতে পারে! এই জন্যই আপনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাহা সৎ যাহা নৈতিক আদর্শের অনুযায়ী তাহাকে মোহন মধুর করিয়া দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করা। তাহা না করিয়া শুধু ভাল লাগার নাম করিয়া পতঙ্গের সম্মুখে দীপশিখাকে সুন্দর করিয়া স্বাভাবিক করিয়া আঁকিয়া তোলা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

"জানি অনেকে বলিয়া থাকেন পাপের চিত্র আঁকিয়া তাহার বিষময় পরিণাম দেখাইয়া চিত্তকে উন্নত করা যায়। যদিও ইহাতে শিল্পীর উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় তথাপি ইহাকেও আমি পাপ প্রশ্রয়েরই ছলনা মাত্র না বলিয়া পারি না। কারণ পাপের পরিণাম দেখাইতে গিয়া ইঁহারা প্রথম পাপের মোহনতা দেখাইতে বাধ্য হন। পাঠকের চিত্ত ইহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারে না। আর একবার যখন চিত্ত পাপের দৃশ্যে ও ভাবে মুগ্ধই হইল তখন পরিণাম দর্শনের কোনও প্রভাব কি হইতে পারে! ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ইহার একটি নিদর্শন। মোট কথা গল্প গল্পই থাকিয়া যায়, অথচ পাপের চিত্র মানব চিত্তকে তদ্বিষয়ে ভাবিবার একটা প্রকাণ্ড অবসর মাত্র আনিয়া দেয়।

"তার চেয়ে আমার মতে ঔপন্যাসিকের উচিত শুধুই আদর্শ চিত্র আদর্শ জীবন আদর্শ কর্ম্মকে অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধানত করিয়া তোলা। অনেকে বলিতে পারেন আদর্শচিত্র আঁকিতে হইলেও ত contract বা বৈপরীত্যের প্রয়োজন। ব্ল্যাক বোর্ড যদি কাল না হয়, খড়ির আঁকা ছবি যে শুভ্র এ কথাটা বোঝা দূরের কথা, ছবি আঁকাই সম্ভব হইত

না। কোন চিত্রকে ফুটাইতে হইলে তাহার পাশে একটি বিপরীত চিত্রও দাঁড় করাইতে হয়, এইজন্যই রোহিণীর পাশে ভ্রমর, ওথেলোর পাশে আয়াগো, বিলাসের পাশে নরেন। কিন্তু আমি বলি এইরূপ বিপরীত চিত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন নাই। আমাদের স্ব স্ব মানসিক অবস্থাই আদর্শ চিত্রের contrast এর স্থান পরিপূর্ণ করিবে। আদর্শ চিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করাইবার জন্য ভ্রমরের পাশে রোহিণী না থাকিলেও চলিত; নরেনের হৃদয়ের সরল মহত্ত্ব বিলাস না থাকিলেও স্পষ্টই বোঝা যায়। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাপচিত্রের প্রয়োজন নাই।"

যাঁহাকে এতক্ষণ নৈতিক মানব এই সব কথা শুনাইতেছিলেন তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "দেখুন যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যে আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য, চক্রান্ত করিয়া পাকে চক্রে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন একথা আর যেই মানুক আপনি নিশ্চয়ই মানেন না। অথচ দেখুন তিনি ত আমাদের চক্ষুকে শুধু প্রলোভনপ্রিয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার সম্মুখে আবার যথেষ্ট প্রলোভন ও ধরিয়া রাখিয়াছেন দেখিতে পাই। ইহাতে ত এমন মনে হয় না যে বিধাতার ইচ্ছা এই যে মানুষ তাহার চোখে সাতপাক কাপড় জড়াইয়া কোন রকমে এক দৌড়ে এই সংসারটা পার হইয়া যাক্। তার চেয়ে আমরা যাহাতে দেখি, সেই জন্যই ত তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ দেখিতে পাই। যদি এক দৌড়ে মাঠ পার হওয়াই সংসারের পরীক্ষা পাশের উপায় হয়, তাহা হইলে বিশ্বস্রষ্টাকে মানবের শত্রু না বলিয়া পারা যায় না, নতুবা বলিতে হয় বিশ্বস্রষ্টা একটি পরম বোকা। আমার কিন্তু মনে হয় তিনি বোকাও নন শত্রুও নন। মানুষকে প্রলোভনের মাঝ দিয়া বহু দুঃখদহন সহ্য করিয়া বহু আঘাতে নিদারুণ শিক্ষা লইয়া তবে এই সংসারের পথ চলিতে হয়। যদি সংসারের কোনও সুসঙ্গত শান্তিময় পরিপূর্ণতার লক্ষ্য থাকে তবে তাহাকে এই সংসারের করুণ শিক্ষালয়ে পূর্ণশিক্ষা লইয়াই সেই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে; সে শিক্ষা সাতপাক কাপড়ের অন্ধ সংযমে হইবার নয়। এই সাধনার পথে চলিবার অধিকার প্রতিপদে অতি নিদারুণ বেদনা বিনিময়ে অর্জ্জন করিতে হয়। এজন্য আমি চাই এই চিত্তজগৎকে অতি উজ্জ্বল করিয়া তাহার ভালমন্দকে এতটুকুও বাদ না দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে। আমি জানি এ জগতে ভাল ও মন্দের সমান দর; স্রষ্টা উভয়কেই একটি কোনও শাশ্বত প্রয়োজনের খাতিরে সৃষ্ট করিয়াছেন। বেদনা এখানে আনন্দের

মূল্য, পাপ এখানে পুণ্যের পথ, অকল্যাণ কল্যাণের আয়োজন। সেই জন্ম আমি চরিত্র সৃজন করিতে কাল্পনিক 'কেবল ভাল' আঁকিয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হইতে পারি না। আমি যাহা সৃষ্টি করি তাহার মাঝ দিয়া জগৎকে আমি সত্য করিয়া দেখাই। বলিতে পারেন তাহা হইলে আর তোমার সৃষ্টির কি প্রয়োজন, জগৎ প্রকৃতি দেখিলেই ত হয়। না, তাহা হয় না। বহুকাল হইল একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছিলেন "কাব্যজগৎ এই জড়জীবজগতের সার—এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এসেন্স বা আরক। কাব্য-শোধিত সংসার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। কাব্যে যে তীব্রতা আছে, যে উপকারিতা আছে সংসারে তাহা নাই। কেননা সংসার যদি গোলাপ ঝারি হয় তবে আমরা বলিব কাব্য আতর। আবার সংসার যদি দ্রাবক হয়, কাব্য মহাদ্রাবক। * সংসারে ও উপন্যাসে চিত্রিত সংসারে অনেক ভেদ আছে। সংসারে জীবনের বিকাশ ব্যাপার এত জটিল, এত গোপন ধীর গতিতে চলিতে থাকে যে প্রায়শঃই তাহার পারম্পর্য্য ও কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা ধরা অসম্ভব হইয়া পড়ে; সুতরাং দেখার কোনই সার্থকতা থাকে না। মানব এই সংসারে নিজেও কর্ম্মী, নিজেও নানা ভাবের তরঙ্গে তাড়িত, এখানে তাহার দেখার অখণ্ড অবসর নাই, দেখিতে গিয়া এখানে সে নিজেও কর্ম্ম জড়িত হইয়া পড়ে। দেখিতে হইলে বস্তুটি যেমন অত্যন্ত জটিলতাময় না হইলেই তাহার ধারনা সহজ হয়, তেমনি আবার দ্রষ্টাকেও কতকটা ব্যবধানে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। বস্তু যদি চোখের সহিত লাগিয়া থাকিত তাহা হইলে কিছুই দেখা সম্ভব হইত না। বস্তু ও চোখের মধ্যকার ব্যবধানটাও দেখার একটা প্রধান সহায়ক। উপন্যাসজগৎ এই ব্যবধানটি সৃষ্টি করিয়া এই দেখাটিকে সহজ সুগম করিয়া তোলে। আরও একটি কথা আছে।

জীবনের এই বাস্তবচিত্র স্বভাবতঃই করুণ রসাত্মক হইয়া থাকে। এই জন্যও অনেকে বিয়োগান্তক সৃষ্টিকে আমল দিতে চাহেন না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তাহা হইলে কি যাহা সত্য তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে কাল্পনিক বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখাই শিল্পীর সাধনা হইবে? অতীন্দ্রিয় জগতের কথা জানিনা সেই সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বাস্তব জগতের যাহা সত্য তাহার দিকে চাহিয়া বাস্তব জীবনের ঘটনাপুঞ্জের দিকে চাহিয়া

* বান্ধব শ্রা-ভা. ১২৮৩ নাটক প্রবন্ধ।

আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিবার মত মনোভাব যে হয় না তাহা সত্য। পাপপুণ্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম, তাহার সহিত সুখদুঃখের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ এই দুটা চোকে ত দেখা যায় না। তাই আমি দেখিলাম এই জীবন বড় করুণ, মানবভাগ্য বেদনাময় অশ্রুময়,—বিশ্বশক্তিপুঞ্জের অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। এই সত্যের দিকে চাহিয়া অতি বড় পাপীকে ও আর ঘৃণাভরে ঠেলিয়া দিতে পারা-যায় না, কিরণ্ময়ী পাপিষ্ঠা কিন্তু করুণাবিগলিত মমতা অনুভব না করিয়া, অসহায় শিশুকে যেমন করিয়া মা বুকে টানিয়া লন তেমনি তাহাকেও বুকে তুলিয়া না লইয়া ঘৃণা করিবার মত অমানুষিক হৃদয়হীনতা কাহার আছে আমি জানি না। বিশ্বের মাঝে নিয়তির এই রহস্যময় লীলা দেখিয়া কি আর মানবকে তাহার কোন বিশেষ কর্ম্মের জন্য দায়ী করিয়া তাহাকে অপরাধী করিতে মন সরে? মানবের পরম অসহায়তার দিকে যাহার চক্ষু পড়িয়াছে সে কি আর ভালকে ভাল বলিয়া হাসিতে পারে না, মন্দকে মন্দবলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিতে পারে? অসহায় মানবের দিকে চাহিয়া এই যে করুণায় হৃদয় গলিয়া যায়, ইহা কি কোন ও অংশে নৈতিক শিক্ষা অপেক্ষা হীন এবং ইহাই কি জীবনের চরম শিক্ষা নয়! পাপীকে সরাইয়া রাখিয়া যে বিশ্বকে দেখিতে চায় দেখুক আমি কিন্তু মানবকে পাপপুণ্যের সংঘাতের মধ্যেই দেখিতে চাই; এই বাস্তব সৃষ্টিই আমার লক্ষ্য।”

ভাববাদী ঔপন্যাসিক ইতি মধ্যে পাশে আসিয়া বসিয়া ছিলেন তিনি বলিয়া উঠিবেন “কিন্তু আপনি একটি কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝখানে এই আমার আমিটিও রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য, দেখিয়াছেন আমি ও যে স্রষ্টার আর একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব হইতে ভিন্ন রকমের বিচিত্র সৃষ্টি তাহাআপনি অস্বীকার করিতেছেন। স্রষ্টা এই জগৎটিকে সম্পূর্ণ যাহা হওয়া উচিত তাহা করিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই, অনন্ত কালের পথ বাহিয়া এই জগৎ চলিয়াছে। আজি ও এ জগৎ পরিপূর্ণতা ধরিতে পারে না হয় ত আর পারিবেও না। এ জগৎ প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনার অপরিপূর্ণতাকে প্রচারিত করিতেছে ও পরিপূর্ণতার অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে মাত্র। ইহা হইতেই আপনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন মানব জীবন ও এমনি অপরিপূর্ণ। কিন্তু আপনি বিশ্বসৃষ্টিতে ও আমাতে যে স্রষ্টার ইচ্ছাবৈচিত্র্য আছে তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এ জগতের আর সমস্ত বস্তুতে আমাতে এইটুকু বিশেষ ভেদ আসিয়া পড়িয়াছে যে অন্য সমস্ত বস্তু তাহার সৃষ্টি কৌশলের একটা প্রকাশ মাত্র কিন্তু

আমাতে স্রষ্টার সৃষ্টিপ্রবণতাটুকু ও আসিয়া পড়িয়াছে। আমার মধ্যে সৃষ্টি করিবার শক্তি ও রহিয়াছে। সমস্ত অসম্পূর্ণতার মধ্যে থাকিয়াও আমার মধ্যে তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়ার শক্তি সম্ভাব্যতা রহিয়াছে। তাই এ জগৎ যে পরিপূর্ণতার দিকে কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে আমার বিচিত্র মন আপনার ধ্যানালোকে কল্পলোকে সেই পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই জন্যই বাস্তব সৃষ্টির নাম দিয়া মান অন্তরের বিরাট সম্ভাব্যতাকে আপনি যখন অস্বীকার করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ও অসহায় করিয়া দেখাইয়া বসেন তখন আমি কিছুতেই তাহাকে সত্যকার বাস্তব সৃষ্টি বলিতে পারি না।

'অপরিপূর্ণতার বন্ধনে এই যে সৃষ্টি কাঁদিয়া ফিরিতেছে তাহার এই বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি নাই, শুধু আমার আমিটি এই প্রয়োজনের চক্রপেষণ হইতে, সীমার বদ্ধতা হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া পরিপূর্ণ আনন্দলোকে উপনীত হইতে পারে। যদিও মানব বন্ধনের বেদনায় কাতর, তথাপি তাহার মধ্যে মুক্তির একটা দিক রহিয়াছে। শত বন্ধনের দংশনপীড়িত এই মানব জীবনের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া জানি না অনন্ত আকাশের কোন নক্ষত্রলোকের বার্ত্তা লইয়া কোন পরিচয়ের স্মৃতি বহন করিয়া উদাস দক্ষিণা হাওয়া কখনও কখনও আসিয়া মানব চিত্তে কি আলোড়ন তুলিয়া দেয় অমনি মুহূর্ত্তে যত বন্ধন যত দীনতা যত বদ্ধতা সব কোথায় ঝরা পাতার মত উড়িয়া যায়; মানব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করে. তখন যেন আমার মধ্যে এ কোন্ আমির লীলা অনুভব করি আমি যেন স্রষ্টার সহিত এক হইয়া যাই কোথায় যেন ভেদ থাকে না। সেই মুক্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আর কিছুতেই এই তথাকথিত বাস্তব সৃষ্টকে সত্য সৃষ্টি বলিয়া সমাদর করিতে পারি না।"

বাস্তববাদী বলিলেন "আপনি যে কোন্ নক্ষত্রলোকের বার্ত্তার কথা বলিতেছেন উহা বাস্তব জীবনের সত্য নয় উহাকে আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা অনুভব করি।"

ভাববাদী উত্তর করিলেন "আপনার একথার উত্তর ও পূর্ব্বেই দিয়াছি। আপনি শুধু বিশ্বকেই দেখিতেছেন। আমার মন বলিয়া বস্তুটি তাহাকে আপনি ভাল করিয়া দেখিতেছেন না। আমার মন যখন আপনার বাস্তব সত্যকে ছাড়াইয়াও অন্য সত্যের সন্ধান পায় তখন আমিও যেমন ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, আপনিও তেমনি ইহাকে সত্যের মর্য্যাদা না

দিয়া পারেন না। এই মাত্র বলিতে পারেন যে আমার কল্পনা আপনার সীমাবদ্ধ বাস্তবতাকে পার হইয়া গিয়াছে। ইহাকে অসত্য বলিবার আপনার কোন যুক্তিসঙ্গত অধিকার নাই।"

নৈতিক মহাশয় একটু আশ্বস্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ভাববাদী মহাশয় নীতিশাস্ত্রের কথাটাও পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন না। একটু অধীর হইয়া বলিলেন "তাহা হইলে আপনিও কি বলিতে চান যে নৈতিক উদ্দেশ্য থাকার কোনও প্রয়োজন নাই?"

উত্তর হইল "দেখুন আমি ত তাহা বলি নাই তবে একথা বলিব যে নৈতিক জগৎটাও বন্ধনের জগৎ, পথ চলাটাও নিয়মের বন্ধন। তবে এই পথ চলা প্রয়োজন হইতে পারে, হইতে পারে যে প্রয়োজন আছে। কারণ নৈতিক সাধনার ও লক্ষ্য হইয়া পরিপূর্ণতার দিকে স্বাধীনতার দিকে লইয়া যাওয়া। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে নৈতিক সাধনার মধ্যেও প্রকৃত আনন্দ নাই। মানবের অন্তঃপ্রকৃতি এই নৈতিক সাধনার বাঁধা বাঁধির মধ্যে স্বাধীনতা পায় না, আনন্দ পায় না। এই জগৎকে পরিপূর্ণ করিয়া দেখার ও জানার যে আনন্দ আছে নৈতিক সাধনা তাহা দিতে পারে না। অথচ মানুষের মধ্যে যে একটা মুক্তির প্রেরণা রহিয়াছে তাহা ক্রমাগতই তাহাকে সকল আবরণ মুক্ত হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে, সকল বন্ধন সকল সীমাকে উপেক্ষা করিবার জন্য প্রেরণা দিতেছে। অথচ মানবের স্বাভাবিক সংস্কারগত যে বন্ধন তাহা তাহাকে কিছুতেই ওই স্বাধীনতা উপভোগ করিতে দেয় না। বদ্ধতা আছে বলিয়াই সে নিয়মকে অতিক্রম করিতে গেলে নানা অস্বস্তি ও অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হয়। মানুষের এই দুই মুখী গতি—এক বদ্ধতার দিকে, অপর মুক্তির দিকে—তাহাকে টানাটানি করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, মানবের মধ্যে এই মুক্ত আমি ও বদ্ধ আমির বিরোধ রহিয়াছে বলিয়াই আমার সহিত আপনার মিল কিছুতেই আর হইয়া উঠিতেছে না।

"মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? যতক্ষণ আপনার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব এই মুক্ত আমি ও বদ্ধ আমির বিরোধ না মিটিতেছে ততক্ষণ কিছুতেই একটা স্থির মীমাংসা হওয়া সম্ভাবনা নাই। শুধু ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া ও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

"মানবাত্মা যখন অকস্মাৎ আপনার মধ্যে আপনাকে মুক্ত বলিয়া দেখিতে

পায় তখন সে দ্রষ্টার মত বলে আমি এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির কণামাত্র ও আমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে দিতে পারি না। বিস্মিত কৌতূহল ভরে আমি শুধু দেখিব—আমার, নিকট ভাল নাই মন্দ নাই—আমি জানি একমাত্র আশ্চর্য্যকে, বিস্ময়ময় রহস্যময়কে। তাহার দিকে চহিয়া দেখিতে আমার কণামাত্র সঙ্কোচ নাই, ইহাতেই আমার পরম আনন্দ।

"কিন্তু এই পরিপূর্ণ আনন্দ বোধ জীবনে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে চায় না। মুক্তির দিকটি বদ্ধ হইয়া যায়। বাসনাচঞ্চল বদ্ধ আমির চাঞ্চল্যে এই পরিপূর্ণ আনন্দ উত্থিত হইয়া পড়ে; পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার অনাবিল সৌন্দর্য্য মেঘান্ধকারে মলিন হইয়া যায়, বেদনায় চিত্ত পীড়িত হয়; আবার ভাল মন্দের আবর্ত্তে পড়িয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে। বদ্ধ আমিটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার যতই পক্ষপাতী হোক না কেন, তাহার পক্ষে অবাধ স্বাধীনতা যে সুখময় নয়, চরণ যে তাহার শৃঙ্খলিত, চলার পথ যে তাহার সীমাবদ্ধ ইহা অতি কঠোর সত্য। মুক্ত আমির অধিকারের দিকে লুব্ধ হস্ত বাড়াইতে গিয়া বদ্ধ আমিকে বার বার মর্ম্মান্তিক জ্বালা লইয়া ফিরিতে হয়।

"এই জন্যই আমাদের বদ্ধ স্বভাবটি মুক্ত আমির প্রলোভনে পীড়িত হইয়া বলে ওগো আমায় আর তুমি এ প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিও না। মানবের মধ্যে মুক্তি ও বন্ধনের এই বিবাদের অবসান না হইলে, তাহার এ দ্বন্দ্ব এ অশান্তি কিছুতেই মিটিবে বলিয়া মনে হয় না। নীতিবিদ্ বদ্ধ আমিকে শাসন করিতে থাকবেন, ঔপন্যাসিক শিল্পী মুক্ত আমিকে লইয়া বিহার করিবেন, আর মাঝে হইতে আমার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চিরকালই চলিতে থাকিবে। এই দুটি আমিকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিবার কোনও উপায় যদি থাকে তাহার সন্ধান করুন নতুবা ভুল করিয়া আপনি আমার সম্পত্তি লইয়া টানিবেন আর আমি আপনার ধন লইয়া হয়ত টানাটানি করিতে থাকিবে। কারণ বাস্তবিক পক্ষে আপনার যাহাকে লইয়া কারবার আমার কারবার তাহাকে লইয়া নয়"।

পতিতার সিদ্ধি।

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৪৭)

সকলের জন্ম খাবার প্রস্তুত করা নির্ম্মলার শেষ হয় হয় হইয়াছে। শুভা, পুঁটি, মা—নির্ম্মলার উদ্দেশে সকল প্রকারের সম্বোধন করিয়া ব্রজেন্দ্রও ডাক হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। সমস্ত বাড়ীটা এখন একরূপ নিস্তব্ধ কেবল মাঝে মাঝে নালুবাবুর পড়ার গুণ্ গুণ্ শব্দ নির্ম্মলার কানে পশিতেছিল। নির্ম্মলা রাঁধিতেছিল আর ভাবিতেছিল কি মূর্ত্তি লইয়া সে আজ স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সাধ্বীর মর্য্যাদায় আজ আঘাত লাগিয়াছে। সে সব সহ্য করিতে পারে, শ্বশুর গৃহে শত প্রকারের লাঞ্ছনা—কিন্তু ওই আঘাতের এতটুকুও তার অসহ্য। মনের মলিনতা লক্ষ্য করিয়া এক মুহূর্ত্তেই তার সৎশ্বাশুড়ীর উপর তার অশ্রদ্ধা হইয়াছে। এখন আবার স্বামী। তাহাকে নির্ম্মলা কি পণ্ডিত বলিবে? সে যে তার ছেলের কাছেই তাকে অপদস্থ করিল। ক্ষুদ্র বালক কি বুঝিয়াছে, না বুঝিলেও স্বামীর উপরে নির্ম্মলার 'অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হইল। বুঝিল চরিত্রের কলুষতা যদি একবার কাহারও হৃদয়ের কোন অংশ অন্ধকারে ঢাকিয়া দেয়, শিক্ষার দীপ্তালোক সে স্থানটাকে আর দ্রষ্টব্য করিতে পারে না।

কিন্তু কি মূর্ত্তি লইয়া নির্ম্মলা স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে? অভিমান-রঞ্জিত মুখ লইয়া? কোথায় পাইবে সে অভিমান? প্রাণের যে অংশ লইয়া সে অভিমান দেখাইবে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসের চাপে সে অংশ বিলীন প্রায় হইয়াছে। চিরশান্ত, সদানন্দময়ী—উগ্রমূর্ত্তিও ত কখন সে দেখাইতে পারে নাই। নির্ম্মলা রাঁধিতেছিল, আর ভাবিতেছিল। যে মূর্ত্তিতে সে শ্বাশুড়ী ও সরির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জানিয়াও কিছু-না-জানা ভাবময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মলা কি ধরিতে ভুলিয়া গিয়াছে? সে মূর্ত্তি একবার দেখিয়া যে যার নিজের কাছে অপরাধী শ্বাশুড়ী কিম্বা সরি কেহই যে আর তাহার কাছে উপস্থিত হইতে পারিতেছে না!

রন্ধন কার্য্য তার শেষ হয় হয় হইয়াছে, নালু দ্বারদেশে আসিয়া নিম্নস্বরে ডাকিল "মা"।

নির্ম্মলা মুখ ফিরাইতেই সে বলিয়া উঠিল—"একটি মেয়েলোক তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছে।"

"কোথা থেকে এসেছে সে জিজ্ঞাসা ক'রে এস।"

"জিজ্ঞাসা করেছিলুম. বলে গিন্নি মা'র কাছে বলব।"

"আসতে বল।"

নালুকে আর বলিতে হইল না। মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল সেই স্ত্রীলোক একেবারে রন্ধনশালার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মায়ের আদেশে নালু আবার পাঠের ঘরে চলিয়া গেল।

"তুমিই কি মা গিন্নী?"

"কোথা থেকে আসছ তুমি?"

ঝি বলিতে লাগিল। দু'টা কথা বলিতে না বলিতে নির্ম্মলা তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—'আমি বুঝেছি। তা আমার কাছে কেন এসেছ?'

ঝি রাত্রির ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিল। নির্ম্মলা আবার বাধা দিয়া বলিল—"আমি জানি। কি বলতে এসেছ শিগ্‌গির বল—আমার অপেক্ষা করবার সময় নাই।"

পুলিশ আসিলে বিশু ও তাহাকে রাখু সম্বন্ধে যে কথা বলিতে ব্রজেন্দ্র আদেশ করিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া ঝি বাবুর মতি ফিরাইতে নির্ম্মলাকে অনুরোধ করিল।

"সে মরে গেছে বুঝলে কি ক'রে?"

"তা না বলে কি বলব মা? সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফিরলো না, ঘরের জিনিষ পত্র চারদিকে ছড়ানো, গহনা পর্য্যন্ত সাবধান ক'রে যায় নি।"

"তা আমি কেমন ক'রে বাবুর মতি ফেরাব?"

"সে ঠাকুরের যে কোনও অপরাধ নেই মা!"

"সে তোরা বল্‌ছিস্‌, লোকে বিশ্বাস করবে কেন?"

নির্ম্মলার কথার ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া ঝি নীরবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত সময় ওই ভাবে থাকিয়া সে বলিল—"তাইত মা ব্রহ্মহত্যা হবে, একটা বেউশ্যের খুনের দায়ে?"

"তোরা যা জানিস্‌ ঠিক বললে ব্রহ্মহত্যা হবে কেন!"

"আপনি ওই যে কি বললে মা! আমাদের কথায় লোকে বিশ্বাস করবে কেন?"

"করে না করে বামুনের অদৃষ্ট, যে যা কর্ম্ম করেছে তার ফল পাবে। আমার কাছে কেন এলে বাছা! ওসব নোংরা কথা শুনতে আমার ভালই লাগছে না।"

ঝি হেঁটমাথা বার দুই নাড়িয়া আপনার মনে কি বলিল। তারপর নির্ম্মলাকে একটা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া চলিল। কিছু দূর চলিয়াই মুখ ফিরাইয়া বলিল "তবে আমার আসার কথা—"

কথা তার শেষ না হইতেই শুভার মা পিছন হইতে ডাকিল—"বৌমা" ঝির আর কথা শেষ করা হইল না। দ্রুত পদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

"ও কে এসেছিল বৌমা ?"

"এইত শুনলে মা কেও কাউকে বলতে নিষেধ করছিল। তোমাকে দেখে পালিয়ে গেল।"

"আমাকে বলতে দোষ আছে ?"

নির্ম্মলা উত্তর দিল না।

"তুমি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি।"

তবু নির্ম্মলা উত্তর দিল না।

"আমাকেও তুমি যেন কেমন সন্দেহ করছ।"

"বললে ওর মনে হয়েছে ক্ষতি হবে। তখন শোনবারই এখন প্রয়োজন কি মা।"

"কেন গা আমি কি পেটের কথা রাখতে পারব না। পাড়ায় পাড়ায় বলতে যাব নাকি ?"

"রাখতে কি পেরেছ মা ?"

বিস্মিতনেত্রে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—"কইমা, কবে, কার কাছে তোমার কি গোপন কথা বলেছি ?"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল—"ভেবে দেখ মা।"

"তুমিই বলনা।"

"শুভার সঙ্গে ওই ঠাকুরের বিয়ের কথা কয়েছি, ওবাড়ীর গিন্নী জানলে কি করে ?"

"একটু লজ্জিতার ভাবে শুভার মা উত্তর করিল—"তাহ'লে আবাগী সরি বলেছে।"

"সরিকে বললে কে ? আমি ত তাকে বলিনি মা !"

মুখের ভাবে নিজের অপরাধটা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া শুভার মা বলিল—"তুমিই কি তবে তাকে বিদেয় করে দিয়েছ?"

"বিদেয় আমি করি নি। তবে তাঁর চলে যাবার একান্ত জেদ দেখে নিষেধ করিনি। ধরে রাখলে কি সর্ব্বনাশই না হত মা!"

"সর্ব্বনাশ কি বৌমা?"

"আমাকে ব্রহ্মহত্যার উপলক্ষ হ'তে হ'ত।"

"কি বলছ গো?"

"ও কে তুমি বুঝেছ বলছিলে, কি বুঝেছ বল দেখি?"

"বুঝেছি বলে অপরাধ করেছি মা।"

"অপরাধ কিসের মা? নিশ্চয় কিছু মনে করেছিলে। বল্‌তে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"আমি মনে করেছিলুম—" বাস্তবিকই অতি সঙ্কোচে শুভার মা আর বলিতে পারিল না।

"তুমি মনে করেছিলে ভটচাজ্জি ম'শায় ওকে গোপনে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"ওকি বলছ মা, এরকম মনে আমি করতে যাব কেন!" শুভার মা বলিল বটে, কিন্তু তার মাথা কথাগুলায় সায় দিতে অপারগ হইয়া আপনা আপনি নত হইয়া গেল। আর দু'একটা কথ সে কি বুঝিয়াছিল, বলিবার বৃথা চেষ্টায় নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলিল—"ও সেই মাগীর বাড়ীর ঝি। বলতে এসেছিল, তোমার ছেলে ওই গরীব ব্রাহ্মণকে খুনের আসামী ক'রে পুলিশে ধরিয়ে দেবার মতলব করেছে।"

"তা হ'লে ত ছেলের বড় অন্যায়!"

"পুলিশের কাছে ওদের কি বলতে হবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে। তাই ও বেটি কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ছুটে এসেছিল, যাতে আমি তোমার ছেলেকে সে কাজ করতে নিষেধ করি।"

"পণ্ডিত হ'য়ে তার এরকম দুর্ব্বুদ্ধি! তুমি তাহ'লে এখনি গিয়ে নিষেধ ক'রে এস মা! ছি ছি! ব্রজেনের এত বাড়াবাড়ি! নাও এস—তোমাকে সে কি বলবে বলে ব্যস্ত হয়েছে।"

"তোমার কি মত? আমার কি এসব কথায় থাকা উচিত?"

"মতামত নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্রকে এ মহাপাপের কাজ থেকে যে

কোনও উপায়ে ফিরিয়ে আন। ওমা, একি কথা! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—"

উপর হইতে এই সময় ব্রজেন্দ্রের কথা উভয়েরই কাণে গেল। কথায় বিরক্তি, হতাশ, অভিমান—সব যেন একসঙ্গে জড়ানো।

"মা আমি চললুম—আর বিলম্ব করতে পারি না। পুঁটি উঠেছে—তাকে তুলে নিয়ে যাও।"

শুনিয়াই শুভার মা বলিয়া উঠিল—"আর দেরি করছ কেন বৌমা? সত্যি সত্যি চলে যাবে!"

"তুমিও যেমন, কোথায় যাবে? খাবে কোথায়? আর কি সে আবাগী আছে! তুমি আগে যাও, ঠাঁইটা কর গিয়ে, আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্রজেন্দ্রের বালকত্বের উপর সমালোচনা করিতে করিতে শুভার মা চলিয়া গেল। আর দেখা না করিলে চলেনা বুঝিয়া নির্ম্মলাও রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। মূর্খস্বামী সত্যই কি এক নিরীহ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে?

(৪৮)

ব্রজেন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতে আসিয়া বলিব না বলিব না করিয়া এটর্ণী প্রভুর জেরায় সরি একরূপ সব কথাই বলিয়া ফেলিল, রাখুর পূজা করিতে আসার কথা, আসিতে আসিতে মধু ঠাকুরকে দেখিয়া পথ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার কথা, নির্ম্মলার আদেশে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে শুভার নাকে আঘাত লাগার কথা, তারপর রাখুকে যত্ন করিয়া বসানো, ব্রজেন্দ্রের নিজের ঘরে আহার করানো,—ইত্যাদি ইত্যাদি এমন কি রাখুর সঙ্গে নির্ম্মলার ভাই সম্বন্ধ পাতানো—সমস্ত কথা জেরার কৌশলে ব্রজেন্দ্র সারির মুখ হইতে বাহির করিয়া লইল।

সরি বলিতেছিল, শুনিতে শুনিতে ব্রজেন্দ্র উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইতেছিল। শিক্ষার সংযম সরির চোখে তার মুখটাকে অরঞ্জিত রাখিলেও ভিতরের উত্তাপটা ক্রমে এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, দেহটাকে আর সে স্থির রাখিতে পারিল না। সে বসিয়াছিল, উঠিল। একটা হাত তার বিদ্রোহীর মত একটা ঘ্যান ঘ্যান করা মশাকে শাস্তি দিতে তারই পিঠে বেশ একটু জোরে আঘাত করিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য। ব্রজেন্দ্র বুঝিল, তাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত রাখুর এইরকম একটা ঘুসির সঞ্চালনেও ত শুভার নাকে আঘাত লাগিতে পারে।

"পূজারি ঠাকুর আজ আর আসবে না?"

"মা'ত তাই বললে।"

"সে কোথায় গেছে বলতে পারিস্?"

"দেশে চলে গেছে।"

সরির নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত উত্তর ব্রজেন্দ্রের ঈর্ষা-প্রজ্বলিত বক্ষে এক মুহূর্ত্তে একটা যেন হিমনদীর প্রবল প্রবাহ ঢালিয়া দিল।

মুখের ভাব লুকাইতে সরির কাছে থাকাও তার সম্ভবপর হইল না।

"পুঁটির কাছে থাক্ সরি, আমি একবার শুভাকে দেখে আসি।"

ভাবগোপনের শত চেষ্টাতেও সরি প্রভুর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, মা'র মুখে রাখুর প্রস্থানের কথা শুনিয়া তার ও ঠাকুরমার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, প্রভুরও ঠিক তাই হইয়াছে। সমাপরাধের আর একটী সঙ্গী জুটিল দেখিয়া সরি বেশ সন্তুষ্টই হইল। সে একবার বিছানায় ঝুঁকিয়া পুঁটিকে দেখিয়া লইল, অঘোরে বালিকা ঘুমাইতেছে বুঝিয়া ঠাকুরমার কাছে চলিয়া গেল।

শুভার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্রজেন্দ্র দেখিল শুভা বালিশে মুখ লুকাইয়া নিস্পন্দের মত পড়িয়া আছে। তাহার বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সে বুঝিল শুভা ঘুমায় নাই, পদশব্দে তার আগমন অনুমান করিয়া বালিকা মুখ ঢাকিয়াছে।

ব্রজেন্দ্র শুভাকে ভালবাসিত। ভালবাসিত শুভা তার একটি মাত্র ভগিনী বলিয়া, তার উপর বালিকা তার বিমাতার কন্যা অল্পবয়সী বিধবার মমতার একমাত্র অবলম্বন। সেই জন্য স্নেহটা তার একরূপ পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম ব্রজেন্দ্র এই স্নেহ অভিনয়ের আকারেই ব্যবহার করিত। করিত অতি সঙ্কোচের সহিত, কোনও সময়ে তাহাতে সামান্য মাত্র ও ত্রুটি দেখিয়া যাহাতে তার মা ক্ষুণ্ণ না হয়। ক্রমে সে অভিনয় এতই সত্যে পরিণত হইয়াছিল যে দেখিয়া শুভার মাকে ও সময়ে সময়ে মনে করিতে হইত, সেও বুঝি কন্যাকে ব্রজেন্দ্রর মত ভালবাসে না। অনেকবার সাংসারিক ব্যাপারে সামান্য মাত্র ত্রুটিতে বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী নির্ম্মলাকেও তার কাছে তিরস্কৃতা হইতে হইয়াছে।

তবু অতি ধীরে ব্রজেন্দ্র ডাকিল—"শুভা!"

শুভা বালিশের ভিতর আরও খানিকটা মুখ ঢুকাইয়া দিল।

"ভয় করতে হবে না তোকে। অন্যমনস্কে একজনের হাত তোর নাকে লেগে গেছে, এতে তোর ভয় কিম্বা লজ্জা করবার কি আছে? যন্ত্রণা কিছু নেই ত?"

শুভা কোন উত্তর দিল না।

"চুপটি ক'রে শুয়ে থাক্, যেন ওঠা নামা করিস্‌নি।" বলিয়া ব্রজেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, ঈর্ষার নেশায় কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার মনে যে সকল অসচ্চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সহসা প্রতিক্রিয়ায় সে গুলা তাহাকে এমন উত্যক্ত করিয়া তুলিল যে, আপাততঃ নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা করিতে তার মন কিছুতেই সম্মতি দিতে সাহস করিল না।

ইহার পরেই মায়ের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহার খাইবার ব্যস্ততা দেখিয়া শুভার মা নির্ম্মলাকে ডাকিতে গিয়াছে।

খাবারের পাত্র হাতে লইয়া নিজের ঘরের দ্বারমুখে প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মলা দেখিতে পাইল স্বামী চলিয়া গিয়াছে, আর তার জন্য রচিত আহারের স্থানটির পার্শ্বে চুপটি করিয়া মাটিতে হাত রাখিয়া তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বসিয়া আছে।

"পুঁটিকে নিয়ে গেল কেন?"

"শুভাকে বললুম, সে এসে নিয়ে গেল।"

"তোমারা সকলে মিলে তার নাকটাকে আর সারতে দিলে না দেখছি।" বলিয়াই নির্ম্মলা ঠাঁইটির উপর পাত্রটি রাখিয়া আবার বলিল—"সরপোষ দিয়ে ঢেকে রাখ মা আমি একবার শুভাকে দেখে আসি।"

(৪৯)

চিত্ত স্থির রাখিবার শত চেষ্টাতেও নির্ম্মলা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চোখে নিদ্রা আনিতে পারিল না। সে বুঝিয়াছে, তার বোকা শাশুড়ী পেটে কথা চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার খাবার লইয়া আসিবার পূর্ব্বে যেটুকু সময় পাইয়াছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই শাশুড়ী স্বামীকে ঝির কথা বলিয়া দিয়াছে, আর তাই শুনিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। আহার করিবারও অপেক্ষা করিতে পারে নাই।

স্বামীর উপর অভিমান করিবার শত কারণ থাকিলেও সে যে মুখের অন্ন ফেলিয়া চলিয়া গেল, এটা নির্ম্মলা সহ্য করিতে পারিল না। সমস্ত দিনের

ভিতরে সে মুখে কিছু তুলিতে পারিয়াছে কিনা তাহাও ত নির্ম্মলা বুঝিতে পারিল না। বাহিরে তাহাদের যেরূপ নিষ্ঠা, তাহাতে স্বামীর কিছু আহার না করাই সম্ভব। সুতরাং নির্ম্মলার মনোবেদনার সীমা রহিল না।

শাশুড়ীর বলায় ভাল কি মন্দ হইয়াছে, এ বিষয় ভাবিবারও নির্ম্মলা অবকাশ পায় নাই। সে যাহা ঘটিবার ঘটুক, সে শয্যায় শুইয়া চক্ষু মুদিয়া কেবল স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রতীক্ষা করিতেছিল নীরবে। তার শয্যা পর্য্যন্ত তার চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারে নাই। দেহ তার এত স্থির। দীপালোক পর্য্যন্ত তার মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারে নাই, চক্ষু তার মুদ্রিত। একটি দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত ঘরের বায়ুকে চঞ্চল করিতে তার নাসিকাপথ হইতে বাহির হয় নাই।

নির্ম্মলা ঘরে আজ সরিকে রাখিয়াছে। যাহাতে ইহাদের ভিতরে আর সন্দেহের কণামাত্র প্রবেশ করিবার সুবিধা না পায়। মায়ের জাগরণের কোন ও নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি একটা। দেউড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ যেন নির্ম্মলা শুনিতে পাইল।

"সরি—সরি—ও সরি।"

ধড় মড়িয়া সরি উঠিয়া বসিল।

"দেখ্ দেখি, বাবু বুঝি আসছেন।"

নির্ম্মলার কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা কবাট খোলার শব্দ শুনিতে পাইল।

আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। সরি দোর খুলিয়া বাহির হইয়া গেল

নির্ম্মলার ব্যাকুল প্রতীক্ষার মুখে সরি ব্রজেন্দ্রের এক চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল :—

"সারাদিনই একরূপ উপবাসী, তবু ক্ষুধার মুখে চলে এসেছি; তুমি আমার জন্ত খাবার প্রস্তুত করছিলে জেনেও। তুমি যে মর্ম্মাহত হবে এটা বুঝতেও আমার বাকী ছিল না। তবু আমাকে আসতে হ'ল, না এলে আমাকেও চারুর খুনের দায়ে পড়তে হবে ভেবে। কেননা অনেক আগে তার ফিরে না আসার খবর পুলিশকে আমার দেওয়া উচিত ছিল।

অবশ্য এটা আমার ঠিক কৈফিয়ৎ নয়। কিছু মুখে দিয়ে এলে একবারেই যে চলতো না একথা বলতে পারি না।

এ আমার কৈফিয়ৎ নয়। চারুর প্রতি মোহে রাখুঠাকুরের উপর রাগে তোমার কাছে—কাছে বলা ভুল—তোমার উদ্দেশে এমন দু' একটা অপরাধ ক'রেছি, যার কৈফিয়ৎ নাই। হয়ত তুমি তা জান না, আর না জানলেও জানবার জন্ত যে আগ্রহ দেখাবে না, এটা আমার বিশেষরূপই জানা আছে। সেই জন্ত অপরাধটা বড় কর্কশভাবেই আমার মনটাকে পীড়ন ক'রে উঠ্‌লো। তোমার সঙ্গে দেখা না করে চলে আসার সেও একটা কারণ।

যাক্, পুলিশ আসিয়াছে। আমিও আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়াছি। যদি চারুর চিঠিখানা দেখাইবার প্রয়োজন হইত দেখাইতাম। প্রয়োজন হয় নাই। পুলিশ চারুর ও রাখুর সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়াছে। পূর্ব্বের একখানা দলিল, চারুর একখানা বাড়া কেনার—তাহাতে চারু ও রাখুর সম্বন্ধ জানা গিয়েছে। তবে তাতে লেখা আছে স্বামী মৃত। তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। পুলিশ বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেছে, স্বামীকে দেখে সাময়িক উন্মত্ততায় সে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছে। জিনিষপত্র, টাকা, গহনা, সিন্ধুক, বাক্‌সের চাবি যেরূপ ভাবে সে ফেলে গেছে তাতে পাগল হয়ে তার ডুবে মরাই সম্ভব। এইবারে তার সম্পত্তি। কতকটা আগে হ'তেই আমার আয়ত্তে আছে। অবশিষ্ট নিয়ে একটু গোল বাধতে পারে। তার ভাই আছে। আইনে চারুর স্ত্রীধনে সেই অধিকারী। চারুর সেই মাসী বুড়ীর সঙ্গে, শুন্‌লুম সেও রথ দেখতে পুরী গেছে। সে ফিরে এলে, তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে যা হ'ক একটা ঠিক কর্‌ব। তবে এটা ঠিক জেনো, এ বাড়ী আর বাড়ীতে কাছে আমার যা আছে, সেটা রাখু ঠাকুরের পাওয়াই হয়ে গেছে। অধিক আর লিখলুম না। পুলিশ সমস্ত জিনিষের লিষ্ট করে চলে গেল। বাড়ী আগলাতে দু'জন পাহাড়াওয়ালা রেখে গেল। আমাকেও এ রাত্রিটা থাকতে হ'ল। একান্ত অনাহারী আছি মনে ক'রে চিন্তিত থেকোনা।

এইবারে লিখতে পারি

অনুতপ্ত তোমার ব্রজেন্দ্র।

পুঃ রাখু সম্বন্ধে তোমার যে আর একটা সঙ্কল্প, সেটার সম্বন্ধেও আমি চিন্তা কর্‌ছি। ইতি—

পড়িতে পড়িতে নির্ম্মলার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেটা লক্ষ্য করিয়া উঠিল—"খবর ভালত মা?"

ঠিক এই সময়ে শুভার মা দ্বারদেশে আসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—"বৌমা!" উত্তরে নির্ম্মলা বলিল—"ভিতরে এস মা।"

"ছেলে এলো বলে বোধ হ'লনা?" বলিয়া শুভার মা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

"না মা, আসতে পারবে না বলে চিঠি পাঠিয়েছে" বলিয়াই নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে আবার বলিল—"তোমাকে কোনও কথা বলা দায় দেখছি যে মা, কিছু পেটে রাখতে পার না।"

"আবার কি বলেছি গো।"

"আমার ননদের সম্বন্ধের কথা তোমার ছেলেকে শোনালে কে?"

"ছেলে কি রাগের কথা লিখেছে নাকি?"

"তা আর লিখলে কই? লিখলে ত ভালই হত।"

"তা হলে ব্রজেন্দ্রের মত আছে?"

"মতামত টাকা মা! তোমার ছেলে কি সে আবাগীর অতগুলো টাকা হাতছাড়া করবে!—যাও, শোওগে। দেখো যেন মেয়ের কাছে পেটের কথা বার ক'রে দিও না। শুনলে তার নাকের ফুলো বেড়ে যাবে।"

"ওই সরি বলেছে মা!"

কৃত্রিম ক্রোধে এইবারে সরি বলিয়া উঠিল—"নাও মা চিঠি মুড়ে শুয়ে পড়। সব সরি বলেছে, আর কেউ বলেনি, বলতে জানেও না।"

* * * *

পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রে বাহির হইল, সাতশত যাত্রীসমেত সেন্টলরেন্স জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।"

রাণাপ্রতাপ

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

যুগ যায়, যুগ যায়!
অনন্তের তরঙ্গ লীলায়
বুদ্বুদ সমান উঠে মুহুমুহু গেল টুটে কত
কত রাজ্য, রাজা লক্ষ শত ;
জয়রব অস্ত্র ঝনৎকার সহিল না কালের ফুৎকার,
নিভে গেল নিশান্তের ক্ষীণ তৈল মৃৎপ্রদীপ শিখা—
বিজয়ীর মিথ্যা অহমিকা ;
কোহিনুর হোল চুর,
ময়ূর আসন সহিল না কালের শাসন।

যায় যুগ, যুগ যায়!
নিয়ে যায় আবর্জ্জনা প্রায়
কালের সে শতমুখী পৃথিবীর প্রাঙ্গণ হইতে
মণি রত্নে বর্ম্মে ঢাকা সহস্র-সেবিত রাজ দেহ ;
হীরক খচিত রাজগেহ
তাসের প্রাসাদ সম কালের তুড়িতে উড়ে যায়।

মাত্র অবশেষ নাম,
বালকের কুতূহল, বিদ্বানের চর্চ্চার আরাম ;
আর কিছু নাই—
বন্দীরা না গাহে স্তুতি, বন্দিনীরা নতি নাহি করে,
রঙ্গিণীরা নৃত্যে নাহি ঘেরে সম্রাটেরে,
স্তব্ধ সব। শব্দহীন কালের সভায়
বিচার প্রার্থীর প্রায়
দলে দলে দাঁড়াইয়া মূককণ্ঠ মূর্ত্ত অত্যাচার,
জঘন্য লিপ্সার যত ক্ষুদ্র বিগ্রহের দল

কালের সে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি সম্মুখে
কম্পমান স্তব্ধ নতমুখে।

তার মাঝে হে সন্ন্যাসী বীর
তুমি উর্দ্ধশির,
মৃত্তিকা পিণ্ডের মাঝে স্যমন্তক সম দ্যুতিমান্
কাল সভাতল করিয়া রেখেছ সমুজ্জ্বল।

একদিন যারা
বন হ'তে বনান্তরে খেদাইয়া বার বার করি গৃহহারা,
রণবলে ধনবলে চূর্ণিবারে চেয়েছিল
দুর্নিবার শকতি তোমার,
রাজ সম্পদের পণে
কিনিতে চাহিয়াছিল হে দরিদ্র তোমার সম্মান,
কোথা আজ তাহাদের স্থান?

কোথা গেছে সে রাজসম্পৎ,
গজ অশ্ব পদাতিক স্বর্ণময় লক্ষ রণরথ?
কালের আবর্ত্ত মাঝে কোন্ দিন হারায়েছে পথ
বৈভবের তুচ্ছ ধূলিকণা,
স্মরণে আসে না।

শুধু রয়েছে জাগ্রৎ
আপন প্রভায় দীপ্ত দারিদ্র্যের সাধনা তোমার
সহস্র বিপ্লব অবহেলি।
নৃপতির শিরোভূষা চিরকাল ধরি
কাল চলে পদতলে দলি,
ইঙ্গিতে থামায়ে দেয় বিজয়ীর জয়ডঙ্কারব,
শুধু নিঃস্ব তাপসের চীর,
তাঁহার ত্যাগের মুক্তিবাণী—
বহি আনে সর্ব্বধ্বংসী যুগ হ'তে যুগান্তর মাঝে
মানব সমাজে।

একদিন কলঙ্কের ঘন মেঘস্তূপে
ভারতের ভাগ্যাকাশে আদি অন্ত ছিল আবরিয়া ;
তূর্ণ বিদারিয়া
সে আঁধারে জেগেছিলে তুমি বজ্রশিখা,—
আঁধার ভারত-ভালে বহ্নিশুচি শুভ্র ললাটিকা।

বিলাসীর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গি রুদ্র রবে,
বজ্রানলে দগধিয়া নৃপতির রূঢ় অহঙ্কার,
শক্তিরে বিদ্রূপে বিঁধি
সর্ব্বত্যাগী তাপস আত্মার
জেগেছিলে অম্লান প্রকাশ।

মদগর্ব্বে আত্মহারা ভোগে অন্ধ বিলাসীর আঁখি
তোমারে নিরখি
মুহূর্ত্তে ঝলসি গেল। চারিদিক হ'তে
গ্রাসিতে গর্জ্জিয়া এল রাজবল শতমুখ স্রোতে।
সে তরঙ্গাঘাতে অনধীর
জলধির দীপ স্তম্ভ সম ঊর্দ্ধশির
দাঁড়াইয়া ছিলে মহাবীর,
ফেণায়িত অন্ধকারে বিচ্ছুরিয়া দিগ্‌ দিগন্তরে
জ্যোতিঃ শিখা শুভ্র শুচিতম,—
অন্ধকারে লক্ষ্যহারা তরণীর দীপ্ত ধ্রুবতারা।

শুধু গিয়েছিল ভাসি
সে তরঙ্গস্রোতোবেগে সম্পদের শুষ্ক পর্ণরাশি—
তোমার প্রাসাদ, দাসদাসী।
তোমারে স্পর্শেনি কেহ হে সন্ন্যাসী, সর্ব্বকামনার
সকল বৈভব ভস্মে অঙ্গরাগ রচি আপনার
প্রলয় তাণ্ডব মাঝে ছিলে বিরাজিত
চিদানন্দ ধূর্জ্জটির মত।

চারি ধারে বিলাসের লালসার লীলা,
তার মাঝে মত্তি অবিচলা—

দেশ মাতৃকার পায়ে রাখি,
দুঃখ দৈন্য অনশন অত্যাচারে নিয়েছিলে ডাকি
নিত্যকার সহচররূপে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া যে লিখন গিয়াছিলে আঁকি
ভারতের ইতিহাসে, মুছিয়াছে সেকি
কালের করাল করলেপে?

সর্ব্বসুখ ভোগেন্ধনে যে যজ্ঞ অনল জ্বলিয়াছে
একদিন হিন্দুস্থানে,—এতদিনে সে কি নিভিয়াছে?
তোমার সে উদগ্র সাধনা
একি ব্যর্থ হ'য়ে গেছে—এ ভারতে হে প্রতাপ রাণা?

নহে, নহে, নহে,
ভারতের চিত্তদ্বারে ঝঞ্ঝাসম আজ দেয় হানা
জীবনের সাধনা তোমার,
তব যজ্ঞানল শিখা
জ্বলিয়া উঠেছে পুনঃ আহিমাদ্রি কুমারিকা
উদ্ভাসিয়া সারা হিন্দুস্থান।
ভারতের প্রাণে আজি বিস্তৃত তোমার অধিকার
জীবনের তপস্যার এই শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার।

কোটিপতি আজ—
হর্ম্ম্য ত্যজি নামি আসে চণ্ডালের কুটীরের মাঝে
ভিখারীর সাজে
লেশমাত্র নাহি মানে লাজ;
কুলবালা করে আলা কারার নিবিড় অন্ধকার;
বরপুত্র কমলার ভিক্ষাপাত্র করপুটে বহে,
হাসিমুখে অনশন সহে;
বালক ছুটিয়া আসি জননীর বাহুবন্ধ হ'তে
আঘাতের নীচে মাথা পাতে;

মায়ের পূজার অর্ঘ্য কুলী নিয়ে আসে আজি—
জীবনের মজুরীর পুঁজি ;
ক্ষুধিত সহাস্যমুখে বহি আনে তার অন্নগ্রাস—
এর মাঝে তোমারি প্রকাশ।
আজ হেরি তোমার সাধনা
ভারতের সর্ব্বজনে, কর্ম্মে জ্ঞানে মূর্ত্তিমান্‌, হে প্রতাপ রাণা।

ঘৃণাহতা

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

(শ্রীভক্তেন্দ্র নাথ রক্ষিত)

অরুণের কথা।

নদীর প্রবলটানে যখন ভাঙ্গন ধ'রে তখন তার ধারের জমীগুলো নিমেষের মধ্যেই অদৃশ্য হ'য়ে যায়। আমারও যৌবন জলতরঙ্গ যখন নীচের দিকে নাম্‌তে আরম্ভ ক'রেছিল তখন কোন বাঁধাই সে মানেনি। নিরুর সেই শেষ দিনের চাউনি, ঘাটের কোলে থম্‌কে দাঁড়ান জলের মত আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ যেমন ঘাটের কোলে থম্‌কে দাঁড়িয়েই—অনন্ত ঢেউয়ের সঙ্গে সমুদ্রের বুকে ঝাপিয়ে পড়বার জন্যে ছুটে যায়—তেমনি আমার এই পর-পদ-দলিত লাঞ্ছিত মন মুহূর্ত্তের জন্যে বিবেক ফিরে পেয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আবার পাপের সমুদ্রে ঝাপিয়ে প'ড়েছিল। * *

সন্ধ্যায় শ্যামলা বসুমতীর ললাটে ভানুর রক্তিম আভা যেমন বিশ্বমানবকে মুগ্ধ ক'রে তেমনি করে যেদিন বধূর বেশে শত কোলাহলের মধ্যে মলিনা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ; সেদিন মনে হ'য়েছিল সেই সতীরাণী নিরুকে। এমনি একরাত্রে উৎসবের মাঝে নিরুও আমায় আশ্রয় ক'রে দাঁড়িয়েছিল। শুভদৃষ্টির সময় নিরুর চোখ দেখে বেশ বুঝেছিলুম যে সে এতক্ষণ কাঁদ্‌ছিল। সেই যে তা'র কান্না আরম্ভ হ'লো, সারা জীবনে বুঝি সেই পরম বন্ধুটীকে রেহাই দিতে সে পারেনি। এমন দিন তা'র ছিলনা—যেদিন, আমার উপেক্ষা অনাদরে, সে চোখের জল্ ফেলেনি। বর্ষার অশ্রুমুখী আকাশের মত সারা

জীবনটা সে কেঁদেছে। বৌউদির অনুরোধে আর আমার রূপপিপাসার উত্তেজনায় মলিনাকে আমি বিয়ে করেছিলুম। এ বিয়েতে বাবা উপস্থিত ছিলেন না, তখন তিনি কাশীতে—দাদা গিয়েও তাঁকে আন্‌তে পারেননি।

মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত সেই অবগুণ্ঠিতার রূপ জ্যোতিঃ অনুকূল বাতাস লাগা আগুনের মত রূপের পিপাসা আমার জাগিয়ে দিলে। ফুলশয্যার রাত্রে সোহাগভরে যেমন তার হাতখানি ধরেছি, অমনি সর্পাহত পথিকের মত চম্‌কে সে খাট থেকে নেবে পড়্‌লো। আত্মবিস্মৃতা নারীর লজ্জার আবরণ খ'সে গেল—আঁধার ঘরে আলো জ্বালার মত মুখখানি তার জ্বলে উঠ্‌লো আমার নিমেষ হা'রা চোখের উপর তা'র আগুনের গোলার মত চোখ দুটী রেখে ব'ল্লে "আমার গায়ে হাত দিওনা, দেবার অধিকার তুমি রাখনি, মনে ক'রোনা শুধু দুটো মন্তর আউড়ে ষড়যন্ত্র ক'রে তোমরা আমার জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবে! এর পরও যদি তুমি আমার গায়ে হাত দাও—আমি পাড়া-শুদ্ধ লোক ডেকে কেলেঙ্কারী কর্ব্বো, বলে রাখছি"। এই কথা ব'লে সে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। আর আমি; চুপ ক'রে পঙ্গুর মত ব'সে একটা বালিকার চোখরাঙ্গানি সহ্য কল্লুম।

মলিনার কথা।

যেদিন আমার নারীজীবনের সব আশা পায়ে দ'লে এক নারীহন্তা, মদ্যপায়ী যুবকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল—সেদিন সত্যই আমার মর্ত্তে ইচ্ছা হ'য়েছিল। তবে নাকি লোকে ব'লে আমার কপালে অনেক সুখ আছে; তাই এ যাত্রায় রক্ষা হয়েছিল। ছেলেবেলাকার নভেল-পড়া মগজে এ বর আমার পছন্দ হয় নি। সমবয়স্কা মেয়েরা যে এসে সহানুভূতি দেখিয়ে বলবে—আমার স্বামী মাতাল—এ আমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বোনা। দিদির দেওর ব'লে তো' তা'কে চিন্তুমই আরো বেশী ক'রে চিন্তুম নিরুর বিষাদ-ক্লিষ্টা মুখের উপর দুটো উদাস ভরা চাউনির অর্থে। জেনে শুনে দিদি যে আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে—এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দিদির এই দেওরটীকে ছেলেবেলায় আমি বেশ একটু ভক্তি কর্ত্তুম, আর সেই ভক্তিটুকু একটু উঁচুতেই বুঝি উঠছিল। কিন্তু চোখের সামনে যখন নিরপরাধা বালিকাকে মেরে ফেলতে দেখলেম, তখন আমায় সবখানি হৃদয় জুড়ে একটা ঘৃণা জমাট বাঁধতে লাগলো। তারপর যখন শুনলুম ওই নারীহন্তা, মদ্যপায়ী

যুবকের খেয়ালের সঙ্গে আমার জীবনসূত্রটা বেঁধে দেওয়া হবে, তখন ঘৃণায় আমার সমস্ত বুকখানা যুদ্ধশেষে রণক্ষেত্রের মত বিশৃঙ্খল হ'য়েছিল। তারপর বিয়ের পর সকলের উপর উপেক্ষা ও অনাদর পূর্ণমাত্রায় দেখান সুরু হ'লো—দিদি শুদ্ধ কেউ বাদ গেল না। সেকালের কথা ছেড়ে দিলেও এখন অনেক এমন মেয়ে আছে যা'রা পিশাচ স্বামীকে ভালবাসে ভক্তি ক'রে। কিন্তু আমি এমন অস্বাভাবিক ভালবাসতে শিখিনি—তাই আমার সগর্ব্ব ব্যবহারে এঁদের সংসার দিব্বি ভাঙছিল আর আমিও ত তাই চাই। এ বাড়িতে যখন স্বত্ব ঠিক ক'রে ঢুকেছি তখন আমার ছিল ঘোমটাটানা ঘাড়হেঁট ক'রা লজ্জাবনত মুখী বধূর মধুর বেশ—আর যখন বেরুবো তখন রণচণ্ডীর মত চোখ রাঙ্গিয়েই বেরুব, এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। তোমাদের সনাতন নিয়ম হয়ত ব'লবে, নারীর ধর্ম্ম সহিষ্ণুতা। কিন্তু আমি বলবো শক্তিময়ী নারী অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে—শুধু প্রতিবাদ করেই সে ক্ষান্ত হয় না—প্রতিকার করে। ইতিহাস উল্টে দেখ তা'র পাতায় পাতায় নারীর শক্তির পরিচয় পা'বে। পুরুষে বলছে আমরা শক্তিহীনা। কেন তা'রা আমাদের কোন্ শক্তির অভাব দেখেছে? নারীর শক্তি ছাড়া সংসারে কোন্ কাজটা হয় তোমরা বলতো। বিশ্বাস ক'রোনা পুরুষের ওই ভিত্তিহীন মন্তব্যে। নিজেকে শক্তিময়ী ব'লে ভাব দেখি, বিদ্যুৎ বিকাশের মত শক্তি তুমি প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্ব্বে। পাশ্চাত্য নারীরাও নারী, তোমরাও নারী; তা'দের মধ্যে যদি শক্তির লীলা সম্ভব হয়, তোমাদের মধ্যে তা সম্ভব হবে না কেন? নিজের শক্তিকে ছোট ভেবেছ বলেই তো তোমরা শক্তিহীনা। নিজেকে বড় ভাব বড় হ'বে। অমন ক'রে ঘরের কোণে থেকে শক্তির অভাব মনে কর্লে শক্তিহীনা হ'বে না ত হবে কি?

অরুণের কথা।

মলিনা বড় বাড়িয়ে তুলেছে তা'র সগর্ব্ব ব্যবহারে চাকরেরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে—বৌউদি তো হবেনই। সেদিন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বৌউদি এসে বল্লেন—মলিনা তাঁকে আলাদা হ'তে বলেছে। আমি স্পষ্ট তাঁকে বল্লুম "বেশ তো—তা' হ'লে ঝগড়ার পালা বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে—আলাদাই হও না।" কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে বৌদি চ'লে গেলেন। আমার মনে হ'লো আর একদিনের রাত্রের কথা—সে দিনও বৌদি কাঁদ্‌তে

কাঁদ্‌তে বলেছিলেন "অরু! তো'র বৌ আমায় অপমান কল্লে।" সেদিন এই মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার মান কিসের বিনিময়ে রেখেছিলুম—নিরুর মুখের রক্তে মান রেখেছিলুম বৌদির—আর আজ তাঁর চ'খের জলে মান রাখলুম মলিনার! এই অন্যায় কথাটা বলতে মলিনাকে বারণ কর্ব্বো এ সুৎসাহসটুকু আজ আমার নেই। পাছে মলিনার পদ্মের মত চোখ দু'টি ফেটে জল প'ড়ে এই ভয়ে। হায় মোহ! সেই রূপহীনা নিরুর বিষাদক্লিষ্টা মুখখানার দিকে একবারও ফি'রে চাইনি। তাই আজ অতীতের সেই জীবন্ত স্মৃতি দুর্ভিক্ষপীড়িত শিশুর মত আমার হৃদয়ে আঘাত কর্চ্ছে। আজ শিমুল ফুলের তীব্র রংটার উপর নজর পড়েছে আমার; যতটা না নজর পড়েছে উপরের ঐ বিরাট কাল মেঘের দিকে। আস্তে আস্তে, আমার ভাবনার দড়ি ছিঁড়ে দিয়ে; সমুদ্রের মত গাঢ় নীল রংয়ের সাড়ী পরে—মেঘের মত ঘন-কৃষ্ণবর্ণের চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে—সাম্‌নে এসে দাঁড়াল মলিনা। এই কি স্নেহময়ী নারীর মূর্ত্তি? না—বিভীষিকাময় শ্মশানে রক্তলোলুপ শকুনির মূর্ত্তি। এ ফুল কি পদ্মের মত উপভোগ্য না কিংশুকের মত ঘৃণ্য? এ জল কি নদীর জলের মত সুমিষ্ট—না পয়ঃপ্রণালী নিঃসৃত জলের মত দুর্গন্ধ। কে বল্‌বে এ কি? মলিনা তা'র চির অভ্যস্ত মধুর হাসি ঠোঁটের কোলে এনে অপূর্ব্ব কৌশলে ঢেকে নিয়ে বল্লে "তোমার কি হ'য়েছে—মুখখানা শুক্‌নো কেন?" একটু হেসে আমি বল্লুম "কৈ-কিছু না" তা'র একমুঠো ফুলের মত হাতের উপর আমার হাতখানা রেখে বল্লে—"শোবে, এস অনেক রাত হ'য়ে গেছে।"

মলিনার কথা

দিদিকে আলাদা ক'রে দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে নিজের ঘরে "গিন্নি" হ'য়ে—দার্জ্জিলিং এ হাওয়া খেতে এসেছি। বেশ জায়গা এই দার্জ্জিলিং; মেঘের সঙ্গে এমন ঘরের ভেতর খেলা করা বেশ আমোদজনক। আমাদের পাশের বাড়ীতে বিমলেন্দু বাবুরা থাকেন, বেশ ভদ্রলোক তাঁরা। কেমন নির্ম্মল ব্যবহার তাঁদের। কিন্তু হিন্দু-সমাজের এমন দুর্ভাগ্য যে, এম, এ পাশ করেও পুরুষগুলোর মনের সঙ্কীর্ণতা যায় না। বিমলেন্দুর সঙ্গে আমায় বেড়াতে দেখলে—দিদির এই অশেষ গুণনিধি দেওরটী অগ্নিশর্ম্মা হ'তেন—আবার উৎকট "আর্য্যামির" বক্তৃতাও দেওয়া হ'ত। এ নিয়ে প্রায় আমার সঙ্গে ঝগড়া হ'ত।

সেদিন শরীরটা বুঝি খারাপ ছিল, বেড়াতে যাওয়া হয়নি—আব্দার হ'লো তুমিও যেয়ো না। কেন হে বাপু তোমার শরীর খারাপ, তাতে আমার কি! আমি যখন কিছুতেই তাঁর আব্দার রাখলুম না—তখন সঙ্গে দিলেন এক মরুভূমি দেশের দারোয়ান মহাদেও পাঁড়ে। বিমল, আমি আর তাঁর ছোট বোন ইভা তিন জনে বেড়াতে বেরুলুম। যেখানেই যাই, পাঁড়েটী তার লম্বা দাড়িটী নিয়ে ঠিক পেছনেই আছেন। বিমল বিরক্ত হ'য়ে তা'কে আস্তে একবার বারণ ক'ল্লে সঙ্গে সঙ্গে সে তা'র বাজখাঁই গলায় উত্তর যা দিলে—তা'র ভাবার্থ হচ্ছে যে—সে তা'র চাকর নয়, অতএব তাঁর আদেশ মান্তে বাধ্য নয়। আমি চোখ রাঙ্গিয়ে বারণ কল্লুম—সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—বাবুর হুকুম আছে আমায় সঙ্গে থাকতে। ইভা হেসে বল্লে, "পাছে এমন স্বর্গের পরীটাকে নিয়ে কেউ উধাও হয় এই ভয়ে—বুঝলে না মলিনা?" বিমল বল্লে "ছিঃ, লেখাপড়া শিখে মানুষ এমনও হয়।"

অরুণের কথা

দার্জ্জিলিংএ এসে মলিনার ব্যবহার বড় বিশ্রী লাগচে। বিমলেন্দুর সঙ্গ আমি ততটা পছন্দ করি না। মলিনা কিন্তু তাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বেশ কাটায়। কিছু বল্‌বার উপায় নেই—তা'হলেই অম্‌নি রসাতল। আমাদের সমাজে যখন স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই, তখন কেন অত মেশামিশি। হ'তে পারে এটা আমার সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়—এতটা রক্ষণশীল ছিলুম না আমি। আজ কাল এদের মেলা মেশাটা যেন কেমনতর ব'লে মনে হ'চ্ছে। সেদিন বিকেলে বিমলেন্দুর সঙ্গে বসে গল্প কচ্ছি—খবর পেয়ে ভেতর থেকে মলিনা বেরিয়ে এলো। বিমলকে নমস্কার ক'রেই বল্লে "চলুন বেড়িয়ে আসি।" তারপর আমার দিকে একটা লম্বা ফর্দ্দ ফেলে দিয়ে বল্লে "এ জিনিস ক'টা আনিয়ে রেখো—তুমি শুনে নিশ্চয় আনন্দিত হবে যে বিমলবাবুদের আজ নেমন্তন্ন করেছি।" আমায় আনন্দপ্রকাশ কর্‌বার সময় না দিয়েই, তারা বেড়াতে চলে গেল। হায় নারী! বন্ধুকে নেমন্তন্ন ক'রবার ক্ষমতা তোমার আছে—কিন্তু আমার নেই। আমায় উপেক্ষা ক'রে বন্ধুকে তুমি খাওয়াতে পার, কিন্তু তোমায় উপেক্ষা ক'রে আমি কা'কেও খাওয়াই নি। স্বামীর সুখদুঃখের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই নারী! আছে শুধু অর্থের সঙ্গে। তুমি তো জান না কতটা বেদনা আমার এই বুকখানায় জমে আছে। তুমি তো বোঝ না

তোমার বাক্যে, তোমার ব্যবহারে কেমন ক'রে তিল তিল ক'রে আমি মরণের পথে অগ্রসর হচ্ছি। যে প্রাণ ঢেলে সেবা কর্ত্তে জান্‌তো—যে চোখের জলের কারণ খুঁজতো—যে প্রাণ দিয়ে আমার বেদনা মোচন কর্ত্তে পার্‌তো—সে আজ নেই। সতীর দীর্ঘ নিশ্বাস আজ জ্বলন্ত আগুনের মত আমার এই দীর্ঘ পথে বাধা দিচ্ছে। আজ এই সুদূর প্রবাসে কা'কে আমার এ ব্যথা জানাব। কাকে আমার ব্যথার ব্যথী ক'রব! সে যে অনেক দূরে। আজ যে আমায় ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—ওগো তুমি যেখানে থাক এস, একবার ফিরে এস। ওগো একবার ফিরে এস!

মলিনার কথা

আজ আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আকাশের গায়ে তাসের প্রাসাদ বাতাসে ভেঙ্গে পড়েছে। আমার গর্ব্ব, আমার অহঙ্কার, আমার নারীত্ব সব বন্যার জলে ভাসা খড় কুটোর মত ভেসে গেছে। প্রভাত আলোকে ফুটে ওঠা সৌন্দর্য্যময়ী রক্তজবা কালবৈশাখীর ঝড়ে ছিঁড়ে পড়েছে। পূর্ণিমার শ্যামলা বসুমতীর বুকে লুটিয়ে পড়া চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর উপর রমণীর এলায়িত কুন্তলের মত বর্ষার মেঘ আধার ছড়িয়ে দিলে। বিমল! বিমল!! ঘুম ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গে আজ একি শুনালে? নারীর মাতৃত্ব ভুলে তার রূপযৌবনটা ও পিশাচত্বটা কেন বড় দেখলে? কেন ভুলে গেলে যে এই নারী তোমার মা—তোমার ভগিনী। আজ ভাই হয়ে বোনকে একি কথা শোনালে বিমল! বাংলার তরুণ-প্রাণ তোমরা—সমস্ত দেশটা যে তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছে।

আজ তার বুকে একি শক্তিশেল হান্‌লে ভাই! এই জন্যেই কি আমার দেবতা, বিমলের সঙ্গী ভালবাসতেন না। ওগো ত্রিকালদর্শী ঋষি আমায় ক্ষমা করো—ক্ষমা করো। জানি আমি ক্ষমার অতীত—তবু জানি তুমি আমায় ভালবাস। আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই স্বামী—আমায় ক্ষমা করো।

অরুণের কথা

আজ বুঝি দেবাসুরের যুদ্ধ শেষ হলো। আজ বুঝি স্বর্গ নরক এক হ'ল। তা নইলে সেই চিরগর্ব্বিতা মলিনা—তার একি পরিবর্ত্তন! বিমল! তুমি আমার বন্ধুর কাজ করেছ। দুটি বিভিন্ন পথগামী নদীর মিলন ঘটিয়ে স্রোতের

বেগ দ্বিগুণ করে দিয়েছে। আমাদের এতদিনের মনোমালিন্য সব তোমার এক খানি অবৈধ প্রেমপত্রে মুছে গেছে। তোমার চিঠিখানা হাতে নিয়েই যখন মলিনা ঘরে গিয়ে খিল দিলে, তখন জানতুম না এতে কি আছে, জানলে পড়তাম না। কিন্তু মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নয়। তুমি ঠিক লিখেছ "যে যাকে চায় সে তাকে পায় না কেন? চাতক জল চায়—পায়ও বটে কিন্তু অনেক দেরিতে। কিন্তু ভ্রমরের কি ভাগ্য! ফুলের গন্ধ তাকে যেচে ডেকে নিয়ে মধু খাওয়ায়। মলিনা! তুমি যদি পদ্ম হতে—আর আমি যদি ভ্রমর হতুম—" তা হয় না বিমল, বিধির এ বাঁধা-ধরা নিয়মের ব্যতিক্রম তো হবে না। বিমল! মলিনাও পদ্ম হবে না—তুমিও ভ্রমর হবে না—শুধু নিজের বিষে সারা জীবনটা জ্বলবে। জেনেশুনে কেন এমন বিষ আকণ্ঠ পান কল্লে বিমল। না, তোমারই বা দোষ কি, আমিও একদিন রূপের মোহে অনেক কীর্ত্তিই ক'রেছি। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা। মাথাটা একটু ঠিক ক'রে নিয়ে মলিনার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম—একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেতর থেকে এসে শেলের মত আমার বুকে বিঁধলো। আমি দরজা খুলে দিতে বল্লুম—কিন্তু তার কোন উত্তর এল না, সমস্ত নিস্তব্ধ—যেমন প্রবল ঝড়ের পরে সমস্ত পৃথিবী নিঝুম হয়ে যায়, সেই রকম নিস্তব্ধতা ঘরের মধ্যে বিরাজ কচ্ছিল। এত নিস্তব্ধ যে তাতে নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছিল। তারপরে হঠাৎ সে দরজা খুলে এসে আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে "আমায় ক্ষমা ক'রো, আর কখন তোমার অপমান করব না।" এই সেই মলিনা যা'র গর্ব্বে—একদিন মাটীতে পা পড়তো না, এ সেই মলিনা। না এ আর সহ্য হয় না, তুমি যেথানে থাক নিরু, আমায় ক্ষমা ক'রো। মলিনার এ দীনহীন বেশ আমি দেখতে পারি না। স্বর্গ থেকে আমায় ক্ষমা ক'রো দেবী!

* * *

দিন কতক পরে একদিন দুপুরে মলিনার ঘরে গিয়ে দেখি মলিনা ঘুমুচ্ছে—সামনে তার খোলা একখানা চিঠি। চিঠিখানা বৌদি কলকাতা থেকে লিখছেন—মলিনাকে।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণম্।

২০শে বৈশাখ
বুধবার।

স্নেহের বোন মলিনা,

তোর গত ১৮ই তারিখের চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়েছি। আমার

কাছে তুই ক্ষমা চেয়েছিস্—কিন্তু বাস্তবিক দোষ করেছি আমি। নিরু আমার ভালবাসতো ঠিক, বড় বোনের মত—কিন্তু তবু আমি তাকে দেখতে পার্ত্তুম না—কেন জানিস্? আমার ইচ্ছা ছিল তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে দেব—কিন্তু যখন তা হল না—আমার সাধের স্বপ্ন যখন ভেঙ্গে দিলে একটা গরীবের কুৎসিতা মেয়ে, তখন আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মাল—আর তারই জন্য একটি নিরপরাধা বালিকাকে বলি দিলুম। শেষ আমারই জেদ বজায় রেখে ঠাকুরপোর সঙ্গে তোর বিয়ে দিলুম। কিন্তু যখন তোরা আমায় আলাদা করে দিলে তখন আমার বুকখানা যে কি রকম ক'রে উঠেছিল তা বলে আজ আর তোমাদের এই মিলনের দিনে কষ্ট দেবনা বোন। তুই লিখেছিস্ "আবার আমরা তোমার কোলে ফিরে যেতে চাই; ছেলে বেলার মত আমাদের দুজনকে কি কোলে নেবে না দিদি!" তোদের যে কোন দিন ভুলতে পারিনি দিদি। বড় ভালবাস্তুম—পাছে তোদের অমঙ্গল হয় এই ভয়ে চোখের জলও অতি কষ্টে একবিন্দুও যে ফেলিনি বোন। তোরা ফিরে আয় দিদি। আমরা নিঃসন্তান—তোরা দুজন যে আমাদের ছেলে মেয়ের মত বোন।

তোর ভাসুরও বলেছেন তোরা ফিরে আয়। ঠাকুরপোকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলিস্ যে "তোরা ফিরে এলে, আমরা বড় সুখী হব।" আজ আর বেশী লিখতে পাচ্ছি না আশীর্ব্বাদ করি তোদের এ শুভ মিলন চিরস্থায়ী হোক্। পূজার সময় বাড়ী আস্তে ভুলিস্ না।

ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা তোর

"দিদি"

চিঠিখানা প'ড়ে মলিনার মুখের দিকে তাকালুম—ঘুমের ঘোরে সে একটু হেসে উঠলো—জননীর মুখে চুম্বনরত শিশুর মত।

সমাপ্ত।

কবি

[শ্রীসত্যকুমার মজুমদার]

(১)

নিদাঘ সায়াহ্নে গ্রাম্য তরুণীরা যখন ছোট ছোট কলসী কক্ষে দলে দলে নদীর ধারে যাইয়া গল্প জুড়িয়া দিত, সরোজ তখন তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে যাইয়া তাহার অর্দ্ধ মলিন জামাটা গায়ে দিত—ছোট একখানা কাঠের চিরুণী দিয়া কোঁকড়ান চুলগুলি বেশ পাট করিয়া লইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া পড়িত। সন্ধ্যা বেলায় বেড়ানটা ছিল তার মস্ত একটা বাতিক। ঠিক ঐ সময়টায় তার মাথায় কি এক খেয়াল চাপিয়া যাইত, সরোজ জোর করিয়াও তাহা দমন করিতে পারিত না।

সরোজের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোনরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। চিরদিন সরোজদের অবস্থা এমন মন্দ ছিল না, একদিন তাদের অন্নেও অনেক দরিদ্র প্রতিপালিত হইত, কিন্তু সেদিন আর তাহাদের নাই। সরোজ আজ অন্তের দ্বারে অন্নের কাঙ্গাল। ছোট বেলা হইতেই শিক্ষার দিকে সরোজের বড় ঝোঁক্। গ্রামে বড় স্কুল না থাকায় দরিদ্র তারাপদ চট্টোপাধ্যায় পুত্রকে রামনগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া নিকটস্থ কোন স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ছাত্র হিসাবে সরোজ মন্দ ছিল না। বাল্যকালে সে সুখের ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াছে। তখন সে ভাল ভাল জামা কাপড় পরিয়া পাড়ায় আর দশ জনের সঙ্গে বুক ফুলাইয়া চলিত। কিন্তু এখন সে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র,—একটি মাত্র জামা তাও অর্দ্ধছিন্ন,—অন্তের পরিত্যক্ত একজোড়া ছেঁড়া চটী পায়ে দিয়া সে স্কুলে যাইত। এত যে তার অভাব অভিযোগ,—তাতেও সে নিজেকে কখনও দরিদ্র বলিয়া মনে করিত না। এমনি করিয়াই তার পাঠ্য জীবনটা সে অভাবের সঙ্গে লড়িয়া অবাধে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

সরোজ মনে করিত, সে কবি। সমপাঠী মহলে সে কবি বলিয়াই পরিচিত ছিল। তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সে ছোট ছোট কবিতা লেখা অভ্যাস করে। গল্প লিখিবার ঝোঁক্ ও তার কম ছিল না। কিন্তু তাহাতে সে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে অনেক দিনের কথা—যখন তার

বয়স মাত্র দশ এগার বৎসর সে কাশীদাসের মহাভারত অবলম্বন করিয়া এক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নাম দিয়াছিল 'রাজসূয় যজ্ঞ'। তা ময় দানবের সভাবর্ণনাতেই তার অনেক কাগজ খরচ হইয়া গেল। ওদিকে সে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন ভাগ পড়িতেই দেখিতে পাইল "রাজসূয় যজ্ঞ" মতি রায় কৃত মূল্য দেড় টাকা। বিরক্ত হইয়া সরোজ নাটক লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

তিন চারিখানা খাতা গাঁথিয়া সরোজ অনেক কবিতা লিখিল। গ্রন্থের নাম দিল "মুকুল"। ইহার কয়দিন পরে একখানা মাসিক পড়িতে 'মুকুল' নামে একখানা নব প্রকাশিত কবিতা বইয়ের সমালোচনা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। সরোজ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবে না—রাগ করিয়া কাব্যের নাম রাখিল 'অঙ্কুর'।সরোজের কবিতা রাশি ছাত্র মহলে নিতান্ত অনাদৃত হয় নাই। কিন্তু একদল ছাত্র সম্মুখে প্রশংসা করিলেও অন্তরালে তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। অন্তের নিন্দা উপেক্ষায় মন দিবার স্বভাব সরোজের ছিলনা। আপন প্রাণের ছন্দে আপনি বিভোর হইয়া সে লিখিত। অন্তের ভাল না লাগিলেও তাহা ত তার নিজের প্রাণের সত্যকার একটা অভিব্যক্তি।

সরোজের কবিতাগুলির আদর ছিল একজনের কাছে। তার নাম রমা। যে বাড়ীতে সরোজ থাকিত তারি পাশেই রমাদের বাড়ী। সরোজের প্রত্যেকটী কবিতা রমার বড় ভাল লাগিত। সরোজ কবিতা লিখিয়া তার একখানা কপি সকলের আগেই রমাকেই উপহার দিত। রমাকে না দেখান পর্য্যন্ত সে কোন কবিতাই অন্ত কারো কাছে বাহির করিত না।

সে দিন সরোজ সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইতে বাহির হইয়া অভ্যাস মত ঘাটের এ ধার সে ধার ঘুরিতেছিল। ঘাটে সৌন্দর্য্যের হাট রমা—তাহার ছোট বোনের হাত ধরিয়া কলসী কক্ষে উপরে উঠিতে ছিল সম্মুখেই সরোজকে দেখিতে পাইয়া ঈষদ্ হর্ষ পুলকে একবার মাত্র তাহার দিকে তাকাইয়া লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না।

রমা সরোজকে কি বলিতে যাইতেছিল, পেছন হইতে সুধামুখী বলিয়া উঠিল "কিরে রমা ভাবটা যেন ভাল লাগছে না, মরিস্‌নি ত?'

কথার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রমা মরমে মরিয়া গেল, রাগে ক্ষোভে তার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ঘাটের উপরে উঠিয়া সুধামুখী আবার বলিল, "ছোড়াটার মাঝে এমন কি দেখতে পেলি রমা। আমার মনে হয়

নিতান্ত পাগল। আমাদের হারু বল্‌ছিল ও হিজিবিজি কি সব লেখে। কবি নয় কপি।"

রমার বড় রাগ হইল, বলিল, "তুমি কি দেখলে সুধাদিদি যে আমায় যা ইচ্ছা তাই বলছ। মানুষের সঙ্গের কথা কইলেই দোষ।"

সুধা হটিবার পাত্রী নয়। সে অমনি বলিয়া উঠিল "কথা কইলে দোষ হবে কেন রমা! তবে ঐ চাওয়া চাওইটার ভিতর যেন কেমন একটু গোলমেলে দেখলুম তাই। তা রাগ করিস্‌নে ভাই, গরীবের ছেলে কিনা আর একটু পাগলা ছাটের।"

রমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "গরীবও মানুষ। তা সে গরীব হোক্ পাগল হোক্ তার সঙ্গে আমায় জড়াচ্ছ কেন সুধাদিদি! তোমার পায়ে পড়ি মেয়ে মানুষের ও যে বড় লজ্জার কথা—তার চেয়ে মরণও যে ভাল তুমি আমার মিথ্যে দুর্নাম রটিও না।"

সুধামুখী হাসিয়া বলিল, "সে ভয় তোর নেই রমা, হাজার হলে ও আমি মেয়ে মানুষত!"

(২)

সরোজ ঘরে বসিয়া একটা প্রশ্নের অঙ্ক লইয়া বড়ই গোলমালে পড়িয়া গিয়াছিল, রমা কখন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারে নাই। অনেক ক্ষণ রমা নিকটে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সরোজ এতই নিবিষ্ট যে পাশ ফিরিয়াও চাহিল না। অগত্যা রমা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে গেল। এবার সরোজ রমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "কে; রমা যে!"

রমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি মনে করেছিলুম আপনি ঘুমিয়ে স্বপ্নে অঙ্ক ক'সে যাচ্ছিলেন।"

সরোজ বক্র হাস্যে রমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এ অঙ্কটা নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি কিছুতেই হয়ে উঠ্‌ছে না।"

রমা মধুর অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বলিল, "ও কবির কাজ নয় সরোজ বাবু। ঐ খানেই ত গোল, অঙ্ক কস্‌তেই মাথা গুলিয়ে যায় ওত আর সঙ্গীতের মত তরল নয় যে সাঁঝের বেলায় নদীর ধারে ধারে ঘাটের পাশে পাশে বেড়ালেই বেরিয়ে পড়বে!

সরোজ সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ও কথা বলছ কেন রমা?"

রমা উত্তর করিল, "তা পরে বলছি, অঙ্কটা আগে ক'সে নিন! পাটি-গণিতের অঙ্ক বুঝি! বলুন ত বাঙ্গলায় প্রশ্নটা বুঝিয়ে!"

সরোজ রমাকে প্রশ্নের বাঙ্গলা অর্থ বুঝাইয়া দিল। রমা শ্লেটখানা টানিয়া আবার প্রশ্নটা শুনিয়া লইল তার পর দাঁড়াইয়াই অঙ্কটা কসিয়া ফেলিল। বিস্মিত পুলকে সরোজ বলিল, "তোমার মাথাত বেশ পরিষ্কার রমা, আমার মনে হ'ত তুমি আমারি মত শুধু কাব্যই বোঝ, এখন দেখছি গণিতেও তোমার বেশ অধিকার!"

রমা শ্লেটখানা সরোজের হাতে দিয়া বলিল, "সুখ্যাতি আর কর্‌তে হবে না। তা যাক্ যা বলতে এসেছি শুন্থন, আপনি রোজ নদীর ধারে বেড়াতে যান কেন?"

সভয়ে সরোজ বলিল, "সে কথাকি তোমায়ও বুঝিয়ে দিত হবে রমা?"

রমা অন্তদিকে চাহিয়া বলিল, "বুঝিয়ে না দিলে কি ক'রে বুঝব!"

সরোজ কণ্ঠস্বরকে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে গম্ভীর করিয়া বলিল, "সূর্য্য যখন ডুবে যায়—চাঁদ যখন উঁকি মারে, পল্লীবালার কলসী ভরা সোহাগের জল যখন—বক্ষ লু'টে—"

রমা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর বলতে হবেনা সরোজ বাবু! তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস্ করছি,—কবিতার জন্ম রূপে না সৌন্দর্য্যে, প্রাণে না দেহে?"

সরোজ স্তব্ধবিস্ময়ে রমার মুখপানে তাকাইয়া রহিল এই পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারী অর্দ্ধশিক্ষিতা পল্লীবালা এত কথা শিখিল কোথায়? এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াত সরোজের ক্ষমতায় কুলাইবে না। শ্রদ্ধায় তার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া উঠিল এমনি একটি সঙ্গীকে যদি সে চির জীবনের সহচরী করিয়া লইতে পারিত।

রমা আবার বলিল, "অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন কেন? কথার উত্তর দিন! কাব্যের দোহাই দিয়ে নিজের কু প্রবৃত্তিটা ঢেকে ফে লবার চেষ্টা সব যায়গায় খাট্‌বে কেন?"

সরোজ উত্তর করিল না। রমা বলিতে লাগিল, "লেখা পড়া শিখ্‌তে পরের বাড়ী এসেছেন, ও সব কেন? কাব্য শিখ্‌তে হয় ঘরে বসে ভাবুন আর লিখুন। কবি—হৃদয়ে কাব্য ফুটিয়ে তোল্‌বার অনেক জিনিব ভগবান প্রকৃতির বুকে ঢেলে দিয়েছেন। মেয়ে মানুষের দিকে আড়ে আড়ে চাইলেই কাব্য ফুটে উঠে না!"

সরোজ এবার মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি ও সব বুঝবে না রমা।"

রমা বাধা দিয়া বলিল, "আমি ও সব বুঝতে চাইনে সরোজবাবু! তবে আপনাকে নিষেধ ক'রে দিচ্ছি আর ও ধারে বেড়াতে যাবেন না। এটা আমার আদেশ বলেই জানবেন!"

সরোজের ভিতরটা তখন যেন কেমন ওলটপালট হইয়া যাইতেছিল। মুখটাও একটু গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল; সরোজ বলিয়া ফেলিল, "তুমি আমায় নিষেধ বা আদেশ করবার কে রমা?" "আদেশ করবার: কে!" রমা ঢোক্ গিলিয়া বলিল, "কেউ নই। আমার ভুল হয়েছিল সরোজবাবু, আমায় মাপ্ করবেন।"

রমা চলিয়া যাইতেছিল, সরোজ ডাকিল, "যেওনা রমা, আমি তোমার আদেশই মানলুম, তোমার নিষেধ বা আদেশ উপেক্ষা করবার ক্ষমতা যেন আমার নেই বলে মনে হচ্চে। কাল তুমি আমার জন্ত বড়ই অপ্রস্তুত হয়েছিলে রমা! তুমি আমার কাছে বিশেষ দরকার ছাড়া আর এস না।"

সরোজ মাসিক-পত্রিকা পড়িতে পারিত না। মাসিক হাতে করিলেই বা তার দুই এক পাতা উল্টাইলেই তাহার মনে হইত সেও উহার লেখক হইবে। সরোজ দেখিত প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে কত সুরে কত পাখী গান ধরিয়াছে—সে ওদেরি মত কুঞ্জে বসিয়া গাহিতে চায়; কিন্তু পারে না। গাহিতে গেলেই একঘেয়ে একটা করুণ সুর তার সমস্ত গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সরোজ কখনও দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করিয়া লিখে—

ও বড় নিঠুর হাসি—
ছিঁড়ে যায় ওতে হৃদিবীণা তার,
ভেঙ্গে যায় বাঁশী বাজেনাকো আর,
অতি গোপনীয় মরমের তলে—
ঢালে বেদনার রাশি।
ও বড় নিঠুর হাসি!

এমনি করিয়া সরোজ তার কাব্য প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিতে যাইয়া নিজের অক্ষমতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িত। কয়দিন পরে সরোজ তাহার প্রতিবাসী—নরেশ চাটুর্য্যের এক পত্র পাইল। নরেশ লিখিয়াছে—

ভাই সরোজ!

বাবা আমার বিবাহ দিতেছেন। চারিদিক হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে!

রামনগরের ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কাল তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিলেন। তুমি হয়ত সে মেয়েকে দেখিয়াছ—দেখ্‌তে কেমন—তার সম্বন্ধে যতটা জান জানাইতে ত্রুটি করিও না, তার নামটাও লিখিও। খামে উত্তর দিও। ইতি।

তোমাদের নরেশ।

সরোজ বার বার পত্র খানা পড়িল, তারপর সেখানা তুলিয়া রাখিয়া অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া ভাবিল। নরেশের পত্রের একটা জবাবত দিতে হইবে। কিন্তু কি সে লিখিবে—তার সমস্ত লেখনী তখন কবিতাময় হইয়া উঠিয়াছে—সরোজ লিখিতে বসে—কবিতা হইয়া পড়ে,—। তবুও সরোজ লিখিল।—নরেশ দা,

তোমার পত্র পাইয়াছি। যার কথা তুমি লিখিয়াছ সে আমার বিশেষ পরিচিত। আমি প্রথম যখন এখানে আসি তখন সে বালিকা—আমার কাছে মাঝে মাঝে পড়া দেখিয়া নিত। এখন সে বড় হইয়াছে। আমি সুন্দর কুৎসিৎ বড় চিনিনা—তাই সে সুন্দরী কি না তোমাকে লিখিতে পারিলাম না। লোকে তাকে সুন্দরীই বলে। আমারও সুন্দরী বলেই মনে হইয়াছিল। লেখাপড়া বেশ জানে। তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলে বেশ হয়। তার নাম রমা ইতি—

তোমাদের

সরোজ।

বৈশাখের রৌদ্রপীড়িত প্রকৃতি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সরোজ আপন শয্যায় শুইয়া একখানা বাঙ্গলা নভেল পড়িতেছিল। রমা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'সরোজবাবু,"

সরোজ বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল "কি মনে ক'রে রমা?"

রমা দরজার দিকে মুখ রাখিয়া বলিল, "কাল আমায় নিতে আস্‌বে।"

সরোজ জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঃ পরশু তোমার বিয়ে বুঝি! বিয়ে তা হলে সেখানেই হবে। তা নরেশ দা ত সে সম্বন্ধে আমায় কিছু লিখেনি।"

বাহিরে একজন ডাকপিয়ন ডাকিল, "সরোজবাবু, একখানা পত্র"। সরোজ বাহিরে আসিয়া পত্র হাতে লইল। গৃহে প্রবেশ করিলে রমা জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে এল?"

সরোজ ঈষদ্ হাস্যে বলিল, "নরেশ দা তার বে'তে যোগ দিতে নেমন্তন্ন

করেছে। তা পরীক্ষার বছর স্কুল ফেলে ত আমি যেতে পারব না! একি রমা তোমার চোক দুটী ছল ছল ক'রে উঠ্‌ছে কেন?"

রমা সে কথার উত্তর না দিয়া পদ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে বলিল, "কাল আমি চ'লে যাচ্ছি—আমার বিয়ে—তাই।"

"তাই কি রমা? বলেই অমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছ কেন? এ বিয়েতে তুমি সুখী নও? নরেশ দা পাত্র ভাল। বেশ চেহারা, উদার অন্তঃকরণ,—সে তোমাকে সুখী কর্‌তে পার্‌বে।"

"তাই আপনার কাছে বিদায় নিতে এলুম"।

"আমার কাছে বিদায় কেন রমা?" তারপর সরোজ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, "ও সব কিছু নয় রমা, দুদিন পরে দেখবে সেটা বাস্তব জগৎ, কল্পনার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তা আমার কাছে বিদায় চাচ্ছ কেন?"

"বিদায় চাচ্ছি কেন?" রমা আর বলিতে পারিল না। ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সরোজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাও রমা, আমি হাসি মুখে তোমায় সংসারে প্রবেশ কর্‌তে অনুমতি দিচ্ছি। মনের কোণে গোপন পাপ পোষণ ক'রনা। তা হলে সংসারে সুখী হ'তে পার্‌বে না। এ সব ছেলে বেলার স্বপ্ন। আশীর্ব্বাদ করি রমা, পতিসোহাগিনী হয়ে কোন দাগ যদি তোমার মনে বসে থাকে, তা যেন মুছে যায়; নরেশ দাকে স্বামী পেয়ে তুমি যেন সুখী হও। তুমি লেখাপড়া শিখেছ—সীতা সাবিত্রীর চরিত্র আদর্শ করে সংসার সুখের ক'রে তোল।

বলিতে বলিতে সরোজ অন্যদিকে চাহিল। রমা সরোজের পায়ে মাথা নোয়াইয়া ধীরে ধীরে নতমুখে বাহির হইয়া আসিল। সরোজ ডাকিয়া বলিল, "নরেশ দাকে ব'ল রমা ছুটী নেই ব'লে যেতে পার্‌লুম না।"

৩

উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছাটা বরাবরই সরোজের ছিল। তাই সে নিজের দারিদ্র্য উপেক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিঁড়িটা পার হইবার পর অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া একেবারে কলিকাতা চলিয়া আসিল। তার দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল। তার সেই আত্মীয়টী

সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন—সরোজের খরচ বহাটা তার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তাই একদিন তিনি সরোজকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "জানত সরোজ, আমার সামান্য মাইনা, তুমি, এক'টা টিউসনি দেখ।"

আত্মীয়ের কথায় সরোজ চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। একেত সে এই বিশাল সহরের মধ্যে আসিয়া নিজের অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে তার উপর কোথায় সে কি করিয়া টিউসনির খোঁজ করিবে। অবস্থার সঙ্গে অনেকদিন লড়াই করা চলে না; ক্রমশঃ সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। এত দিনে তার কাব্যরস একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। কিন্তু কোন কোন দিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া সে প্রাণের মাঝে গানের সুর শুনিতে পাইত। তাহাও ক্ষণিক, নিবিড় কৃষ্ণমেঘে চপলার ক্ষণিক হাসিটীর মত। ষ্ট্র্যাণ্ডরোডের দীপ-মালা গঙ্গার জলে প্রতিফলিত হইয়া যখন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, সরোজ মনে মনে কল্পনা করে, আজ একটা কবিতা লিখিবে। কিন্তু বাসায় ফিরিবার পথে সে ভাবরাশি শূন্যে মিলাইয়া যায়। যে দুই চারিটী রূপসীর পলকের দর্শনের নিমিত্ত সে রামনগরের নদীতীরে ঘুরিয়া বেড়াইত আজ শত শত সুন্দরীর রূপচ্ছটা তাহার কবিতার রুদ্ধ অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে না। সরোজ আপাততঃ কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিল।

কয়দিন পরেশনাথের বাগানে বেড়াইতে যাইয়া সরোজ বুঝিয়াছিল—এটা বেশ বেড়াবার যায়গা। তাই প্রতিদিন সে সেইখানেই বেড়াইতে যাইত। কত লোক মন্দির দেখিতে আসে, কত ইংরেজ, পার্শি, ইহুদী—হিন্দুস্থানী—মাদ্রাজী—কতদেশীয় লোক। সরোজ দেখিত, সবচেয়ে দরিদ্র এই বাঙ্গালীর জাত। জীর্ণ-শীর্ণ, দুর্ব্বলদেহ—স্থূল হইলেও শক্তিহীন। কয় মাস রাস্তায় বেড়াইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে এই বাঙ্গালার সহরে নিজস্ব বলিয়া দাবী করিবার বাঙ্গালীর বড় বেশী কিছু নাই। বাঙ্গালী যেন প্রবাসী। সরোজ তখন মানসচক্ষে দেখিতে পাইত—বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া পীড়িত পল্লী—পেটে অন্ন নাই, রোগে ঔষধ নাই—প্রাণে উৎসাহ নাই, দেহে সামর্থ্য নাই। আছে কেবল পরদাসত্ব—পরস্পর হিংসা আর জীবনভরা আলস্য। ঐ যে পাশ্চাত্য-জাতিরা মোটর হাকাইয়া রাস্তায় চলে বাঙ্গালী ভয়ে ভয়ে দশ হাত দূর দিয়া সরিয়া যায়। সরোজ দেশ হইতে শুনিয়াছিল সেখানে সাদায় কালায় মেশা-মেশি—কিন্তু তার নিকট সেটা এতই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল যে সে কল্পনা করিয়াও এত পার্থক্য অনুভব করে নাই।

একদিন পরেশনাথের বাগানে তিনজন সাহেব মেম বেড়াইতে আসিয়াছিল। সরোজ দেখিল, মন্দিরের একটি চাকর স্বহস্তে তাহাদের চর্ম্ম-পাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া এক প্রকার কাপড়ের জুতা পরাইয়া দিল। মন্দির দেখিয়া নীচে নামিলে আবার জুতা পরাইয়া দিয়া সেলাম করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি দুই আনি বক্‌শিস করিল। সরোজের তখন মনে হইল, হায়রে দেশের অধঃপতন! সামান্য কয়টা পয়সার লোভে এতটা নীচ কাজ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিল না। তাহার প্রাণের তার অমনি অগ্নসুরে বাজিয়া উঠিল—এই অধঃপতিত ছোট লোকদিগকে জাগাইতে হইবে ইহাদিগকে নিজের আত্মসম্মান বুঝাইয়া দিতে হইবে নহিলে দেশের মঙ্গল নাই। সে যখন কবি বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে তখন এমন গান সে গাহিবে যে দেশের লোক সে ছন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে। কবির সেই সুরটি অমনি কাণে বাজিয়া উঠিল। "আমরা ঘুচাব মা তোর দুঃখ, মানুষ আমরা নহি, মেষ"! চলিতে চলিতে সরোজের মন তখন দারুণ উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারতের গৌরবময় অতীত ইতিহাস তার প্রাণকে নব জাগরণের সাড়ায় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, সরোজ গুণ গুণ করিয়া গাহিল—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।"

সরোজ বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গেল, জন্মভূমির আকুল আহ্বান সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল দেশবাসীর কাতর আর্ত্তনাদ তাহাকে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিল চারিধারে একটা বিরাট অন্ধকার—একটা প্রাণহীন নির্জ্জীবতা সমস্ত বাঙ্গলার বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সরোজ এর বিরুদ্ধে মাথাখাড়া করিয়া দাঁড়াইবে।

বাসায় ফিরিলে সরোজের আত্মীয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে সরোজ টিউসানি পেলে?'

এক কালে সরোজের সমস্ত সংকল্প জল হইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে সরোজ বলিল, "আজ পর্য্যন্ত কোন খোঁজইত পেলুম না! কাল থেকে একবার প্রাণপণ চেষ্টায় খুঁজে দেখব!"

সমস্ত রাত্রি সরোজের নিদ্রা হইল না। একদিকে নিপীড়িত অশিক্ষিত দুঃস্থ সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা অন্যদিকে দারিদ্র্যের ভৈরব গর্জ্জন। সরোজ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল এ দরিদ্র দেশের কিছু হবে না। এই অর্থ সমস্তার যুগে জাতির দারিদ্র্যই তাহাকে খঞ্জ করিয়া রাখিয়াছে। ধীরে ধীরে সরোজের হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল।

কলেজ শেষে সরোজ বাসায় ফিরিতেছিল, নিরাশার বিপুল আঁধার একে একে তাহার সমস্ত আলোক :নিভাইয়া দিতেছিল, সরোজ দেখিতেছিল দৈন্য তার ভৈরব বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সে যে দিকে চায় সেই দিকেই শুধু অভাবের প্রেতমূর্ত্তি।

একখানি প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সরোজ দেখিল বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা "গৃহশিক্ষক আবশ্যক বেতন যোগ্যতা অনুসারে। বাঙ্গলা ভাষায় যিনি সুপণ্ডিত কাব্যে যার অধিকার আছে, তিনিই শুধু দরখাস্ত করিবেন।" সরোজের সারা হৃদয় পুলকস্পন্দনে কাঁপিয়া উঠিল এত দিনে তাহার কাতর প্রার্থনা ভগবানের সিংহাসন তলে পৌছিয়াছে। সরোজ গৃহ কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "দরকার ত বটে, তা আপনি পারবেন কেন, আপনি ও দেখছি কলেজের ছাত্র, বয়স ও খুব বেশী নয় একটী মেয়েকে পড়াতে হবে থার্ড ক্লাসে পড়ে তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের আমি বড় পক্ষপাতী তাই বাঙ্গলা ভাষাটাই ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। মেয়েরও একটু বয়স হয়েচে তা আপনাদের মত ছেলে ছোক্‌রা দিয়ে পড়ান চলে না।"

সরোজের মুখ মলিন হইয়া গেল, ম্লান মুখে সরোজ বলিল, এতে আমার বল্‌বার আর কি থাকতে পারে! সন্দেহের কোন কারণ না থাকলেও তা আপনি মানতে চাইবেন কেন? তবে আমি বড় গরীব, পেলে আমার পড়াটা চলত, বাধ্য হয়ে আমার পড়া ছেড়ে দিতে হচ্ছে!"

সরোজ নমস্কার করিয়া ফিরিতেছিল, গৃহ কর্ত্তা বলিলেন, "দাঁড়ান, আচ্ছা আপনি ভাল কবিতা লিখতে পারেন? লিখুন ত যা আপনার খুসী দুই চারি লাইন। সরোজ কলম লইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই একটা ছোট কবিতা লিখিয়া ফেলিল। কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইয়া চাকরকে বলিলেন, "নীহারকে পাঠিয়ে দেত, তার এক মাষ্টার এসেছে!" তার পর সরোজকে একেএকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—এই ত চাই দুঃখের সঙ্গে না লড়লে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কেন?

(৪)

সরোজ তাহার ছাত্রীটাকে লইয়া প্রথম প্রথম বড়ই বিপদে পড়িয়া গেল। একে বড় লোকের আদরিণী কন্যা তাহাতে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে পড়িয়া একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন। পারা গাঁয়ের ছেলে সরোজের কাছে এটা কেমন যেন

অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। তার পর নীহার নিতান্ত বালিকা নয়। নীহার তার মাষ্টারটাকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে না দেখিলেও কখনও অশ্রদ্ধা করিত না। সে যখন তার মাষ্টারটীর সম্যক পরিচয় পাইল, তখন প্রায়ই সে তাহার নিজের খাবারের পয়সা গুলি তাহার মাষ্টারের পকেটে ফেলিয়া দিয়া বলিত "মাষ্টার মশায় আজ একটু বেশী পরিশ্রম কর্‌লেন জল খাবেন।"

সরোজ দান গ্রহণে নিতান্ত অনভ্যস্ত না হইলেও ইদানীং পরের দান গ্রহণটা সে হেয় কাজ বলিয়া মনে করিত। তাই নীহারের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া সঙ্কুচিতচিত্তে পয়সা লইয়া আপনাকে ঋণী মনে করিত। একদিন সরোজের বড় সন্দেহ হইল, পয়সা গ্রহণের কালে সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "নীহার, মাঝে মাঝে তুমি আমায় খাবারের পয়সা দাও—কোথায় পাও তুমি।"

নীহার মৃদু হাস্যে উত্তর করিল, তা দিয়ে আপনার দরকার কি মাষ্টার মশাই?"

সরোজ জেদ করিয়া বলিল,

"তা না বল্‌লে আমি নেব না নীহার!"

নীহার বিপদে পড়িয়া বলিল, "বাবা রোজ রোজ আমায় চার আনা করে জল খাবার দেন, খাওয়ার দরকার আমার বড় হয় না।"

সরোজ বিস্ফারিত চক্ষে নীহারের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার খাবারের পয়সা না খেয়ে আমায় দাও কেন?"

নীহার তাহার সকরুণ বিশাল চক্ষু আয়ত করি৷ বলিল, "আপনি গরীব, পয়সা কোথায় পাবেন? পড়াতে আপনার বড্ড পরিশ্রম হয়।"

অপমানে সরোজের সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল—কাতর স্বরে বলিল, "গরীব ব'লে দাও নীহার! আমি গরীব বটে ভিক্ষুক নই যে তোমার ভিক্ষা নেব। গরীবের একটা আত্ম সম্মান আছে—তোমরা কি তাদের এতই ছোট এতই অপদার্থ মনে কর।"

নীহার অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তা কেন মাষ্টার মশাই ভিক্ষা হবে কেন? আপনিত চান্ না।"

সরোজের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তীব্র অপমান বুকে চাপিয়া সরোজ বলিল, "চেয়েই হ'ক আর না চেয়েই হ'ক দান নেওয়া মানুষের কাজ নয় নীহার! মানুষ নিজের ক্ষমতায় খে'টে খাবে, পরের দ্বারে ভিখারী হবে

কেন? পরের অন্নে আমি অনেক দিন প্রতি পালিত হয়েচি, তা'তে কত নীচতা তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, আর না।"

সরোজ ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া আসিতেছিল, নীহার মাষ্টার মহাশয়ের হাত ধরিয়া ফিরাইয়া বলিল, "মিছে কথা করেছি মাষ্টার মশাই, গরীব বলে দিইনি, কেন যেন দিতে ইচ্ছে হয় তাই দিই।"

নীহার নিজের পড়া নিজেই করিয়া লইত। সরোজ কেবল ঘণ্টা দুই সাক্ষ গোপালের মত বসিয়া থাকিয়া চলিয়া আসিত। তবে সরোজের পরিশ্রম হইত সেই দিন যে দিন নীহার কাব্য শিখিবার জন্য খাতা লইয়া বসিয়া যাইত। সরোজ নীহারকে শিক্ষা দিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি কবিতার বই পড়িতে উপদেশ দিত।

নূতন নূতন ছন্দের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সরোজ বলিল, "ওসব কেন নীহার, ক্লাসের পড়া কর। এত অল্প বয়সে কবিতার দিকে অতটা ঝোক্ দিলে লেখা পড়া বড় কিছু হবে না।"

নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল, "শ্রান্ত হয়েছেন মাষ্টারমশাই তাই বলুন না। ক্লাসের পড়ার জন্য আমার মাষ্টারের দরকার নেই। বলুন দেখি ক'দিন আমায় ক্লাসের পড়া বলে দিয়েছেন। কাব্য শিখাবার জন্যই আমার মাষ্টার রাখা।"

সরোজ আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বলিল, "কাব্যত শিখান যায়না নীহার কাব্যটা ভিতরকার জিনিষ-প্রাণের সঙ্গীত।"

বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে নীহার তাহার মাষ্টারের দিকে চাহিয়া রহিল! সরোজ বলিতে লাগিল, "বিস্মিত হয়োনা নীহার এটা সত্যি কথা। কাব্যশক্তি ঈশ্বরদত্ত। অনুশীলন দ্বারা মানুষ তা বাড়াতে পারে মাত্র। তবে সে শক্তি অল্প বিস্তর সবার ভিতরেই আছে। যার তা প্রকাশ কর্‌বার ক্ষমতা আছে সেই কবি।"

নীহার জিজ্ঞাসুর স্বরে বলিল, "কি ক'রে প্রাণের কথা কলমে বের হয়ে পড়ে মাষ্টার মশাই?"

সরোজ উত্তর করিল, "তা জেনে কাজ নেই নীহার! কবির জীবন বড় দুঃখের। তবে কবি আপনার সুখে আপনি বিভোর। বিশ্বের সমস্ত দ্বার কবির কাছে মুক্ত—কবিতাই সাধারণের চেয়ে সতন্ত্র। সারাবিশ্বটা কবির সংসার—বিশ্বের পরিবার তার আপন ব'লে, তার এত দুঃখ। কেন, আর এক দিন তোমায় বুঝিয়ে দিব।"

সরোজ তাহার কবিতার খাতা নীহারকে পড়িতে দিয়াছিল। পড়িয়া

নীহার বলিল, আপনার কবিতা গুলি, কেমন যেন একঘেয়ে—যেন কত বিষাদ-ইংরেজীতে যাকে melancholia বলে।"

সরোজ নীরব রহিল, নীহার বলিতে লাগিল, "এত দুঃখকি আপনার মাষ্টার মশাই যে কবিতাকে এমন দুঃখময় করে তুলেছেন। সে যাক্ এ সবত দেখ্ছি আপনার ছোটবেলাকার লেখা—এখন লিখ্‌ছেন না কেন?"

সরোজ উত্তর করিল, "কি লিখব নীহার! কলমে লেখা ফোটে না। আমি কবিও নই! তারপর কাব্য নিয়ে থাকার এ যুগ নয়। কাব্যে ভাব ফুটিয়ে তুললে দেশের দুর্গতি ঘুচবে না। এটা কর্ম্মযুগ। এ যুগে যে জাতির মধ্যে কর্ম্মীর সংখ্যা যত বেশী হবে সে জাতির ততই মঙ্গল। দেখছ না পাশ্চাত্য জাতির দিকে চেয়ে কত বড় তারা! তারা কর্ম্মী তাই ভাবুক ভারতবাসীর উপর প্রভুত্ব করছে। তারা কাব্যের চেয়ে বিজ্ঞানের আমল দিয়েছে উপরে—তাই তারা প্রভু, আমরা ভৃত্য। এই ভাবের ঘোরে কল্পনার আশ্রয় করে আমরা সব খোয়াতে বসেছি। বাঙ্গলার চারিধারে হাহাকার জরা ব্যাধি অকাল মৃত্যু কত কি! কাব্য নিয়ে থাকলে আর চলে কি! আগে দেশের অভাব দূর করতে হবে দেশকে বাঁচাতে হবে।"

নীহার অবিশ্বাসের সুরে বলিল, "কি সব বকে যাচ্ছেন মাষ্টার মশাই, কোথায় রোগ শোক হাহাকার, কবি কিনা!

সরোজ বলিল, "এ কাব্যের শব্দযোজনা নয় নীহার, অতি বড় সত্য কথা। চিরদিন সহরে আছ—মারহাট্টা ডিচের ওধারেও বোধ হয় যাও নি, আমি বলছি বাঙ্গলার পল্লীর কথা। পল্লী দিন দিন জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মে ঐশ্বর্য্যের ছায়ায় বেড়ে উঠেছ, তুমি দেশের কথা কি বুঝবে?"

এই অনভিজ্ঞতাটা নীহারের কাছে প্রকাণ্ড একটা দোষ বলিয়া মনে হইল। দেশের দুর্দ্দশার কথায় তাহার কোমল নারীহৃদয়ে বড় ব্যথা অনুভব করিল। করুণ-কণ্ঠে নীহার বলিল, "সত্যি মাষ্টার মশায় এত দুঃখ এদেশের!"

সরোজের স্বর ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হইতেছিল। সরোজ বলিতে লাগিল, "তাই বলছিলুম নীহার কবি হওয়ার অনেক দুঃখ। এবার কবিকে কল্পনা ছেড়ে কাজ দেখতে হবে। হাঁ, কবিরও যে মোটে দরকার নেই তা নয়—এমন কবি হ'তে হবে যে কবির গানে দেশ মেতে উঠে, এমন কবিতা লিখতে হবে যার প্রতি ঝঙ্কারে মানুষ সৃষ্টি হয়, নির্জ্জীব বাঙ্গালী আবার সজীব হয়ে উঠে। তেমন

গান গাইতে হবে যে গান চাঁদ কবি দিল্লীর রাজসভায় গান করেছিলেন। চারণ কবিদের মত চারণ সাজতে হবে তেমন চারণ—ইতিহাস পড়েছ যারা গান গেয়ে বাপ্পা কুলতিলক হামীরকে চিতোরোদ্ধারে সহায়তা করেছিল—যাদের গানে উন্মত্ত হয়ে রাজপুতবালা প্রিয়তম স্বামীপুত্রকে দেশের মঙ্গলে মৃত্যুমুখে তুলে দিত নিজেরাও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পেত না। যদি পারি তেমন কবি হব নইলে আর কবিতা লিখব না। শুধু প্রেমের গানে দেশের দুর্ব্বলতা বাড়ছে বই কম্‌ছে না নীহার!"

সরোজের কথায় নীহার বহুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাহার ছোট্ট মাষ্টারটী যাহাকে সে নিতান্ত গরীব ১৫৲ টাকা বেতনভোগী বড় বেশী কিছু মনে করিতে পারিত না, আজ যেন কেন তার মাথাটা আপনা হইতেই তারি পায়ে নত হইয়া আসিল। নীহার বুঝিল—এই অপদার্থ গরীব বেচারী একটা প্রকৃত মনুষ! প্রীতিতে তার সারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কেন যেন আজ মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে দাঁড়াইতে তার ভারী লজ্জা হইতে লাগিল, দুইবৎসর সে ইহার কাছে পড়িতেছে এমন ভাবটী সে কোনদিন উপলব্ধি করে নাই। নতমুখে নীহার বলিল, "আমরা এতে আর কি করব মাষ্টার মশাই দেশের কাজ ত পুরুষেরাই করবে!"

সরোজ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"তোমরা কি করবে! পড়নি নীহার—

"সুকেশিনী শিরঃ শোভা কেশেরচ্ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে যদি তাহে হয় উপকার!"

এ ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের সাহায্য করবে! নইলে হবে না। নারী পুরুষের শক্তি, সেই শক্তির সহায়ে তারা শক্তিমান্ হয়ে উঠবে, তাদের উৎসাহে পুরুষের ক্লান্ত দেহে আবার নূতন উৎসাহ জেগে উঠবে।"

নীহার এক অপূর্ব্ব মধুর হাস্তে বলিল, "যান—আপনিও যেমন! কবি কিনা কেবল কথায় কথায় কাব্য।"

অমন মধুর হাস্ত নীহারের মুখে সরোজ আর কখনো দেখে নাই! আজ বহু দিন পরে তাহার রমার কথা মনে হইল। সেও একদিন এমনি মধুর হাস্তে তার একটী কথার প্রতিবাদ করিয়াছিল।

সরোজকে নীরব দেখিয়া নীহার বলিল, "যান মাষ্টার মশাই অনেক রাত হ'য়ে গেল, এই নিন আজ জল খাবেন। আপনাকে দান করছিনা এতটা বক্তৃতা করলেন এটা তারি মুজুরী।"

সরোজের হাতে শিকিটা তুলিয়া দিয়া হাসি লুকাইয়া নীহার দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

(৫)

সহরের বাতাসে সরোজের পারা গেঁয়ে ভাব ছুটিয়া গিয়াছিল। প্রতিবারেই গ্রামে আসিয়া সে একটা বিশেষত্ব অনুভব করিত। সব চেয়ে পার্থক্য তার কাছে ঠেকিত যে দেশের ভদ্রলোকের সাধারণকে মানুষ বলিয়াই মনে করে না। গোড়ামীটা তার কাছে বড়ই বিসদৃশ বড়ই অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। সরোজ এতদিন দেশের কথা চিন্তা করিয়া যতটা বুঝিয়াছে, তাহাতে কেবলি তাহার মনে হইত—যতদিন দেশের আপামর সাধারণ একযোগে কাজ করিতে না শিখে তত দিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারা কোন কাজই হইবে না। তাই সরোজ সেবার গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী যাইয়া আবদুল্লা পুরের মুসলমান পারায় এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছে। সভাভঙ্গে উক্তগ্রামের ছলিম মোল্লা বলিল, 'দেখুন বাবু, আমরা মোছলমান চাষা লোক লেখাপড়া শিখে কি করব।' উত্তরে সরোজ বলিয়াছিল "মোল্লা সাহেব কৃষকের কি আর লেখাপড়া শেখার কিছু নেই! বিলাতে চাষারাও লেখা পড়া জানে। কৃষিবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে—সে বিদ্যা শিখলে জমীতে একমনের স্থলে দুই মন ফসল জন্মাবার উপায় জানা যায়। আমাদের দেশের চাষারা একবৎসর বৃষ্টি না হ'লে চোখে আঁধার দেখে ইউরোপে তারা কত কি উপায়ে বৃষ্টির কাজ সেরে নেয়। লেখাপড়া না জানলে সে বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না। আপনাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিতে হবে তাতে স্কুল বস্‌বে। দিনে ছেলেরা পড়বে, রাত্রে সকলেই পড়বে। মুষ্টি চাল তুলে শিক্ষকের মাইনে চালাতে হবে।" আবদুল্লাপুরের মুসলমানগণ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল। ছুটীতে ছুটীতে বাড়ী আসিয়া সরোজ স্কুল পরিদর্শন করিত। এইরূপে সে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বা পল্লীতে ও অল্পবিস্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল অল্পদিনের মধ্যেই সরোজ বিশেষ প্রতিপত্তি শালী হইয়া উঠিল।

একদিন নরেশ সরোজকে বলিল, "কি হে সরোজ! এ সব হচ্ছে কি ছোট লোকদিগকে এমন ক'রে মাতিয়ে তুললে, ভদ্রলোকের সম্মান থাকবে ত?"

সরোজ আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিল, "তুমি এ কথা বলছ নরেশ দা! যে তুমি

রমার স্বামী! সে কি তোমায় এই শিক্ষা দিয়েছে! নরেশ দা একবার দেশটার দিকে চেয়ে দেখ ত,—কি দুর্দশা দেশের।—লেখাপড়া শিখে তোমার এই জ্ঞান হলো? কি তোমার আভিজাত্য যে তুমি তার এত গৌরব করছ? সাধারণ যদি না জাগে একবার সহরে যেয়ে দেখ কত ছোট তোমরা অন্যের কাছে।"

নরেশ মাথা হেট করিয়া চলিয়া গেল। পূজার ছুটী ফুরাইয়া আসিতেছিল নীহার পত্র দিয়াছে।—"মাষ্টার মহাশয় শীঘ্র আসুন। আপনার উপযুক্ত কাজ জুটিয়াছে। সহরের এ কোয়াটারে বড় কলেরা লাগিয়াছে। এবার কাজের কাজ করিবার বড় সুযোগ একদল স্বেচ্ছাসেবক কাজে লাগিয়াছে। বাবা একা আমায় রোগী সেবায় যেতে দেন না।" সরোজ যাইতেছি বলিয়া উত্তর লিখিয়া তাড়াতাড়ি কাজ গুছাইতে লাগিল।

সরোজ কলিকাতা পৌছিয়া দেখিল নীহারের মায়ের কলেরা—সরোজ দিবারাত্রি রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সারিয়া উঠিয়া তিনি সরোজকে আপন সন্তানের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সরোজ স্বেচ্ছাসেবকদলে নাম রেজেষ্টারী করিয়াছিল। তার কয় দিন পরে নীহারের নিজের কলেরা হইল, সরোজ আহার নিদ্রা ভুলিয়া রোগিণীর কাছে বসিয়া থাকিত। নীহার কখনো ক্ষীণ স্বরে বলিত, মাষ্টার মশাই আমি মরব না, আপনি শরীরের উপর অত্যাচার করে এমন না খেয়ে দেয়ে বসে থাকবেন না। শুধু আমার কাছে বসে থাকেন কেন? আরও যে পাড়ায় কত রোগী।—"

কর্ত্তব্য ত্রুটির ভয়ে সরোজ অন্যান্য রোগী সেবায় ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিও না। নীহার বাঁচিয়া উঠিল—তার মাষ্টার মহাশয়ের জন্য অমূল্য একটা পুরস্কার লইয়া।

একদিন সরোজ নীহারদের বাড়ীর দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া জন-সমাগম দেখিতেছিল। কতকগুলি পশ্চিমদেশীয় মুজুর দল বাঁধিয়া রাস্তার একধারে কি একটা কাজ লইয়া গোলমাল করিতেছিল। এমন সময়ে একজন সাহেব মোটর হাঁকাইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেই এক ব্যক্তি চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। সাহেব মোটর থামাইয়া চাবুক হস্তে সেই ব্যক্তিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে বেচারী প্রাণের ভয়ে দলের মধ্যে লুকাইল। এ অবিচার সরোজের সহ্য হইল না। একে ত মোটর চালক সাবধানসূচক বংশীধ্বনী করে;

নাই—তার উপর চাবুক মারিতে যায়! সরোজ জামার হাতা গুটাইয়া নীচে নামিতেছিল।

নীহার হাত ধরিয়া ফিরাইয়া বলিল "কোথায় যাচ্ছেন মাষ্টার মশাই!"

সরোজ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল "ছেড়ে দাও—নীহার, বেটার চাবুক মারা দেখিয়ে দি। লোকটা চাপাও পড়ছিল ওর দোষে আবার চাবুক খাবে।"

নীহার সরোজকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, "অত মাথা গরম কর্‌লে কাজ হবে না মাষ্টার মশাই। সব সইতে হবে। ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দার! ফল হবে শ্রীঘর বাস!"

সরোজ হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "শ্রীঘরের ভয় করিনে নীহার!"

নীহার আরও জোরে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমিত করি। আর মিছিমিছি কে জেলে যায়! এসব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা একা কর্‌লে কি হবে! দেশের লোক ঘুমুচ্ছে তাদের জাগান। মার খান আরও পিঠ পেতে দিন। ভগবানের পিঠে এমার একদিন যেয়ে লাগবেই। অত্যাচার কর্‌বেন ত মরণ!"

সরোজ অবাক্ বিস্ময়ে নীহারের দিকে চাহিল—নীহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গ্রীষ্মের ছুটীতে সরোজ এক নূতন মানুষ হইয়া বাড়ী গেল। সরোজের ইচ্ছা আর পড়িবে না, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। কাজেও সরোজ তাহাই করিল—কলেজ খোলার পরেও কলিকাতায় গেল না, গ্রামে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল।

রমা যখন শুনিল সরোজ আর পড়িবে না তখন সে একদিন দুপুর বেলায় সরোজদের বাড়ী আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—বিবাহের পর দীর্ঘ দিন পরে রমার সঙ্গে সরোজের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

সরোজ রমাকে দেখিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল, "রমা" নাকি—না নাম ধরে ডাকৃলে আর পোষায় না—এখন ছেলের মা হয়েছ—তা বৌদি বলেই ডাকৃব। এতকাল পরে হঠাৎ এভাবে কেন রমা!"

রমা মুখের ঘোম্‌টা সরাইয়া ফেলিয়া বলিল, "পড়াটা ছেড়ে দেবার মানে কি? এইত ফোর্থ-ইয়ার!"

সরোজ পাশের ঘরে চৌকিতে রমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "প'ড়ে আর কি হবে—এসব ছাই—পড়ায় বিদ্যা বড় কিছু হয় না। তারপর আমি মনে করেছি এখন থেকে দেশের কাজে লাগ্‌ব।"

রমা চৌকিতে বসিয়া বলিল, "দেশের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া সকলের সাজে না। যাদের খাওয়া পরায় ভাবনা নেই তারাই ও সব করুক্। বাড়ীর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখলে ভাল হয় যে কি ক'রে সংসার চল্‌ছে।"

"ও সব ভাবতে গেলে আর চলে না রমা! সংসারের ভাবনা ভেবে' কেউ কোনদিন কোন কাজ কর্‌তে পারেনি। জান রমা—একবার যার গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে আসে ক্ষুদ্র একটা পরিবারের ভাবনা আর তাকে বিচলিত কর্‌তে পারে না। শঙ্করাচার্য্য শ্রীচৈতন্য এরা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য নিজের আত্মীয় স্বজনের দিকে তাকাননি। আমরা তাঁদের পায়ের ধুলার যোগ্যও নই তাই অত সাহস করি না। আমার ছোট পরিবার একভাবে চল্‌বেই।"

"বে' থা কর্‌তে হবে না?"

"সে সাধ অনেক দিন, যেদিন তোমাকে"—সরোজ কি বলিতে যাইয়া থামিয়া গেল। পরে বলিল, "বিয়ে আমি করব না। ওটা একটা প্রতিবন্ধক। শত সহস্র যুবকের আত্ম-বলি নইলে দেশের মঙ্গল নেই রমা।"

রমা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "দেশের কাজ কর্‌তে কেউ কাকে নিষেধ কর্‌তে আসেনি। আমি বল্‌ছি পরীক্ষা আপনাকে দিতেই হবে।"

সরোজের হাসি পাইল। আজও রমা তার কাছে তেমনি দাবী রাখে। হাসিয়া সরোজ বলিল, "আজও যে তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে নিব তা কি ক'রে জান্‌লে রমা? আদেশটা এখন নরেশ দাকে কর্‌লেই ভাল হয় রমা! কিন্তু বড় দুঃখ হচ্ছে যে দেশের কান্না তুমি শোননি!"

রমা সরোজের কথার কোন জবাব না দিয়া চলিয়া আসিল। ইহার দুই দিন পরে সরোজ কলিকাতা রওনা হইল।

এবার নীহার বলিল, "এত দেরী যে মাষ্টার মশাই চিঠির পর চিঠি লিখেও জবাব পেলুম না। আপনার দেরী দেখে বাবা আপনার আশা পর্য্যন্ত একজন নূতন মাষ্টার রাখ্‌তে চাইলেন। আমি স্বীকার কর্‌লুম না।"

সরোজ ম্লান মুখে বলিল, "বেশ তাই রাখ। আমি আর কতদিন পড়াব। ইচ্ছা ছিল আর পড়ব না। তা পড়তেই হবে। বিয়ে পাশ না কর্‌লে ত

৩০৲ টাকার সাধের কেরাণী গিরি জুটবে না! তাই সংসারে যে আমার বড় আপন বলে মনে মনে গর্ব্ব করে সে বি, এ টা পাশ করতে আদেশ দিয়েছে।"

নীহার মৃদু হাস্যে বলিল, "কে এত বড় আপন মাষ্টার মশাই! আমি ত বলিনি।" নীহার অলক্ষ্যে জিভ কাটিল, পরে আবার বলিল, "ঠিক কথা, পড়া ছাড়বেন কেন! আর আমি মাষ্টার ছেড়ে দিব কেন! চাকরী করতে চান বাবাকে বলে একটা জুটিয়ে দিব, অনেক সাহেবের সঙ্গে বাবার আলাপ! আর একটা মজার কথা মাষ্টার মশাই, আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল!"

সরোজ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে নীহারের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "বেশত নিমন্ত্রণ খাওয়া যেত। "মিষ্টান্ন মিতরেজনাঃ।"

নীহার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা আর হচ্ছে না। এবারকার খাওয়াটা বুঝি থেকে যায় মাষ্টার মশায়! ওকি চমকে উঠলেন যে! আমি বে করতে অস্বীকার করেছি!"

সরোজের মনে একটা সংশয়ের ছায়া পড়িল, সে ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি নীহার!" নীহারের মৃদু-হাস্য অধরে মিলাইয়া গেল। গম্ভীর হইয়া নীহার বলিল, "কেন মাষ্টার মশাই আপনি না বলেছেন বে করলে দেশের কাজ করা চলে না। তাই আপনিও বে' করবেন না।"

সরোজ উত্তর করিল, "আমার বিষয়ে যা খাটে, তোমার বিষয়ে তা খাটে না নীহার—আমি পুরুষ, তুমি স্ত্রীলোক—আমি দরিদ্রের সন্তান, তুমি ধনীর কন্যা। হিন্দুর ঘরে চিরকুমারের অভাব নেই, চিরকুমারী বড় দেখা যায় না। তুমি বে কর নীহার—অবস্থাপন্ন সৎপাত্র দেখে। স্বামীর অর্থ দেশের কাজে ব্যয় করতে তাকে উদ্বোধিত ক'রো। প্রাণ আর অর্থ থাকলে বড় বড় কাজ করা যায় নীহার। দরিদ্রের চেষ্টায় কোন কাজ হয় না। হিন্দু—ব্রাহ্মণের মেয়ে তুমি বাপ মায়ের অবাধ্য হয়ে হিন্দুর আদর্শকে কলঙ্কিত ক'র না।"

নীহার অধর দংশন করিয়া বলিল, "অবাধ্য মেয়ে আমি নই মাষ্টারমশাই! শিক্ষিতা বয়স্থা হিন্দুবালার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করবার অধিকার হিন্দু-শাস্ত্রকার-গণ লোপ করেন্ নি। ইংরেজী নভেল পড়ে আমার মাথা গরম হ'য়ে যায় নি। আমি ভালমন্দ বুঝবার আগে বাপ মা যদি আমায় যার তার হাতে তুলে দিতেন মন্দ হলেও তা আমি মানতে বাধ্য হতুম। যাক মেয়ে মানুষের ধর্ম্ম মেয়েরাই ভাল বোঝে এ সম্বন্ধে আপনার উপদেশ আমি চাইনে!

(৬)

পরীক্ষার পর সরোজ বাড়ী আসিল।—বঙ্গ ভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের ধুমটা তখন পুরা দমে চলিতেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনকারিগণের সঙ্গে মৌলিক সূত্রে তাহার মিল না থাকায় সে কাজে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। নরেশ এবার সুযোগ পাইয়া বলিল, "কি হে সরোজ এত ধুম ধামেও তুমি যে চুপ!"

সরোজ উত্তর করিল; "পাছে পাছে আস্‌ছি নরেশ দা! তবে তোমরা যে পথটা ধরেছ সে পথে আমি যেতে চাইনে। দেশের বারো আনা লোককে ফেলে রেখে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার্‌বে না।"

তারপর সরোজ তাহার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান ভাইদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে সভা সমিতি করিতে লাগিল। এদিকে সরকার একে এক আন্দোলনকারী নেতাদিগকে কাহাকেও জেলে, কাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে, কাহাকে দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া দিতে লাগিল। হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালী একেবারে দমিয়া গেল। আন্দোলন থামিয়া গেল সরোজ একভাবেই কাজ চালাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে বেশী দিন এ ভাবেও কাজ করিতে হইল না। আবদুল্লাপুরের এক সভায় দুইজন দেশীয় ইনস্‌পেক্টর সরোজকে গ্রেপ্তার করিল। সভাস্থ মুসলমানগণ বাধা দিতে যাইতেছিল সরোজের নিষেধে ক্ষান্ত হইল। হাজতে যাওয়ার পূর্ব্বে সরোজ বলিয়া গেল, "আইন অমান্য ক'রে কোন কাজ আমি করিনি তোমরা কোর্টে যাও! ইচ্ছা না হয় যেওনা। যার ইচ্ছা আমার মত কাজ ক'রে জেলে এস! এর প্রয়োজন আছে। পেটের জ্বালায় এক বেলা খেয়ে দিন কাটানোর চেয়ে দুবেলা পেট ভর্ত্তি ক'রে মোটা হ'তে পার্‌বে।"

আবদুল্লাপুরের সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া মোকদ্দমা রুজু করিল। সাত দিন হাজত খাটার পর বিচার হইল। উত্তেজনা পূর্ণ সঙ্গীত রচনা ও গ্রামে গ্রামে তাঁহা গান করিয়া সাধারণকে মাতাইয়া তোলার অভিযোগে রায় হইল তিন মাসের জেল।

জেলে যাইয়া সরোজ নীহারকে এক পত্র লিখিল,—

নীহার!

এত দিনে আমি আংশিকও কবি হইতে পারিয়াছি। আমার গানে

দেশ না হউক দুই চারি খানা গ্রাম ও মাতিয়াছে। কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা বা উৎপীড়ন বা কোন আইন ভঙ্গ করিয়া আমি জেলে আসি নাই। তোমার অনুরোধ আমি অক্ষয়ে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছি। আলীপুরের জেলে আছি বেশ। যে কাজে হাত দিয়াছি জেল তাহাতে অনেকবার খাটিতে হইবে। অভ্যাস থাকা ভাল। এই গুলি হইতেছে সিঁড়ি এ সব পার না হইতে পারিলে দেশের দুর্দ্দিন যাইবে না।

(৭)

"মাষ্টার মশাই !"

নীহারকে অপ্রত্যাশিত ভাবে জেলের মধ্যে দেখিয়া সরোজ বিস্ময়ে এক পদ হাটিয়া গেল।

নীহার আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিয়া সরোজের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। সরোজ নীহারকে উঠাইয়া ডাকিল 'নীহার' !—

নীহার এমন দৃষ্টিতে সরোজের দিকে চাহিল যে তার কবিহৃদয় বহুদিন পরে একটা নূতন সুরে বাজিয়া উঠিতে চাহিল !

নীহার বলিল,—"মাষ্টার মশাই তোমায় যা বলিনি আজ তাই বল্‌ব !"

বিচলিত হইয়া সরোজ বলিল, "কি সব বল্‌ছ নীহার আমি শিক্ষক তুমি ছাত্রী !"

নীহার বলিয়া উঠিল,—"আর তুমি প্রভু আমি দাসী। তুমি এত দিন আমায় শিখিয়েছ স্কুলের লেখাপড়া নয় কাব্য আর বিশ্ব-প্রেম তা স্বামীও স্ত্রীকে শিখাতে পারে। তার দোহাই দিয়ে তুমি আমায় ঠেলে ফেলতে পারছ না। আমি বাপ মায়ের আদেশ নিয়ে এসেছি ! আমায় তুমি সঙ্গিনী ক'রে নাও। দুজনে মিলে দেশের কাজ কর্‌ব—জেলে যেতে হয় দুজনেই যাব।"

সরোজ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিল দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া সরোজ বলিল, "না না তা হ'তে পারে না।"

নীহার আরও নিকট সরিয়া যাইয়া হাত ধরিয়া বলিল, "কেন ? তুমি দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছ তার পুরস্কার, প্রিয়তম, আমার এই প্রাণ তোমার জীবন পথে উৎসাহ দাতা।"

———

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা

জাতীয় শিক্ষা সমস্যা লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মূলে কেবল মাত্র একটা কথা আছে। আমাদের দেশের জিনিষ দেশীয় ভাবে শিখিবার অধিকার আমাদের আছে কিনা? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংপ্রতি ম্যাট্রিকুলেশনে বাঙ্গালাভাষাকে শিক্ষার অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ ইতিমধ্যেই বলিতেছেন, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অসমীচীনের কাজ করিয়াছেন, ইংরাজীকে ইতিমধ্যেই যে অল্পমানের আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশনে শিক্ষার যে Standard বা মাত্রা ছিল, তাহা ইহাতে সংকুচিত হইয়া গেল, ক্লাইব ষ্ট্রীট রাধাবাজার ও মুর্গীহাটার ব্যবসায়ীরা সস্তায় আর ইংরাজীনবীশ কেরাণী পাইবেনা, ইংরাজীর যে জ্ঞান থাকিলে কোনও রূপে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়—তাহাও আর সম্ভবপর হইবে না, কনের বাপেরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ বরের আর তেমন 'কদর' করিবে না,—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন খিঁচুড়ী পাকাইয়া গেল! অবশ্য এই উক্তি গুলি রক্ষণশীল সম্প্রদায়গণের। যাঁহারা শিক্ষা—সমস্যার সম্বন্ধে ভাবুক, তাঁহাদের মত কিন্তু অন্য প্রকার। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে বিদেশী ভাষার পঠন—পাঠকের কোনওরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়, এ কথা সর্ব্বদেশের শিক্ষাব্যবসায়িগণ একবাক্যেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে অবস্থায় তরঙ্গাপসৃত পলিমাটীর ন্যায় শিশুর মনটী কোমল ও নমনীয় থাকে, তখন তাহাতে সেটুকু আঘাত পড়িবে, তাহাই রেখারূপে তাহাতে দাগ কাটিয়া যাইবে। সুতরাং কিশোর জীবনের এই অবস্থায় কিশোরের যাহা মাতৃভাষা, সে স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছে, তাহারই শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এ পর্য্যন্ত কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থাপকেরা অন্য নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। রূপার তোড়াটী কেহ যদি চরণালঙ্কার না করিয়া শিরোভূষণ করে, তবে লোকে সেটা যেমন উন্মাদকর দৃশ্য বলিয়া হাসিতে থাকিবে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া বিদেশীরা তেমনি শ্লেষের সহিত হাসে। প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েরা যে কেন 'A—B—C—D'

চিনিতে আরম্ভ করে, তাহা "বরিশাল গানের" মতই অবোধ্য। দোটানা। মধ্যে পড়িয়া তাহাদের বাঙ্গালাও শেখা হয় না, ইংরাজীও শেখা হয় না। তাহারা যাহা শেখে, তাহা ভাষার ব্যভিচার। মোগল-পাঠানের যুগে বাঙ্গালী আরবী ও ফার্সী শিখিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে যদিও সে বাঙ্গালা ভাষা ভুলে নাই, তথাপি সে ভাষার পাবিত্র্য ও শুচিতা রক্ষা করিতে পারে নাই। ফলে বাঙ্গালীর যুগনির্দ্দেশক পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহে ভাষার সংমিশ্রণ রহিয়া গিয়াছে। জীবনের যে সোপান পর্য্যন্ত শিশুদের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হয় না, সে পর্য্যন্ত তাহাদের নিজ নিজ মাতৃ-ভাষাই শিক্ষা করা উচিত। তৎপরে যখন তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ আরম্ভ হইল, তখন সে স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে বিদেশী ভাষার আলোচনা ও চর্চ্চা করিলে তাহা অতি সহজেই আয়ত্ব করিয়া ফেলিবে। এই একই কারণে বাঙ্গলা শিশুদের পক্ষে বাল্যকাল হইতে 'হিন্দী' শিক্ষালাভ অত্যন্ত দুষ্পাঠ্য হইবে। বিদেশী প্রথার অনুকরণে কিণ্ডারগার্টেন' প্রণালী আমাদের শিশুজীবনে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বস্তু পরিচয় হয় না, তাহারা কেবল কতকগুলি বাঁধা বুলি টিয়াপাখীর মত শিখিয়া যায়। বস্তুপরিচয় হয় নাই বলিয়া পরিণত বয়সে তাহাদের ভাব-পরিচয়ও হয় না, আশপাশের জিনিষ তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায়, চক্ষু থাকিতেও তাহারা একরূপ জন্মান্ধ হইয়া থাকে,— তাহার উপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গুরুভার যখন তাহাদের স্কন্ধে গিয়া পড়ে, তখন তাহারা রামপ্রসাদী সুরে গাহিয়া যায়—

'মা, আমায় ঘুরাবি কত—
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।'

সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার মূলে এই যে 'মুস্কিল' আছে, আজ তাহার 'আসান' করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় এই জাতীয় উন্মেষের প্রথম পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া দেশের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন; এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথেষ্ট উদারনীতি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ৺রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, ললিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ শিক্ষাপ্রদানে বাঙ্গালা ভাষাকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া-ছেন। অধ্যাপনার সময় কোন্ ভাষা ব্যবহার করা উচিত, তাহার সম্বন্ধে দুইটী মত আছে—

(ক) ভাষা শিক্ষার সময় সেই ভাষাকেই শিক্ষার যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার সময় ইংরাজীকেই যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করাই উচিত। অবশ্য যেখানে দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের অবতারণা হইবে, সেখানে মাতৃভাষারই সাহায্য লইতে হইবে।

(খ) ভাষাশিক্ষাব্যতীত অন্য সর্ব্বশাস্ত্রশিক্ষায় মাতৃভাষাকেই যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন রসায়ণশাস্ত্র, চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা, উদ্ভিদতত্ব প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা মাতৃভাষাতেই সুবোধ্য ও সুগম হইবে। এই সমস্ত কঠিন বিষয়ের ইংরাজীতে শিক্ষা দিলে ছাত্রগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা অধ্যাপক-গণের নোট সমূহ কণ্ঠস্থ করে। ইহাতে কোনো কালেই তাহারা মানুষ হইতে পারে না, তাহাদের জীবনতরী আর কখনো কূলে ভিড়ায় না,—গোস্পদ প্রমাণ জলে আসিয়াই ডুবিয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের ফলে এই সমস্যাটীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষার যে সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই স্বীকার করিব। অথচ জীবন গঠনের প্রারম্ভেই ইংরাজী ভাষারূপ দুর্ব্বহ ভার শিশুর উপর চাপাইলে, 'হাঁপ' ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনবায়ু নিঃসারিত হইয়া যাইবে। মধ্যযুগের ইয়োরোপ সাধনায়, তন্ত্রে, মন্ত্রে, ভাষায়, ভাষায়, 'ল্যাটিন্' হইয়া গিয়াছিল, ল্যাটিন্ ছাড়া অন্য ভাষা বিধর্ম্মীর পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত; কিন্তু এত করিয়াও যখন বিভিন্ন জাতিয় ব্যক্তিত্ব স্ফূরণ হইল না, তখন ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি সমূহ স্ব স্ব ভাষার অনুশীলনে যত্নবান্ হইল। জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষাই শিক্ষার বাহন স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। একটী ইংরাজী বালক ছেলে বেলায় ইংরাজী-ই শিক্ষা করিবে, কারণ ইহাই তাহার মাতৃভাষা। কিন্তু কোন স্বর্গীয় বিধানবলে বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা ছাড়িয়া ইংরাজীর শরণ লইতে যায়? আর কোন্ নীতি-অনুসারেই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এতদিন এই অসহ্য অনাচার সহ্য করিয়াছিলেন? তাই বর্ত্তমান সন্নীতির সমর্থন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট উদারতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মধ্যযুগের ইয়োরোপে যেমন ল্যাটিন্ ভাষা একটী মহাদেশ প্রসারী ভাষা ছিল, আজ বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষাও সেই স্থান লাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক কারণ বশতঃ ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে যে কোনো মত প্রচারিত

হইলেও ইংরাজী ভাষার এই দেশব্যাপী সম্প্রসারণ কেহই এক আঘাতে নিরুদ্ধ করিতে পারিবেন না। কারণ ভাষার ব্যাপকতা কোনো অস্থায়ী মত উপর নির্ভর করে না। উপর তলার বাবুরা মালীকে যতই কেন হুকুমজারি করুন না, নীচের বাগানের তরুণ গোলাপ কোরকটীর সহজ বিকাশ কিছুতেই তাঁরা প্রতিরোধ করিতে পারেন না।—তাহা অব্যর্থভাবে ফুটিবেই। অপর পক্ষে ইংরাজী ভাষাকে মর্ম্মের সিংহাসনে বসাইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে দেউড়ীর দরোয়ানী করিতে দেওয়াটা যে অপমানকর সে বিষয়ে কেহই আপত্তি করিবেন না অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর শিক্ষালাভ বিষয়ে স্বাধীনতার পথ খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে বলেন বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের উপযুক্ত বই নাই, অথচ বাঙ্গালায় শিক্ষা দিতে হইবে, এ কেমন কথা? কিন্তু কোনো দেশে কোনো যুগে আগে বই লিখিয়া পরে ভাষার যোগ্যতার সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত উঠে নাই। যে সব ভাষা আর কথিত ভাষার অবস্থায় নাই, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণ লিখিয়া তবে ভাষা শিক্ষা দিয়াছে। উদ্ভিদ-তত্ত্বসম্বন্ধে বাঙ্গালায় উপযুক্ত বই নাই,— কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যদি এবিষয়টী শিক্ষা দেওয়া হয়, বাঙ্গালা ভাষায় যদি ছাত্রগণ এই বিষয়টী বুঝিতে শেখে, তাহা হইলে শীঘ্রই বিষয়টী বাঙ্গালা ভাষায় যে লিখিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনটীকে কি ধাতুতে গড়িতে হইবে, এখন তাহাই বিবেচ্য। মাটীর পুতুলে যতই কেন রং ফলানো যাক না, তাহারা মৃত্তিকা-ধর্ম্ম যেমন কখনো ঘোচেনা, তেমনি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ইংরাজী ভাষায় বহুকৃতবিদ্য হইলেও ঘুচিবে না। আমাদের মন বাঙ্গালীর ধর্ম্ম যখন কোনো কালেই ত্যাগ করিতে পারিবেনা, তখন এই ভাষার আশ্রয়ই আমাদের পরমার্থ। আজ বাঙ্গালায় ভাষার এই দৃঢ় সমর্থন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্নমত-পন্থীদের মধ্যে একটী অনশ্বর স্বুবর্ণ-মিলন-সেতু বাঁধিয়া দিয়াছেন।

ডালি

অধিকার ও কর্ত্তব্য।

[Mazzini র Duties of Man হইতে]

অধিকারের কথা না বলিয়া কেন তোমাদিগকে কর্ত্তব্যের কথা বলিতেছি? এই দেশে,—যেখানে সকলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তোমাদিগকে উৎপীড়িত করিতে সতত উদ্যত, যেখানে মানবের বহু অধিকার হইতে তোমরা বঞ্চিত, যেখানে কেবলমাত্র দুঃখ তোমাদের প্রাপ্য, আর যাহা সুখ বলিয়া মানবসমাজে পরিজ্ঞাত তাহা অন্যের নির্দ্দিষ্ট—সেখানে আমি যুদ্ধের কথা জয়ের কাহিনী না গাহিয়া ত্যাগের কথা বলিতে চাই কেন? পার্থিব উন্নতির কথা বলিয়া ধর্ম্মের কথা শিক্ষার কথা নৈতিক উন্নতির কথা শোনাইতে ব্যস্ত কেন?

অধিক কথা বলিবার আগে এই প্রশ্নের উত্তরটাই বিশদ ভাবে তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে আমি বাধ্য। * * * কেননা এই প্রশ্নই দুর্দ্দশা পীড়িত শ্রমজীবিগণের হৃদয়ে স্বতঃই উত্থিত হয়:—

"আমরা কায়িকপরিশ্রমের ক্রীতদাস—দরিদ্র এবং অসুখী। আমাদের নিকট পার্থিব উন্নতি, স্বাধীনতা ও সুখের কাহিনী কীর্ত্তন কর। বল, আমরা কি চিরদিনই যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য? আমাদের অদৃষ্টে কি কখন সুখ ভোগ ঘটিয়া উঠিবে না? * * * আমাদের কাছে মানবের অধিকারের কথা বল। বল কি উপায়ে আমরা সেই সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইব। শোনাও আমাদিগকে আমাদের শক্তি-কথা। প্রথমতঃ আমাদিগকে একটা সর্ব্ব স্বীকৃত সমাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব লাভ করিতে দাও; তাহার পর আমাদের নিকট কর্ত্তব্যের কথা উত্থাপন করিও।"

বহুশ্রমজীবী এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, এইরূপ মতের অনুসরণ করে এবং এইরূপ চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট সভা সমিতিতে যোগদান করে। কিন্তু একটা কথা তাহারা বিস্মৃত হয় যে বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এইরূপ মতবাদ প্রচারিত হওয়া সত্বেও, শ্রমজীবিগণের অবস্থার সামান্য মাত্রও উন্নতি হয় নাই।

রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালী বা জন্মগত আভিজাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইউরোপ বিগত পঞ্চাশ বৎসরে যাহা কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা মানবের অধিকার

ও স্বাধীনতার নামে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যভূত সুখলাভের উপায় স্বরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিরাট ফরাসী-বিপ্লব ও তদনুকরণে অনুষ্ঠিত অন্যান্য পরবর্ত্তী বিপ্লবসমূহ মানবের অধিকার প্রচারের ফলস্বরূপে সংঘটিত হইয়াছে। এইসব বিপ্লববাদিগণের মুলমন্ত্র এই যে :—মানব সুখভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপন ক্ষমতানুরূপ যে কোন উপায়ে সুখের সন্ধান করিতে মানব অধিকারী। তাঁহার সুখলাভপ্রচেষ্টায় বাধা দিতে কাহারও অধিকার নাই। সুখলাভের পথে সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিবার অধিকার মানবের আছে।

সমস্ত বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইয়া, স্বাধীনতাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনেক দেশে যে স্বাধীনতা বহু বর্ষ ধরিয়া বিদ্যমান ছিল, কোন কোন দেশে এখনও তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু তাহাতে কি দেশের অধিবাসিগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে? লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা কায়িক পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহারা কি সেই অঙ্গীকৃত আকাঙ্ক্ষিত সুখের কণামাত্রও লাভ করিয়াছে? না, সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হয় নাই। বরং অনেক দেশে তাহাদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

* * * *

তথাপি বলিতে হইবে এই পঞ্চাশ বৎসরে সামাজিক ঐশ্বর্য্যের উপাদান ও সুখলাভের পার্থিব উপাদান সমূহ ক্রমশঃই বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। * * * বাণিজ্যের প্রসার ও প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সর্ব্বত্র সত্বর ও নিরাপদ যাতায়াতের এই সংবাদ প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে। * * * অন্য দিকে মানবের সহজাত অধিকারের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। * * * তবে কেন দেশবাসীর অবস্থা উন্নত হইতেছে না? তবে কেন উৎপন্ন দ্রব্যজাতের উপভোগ সকল ব্যক্তির করায়ত্ত না হইয়া মাত্র কয়েকজনের হস্তগত হইতেছে? * * * তবে কেন শিল্প বাণিজ্য নবভাবে উজ্জীবিত হইয়াও সমগ্র মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিদান না হইয়া কতিপয় ব্যক্তির বিলাসোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছে।

যাঁহারা একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার উত্তর অতি সুস্পষ্ট। মানুষ শিক্ষার ক্রীড়নক। তাহাদিগকে যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তাহাদের কার্য্যপ্রণালীও তদনুরূপ হইবে। বিপ্লববাদের

সহায়কগণ ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনপ্রার্থিগণ একাল পর্য্যন্ত তাহাদের কার্য্য-প্রণালী একটিমাত্র ভাবের উপর—ব্যক্তিগত অধিকার বাদের উপর স্থাপিত করিয়াছেন। এই সব বিপ্লবের দ্বারা যে স্বাধীনতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,—শিক্ষার স্বাধীনতা, ধর্ম্মবিলাসের স্বাধীনতা, ব্যবসায়ের স্বাধীনতা, সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্ব মানবের জন্ম স্বাধীনতা!

কিন্তু যাহারা এই সমস্ত অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাদের যদি তাহা অনুশীলন করিবার উপায় না থাকে তবে সে অধিকার লাভে ফল কি? যদি শিক্ষা হইতে উপকার লাভের সময় বা উপায় মানবের না থাকে তবে শিক্ষার স্বাধীনতার লাভ কি? বাণিজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের কি ফল যদি না থাকে মূলধন, না থাকে বাজারে "পসার"?

যে সমস্ত দেশে এই সব তথ্য প্রচারিত হইয়াছিল, সেখানকার সমাজে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই ভূমি, অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল আর অবশিষ্ট বিশাল জনসংঘের কিছুই ছিল না। তাহারা কায়িক পরিশ্রমে প্রাণধারণ করিত এবং জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত যে কোন মূল্যে আপনাদের পরিশ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। যাহাদিগকে সমস্ত একটা না একটা কায়িক পরিশ্রমে জীবনক্ষেপ করিতে হইত, ক্ষুধাও অভাবের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতে হইত তাহাদের আবার স্বাধীনতা কি? তাহাদের পক্ষে স্বাধীনতা হয় উপহাস, নয় প্রবঞ্চনা!

এইরূপ ঘটনা নিবারণ করবার একমাত্র উপায় ছিল যদি উচ্চশ্রেণী স্বেচ্ছায় পরিশ্রমের জন্ম নির্দ্দিষ্ট সময় হ্রাস করিয়া পরিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিতেন, বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন, শ্রমজীবিগণের বস্ত্রাদি সকলের মধ্যে সুলভ করিতেন, সচ্চরিত্র কর্ম্মনিপুণ শ্রমজীবিগণকে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেন।

কিন্তু কেন তাঁহাদের এইরূপ করা উচিত ছিল। সুখই কি মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নহে? পার্থিব উন্নতিই কি সকলের একমাত্র বাঞ্ছনীয় নহে? তবে কেন তাহারা পরের জন্ম আপনাদের ভোগের মাত্র কমাইয়া দিবেন? ...... তাহারা যে এইরূপ উত্তর দিতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহারা এইরূপ উত্তরই প্রদান করিয়াছিল। সম্পন্ন অবস্থার ব্যক্তি দরিদ্রকে এই ভাবেই অবলোকন করিত এবং ইহাই ক্রমশঃ সমাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধিকার ও

অবস্থা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যখনই একজনের অধিকারের সহিত অন্যের অধিকারের সংঘর্ষ ঘটিত তখনই ফল হইত সামরিক অবস্থা * * * এই নির্দ্দয় যাহার অর্থ ছিল, কূটবুদ্ধি ছিল, সে দুর্ব্বল, বুদ্ধিহীনকে পিষ্ট করিয়া ফেলিত।

এই প্রকার সামরিক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত হইয়া মানব কেবল স্বার্থ-পরতা ও ঐহিক উন্নতির লালসায় শিক্ষিত হইতে ছিল। ধর্ম্মমতের স্বাধীনতায় ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহ ধ্বংস হইয়াছিল, শিক্ষার স্বাধীনতায় নৈতিক যথেচ্ছাচার উদ্ভূত হইয়াছিল। মানবজাতির মধ্যে কোন সাধারণ বন্ধন না থাকায় ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও জীবনের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব, ভোগে অত্যাসক্তি ও তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আসক্তি হেতু সকলেই নিজ নিজ অভিমত পন্থায় অগ্রসর হইতে লাগিল, কেহই ভাবিল না যদি সেই পন্থা অনুসরণ করিতে গিয়া তাহাদেরই ভ্রাতৃগণের দেহ পদদলিত হইয়া যায়। আমরা ভ্রাতা শুধু নামে, প্রকৃতপক্ষে শত্রু।

অধিকারবাদকে ধন্যবাদ, তাহার কৃপায় আজ আমরা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি! অধিকার নিশ্চয়ই আছে কিন্তু যদি অধিকার বাদ অপেক্ষা উচ্চতর কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করিয়া না লই তবে যখন একের অধিকারের সহিত অন্য ব্যক্তির অধিকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন কেমন করিয়া আমরা সেই সংঘর্ষের মীমাংসা করিব?

যদি মানব মাত্রেরই সুখলাভে অধিকার থাকে তবে শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ি-গণের মধ্যে যে সমস্যাসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা কেমন করিয়া তাহাদের মীমাংসা করিব? যদি প্রাণরক্ষা মানব মাত্রেরই অলঙ্ঘ্য অধিকার হয় তবে পরের উপকারের জন্য সেই প্রাণপাত করিতে কে উপদেশ দিবে? দেশের নামে, জনসংঘের নামে তোমরা তাহা চাহিতে পার কি?

* * * *

তোমরা যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ব্যক্তিকে বলিয়া আসিতেছ, সমাজ তাহারই অধিকারসমূহের নিরাপদ অনুশীলনের জন্য গঠিত হইয়াছে, তবে কেমন করিয়া তাহাকে বলিবে যে সমাজের জন্য সর্ব্বস্ব তাহার উৎসর্গ করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে সমাজের উন্নতির জন্য তাহাকে অনন্ত দুঃখ, কারাবাস এমন কি নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে? তোমরা সাধ্যমত তাহাকে শিক্ষা

দিয়াছ যে সুখ ভোগই মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য; তবে কেমন করিয়া আশা করিতে পার যে বিদেশীয় অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষার জন্য অথবা তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহের অবস্থার উন্নতির জন্য সেই সুখ এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে সে সম্মত হইবে? বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহার নিকট পার্থিব স্বার্থের মন্ত্র প্রচার করিবার পর কেমন করিয়া তোমরা আশা করিতে পার যে তাহার স্বদেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এই ভাবিয়া ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা আয়ত্বের মধ্যে পাইয়াও সে তৎসমুদায়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে না?

শ্রমজীবিগণ, ইহা কেবলমাত্র আসার মনঃকল্পিত, ঘটনার দ্বারা অপ্রমাণিত ব্যক্তিগত মত নহে। ইহা ইতিহাস—আমাদের বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস—যাহার প্রতিপৃষ্ঠা দেশবাসীর রক্তে রঞ্জিত!

• • • •

আমরা যে পবিত্র সামাজিক যুদ্ধে নিরত, ইহাকে যদি কেবলমাত্র অধিকার লাভের যুদ্ধে পরিণত করা যায়, তবে যেদেশের অধিবাসিগণ পূর্ণ দাসত্বে শৃঙ্খলিত যেখানে এইরূপ সমরে আরও বহু বিপদের সম্ভাবনা, যেখানে উন্নতির প্রতি পাদক্ষেপ স্বদেশপ্রেমিকের রক্তে অনুরঞ্জিত, যেখানে শাসকদিগের বিরুদ্ধে এই সমর গুপ্ত, প্রকাশ্য আন্দোলনের সান্ত্বনা ও প্রশংসায় বঞ্চিত, সেখানকার নেতৃগণ কোন্ দায়িত্বজ্ঞানে, কোন্ বিশ্বাসের প্রেরণায় উন্নতিলাভের পন্থায় অটল থাকিতে পারে? • • •

রক্তের উত্তেজনায়, অত্যাচারের প্রতিশোধ কামনায় যুবকগণ সহজেই এইরূপ সমরে যোগদান করিতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন তাহার অবসান হয়, এইপ্রকার প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যখন মোহঘোর কাটিয়া যায়, তখন কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের পর, কেন তাহারা সেই অশান্তিময়, বিঘ্ন-সঙ্কুল, বিপদ্ পরিপূর্ণ জীবন—যাহা প্রতিমুহূর্ত্তে কারাবাস, বধমঞ্চ বা নির্ব্বাসনে নির্ব্বাপিত হইতে পারে এইরূপ জীবনের পরিবর্ত্তে আরামময় জীবন অবলম্বন না করিবে? •

• • • এরূপ কাহিনী বড়ই করুণ, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, এই সব মত্ত্রেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না কি? কেমন করিয়া, কাহার দোহাই দিয়া আমরা লোকের বিশ্বাস জন্মাইব যে বিপদ ও প্রবঞ্চনা

তাহাদিগকে নিরুৎসাহ না করিয়া বরং অধিকতর শক্তিমান করিবে; যে এই যুদ্ধ তাহাদিগকে কয়েক বৎসরের জন্য নহে, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া চালাইতে হইবে। কেবলমাত্র অধিকার লাভের জন্য কে তাহাদিগকে এইরূপ যুদ্ধে ব্রতী হইতে উপদেশ দিবে যখন দেখা যাইতেছে যে অধিকারবর্জ্জন অপেক্ষা এই যুদ্ধে তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ অধিকতর?

* * * অধিকারবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কে বুঝাইবে যে সাধারণের হিতের জন্য চেষ্টা ও সামাজিক ভাবের বিকাশের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে সে বাধ্য? ধর, সে যদি বিদ্রোহী হয়, সে যদি সাহস করিয়া তোমাদিগকে বলে, "আমি সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতেছি। আমার ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি আমাকে অন্যত্র আকৃষ্ট করিতেছে। সেই ইচ্ছা ও সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার আমার অলঙ্ঘ্য, অধিকার আছে সেজন্য আমি সকলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অভিলাষী" তখন অধিকারবাদের চতুঃসীমার মধ্যে দাঁড়াইয়া তোমরা কি তাহার কথার উত্তর প্রদান করিতে পার? কেবল বহুসংখ্যক ব্যক্তি তোমাদের দলভুক্ত বলিয়া তোমরা কোন্ অধিকারে তাহাকে তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিরোধী নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করাইতে পার? আর সেই নিয়ম যদি সে ভঙ্গ করে তবে তাহাকে শাস্তি দিবার কোন অধিকার তোমাদের আছে কি?

প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার সমান। কেবলমাত্র এক সমাজে একত্র অবস্থান করে বলিয়া কোন অধিকার জন্মিতে পারে না। ব্যক্তির অপেক্ষা সমষ্টির ক্ষমতা অধিক হইতে পারে কিন্তু অধিকার বেশী নয়। তবে কেমন করিয়া তোমরা ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে তাহার স্বদেশী অথবা বিদেশী ভ্রাতৃগণের ইচ্ছার নিকট তাহার ইচ্ছাকে নত করিতে হইবে?

কারাবাস বা ঘাতকের ভয় দেখাইয়া?

যে সমস্ত সমাজ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারা সকলেই এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

কিন্তু ইহা ত দ্বন্দ্বের কথা—আমরা চাহি শান্তি। ইহা অত্যাচার-উৎপীড়ন, আমরা চাহি শিক্ষা।

বলিয়াছি আমরা চাহি শিক্ষা। এই এক কথার উপর আমার সমস্ত মতবাদ স্থাপিত, আমার সমস্ত বক্তব্য পঞ্জীভূত। বর্ত্তমান কালের আন্দোলনে শিক্ষাই প্রধান সমস্যা। আমরা বলপ্রয়োগের সাহায্যে কোন নূতন নিয়ম স্থাপন

করিতে চাহি না। যতই উৎকৃষ্ট হউক না বলপ্রয়োগে কোন নূতন নিয়ম স্থাপন করার নাম উৎপীড়ন। আমরা যাহা করিতে পারি তাহা এইমাত্র :—বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়মের অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর বিধান আমরা জাতির সম্মতির জন্য প্রস্তাব করিতে পারি এবং জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে পারি যে সাধ্যমত, সর্ব্ববিধ উপায়ে উক্ত নিয়ম অবলম্বন ও তদনুসারে কার্য্য করা তাদের কর্ত্তব্য।

উৎপীড়ন মানবের উন্নতিপন্থায় যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন নিক্ষেপ করে তাহা অপসারিত করিবার জন্য অধিকারপদ মানবকে উৎসাহিত করিতে সমর্থ তাহা স্বীকার করি কিন্তু যেখানে মানবের উদ্দেশ্য—যে সমস্ত বিভিন্ন উপাদান লইয়া সমাজ গঠিত তাহাদের মধ্যে একটা মহান্ ও শক্তিশালী সামঞ্জস্য সংগঠিত করা, সেখানে অধিকারবাদ নিষ্ফল। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সুখলাভ-এই মতবাদ প্রচার করিয়া আমরা কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তির সৃষ্টি করিব যাহারা তাহাদের পুরাতন প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা নূতন নিয়মের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মাস কয়েকের মধ্যেই তাহাকে পঙ্কিল করিয়া তুলিবে। সেইজন্য আমাদিগকে এমন একটা নীতির সন্ধান করিতে হইবে যাহা পূর্ব্বোক্ত মতবাদ সমূহ হইতে মহত্তর হইবে এবং যাহা মানব জাতিকে উন্নতিরপথে পরিচালিত করিবে, তাহাদিগকে বিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগশিক্ষা দিবে, ব্যক্তি বিশেষ অথবা বহুর প্রভাব হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে একতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। এই নীতির নাম কর্ত্তব্য। আমরা মানবকে শিক্ষা দিব যে সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান। এই জগতে কেবলমাত্র একটা বিধান মানিয়া চলিতে মানব বাধ্য। প্রত্যেককে নিজের জন্য নহে,পরের জন্য জীবন ধারণ করিতে হইবে। অল্প বা অধিক পরিমাণে সুখী হওয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে; তাহার উদ্দেশ্য আপনাকে এবং অপরকে অধিকতর পুণ্যবান্ করা। স্ব স্ব ভ্রাতৃগণের নামে ও সাহায্যে অন্যায় ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কেবল মাত্র একটা অধিকার নহে তাহা কর্ত্তব্য—সমস্ত জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য—যাহার অবহেলা পাপ।

ভ্রাতৃগণ, আমার বাক্য বিশেষ করিয়া প্রনিধান কর। তোমাদের অধিকার জ্ঞান কোন কালেই তোমাদিগকে স্থায়ী ও মূল্যবান উন্নতি প্রদান করিতে পারিবে না। ইহা বলিয়া আমি তোমাদিগকে অধিকার সমূহ বর্জ্জন করিতে বলিতেছি না। আমি কেবলমাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে অধিকার লাভ কর্ত্তব্য পালনের পরিণাম স্বরূপেই সম্ভবপর হইতে পারে; সুতরাং অধিকার

সমূহ আয়ত্ব করিতে হইলে আমাদিগকে কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা করিতে হইবে। আমি যে বলিয়াছি সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, পার্থিব উন্নতিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আমরা স্বার্থপর হইব ইহাতে এমন বুঝিওনা যে উক্ত সব বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি আমি বলিতে চাহি যে কেবলমাত্র পার্থিব উন্নতি জীবনের উদ্দেশ্য হইলে তাহার ফল অতি বিষময় ও সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে।

* * * *

পার্থিব উন্নতিও প্রয়োজনীয় এবং আমরাও তাহা পাইতে চেষ্টা করিব তবে তাহার কারণ ইহা নহে যে মানব মাত্রেরই সুন্দর বাসস্থান ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজনীয়; তাহার কারণ যতদিন মানব বর্ত্তমান যুগের ন্যায় দারিদ্র্য ও অভাবের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিতে থাকিবে ততদিন তাহাদের হৃদয়ে মহত্ব জ্ঞান ও নৈতিক উন্নতির আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে না।

* * * *

সুতরাং তোমাদের নৈতিক উন্নতির জন্য তোমাদের অবস্থার উন্নতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহাদিগকে উপায় স্বরূপে গ্রহণ করিও; জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিও না। কর্ত্তব্য জ্ঞানের দিক হইতে তাহাদের সন্ধান করিও, অধিকার বলিয়া দাবী করিও না। ঐহিক সুখলাভের আশা না করিয়া পুণ্যলাভ প্রয়াসে তাহাদের জন্য চেষ্টা করিও। তাহা না হইলে তোমাদের অত্যাচারিগণের ও তোমাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? অত্যাচারীগণও কেবল স্ব স্ব সুখ, ভোগ ও ক্ষমতার লালসায় উৎপীড়ন করিয়া থাক।

আপনাদিগকে উন্নত কর। ইহাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইবে। কেবল মাত্র আত্মোন্নতির বলে, পুণ্যের প্রভাবে তোমরা স্ব স্ব অবস্থাকে অল্প অসুখী করিতে পারিবে। ঐহিক স্বার্থ বা বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানের দ্বারা উন্নতির কামনা করিলে তোমাদের মধ্যেই সহস্র সহস্র অত্যাচারীর সৃষ্টি হইবে। যতদিন তোমরা স্বার্থপর ও বর্ত্তমান প্রবৃত্তি সমূহের দাস থাকিবে ততদিন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিলেও কোন উপকার সাধিত হইবে না।

যাহারা এখনও তোমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে তাহাদেরও উন্নতি

সাধন আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু আপনাদিগকে উন্নত করা ব্যতীত তোমরা সে চেষ্টায় সফল হইবে না।

• • • •

ইহার সংসাধন করা বিশ্বাসের কার্য্য। বিশ্বাস করিতে হইবে এই পৃথিবীতে পরমেশ্বর তাহার মানব সন্তানগণের উপর কর্ত্তব্যভার প্রদান করিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে হইবে, যে সে কর্ত্তব্য পালন না করিলে তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে, বিশ্বাস করিতে হইবে সত্যের জন্ম অবিরাম চেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য।

• • • •

আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবান তাঁহার সৃষ্ট জীবের হৃদয়ে যে স্বাধীনতা ও ক্রমোন্নতির বীজ প্রদান করিয়াছেন তাহাকেই পূর্ণভাবে বিকশিত করা। স্বর্গে যেরূপ ভগবদ্রাজ্য বিদ্যমান মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ রাজ্যের অস্তিত্ব আমরা কামনা করি। পৃথিবী যেন স্বর্গলাভের হেতু ভূত হয়। সমাজ যেন ঐশ্বরিক ভাবের ক্রমোপলব্ধি প্রচেষ্টা ক্ষেত্র হয়। খৃষ্ট যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিকার্য্য সেই ধর্ম্মমতের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে সব প্রচারকগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিকার্য্য তাঁহাদের গৃহীত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি জীবন্ত ছিল। তোমরাও তদ্রূপ হও, তোমরা জয়লাভ করিবে। যাহারা তোমাদের উচ্চে অবস্থিত তাঁহাদের নিকট কর্ত্তব্যের প্রচার কর আর সাধ্যমত স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন কর। ধর্ম্ম, প্রেম ও আত্মোৎসর্গ প্রচার কর। নিজেরা ধার্ম্মিক, প্রেমিক ও আত্মোৎসর্গপরায়ণ হও। স্ব স্ব মনোভাব সাহস করিয়া প্রকাশ কর, সাহস করিয়া আপনাদের অভাব ব্যক্ত কর; কিন্তু ক্রোধ করিও না; ভীতি প্রদর্শন করিও না, প্রতিশোধ কামনা করিও না। যদি কোন ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন আবশ্যক হয়, মনে রাখিও বাক্যজাল অপেক্ষা দৃঢ়তা অধিকতর ভীতিপ্রদ।

তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই সুখময় ভবিষ্যতের কথা প্রচার করিও, তাহাতে তাহারা শিক্ষা, কর্ম্ম ও তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করিবে। তাহাদিগকে মানবের কর্ত্তব্য ও বিবেক সম্বন্ধেও উপদেশ প্রদান করিও এবং

সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকেও উন্নত ও শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিও; তোমাদের কর্ত্তব্যের পূর্ণ জ্ঞান লাভ ও তদনুশীলন জন্য আপনাদিগকে সতত প্রস্তুত রাখিও।

নারায়ণের নিকষমণি

বিপথ:—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ১৮০ টাকা, বড় বড় সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়। বইখানি পারিবারিক উপন্যাস, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বই পড়ে মনে হয় যে একটি সরলা বালিকা 'চারু' সরল মনে একটা খেয়ালের বশে একটা সেবার পথ ধরেছিল। কিন্তু সে পথ হয়েছিল তার পক্ষে বিপথ, সুতরাং পথভোলা মেয়েটি একটা মস্ত ভ্রান্তি নিয়ে শেষে মরণের কোলে শান্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। "চারুর" চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে গ্রন্থকার সফল হয়েছেন এবং এটা ফোটাবার জন্যই বাকী চরিত্রগুলির সৃষ্টি; তাদের নিজেদের তত কিছু বিশেষত্ব নেই। সুতরাং সে সব চরিত্রের দুই এক জায়গায় গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হ'তে না পারলেও আসল চরিত্রের তাতে বড় যায় আসে না। মোটের উপর প্রতি পাদক্ষেপে চারুর পথভ্রান্তিটা ফুটিয়ে তুলতে লেখক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতার বেশ পরিচয় দিয়েছেন; কেবল চারু ও বিজয়ের মিলনটা কতকটা dramatic হয়ে পড়েছে। বিজয়ের পিতা শশীভূষণের চরিত্রে ধারাবাহিক ভাবে একটা রুক্ষতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে লেখক মহাশয় অনেকটা সফল হয়েছেন, কেবল মাঝখানে বর্ণনাটা একটু বেমানানসই হয়েছে। এই রুক্ষ প্রকৃতিকে জয় করে চারু যে তাতে করুণ স্নেহের রস বহিয়েছিল, এটাই হচ্চে গ্রন্থকারের চারুর চরিত্র ফোটানের দিক দিয়ে খুব বড় কৃতিত্ব। নিরেট আহাম্মক দীননাথের চরিত্রে গ্রাম্যতা একটু বেশী মাত্রায় দেখা দিলে ও আসলে সেটা উপভোগ্য হয়েছে। লেখকের এটা প্রথম রচনা, সুতরাং তাতে ভ্রম প্রমাদ অনেক আছে এবং তা থাকা স্বভাবিকও। যেমন সত্যদা'র ও মোক্ষদার চরিত্র আদৌ ফোটেনি। তবে একথা আমরা বলতে বাধ্য প্রথম চেষ্টা হিসাবে গ্রন্থকার আমাদের প্রশংসা ও উৎসাহের দাবী করতে পারেন। বইখানাতে ছখানা সুন্দর ছবি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতে সময়োচিত ভাবপ্রকাশ ও মানসিক অবস্থা বোঝাবার বেশ প্রয়াস হয়েছে। লেখকের বর্ণনার ভাষা ভাল, বাঁধাই সুন্দর; সুতরাং সে হিসাবে দাম অল্প। পূজার অবকাশে বইখানি পড়ে পাঠকেরা নিশ্চয়ই তৃপ্তি পাবেন।

নারায়ণ

সম্পাদক—
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

ভাদ্র,
১৩২৯

সহকারী সম্পাদক—
শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ